মানসী ও মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩৩৪—শ্রাবণ ১৩৩৫)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৩।১এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী প্রেসে"

শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৩৫

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ফাল্গুন ১৩৩৪—শ্রাবণ ১৩৩৫)

বিষয়-সূচী

লেখক-সূচী

চিত্র সূচী

বৈশাখ—

জ্যৈষ্ঠ—

আষাঢ়—

শ্রাবণ—

মানসী ও মর্ম্মবাণী

২০শ বর্ষ
১ম খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩৪

১ম খণ্ড
১ম সংখ্যা

গান

খর বায়ু বয় বেগে
চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো।
তুমি ক'সে ধর হাল,
আমি টেনে তুলি পাল
হাঁই মারো—মারো টান—হাঁইয়ো॥

শৃঙ্খলে বারবার ঝন্‌ঝন্ ঝঙ্কার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার,
বন্ধন দুর্ব্বার সহ্য না হয় তার
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো—মারো টান—হাঁইয়ো॥

গণি গণি দিনক্ষণ
চঞ্চল করি মন
বোলো না যাই কি নাই যাই রে।
সংশয় পারাবার
অন্তরে হবে পার
উদ্বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল,
জয় জয় জয় গান গাইয়ো
হাঁই মারো— মারো টান—হাঁইয়ো॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পিনাঙ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৭

সেকালের কথা

দশ এগারো বৎসর বয়সে বাঙ্গালা ভাষা-গ্রন্থ অধ্যয়নে আমার প্রথম মনোনিবেশ হয়। ইহার পূর্ব্বে ৭ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করি। প্রায় ৪ বৎসর পাঠের পর ঐ ব্যাকরণ সায় হইয়া আসিতেছিল, এই সময়ে বাঙ্গালা বহি পড়িবার সাধ হইল। যত দূর মনে হয় এই কয়খানি বহি পড়িয়াছিলাম যথা—(১) পুরুষ পরীক্ষা, (২) প্রবোধ চন্দ্রিকা, (৩) বেতাল পঞ্চবিংশতি, (৪) বাঙ্গালার ইতিহাস, (৫) জীবন-চরিত। শেষের তিনখানি বিদ্যাসাগরের লেখা। তিনখানিই অনুবাদ—বেতাল হিন্দী হইতে, আর দুইখানি ইংরাজী হইতে। তবে এস্থলে বলা উচিত, বেতালের যে অনুবাদ সে নামমাত্র অনুবাদ; হিন্দীতে এক খানি কঙ্কাল পাইয়া তাহাতে অস্থি মাংস রক্ত চর্ম্ম যোজনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এক অতি অপূর্ব্ব গল্প গ্রন্থ খাড়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার কীর্ত্তির প্রথম সোপান। বাঙ্গালার ইতিহাসখানি মার্শম্যান নামক পাদরীর প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থের প্রকৃত অনুবাদ বটে। প্রভাতবাবু একস্থলে বিদ্যাসাগরের রচনাকে 'গুরুগম্ভীর' এই আখ্যা দিয়াছেন—বাস্তবিক এই আখ্যা খুব ঠিক হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর-রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সে প্রকার নহে। উহা অতি সহজ চলিত ভাষাতে লিখিত। 'জীবন-চরিত' গ্রন্থখানি চেম্বার্স কর্তৃক সঙ্কলিত ও 'বিওগ্রাফি' নামক পুস্তক অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্য হইতে নিউটন ইত্যাদি কয়েকটি বড়লোকের সংক্ষিপ্ত চরিত্র কীর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহার রচনাও গুরুগম্ভীর পদবাচ্য নহে। কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয় বলা আবশ্যক হওয়াতে অনেকগুলি নূতন শব্দ বিদ্যাসাগরকে সৃষ্টি ও বাঙ্গলাতে প্রচলিত করিতে হইয়াছিল, যথা, গবেষণা, আবিষ্ক্রিয়া, অনুবীক্ষণ ইত্যাদি। গ স্ সেই সকল শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাই এক্ষণকার লেখকেরা সেই শব্দগুলি নাড়াচাড়া করিয়া বাঙ্গালা রচনার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছেন। এক্ষণে এমন একটিও লোক দেখিতে পাই না যিনি অমন পরিপাটি রূপে বাঙ্গালা ভাষার শব্দ সম্পত্তি বাড়াইতে পারিতেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রে তাঁহার মতন ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি আর তো নজরে ঠেকে না—এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি তাঁহার প্রণীত 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র উদাহরণ সংগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, দেখিবেন কিরূপ পটুতা, নৈপুণ্য, সহৃদয়তা, অশেষ বিষয় সংগ্রহ এই সমস্ত গুণ অতি চমৎকারিতার সহিত প্রকটিকৃত হইয়াছে। যদি কেহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উদাহরণ আর 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র উদাহরণ তুলনা করিয়া দেখেন, তবে তিনি বোপদেবের নামে পরিহাস করিবেন, আর বিদ্যাসাগরের নাম শিরোধার্য্য করিবেন।

'পুরুষ-পরীক্ষা' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' এই দুইখানি গ্রন্থ যদি কেহ আজকালের কালে পাঠ করেন, তাহা হইলে অতি অদ্ভুত মনে করিবেন। ঐ দুই গ্রন্থের ভাষাই বল আর লিখিত বিষয়গুলি বল, অনেক স্থলে হাস্যাস্পদ বোধ হইবে। 'পুরুষ-পরীক্ষা' হইতে একটী কথা লিখিয়া দেখাইয়া দিতেছি। গ্রন্থকার বুদ্ধির বিষয় বিচার করিতে বসিয়া বুদ্ধিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ১নং বেগবেগা অর্থাৎ যে বুদ্ধি থাকিলে শীঘ্র বুঝিতে পারে অথচ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়। ২নং বেগচিরা অর্থাৎ শীঘ্রই বোঝে, কিন্তু বিলম্বে ভোলে। ৩নং চিরচিরা অর্থাৎ বিলম্বে বোঝে, অথচ বিলম্বে ভোলে। ৪নং চিরবেগা অর্থাৎ বিলম্বে বোঝে, শীঘ্র ভোলে। গ্রন্থকারের এই লেখাটুকু পাঠ করিলে কেহই বোধ হয় একটী অপভাষা প্রয়োগ করিবার প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে পারিবেন না। এই দুই খানি গ্রন্থ আমার বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হবু সাহেব হাকিমদিগকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, হবু হাকিমেরা যখন প্রকৃত হাকিম হইতেন

তখন 'চণ্ডীমণ্ডপকো বোলাও' এইরূপ আজ্ঞা কেন প্রচার করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, চণ্ডীমণ্ডপ কোন সাক্ষীর নাম! বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সাহেবদিগের বাঙ্গালা শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই উপলক্ষেই বেতাল-পঞ্চবিংশতি রচনা করা হয়। তাহার কিছু কাল পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপল নিযুক্ত হন এবং কর্তৃপক্ষেরা ঐ কলেজের শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্তন করিতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। তদনুসারে উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ, ব্যাকরণ কৌমুদী প্রভৃতি পাঠ্য গ্রন্থগুলি প্রণীত হইয়া ঐকালের ছাত্রদিগকে পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ প্রণালী পরিবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা-প্রণালী এক সম্পূর্ণ নূতন ভাব ধারণ করিল, এবং ঐ ভাষায় সর্ব্বসাধারণে সহজে সংস্কৃত শিখিবার এক যুগান্তর উপস্থিত হইল।

ইহারই কাছাকাছি সময়ে এ দেশের স্ত্রী-শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এক্ষণকার বেথুন কলেজ সেই সময়ের সৃষ্ট। বেথুন কলেজের সৃষ্টির ইতিহাস এক্ষণে বোধ হয় অনেকেই জানেন না, কিন্তু ইতিহাসটী অতি চমৎকার। মহাত্মা বেথুন যখন ল মেম্বর হইয়া এদেশে আসেন এবং এডুকেশন কমিটির প্রধান অধ্যক্ষ হয়েন, তখন তিনি এখানকার সতীদাহ ব্যাপারটা কি ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তখন তাঁহার মনে এক দুর্বিবহ অনুতাপ উপস্থিত হইল। কারণ সতীদাহ নিবারণের সময় তিনি বিলাতে ছিলেন এবং ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতেন। সেখানকার অনেক মহাপুরুষ সতীদাহ পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিলাতে আন্দোলন করিয়াছিলেন। এবং বেথুন সাহেবকে তাঁহারা স্বপক্ষ সমর্থনার্থ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করেন। বেথুন সাহেব এদেশের আচার ব্যবহার বিশেষ কিছুই জানিতেন না; সুতরাং সেই বিষয়ের ব্রীফ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে আন্দোলন ত সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। পরে বেথুন সাহেব এদেশে আসিয়া সতীদাহের ব্যাপারটা ভালরূপে বুঝিয়া আপশোষ করিয়াছিলেন —"আমি এতদূর হতভাগ্য যে, আমি টাকা খাইয়া এতাদৃশ দুষ্কর্ম্ম সমর্থন করিবার জন্য ব্রীফ লইয়াছিলাম! সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমার সমস্ত শক্তি ও সম্পত্তি আমি এদেশের স্ত্রীলোকের উপকারের জন্য নিয়োজিত করিব।" ইহাই হইতেছে বেথুন কলেজের সৃষ্টির ইতিহাস। *

তৎকালে বেথুন সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি বিদ্যাসাগরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তির মত উপযুক্ত লোক এ দেশে অতি অল্পই আছেন। এ নিমিত্ত বেথুন কলেজের সৃষ্টির পর উহার পরিচালনার জন্য এক অধ্যক্ষ কমিটী গঠন করিয়া বিদ্যাসাগরকে তাহার সেক্রেটারী করিয়া দিলেন। এ স্থলে একটা বৃত্তান্ত বলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি যে, সকল সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে সময়োচিত সংলগ্ন কথা কেমন করিয়া যোগাইত। বৃত্তান্তটি এই—বেথুন কলেজে মিস পিগট নামে একটী মেম সাহেব প্রিন্সিপল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোন কারণে মেয়ে-স্কুলের কোন পণ্ডিতের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিটির নিকট আবেদন করেন। পণ্ডিত কাঁদিয়া বিদ্যাসাগরের নিকট পড়িলেন। বিদ্যাসাগর সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেন, পণ্ডিতের কোনই অপরাধ হয় নাই। যখন কমিটি প্রিন্সিপলের আবেদন বিচারের জন্য বৈঠক করিলেন, তখন সেক্রেটারীরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে উপস্থিত। তিনি পরিষ্কার রূপে কমিটিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, পণ্ডিতের কোন অপরাধ নাই, প্রিন্সিপল মহাশয়া অন্যায়রূপে গরিব পণ্ডিতের অন্ন মারিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কমিটির সাহেবেরা সকলেই তাহা বুঝিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ একত্র পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আবেদন একেবারে অগ্রাহ্য করিলে প্রিন্সিপল মহাশয়াকে অপমান করা হয়, অতএব মাস দুয়েকের জন্য পণ্ডিতকে সস্‌পেণ্ড করা হুউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন যে, যদি বলিদান না পাইলে

প্রিন্সিপল মহাশয়ার রাগ না পড়ে, তবে তাহাই করা হউক। ইহা প্রকাশার্থ তিনি এইরূপ ইংরাজী ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন—"Do if some sacrifice is necessarry to appease her".—Sacrifice এবং appease এই দুইটি কথা শুনিয়া কমিটির সাহেবেরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আর কিছুই করা হইল না। পণ্ডিতকে কোন শাস্তি দেওয়া হইল না। বৈঠক শেষ হইল। এই মত সংক্ষেপ কথা কহিবার অসাধারণ শক্তি বিদ্যাসাগরের ছিল।

তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে ইংলণ্ডের দিগ্‌গজ পণ্ডিত ডাক্তার জনসন্‌কে অনেক সময় মনে পড়ে। মেকলে লিখিয়াছেন, জন্‌সন্ দুই প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিতেন। কাহারও সহিত কথা-বার্ত্তা কহিবার সময় তিনি সহজ চলিত স্যাক্‌শন কথা ব্যবহার করিতেন, আর কলম ধরিলেই বড় বড় ল্যাটিন কথা না লিখিলে তাঁহার মন উঠিত না—মেকলে লিখিয়াছেন, সেটি ছিল জন্‌সনী ভাষা। বিদ্যাসাগরের বিষয়েও দেখা যাইত যে, কথা-বার্ত্তার সময় তিনি কখনও সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। প্রশংসা না বলিয়া বলিতেন "বাহবা," হতবুদ্ধি না বলিয়া বলিতেন "ফ্যাপাতুড়ো", বুদ্ধিমান্ না বলিয়া বলিতেন শেয়ানা চালাক চতুর। আর জনসনের মত তাঁহার আরও একটি অভ্যাস ছিল—জনসন যখন কাহারও সঙ্গে তর্ক করিতেন, তখন মাঝে মাঝে বলিতেন "Why sir ? How sir ? You don't enter into the question, sir." বিদ্যাসাগর প্রায়ই বলিতেন "তা জান না বুঝি?" এটা কিন্তু জনসনের মত কঠোর ভাবে নহে, অতি সুকোমল ভাবে বলিতেন। আর একটা চলিত কথা তাঁহার মুখে শোনা যাইত, "তুক্কো"। এ শব্দটার মানে বলা কঠিন, কতকটা অতিবিজ্ঞতা সূচক বাক্য প্রয়োগ করিবার সময় এই শব্দটার বোধ হয় প্রয়োগ হয়। যেমন "গাঁও বড়, তার মাঝের পাড়া"—এই রকম কথাগুলিকে তিনি বলিতেন "তুক্কো।"

আমার যখন পঠদ্দশা, তখন নিম্নলিখিত কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার সহিত আমার কিছু কিছু সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। প্রথম 'ভ্রম-ভঞ্জিনী' পত্রিকা, ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺তারকনাথ পালিত বাঙ্গালাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আর একখানি "পূর্ণিমা।" তাহাতে আমি ও ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আর একখানি "অবোধ-বন্ধু"(১)—ইহাতে আমি ফরাসী হইতে অনুবাদ করিয়া সমগ্র "পল ভার্জ্জিনিয়া" উপন্যাস খানি প্রকাশ করিয়াছিলাম। "বিচারক" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলাম; তাহা কিন্তু চারি সংখ্যা ব্যতীত বাহির হয় নাই। প্রত্যেক সংখ্যাতেই সর্ব্বোপরি এক একটি সংস্কৃত শ্লোক Mottoর আকারে লিখিত হইত, আর প্রত্যেক সংখ্যাতে একটির বেশী প্রবন্ধ থাকিত না। একটি মটোর কথা আমার অদ্যাবধি স্মরণ আছে—

"গুণানামেব দৌরাত্ম্যাৎ ধুরিভুর্য্যো নিবির্জ্জতে।"

ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" (২) পত্রের উপরে দুইটি করিয়া মটো থাকিত—সে দুটি এই—

(১) সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ
সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ॥"

(২) নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্
ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীশমমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোত্তদ্ বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্ন পদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে নস্ব চতুরস্বাস্তদ্বিরেফা রসং॥"

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

(১) এই পত্রিকাখানি ১২৭৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রথম বাহির হয়। প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি থাকিত—
"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

প্রথম বর্ষে "পল ভার্জ্জিনিয়া" বাহির হয়। রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, তিনি বাল্যকালে "অবোধ বন্ধু" হইতে এই উপন্যাসখানি পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁহার 'জীবন স্মৃতি'র ৮২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

অর্ব্বাচীন

কুক্ষণে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বাংলা সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্র' শব্দটি আমদানী করিলেন। সাহিত্যিক ভাবরাজ্যে অভিজাত ও গণতন্ত্রযুগের বিধি নিষেধ শাসন মানিয়া এতদিন অনায়াসে আমরা চলিয়া আসিতেছিলাম। ফরাসি একাডেমির মত কোনও কড়া পাহারা সিংহদ্বারে অথবা দেউড়িতে ছিল না; ভিক্টোরীয় যুগের সুরুচি ও শুচিতা আমাদিগের কলাভবনপ্রাঙ্গণ গোময়লিপ্ত করে নাই; অথচ আমরা আমাদের দেশের সমাজের পুরুষপরাম্পরাগত সংস্কারের তর্জ্জনীহেলনে যে পথ ধরিয়া আসিতেছিলাম, সে পথের দাবি তরুণ প্রবীণ সকলেই স্বীকার করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শব্দশিল্পী, চিত্রশিল্পী, পাঠক, দর্শক, গায়ক, শ্রোতা সকলেই সেই পথে সুন্দরের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। শাসনের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও বিদ্রোহের লক্ষণ সূচিত হয় নাই। আজিকার এই আধুনিক বস্তুতন্ত্রতার দুঃশাসন, সভামধ্যে কলালক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ করিতেছে দেখিয়া, প্রবীণ সমাজ লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন।

ইহাকে সাহিত্যিক atavism বলিব না। ঈশ্বর গুপ্ত, গুড়গুড়ে ভট্‌চায্যি ও তাঁহাদের সমসাময়িক কবিগণের সাহিত্যিক বংশধর ইঁহারা নহেন। তাঁহাদের কথা-কাটাকাটির, পরস্পরের গাত্রে ধূলিনিক্ষেপ ব্যাপারের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। ইহা একটা সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিমা; জীবন-রহস্যের, জগৎ প্রহেলিকার সম্মুখে এক অভিনব attitude। সেই ভঙ্গিমায় রূঢ়তা আছে, পৌরুষ নাই; বর্ব্বরতা আছে, বীর্য্য নাই; ক্ষুধা আছে, সংযম নাই। ইঁহাদিগকে তরুণদল বলিলে ঠিক এই সকল সাহিত্যসেবীর সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা হয় না। ইঁহারা কি বলিতে চাহেন, ইঁহাদের কণ্ঠ হইতে নূতন কোনও বাণী উদ্গিরিত হইতেছে কি না, বহু আয়াসেও তাহা

"এই অবোধ বন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌল বর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্র-সমীর-কম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমাল পরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জন্মিয়াছিল!"

২। ১২৩৭ বঙ্গাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম বাহির হয়। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিক হয়। ৭ বৎসর পরে দুইখানি কাগজ বাহির হয়। একখানির নাম 'রসরাজ', অপর খানির নাম 'সম্বাদ ভাস্কর'। প্রভাকরকে গালি দিবার জন্যই রসরাজের সৃষ্টি হয়। এই দুইখানি কাগজেও দুইটি শ্লোক থাকিত। সম্বাদ ভাস্করের শ্লোক এইরূপ—

"প্রাতর্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো
দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ নতেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনাসৎকৃত্যমত্যাদরাদ্
গৌরীশঙ্কর পূর্ব্বপর্ব্বত মুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ।"

রসরাজের motto ছিল—

"সতাং স্বস্তে শ্রান্তং শমসুখমসীমং প্রকটয়ন্
বিদগ্ধানাং সদ্যঃ কুসুমশরলীলাং প্রবলয়ন্।
গুণানাবিষ্কুর্ব্বন্ গুণিষু খলগর্ব্বানপহরন্
রসোদন্তোদ্গারী জগতি রসরাজো বিজয়তে॥"

১৭৮৩ শকে (ইং ১৮২২ সালে) সমাচার চন্দ্রিকা প্রথম বাহির হইয়াছিল। ইহাতেও motto ছিল। সেটি এই—

'সদা সমাচারযুষাং কলার্পিকা
পদার্থচেষ্টা পরমার্থ দায়িকা।
বিজৃম্ভতে সর্ব্বমনোহনুরঞ্জিকা
প্রিয়া ভবানীচরণস্য চন্দ্রিকা॥"

ইহার পূর্ব্বে সংবাদ কৌমুদী বাহির হয়। ইহারও মাথার উপর একটা শ্লোক ছিল। শ্লোকটি এইরূপ—

"দর্পণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্থিতং।
রবিণা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ॥"

ধরা যায় না। কোনও নূতন প্রেরণা, কোনও অজ্ঞাতপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্ব,—এমন কিছু, যাহা সংসারকে সৌন্দর্য্যস্নাত ও কল্যাণমণ্ডিত করিবে? যদি না থাকে, তাহা হইলে এই সাহিত্যিক বিক্ষোভের, এই বীভৎস ভঙ্গীর সার্থকতা কি?

যদি বল, ইহা নূতন কিছু নয়, প্রাচীন সাহিত্যেও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়; ইঁহারা কেবল কোনও বিশেষ ঘটনার, কোনও বিশেষ প্রবৃত্তির উপর ঝোঁক দিয়াছেন মাত্র; তদুত্তরে বলিব যে, বোধ হয় ইহা কেবল ঝোঁক বা emphasis মাত্র নহে, ইহাই ইঁহাদের সর্ব্বস্ব। একখানা বিপুল মহাকাব্যের মধ্যে মানবের জীবনলীলা যেভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে অহল্যা-চিত্রাঙ্গদা-রম্ভাবতী কাহিনী অর্দ্ধমগ্ন দ্বীপের মত প্রায় অদৃশ্য হইয়া থাকে; কিন্তু আধুনিক বস্তুতন্ত্র সাহিত্যিক রস-স্রষ্টার কাছে ঐ ধরণের আখ্যানবস্তু একটা নবাবিষ্কৃত মহাদেশ। তাঁহার সমস্ত কল্পনাশক্তি উহার চারিদিকে ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু পৌরাণিক আখ্যায়িকায় তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। তাঁহারা আধুনিক সমাজ হিসাবে বস্তুতন্ত্র; আর তাঁহাদের বস্তুতন্ত্রতা নরনারীর যৌবন ঘটিত মালমসলা লইয়া কিছু একটা গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত। ব্যাপারটা অত্যন্ত আধুনিক; এই শ্রেণীর লেখক লেখিকা আপনাদিগকে রিয়ালিষ্ট্ বলিয়া পরিচিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেন না, বরং একটু গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। উচ্চ আধ্যাত্মিক মঞ্চ হইতে ইঁহাদিগের প্রতি যুক্তিতর্ক প্রয়োগ অথবা বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিলে বিশেষ কোনও ফলোদয় হইবে না। ইঁহারা যদি বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিষয়টা একটু বুঝিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

ইংরাজ লেখক যখন নিজেকে রিয়ালিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেন, সেটা বুঝিতে আমাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না। মার্কিণ রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বলিয়াছিলেন, 'আমাদের মাথা উঁচু হইয়া থাকে নক্ষত্রলোকের দিকে, কিন্তু আমাদের পা থাকে কঠিন মৃত্তিকার উপর,' তখন মার্কিণ জাতির এই অত্যন্ত সুস্পষ্ট রিয়ালিজম্ সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্দেহ হইতে পারে নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের টাইম্‌স্ পত্রিকার সাহিত্যিক অতিরিক্ত খণ্ডপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যখন পড়া গেল যে, নেপোলিয়ন ইংরাজকে দোকানদারের জাতি বলিয়া বিদ্রূপ করিতে গিয়া বরং ইংরাজকে সম্মানিত করিয়াছেন; যদি তিনি বলিতেন যে ইংরাজ ভাবরাজ্যে বিচরণ করে, সে আডিয়ালিষ্ট, তাহা হইলে তাহার অপমানের সীমা থাকিত না; তখন জিনিষটা আরও পরিষ্কার হইয়া গেল। (We were not really annoyed when Napoleon called us a nation of shop-keepers; we should have been much more annoyed if he had called us a nation of idealists, and if we had thought there was any truth in that charge. There is nothing, in fact, about which John Bull is more shame-faced than his idealism…he would rather write himself down an ass than admit that he had ideals. He feels that idealism would turn his bluff red countenance into a grimace.—The Times Literary Supplement. Jan. 14, 1916.)

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ইংরাজ আমাদিগকে পুনঃপুনঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করাইয়া দেন, যেন আমরা রিয়ালিটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি। এই রিয়ালিজম্, এই বস্তুতন্ত্রতা ইংরাজের মজ্জাগত হইলেও তাঁহার সাহিত্যে রিরংসাবৃত্তিকেন্দ্রগ কোনও ভাবোচ্ছ্বাস-চেষ্টা কোনও তরুণ দলকে বিদ্রোহী করিয়া তুলে নাই। ভিক্টোরীয় যুগের কথা বলিতেছি না। রাব্‌লে, বাল্‌জাক্ ফ্লবেয়ার, জোলা'র ইংরাজি অনুবাদ অতিকষ্টে ইংলণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। এড্‌ওয়ার্ডীয় ও জর্জ্জীয় যুগে ইংরাজ সাহিত্যিক নূতন নূতন ভাবতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিলেন; কবি নূতন ছন্দে, রূপদক্ষ শিল্পী নূতন রেখা-বিন্যাসে সুন্দরকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

তবুও বিদ্রোহের সুরে কোনও নূতন যুগের বাণী শ্রুত হইল না। আমি গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার অবস্থার কথা বলিতেছি। তাঁহাদের সাহিত্যে চুম্বন আলিঙ্গনের ইঙ্গিত ছিল,—কিন্তু এমন ভাবে ছিল যে, কোনও আইডিয়ালিষ্ট তাহাতে ব্যথিত হইবেন না। তরুণ কবি রুপার্ট ব্রুকের কথাই ধরা যাক্। আমাদের এই হাল ফ্যাশনের চুম্বন-আলিঙ্গন-পদাবলীর সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয় রুপার্ট ব্রুকের—

When Beauty and Beauty meet
All naked, fair to fair,
The earth is crying sweet,
And scattering—bright the air,
Eddying, dizzying, closing round,
With soft and drunken laughter;
Veiling all that may befall
After—After—

Where Beauty and Beauty met,
Earth's still a-tremble there,
And winds are scented yet,
And memory—soft the air,
Bosoming, folding glints of light,
And shreds of shadowy laughter;
Not the tears that fill the years
After—After—

যতটুকু উক্ত হইয়াছে, তাহার চেয়ে কত বেশী অনুক্ত রহিয়া গিয়াছে! কিন্তু আকাশে বাতাসে কি সৌন্দর্য্যহিল্লোল, কি বেদনা! অথচ হা হুতাশ নাই; নগরে গ্রামে অলিতে গলিতে ব্যথিতের সন্ধানে ফিরিতে হয় না। চুম্বন আলিঙ্গন সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে শরৎ বাবুও অগ্রসর হইয়াছেন কেন? বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব একটা অকস্মাৎ দৈব সংঘটন, একটা বিষম অনর্থ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা এ-যুগের ইতিহাস আলোচনা করিবার অবসর পান নাই। আবার সব চেয়ে মজার কথা এই যে, তিনিও সহসা এই তরুণ সাহিত্যিক ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে সবলে একটা ধাক্কা দিলেন। সাহিত্যনীতির সীমানা যাহাই হউক, তিনি কি নিজের শক্তির পরিধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন? কিন্তু সে কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আরো কয়েকটা কথা বলিবার আছে। ইংরাজের রিয়ালিজম্-এর কথা বলিতে গিয়া কতকগুলা কোটেশনে প্রবন্ধটা কণ্টকিত করিতে হইল। এই হাল ফ্যাশনের বাঙ্গলা বস্তুতন্ত্রতা ত বিদেশ হইতে আমদানি, ইহা আমাদের ধাতুগত নয়, তাই ইংরাজি বচন উদ্ধৃত দেখিলে শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না। এই সাহিত্যিক অভিব্যক্তির জন্য হয়তো আমরা প্রস্তুত ছিলাম না; সমাজগাত্রে যদি ইহা দুষ্ট ব্রণের মত দেখা দিয়া থাকে, ইহার নিদান অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে আমার একটু সুবিধা আছে। পুরাতনের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, আমি তাঁহাদের দীনতম অনুচর; আবার বিদ্যাচর্চ্চাসম্পর্কে তরুণমতি যুবকগণের সহিত বহুকাল যাবৎ মিশিয়া আসিতেছি। এ-পর্য্যন্ত যখনই কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, "কি প'ড়ব?" আমি উত্তর দিতাম, "যা' পাবে, তাই পড়বে।" —কখনও আশঙ্কা করি নাই যে,বাঙ্গালীর অথবা বিদেশীর রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাহারও অধোগতি হইতে পারে। যে আবহাওয়ায় আমাদের ছেলেরা পুষ্ট হইয়া আসিতেছে, বংশগত সমাজগত যে সকল সংস্কারের মধ্যে তাহারা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে হঠাৎ কোনও কাব্য উপন্যাস তাহাদিগকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারিবে না; নির্ব্বিচারে দুর্নীতির স্রোতে কখনই তাহারা গা ঢালিয়া দিয়া অনাচার ও স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দিবে না, এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। এ বিশ্বাসের বিশেষ কারণও ছিল। এমন বাঙ্গালী হিন্দু ছেলে মেয়ে প্রায় ছিল না, যাহারা বারো তেরো বৎসর বয়সের মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ দুই তিন বার আগাগোড়া পড়িয়া শেষ না করিত। কচিৎ আদি-রসাশ্রিত বর্ণনা থাকিলেও মনে কোনও গ্লানি আসিত না; সমগ্র মহাকাব্য একটা বিপুল স্পন্দনে তাহাদের সমগ্র সত্তাকে উদ্বোধিত করিত। তাহাদের চরিত্রের উপর যে রেখাপাত হইত, তাহা কিছুতেই মুছিয়া যাইতে

পারে না। উৎকট বিদেশী রিয়ালিজম্ তাহাদিগকে ব্যথিত করিত, কিন্তু সহজে পথভ্রষ্ট করিতে পারিত না। যাত্রাগান, কথকতা এই পৌরাণিক ধর্ম্মভাবপুষ্টির সহায়তা করিয়া আসিতেছিল।

আজ একটু বৈপরীত্য দেখিতেছি। এখন যাহাদের বাইশ তেইশ বৎসর বয়স, তাহাদের মধ্যে খুব কম ছেলে মেয়ে কাশীদাস কৃত্তিবাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে মহাভারত রামায়ণের অংশবিশেষ ট্যাব্‌লয়েড্ পরিমাণে তাহারা হয়ত গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। কোনও রসের চর্চ্চা তাহাদের হইল না; বীররস, করুণ রস, বাৎসল্য রস,—কোনও রসেরই আস্বাদ তাহারা পাইল না। ভক্তি-প্রেম স্নেহ-নির্ঝরে স্নাত হইবার সৌভাগ্য হইতে কে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিল? আর যাত্রাগান কথকতার পরিবর্ত্তে সিনেমা বায়স্কোপে তরুণ তরুণীর চিত্তবৃত্তি কি ভাবে উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা হইল?

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে নূতন বিকাশ, এই অত্যন্ত আধুনিক রিয়ালিজম, ইহাও তো বেশী দিনের নয়; গত বিশ বাইশ বৎসরের মধ্যে ইহা নানা সূত্রাবলম্বনে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধিব্যবস্থায় কলেজের তরুণ ছাত্রগণ অবসরবিনোদনের জন্য একটা আলাদা ঘর পাইলেন। আর তাঁহাদের সমক্ষে সমস্ত আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য উপস্থাপিত করা হইল। রুষিয়া, জার্ম্মাণি, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড একেবারে হুড়মুড় করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে হাজির। আমি সে অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ছেলেদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময়পুরীতে অ্যালিস্ যেমন উদ্ভ্রান্ত হইয়াছিল, এই নবীন ভাবজগতে ইঁহাদেরও অবস্থা সেইরূপ। আমি কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম, যখন কেহ কেহ নিভৃতে আমার সঙ্গে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেন। ইব্‌সেন্ কি বলিলেন? পুরুষ চিরদিন নারীকে exploit করিয়া আসিতেছে! স্ত্রীওবর্গ কি জবাব দিলেন? মাতা, কন্যা, ভগিনী ও পত্নীরূপে নারী এতদিন পুরুষকে exploit করিয়া আসিতেছেন? ব্রিয়ো কর্ম্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কি বলিতে চান্? কেন বার্ণার্ড শ 'নেশন' পত্রিকায় লিখিলেন যে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ লেখক (I am a heretical and immoral writer)? সকলেই মনে করিল যে য়ুরোপ আধুনিকতার জয়ভেরি বাজাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ নহে; একটা চিরন্তন সত্য, একটা eternal verity, তাহার পতাকায় প্রোজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। যদি বলা যাইত যে, এই নবীন য়ুরোপীয় সাহিত্যকে বুঝিতে হইলে অন্ততঃ গত শতবর্ষের ইতিহাস বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিতে হইবে, নতুবা ইহার মর্ম্মকথা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না;—তাহা হইলে ছাত্রদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও কৌতূহল জাগিত বটে, কিন্তু অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে তাহা অসম্ভব। য়ুরোপের ঘরে বাইরে যে দ্বন্দ্ব সমাজকে বিক্ষোভিত করিয়াছে,—ঘরের সহিত বাইরের অসামঞ্জস্যের কথা আমি বলিতেছি না,—ঘরের মধ্যে এবং ঘরের বাইরে পুরুষের সহিত নারীর দ্বন্দ্ব, ধনীর সহিত নির্ধনের দ্বন্দ্ব, তাহারই রেখা পড়িয়াছে য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্যে। ইহার মধ্যে কতটুকু চিরন্তন সত্য, কতটুকু ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরাজনিত সাময়িক আপেক্ষিক সত্য বা সত্যাভাস, তাহা যাচাই করিতে না পারিলে, আমাদের ছেলে মেয়েরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে সাহিত্যের সহিত সমাজের কি নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক! অথচ তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা কোথাও দেখিলাম না। আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতায়, য়ুরোপের সাহিত্যে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা একান্ত ঐ সমাজের সামগ্রী; যতটুকু চিরন্তন সত্য তাহার মধ্যে নিহিত আছে, তাহা সর্ব্বত্র সকল সমাজে সব সময়ে প্রযোজ্য। কিন্তু তাহা ভাবিয়া দেখিবার, বিচার করিবার অবসর কোথায়? মার্কিণ লেখিকা ইন্টার্ন্যাশনাল জর্ণাল্ অব্ এথিক্স্ পত্রিকায় নারীজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। কলেজের কমন্ রুমে তরুণ পাঠক বুঝিলেন যে, নারী তিন প্রকার (১) Mother-

woman, জননী,—জননীত্বে ইহার পরম আনন্দ ও চরম চরিতার্থতা ; (২) lover-woman, কামিনী বা রমণী,—ইনি প্রেমসর্ব্বস্বা, বিবাহ করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু কিছুতেই জননী হইতে চান্ না ; (৩) Neuter woman, ক্লীব নারী,—ইনি পুরুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, রিরংসাবৃত্তি (sex appeal) ইঁহার নাই। কয়েক বৎসর পরে আর এক জন লেখিকা 'ন্যাশের ম্যাগাজিন ও পেলমেল'-এ নারীর ও পুরুষের বিভাগ অনেকটা ঐ ভাবেই করিলেন। এই যে আলোচনা, ইহার মধ্যে হয়ত কিছু বৈজ্ঞানিক ভাবের আভাস আছে। কিন্তু যাহা আমাদের সমাজের ধাতুগত নয়, তাহা আমাদের ছেলে মেয়েদের পক্ষে কতকটা দুষ্পাচ্য দাঁড়াইল। বাঙ্গালী মেয়ে লিখিলেন, সতীত্বের সহিত দেহের কোনও সম্পর্ক নাই। আপাততঃ বিবাহটাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, কিন্তু সতীত্বের নূতন ব্যাখ্যা দিতে হইবে। আর এক জন তাঁহার সৃষ্ট নারী চরিত্রের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, ধর্ম্মপত্নীর চেয়ে বারবনিতা ঢের ভাল ;—উভয়েই দেহ বিক্রয় করে, কিন্তু পতিতা ইচ্ছা করিলে না করিতেও পারে! এদিকে অর্ব্বাচীন বাঙ্গালী লেখক নারীর উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীটি মানিয়া লইয়াছেন,—নারীর একমাত্র সংজ্ঞা 'রমণী।'

নারীত্বের, সতীত্বের, এই নূতন ব্যাখ্যা, নূতন মূল্য-নির্দ্ধারণ প্রাচীনপন্থীর কাছে যতই উৎকট হউক, গত দুই দশকের মধ্যে অর্ব্বাচীন সাহিত্যিক প্রচারক অকুণ্ঠিত চিত্তে গল্পে ও গানে, দিকে দিকে এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটিকে জাহির করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইহার মধ্যে একটা মহাপ্রলয় হইয়া গেল ; তাহার ফলে রাষ্ট্রে ও সমাজে ভাববিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। সেই ওলোট পালোটের মধ্যে অনেক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন হওয়া বিচিত্র নয়। আগে যাহা মূল্যবান্ ও একান্ত আবশ্যক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল, পরে তাহার হয়তো, বিশেষ কোনও মূল্য রহিল না। পূর্ব্বে যাহা নগণ্য বিবেচিত হইত, পরে তাহা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব হইল। ভাবরাজ্যে এক নূতন বোঝাপড়া চলিতে লাগিল। চাল চলন, রীতি নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে যেমন নূতন পরীক্ষণ ও সূক্ষ্ম যাচাই আরম্ভ হইল, নারী ও পুরুষ তেমনি পরস্পরকে নূতন পর্য্যায়ভুক্ত করিল। দেখা গেল যে, মূল্যের একটা অদ্ভুত তারতম্য,একটা trans-valuation হইয়া গিয়াছে। পতিতা ও জারজ সন্তান হেয় নয়,—বড় বড় নীতিবিশারদ এই কথা প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন। য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যা এক কোটির অধিক। য়ুরোপীয় সভ্যতা রক্ষা করিতে হইলে মানুষ চাই ; অত বাচ-বিচার করিলে চলিবে না। কথা উঠিল, জারজ সম্বন্ধে আইন পরিবর্ত্তিত হউক। একজন সুজনন (Eugenics) বাদিনী নারী লিখিলেন, যে রুগ্ন পুরুষ সন্তানের জন্মদাতা হয়, সেই পিতাকে জারজ বলিতে হইবে। সুস্থ ও সবল পুরুষ ও সুস্থ সবলা—নারী এখন অবলা নন্—নারী মিলিত হউক ; য়ুরোপীয় সভ্যতার ভাবধারা রক্ষা করিতে হইলে যৌন সম্পর্ক ভাল করিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বিচার করিয়া ষ্টেট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে তবেই উন্নতির সম্ভাবনা। কথাটা উঠিয়াছিল একটু ক্ষীণভাবে, আরো কিছু পূর্ব্বে। তাও বেশী পূর্ব্বে নয়, এই বিশ বাইশ বৎসরের মধ্যে। রুষের সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিল। আড্মিরাল ষ্টোয়েশেল পোর্ট আর্থরের শাসনকর্ত্তা। জাপান পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল রুষের সহিত যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধের প্রাক্কালে কেমন করিয়া পতিতা জাপ রমণী রুষ সেনানীর গোপন কক্ষ হইতে সাঙ্কেতিক চিঠিপত্রের ছায়াচিত্রানুলিপি টোকিওতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা এখন ইতিহাসের সামগ্রী হইয়া গিয়াছে। পতিতার মাহাত্ম্য বাড়িয়া গেল ; তাহাকে অপাংক্তেয়া মনে করা উচিত নয়, এই ভাবের একটা কথা শুনা গেল। কিন্তু তবুও কোনও সাহিত্যে জোর করিয়া সতীত্ব ও দেহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তখন পর্য্যন্ত নূতন ব্যাখ্যা কোনও নারী দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর কথা যে দেশে পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, সেই দেশেরই একটি মেয়ে আজ এই নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। ইংরাজ মহিলা যদি এই ব্যাখ্যা দিতেন, হয়তো খুব বেশী বিস্মিত হইতাম না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে

নল-দময়ন্তী নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া একটি মেয়ে তাঁহার সহচরীকে বলিলেন, "এই নায়িকাটি দেখ্‌লে? what a ninny!" পত্রিকায় যখন এই বিবরণ পড়িলাম, তখন আমি কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ করি নাই। নারীত্বের, সতীত্বের যে মূল্য নির্দ্ধারণ এদেশে পাকা হইয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত বিদেশের মিল না থাকিতে পারে। তাহাদের standard of values স্বতন্ত্র। এবার তাহারও ওলোট পালট য়ুরোপে হইয়া গিয়াছে।

ওদিকে আর একটা ব্যাপার সমস্ত পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ব-মূলক চিন্তাধারাকে বিচলিত করিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হর্ম্মোন্‌তত্ত্ব সুধী-সমাজে গৃহীত হইল। জীবতত্ত্ব গবেষণা নূতন খাতে চলিল। আর ফ্রয়েড যখন মানবের সমস্ত চিত্তবৃত্তি মদনানন্দমূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইলেন, তখন সুধীসমাজ কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমার মনে পড়িল আরো কিছুদিন আগেকার কথা। দাক্ষিণাত্যে একখানি নূতন মাসিক পত্র প্রকাশিত হইল; তাহার নাম ইষ্ট্‌ এণ্ড ওয়েষ্ট। প্রথম সংখ্যাতেই বোধ হয়, একজন প্রচ্ছন্ননামা লেখক (সাঙ্কেতিক নাম —Artaxerxes) ওঁ-এর ব্যাখ্যা দিলেন। ওঁ অর্থে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝায়;—বৃষস্কন্ধী গাভীর সহিত সঙ্গত হইবার কালে বৃষ ঐরূপ শব্দ করে। আর ফিনিশিয়া, ক্রীট, মিসর, ভারত,—কোথায় সৃষ্টিতত্ত্বাভিভূত মানব বৃষকে পূজা করে নাই? সে যাহা হউক, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ফ্রয়েডের বহু শিষ্য দাঁড়াইয়া গেল; সমালোচকও দেখা দিল। ভিক্টোরীয় যুগে যে সকল বিষয় প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লোকে সঙ্কোচ বোধ করিত, সে সমস্ত প্রসঙ্গ সাধারণের আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইল। তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ট্যাব্‌লয়েড্‌ আকারে সাময়িক পত্র-পুটে বাঙ্গালার অর্ব্বাচীন সমাজে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। প্রবীণদিগের মধ্যেই বা কয়জনের সাধ্য আছে যে সমগ্র ফ্রয়েড্‌-সাহিত্য তাঁহারা মন্থন করিতে পারেন? কতটুকুই বা পাওয়া গেল, কতটুকুই বা বুঝা গেল, ঠিক বলা শক্ত; অথচ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ধুয়া ধরিয়া এই নূতন মদনানন্দমোদক প্রয়োগে অর্ব্বাচীন কবি (-রাজ বলিলাম না) আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যকে সতেজ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

এদিকে শরৎচন্দ্র আসিয়া পড়িলেন ঝড়ের মত, বঙ্গোপসাগরের ওপার হইতে একটা প্রচণ্ড টাইফুনের মত। কতদিনের জীর্ণ সংস্কার টলিয়া গেল সেই ঝড়ের মুখে! তাঁহাকে কোনও গণ্ডীর মধ্যে ফেলিবার চেষ্টা করা বৃথা; বিজ্ঞাপন দিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট পরাইবার চেষ্টাও বিড়ম্বনা। বঙ্কিমের যুগ যেন প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। রবীন্দ্রনাথ পতিতাকে গৌরবশ্রীমণ্ডিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এখন পতিতা সগর্ব্বে নূতন দাবি করিয়া দাঁড়াইল সাহিত্যের আসরে, গৃহীর প্রাঙ্গণে। ভাল হইল, কি মন্দ হইল; সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণের বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা হইল কি না; সে তর্ক তুলিতেছি না। শরৎচন্দ্র কোনও থিওরি লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বসিয়া তিনি যে রস-সম্ভার তাঁহার চারিদিকে সাজাইয়াছেন, তাহার প্রবল আকর্ষণী শক্তি অপরিণতমস্তিষ্ক বঙ্গসন্তানের হৃদয়কে কি বিচিত্র স্পন্দনে আলোড়িত করিল, তাহাই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর আলোচ্য বিষয়। এদেশে সতীত্বের তথা নারীত্বের নবমূল্যনির্দ্ধারণে, re-valuation-এ, তিনি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কিছু সাহায্য করিয়াছেন কি না, তাহা লইয়া কিছু জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। এই তর্ক-বিতর্কের আসরে স্বপক্ষে বা অন্য কাহারও পক্ষে কোনও প্রকার কৈফিয়ত দিবার জন্য তাঁহার দাঁড়াইবার প্রয়োজন নাই; কারণ, তাঁহার রচিত উপন্যাসগ্রন্থ যে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহার অধিক আর তিনি কি বলিবেন?

যেদিন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর সারথ্য গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সবুজ পত্রের পতাকা তুলিলেন, আমাদের সাহিত্যপঞ্জিকায় সেটি একটি স্মরণীয় দিন। ভাবরাজ্যে যেন একটা ভূকম্পন হইল। জরা ও অকাল-পক্কতার বিরুদ্ধে সবুজের অভিযান সকলকে চমৎকৃত করিল। সমস্ত সমাজের উপর একটা ডাক পড়িল,—এস, বিচার করা যাক, সমষ্টির সহিত ব্যষ্টির, গোষ্ঠীর সহিত ব্যক্তির, স্বামীর সহিত স্ত্রীর, ধর্ম্মের সহিত পুণ্যের

সম্পর্কটা কি? আধুনিক পাশ্চাত্য সামাজিক দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া যে তত্ত্ব বার্ণার্ড শ, ইব্‌সেন, ব্রিয়ো, ষ্ট্রীণ্ডবর্গ লাভ করিয়া সাহিত্যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ তাহা এদেশের অতীত ভাবধারার মধ্যেই পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য উপনিষদ-মহাভারত-কালিদাস-সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট; প্রমথনাথের কাছে নারদপঞ্চরাত্র হইতে ফ্রয়েড পর্য্যন্ত কিছুই অপরিচিত নহে। প্রশ্ন উঠিল, তামস মধ্যযুগের ছন্দানুবর্ত্তিতা হইতে কেন মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা হইবে না? তরুণের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কথাটা নূতন নহে; কেবল তাঁহাদের এই ডাক-টা কিছু নূতন ধরণের, বলার ভঙ্গীটা অভিনব। তাই সমাজ চমকিয়া উঠিল। বৃদ্ধেরা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তাই তো, এমন ভাবে ধাক্কা না দিলেও বোধ হয় চলিত; এ-দেশের culture এর মধ্যে কবে তরুণের জয়গান হয় নাই? তরুণ শ্রীকৃষ্ণ, তরুণ শুকদেব, তরুণ ধ্রুব, তরুণ প্রহ্লাদ অপরূপ সৌন্দর্য্যে আজও দেদীপ্যমান। তরুণ শঙ্করের জয়গানে আসমুদ্র হিমাচল আজও ধ্বনিত হইতেছে। সত্যের আলোকবর্ত্তি হাতে লইয়া উঁহাদের মত তরুণ অগ্রসর হউক্। রাজনীতিক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথও তরুণকে আহ্বান করিয়াছিলেন কম্বুকণ্ঠে। তিনি বলিতেন, লুথারের ধর্ম্মসংস্কার চেষ্টা আদৌ ফলবতী হইত না, যদি উইটেন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহার সহচর না হইত। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে, অর্দ্ধোদয় যোগে, তারকেশ্বর বন্যায় দিকে দিকে তরুণের সবুজ পতাকার পশ্চাতে প্রবীণ সমাজ অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অমৈত্রী আন্দোলনে তরুণের হাত হইতে সে পতাকা স্খলিত হয় নাই। চিরকালই তাহারা সামাজিক মঙ্গলের, কল্যাণের অগ্রদূত। তরুণকে প্রবীণ অশ্রদ্ধা করিতে পারে না।

সবুজ পত্রের কথা বলিতেছিলাম,—অম্লান আলোকে সুরভি বাতাসে সে মর্ম্মরিত হইল। বিপুল জটিল ঘরে বাইরের সমস্যা লইয়া যে গল্প বাহির হইল, গদ্যছন্দের অমন অবাধ সৌন্দর্য্যহিল্লোল পূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় নাই। আর দামিনী? সেই "আদিম জন্তু"টা? তরুণের জয়গানে সবুজপত্র মুখরিত হইলেও কোথাও সেই আদিম জন্তুটার লালারসে পাঠক জীর্ণ হয় নাই। কাম কোথাও জীবনের কাম্য বস্তু বলিয়া প্রকটিত হয় নাই। তবে কোথা হইতে আজিকার অর্ব্বাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এই উৎকট অভিনব ফ্রয়েডীয় বেদনার কম্পন অনুভূত হইল?

অনেক দিন পূর্ব্বে কবি গাহিয়াছিলেন—'আবার কবে ধরণী হবে তরুণা'; আজিকার এই নবত্বে কিন্তু তিনি শিহরিয়া উঠিতেছেন। এদিকে মনস্তত্ত্বের ধুয়া ধরিয়া এই নূতন সাহিত্য ধরণীর ধূলিপঙ্কের ম্লানিমায় দেহকে আবৃত করিয়া যে সুরে আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে, তাহা নিতান্ত মিষ্ট নহে। আমাদের দেশে এখনও হ্যাভলক্ এলিস্ অথবা মেরি ষ্টোপস্ বোধ করি সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের পথে দেশকে অগ্রসর করিবার কিছু বিলম্ব আছে। বিলাতে ইদানীং কাযটা কিছু দ্রুত চলিতেছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি বোর্ডিং স্কুলের চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ছাত্রীর ডায়ারি প্রকাশিত হইলে সমালোচকমণ্ডলী কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অনেক দিন হইতে মেয়েটি ডায়ারি লিখিত। এক তারিখে আছে—"আমার বন্ধুরা পরস্পর অনেক সময় এমন হাসি ঠাট্টা করে, যা' আমি বুঝতে পারি না; এক এক সময়, কথাই বুঝি না; জিজ্ঞাসা করলে, হাসে। আজ একটা কি কথা বল্লে, বুঝতে পারলুম না; তবে শব্দটা যেমন শুনেছ, সেই রকম লিখচি; শব্দটা হচ্চে 'Seg-sual'।" আর এক তারিখে আছে—"শিখে নিয়েছি; জিনিষটা বুঝতে পেরেছি।" মেয়েটি এত কাঁচা যে, শব্দটির বানান পর্য্যন্ত ঠিক জানে না; তবুও কেমন করিয়া স্বল্পবয়স্কা বালিকার চিত্তবৃত্তির ক্রমোন্মেষ হয় ও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রকাশকগণ রোজনামচাটি মুদ্রিত করিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু সমালোচনা যে ভাবে চলিল, তাহাতে তাঁহারা পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাল ঠুকিয়া বলিলেন না যে, অমন অমূল্য দার্শনিক গ্রন্থ কিছুতেই চাপা দেওয়া হইবে না। আধুনিক সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রতা

উঁহাদের দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে বটে; কিন্তু অয়কেন্ যাহাই বলুন, এখনও উঁহারা morality হইতে art-কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহেন না। আর একটি মেয়ের কথা বলিতেছি। এখন তাহার বয়স ষোল বৎসর। তিন বৎসর বয়স হইতে কুমারী জ্যাসিন্থ পার্স্‌ন্স ছবি আঁকিতেছেন; যখন তাঁহার বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর, তখন তাঁহাকে বিলাতের 'মেডিচি সমিতি' ব্লেকের Songs of Innocence পুস্তকের গানগুলিকে সচিত্র করিতে অনুরোধ করেন; রূপদক্ষ মেয়েটির তুলিকায় বর্ণে ও রেখায় গানগুলি যেন নবকলেবর লাভ করিল। গত নভেম্বর মাসে 'মেডিচি গ্যালারি'তে তাঁহার আশৈশব অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রদর্শিত হইল। মর্ণিং পোষ্টের সুকুমার কলা-সমালোচক লিখিলেন—"কি অসাধারণ বৈচিত্র্য! কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসৃষ্টি! মেয়েটি যদি ভবিষ্যতে আর তুলিকা স্পর্শ না করে, তবুও তাহার এই চিত্রগুলি তাহাকে অমরত্ব দান করিবে।' পত্রিকায় যখন এই সকল বিবরণ পাঠ করি, তখন মনে হয় কি রহস্যময় ব্যাপার! দুইটি মেয়ে একই সময়ে একই শিক্ষা দীক্ষার আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠিতেছে; প্রবীণেরা দুজনের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার দুইটি জিনিষ পাইলেন। নিস্তরঙ্গ বারিরাশির মধ্যে লোষ্ট্রনিক্ষেপে যেমন বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, ইঁহাদিগকে লইয়া শিক্ষিত ইংরাজ সমাজ সেইরূপ সংক্ষুব্ধ হইল। কালক্রমে দুইটি জিনিষ আমাদের তরুণ সমাজের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইলে বঙ্গের কলালক্ষ্মী কোন্‌টিকে সাদরে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবেন? যদি প্রথমটির দিকে ঝোঁক পড়ে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া মানিতে হইবে যে, মিস মেয়োর কথা বোধহয় আংশিক ভাবে সত্য,—আমরা Over-sexed, আমাদের সঙ্গীতে 'কাম রতি মরে লাজে'। কিন্তু আমি কিছুতেই মানিব না যে, আমরা আইডিয়ালিজম-বর্জ্জিত, সৌন্দর্য্যের স্বর্গোক হইতে নির্ব্বাসিত। এই কামলোক আমাদের কাম্য লোক নহে।

কিন্তু আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু উপায় অবলম্বন করিয়াছি কি, যাহাতে আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সম্মুখে কোনও পুণ্যলোকের চিত্র ফুটিয়া উঠে? ত্যাগের মাহাত্ম্য, বীর্য্যগৌরব, ব্রহ্মচর্য্য, শালীনতা, পৌরুষ-সম্বন্ধে আমাদের ছেলেরা সচেতন হইবার সুযোগ পাইয়াছে কি? প্যারিসের আদব কায়দা, ফরাসীর শিক্ষাদীক্ষা যদি আমাদের অনুকরণীয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেন আমাদের বাঙ্গালী সন্তানকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না যে, সে-দেশের culture স্বতন্ত্র? ফরাসীরা ব্রহ্মচর্য্যকে বড় করিয়া দেখে নাই;—বিদ্যাপীঠের পার্শ্বে ছাত্রের সহচরী grisetteকে দেখিয়া আমাদের ছেলেরা কি মনে করিতে পারে যে, ইনি আধুনিক পাশ্চাত্য কচের অভিনব দেবযানী সংস্করণ? লর্ড অ্যাক্‌টন্ যখন কেম্ব্রিজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, প্রথম প্রথম তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে কিছুদিনের জন্য প্যারিসে লইয়া যাইতেন; বলিতেন, এখানে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি; তোমরা নিজেরা বিচার করিয়া দেখ, ইহাদের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ; ইহাদের সমাজে যে ব্যবস্থা খাপ খাইয়া গিয়াছে, ইংরাজের কাছে তাহা বিসদৃশ ঠেকিলেও অশ্রদ্ধা বা বিদ্রূপ করিবার কিছু নাই।—ইংরাজ সন্তান আজ পর্য্যন্ত বিচলিত, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। কিন্তু ফরাসী অধ্যাপকের কি অনন্যসাধারণ সাধনা ও আত্ম-নিয়োগ! তিনি মনে করেন যে, সমগ্র ফরাসী সভ্যতার ধারারক্ষার ভার যেন তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে; সেই ধারা অবাধে চালাইতে হইলে উপযুক্ত শিষ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে; গুরুর পন্থা অবলম্বন করিয়া গুরুর হাত হইতে সভ্যতার দীপটি লইয়া শিষ্যকে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচীন যুগের মত আজ আর আমাদের দেশে গুরুশিষ্যপরম্পরা বিদ্যার ধারারক্ষাপ্রথা অপ্রতিহত নাই। গত শতবর্ষের মধ্যে সব ঘুলাইয়া গিয়াছে, আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। গুরুর হাতে দীপ নাই; শিষ্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে; পরা ও অপরা বিদ্যার জন্য তাহার কোনও মাথাব্যথা নাই। সে দিকে দিকে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিতেছে। আজ যদি কামলোক তাহার কাম্যলোক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজকালকার কোনও অধ্যাপক তাহাকে দোষ দিতে পারেন কি?

জর্ম্মণীর নিজস্ব একটি সভ্যতার ধারা আছে। সমস্ত বিপ্লবের মধ্যে টিউটন্ তাহার kulturটিকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐ তাহার একমাত্র অবলম্বন; ঐ খানেই তাহার যথার্থ স্বপ্রকাশ। গত মহাপ্রলয়ে তাহা বিপর্য্যস্ত হয় নাই; অধ্যাপককে ঘিরিয়া তরুণ তরুণী আবার শ্রদ্ধার সহিত, আগ্রহের সহিত দাঁড়াইল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণে তাঁহার সহকর্ম্মী, কাব্যদর্শনেতিহাস কক্ষে অবহিত শ্রোতৃমণ্ডলী। তা'র পরে তাহারা মুক্তি পায় বাহিরের আকাশে বাতাসে; অরণ্যে পর্ব্বতে গ্রামে সাগরবেলায়, তাহারা ধরণীর সহিত নিবিড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ পায়। তাহারা নিজেকে 'উড়ন্ত পাখী' বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসে; ব্লাক ফরেষ্ট হইতে বল্টিক সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর জর্ম্মণীর সহিত, অথবা সুইট্জর্ল্যাণ্ড গ্যালিসিয়ার প্রত্যন্তদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ জর্ম্মণীর সহিত প্রত্যেক vogel কয়েক বৎসর ছাত্রজীবনের মধ্যেই পরিচয় স্থাপন করিয়া ফেলে। তাহাদেরও শিক্ষাসংস্কার হয়তো ব্রহ্মচর্য্যভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কাম-লোক তাহাদের কাম্যলোক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তাহারা কোনও এক জ্যোতির্ম্ময় লোকের সন্ধানে ফিরিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহই বাস্তবকে অস্বীকার করে না; কিন্তু তাহারা বস্তুতন্ত্রতার বশ্যতা স্বীকার করিয়া ভোগায়তনের ধূলিপ্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিয়া চরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করে না।

আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, আমাদের ছেলেরা লালসার পঙ্কানুলেপন ভালবাসে? ভিন্ন ভিন্ন কলেজের সাময়িক পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের এক একটি এমন সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হয় যে, কিছুতেই মনে করিতে পারা যায় না যে, ইহারা কোনও দিন বঙ্গসাহিত্যগাত্রে বিস্ফোটকরূপে দেখা দিতে পারে। নির্ব্বীর্য্য লালসা কখনও কোনও সাহিত্যের ধাতুগত হইতে পারিবে না। তরুণ তরুণীর তথা প্রবীণ প্রবীণার নবজাগরণ এদেশেই হইয়াছিল গত বিশ বাইশ বৎসরের মধ্যে, স্বদেশী আন্দোলনে। বাঙ্গালী সন্তান শতবর্ষের মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখিল; আর সে পশ্চিমের মুখাপেক্ষী হইতে চাহিল না। আজ সমস্ত এশিয়াবাসী আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। বহু প্রাচীন যুগের বাণী "আত্মানং বিদ্ধি" আজ সমগ্র এশিয়ার whispering gallery'র ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। নিজেকে শক্তিহীন মনে করিব কেন? আমাদের আধুনিক নবীন সাহিত্যে এমন কিছু থাকিবে না, যাহাতে আমাদের পৌরুষ প্রকটিত হয়? গল্পসাহিত্যের কথাই ধরা যাক্। কেবলমাত্র কাঁচা প্রেম, বিরহ, বুকভাঙ্গা, স্বামীর অবহেলা, বৌটির মৃত্যুমুখে পতন; অথবা অবৈধ মিলনাকাঙ্ক্ষার হা হুতাশ, বা আরো কিছু। এই দেখিতেছি প্রধান উপাদান। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই ঐ এক কথা, ঐ sex-appeal। ইহার জন্য কেবল এই হাল ফ্যাশনের অর্ব্বাচীন লেখকগণ দায়ী নহেন; অনেক দিন হইতে এই ভাবে এক শ্রেণীর লেখক গল্পব্যবসায় চালাইতেছেন। হয়তো এক শ্রেণীর পাঠকও গড়িয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা এই জিনিষই চান্। লেখক পঙ্গু, পাঠক পঙ্গু, গল্পসাহিত্য ও প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোথাও পৌরুষের চিহ্নমাত্র নাই। এক একবার মনে হয় যে, কেহ যদি একটা ডাকাতের ছবিও দিত! কিন্তু ডাকাতের পর, আর আমাদের সাহিত্যে কোনও খাঁটি ডাকাতের কাহিনী পাইলাম না, সে কি কেবল সি আই ডি'র ভয়ে?

কেহ যদি গত চার পাঁচ বৎসরের বিলাতী গল্পপ্রধান মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি আরো একটা জিনিষ দেখিতে পাইবেন। অনেক গল্প অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির জয়গাথা মাত্র। একজন ইংরাজ যুবক অথবা তরুণী সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ এক অজ্ঞাত দ্বীপে কিরূপ শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইল; আফ্রিকার অভ্যন্তরস্থ কোনও এক দুর্গম প্রদেশের বর্ব্বর রাজা এক জন নবাগত ইংরাজ যুবকের তর্জ্জনীহেলনে কেমন করিয়া নতশির হইল; চীনা, আফ্রিদি, মলয়বাসী, কাফ্রী, কিরূপ কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর, গুপ্তহন্তারক; আর

ইংরাজ শৌর্য্যবীর্য্যে, চরিত্রগুণে কত মহান্! ইংরাজের গল্প সাহিত্যে এই কাহিনী নানাপ্রকারে এতদিন পল্লবিত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু মহাচীনের গোলযোগে আপাততঃ বাধ্য হইয়া লেখকগণ একটু সংযত হইয়াছেন। ডক্টর ওয়েলিংটন কূ ইংরাজকে বলিলেন—তোমরা আমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন করিতে চাও; কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে? তোমরা আমাদিগকে ঘৃণা কর। তোমাদের গল্প লেখকগণ আমাদিগকে হেয় ও জঘন্য প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত। ইংরাজ পাঠক পাঠিকার সম্মুখে তোমরা প্রাচ্য সমাজের যে চিত্র মাসে মাসে আঁকিয়া তুলিতেছ, তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।—আমার যতদূর স্মরণ হয়, 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় এই চিঠি প্রকাশিত হয়। ডক্টর লী ও এইভাবে আন্দোলন করিলেন। তাহার পর হইতে কিন্তু এই ধরণের গল্পের সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। সে যাহা হউক, ইংরাজের ঘরে ঘরে এই সকল গল্পপ্রচারের ফলে সে যদি মনে করে যে, ইংরাজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে তাহার সেই ধারণাকে কেমন করিয়া অমূলক বলিব? আমরা আমাদের স্বাদেশিকতার বড়াই করি রাজনীতিক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের গল্পসাহিত্যে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানকে বড় করিয়া দেখিবার চেষ্টা আছে কি? শুধু 'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য' বলিয়া চেঁচাইলেই আমাদের মাথা উঁচু হইবে না।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, ইংরাজি গল্পে Sex-appeal নাই; হয়তো ইদানীং একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে; কিন্তু সেখানে আরো অন্য জিনিষ যাহা আছে, তাহার আকর্ষণী শক্তি কম নহে। অপেনহাইমকে সম্প্রতি একজন পত্রিকাসম্পাদক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সমগ্র কথাসাহিত্যের ভিতরে কোন চরিত্রটি সৃষ্টি করিতে পারিলে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব বোধ করিতে পারিতেন?" তিনি উত্তর দিলেন,—"শার্লক্ হোম্‌স্"। আরো বলিলেন, 'আজকালকার সাহিত্যিক মদনোৎসবে এই চরিত্রটি আমাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করে।" সিনেমায় প্রদর্শিত চিত্রে মদনানন্দমোহ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ সম্প্রতি বলিয়াছেন—'এই Sex-appeal না থাকিলে কি চলে না? পরপুরুষের চুম্বনে মিস্ মেরি পিক্‌ফোর্ডের আপত্তি না থাকিতে পারে; এই বয়সে আমিও হয়তো তাঁহার অধর-স্পর্শে আনন্দবোধ করিতে পারি;—কিন্তু এত লোকের সামনে!' আমাদের অর্ব্বাচীন কথাসাহিত্যে যে Sex-appeal আদৌ উপাদেয় নয়,—সংস্কারবশতঃই হউক অথবা যে কারণেই হউক ইহাই অনেকের ধারণা।

কিন্তু ঘটনাচক্রে যাহা দাঁড়াইতেছে, তাহা স্থায়ী হইবে না, ইহাও আমার ধারণা। তরুণ বয়সেও শক্তির অপব্যয় বেশীদিন চলিতে পারে না। জর্ম্মণীতে যে তরুণসঙ্ঘ মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের উপর সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে; তাহারাই ভবিষ্যতের আশা। এদেশের বিশিষ্ট সভ্যতারেখা হইতে ভ্রষ্ট হইলে আজিকার তরুণ তরুণী কালিকার ইতিহাস কি ভাবে গড়িয়া তুলিবেন? তাই মনে হয়, এই attitude, এই ভঙ্গিমা ইহাঁদিগের যথার্থ পরিচয় নহে। আর ভাষা সম্বন্ধে এইটুকু ইঙ্গিত করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বীণাপাণির পাদ-পীঠে ভাষার আলপনা একটা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার নহে।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

বদরীর পথে

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী—প্রিয়বরাসু

তোমার পত্রের উত্তর দেরাদূনে থাকতে দিতে পারি নি। দিলেও বেশী কোনও লাভ ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি করিনি ভাই; একেবারে ধীরে সুস্থেই দিচ্চি।

পৌষ মাসে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তুমি

বলেছিলে, কুম্ভে হরিদ্বার যাওয়া তোমার এবার সম্ভব হবে না, যদি আমরা বদরী যাই তো খবর দিতে বলেছিলে। সেটা দিতে যে দেরি হলো, তার কারণ, আমার পক্ষে এ পথে যাত্রা করা যে সম্ভব, আমিই কি তা' আগে কোন দিন ভেবেছিলুম? তাই ভরসা ক'রে খবর দিইনি। ঠিক হতেই দিয়েছি। এবার আশ্বিন মাসে পুজার ছুটীতে কাশী আসবামাত্র পিতু বলেছিল, "এবার পূর্ণকুম্ভ, হরিদ্বারে গঙ্গাস্নানে যাবেন? আর চলুন না, বদরী যাই।" আমি তাকে ঠাট্টা করেই উত্তর দিই, "বেশ ত, যাই চল্ না।"—ব্যস এই পর্য্যন্ত! তারপর তোমার সঙ্গে সেই কথা,—"পিতু বলছিল আমি যাই তো সেও বদরী যায়, তুমি যাবে?"

কুম্ভ স্নানের খবরটা তোমার সখা লোকটিকে দিতেই তিনি চম্‌কে উঠে বলে ফেল্লেন, "বল কি! ক্ষেপেচ?"

ক্ষ্যাপা, যে পুরাদস্তুর ক্ষেপে উঠেছে, সেও তার সম্বন্ধে এত বড় সংশয়কে বোধ করি সইতে প্রস্তুত নয়; আমি আর এমন কি ক্ষেপেচি, যে সেটাকে সহসা স্বীকার করে নিতে চাইবো? কাযেই চুপটী করে গেলাম। এ দিকে পিতু লিখলে, "দেরাদুনে তিন মাসের জন্যে বাড়ী নেওয়া হচ্ছে; আপনারাও সব আসুন, ঐখান থেকে স্নান করাও হতে পারবে।"—তাতে বদরীর কোন নাম গন্ধও ছিল না।

ইনি বল্লেন, "তুমি তাহলে যেও, আমি আর এখন কি করে যাব?" অর্থাৎ মক্কেলদের ব্যাপারে ব্যস্ত আর কি! যাহোক, ছেলেদের সঙ্গে নেবার জন্যেও দরখাস্ত দিয়ে মত পেলুম না, এমন কি খবরের কাগজে কুম্ভমেলার বিরাটত্ব যতই প্রকট হ'তে লাগলো, আমার শুদ্ধ স্নান যাত্রার আশাটা ততই খর্ব্বীকৃত হ'তে থাকলো! "বিস্তর অসুবিধে হবে। অত ভিড়ে মোটরে গিয়েও তোমরা বিপদে পড়বে হয়ত," ইত্যাদি। শেষকালে যাবার আগের দিন স্পষ্টই বল্লেন, "না না, যেও না।" অবশেষে ইতিগজ করেই কাশী যাত্রা করলুম।

ভোরের বেলা ক্যান্টনমেন্ট ষ্টেশনে নেমে বোনেদের বাড়ী পৌঁছে খবরটা নিয়ে, অসীতে নিজেদের বাড়ীই যাব ভেবেছিলুম। পিতুর কাছে গিয়ে জানতে পারলুম যে ভাসী বাড়ী নেই, সে ও পিতুর ছেলে বীরু দুজনে দেরাদুনে বাড়ী ঠিক করতে গেছে। সেখান থেকে তার এলে তাদের বেরুনো হবে। পিতুর ননদরা, একজন নন্দাই (সদ্য পেন্সনপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ ফণি বাবু), তার ভাগ্নী, একজন আত্মীয়া—সব যাবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছেন। মারও শিলং থেকে আসবার কথা আছে।

বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন ক'রে, কিছু বাজার করা গেল। চোখের সামনে বাজার দেখলে আমাদের যত কিছু দরকারী জিনিসের তাগাদা মনে উঠে পড়ে। এ ধর্ম্মটা যেন আমাদের স্বধর্ম্ম, না? অন্ততঃ পুরুষরা তাই মনে করে থাকে। আমি কতকগুলি খেলনা কিনে নিলাম, আমার ফণু রাণীর জন্যে, আর কড়ি মণ্টুর জন্যে গাড়ী ও বল। বিকালবেলা বেহাই বাড়ী ঘু'রে, পরম শ্রদ্ধাস্পদ চূড়ামণি মহাশয়কে প্রণাম করতে যাওয়া হলো। সেখানে প্রাণ খোলা অপার্থিব স্নেহের সঙ্গে সুপ্রচুর জলযোগ লাভ ক'রে অসীর শূন্য পুরীতে ফিরে গেলুম।

তুমি তো জানোই, এই অসীর বাড়ী আমার সর্ব্ব তীর্থের সার মহাতীর্থ। এই অসীধাম আমার আনন্দ কানন, এই অসীধাম আমার মহাশ্মশান। আমার পিতৃতীর্থ এই অসীর বাড়ী—আমি যেখানেই থাকি আমার স্মৃতির মধ্যে তাঁর শেষ কয় বছরের পুণ্য-স্মৃতিকে যেন জীবন্ত করে রেখে দিয়েছে! দূরে থেকে মনে হয় ঐখানে ছুটে গেলেই বুঝি সেই চির-হারানো জীবনের সব চেয়ে ঈপ্সিত দিনগুলা আবার আমার কাছে ফিরে আসবে! কাছে এলে সে মরীচিকা মিলিয়ে গেলেও, এখানের প্রত্যেক ধূলিকণাটুকু পর্য্যন্ত যে আমার জীবনের আদর্শ দেবতার পুণ্যস্মৃতিসমুজ্জ্বল ও সুপবিত্র। তাই ভক্তের দেবদর্শনের মতই আমি প্রাণভরা ভক্তি নিয়ে এখানে ছুটে আসি। এর শূন্যতা আমায় পীড়িত করলেও এর আকর্ষণ যে আমি প্রতিহত করতে পারি না, এবং চাইও না। থাক্, এ আমার আলোচনার বিষয় নয়, সেও তুমি অন্ততঃ বোঝ।

বাড়ীতে হরির মা, পূজারী সারদা ও তার ভাই কাশী মাত্র রয়েছে। ছোট-বৌ কিছুদিন আগে কলিকাতায় গেছে, ভাসি দেরাদুনে। সিগ্রায় ফিরে শুনলুম, বৃন্দাবন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছে। বৃন্দাবনকে চেন বোধ হয়? মহামহোপাধ্যায় ৺যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের ছেলে। আমার সেটি বড় স্নেহের ভাই। এবার পূজার ছুটিতে যখন কাশীতে দেড় মাস ছিলুম, সে সর্ব্বদাই আসতো, আমিও খুব যেতাম। পরদিন সকালে তার ওখানে ও দুর্গাবাড়ী সেরে অসীতে ফিরে গেলুম। অন্নপূর্ণা মার পূজা আসছে, তাঁর অঙ্গরাগ ক'রে নূতন বেণারসী সাড়ী পরিয়ে বেলা ১২টার সময় ফেরা গেল।

বিকালে ছিল সেদিন "রাণীভবনে" খড়্গসিংহের মুক্তির জন্য মহিলা সভা। আমি ওখানে এসেছি ওরা জানতো না। আমায় উপস্থিত দেখেই সেই সনাতন বিধি—"আপনাকে কিছু বলতে হবে।"

আমি তো স্তম্ভিত। পাঁচ মিনিটের নোটিস! কি করি, অগত্যা একটা পেনসিল কাগজ চেয়ে নিয়ে কোলের মধ্যে মুখ করে লিখতে বসে গেলুম। ফুলস্কেপের পৃষ্ঠা দু'তিন হয়েওছিল। শেষ পড়তে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধেক কথাই বুঝতে পারি না। যাহোক নিজের লেখা তাই রক্ষে! গোঁজামিল দিয়ে সামলে নেওয়া গেল, কোনমতে মানরক্ষা ক'রে। কিন্তু জিনিসটা একেবারে মাটী হয়ে গেছে। পেনসিলের সে আঁচড় যদি বা কোনমতে সামলে নিতুম, তা আবার তার অর্দ্ধেকখানি হারিয়ে গেছে। সেই সময় সমবেত মহিলাদের নাম সই করতে তার সঙ্গের কাগজগুলো দিয়েছিলুম, দেখছি সেই সঙ্গে এর প্রথমার্দ্ধটা কোথায় 'লোপাট' হয়ে গেছে। স্বনামখ্যাত বিপিন বাবুর মেয়ে বাণীভবনের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী শোভনা নন্দী লেখাটা কোনও কাগজে দেবার জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন, তখন যে তার গণেশের মতন মুণ্ড উড়ে গেছে তা কেউই দেখে নিইনি।

মোটা কথাটা আমার এই বলবার ছিল যে, খড়্গ সিংহ নরঘাতক, নরহত্যাকারী চিরদিন সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে সকল সমাজেই নিন্দিত এবং এই অপরাধে অপরাধীর জন্য সব চেয়ে বড় দণ্ডেরই বিধান আছে। আটবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড নরঘাতীর পক্ষে গুরুপাপে লঘুদণ্ডই বলা যায়, তার জন্য শোক প্রকাশের কি আছে? তার অপরাধের সঙ্গে তুলনা করলে এ দণ্ডকে খুবই কঠোর বলা যায় না। যুক্তি তাই বলে বটে! কিন্তু কার্য্যের সঙ্গে কারণের সম্বন্ধটা এমনই নিবিড় যে সেটাকে এই সঙ্গে বাদ দিয়ে গেলে চলে না। খড়্গসিংহ যাকে হত্যা করেছেন, এবং তার যে অমানুষিক অপরাধের জন্যে এ হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতে তাঁকে তাঁর সমস্ত দেশবাসী মিলে নরঘাতক বলে মনে করতে তো পারেনই নাই, পরন্তু মাংসাশী হিংস্র নরপশুর হত্যাকারী বোধে তাঁর এই সপরিশ্রম আটবর্ষ কারাদণ্ডকে কঠোরতর অনুভবে ব্যথিত হয়েছেন। তারপর আর এক কথা, এ হত্যা গুপ্তহত্যা নয়! নির্ভীক বীরত্বের সঙ্গেই তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে জীবন পণ করেই নরকুলকলঙ্ককে পৃথিবী হতে অপসৃত করতে চেয়ে জননী ধরিত্রীর কথঞ্চিৎ ভার মোচন করেছেন।

আমাদের শাস্ত্রমতে নারী বাল্যে পিতার যৌবনে পতির এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের রক্ষাধীনা। সে হিসাবে নারী-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আত্মদানকারী নেপালী খড়্গ বাহাদুর সিংহ সমগ্র দেশের; এমন কি, সমস্ত নারী জগতেরই পিতা বা পুত্রের স্থানীয় হয়েছেন,—বিশেষতঃ যেদেশে নারী-মর্য্যাদা দস্যু তস্করের লুণ্ঠন বস্তুতে পরিণত হয়ে দাঁড়ালেও, না শাসন সম্প্রদায়ের না তাদের স্বদেশবাসীর দ্বারায় প্রতিবিধানের জন্য যথার্থ ভাবে চেষ্টা হয়, সে দেশে এই নারী সম্মানের রক্ষকের স্মৃতি দেবতার মতই পূজিত হওয়া উচিত। তিনি হোন্ নেপালী, হোন্ বাঙ্গালী, হোন্ না কেন আর কেউ তি—নি যাই হোন, যেই হোন, তিনি সকলেরই নমস্য! বীর যিনি পরার্থে আত্মদান করেন, তাঁর পরিচয় তাঁর জাতি ধর্ম্মে নয়, দেশে কালে নয়, শুধু তাঁরই কার্য্যে! তিনি সকল কন্যার পিতা, সব ভগিনীর ভ্রাতা—সমস্ত মায়ের সন্তান। তাই আমাদের আজ সেই স্নেহাধার, এবং স্নেহময় আত্মীয়

তমের জন্ম আমাদের অন্তরের এই আনন্দ গৌরবের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে বক্ষতলে শোকের ব্যথা এবং চক্ষের তলায় অশ্রুরবাষ্প জমাট বেঁধে উঠছে! এই সভাকে আনন্দ সভা এবং শোক সভা এক সঙ্গে দুহয়েতেই পরিগণিত করছি।

মোট আমার বলবার কথাটা এই ই ছিল; মানুষ চেষ্টাযত্নে আর সব করলেও করতে পারে; পারেনা শুধু প্রাণ দিতে। তাই সেটা নেবার অধিকারটাও কারু নেই এবং সেইটেই এ সংসারের সবচেয়ে বড় অপরাধ। তার পক্ষে আট বৎসর সপরিশ্রম কারাদণ্ড কিছু অন্যায় নয়। সেজন্যে এত হুলস্থূল কেন? কিন্তু একে কি বলে নরহত্যা? অর্থ দিয়ে পশুমাংসের মতন নারীমাংস ক্রয় করে যে নরপিশাচ, তাকে নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে, কোন্ সভ্যজগতের ন্যায়বান নরনারী তাকে মানুষ ব'লে তার সঙ্গে সমান আসন দেবে? আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে—"ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—মানুষের চামড়া ঢাকা থাকলেই মানুষ পদবাচ্য হয় না। অতএব যিনি বা যাহারা, এই সব নরমাংস লোলুপ বাঘের চেয়েও ভীষণ, নারীমাংস লোলুপ হিংস্র শ্বাপদগুলাকে জনসমাজ হতে উন্মূলিত করতে পারেন, তাঁরা সেই জনসমাজের নিকটে বীর. ব'লে পূজা পাবার যোগ্য—দণ্ডনীয় নহেন

যাই হোক, সে লেখাটা ভাই যে সময়কার মনোভাবে যে রকম ফুটেছিল, আজ তার সারাংশটা আর টেনে বুনে এনে ঠিক হয়ত তেমনটী করে তোমায় জানাতে পারলুম না। বুঝে সুঝে নিয়ে পড়ো, এথেকেই। আমার লেখার মজাই তো ঐ! জানো ত, ঠিক মাথায় মাথায় যখন শেষ মুহূর্ত্তটি দেখা দেয়, তাগাদার পর তাগাদা চলতে থাকে, আমি তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম টেনে নিয়ে নিবিষ্ট হই। চিরদিন তাড়াহুড়োর মধ্যেই জীবনটা ছুটে চলেছে। তার অভ্যাসটীও তাই তেমনি দুরন্ত হয়ে উঠেছে! সেই যে কলুর ছেলে, ঘানিগাছে চ'ড়ে গান গাওয়া যার অভ্যাস হয়েছিল, রাজসভায় বসে গান কোন রকমে তার কেন গলা দিয়ে বার হয়নি, এটা আমি ভাল করেই বুঝি! আমাকেও যদি সবাই মিলে অখণ্ড অবসর দিয়ে দেয়, আর তাগাদা না করে, আমি যে কস্মিণেই এক কলমও লিখে উঠতে পারবো না, এটা স্থির জানি।

যাহোক, রাত্রে সিগ্রায় ফিরে দেখি বৃন্দাবন তখনও আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। আর যাঁরা সব এসেছিলেন, তাঁরা বসে বসে ফিরে গেছেন। সকাল বেলায় বৃন্দাবনের বাড়ী গিয়ে যে আলোচনা গুলো আরম্ভ করা গেছলো, সেগুলো সব শেষ হয়ে তো ওঠেনি। শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মশাইও সে আলোচনায় ছিলেন, এবেলা তিনি আসেননি। অগত্যা তিনজনের কায আমাদের দু'জনকার উপরেই পড়লো।

বৃন্দাবনের সঙ্গে গল্প আরম্ভ হলে ত আর সহজে শেষ হয় না! খড়্গসিংহ থেকে আরম্ভ করে, মজফঃরপুরের সাহিত্য সভা, কোন বিশেষ মাসের মাসিকে প্রকাশিত কোন বিশেষ ছোট গল্প ইত্যাদি এবং আরও অনেক কিছুই আলোচনা চলতে থাকে। ফনীবাবু (জজসাহেব বলেই তাঁকে উল্লেখ করা যাবে) বিচার সম্বন্ধীয় আলোচনার পর প্রায় চুপচাপই বসে রইলেন, একবার উঠে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে হয়ত দুটী চিনের বাদাম ও পাঁপর ভাজা খেলেন, কারণ সে দুটো জিভে না থাকলে ফিরে এসেই আমায় ওরা ডাকচে বলে অত করে ঠেলে পাঠাতেন না।

বৃন্দাবন যখন চ'লে গেল তখন রাত এগারটা বেজে গেছে। বিছানায় পড়ে ঘুম আর এলো না। কড়ি রুণুর কথা কেবলই মনে পড়তে লাগলো। দেরাদুন থেকে শীঘ্রই ফিরবো বলে এসেছি, কিন্তু যদি ওরা বদরী যায়, তাহ'লে? এমন সুযোগ ছাড়বো কি? অথচ সে যে একেবারে দীর্ঘকাল।

পারবো কি? আবার এদিকে অমি আসছে, তার গ্রীষ্মের বন্ধ। এই সময়টীর প্রতীক্ষায় যে প্রত্যহ দিন গুণেছি।—যাক্, দেখা যাক্, বদরী যাওয়া তো আর মুখের কথা নয়। ৪২২ মাইল যাওয়া আসায়, কাশী থেকে কলকাতা—তাও আবার পাহাড়ী পথ। সে আর আমরা

গেছি! আর নিয়ে যাবে যে সেও তো তেম্‌নি মস্ত একটা বীর।

দেরাদুন থেকে টেলিগ্রাম এসে জানালে যে বাড়ী পাওয়া গিয়েছে। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে আমাদের যাত্রীদল ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌছলো। কোনও গাড়ীতে রিজার্ভ পাওয়া গেল, কি গেল না— তখন পর্য্যন্ত সে খবর নিয়ে মোগলসরাই থেকে লোক ফিরে আসেনি।

দেরাদুন এক্সপ্রেস চ'লে গেল, সেটায় বদল ছিল না। পেসোয়ার মেলে দুটো বদল, তবে আমাদের নামতে হবে না, এই যা সুবিধা।

পেসোয়ার মেলেই দুটো কামরার বারোটা বাঙ্ক আমাদের দখলে পাওয়া গেল। পঞ্চু সেদিন তার নূতন কেনা গাজীপুর অঞ্চলের জমীদারীর কাছে আমাদের সঙ্গী হতে পারলে না ব'লে, সেদিন আমরা বারজন লোকেই রওনা হলুম। আর দুটী মেয়ে ও একটী পুরুষ, সতীশের মার সঙ্গে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমাদের লোকজনেরা সব ছিল।

সতীশের মাকে চিনতে পারলে? বসুমতীর প্রোপ্রাইটার সতীশ মুখুর্য্যের মা, আমাদের বেয়ান।

আজ ভাই এইখানেই বিদায়। দেখি পারি ত মধ্যে মধ্যে লিখে যাব। আমার যাবার ভরসা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল না, তবু তোমায় সেই "যাব কি যাব না"র মধ্য থেকেই আসতে লিখেছিলুম। আসতে পারলে খুবই ভাল হতো। কিন্তু সে দোষ যখন তোমার চেয়ে আমারই বেশী, তখন উপায় কি? তোমায় ব'কে যে খানিকটা গায়ের ঝাল মেটাব তারও উপায় নেই। আজ এইখানেই ইতি—

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ভালোবাসা

মনের সাধনা শুধু, ভালোবাসা, নয়নের নয়?
তার আশা মনোরথে, উড়ে চলে শূন্য পথে,
চরণে ধরার ধূলি ছুঁতে করে ভয়,
স্বর্গ তার রঙ্গভূমি, করেনাক মর্ত্ত্যে অভিনয়!

এই দেহে আরতির পঞ্চদীপ দীপ্ত শিখা জ্বালি,
প্রেমাস্পদে পূজিবারে, আয়োজন বারে বারে,
দুই করে ব'হে আনি নৈবেদ্যের থালি,
পুষ্প ফলে দুর্ব্বাদলে, গঙ্গোদকে পাদ্য অর্ঘ্য ঢালি।

অমরাবতীর পথে, নন্দনের মন্দাকিনী তটে,
দেবতা অপ্সরা সাথে যে প্রেম লীলায় মাতে,
তার কথা মর্ত্ত্যলোকে স্বপ্নাতীত বটে,
কল্পনার তুলি হাতে আঁকিবারে তারে চিত্তপটে!

দেবতা অমর, তাই প্রেম তার দেহের বেসাতি,
ইন্দ্রের পার্ষদ কাম, ধরেনা অতনু নাম,
রতি-পতিরূপে ফিরে ঋতুপতি সাথী,
মদন-উৎসবে কাটে অনিমেষ অতিমির রাতি!

জরা মৃত্যু বিভীষিকা-ক্লিষ্ট মন অভাগ্য মানব,
ক্ষণিক যৌবন লয়ে, চলে পথ ভয়ে ভয়ে,
জানে কায়মনে পূজা জীবন গৌরব!
অতনু এ তনুদেহে, মনসিজ মন্ত্রে অভিনব!

দুর্লভ মানব জন্ম তাই লভি তৃপ্ত দেহমন,
দেবত্বের পরমাদ, চাহিনা তাহার স্বাদ,
স্মরণে স্বপনে ধ্যানে করি আবাহন,
দেহমনে দয়িতের করি যেন পূজা সমাপন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

"সত্যধাম"—রাঁচী
৫।১০।২৭

কলের মানুষ

(গল্প)

কাশীনাথ দাদার সঙ্গে কলের সম্বন্ধ তাঁহার দার পরিগ্রহের পর। প্রায় পাঁচ বৎসর।

ঠনঠনিয়ার তল্লাটে একটা দোকান দেখিতে পাইবেন, সেখানে খাঁটি সর্ষপ তৈল পাওয়া যায়। সেই দোকানের খানিকটা দূরে তাহারই কল।

কারখানার গৃহ টিন ও টাইলের সংমিশ্রণ। বেলা দশটা হইতে বারটার মধ্যে সূর্য্যদেবের রশ্মির সহিত তাহার একবার সংস্পর্শ হয়।

গৃহের মধ্যে অন্ধকার, কিন্তু কল যতক্ষণ চলে ততক্ষণ মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ তমিস্রপূর্ণ প্রকোষ্ঠের মতন বোধ হয় যে গৃহ সজীব। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যে যদিও ধ্বংসের পথে তথাচ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়।

কলের মধ্যে পঞ্চভূত খাটে। জনকতক কুলি মজুর ও একজন ফায়ারম্যান তাহাদিগকে খাটায়। দৈনিক সহবাসে তাহাদের মধ্যে একটা সখ্যতাবন্ধন সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছিল।

কাশীনাথ সরকার, বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ, তাহার অধিকারী। রাস্তার ধারে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইবেন যে একখানি দেবদারু কাঠের তক্তার উপর বিষাদপূর্ণ কালো অক্ষরে লেখা "সরকার এণ্ড কোম্পানীর তৈলের কল"।

"এণ্ড কোম্পানী"র অর্থ আর কিছুই নয়। কাশী-নাথের স্ত্রী বিনোদিনীর মূলধনের সাহায্যে কলের প্রারম্ভ। সঞ্চিত লাভের ও অর্জ্জিত লোকসানের ভাগ উভয়ের অর্দ্ধা-অর্দ্ধি। লাভ হইতে লোকসান বাদ দিয়া যেটুকু উপার্জ্জন, তাহাতে জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে এপর্য্যন্ত কোনও অনাটন হয় নাই। কিংবদন্তী যে কাশীনাথ অনেক টাকার মালীক।

টাকা, শক্তির প্রতীক। শক্তি থাকিলে শক্তিধর সচরাচর লাফালাফি, হাঁকাহাঁকি করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। কাশীনাথের সম্বন্ধে কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

কাশীনাথ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করে। তৎক্ষণাৎ একেবারে স্নান করিয়া লয়। জপের অভ্যাসও আছে, জপ শেষ হইলে দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে একবার প্রকাশ্যে বলে, "হরি হে—দীনবন্ধু!" সেই সাড়া পাইয়া বিনোদিনী একবাটি টাট্‌কা মুড়ি তেল মাখিয়া একটা খানি-লঙ্কার সহিত স্বামীর হাতে দিয়া যায়। মুড়ি শেষ হইবার উপক্রম হইলে এক পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হয়।

বেলা দশটার সময় কলগৃহের মাথায় দিনকর রশ্মি বিকীর্ণ করিলে, কাশীনাথ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পায় যে সৌরজগতের কলও দৈনিক নিয়মে চলিতেছে। অনিত্য সংসারে নিত্যের এই প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া সে বোধ হয় পুলকিত হয়।

বেলা একটার পূর্ব্বে কাশীনাথ ঘরে একবার ফিরিয়া আসে। সেই অবসরে বিনোদিনী দুই তিন রকম ব্যঞ্জনের সৃষ্টি করিয়া স্বামীর অন্নের থালা সাজাইয়া দেয়। প্রত্যহই প্রায় নূতন রকমের। রসজ্ঞ কাশীনাথ মুগ্ধ হইয়া সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া রসনার সাহায্যে পরীক্ষা করে। আহার শেষ হইলে বিনোদিনী স্বামীর পরিত্যক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের অবশিষ্ট প্রসাদ মনে করিয়া খায়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে উভয়েরই একটা শান্তিময় সরিকদারী চলিতেছিল।

আহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া কাশীনাথ আবার কারখানায় গিয়া বসে। সেই অবস্থায় সে

মধ্যে মধ্যে নিদ্রাগত হয়। কখনও সুষুপ্তির অবস্থা পার হইয়া স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করে। হঠাৎ কল থামিয়া গেলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন জিজ্ঞাসা করে, "কি রকম ?"

কর্ম্মচারী বলে "সেই রকমই !"

এই আশ্বাস বাণী কাশীনাথের পক্ষে প্রচুর। কলের মধ্যে হঠাৎ কিছু নূতন হইতে পারে, কাশীনাথ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। কল সর্ব্বদাই কল, হয় চলিবে, কিংবা অচল হইবে। যদি অচল হয় তবে সংশোধন করিলেই চলিবে। অচল হইলে তামসিক, সচল থাকিলে সাত্ত্বিক, নিতান্ত চঞ্চল হইলে রাজসিক। এই ত্রিবিধ অবস্থার বাহিরে কোনো কল এ পর্য্যন্ত যায় নাই তাহাই কাশীনাথের ধারণা ছিল।

কলের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া কাশীনাথ মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল।

কাশীনাথ ভাবিত, কলের সঙ্গে মানুষের তফাৎ কি ? কলের জীবন হয়ত দশ বার বৎসর, মানুষের হয়ত আশী। তাহাতে কি যায় আসে ? কলের কলেবর মানুষের মতন বর্দ্ধিত হইয়া শৈশব হইতে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু কল একেবারেই যৌবন লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আসে। তাহাকে কিছু শিখিতে হয় না, কলেজে যাইতে হয় না, চাকুরির চেষ্টা করিতে হয় না। সুতরাং কলের মূল্য বেশী। তবে কল স্ত্রীলোকের মতন, জল উত্তাপ প্রভৃতি পঞ্চভূত তাহার মধ্যে পুরুষ। একাধারে স্ত্রী পুরুষ। স্ত্রীর গর্ভে যেমন সন্তানাদি হয়, কলের গর্ভে খাঁটি সর্ষপ তৈল হয়। তিনসের সর্ষপ দিলে প্রায় একসের তৈল হয়, খলিটুকু উপরন্তু। ওজন করিলে তিনসেরের সন্ধান পাওয়া যায়। যদি কল চলে, অথচ তৈল বাহির না হয়, তখন বুঝা যায় সর্ষপ বীজেরই অভাব। বাহির হইয়া যদি নষ্ট হয়, তবে পুরাতন কীট-দষ্ট সরগুজা মিশ্রিত। মানুষের বেলা এসব হিসাব করা অসম্ভব। কলের মধ্যে আত্মা নাই, চৈতন্য নাই, তাই বা বলে কে ? শক্তি ত চৈতন্যময়ী।

কল প্রজ্ঞাসম্পন্না। তার মতিগতির স্থিরতা আছে। কল সতীত্বের আধার, দাগা দিয়া যায় না। কল অন্নপূর্ণা ও জগদ্ধাত্রী রূপে একসময় সকল দেশেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে কলের সঙ্গে নিজের মনের কথা চলিবে না কেন ? স্ত্রীর সহিতই কি মনের কথা চলে ? কচিৎ। ইতর জীব জন্তুর সহিত কি চলে ? এই বিশ্বকল যদি কেহ চালাইতে থাকেন, তাঁহার সঙ্গেই বা কি মনের কথা হয় ?

পৌষ মাসের ষোড়শদিন। আজ বিনোদিনী নূতন রকমের পিষ্টক ও পুলি স্বামীর জন্য সারাদিন বসিয়া তৈয়ারি করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সেগুলি রেকাবিতে সাজাইয়া স্বামীর সম্মুখে নৈবেদ্যের মত ধরিয়া দিল। কাশীনাথ ভাবিয়া দেখিল যে একটা কল নিজের তৈয়ারি জিনিস আর একটা কলকে উপহার দেয় না। কিন্তু দুইটি কল স্থাপনা করিয়া একটাকে শিখাইয়া দিলে অন্যটার পক্ষে তাহা গ্রহণ করিতে কতক্ষণ ?

কাশীনাথ বলিল, "সুন্দর !" কে সুন্দর ? পিঠেপুলি, না বিনোদিনী ? কাব্য না কবি ? প্রেম, না নায়িকা ?

কিন্তু বিনোদিনী সেই 'সুন্দর' কথাটিতেই খুসি। তার জীবন সেইখানেই সার্থক, যেখানে স্বামীর মুখের কথা।

বিনোদিনী বলিল, "দুধ একটু ধ'রে গিয়েছিল, গন্ধ হয় নি ত ?" কাশীনাথ বলিল, "অনেক সময় কলের তেলে ঝাঁজ হয় না, সেগুলো পুরাণো রাই সর্ষপের দোষে। তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ কি ? আমার মুখে ত ভালই লেগেছে। কথাটা না বল্লেই ভাল হ'ত। কোন দোষ নিজের ঘাড়ে নিতে নেই, তাতে সন্দেহ হয়ে, সত্যি বলে বোধ হয়। এখন বল ত তুমি আছ কি রকম ?

বিনোদিনী। সেই রকম।

কাশীনাথ। আজ দেবেন বাবুদের বাড়ী গান হবে, শুনতে যাবে না ?

বিনোদিনী। যদি বল ত যাই। মা, বড়দিদি, ওবাড়ীর পিসি, সকলেই যাবেন।

কাশীনাথ। সে কথাও ব'লবার দরকার ছিল না। এঞ্জিন ট্রেণ চালায়, গার্ড সাহেব কেবল ঘুমায়। কলিশন্ হয়ে গেলে দোষ পড়ে ড্রাইভরের ঘাড়ে। কল যদি নিজেকে দেখতে পেত, তবে বিগড়েও যেত না, ধাক্কাও খেত না। যে উপন্যাসগুলো কিনেছিলে, সেগুলো সাঙ্গ করেছ ত ?

বিনোদিনী। তুমি গান শুনতে যাবে না ?

কাশীনাথ। না, বড় শীত।

স্বামীর শীত ও দেবেন বাবুর গান, জড়জগতের এই দুইটি কাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক কোথায় তাহা বুঝিবার বয়স বিনোদিনীর তখনও হয় নাই।

শীতের মধ্যেও সে গান শুনিতে ব্যগ্র! দেবেন বাবুর গলা বড় মিষ্ট, বিনোদিনী শুনিতে ভালবাসে। ভালবাসা ও গান, প্রাণের স্ফূর্ত্তির বিশেষ দুইটি উপাদান। জড়কে বুঝাইয়া দেয় যে তাহার মধ্যে চৈতন্য আছে। স্বামীর লেপমুড়ি দিলেই শীত ভাঙ্গিবে। নিজের শীত তুচ্ছ। সেটা, গান শুনিয়াই ভাঙ্গিবে। ভালবাসা তার উষ্ণা।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "শীত লেগে সর্দ্দিকাসি হবে নাত ?"

বিনোদিনী বলিল, "না।"

কাশীন্যথ ভাবিল, তবে কল্‌টাকে অত যত্ন করি কেন ? 'ফায়ারম্যান্' বলে মর্চ্চে পড়ে যাবে।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চুলগুলি গুছাইয়া, একখানা নীলাম্বরী শাটী পরিধান করিয়া, স্বামীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখাচ্ছে কেমন ?"

কাশীনাথ। ঠিক কলের মতন।

বিনোদিনী হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ভাড়াটিয়া গাড়ীর শব্দ ক্ষীণতর হইয়া আসিলে, কাশীনাথ তাহার কারখানার গৃহে তালা বন্ধ করিতে গেল। তখন প্রায় নয়টা। ঘরটার মধ্যে দারুণ শীত, কিন্তু তখনও স্ফুলিঙ্গহীন কয়লার অন্তরাগ্নি একেবারে নিভিয়া যায় নাই। তৈলধারে দুই এক বিন্দু সর্ষপ তৈল মধ্যে মধ্যে ক্ষরিত হইতেছিল।

গৃহ অন্ধকার। হাতের হারিকেন্ লণ্ঠনের সাহায্যে কাশীনাথ দেখিল যে, কল অবিকৃত ভাবে গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া—তাহার প্রকাণ্ড আঁকা বাঁকা ছায়া দেয়ালে পড়িয়াছে। কাশীনাথ কলটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিল যে ছায়ারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। আলোক, ছায়া ও প্রতিবিম্বের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ, কেবল দৃষ্টির তারতম্য!

কলগৃহের নির্জ্জনতা ভাল লাগাতে কাশীনাথ এক খানা চেয়ারে বসিয়া ভস্মস্তূপের দিকে পদদ্বয় প্রসারিত করিল।

বাহ্যজগৎ হইতে অবসর পাইলে, মন নিজের সঞ্চিত চৈতন্য ভাণ্ডারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

কাশীনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিত এক পল্লীগ্রামে। শৈশব কাটিয়াছিল সেখানে। মনে পড়িল একটা ভাঙ্গা বাড়ী ও তাহার সংলগ্ন ভাঙ্গা মন্দির ও শৈবালপূর্ণ পুষ্করিণী। সেখানে কল ছিল না, ছিল একটা গোশালা, ও তাহারই নিকট আবর্জ্জনাবেষ্টিত পুরাতন ঢেঁকির ঘর। বাল্যকালে সেই ঘরে বসিয়া সে ফার্ষ্ট বুক পড়িয়া কৃতবিদ্য। পিতার কথা মনে পড়ে না। বিধবা জননী দরিদ্রা। মাতুল ভরণ পোষণ করিতেন। অনেক দিন হয়ত জননী অনাহারে থাকিয়া কাশীনাথকে মানুষ করিয়াছেন। পরলোকে কোথায় কে থাকে, তাহা কাশীনাথ কখনও ভাবিয়া দেখে নাই। বোধ হইল পরলোক এই শূন্য, অন্ধকার কলঘরের মতন। জননীই কাশীনাথের সঙ্গে বিনোদিনীর বিবাহ দিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, বৌকে যত্ন করিস্, ওরিই দৌলতে তোর কপাল ফিরবে।"

স্মৃতিভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করিয়া মন আরও দেখিল যে, কলেজে অধ্যয়ন করিয়াও জন্মভূমির শৈশবের দৃশ্য তাহার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। বাল্যলীলার সহচর ও সহচরী, নিদাঘে চাতকের ডাক, ঘনমেঘের কোলে উড্ডীয়মান সাদা বকপাখী—সবগুলিই সজীব চিত্র! কলেজের পরীক্ষায় সে কত নম্বর পাইয়াছিল, বিবাহের সময় বাসরঘরে কে ছিল, বিনোদিনীর পিতা কতটাকা কন্যাকে দিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, বি,এস-সি পাশ করিয়া কোথায় কোথায় চাকুরির চেষ্টা করিয়াছিল, কল কারখানা কত টাকা দিয়া শ্বশুর

কিনিয়া দিয়াছিলেন ও তার দলীল দস্তাবেজই বা কোথায়, দেবেন বাবু কেন বিনোদিনীর পাণিগ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, ও বিনোদিনীর পিতা কেন তাহাতে রাজি হন নাই, বিনোদিনীর চেয়েও দেবেন বাবুর স্ত্রী অধিক সুন্দরী কি না, ও সে মোটর কারে চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইলে কি রকম দেখায়, তাহাদের গৃহ কত সুসজ্জিত, এই প্রকার শত শত কথা কাশীনাথের মানসাঙ্কে প্রবেশ করিয়াও তাহার চৈতন্য নূতন একটা কিছু গড়িতে পারে নাই।

বাহিরের ইতিহাসের মধ্যে অন্তরের ইতিহাস জাগ্রত হইলে, বর্ত্তমানের মধ্যে ভূত আসিয়া দেখা দেয়। কাশীনাথের স্বভাবসিদ্ধ তন্দ্রা তাহাকে আবিষ্ট করিতেছিল। বাহ্যদৃষ্টির অবসন্ন জ্যোতির সহিত অন্তর্দৃষ্টির আলোক মিশিয়া সেই বিজনগৃহের দেয়ালে কলের ছায়াটা বোধ হইল একটা ভূতের মতন! ক্রমে তাহার রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়া পড়িল! স্মৃতির মধ্যে শ্রুতিও আবিষ্ট হইল!

"Good morning Mr. Sircar."

বাস্তব মূর্ত্তি সম্মুখে। হাস্যময়ী সুন্দরী, ভরা যৌবন, পরিধানে সাটিনের ইভ্‌নিং গাউন, শিংগল্‌ড কেশগুচ্ছ, সবুজ মখমলের ক্যাপ্‌, গণ্ডদেশে মুক্তার মালা, হাতে একটা রেশমি থলি, অঙ্গুলির মধ্যে একটিতে হীরকখচিত ওয়েডিং রিং!

"I wish you a happy new year! Where is Mrs Sircar?"

কাশীনাথ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?

যুবতী। আমি শ্রীমতী পুরুষ, মিসেস্ ম্যান্।

কাশীনাথ। আপনি এই চেয়ারে বসুন।

যুবতী। দেখতে পাচ্ছেন না, আমি আপনার এই কারখানায় কল? আমি যথাস্থানে বসে আছি।

কাশীনাথ। আমি কেবল স্লীপিং পার্টনার। আমার স্ত্রীই এ কারখানার ক্যাপিট্যালিষ্ট্।

যুবতী। স্ত্রীর জন্যই মূলধন। যতই নারীর জাগরণ ততই মূলধনের সৃষ্টি। ততই কলের বিকাশ। স্বামী সুষুপ্ত হিস্যাদার হবেই। আপনি সুষুপ্ত বলেই আমি দেখা করতে এসেছি। জাগ্রতাবস্থায় আমাকে কোনো দিন দেখছেন? আমার ক্যাপিট্যালিষ্টকে আজ দেখছিনে কেন?

কাশীনাথ। তিনি দেবেন বাবুর গান শুনতে গিয়েছেন।

যুবতী। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) দুঃখের বিষয়! সেই অবসরে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, একটু সংসার সম্বন্ধে আলোচনা করলে হয়ত আপনি নিদারুণ একাকীত্ব অনুভব করবেন না। মাফ করবেন, আমিও একাকিনী। আপনার এই ঘরে পাঁচবৎসর কাটিয়েছি। এত যে খেটে খেটে সারা, তা বোধ হয় কখনো আপনি ভেবে দেখেন নি?

কাশীনাথ। কি নিষ্ঠুর আমি!

যুবতী। আপাততঃ তাই আমি বলতে চাই। যখন কল ছিল না, মানুষকে মানুষ ভালবাসত। একজনের জন্য আর একজন খাটছে সেটা দেখতে পেত। সেই দৃষ্টির মধ্যে কত সৌন্দর্য্য, কত আর্ট, কত সমাজবন্ধনের সূচনা। সে গুলোতে তৃষ্ণা নাই, তারই জন্যই আপনারা কল খাড়া করেছেন। স্বভাবের মানুষ আপনাদের সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে নি, কলের শক্তি সেটা করছে। কত সুন্দর জিনিস আপনি দেশ-বিদেশ হতে পাচ্ছেন। কত খেলনা, কত গহনা, কত বস্ত্র, কত গৃহ সাজানর জিনিষ, কত রেলগাড়ী, মোটর কার, এয়ারোপ্লেন, কত সিনেমা বায়স্কোপ, তার কি সংখ্যা আছে? বোধ হয় দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কলেরি তৈরি, মানুষ কেবল নিমিত্ত মাত্র। মানুষকে আর ভালবাসতে হয় না। পয়সা খরচ করতে পারলেই হল। অথচ সেই লুপ্ত মানবপ্রেমের যায়গায়, কলের জন্য কি একটু প্রেম হয় না?

কাশীনাথ। কল ত একটা জড়শক্তির আধার।

যুবতী। আপনি কোন্ শক্তির আধার?

কাশীনাথ। আমিও জড়শক্তির আধার, কলের মতন আমাকে চালাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যটুকুও আছে।

যুবতী। আরও দশজনকে চালিয়ে নিয়ে যান কোন্ শক্তির বলে?

কাশীনাথ। সেই জড়শক্তির বলে। যতদিন তাদের অন্নবস্ত্র জুটিয়ে দিতে পারব, সখ মেটাতে পারব, তাদের চালাতেও সক্ষম হব। না পারি, তারাও একদিকে সরে পড়বে, যারা চালাতে পারবে তাদের আশ্রিত হবে।

যুবতী। তাদেরই মধ্যে কখনও একটু স্নেহমমতা কিংবা আত্মদান দেখ্‌তে পান্ নি? পিতা মাতার, বন্ধুর, স্ত্রী পুত্রের?

কাশীনাথ। চৈতন্যের মধ্যে একটু মায়ার টান দাঁড়িয়ে যায়, কারও কম, কারও বেশী।

যুবতী। আপনার স্ত্রীর উপর টান্ কতদূর?

কাশীনাথ। আমি ঠিক সেটা এখনো বুঝতে পারিনি। হয়ত তার রূপের জন্য, যৌবনের জন্য, হাবভাবের জন্য। সেগুলো জড় শক্তিরই নানা রকম ভাব। সেই ভাবগুলোর আকর্ষণে জড় জড়েই আকৃষ্ট হয়। তাকেই বোধ হয় আমরা প্রেম বলে পরিচয় দিই।

যুবতী সহাস্য মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া পড়িল। সে হাসিয়া বলিল, "কলের দৌলতে আপনার স্ত্রী যদি চির-যৌবনা ও চিররূপসী হয়ে পড়ে, তাহ'লে কি আপনার প্রেম চিরকাল তাতেই বদ্ধ থাকবে? কিংবা, কলের দৌলতেই যদি আপনাকে খুব সুপুরুষ ও বড় মানুষ করে দেওয়া যায়, তা হ'লেই কি আপনার স্ত্রীর সতীত্ব অটুট থাকবে? আনি রূপের কাঙ্গালী? কল কত রকম রূপের সরঞ্জাম সৃষ্টি করে। যৌবনের কাঙ্গালী? কল যৌবন বেঁধে রাখবার তদ্‌বির করে দেবে। কল নাচতে শেখাবে, পিয়ানো হার্মোনিয়মের সাহায্যে গান শেখাবে, বিদ্যালয় খুলে নানা দেশের ভাবের কথা জুটিয়ে দেবে, ডাক্তারখানা খুলে রোগ তাড়িয়ে দেবে, ধাত্রীর সাহায্যে প্রসব যন্ত্রণা কমিয়ে দেবে। কলের মানুষে দেশ ছেয়ে পড়বে। সেই সব মানুষের মাল নিয়ে এক একটা দোকান হবে, খুব সস্তা দরে কেনা-বেচা হবে, যখন যার যেটা দরকার ও পছন্দ, সেই রকম মানুষকেই আপনি কিনে নিতে পারবেন। রূপ, যৌবন, হাব-ভাব, সকলেরই বাজার দর ক্রমাগত উঠবে নামবে। পয়সার উপর নির্ভর করবে। কলই পয়সার উপায় ক'রে দেবে, আপনার প্রেমও উত্তোরত্তর চরিতার্থ হবে। কিন্তু যে কল সকলেরই উৎস, সে কেবল জড়শক্তি ব'লে তার উপর কি একটু মায়াও আপনার হবে না? জড়শক্তির ভাবগুলো নিয়েই আপনার প্রেম, শক্তিটার বেলায় ফাঁকি?

কাশীনাথ। কথাটা বড় শক্ত। কল যেমন রূপ-যৌবনের সৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে সংহারও করে। কলের দৌলতে আনন্দও হয়, নিরানন্দও হয়। কলের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখলে তার উপর মায়া হওয়া অসম্ভব, কল সৌন্দর্য্য ভেঙ্গে ছারখার করছে।

যুবতী। সৌন্দর্য্যের আধারগুলোও কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্করী হয় না? তবে মানুষগুলো নিরানন্দের মধ্যে প্রেমের আনন্দের জন্য পাগল হয় কেন? আপনিই ত বলেছেন যে আপনিও জড়শক্তি, আপনার স্ত্রীও জড়শক্তি, কলও জড়শক্তি। আপনার স্ত্রীর রূপ যৌবন ভাব-ভঙ্গী যদি আপনাকে আকর্ষণ করে, তবেই আপনার প্রেম, অথচ তা না হলেও আপনি বলেন যে আপনার চৈতন্যের মধ্যে একটু মায়ার টান বোধ হয় আছে। আমি যদি আপনাকে রূপ-যৌবন হাব-ভাবের নূতন পছন্দসই সরঞ্জাম জোগাড় করে দিতে চাই, তাতেও আপনার মন উঠছে না, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির ভয়টুকুও আছে। তবে এই তিনটি জড়শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ কি? যদি আপনিই কেবল একটা জড়শক্তি থাক্‌তেন, নিজেই নিজের স্বামী ও স্ত্রী হতেন ও সঙ্গে সঙ্গে কলও চলতে থাকত, তাহ'লে কি হ'ত? দোষ গুণ কলের না আপনাদের?

কাশীনাথ। যেমন আজ-কাল আমাদের কল চলছে সেই রকম হ'ত, আমি স্লীপিং পার্টনার মাত্র।

আমার পক্ষে স্ত্রীও যেমন এক কল, আপনিও তা। তবে আপনি আমার উদ্দেশ্যের পথে চলেন, স্ত্রী তাহার মতলবে চলে।

যুবতী। অথচ এত অধীনতা সত্ত্বেও আমার জন্য আপনি একটু সহানুভূতি দেখাতে পাচ্ছেন না। আমার চেয়ে আপনার স্ত্রীর রূপ-যৌবন অনেক কম সেটা বোধ হয় বুঝতে পারেন ?

কাশীনাথ। আমি তর্কে আপনার সঙ্গে পেরে উঠব এমন আশা করি না, অথচ কি জানেন ? বিবাহ করে'ই হোক, কিংবা যে কোনো কারণেই হোক, তার উপর একটু মায়া জন্মে গিয়েছে।

যুবতী। সে যদি ভ্রষ্টা হয় ? পতিতা হয় ?

কাশীনাথ। আমার বোধ হয় তাহলেও সে মায়াটুকু থাক্‌বে।

যুবতী। যদি সে জরাজীর্ণা, রুগ্না, অকর্ম্মণ্য হয় ?

কাশীনাথ। তা হলেও বোধ হয় থাকবে।

যুবতী। একথা তাকে কখনও বলেছেন ?

কাশীনাথ। এমন কিছুই ঘটেনি যাতে বলবার দরকার হয়েছে।

যুবতী। বোধ হয় শীঘ্রই ঘট্‌বে। তবে আমি এখন বিদায়।

দেখিতে দেখিতে ছায়াময়ী সুন্দরী, ভয়ঙ্করী কালো মূর্ত্তি ধরিয়া কলের সহিত মিশিয়া গেল। কাশীনাথ ভয় পাইয়া বলিল "হে আদ্যাশক্তি ! সন্তানের উপর দয়া কর ! সংসারের মায়া ত বুঝিতে পারি না।"

কারখানার গৃহ হইতে কাশীনাথ শয়ন-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল যে বিনোদিনী তখনও ফিরিয়া আসে নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহর, দাস-দাসী বাহিরে শান্তিপূর্ণ নাসিকাধ্বনি সহযোগে দেহ-মনের বিশ্রাম প্রচার করিতেছিল। কাশীনাথও সেই পথ অবলম্বন করিয়া লেপ-মুড়ি দিল।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে শীঘ্র নিদ্রা হয় না। কাশীনাথ ভাবিল,—"জগতের কলের মধ্যে আমিও এক কল। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারের মধ্যে যথাশক্তি নিজের কর্ম্মটুকু নিষ্কামভাবে করিয়া যাইতেছি, অথচ একটা কিসের অভাব থাকিয়া গিয়াছে, সে অভাবটু পূরণ করিবে কে ? আমাকে আপনার বলিবার আছে কে ?

"সবই আছে, মনে করিলে সকলিই আপনার, কিংবা কেহই কাহারও না। কিন্তু কেহই তাহা ত প্রাণ খুলিয়া বলে না ! সত্য কথা সকলেই লুকায় ?

"আমিই আমার ? তাহাতেও ত মন তৃপ্ত হয় না ! প্রতি দিনের কামনা ? কিন্তু কাহাকেও ত ভালবাসি নাই। প্রতিদানের জন্যই কি ভালবাসা ?"

"কলের মানুষকে ভালবাসি কি করিয়া ? বিনোদিনী কি কলের মানুষ ? সেও ত আমার জন্য কলের মতন খাটে। নিজের ইচ্ছায় সে আমার অধীনতা ঘাড়ে পাতিয়া লইয়াছে। কারখানার কল কি তাহা পারে ? তাকে জোর করিয়া বিজ্ঞানের কৌশলে খাটাই। কিন্তু খাটাই কিসের বলে ? যদি শক্তি বিমুখ হয় ? যদি শক্তির দেবতা নিয়মের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলে ? যদি তড়িৎ, অগ্নি, বায়ু, স্তব্ধ ও অচল হয় ! তবে শক্তি কি প্রেমের দাস ? সে কি প্রেমের প্রতিদান চাহে ?"

টালায় দেবেন বাবুর বাটী। বিমলা দেবেন বাবুর স্ত্রী, উভয়ের পুত্র সন্তান খুকুমণি এক বৎসরের। বিমলা খুব সুন্দরী, নিখুঁত বলিলেও চলে। সাজ-সজ্জা, আহার নিদ্রার সরঞ্জাম সবই নিখুঁত। খুকুমণি গ্লাক্সো ও হরলিক্‌সের দৌলতে হৃষ্টপুষ্ট, গোলাপী বর্ণের পুত্তলিকার মতন, টিপিয়া ধরিলে চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে। জননীর স্তনদুগ্ধের সহিত সম্বন্ধ নাই, সুতরাং একটা অদ্ভুত জীব মনে করিয়া বিমলার দিকে তাকাইয়া থাকে, ও তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া খুন হয়।

বিমলা কলের মতন চলে। কলের জিনিষের মধ্যে বাস করিয়া আরাম পায়। প্রভাত-চা' হইতে সুরু করিয়া রাত্রির ডিনার পর্য্যন্ত যত ব্যাপার সকলেরই সময় নির্দ্দিষ্ট। দেশ, কাল, বন্ধু-বান্ধবের সমাগম, প্রাতে ও সন্ধ্যায় মোটরকারে সমীর সেবন, কথোপকথন,

বিশ্রাম, বেশভূষা, ঔষধ সেবন, সকলই কঠিন নিয়মবদ্ধ। মনু স্মৃতির বিধান, শ্রাদ্ধ, ব্রত, সকলই ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু বিমলার নিয়ম ভঙ্গ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

দেবেনবাবু গান ও গল্প লইয়াই থাকেন। বিমলা সবই সহ্য করিতে পারে, কেবল গান ও গল্প শুনিলে বিরক্ত হয়। অন্যান্য বিষয়ে, তাহার সহিত দেবেন বাবুর মতভেদ বড় একটা ছিল না। বিমলার মতে গান ও গল্প, দুইটি জিনিষই অকর্ম্মণ্যের ফাঁকি—মনুষ্যত্ব ও দেশের অবনতির প্রধান কারণ। সুতরাং দেবেন বাবুর বৈঠকখানা, তাঁহার বাটীর অন্যাংশে ছিল। দেবেনবাবু গান জুড়িয়া দিলে বিমলা খুকুমণির শয়ন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজে সেলাইয়ের কল লইয়া বসিত। তাহার নিতান্ত ভয় হইত পাছে খুকুমণির কাণের মধ্যে সঙ্গীত গজাইয়া উঠে।

দেবেনবাবু সুপুরুষ, ও সুগায়ক। তাঁহার গানের ওস্তাদির মর্য্যাদা বিমলা রক্ষা না করিলেও, অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধু মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার আর্টের অসাধারণ উৎকর্ষে স্তম্ভিত হইত। তিনি নিজেই তাঁহার গানের কথা ও সুর বাঁধিয়া ফেলিতেন, ও নিজেই তাহা হার্ম্মোনিয়ম সহযোগে প্রকাশ করিয়া মুগ্ধ হইতেন ও সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

বেশী দিন নয়, প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গীত-মুগ্ধা বিনোদিনীর সহিত দেবেনবাবুর বিবাহের কথা উত্থাপন হয়, তখন তিনি একটা কটেজ পিয়ানো সংগ্রহ করিয়া সঙ্গীত-গৃহ সাজাইয়া ছিলেন। বিবাহ না ঘটাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন, এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটা বহু মূল্যবান রেশমী ঢাকা প্রস্তুত করিয়া পিয়ানোটাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেন। সেই আবরণের মধ্যে তাঁহার কৌমার্য্য যুগের রচিত গান ও স্বরলিপিগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন।

স্ত্রী-বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে বিমলাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিত যে দেবেনবাবুর হৃদয়ে বিনোদিনীর প্রেমাগ্নি বরাবরই জ্বলিতেছে। বিমলা বলিত যে সেটুকু ক্রমশঃ মুখে জ্বলিলেই ষোলকলা পূর্ণ হইবে।

আজ গানের আয়োজন একটা আনন্দোৎসবের মতন। কারণ, তাহার স্বভাবসিদ্ধ সঙ্গীত বৈরাগ্য সত্ত্বেও স্ত্রী-বন্ধুদিগের খাতিরে বিমলা নিজেই তাহাতে যোগদান করিয়াছে।

বিনোদিনী আসিলে, বিমলা তাহাকে পিয়ানোর সম্মুখে বসাইয়া দিল। নিজে চা' তৈয়ারী করিয়া তাহাকে খাওয়াইল।

দেবেনবাবু বেশ চড়া সুরে গান জুড়িয়া দিলেন। গান এত সুমিষ্ট, সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া পড়িল যে, স্মিত ও আনন্দিত মুখে সকলেই ধন্যবাদ দিতেছিল।

গানের কথাটা প্রেমের পূর্ব্ব স্মৃতির, সুর সান্ধ্য কল্যাণ, স্বর কামনার। দেবেনবাবুর দৃষ্টিকেন্দ্র বিনোদিনীর দিকে।

অন্য দিন দেবেনবাবুর গান শুনিলে বিনোদিনী যেমন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইত, আজ কিন্তু তাহা নয়। বিনোদিনীর মুখ বিষণ্ণ। সুর তাহার মনকে কোনো অজ্ঞাত জগতে লইয়া যাইতেছিল, যেখানে সুর ও গানের দেবতা প্রতিষ্ঠিত।

বিমলা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তুমি গান শুনছ না?"

বিনোদিনী। আমার আজ গান ভাল লাগছে না।

বিমলা। কি আশ্চর্য্য! আমারও কোন দিনই ভাল লাগে না, কিন্তু আজ লাগছে।

বিনোদিনী। কেন বল ত?

বিমলা। ওঁর মুখভঙ্গী দেখে। আমি সুরের মাধুর্য্য বড় একটা বুঝিনে, কিন্তু মুখের মাধুর্য্য বুঝতে পারি। মনের কথা মনে চেপে রেখে গানের কথায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করা যে কি সঙ্কটাপন্ন ও হাস্যাস্পদ অভিনয়, তা আজ বুঝতে পারলেম।

বিনোদিনী। গানের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ। যে গান করে তার সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি?

বিমলা। তা হলে' আমার বোধ হয় গ্রামোফোনের কলটার আওয়াজ একটা কলের মানুষের মুখ দিয়ে বের

করলে চলত। আমার খুকুমণির একটা পুতুল আছে, তার পেট টিপে ধরলে কোঁ কোঁ ক'রে ডাকে। তারি মধ্যে যদি গান বের করা যায়, ও সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরানো ও দাঁত দেখানো যায়, তা হলে যন্ত্র সঙ্গীতের একটা অসাধারণ উন্নতি হবে নিশ্চয়।

দুজনেই হাসিল। উভয়েই কলের সহিত কলের মানুষের সম্বন্ধ বুঝিয়াছিল বোধ হয়।

রাত্রি অনেক হওয়াতে, জলযোগ শেষ হইয়া গেলে বিমলা দেবেন বাবুকে বলিল, "দিদিকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে এস। তার শরীর ভাল নয়। মোটরকার তৈরি।"

কাশীনাথ লেপমুড়ি দিয়া প্রায় এক ঘণ্টা নির্জ্জন গৃহে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে বিচিত্র আলোচনায় মগ্ন ছিল। এমন সময় গৃহদ্বারে শব্দ হইল, "ওগো দুয়ার খুলে দাও।"

কণ্ঠস্বর বিনোদিনীর, কিন্তু একটু বিকৃত। বিনোদিনী গৃহে প্রবেশ করিলে কাশীনাথ দেখিল যে তাহার নয়ন উদ্দীপ্ত, মুখমণ্ডল আরক্ত। বিনোদিনী কাঁপিতেছিল।

কাশীনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি হেঁটে এসেছ? গাড়ীর শব্দ. ত পেলেম না?"

বিনোদিনী। সব বলছি। তুমি খেয়েছ ত?

কাশীনাথ। খাবার ইচ্ছা ছিল না, দুটো পুলি খেয়ে শুয়ে পড়েছি। তুমি শীতে কাঁপছ দেখছি, লেপের মধ্যে এস।

বিনোদিনী। আমার পায় ধুলো, খানিকটা হেঁটে এসেছি।

কাশীনাথ। পা মুছে ফেল্লেই চলে যাবে।

বিনোদিনী। তোমাকে সব কথা না বলে তোমার লেপের মধ্যে যাব না। তুমি আমার স্বামী।

কাশীনাথ ভাবিল যে একটা কোন কাণ্ড ঘটিয়াছে, কারণ স্বামীত্ব সম্বন্ধে তাহার দাবী কত দূর এহেন প্রশ্ন বিনোদিনী পূর্ব্বে কখনও উত্থাপন করে নাই।

"সে সম্বন্ধে আমার ত কোনো সন্দেহ নাই।"

বিনোদিনী। কিন্তু আমি যে তোমার স্ত্রীর উপযুক্তা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আজ হয়েছে।

কাশীনাথ। বেশ, সে সন্দেহটা আমি মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত।

বিনোদিনী। আমি এক সময় দেবেন বাবুকে ভাল বেসেছিলাম।

কাশীনাথ। যে ভাল না বাসে তাকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না, তা যাকেই ভালবাসুক না কেন। এখনও যে তাঁকে ভাল বাসনা, সেটুকুই অন্যায়।

বিনোদিনী। সে আমার উপর পাশবিক অত্যাচার করবার চেষ্টা করেছিল।

কাশীনাথ। সুতরাং তাকে আরও ভাল বাসবার দরকার। পশুর জন্ত কি তোমার দুঃখ হয় না?

বিনোদিনী। যে সতীর সতীত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা করে তাকে খুন করে ফেলা উচিত।

কাশীনাথ। (সভয়ে) খুন করে ফেলছ নাকি?

বিনোদিনী। হাতে কিছু ছিল না, তাই ছল করে মোটর থামিয়ে একটা গলির মধ্য দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

কাশীনাথ। ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কতদূর?

বিনোদিনী। তার এতদূর আস্পর্দ্ধা যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছে!

কাশীনাথ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করে নি?"

বিনোদিনী। যার স্বভাব খারাপ সে কি জিজ্ঞাসা করে?

কাশীনাথ। বুদ্ধি থাকলে করে।—অধীর হয়ে পশুর মতন অবস্থা হ'লে করে না। হয়ত মনে ক'রেছিল, তার পূর্ব্বের ভালবাসার দাবী ছিল।

বিনোদিনী কাঁদিল। স্বামীর চরণে লুণ্ঠিতা হইয়া বলিল, "কিসের ভালবাসা? স্বামী ছাড়া কি আর কারও প্রেমের দাবী আছে? তুমি যদি এতদিন বুঝতে!"

কাশীনাথ বিনোদিনীকে কোলে টানিয়া লইয়া তার পদধূলি মুছিয়া দিল। নয়নে চুম্বন করিয়া অশ্রুধারা নিবারিত করিল। কাশীনাথ বলিল, "বিনো! স্বামী

একটা কলের পুতুল মাত্র। বোধ হয়, সতী-স্ত্রী প্রতীকের মত তার উপাসনা করে, যেমন আমরা মাটির দেবতা প্রতিষ্ঠিত ক'রে বিশ্বদেবতাকে উপাসনা করি। এরই জন্ম বোধ হয় বিবাহ প্রথা। কলের পুতুলের কি প্রেমের দাবী আছে?

বিনোদিনী। না থাকলে আমার জীবনের সাধ মিটিবে কি ক'রে?

কাশীনাথ। আমারও কি জীবনের সাধ নেই? তোমার অভাব তুমি মিটিয়ে নিয়েছ। আমার অভাব মিটবে কি?

বিনোদিনী। তুমি একবার বল আমাকে ভালবাস কি না।

কাশীনাথ বলিল, "বাসি, অনুক্ষণ বাসি। জগতের বিরাট কলের মধ্যে, সৌন্দর্যের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, সুখের মধ্যে, রোগ শোকের মধ্যে বেশ দেখতে পাই যে বিশ্বশক্তি কেবল প্রেমের জন্মেই পাগল! প্রেম না পেলে শক্তি পাগলিনীর মতন সংহারে উন্মত্ত হয়! সৃষ্টি প্রসারণের জন্ম প্রেমের সঙ্গে কাম এসে জোটে। সেটুকু কলের মতন। মানুষের আত্ম-চৈতন্ম প্রেমের পথে, কল-কারখানা ইন্দ্রিয়চরিতার্থের পথে। সেটা সংযত ক'রে বিবাহ। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবি, তুমি কলের মানুষ, না প্রেমের মানুষ? এখন দেখছি তুমি প্রেমের মানুষ, সতী, আমার মতন দরিদ্র গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মী। দেবেনবাবু তোমাকে তখন ভালবেসেছিল তখন প্রেমের মানুষ খুঁজেছিল। তার চরিত্র যদি বিগড়ে না যেত, তাহলে সে দেখতে পেত যে তার অভাব এখন তার স্ত্রীই পূর্ণ করবে। কিন্তু আমরা অন্তরে অন্ধ, বাইরে কেবল রূপ-যৌবন খুঁজে বেড়াই, মানুষটাকে দেখতে পাইনে। এ সম্বন্ধে আমাদের জীবনে অনেক কথা হবে, এখন তুমি লেপমুড়ি দেও, আমি ঘুম পাড়িয়ে দিই।"

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। উভয়েই মানসিক ক্লান্তি বশতঃ অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

গঙ্গাতীরে

বহুদিন পরে দাঁড়াইনু আজ গঙ্গার এই কূলে—
পল্লীপ্রান্তে, পথ হ'তে নামি,'—দিনের ভাবনা ভুলে'।
জীবনের দিবা যৌবন বিভা শীত-সায়াহ্ন-ম্লান,
শ্রান্ত পথিকে তাই এ তীর্থ করিল কি আহ্বান?

উঁচু পাড় বেয়ে নামিনু পিছল পদরেখা-পথ ধরি'—
একটি অশথ ঝুঁকে আছে যেথা ঘাটটিরে ছায়া করি,'
ভাঙনের মুখে ধ্বসে গেছে মাটি—নগ্ন বিপুল মূল,—
তবু সে তেমনি আলো-ঝিল্‌মিল্ পল্লব-সমাকুল।

সম্মুখে হেরি ধারা অবিরাম ধুয়ে চলে দুই কূল,—
যার মহিমায় সারা তটভূমি বারাণসী-সমতুল!
পিতৃগণের পরাণের তৃষা—তর্পণ-অঞ্জলি—
ওই অক্ষয় সলিল-বক্ষে নিতি উঠে উচ্ছলি'।

নদীবুকে হোথা পড়িয়াছে চর,—চাষীরা দেখেনা চেয়ে,
তাই কাশফুলে বিধবা-বেশিনী যেন সে কুমারী মেয়ে!
উপরে নিবিড় নীলের বিথার, নিম্নে ভাঁটার টানে
নীরবে বহিছে-খরবেগ নদী, ঢেউ নাই কোনখানে।

পা দু'টি ডুবায়ে বসিনু বিরলে বালুকার পৈঁঠায়,
হেরি খেয়াতরী, দূর পরপারে ঘাটগুলি দেখা যায়,
ছোট ছোট পথ নামিয়াছে জলে তীরতরু-ফাঁকে-ফাঁকে,
কোথাও শীর্ণ সোপান-পংক্তি উঠিয়াছে থাকে-থাকে।

এপারে অদূরে তটের উপরে দাঁড়ায়ে যে তরুসারি—
কচিৎ-কূজনে আরো সে গভীর মধুর মৌনচারী!
শ্যাম তরুশিরে ক্লান্ত কিরণ ঝিমায় তন্দ্রাহত—
পল্লবতলে ঘনায় আঁধার ছায়া-গোধূলির মত!

বেলা বেড়ে উঠে, ছায়া সরে' যায়—চেয়ে আছি পরপারে,
আজ নদীকূলে সহসা স্মরিনু জীবনের দেবতারে!—
যে দেবতা মোর প্রাণের বিজনে জেগে আছে নিশিদিন,
অশ্রু হাসির উদ্বেল গানে ছিল না যে উদাসীন।

যার প্রসাদের প্রীতিরস মোর জীবনের সম্বল,
যার আঁখিপাতে মরুর মাঝারে মিলেছে উৎস জল,
ইঙ্গিতে যার বিলায়ে দিয়েছি যৌবন সুমধুর—
সুন্দর আর সত্যের লাগি' নিষ্ঠা সে নিষ্ঠুর!

পরশ-হরষে মজি নাই, তাই গেয়েছি দেহের গান,—
জেগে রব' বলি' করি নাই তার অধরের মধুপান!
রুদ্রের সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে,
প্রাণের পিপাসা আঁখিতে ভরেছি রূপেরি অন্বেষণে।

সেই বৈরাগী আজি এ প্রভাতে তেয়াগি' ছদ্মবেশ,
গাহন করিতে চাহে ওই নীরে,—আজ বুঝি ব্রত শেষ!

আর কিছু নয়,—শুধু স্নানশেষে ওই অশথের তল,
গুঞ্জনহীন নিবিড় নীরব ছায়ালোক সুশীতল!

মথিতে চাহিয়া জলরাশি আর—করিবারে পারাপার—
তরঙ্গ-মুখে তরণী স'পিয়া দুরন্ত অভিসার!
আজ শুয়ে র'ব সিকতার 'পরে, বাহুতে নয়ন ঢাকি'—
সব-ভুলে-যাওয়া অসীম আরাম পরাণে লইব মাখি'।

দিনশেষে যবে আসিবে জোয়ার,—যদি সেই কলনাদে
তন্দ্রা না টুটে, হ'য়ে যাই ক্রমে অচেতন অবসাদে,
তলাইয়া যাই কিছু না জানিতে জাহ্নবী-জল-তলে!—
হায় রে, এমন সুখ-পরিণাম নরের ভাগ্যে ফলে?

'অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি' আজিকে মাগিছে প্রাণ,—
মনে হয় এই গঙ্গার কূলে আছে তারি সন্ধান!
আজ বুঝিয়াছি, কেন অন্তিমে এই বালু-শয্যায়—
আমার দেশের যত মহাজন নয়ন মুদিতে চায়!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

বেদ-কথা

(ঘ) পশু-যাগ

অবশ্য-কর্ত্তব্য পশুযাগের নাম নিরূঢ় পশু বন্ধ। বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্তায় এই যাগ কর্ত্তব্য। কাহারও মতে বৎসরে দুইবার—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে কর্ত্তব্য। অগ্নিষ্টোমের অঙ্গমধ্যে অগ্নিষ্টোমীয়, সবনীয় ও অন্ধবন্ধ্য এই তিনটি পশুযাগ আছে, উহা নিরূঢ় পশুবন্ধের বিকৃতি।

পশুযাগের সহিত ইষ্টিযাগের অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। ব্রতগ্রহণ, প্রণীতা প্রণয়নাদি অনুষ্ঠান উভয়ের মধ্যে সাধারণ, এইজন্য পশুযাগকে দর্শপূর্ণমাসের বিকৃতিরূপে গণ্য করা রীতি আছে। এস্থলে পশুযাগের যেগুলি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান সেইগুলিরই বিবরণ দেওয়া যাইবে।

দর্শপূর্ণমাসেষ্টিতে চারিজন ঋত্বিক্ আবশ্যক—ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও অগ্নীৎ। পশুযাগে তদতিরিক্ত দুইজন ঋত্বিক আবশ্যক। হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ এবং অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা। পূর্ণমাসেষ্টিতে হোতাকেই অধ্বর্য্যুর আদেশে অনুবাক্যা ও যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। পশুযাগে মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যা পাঠ করেন এবং অধ্বর্য্যুর আদেশক্রমে হোতাকে যাজ্যাপাঠে অনুজ্ঞা করেন। হোতৃবরণের পর মৈত্রাবরুণের পৃথক্ বরণ আবশ্যক হয়। প্রতিপ্রস্থাতা অধ্বর্য্যুকে কতিপয় কর্ম্মে সাহায্য করেন।

দর্শপূর্ণমাসে গার্হপত্য ও আহবনীয় এই দুইয়ের মধ্যে যজ্ঞপাত্র ও হোমদ্রব্য রাখিবার জন্য ঐষ্টিক বেদি থাকে। পশুযাগে আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে আর একটি বেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই বেদির নাম পাশুক বেদি। পাশুক বেদির উপরে আর একটি ক্ষুদ্রতর চতুষ্কোণ বেদি তুলিতে হয়, ইহার নাম উত্তর বেদি। উত্তরদিকে ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের মাটিতে এই উত্তর বেদি গঠিত হয়, সেই গর্ত্তের নাম চাত্বাল। চাত্বালের নিকটে পাশুক বেদির ধূলি ও আবর্জ্জনা স্তূপাকৃতি করিয়া উৎকর নির্ম্মিত হয়।

উত্তর বেদির মধ্যস্থলের নাম নাভি। আহবনীয় হইতে যথাবিধি অগ্নি আনিয়া এই নাভিতে রাখিতে হয়। উত্তর বেদি আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে, কাযেই এই অগ্নি আনয়নের নাম অগ্নিপ্রণয়ন কর্ম্ম। প্রণয়নের পর সেই নাভিস্থিত প্রণীত অগ্নিতে মন্থনোৎপন্ন নূতন অগ্নি নিক্ষেপ করিলে উহা হব্যবহনযোগ্য হয় এবং তদবধি এই অগ্নিই আহবনীয়রূপে গণ্য হয়। পুরাতন আহবনীয়ে তদবধি গার্হপত্যের কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হয়।

সামিধেনী পাঠপূর্ব্বক এই নূতন আহবনীয়ে সমিৎ প্রক্ষেপদ্বারা অগ্নি সমিদ্ধ করিয়া যথারীতি আঘার হোম করিয়া হোতৃপ্রবরণ ও মৈত্রাবরুণ প্রবরণ সম্পাদ্য। তৎপরে এই অগ্নিতে প্রযাজাদি যাগ করিতে হইবে। এই প্রযাজাদি যাগে যে সকল বিশেষ বিধি আছে, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

ঐষ্টিক বেদি ইষ্টিযাগের উপযোগী যজ্ঞপাত্র ও হোমদ্রব্য রাখিবার জন্য। পাশুক বেদি পশুযাগের উপযুক্ত পাত্র ও দ্রব্য রাখিবার জন্য। উত্তর বেদির উপরে দর্ভ বিছাইতে হয়। পাশুক বেদির একাংশে (?) প্লক্ষশাখা বিছাইতে হয়। উহার উপর পশব্য রাখিতে হইবে।

পশুযাগের আরম্ভেই পশু বন্ধনার্থ যূপ কাটিয়া আনিতে হয়। অধ্বর্য্যু স্বয়ং তক্ষার (ছুতারের) সহিত বাহিরে গিয়া গাছ কাটিয়া আনেন। পলাশাদি বৃক্ষ যূপের জন্য প্রশস্ত। গাছ কাটিয়া উহার ডালপালা ছাঁটিয়া মূল স্তম্ভকে অষ্টাশ্রি (আটকোণা) করিতে হয়। যূপের দৈর্ঘ্য অন্যূন পাঁচ হাত, উহার পঞ্চমাংশ মাটির নীচে পুঁতিবার জন্য। যূপের মাথায় একটা মুকুটাকার কাষ্ঠখণ্ড পরাইতে হয়। তাহার নাম চষাল। পুঁতিবার পূর্ব্বে যূপস্তম্ভে ঘি মাখাইতে হয়—এই কর্ম্মের নাম যূপাঞ্জন। পাশুক বেদির পূর্ব্বপ্রান্তে অবট (গর্ত্ত) খনন করিয়া তাহাতে যূপ পুঁতিতে হয়। যূপের গায়ে রজ্জুর বেষ্টন দিতে হয়—এই রজ্জুর নাম রশনা। রশনার ভিতর একটু করা কাঠ পরাইতে হয়,এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম চষাল। এই সকল কর্ম্মের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সময় হোতা তদনুকূল মন্ত্র পাঠ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যূপে পশুবন্ধনের পূর্ব্বে পশুকে দুইগাছি দর্ভদ্বারা সমন্ত্রক স্পর্শ করিতে হয়। এই কর্ম্মের নাম উপাকরণ। উপাকরণান্তে পশুর শৃঙ্গান্তরালে রজ্জু বাঁধিয়া সেই রজ্জু যূপ রশনায় বাঁধিয়া দিতে হইবে—এই পশুবন্ধনের নাম পশু-নিয়োজন। পশুর ললাট ঘৃতাক্ত করিয়া দিতে হয়।

পশু নিয়োজনের পর যাগের উদ্যোগ করিতে হইবে। উত্তর বেদির নাভিতে প্রণীত অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপদ্বারা অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া আঘার হোমের এবং হোতার ও মৈত্রাবরুণের প্রবরণের পর প্রযাজ যাগ করিতে হইবে। ইষ্টিযাগ উপলক্ষে এই প্রযাজ যাগের উল্লেখ হইয়াছে। প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ যাগ ও পরে অনুযাজ যাগ সম্পাদ্য। পূর্ণমাসেষ্টিতে পাঁচটি প্রযাজ বিহিত, কিন্তু পশুযাগে প্রযাজের সংখ্যা এগারটি। পশুযাগে অনুযাগের সংখ্যাও এগারটি। তদ্ব্যতিরিক্ত পশুযাগে এগার অনু-যাজের সমকালে এগারটি উপযাজের বিধান আছে; এই উপযাজ ইষ্টি যাগে নাই। এগার প্রযাজ যাগের দেবতা যথাক্রমে—১ সমিৎ, ২ তনূনপাৎ অথবা নরাশংস, ৩ ইড়ঃ ৪ বর্হিঃ, ৫ দুরঃ, ৬ উষাসানক্তৌ, ৭ দৈব্যৌ হোতারৌ ৮ তিস্রো দেব্যঃ (ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী), ৯ ত্বষ্টা, ১০ বনস্পতি, ১১ স্বাহাকার। অনুযাজ ও উপযাজ দেবতাগণের নাম পরে বলা যাইবে।

প্রত্যেক প্রযাজ যাগের পূর্ব্বে মৈত্রাবরুণের আদেশ-ক্রমে হোতা সেই যাগের দেবতার উদ্দিষ্ট যাজ্যামন্ত্র পড়েন। পশুযাগের প্রযাজ যাগে যে যাজ্যামন্ত্র পঠিত হয়, তাহার নাম আপ্রী। ঋগ্বেদ সংহিতামধ্যে দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। প্রত্যেক সূক্তে এগার দেবতার উদ্দিষ্ট এগারটি আপ্রীমন্ত্র আছে। যে ঋষি যে সূক্তের দ্রষ্টা, যজমান সেই ঋষির গোত্রোৎপন্ন হইলে সেই সূক্তের অন্তর্গত আপ্রীমন্ত্র পশু যাগে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় মন্ত্রের দেবতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কোন সূক্তে দ্বিতীয় মন্ত্রের দেবতা তনূনপাৎ, কোন সূক্তে বা নরাশংস। কাযেই গোত্র ভেদে যজমানকে দ্বিতীয় প্রযাজে তনূনপাৎ অথবা নরাশংস দেবতার উদ্দেশে যাগ করিতে হয়। কতিপয় সূক্তে তনূনপাৎ ও নরাশংস উভয় দেবতার উদ্দিষ্ট মন্ত্র আছে। সেখানে আপ্রীসূক্তে মন্ত্র সংখ্যা বারটি। যজমান ইচ্ছামত নরাশংসের বা তনূনপাতের উদ্দেশে যাগ করেন। এগার প্রযাজের মধ্যে প্রথম দশটিতে হোম দ্রব্য আজ্য মাত্র, কিন্তু অন্তিম প্রযাজের হোম দ্রব্য পশুর বপা। পশুর উদরে নাভির পার্শ্বস্থিত মেদের নাম বপা। এই বপা দ্বারা স্বাহাকৃতির উদ্দেশে অন্তিম প্রযাজ-যাগ করিতে হইবে। কাযেই দশ প্রযাজ অনুষ্ঠানের পর একাদশ প্রযাজের পূর্ব্বেই পশু বধের আয়োজন করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি পশুবধ করিবে তাহার নাম শমিতা বা অধ্রিগু। পাশুক বেদির উত্তরে চাত্বালের নিকট পশু বধের স্থান, সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। পশুর অঙ্গ পাকের জন্য সেইখানে অগ্নি স্থাপন করিতে হয়, সেই অগ্নি শামিত্র অগ্নি। অগ্নীৎ নামক ঋত্বিক্ উল্মুক (অগ্নিখণ্ড) হাতে পশুর চারিদিকে ভ্রমণ করেন, উদ্দেশ্য রাক্ষসেরা পশুকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। রাক্ষসেরা অগ্নিকে ভয় করে। এই অগ্নি-ভ্রামণ কর্ম্মের নাম পর্য্যগ্নিকরণ। হোতা শমিতার উপদেশে পশু বধার্থ নিগদ মন্ত্র উচ্চারণ করেন—এই মন্ত্রের নাম অধ্রিগুপ্রৈষ। অগ্নীৎ উল্মুকহস্তে আগে আগে শামিত্র দেশের দিকে চলেন। শমিতা পশুর গলবেষ্টন রজ্জু ধরিয়া পশ্চাতে পশুকে লইয়া চলেন। তৎ পশ্চাৎ প্রতিপ্রস্থাতা, অধ্বর্য্যু ও যজমান অনুগমন করেন। শামিত্রে উপস্থিত হইয়া অধ্বর্য্যু একগাছি তৃণ ভূমিতে ফেলিয়া দেন ও যজমান ও ঋত্বিকেরা সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহবনীয় (উত্তর বেদির নাভিস্থিত) অগ্নির নিকটে মুখ ফিরাইয়া বসেন—যেন পশুহত্যা দেখিতে না হয়। শমিতা সেই সময়ে পশু হত্যা করেন। পশুর মুখ চাপিয়া অথবা গলায় ফাঁস দিয়া শ্বাসরোধের দ্বারা হত্যা করিতে হয়,—এইরূপ হত্যার নাম সংজ্ঞপন। সংজ্ঞপনের পর যজমানের পত্নী জলের কলস লইয়া আসিয়া সেই জলে পশুর চক্ষু নাসিকাদি অঙ্গ শোধন করেন। অধ্বর্য্যু ও যজমানও জল ঢালিয়া পশুর অন্যান্য অঙ্গ শোধন করিয়া দেন। অধ্বর্য্যু পশুর উদরের ত্বক্ চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন। প্রতিপ্রস্থাতা দুই খণ্ড কাষ্ঠে সেই বপা গ্রহণ করিয়া জলে ধুইয়া শামিত্র অগ্নিতে তপ্ত করেন। পরে আহবনীয়ের নিকট আসিয়া আহবনীয়াগ্নিতে বপা তপ্ত করিতে থাকেন। অগ্নির উত্তাপে বপা গলিতে থাকে ও বপার কিছু ক্ষরিত হইয়া অগ্নিতে পড়িত থাকে। অধ্বর্য্যু সেই সময়ে বপার উপর আজ্য ঢালিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকেন। স্তোক শব্দের অর্থ বিন্দু—এই আহুতির নাম বপাস্তোকাহুতি। আহুতির সময় হোতা যে অনুবচন মন্ত্র পাঠ করেন তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দ্বিতীয় পঞ্চিকার ৭ম অধ্যায়ের ৫—৮ খণ্ডে * ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে সেই বপার কিয়দংশ দ্বারা যথাবিধি যাজ্যা (আপ্রী মন্ত্র) পাঠের পর স্বাহাকৃতির উদ্দেশে অন্তিম প্রযাজ যাগ করা হয়।

বপার অবশিষ্ট অংশে প্রধান দেবতার যাগ হয়। নিরূঢ় পশুবন্ধ নামক বাস্তু যাগের উদ্দিষ্ট প্রধান দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি (প্রজাপতি বা সূর্য্যও বিকল্পে দেবতা হইতে পারেন)। অগ্নীষোমীয় পশুযাগে প্রধান দেবতা অগ্নি ও সোম ইত্যাদি। অধ্বর্য্যু সেই প্রধান দেবতার উদ্দেশে বপাহুতি দান করিবেন। যাগকালে জুহূতে হোম দ্রব্য রাখাই বিধি। জুহূতে প্রথমে আজ্য তৎপরে একখণ্ড

* লেখক কৃত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের।

হিরণ্য রাখিয়া তদুপরি বপা রাখিতে হয়। বপার উপরে আবার হিরণ্য খণ্ড ও আজ্য রাখিলে মোটের উপর পাঁচ অবদান গ্রহণ করা হয়। হিরণ্য রাখিবার তাৎপর্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পঞ্চিকার ৭ম অধ্যায় ৪র্থ খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। প্রধান দেবতার উদ্দেশে বপা যাগের পর সযজমান ঋত্বিকেরা চাত্বালের নিকটে গিয়া জলস্পর্শ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আসেন।

বপা হোমের পর পশু পুরোডাশ ও পশ্বঙ্গ যাগ। ব্রীহি বা যবের মত ওষধি হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া আহুতি না দিলে পশুযাগ সম্পূর্ণ হয় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পর্য্যগ্নিকরণ বিষয়ক অখ্যায়িকা দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, পশুর মধ্যে যাহা মেধ্য বা যাগযোগ্য, তাহা ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া ওষধিতে পরিণত হইয়াছে, অতএব পুরোডাশ যাগে পশুযাগেরই ফল পাওয়া যায়। ফলে পশুর বিবিধ অঙ্গের সহকারে পুরোডাশ আহুতি না দিলে পশুযাগ সম্পূর্ণ হয় না। এই পুরোডাশের নাম পশু পুরোডাশ। নিহত পশুর যে সকল অঙ্গ যাগযোগ্য তাহা ছুরি দিয়া কাটিয়া শামিত্র অগ্নিতে পাকের ব্যবস্থা করিয়া পুরোডাশ যাগের আয়োজন করিতে হয়। ইষ্টি যাগে যেরূপে পুরোডাশ প্রস্তুত হয় ও যে বিধানে আহুত হয়, এখানেও প্রায় সেই বিধান। নিরূঢ় পশুবন্ধে ইন্দ্রাগ্নির উদ্দিষ্ট পুরোডাশ দ্বাদশ কপালে, (সূর্য্য বা প্রজাপতির উদ্দিষ্ট হইলে আট কপালে) অগ্নীষ্টোমীয় পশুযাগে অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ একাদশ কপালে পক্ব হয়। প্রধান দেবতাকে পুরোডাশ দিবার পূর্ব্বে প্রযাজ-যাগের প্রয়োজন হয় না। কেন না পূর্ব্বে যে একাদশ প্রযাজ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতেই যথেষ্ট। তবে প্রধান যাগের পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ আবশ্যক। পুরোডাশ হইতে ইড়া ভক্ষণও আবশ্যক

পুরোডাশ যাগ সমাপ্ত হইতে হইতে পশ্বঙ্গ পাকও সম্পন্ন হইয়া আসে। পশুর সকল অঙ্গ যাগযোগ্য নহে। হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড় প্রভৃতি এগারটি অঙ্গ প্রধান দেবতার উদ্দেশে পৃথক করিয়া কাটিয়া লইতে হয়। কয়েকটি অঙ্গ স্বিষ্টকৃৎ যাগের জন্য রাখিতে হয়, উপযাজ হোমের জন্য অন্ত্রের কিয়দংশ লইতে হয়, ঋত্বিক্‌দের ভোগ স্বরূপ কয়েকটি অঙ্গ লইতে হয়, পত্নীসংযাজের জন্য লাঙ্গুল লইতে হয়; পশুর রুধির রাক্ষসের উদ্দেশে উৎকরে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই সকল অঙ্গের মধ্যে পশুর হৃদয়কে পৃথক্ রূপে শূলে বিঁধিয়া শামিত্র অগ্নিতে সেঁকিয়া লইবে; অন্যান্য অঙ্গ পশুকুম্ভীক নামক হাঁড়িতে লইয়া শামিত্র অগ্নির উপর জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। হৃদয়কেও শূল হইতে বাহির করিয়া কুম্ভীস্থিত অন্যান্য অঙ্গের উপরে রাখিবে। শমিতার উপরই এই রন্ধন কর্ম্মের ভার থাকে।

পুরোডাশ যাগান্তে শমিতা সংবাদ দেন পশু পাক শেষ হইয়াছে। তখন অধ্বর্য্যু আসিয়া প্রধান যাগার্থ নির্দ্দিষ্ট অঙ্গগুলি কাটিয়া জুহূতে গ্রহণ করেন। কুম্ভীস্থিত পশুর বসা পৃথক ভাবে লইতে হয়। ঐ অঙ্গে পৃষদাজ্য মাখাইতে হয়। পৃষদাজ্য অর্থে দধি মিশ্রিত আজ্য। উহাও হোমদ্রব্য মধ্যে গণ্য এবং উহা প্রস্তুত করিবার নির্দ্দিষ্ট বিধান আছে। জুহূতে গৃহীত পশ্বঙ্গের নীচে ও উপরে আজ্য ও হিরণ্য রাখিয়া আহুতি দিতে হইবে। জুহূতে পশ্বঙ্গ কাটিয়া লইবার সময় মৈত্রাবরুণ মনোতা নামক দেবতার উদ্দেশে অনুবচন পাঠ করেন। মনোতা অন্য দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম খণ্ড দেখ)। জুহূতে গ্রহণান্তে যথাবিধি যাজ্যা পাঠান্তে প্রধান দেবতার উদ্দেশে পশ্বঙ্গ হোম হয়। প্রধান যাগের পরে বনস্পতি দেবতার উদ্দেশে খানিকটা পৃষদাজ্য আহুতি দিবার রীতি আছে।

তদনন্তর স্বিষ্টকৃৎ যাগ। স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির জন্য যে কয় অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারও নীচে উপরে আজ্য ও হিরণ্য রাখিয়া হোম করিতে হয়। স্বিষ্টকৃৎ যাগান্তে আজ্য মিশ্রিত বসাশেষ আহবনীয়ে অর্পণ করিবে।

যাগের পর ইড়া ভক্ষণের ব্যবস্থা। প্রধান যাগের পশ্বঙ্গ কাটিয়া লইবার সময়ই ব্রহ্মার জন্য প্রাশিত্র এবং সযজমান ঋত্বিক্‌দের জন্য ইড়া সেই সেই পশ্বঙ্গ হইতে কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ঋত্বিক্‌দের ভাগ স্বরূপ পূর্ব্বেই লওয়া আছে। এই

সকল ভাগ ভক্ষণের পর ঋত্বিকেরা যজমানের সহিত যথাবিধানে ইড়া ভক্ষণ করেন। ভক্ষণান্তে বাহিরে গিয়া জলস্পর্শে শুদ্ধ হইয়া অনুযাজ যাগের আয়োজন করিতে হয়।

ইষ্টিযাগে অনুযাজ সংখ্যা তিনটি, কিন্তু পশুযাগে অনুযাজ সংখ্যা এগারটি। অনুযাজের দেবতা যথাক্রমে—বর্হিঃ, দুরঃ (দ্বার), উষাসানক্তৌ, জোষ্ট্রী, উর্জ্জাহুতী, দৈব্যৌ হোতারৌ, ত্রিস্রোদেব্যঃ, নরাশংসঃ, বনস্পতিঃ, ইড়ঃ ও অগ্নি স্বিষ্টকৃৎ।

হোতা (?) আহবনীয় অগ্নিতে পৃষদাজ্য আহুতি দিয়া এই এগার দেবতার উদ্দেশে এগারবার আহুতি দেন, আর প্রত্যেক আহুতির সমকালে প্রতিপ্রস্থাতা নামা ঋত্বিক্ অন্য একস্থানে স্বতন্ত্র অগ্নি জ্বালিয়া উপযাজের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট অন্ত্রাংশের এক একটুকরা হাতে কাটিয়া লইয়া "সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" বলিয়া হোম করেন। হোতার প্রদত্ত যাগ অনুযাজ যাগ, আর প্রতিপ্রস্থাতার কৃত হোমের নাম উপযাজ হোম। অনুযাজের দ্রব্য পৃষদাজ্য, উপযাজের দ্রব্য পশুর অন্ত্রখণ্ড। এই কর্ম্মের পর স্বরু হোম। স্বরু নামক কাষ্ঠখণ্ড যূপের রশনার ভিতর রক্ষিত ছিল, উহা এই সময় আহবনীয়ে ফেলিয়া দিতে হয়।

তৎপরে পত্নী সংযাজ। পুরাতন আহবনীয়, যাহা হইতে অগ্নি প্রণয়ন করিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রাখিয়া নূতন আহবনীয় হইয়াছে, তাহাই পশুযাগে গার্হপত্য রূপে ব্যবহৃত হয়। সেই গার্হপত্যে পত্নী সংযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মৈত্রাবরুণের সাহায্য আবশ্যক হয় না। হোতাই অনুবাক্যা ও যাজ্যা উভয় পাঠ করেন। সোম, ত্বষ্টা, দেবপত্নীগণ ও গৃহপতি অগ্নি এই কয়জন এই কর্ম্মে দেবতা। ইঁহাদের উদ্দেশে পশুর লাঙ্গুল আহুতি দিতে হয়। যাগান্তে ইড়া ভক্ষণ।

পত্নীসংযাজেই পশু যাগের প্রধান কর্ম্ম শেষ হইল। তৎপরে ইষ্টিযাগের অনুযায়ী কতিপয় আনুসঙ্গিক কর্ম্মের পর যজমান বিষ্ণুক্রম প্রক্রমণ করিয়া ব্রত বিসর্জ্জন করেন।

ক্রমশঃ

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

ফরাসী জাতির মর্ম্মকথা

শিক্ষা এবং সভ্যতায় অন্যান্য অগ্রগণ্য জাতির মধ্যে ফরাসীজাতি অন্যতম। বহু পুরাকাল হইতে এমন কি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ফরাসীরা ছবি আঁকিত। এইরূপ কোনও প্রাচীন সভ্যজাতির সামাজিক জীবন পর্য্যালোচনা করা শুধু যে চিত্তবিনোদক, তাহাই নয়, অধিকন্তু শিক্ষাপ্রদ। বর্ত্তমান যুগে ফরাসীজাতি সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সভ্য; এই ফরাসীজাতির সামাজিক রীতিনীতির সামান্য একটু বিবরণ সংগ্রহ করাই আমার উদ্দেশ্য।

H. Fyfe সাহেব বলেন, ফরাসীরা যে সকলের চেয়ে বেশী সভ্যতা লাভ করিয়াছে, তার মূলে আছে তাহাদের বস্তুতান্ত্রিকতা। তাহারা জগতের মধ্যে জগতের জন্যই বাস করে। তাহাদের লক্ষ্য, কেমন করিয়া জীবনকে সর্ব্বদাই আনন্দময় করিয়া তুলতে পারা যায়। একজন ফরাসী শ্রমিক প্রাণপাত পরিশ্রম করে, কিন্তু এই কাযের মধ্যে সে কখনও বিরক্তি বোধ করে না। Hammerton সাহেব বলেন, ফরাসী চাষারও আচার ব্যবহার অত্যন্ত পরিমার্জ্জিত ও ভদ্রোজনোচিত এবং তাহাদের কথাবার্ত্তাও খুব সংযত ও শ্লীল। ফরাসী কৃষকের সঙ্গে ইংরাজ কৃষকের এবিষয়ে তুলনাই হয় না—(The interval between him and a Kentish labourer is enormous).

এই ফরাসী সভ্যতার মূলে আরও একটা জিনিষ আছে—তাহাদের পারিবারিক জীবন। ফরাসী ছেলেরা তাহাদের জননীকে পূজা করে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছেলেরা যখন খুব ছোট থাকে, তাহাদের মা খেলার সাথী হইয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করেন; যৌবন প্রাপ্ত হইলে মা হন পরম বিশ্বাসী বন্ধু; আর যখন তাহারা অধিক বয়স্ক হয়, মাকে আদর্শ বলিয়া পূজা করে। রাজ্যের আইন কানুন যেমন বাধ্যতামূলক, পরিবারের মতামতও (consiel de famille) সেইরূপ। বিপদে পড়িলে ফরাসী বালক সর্ব্বপ্রথম তার মার কাছে যায়, কারণ সে জানে তাঁর নিকট হইতে সাহায্য এবং সহানুভূতি পাইবেই। সামান্ত সামান্ত বয়সোচিত ত্রুটী তিনি চিরদিনই ক্ষমা করেন, এবং ভর্ৎসনা করিবার সময়ও স্নেহের সুরে করেন। সেইজন্য সন্তানের নিকট ফরাসী মাতা যেমন ভক্তি পান, কোনও ইংরাজ মাতা সেরূপ পান না।

কখন্ কোথায় কোন্ জিনিষ শোভন এবং সুসঙ্গত হইবে সে জ্ঞান ফরাসীর মজ্জাগত বলিলেও চলে। কথা-বার্ত্তায় এবং চেহারায় তাহারা সর্ব্বদাই মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক হইবার চেষ্টা করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, প্রশস্ত সুসজ্জিত বাড়ী, ফুলের বাগান এইসব দেখিলে তাহারা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়। এমন কি খুব গরীব চাষার বাড়ীতেও পরিচ্ছন্নতা এবং সুরুচিব্যঞ্জক আসবাবপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে যেমন অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর দরিদ্র পল্লী আছে, ফ্রান্সের কোথাও সেরূপ নেই; (there are no slums in

১। ফ্রান্সের একটী পল্লীদৃশ্য

French cities comparable in squalor and repulsiveness with those which stain the character of the British and Jewish races.) ঘরবাড়ী এবং ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্ন রাখা ফরাসী স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত আবশ্যক এবং সম্মানসূচক বলিয়া মনে করে। মিষ্ট কথা আর মিষ্ট হাসি ফরাসী নারীর মুখে সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে।

ফরাসী মেয়েরা গৃহস্থালী কাযে খুব পটু; সংসারের খুঁটিনাটির হিসাব তাহাদের কাছে থাকে। এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁরা নিজ নিজ স্ত্রীদের বুদ্ধি ও পরামর্শ অনুযায়ী কায করিয়া অর্থশালী হইতে পারিয়াছেন। মিতব্যয়ী হইয়া ব্যয়সঙ্কুলান করিয়া চলা ফরাসী স্ত্রীর সংস্কারগত। অধিকাংশ ফরাসী পরিবারেরই কিছু না কিছু টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে। ইংলণ্ডে এটা সচরাচর দেখা যায় না। মিতব্যয়িতার মূলে দুইটি যুক্তি নিহিত আছে—প্রথম বৃদ্ধ বয়সে যখন শরীর কায করতে অসমর্থ

২। অতিথিসৎকারের জন্য সদাই হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে

তখনকার জন্য সংস্থান করা, দ্বিতীয় কন্যার বিবাহে যৌতুকের টাকা মজুত রাখা।

সকলেই জানেন ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্র ছিল স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব (Liberte, egalite et fraternite) বর্ত্তমান ফ্রান্সে স্বাধীনতা অধিক পরিমাণে লক্ষিত না হইলেও, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পুরাতন রোম ইতিহাসের প্যাট্রিসিয়ন ও প্লীবিয়ন দিগের ন্যায় বর্ত্তমান ইংলণ্ডেও কৃষি ও শ্রমিকরা নিজেদের প্লীবিয়ন বলিয়া মনে করে, এবং ধনী ব্যক্তিরা উচ্চ শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত হয়; তাহারা ভাবে, এই রকম পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। ফরাসী শ্রমিক ও শিল্পীদের মধ্যে এই ধারণা একেবারেই নাই; তাহারা জানে পদের ও বিত্তের পার্থক্য সত্ত্বেও সব মানুষই সমান। মিস্ হ্যানা লিঞ্চ ফ্রান্সের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে চমৎকার বই লিখিয়াছেন তাহার মধ্যেও এই কথা আছে। নিজেকে নিকৃষ্ট নিম্ন-শ্রেণীর লোক মনে করিয়া ধনীলোকের খোসামোদ করিয়া বেড়ানো ফরাসীজাতির ধাতে নাই। ফরাসী বিপ্লবের সময় আভিজাত্যের গর্ব্ব যখন আর রহিল না, সেইদিন হইতে সাম্য মন্ত্র ফরাসী জাতির মনে গাঁথা হইয়া আছে।

জগতের মধ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহর সবার চেয়ে সুসভ্য আর সুশিক্ষিত; সেই জন্যই ফরাসীরা যখন গর্ব্ব করিয়া বলে "প্যারিস যা করবে, সমস্ত জগৎকেই তা করতে হ'বে," তখন তাহারা বোধহয় অন্যায় কথা বলে না; কিন্তু এটা অতটা ঢাকঢোল পিটাইয়া বলিয়া বেড়ানো ভাল নয়। অন্যান্য জাতির মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান বোধে আঘাত করা উচিত নয়। এই কারণেই বোধ হয় ফরাসীরা

ফরাসী কৃষক যতদিন শক্তি থাকে আনন্দের সহিত কায করে

৪। ফরাসী মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান উদ্যমে চাষ করে

৫। ফরাসী মিতব্যয়িতার নমুনা—দুইটা গাধা রাখিলে খরচ বেশী হইবে তাই বলবান কুকুর পোষা হইয়াছে—ভার বেশী হইলে গাধার সঙ্গে সমানে মোট বহন করিবে

উপনিবেশ সংস্থাপনে (colonisation) অন্যান্য জাতির মত সফল হয় নাই।

যথার্থ ফ্রান্সের পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের ফ্রান্সের পল্লীগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ফরাসী পল্লীবাসীরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও ধর্ম্ম-ভীরু লোক। উপাসনার জন্য পরিবারের সকলেই নিয়মিত ভাবে গির্জ্জায় সমবেত হয়। সেই সময় তাহাদের পবিত্র মুখভাব, গাম্ভীর্য্য এবং সংযত আলাপ আলোচনা হইতে তাহাদের নৈতিক চরিত্রবল অনুমান করিতে পারা যায়। পল্লীবাসীরা অতিথি সৎকার করিতেও অত্যন্ত ভালবাসে। যে কোনও সময় অতিথি আসুক না কেন, ফরাসী পরিবার তাহাকে তৃপ্তির সহিত খাওয়াইতে যত্নবান হয়; ছোট ছোট সরাইখানায় প্রভু হইতে দাস দাসী সকলের মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। কাযে তাহাদের বিরক্তি নাই; শ্রমিকেরা—কি পুরুষ কি স্ত্রী, বয়স খুব বেশী হইলেও আনন্দের সঙ্গে কায করে। অবসর সময়ে তাহারা পরিবারের মধ্যে গল্পগুজব করিয়া কাটায়; Work and love তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখী হইবার মন্ত্র

৬। ফ্রান্সে কৃষক এবং গরীব লোকদের মধ্যে এইরকম কাঠের জুতার প্রচলন আছে

আমাদের দেশে যেমন বিবাহে জামাতাকে যৌতুক দিবার প্রথা আছে, ফ্রান্সেও সেই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল পাত্র মনোনীত করিবার পূর্ব্বে যৌতুক অর্থের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। আমাদের এদেশের ন্যায় ফ্রান্সেও পুত্র ও কন্যার বিবাহ পিতাই দেন। যে বিবাহে পিতা মাতার সম্মতি নাই সে বিবাহ আইন-সঙ্গত নয়। ইংরাজেরা কিন্তু এই পিতামাতার দেওয়া বিবাহের পক্ষপাতী নয়। তাহারা বলে, যেখানে পূর্ব্বে স্বাধীন ভাবে প্রেমের আদান প্রদান হয় নাই, সে বিবাহে সুখ নাই।

Fyfe সাহেব বলেন, "French married folks live together contentedly, but more often than not, without that warmth of affection, that steady glow lit from the flame of passion which marks a marriage founded upon mutual attraction and preference and not in any way contracted by money consideration."

পিতামাতার মনোনীত পাত্রকে কন্যা যখন অপছন্দ করে, তখন সেকথা সে মার কাছে স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলে। এই রকমই হওয়া উচিত, কারণ যে বিবাহ স্বাধীন ভাবে প্রেমের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে

ছেলে মেয়েদের অন্ততঃ পছন্দ অপছন্দ জানাইবার, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক পিতামাতারই দেওয়া উচিত।

ফরাসী পুরুষেরা যেভাবে তাহাদের স্ত্রীর উপর নির্ভর করে, ইংরেজদের সেরূপ নয়,—অর্থাৎ ফরাসী স্ত্রী স্বামীর যথার্থ সঙ্গী এবং বন্ধু, অবসর সময়ে শুধু যে সঙ্গদান করিয়াই স্বামীকে আনন্দ দেয় তা নয়, আবশ্যক হইলে সুযুক্তি ও সুপরামর্শও দেয়। এই জন্য ইংরাজদের ন্যায় ফরাসীরা বাড়ী ছাড়িয়া আড্ডায় যাইবার আবশ্যকতা বোধ করে না —অর্থাৎ club life জিনিষটা ফরাসীদের মধ্যে তেমন প্রচলিত নয়। ফরাসী স্ত্রী স্বামীর সকল কার্য্যই মনোযোগের সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করে। সকাল বেলা খবরের কাগজ পড়ে। খবর আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া

৭। মিতব্যয়ী কিন্তু পরিচ্ছন্ন ফরাসীবালা নিয়মমত নিজের ও পরিবারের কাপড় কাচে

৮। ফ্রান্সের ন্যায় জগতের কোথাও শ্রমশীল কৃষক দেখা যায় না; যে বয়সে লোকে কায করা অসম্ভব ভাবে, সে বয়সে শীতের বরফের মধ্যে কাঠ কুড়াইয়া বেড়াইতেছে।

সংসারের সকল বিষয়ই সে স্বামীর সঙ্গে সহজ ভাবে আলোচনা করে। স্বামীও কখনও নিজের স্বামিত্বের দাবী দেখাইয়া স্ত্রীর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেয় না। এই সব কারণেই বোধ হয় ফরাসী স্ত্রীলোকেরা খুব শিক্ষিতা দেখিতে পাওয়া যায়, আর এই সকল কারণেই ইংরাজ মহিলার অপেক্ষা মনের কথা গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা ফরাসী মহিলার বেশী আছে।

বিবাহের পুর্ব্বে মেয়েরা কি কি বই পড়িবে সে বিষয়ে পিতামাতারা খুব লক্ষ্য রাখেন; কোনও রকম উত্তেজক উপন্যাস বিবাহের পুর্ব্বে মেয়েদের পড়িতে দেওয়া হয় না; এইজন্য বিবাহিত জীবন

৯। ফরাসী জেলেনী—জাল ফেলিতেছে

১০। ফরাসী জেলে—জাল গুটাইতেছে
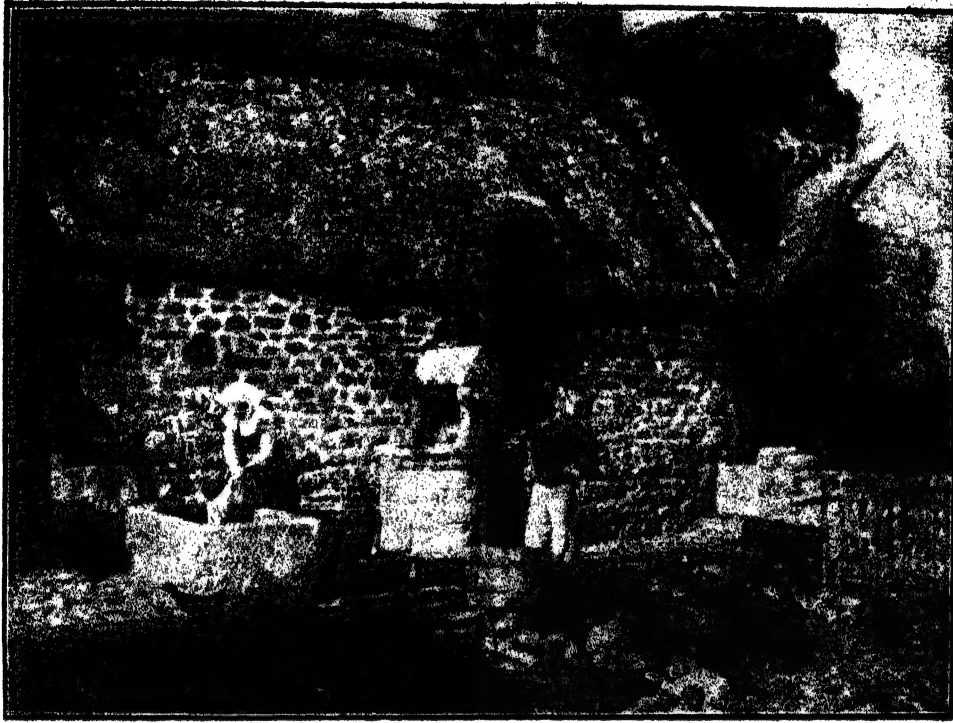
৬। চাষার কুটীর—শান্তি ও পরিচ্ছন্নতায় প্রতিমূর্ত্তি

সম্বন্ধে অসম্ভব আজগুবি কল্পনা তাহাদের মাথায় স্থান পায় না। বিবাহিত জীবন সুখে এবং শান্তিতে কাটাইয়া দিতে পারা জীবনের মধ্যে মস্ত বড় পরীক্ষা; এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিবার জন্য বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে দুই স্থানেই মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সব বিদ্যালয়ে সহজবিজ্ঞান ও গৃহস্থালীর কায খুব ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়; এবং তা ছাড়া মনকে উন্নত ও প্রসারিত করিবার জন্য দর্শন ও নীতিশাস্ত্র পর্য্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। বাস্তবিক যে জাতি মেয়েদের জন্য এরকম উদার শিক্ষানীতির ব্যবস্থা না করে, তাহাদের উন্নতি কেমন করিয়া হইবে বুঝতে পারা যায় না; কারণ ইঁহারাই পরে হইবেন জননী এবং পুত্রের মন ও চরিত্র গঠনের ভার প্রথমেই তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত হইবে।

শ্রীঅনিলকুমার বসু।

মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র

পূর্ব্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর,—অপর দিকে ভূ-মধ্যসাগর, এই দুইটি সুবিখ্যাত "তোয়-নিধির" অন্তর্বেদিরূপে যে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইউরোপীয় সভ্য-সমাজে "প্রাচী" নামে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রাচী নিকট এবং দূর নামক দুই ভাগে বিভক্ত,—যাহা নিকট, তাহার সহিত ভূ-মধ্যসাগরতীরের গ্রীস্ মিশর প্রভৃতি দেশের, এবং বহু সংখ্যক দ্বীপপুঞ্জের সম্বন্ধ এত নিকট যে, তাহাদিগকেও কেহ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

বর্ণনা করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়া, সকল কৌতূহল চরিতার্থ করিতে না পারিয়া, এখনও তথ্যানুসন্ধান চেষ্টায় বিরত হইতে পারে নাই। এখনও নিত্য নূতন অধ্যবসায়, নিত্য নতন তথ্যানু-সন্ধান চেষ্টায় অনেক নূতন স্থানে ভূগর্ভ খননে নানা রূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছে। ইহাতে পুরাতত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বপরিচিত সংকীর্ণ সীমা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়া, বিদ্বৎ-সমাজকে নিকট হইতে দূর প্রাচীর দিকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করি-তেছে। এখন প্রাচ্য তত্ত্ব মানবতত্ত্বের প্রধান পরিচয়-ক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র উত্তরোত্তর অধিক শ্রদ্ধা লাভ করি-তেছে।

ইহার ফলে নীলনদ-তটের অনন্ত বালুকাস্তর-নিহিত অতি পুরাতন সমাধির মধ্যে ইউরোপীয় বিদ্বৎ-সমাজ ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বকালবর্ত্তী স্মৃতি-চিহ্নের আবিষ্কার সাধন করিয়া, তাহা-কেই কিছু দিন পর্য্যন্ত মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন। এখন আর সে সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিতেছে না

কেহ "প্রাচ্য" সংজ্ঞা দান করিয়া থাকেন। যাহা "দূর প্রাচী" নামে উল্লিখিত, তাহার মধ্যেও বহু সংখ্যক দ্বীপ সন্নিবিষ্ট।

মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র কোথায়, তৎসম্বন্ধে মানব-সমাজ বহু কাল হইতে তথ্যানুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্য-সমাজ অনেক দিন পর্য্যন্ত রোম এবং গ্রীস্ এবং কখন কখন মিশর দেশকে সেই আদি উদ্ভব-ক্ষেত্র বলিয়া

এখন সকলের চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

ভারতবর্ষ একটি অতিবিস্তৃত মহাদেশ, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন দেশের একত্র সমাবেশে অসীম রহস্যের আধার হইয়া, এত কাল নীরবে কাল-যাপন করিতেছিল। তাহার অতি পুরাতন ভূস্তর-নিহিত পূর্ব্বতন কীর্ত্তি চিহ্ন অনাবিষ্কৃত এবং অনালোচিত থাকিয়া, প্রকৃত তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতে পারিত না।

তজ্জন্য ইয়োরোপীয়গণ ভারত-পুরাতত্ত্বের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক অলীক অনুমানের অবতারণা করিয়া আসিতেছিলেন; এবং কোনস্থলে অকস্মাৎ কোনও পুরা-কীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইলে, তাহার মূলানুসন্ধানের জন্য যথাযোগ্য আয়োজন না করিয়াই, তাহাকে হয় ব্যাবিলনের, না হয় মিশরের, না হয় গ্রীস্ রোমের, প্রভাবচিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিতেন। তথাপি কোন কোন মনীষী ভারত-স্থাপত্যের মধ্যে কোনপ্রকার পরপ্রভাবের চিহ্ন লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, ভারতবর্ষকে প্রহেলিকাময় মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে,—সিন্ধুপ্রবাহের তটভূমির পার্শ্বে,—কয়েকটি ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন জনপদের পরিত্যক্ত অজ্ঞাত ও অখ্যাত স্থানে কিছু কিছু অনুসন্ধান-চেষ্টা পরিচালিত হইবার পর, অল্পদিন হইল এক বিস্মৃত জনপদের গুপ্তদ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-পুরাতত্ত্ব বিভাগের বহুসংখ্যক সুদক্ষ কর্ম্মচারী তাহার মধ্যে খনন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, বহু পুরাতন অসংখ্য কীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত করিয়া, এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রধান অধ্যক্ষ খননবিদ্যাবিশারদ সার জন মার্শাল সেই সকল কীর্ত্তি-চিহ্ন সভ্য-সমাজের সম্মুখীন করিবার জন্য তিন খণ্ড সচিত্র বিবরণ-পুস্তক প্রকাশিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাহা অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। তৎপূর্ব্বে তিনি তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়া, সুধীসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এই দুইটি তথ্যানুসন্ধান-ক্ষেত্রের নাম এখন জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছে। একটির নাম মহেন্দোজারো, অপরটির নাম হরপ্পা,—দুইটিই পাঞ্জাব দেশের অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত। স্থলপথে এবং জলপথে এই দুইস্থানের সহিত ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত সকল দেশেরই নানাবিধ সম্বন্ধ ছিল। সেই সূত্রে ভারতবর্ষ হইতে মানব-সভ্যতার মূল সূত্র পশ্চিমাঞ্চলে সম্প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই প্রদেশটি যখন ভারতবর্ষের অন্তর্গত, তখন ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে ইহার কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, এপর্য্যন্ত তাহা যথাযোগ্যরূপে আলোচিত হয় নাই। যে তিনখণ্ড বিবরণ-পুস্তক প্রকাশিত হইতে যাইতেছে, তাহার সহিত এতদ্বিষয়ক আর এক খণ্ড গ্রন্থ সংকলিত করাইয়া প্রকাশিত করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ আকস্মিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। এখন যে সকল লোক-ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহার কিছু কিছু নিতান্ত আধুনিক কালে উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলেও, অধিকাংশ লোক-ব্যবহার যে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে কালস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সংশয় প্রকাশের কারণ নাই। তাহার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ-কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে, বর্ত্তমানের মধ্যেই চির পুরাতনের অনেক সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সে ভাবে আলোচনার সূত্রপাত করাইয়া, আরও একখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত করাইতে পারিলে, সার জন মার্শাল মহোদয়ের প্রশংসনীয় উদ্যম অধিক প্রশংসনীয় হইতে পারিত। ভারতবর্ষে অনেক পুরাতন লোক-ব্যবহারের বিধি নিষেধ-বিস্মৃত বা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পুরাতন সাহিত্য হইতে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তাহার সাহায্যে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বকালবর্ত্তী অজ্ঞাত অখ্যাত বহুযুগের মানব-সভ্যতার কিছু কিছু পরিচয় সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে।

দিবসের এক ভাগ ইতিহাসের এবং পুরাণের অনুশীলনে যাপন করিবার প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে,—ইতিহাস এবং পুরাণ দুইটি পৃথক্ বিষয় বলিয়া পরিচিত ছিল, নচেৎ পৃথক্ ভাবে দুইটি উল্লিখিত হইত না। উভয়ের মধ্যে একমাত্র সাদৃশ্য এই যে,—উভয়ের কথা-বস্তু পুরাতন।

ইতিহাসের কথা-বস্তু, "পূর্ব্ববৃত্ত-কথা।" ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের উপদেশ-সমন্বিত যে পূর্ব্ববৃত্ত কথা,

অথবা যে পূর্ব্ববৃত্ত কথাযুক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের উপদেশ-সমন্বিত বিষয়, তাহারই নাম "ইতিহাস" বলিয়া সুপরিচিত ছিল। তাহা সত্যঘটনামূলক পুরা-কাহিনীর আধার। পুরাণে ঠিক এইরূপ ধরা বাঁধা সত্য ঘটনা মূলক কথার উপর ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষের উপদেশ নির্ভর করে না। পুরাণ "পঞ্চলক্ষণ" গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এখন যাহা অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং অসংখ্য উপ-পুরাণ নামে প্রচলিত, তাহার মধ্যে পুরাতন পুরাণের নানা অংশ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা পুরাতন পুরাণের ন্যায় সকল বিষয়ে সম্যক্ "পঞ্চলক্ষণ" নহে। "পঞ্চলক্ষণ" পুরাণে থাকিত—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত ইত্যাদির কথা। সে কথা জনশ্রুতি মূলক চির-প্রচলিত পুরাতন কথা হইলেও, "পূর্ব্ববৃত্ত-কথা" বলিয়া পরিচিত ছিল না এইখানে পুরাণের এবং ইতিহাসের পার্থক্য থাকায় এবং উভয়ের মধ্যে লোকশিক্ষার উপাদান তুল্যভাবে নিহিত থাকায়, অতি পুরাকাল হইতে দুইটি বিষয়কেই পৃথক্ ভাবে অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল।

কালক্রমে অতি পুরাতন ব্যাপারে, একটির সঙ্গে আর একটির,— এক শ্রেণীর সহিত আর এক শ্রেণীর,— এক মতের সহিত আর এক মতের সংমিশ্রণে "অতি পুরাতন" নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যাহা ছিল না,—পরবর্ত্তিযুগে অভ্যুদিত হইয়াছিল,—তাহার সহিত যাহা ছিল, স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহার সহিত এক বিচিত্র সমন্বয় সাধিত হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য অনেক ঐতিহাসিক যুগের লোকব্যবহারের মধ্যে অতি "পুরাতন" কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহার সন্ধান লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

তথাপি তাহা যায় নাই, কিছুই যায় নাই, সমস্তই মিলিয়া মিশিয়া কালস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া, যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া, এখনও চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ভূগর্ভ খননে কোনও পুরাকীর্ত্তি-চিহ্ন [illegible]ত হইলে, তাহার কালনির্ণয়ের জন্য যে সকল মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ভর-যোগ্য হইতে পারে না। এই কারণে অনেক স্থানে অনেক অতি পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়া থাকিলেও, তাহার কালনির্ণয়ের যথাযোগ্য নৈপুণ্যের অভাবে, তাহাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এতকাল অপেক্ষাকৃত অল্পকালের কীর্ত্তি চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ভারত পুরাকীর্ত্তি যে সত্যসত্যই কত পুরাতন, তাহার সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। এতকালের পর সিন্ধুসৈকতের খননব্যাপারে তাঁহারা নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, ভারত-সভ্যতার অতিপ্রাচীনত্বে আস্থাবান্ হইয়াছেন; এবং কেহ কেহ ভারতভূমিকেই মানব-সভ্যতার আদি উদ্ভবক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিতেও অগ্রসর হইতেছেন। ধীরে, অতি ধীরে, এইরূপে সভ্য-সমাজে এক নূতন আলোকরেখা বিকীর্ণ হইয়া,ভারতভূমির অতীত গহন মধ্যে সমগ্র সভ্যসমাজকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। এখন ভারততত্ত্ব কেবল ভারততত্ত্ব বলিয়া সংকীর্ণভাবে বর্ণিত হইতেছে না। এখন তাহা মানব-তত্ত্বের সমুচ্চ পদবীতে সগৌরবে সমারূঢ়।

ইহার জন্য নূতন অনুসন্ধান চেষ্টা আরব্ধ হইতেছে,—নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে যাইতেছে,—নূতন সিদ্ধান্ত নূতন ভাবে সভ্যসমাজকে নূতনের মধ্যে পুরাতনত্বের সন্ধান প্রদান করিতেছে। এই চেষ্টা যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত হইলে, কেবল যে ভারতবর্ষের মুখ সমুজ্জ্বল হইবে তাহা নহে, সমগ্র মানব সভ্যতার মূল যে মানবতা তাহাও সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইবে। কারণ পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্নের মধ্যে যাহা পর্য্যাপ্তরূপে দেদীপ্যমান তাহা পাশবিক আচার ব্যবহারের ধ্যানধারণার এবং শিক্ষাদীক্ষার পরিচয়-বিজ্ঞাপক নহে; তাহা মানবতার শান্ত শীতল অভ্রান্ত নিদর্শন। আধুনিক সভ্যতার উচ্ছৃঙ্খল লীলাভূমি এখন যদি অকস্মাৎ কোনও অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপৎপাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ভূগর্ভ-নিহিত হইয়া পড়ে, এবং বহু যুগের অবসানে ভূগর্ভ খননে আবার তাহা যদি একে একে আবিষ্কৃত হইতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে বর্ত্তমান যুগের যে পরিচয় সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা

মানব-স্বভাব অপেক্ষা পশুর স্বভাবের পরিচয় দান করিয়া, একালের সভ্যতার প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া, একালকে মানব-গৌরবের সমুন্নত কাল বলিয়া বর্ণনা করিতে পারিবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ব্যর্থ আমন্ত্রণ

ধরণীর উপবনে বসন্তের ফুলন্ত যৌবন
এবারও আগের মত' আমারে পাঠালো নিমন্ত্রণ
চিরাভ্যস্ত প্রাচীন প্রথায়;
দক্ষিণের চন্দ্রমল্লীপল্লবপ্রচ্ছায়
অদেহী বিদেশী দূত কম্প্রকণ্ঠে হাঁকি' বারম্বার
পত্রখানি রেখে গেল তার—
সরস সঙ্কেতে ভরা বিচিত্র রঙীন গন্ধমাখা,
অলির অক্ষরে লেখা—যৌবনের জয়চিহ্ন আঁকা

লিপিমুখে শুনিলাম উৎসবের কথা—
অখিলের ধ্যানভঙ্গে কোকিলের প্রগল্‌ভ বারতা;
মুখরিত মত্ত দধিয়াল
শুনিলাম, তারি সাথে শিসে নাকি মিলাইবে তাল;
মৃদুমন্দ মন্ত্রভরা মলয়ের বাঁশী
মঞ্জরিত বল্লরীর নৃত্যখানি সভাতলে তুলিবে উদ্ভাসি';
মধুকর পরাইবে পরাগের টীপ,
পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে জ্বলিবে আরক্ত সন্ধ্যাদীপ!

এবারে হবেনা কিন্তু যাওয়া;
ঘরের দুর্য্যোগে আজি নিরর্থক দক্ষিণের হাওয়া!
অন্তরের অন্তরালতলে
শ্রাবণ কাঁদিছে কোথা এলাইয়া আকুল কুন্তলে!
তাই আজি বসন্তের আমন্ত্রণভার
তারি সে চোখের জলে নিতান্ত হ'লনা রাখা আর।

তবু, হায়, ব্যর্থ হ'ল সব—
এ মোর অন্তরতলে মুদিত যে মাধবী উৎসব—
ঝরে' গেছে ফুল,
এবারের আমন্ত্রণে বসন্তের হ'ল তাই ভুল!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

(Tolsty প্রণীত Resurrectiou উপন্যাস অবলম্বনে)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক—সাগরে গিয়া কুড়াইয়া পাওয়া মেয়েটির নাম রাখা হইয়াছিল সাগরিকা। আশ্রয়দাত্রী ধনী বিধবা দেওঘরে "দেবনিবাস" নামক গৃহে বাস করিতেন। তাঁহার আত্মীয় দেবকুমার, কলেজের ছুটিতে দেওঘরে আসিয়া, নব যুবতী সাগরিকার সর্ব্বনাশ করিয়া যায়। সাগরিকার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া, তাহার আশ্রয়দাত্রী তাহাকে তাড়াইয়া দেন। সাগরিকা নানা অবস্থান্তরের পর, কলিকাতায় আসিয়া পারুল নাম গ্রহণে ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে করিতে কয়েক বৎসর পর একটা খুনের দায়ে পড়িয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আজ্ঞা পাইয়াছে—যদিও সে বাস্তবিক নির্দ্দোষ। ঘটনাক্রমে দেবকুমার সে মোকর্দ্দমায় একজন জুরর ছিল—সেও অন্যান্য জুররগণের সহিত, পারুলকে দোষী বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছিল। ইহার পর দেবকুমারের মনে

অত্যন্ত অনুশোচনা উপস্থিত হয়। সাগরিকার এই অবস্থার জন্য সে নিজেই দায়ী, এই স্থির করিয়া, যদি সম্ভব হয় তবে সাগরিকাকে উদ্ধার করিবে, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে ইহাই সংকল্প করিয়াছে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সে আপীল করাইয়াছে, মাঝে মাঝে জেলে গিয়া সাগরিকা ওরফে পারুলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে। আপিলে সাগরিকার মুক্তি হইলে তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবও সে সাগরিকার নিকট করিয়াছে, কিন্তু সাগরিকা সম্মত হয় নাই। দেবকুমার বিশেষ চেষ্টা করিয়া, জেলের হাঁসপাতালে সাগরিকাকে নার্স করিয়া দিয়াছে।]

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

হাইকোর্টে সাগরিকার আপিল উঠিবার তখনো বিলম্ব ছিল। দেবকুমার ভাবিল, যদি দণ্ডটা বহালই থাকে তবে সাগরিকাকে দ্বীপান্তরে যাইতেই হইবে,—দেবকুমারও দণ্ড ভোগ করিবার জন্য যাইবে। নিজের জমিদারীর একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক মনে করিয়া দেবকুমার তাই কলিকাতা হইতে যাত্রা করিল।

হুগলী এবং হাবড়া জেলায় দেবকুমারের পিতার অনেক ভূ-সম্পত্তি ছিল। একটা কাছারি-বাড়ীতে যাইয়া দুই একদিনের মধ্যেই দেবকুমার বুঝিতে পারিল যে, সে কেহই নহে—তাহার নায়েব শ্রীধর ঘোষই প্রকৃতপক্ষে জমীদার। প্রজারা দেবকুমারের ন্যায্য কথাটাকেও বিশ্বাস করিতে সাহস করে না, অথচ নায়েবের অন্যায় প্রস্তাবটাও মাথা পাতিয়া নেয়! প্রথমে দেবকুমার মনে করিল যে নায়েবের সদয় ব্যবহারই ইহার কারণ। তাহারা ত দেবকুমারকে কখনো দেখে না, দেখে নায়েবকে। তাহাদের সুখ-দুঃখের কথার সঙ্গে নায়েবের দয়া ও সহানুভূতি বুঝি এতই নিবিড় ভাবে জড়িত যে প্রজারা তাহাকে মা-বাপ বলিয়া জানে।

দুই তিন দিনের মধ্যেই দেবকুমার বুঝিতে পারিল যে সে ভুল বুঝিয়াছে। দেবকুমার ত দুই দিনের উড়ো-পাখী, কিন্তু নায়েব শ্রীধর ঘোষই প্রজাদের সত্য ও সনাতন প্রভু! সে প্রভুকে না মানিলে অকস্মাৎ ঘর জ্বলিতেও বিলম্ব হয় না, আসামী হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতেও সময় লাগে না!

প্রজাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে নায়েবকে উপদেশ দিয়া দেবকুমার পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের নিরিখ অপেক্ষা অনেক কমে খাজানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। ব্যাপারটা নূতন দেখিয়া প্রজারা মনে করিল, জমীদার কি কখনো বিনা মতলবে এমন করিতেছেন? এ নিশ্চয়ই একখানা মিছরির ছুরি! বৃদ্ধ নায়েব শ্রীধর ঘোষ—ঠিক পাকা আমটীর মত! দেবকুমারের কাণ্ড দেখিয়া দুই একটি গোমস্তাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখছ না, বাবুর মাথা খারাপ হয়েছে—ও সব কথা ধোরো না। যেমন আদায় করতে তাই করবে। এতদিন সরকারের নুন খেয়েছি, এ বুড়ো বয়সে কি জমীদারীটা লুটের মাল করে' দিতে পারি!"

দেবকুমার যে কয়দিন কাছারি-বাড়ীতে রহিল, সে কয়দিন গ্রামে গ্রামে প্রজাদের বৈঠক বসিল। শেষে তাহারা স্থির করিল, খাজনা যখন কমিয়া গেল তখন লাভ ত হাতে হাতেই। দেখাই যাক্ না কি হয়। কয়েকদিন পর তহশিলে বাহির হইয়াই রামচরণ গোমস্তা বুঝিতে পারিল, প্রজা দল বাঁধিলে লাঠির জোরে কায হাসিল হয় না। নায়েব শ্রীধর ঘোষ মাথার পাকা চুল টানিতে টানিতে বলিলেন, "আর এখানে চলে না—এখন শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়াই সঙ্গত!"

কাছারি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দেবকুমার আর কলিকাতায় গেল না, একেবারে, দেওঘরে আসিল। "দেবনিবাস" বাড়ীখানা সে পাইয়াছিল। উহা রাখা আর আবশ্যক বোধ করিল না। ভাবিল, দেশের বেশীর ভাগ লোকের সঙ্গে মাথায় মাথায় এক থাকিতে না পারিলে তাহাদের সুখ-দুঃখ সে বুঝিবে কিরূপে? সে যদি বড় লোকই থাকিয়া যায় তাহা হইলে দরিদ্র যাহারা তাহারা কোন্ সাহসে তাহার কাছে আসিবে, কোন্ আশায় তাহাদের প্রাণের কথা অকপটে কহিবে?

"দেবনিবাসে" আসিতেই দেবকুমারের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার সুখের দিনও সেইখানেই

কাটিয়াছে, তাহার দুঃখের দিনেরও আরম্ভ সেইখানেই। দেবনিবাস তাই ছিল দেবকুমারের স্বর্গ এবং দেবকুমারের নরক! সেই উদ্যান, সেই কক্ষ, সেই পাগলা ঝোরা, সেই ইউক্যালিপটাস গাছের সারি—সবই যেন দেবকুমারকে দেখিয়া সহসা জীবন পাইল—সকলেই যেন ইঙ্গিত করিয়া দেখাইতে লাগিল, এই যে সেই দেবকুমার, যে এখানে মূল্য দিয়া প্রেম কিনিয়াছিল!

সেই দিন রাত্রে আলমারি হইতে কাগজ পত্র পড়িতে পড়িতে দেবকুমার দেখিল এক কোণে একখানি ফটোগ্রাফ পড়িয়া আছে। কান্তমণি, কুমুদিনী, সাগরিকা ও দেবকুমার একত্রে বসিয়া দেবনিবাসের বাগানে সেই ছবি তোলাইয়াছিল। সে কি আজিকার কথা! দেবকুমার তখন কলেজের ছাত্র, সাগরিকা তখন ছিল দেবপূজার অনাঘ্রাত কুসুম। দেবকুমার তখন সাগরকে ভালবাসিত, সাগরিকাও তখন দেবকুমারকে ভালবাসিত—কিন্তু কেহই জানিত না যে ভালবাসিয়াছে। জীবন দিলেও কি আর সে দিন ফিরিবে? দেবকুমারের চোখে জল আসিল। সে ভাবিতে লাগিল—যদি ওইখানেই সে ভালবাসার শেষ হইত! অগ্নি জ্বালিয়া দেবকুমার পুরাতন কাগজ-পত্রগুলি পোড়াইয়া ফেলিল। সাগরের রামায়ণ খানা যখন জ্বলিতে লাগিল, দেবকুমারের মনে হইল যেন তাহারই হৃৎপিণ্ড জ্বলিতেছে।

সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, রহিল শুধু সেই পীতাভ ফটোগ্রাফখানি। উহাও দগ্ধ করিবার জন্য দেবকুমার কুড়াইয়া লইল। দেখিল, ছবিগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন্‌টি যে কে তাহা তখনো চিনিতে পারা যায়। দেবকুমার ফটোগ্রাফখানা পকেটে রাখিয়া দিল, পোড়াইল না।

কয়েকদিন পর বাবু পান্নালাল-মতিলাল মধুপুর হইতে আসিয়া দেবনিবাসের মালিক হইয়া বসিলেন। দেবকুমার যদি কিছু দিন অপেক্ষা করিত তাহা হইলে হয়ত চতুর্গুণ দামে দেবনিবাস বিকাইত, কিন্তু কলিকাতায় তখনো দেবকুমারের অনেক কায বাকি ছিল, সে তাই আর দেরি করিতে পারিল না, জলের দামে দেবনিবাস বিক্রয় করিল।

এবার আর গাড়ীতে নয়, দেবকুমার পায়ে হাঁটিয়াই বম্পাসটাউন হইতে জসিডি চলিল। যাইবার সময় দেবনিবাসের দিকে সে যখন শেষবার চাহিল, তখন তাহার মনে হইল—যাক্ একটা ভার কমিয়া গেল! পথিক চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পায় দূর গ্রামের কুটীরে অপরিম্লান দীপশিখা জ্বলিতেছে, যাত্রাপথ ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া সে যেমন তখন পুলকিত হয়,—ভারমুক্ত দেবকুমারের হৃদয়েও আজ সেই পুলক জাগিয়া

সন্ধ্যার সময় যখন দেবকুমার হাওড়া ষ্টেসনে নামিল, তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, ষ্টেশনের আলোকগুলি তাহার দিকে ভ্রুকুটি করিয়া নাই, তাহাকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছে। সমস্ত দিনটা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে থাকিয়া দেবকুমার তাহাদের সুখ-দুঃখের নানা কথাই শুনিয়াছিল। সে উহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছিল যে ভগবানের বিচার নাই! নতুবা, উহারা ক্ষুধায় জ্বলে, ম্যালেরিয়ায় মরে, জল বলিয়া পানা-পুকুরের বিষ খায়—আর উহাদেরই শোণিতে-রাঙ্গা ধান-পাট, বড়লোকের প্রীতিভোজ যোগায়, তাহাদের দ্বিতল, ত্রিতল, চতুস্তল গৃহের কক্ষে কক্ষে বিদ্যুতের শিখা জ্বালায়—পাখা ঘুরায়—প্রমোদ উদ্যানে বিলাসের ব্যয় বহন করে! নিজের জমীদারীর মধ্যেও নানা গ্রামে ঘুরিয়া দেবকুমার দারিদ্র্যের, দুর্দ্দশার ও দুঃখের যে সকল ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছিল—সেদিন ট্রেণের মধ্যে সে সমস্তই একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়াও সেই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে দেবকুমার কখন যে তাহার সাজ সজ্জাহীন ছোট ঘরটিতে নিতান্ত দীনের মত ঘুমাইয়া পড়িল তাহা বুঝিতে পারিল না।

পরদিন প্রভাতেই দেবকুমার নিজের জন্য ছোট একখানি বাসা ভাড়া করিয়া আসিল। বালিগঞ্জের অত বড় বাড়ীটায় তাহার যে আর কোনো প্রয়োজন আছে তাহা সে বিশ্বাস করিল না। দেবকুমারকে নূতন

বাসায় যাইতে দেখিয়া তাহার দাই-মা কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ভাবিল, মিস্ বেলা শেষে মিষ্টার দাশকে বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় দেবকুমারের এই বৈরাগ্য! বেলার মা দেবকুমারকে আঘাত করিবার জন্ম একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে ভুলেন নাই। পত্রখানা দেবকুমারের আপিস-ঘরের টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল। খামের উপর বেলার মার হস্তাক্ষর দেখিয়া দেবকুমার উহা স্পর্শও করে নাই। দাই-মা দেবকুমারের বারণ মানিল না। তাহার দেবুকে ফেলিয়া সে-কি আর বালিগঞ্জের শ্মশানে থাকিতে পারে!

প্রভাতে নূতন বাড়ীতে যাইবার সময় দেবকুমার দেখিল, কলিকাতার ফুটপাথরের উপর কত দরিদ্র রাত্রি কাটাইতেছে, বড়লোকের বাড়ীর সিঁড়ির নীচে কত লোকের স্থান। কত মজুর মাথার কাছে ঝাঁকাটা ফেলিয়া ফুটপাথের গাছের নীচে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে। মানুষ যে এমনি করিয়া দিনের পর দিন জীবন কাটায় দেবকুমার যখন আপন চক্ষে তাহা দেখিল, তখন তাহার হৃৎপিণ্ডটা বেগে ধড়ফড় করিতে লাগিল। গাড়ীখানা একটা গলির মোড় ঘুরিতেই দেবকুমার দেখিল, এমন একটা একটা বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে যে ঘাড় ভাঙ্গিয়া উপরে চাহিলে তবে তাহার চুড়া দেখা যায়। অত উচ্চে ভারা বাঁধিয়া মজুরেরা প্রাণ হাতে করিয়া খাটিতেছিল। সমস্ত রাত্রিই যে কায চলিয়াছে তাহার পরিচয় স্বরূপ তখনো সেখানে কয়েকটা তীব্র বৈদ্যুতিক আলো ম্লান হইয়া জ্বলিতেছিল। যাহারা তখনো কায করিতেছিল, অনিদ্রায় ও শ্রমে তাহাদের চক্ষু কোটরে গিয়াছে, দেহ শিথিল হইয়াছে। তাহারা যে নড়িতেছে যেন কলের পুতুল!

দেবকুমার ভাবিতে লাগিল—অর্থের কি বিপুল অপব্যবহার! বেচারিরা প্রাণপাত করিয়া যাহার জন্ম এই প্রাসাদ গড়িতেছে, সে হয়ত একজন রাজা বা জমীদার। এই বিপুলকায় ইমারতের প্রত্যেকখানা ইটকে ভিজাইবার জন্ম সে ইহাদেরই শোণিত শোষণ করিয়াছে! এই প্রাসাদে যেদিন ব্যসনের বাঁশী বাজিবে তাহার পূর্ব্বেই ইহাদের অনেকেই রোগে বা ক্ষুধায় ইহ জগৎ হইতে বিদায় লইবে। অথচ গ্রাম ছাড়িয়া, লাঙ্গল ফেলিয়া কত লোক যে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে, কে তাহা গণনা করে?

দেবকুমার ব্যথিত চিত্তে তাহার গাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাষ না করে' এত লোক মজুরি করতে আসে কেন? এখানে যত পরিশ্রম হয়, জমীতে তা' দিলে ত সোণা ফলে! ছেলে-মেয়েরাও খেয়ে বাঁচে।"

গাড়োয়ান এই প্রশ্নটা শুনিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ভাবিল, বাবু দেখছি দেশের খবরই রাখে না। প্রকাশ্যে বলিল, "গ্রামে কি আর জমী আছে বাবু, যে লোকে চাষ করবে? এই ত আমার পাঁচ বিঘা জমী ছিল, মহাজন আর জমীদার শোধ করতেই শেষ হল। কি আর করি, এখানে এসে গাড়োয়ানী করি। রাত্রে এই গাড়ীর মধ্যেই শুই, আর দিনের বেলা দু'চার পয়সা যা হয় কিনে মুখে দিই। আমার ছেলেপুলে নেই বাবু। একটা বাচ্চা ছিল, কালাজ্বরে নিয়েছে। পরিবার আছে—মহাজনের ধান ভানে। তাই টাকার সুদটা শেষ হয়। আসলের জন্যে রোজই তাগাদা—রোজই তাগাদা। বলে গাড়ীখানাই নিলেমে তুলবে।"

একটা ঘায়ের উপর হাত দিলে যেমন লাগে, কথাটা দেবকুমারেরও তেমনি লাগিল। লোকে মনে করে, ঘা আছে বলিয়াই স্পর্শটা ব্যথা দেয়। কিন্তু তাহা নহে। ব্যথা যেখানে, পরশটা সেইখানেই বাজে।

দেবকুমার যখন গাড়ী হইতে নামিল, তখন গাড়োয়ানকে ভাড়াও দিল এবং তাহার মহাজনের ঋণও শোধ করিয়া দিল।

এই অপ্রত্যাশিত কৃপায় গাড়োয়ান যুক্তকরে আকাশের দিকে চাহিল এবং হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন দেবকুমার সাগরিকাকে দেখিতে গেল। বড় বাবু প্রথমে তাহাকে চিনিতেই পারিলেন না। কারণ

আজ ত আর তাহার আগেকার মত পোষাক পরিচ্ছদ ছিল না। দেবকুমার সামলা ছাড়িয়া সেদিন একজন সাধারণ দরিদ্র ভদ্রলোকের মত জেলখানায় গিয়াছিল। দেবকুমার যেদিনই আসিত, সেই দিনই জেলর বাবুকে কিছু না কিছু উপঢৌকন দিত—হয় ফুল, না হয় ফল, না হয় আর কিছু। বড় বাবু ফুলের তোড়াটি হাতে লইয়া দেবকুমারের দিকে বিস্ময়পূর্ণ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। শেষে ভাবিলেন, বড় লোকের নানা খেয়াল—এও বুঝি তাহারই একটা।

বড় বাবু বলিলেন, "পারুল এখন হাঁসপাতালে নার্স। বুড়ো ডাক্তার ত প্রথমে নিতেই চায় না, বলে জানা শুনা লোক না হলে রোগীর সেবা চলে না। হিরণ বাবু জেদ করতে লাগলেন বলেই হলো; জেলখানায় এবার অসুখ বিসুখও বেশী, নার্স না বাড়ালে চলে না।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "হিরণ বাবু কে?"

"আমাদের জুনিয়র ডাক্তার। ছোকরা বটে, কিন্তু ভারি চটপটে। পায়ে যেন দুখানা পাখা বাঁধা। এই এখানে ত এই সেখানে। যান্ না এই ওয়ার্ডারের সঙ্গে। সেখানে পারুলকেও দেখতে পাবেন, হিরণ বাবুর সঙ্গেও পরিচয় হবে।"

দেবকুমার ধন্যবাদ জানাইয়া ওয়ার্ডারের সঙ্গে প্রস্থান করিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই নূতন পরিবেষের মধ্যে না জানি সাগরকে আজ কেমন দেখিবে।

হিরণ বাবুকে চিনিয়া লইতে দেবকুমারের মুহূর্ত্তমাত্র লাগিল। যখন সে দেখিল কোট প্যান্টালুন পরা একটি যুবক ধোপদস্ত কামিজের হাত গুটাইয়া এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, এবং প্রতিপদক্ষেপে কার্ব্বলিক এসিডের গন্ধ ছড়াইতেছে, তখনই সে বুঝিল ইনিই জেল হাঁসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার হিরণকুমার।

সকলেই জানিত হিরণ বাবু বড় কড়া লোক—তাঁহার কাছে মুড়ী মিছরির একই দর। দরিদ্রবেশধারী দেবকুমারকে তিনি গ্রাহ্যই করিলেন না। ভাবিলেন ইহার কোন আত্মীয় হয়ত অসুখে পড়িয়া হাঁসপাতালে আসিয়াছে, ইনি তাহারই কিছু একটা সুবিধা করিতে আসিয়াছেন। হিরণ বাবু দেবকুমারের পাশ দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যাহা হউক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, যে ওয়ার্ডার দেবকুমারকে সঙ্গে আনিয়াছিল তাহারই অনুগ্রহে হিরণ বাবুর সঙ্গে দেবকুমারের দেখা হইল। তিনি যখন শুনিলেন দেবকুমার বড় বাবুর লোক তখন তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাগরকে সেইখানে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "এটা ত কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার সময় নয়। নার্সদের এখন অবসর কৈ?"

দেবকুমার বিনয়নম্র বচনে কহিল যে সেটা তাহার জানা ছিল না। যদি সুবিধা না হয় তাহা হইলে সে তখনকার মত চলিয়া যাইতেও প্রস্তুত আছে, ভবিষ্যতে নিয়মিত সময়ে আসিবে।

কথাটা শুনিয়া ডাক্তার বাবু একবার দেবকুমারের আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন। কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু থামিয়া গেলেন। মনে পড়িল আগন্তুক জেলখানার বড় বাবুর লোক। অমনি হাস্যমুখে বলিল, "না না—আপনার কথা বল্‌ছিনে। আপনি বড়বাবুর লোক—আপনার দ্বার ত অবারিত।"

বড় লোকের উচ্ছৃঙ্খল সন্তান দেবকুমার—তাহার উপর আবার বিলাত ফেরত এবং শিক্ষিত। আগে সে কখনো প্রতিবাদ সহিতে জানিত না। পান হইতে চুণ খসিলেই সে মনে করিত তাহার অসম্মান হইল—আভিজাত্যের গৌরবটা বুঝি ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু যেদিন হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে নানাস্থানে বিশেষতঃ জেলখানায় অনেক আঘাত পাইয়া দেবকুমার বুঝিতে শিখিয়াছিল যে, মান আদায় করা চলে না, উহা অর্জ্জন করিতে হয়।

সাগরিকার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া দেবকুমার হিরণ বাবুর সঙ্গে নানা কথা আরম্ভ করিল এবং জানিতে পারিল যে তাহার বন্ধু অমর ডাক্তার হিরণ বাবুর সহপাঠী ও বন্ধু। অমর ডাক্তারের নাম হইতেই হিরণ বাবু দেবকুমারকে একটু খাতির করিল। কহিল, অমর

কলিকাতায় আসিলে তাহার বাড়ীতেই থাকে। সে এখন ছুটিতে আছে। ছুটীর পর পোর্টব্লেয়ারে ডাক্তার হইয়া যাইবে।

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এ নূতন নার্স কায করছে কেমন ?"

হিরণবাবু বলিলেন, "বেশ চালাক চতুর। একবারের বেশী দু'বার দেখিয়ে দিতে হয় না। রোগীর সেবা করতে আদৌ বিরক্তি নেই। তবে বুঝতেই ত পারছেন এরা কি চরিত্রের স্ত্রীলোক। ওদের মনে যে দয়ামমতা আছে এই ঢের। আপনিই বুঝি ওর জন্য আপিল করেছেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ। আমি জানি সে নির্দ্দোষী।"

অবিশ্বাসের সুরে হিরণ বাবু বলিলেন, "তা হয় ত হবে। দেখুন আপিলে কি হয়।"

একজন বৃদ্ধা নার্স তখনই একখানা লাল টিকেট আঁটা কাগজ আনিয়া হিরণ বাবুর হাতে দিল। হিরণ বাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "বসুন আপনি। পারুল এখনই আসবে। আমার কি আর মরবার সময় আছে ? এই দেখুন না একটা লোকের নাকি হার্ট ফেল হচ্ছে। যাই দেখি গে।"

হিরণ বাবু টক্ টক্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। দেবকুমার একাকী বসিয়া রহিল।

দূর হইতে দেবকুমারকে দেখিয়াই সাগরিকার মুখের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, দেবকুমারের কাছে আসিবে কি না তাহাই একবার ভাবিয়া লইল। পরমুহূর্ত্তেই মাথা তুলিয়া দেবকুমার যখন চাহিল, তখন দেখিতে পাইল সাগরের মুখে বিরক্তি ও ...

দেবকুমারের নিকটে আসিয়া সাগরিকা নতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দেবকুমারকে রূঢ় কথা বলিবার জন্য সাগরিকা যেদিন তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিল, সেদিন সে তাহাকে যেমন দেখিয়াছিল, আজ আর তেমন দেখিতে পাইল না। কি একটা সঙ্কোচ, কি একটা গাম্ভীর্য্য, কি একটা প্রত্যাখ্যানের ভাব যে সাগরের মুখে সুস্পষ্ট হইয়াছে তাহা দেবকুমারের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দেবকুমার কহিল, "আমি সেওয়ায়ে গিয়েছিলাম। পুরাণো এই ছবিখানা আলমারির মধ্যে পেয়েছি। দেখ দেখি চিনতে পার কি না।"

সাগরিকা ছবিখানা লইয়া একবার দেখিল এবং পরক্ষণেই কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে লুকাইয়া দেবকুমারের মুখের দিকে এমন ভাবে চাহিল—যেন বলিল, "এ ছবি আর এনেছ কেন ?"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁসপাতালে তোমার কেমন লাগছে ?"

"মন্দ কি ? এই একরকম চলে যাচ্ছে।"

"এ কায বোধ হয় বেশী কঠিন নয় ?"

"না, কঠিন আর কি ? আমি এখনো সব শিখে নিতে পারি নি।"

দেবকুমার কহিল, "এখানে যে তোমায় আনতে পেরেছি এতেই আমি খুসি। সেখানের চেয়ে হাঁসপাতাল অনেক ভাল।"

সাগরিকা বলিল, "সেখানের ? কোথাকার ?" তাহার মুখে উত্তেজনার ভাব দেখা গেল।

দেবকুমার তাড়াতাড়ি বলিল, "জেলখানার সেই ডিগ্রির কথা বলছিলাম।"

"ডিগ্রির চেয়ে এখানে ভাল কিসে ?"

"আমার মনে হয় এখানে সেখানকার মত অত খারাপ লোক নেই।"

তীব্র কণ্ঠে সাগর বলিল, "সেখানেও অনেক ভাল লোক আছে। বুড়ীর কিছু করতে পেরেছ ?"

"এখনো হুকুম আসে নি। শুনেছি বুড়ী আর তার ছেলে মুক্তি পাবে।"

সাগরিকার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমি ঠিক জানি ধর্ম্ম আছে।"

"আমাদের আপিল কাল হাইকোর্টে উঠবে। ব্যারিষ্টার সাহেব ত খুব ভরসা দিচ্ছেন; বলছেন জজের হুকুম ফিরবেই ফিরবে।"

শান্তকণ্ঠে সাগর বলিল, "ফিরুক আর না ফিরুক তাতে আর এখন কিছু আসে যায় না।"

"এখন আসে যায় না বলছ, তার মানে কি?"

সাগরিকা শুধু বলিল—"হুঁ"। কিন্তু সেই একটি হুঁ এবং তাহার তত্ত্বজিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেবকুমারকে বুঝাইয়া দিল যে, সাগর জানিতে চায়, এখনো দেবকুমার তাহার সঙ্কল্পটা ধরিয়াই আছে, না সাগরের রূঢ় প্রত্যাখ্যানই শেষ মীমাংসা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে।

ব্যথিত চিত্তে দেবকুমার কহিল, "হুকুমটা ফিরুক বা না ফিরুক, তাতে যে এখন আর তোমার আসে যায় না কেন, তা' জানিনে। তবে আমার নিজের মনের কথা বলতে পারি। তুমি মুক্তই হও আর আন্দামানেই যাও—আমার পক্ষে সবই সমান। আমি যা' বলেছি, সকল সময়েই আমি তা' করতে প্রস্তুত। তুমি যদি রাজি হও, আমি তোমায় বিয়ে করবো।"

সাগরিকা এবার মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষু দুইটা যেন দেবকুমারের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। সাগরিকার মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখে যাহা বলিল, তাহা ঠিক বিপরীত। সে কহিল, "ও কথা আর তুলে' কায নেই।"

"আমি তুলেছি কেন জান? আমার পণটা তোমার আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে।"

একটী মৃদু হাস্যকে বিশেষ চেষ্টায় চাপা দিয়া সাগর বলিল, "যা' কিছু বলবার ছিল, বিয়ের কথায় ত সবই বলেছ। আবার কেন?"

হঠাৎ উপরতলায় ঝিন্ ঝিন্ করিয়া একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং একটি শিশুর রোদনধ্বনি শুনা গেল। সাগরিকা ব্যস্তভাবে বলিল, "ঐ উপরে ডাক পড়েছে। আমি তবে এখন যাই। একটা মেয়ে কয়েদী এক বছরের রোগা ছেলে রেখে কাল মরে' গেছে। আমি এখন তার মা। ছেলেটা আমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকে না।"

সাগরিকা আর দাঁড়াইল না। তাহার হৃদয় আজ আনন্দে নাচিতেছিল। সেই আনন্দটাকে যথাসাধ্য লুকাইয়া সে ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিল।

[illegible] পরিচ্ছেদ

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতে যাইতে দেবকুমার ভাবিতে লাগিল, সাগরিকার মনের ভিতর কি আছে? আমায় কি সে পরীক্ষা করছে? না, কিছুতেই আমায় ক্ষমা করতে পারচে না? কে জানে তার মনের কথা কোনো দিনও জান্‌তে পারব কি না।—দেবকুমার যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বিশ্বাস হইল যে সাগরের মনের ভিতর নিশ্চয়ই একটা উলট-পালট হইয়াছে। সেই আকস্মিক পরিবর্ত্তনটা যদি বা সাগরকে আর দেবকুমারের দিকে টানিয়া না-ই আনে, কিন্তু উহা নিশ্চয়ই তাহাকে ভগবানের করুণার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। দেবকুমার মনে মনে প্রফুল্ল হইল।

উপরে যাইয়া সাগরিকা পরম যত্নে মাতৃ-হারা রুগ্ন শিশুকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তাহাকে স্নেহ-চুম্বনে শান্ত করিতে করিতে দেখিল, শিশু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। সাগরের অন্তরেও তখন হাসির তরঙ্গ খেলিতেছিল। সে আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না! হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিও চোখের জলের মতই সংক্রামক। সাগরকে হাসিতে দেখিয়া দুই একজন রোগী বিনা কারণেই হাসিয়া উঠিল। প্রধান নার্স ধমক দিয়া কহিল, "অত হাস্‌তে হয় ত বাইরে যাও। এটা হাসবার যায়গা নয়। এ কি তোমার বাপ-বাগানের বাড়ী? যাও—এদের বার্লি-সাবুটা নিয়ে এস।"

কথাটার বড় ঝাঁঝ ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য সাগরিকার মুখ কালো হইয়া উঠিল। রোগীদের পথ্য আনিবার জন্য রান্না-ঘরে গিয়া সাগরিকা সাবধানে ফটোগ্রাফখানা বাহির করিয়া বার বার দেখিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়াও তাহার আশা মিটিল না। চোরের মত চারিদিক চাহিয়া, সাগর সেই পীতাভ ছবিখানি এক একবার বাহির করিতে লাগিল, আবার ভয়ে ভয়ে লুকাইল।

সাগরের দিনটা বড় উদ্বেগে কাটিয়া গেল। রোগী-দের ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার অবসর সে পাইল না।

সন্ধ্যার সময় সে যখন শুইতে গেল, তখন ঘরের আলোর নীচে দাঁড়াইয়া সাগরিকা এক মনে ছবিখানি দেখিতে লাগিল। এ যে দেবকুমারের ছবি। এক পাশে কুমুদিনী আর এক পাশে জপের মালা হাতে কান্তমণি। আর সম্মুখে সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া সাগরিকা নিজে। পশ্চাতে দেবনিবাসের উদ্যান, সেই পুষ্পিত লতার কুঞ্জ আর তাহারই পাশে ইউকালিপটাস গাছের সারি। সাগরিকা যেন সেই পাগলা ঝোরাটার উন্মত্ত কলরব শুনিতে পাইল। পতনোন্মুখ দেবকুমারকে ধরিয়া তুলিবার জন্ম সে যে হাত বাড়াইয়াছিল, তাহার প্রথম যৌবনের সেই কথা আজ আবার সহসা মনে পড়িয়া গেল। সাগরিকার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

সাগরিকা এমনি তন্ময় হইয়া ছবির দিকে চাহিয়া ছিল যে আর একজন নার্স তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা জানিতেও পারিল না।

নার্স কহিল, "ও ছবিখানা কার ভাই?"

সাগর বিদ্যুৎশিখার মত ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা। নার্স তখন ছবির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "এ কে লো? এ যে তোরই ছবি পারুল?"

সাগর একটু হাসিয়া বলিল, "তা নয়ত কি?"

"বাঃ, তখন তোর চেহারা এত সুন্দর ছিল? দেখি দেখি। ঠিক যেন একটি আধ-ফোটা ফুল। এখন আর ও-মুখের এতটুকুও নেই। তা' আর হবে না? দশ বারো বছর কি কম কথা!"

"বছর নয় ভাই, বছর নয়। তারপর একটা জন্ম কেটে গেছে।" সাগরিকা বড় দুঃখে কথা কয়টি বলিল। তৈলহীন দীপের মত তাহার মুখের আলো সহসা কালো হইয়া উঠিল।

সাগরিকার দুঃখ যে কত বড়, নার্স তাহা বুঝিল না। কহিল, "তার পরেও ত ভাই তোমার দিন সুখেই কেটেছে।"

"সু—খে!" একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সাগর বলিল—"সুখে! সুখে নয় ভাই—পরম দুঃখে। শত্রুরও যেন তেমন দিন না হয়।"

"কেন?"

"কেন? সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল—দিনের পর দিন মাসের পর মাস—সেই ছল, সেই অভিনয়, সেই পাপ! সে ছিল একটা নরক ভাই, সে ছিল একটা নরক। যত আগুন, যত জ্বালা তাতে ছিল, নরকেও অত থাকে না!"

"যদি অতই জ্বালা, তবে আগে ওপথ ছাড়িস্‌নি কেন?"

"ছাড়তে পারি নি। কত দিন ছুটে' পালিয়েছি, আবার ধরা পড়েছি। ফাঁসির রশি যার গলায় ওঠে, সে কি আর পালাতে পারে? তাকে শেষে মরে' তবে বাঁচতে হয়।"

সাগর কাঁদিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া কাঁদে। এক যুগের রুদ্ধ মর্ম্মবেদনা আজ তাহার অন্তরে ঘূর্ণীবায়ুর মত হা-হা করিতে লাগিল। সম্মুখের টেবিলের খোলা দেরাজের মধ্যে ছবিখানি আছাড় দিয়া ফেলিয়া সাগরিকা এমন ভাবে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল যে, দরজার পাল্লা দুইখানা দড়াম্ করিয়া এ উহার গায়ে পড়িল। ঘরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

তন্ময় হইয়া ছবিখানা দেখিতে দেখিতে সাগরিকা অতীত দিনের সুখ-স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, সেই একদিন গিয়াছে, যখন দেবকুমারের সঙ্গ তাহাকে কত আনন্দ দিত। আজ যদি সে আবার দেবকুমারকে ফিরিয়াও পায়, সেই সুখ কি পাইবে? সঙ্গিনী নার্সের কথায় মনে পড়িয়া গেল—কত পঙ্ক তাহার গায়ে, কত পাপ তাহার নিশ্বাসে, কত দাহ তাহার স্পর্শে! দেবকুমারকে কি সে পোড়াইয়া মারিবে? হায় রে, কত সুখেই তাহার দেবনিবাসে দিন কাটিয়াছে—কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, কত পবিত্রতা, কত সরলতা সেই দিনের সঙ্গে মাখানো ছিল। আর তার পর? উঃ সে কথা ত মনে করা যায় না।

সাগরিকার অন্তরে যে এ কথাটা কখনো উঠে নাই তাহা নহে। কিন্তু প্রথমে সাগরিকা নিজের মনের কাছে সাহস করিয়া স্বীকার করিতে পারে নাই যে সে জীবনটা ছিল বড় বেদনার, বড় জ্বালার। সেই নরকের স্মৃতি এখন যেমন তাহাকে পোড়াইতেছে, আগে তেমন করে নাই। কিন্তু ইহার জন্ত দায়ী কে? সাগর, না দেবকুমার? মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সে যে ব্যভিচারের অগ্নিকুণ্ডে হৃৎপিণ্ডটাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দান করিয়াছে,—সে কেন? ঐ দেবকুমারের জন্ত নয় কি? আর আজ কি না সে আসিয়াছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে—আজ আসিয়াছে সে, সাগরকে বিবাহ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে!

দেবকুমারের প্রতি যত রোষ, যত বিরাগ, যত ঘৃণা, আজ আবার সে সমস্তই অত্যন্ত তীব্র হইয়া দেখা দিল। সাগরের ইচ্ছা হইতে লাগিল যে, সে আজ সেই হাঁসপাতালের শিখরে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর সম্মুখে বলে—দেবকুমার তুমি দূর হও।

আজ যখন দেবকুমারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তখন কেন যে তাহাকে তিরস্কার করে নাই, কেন যে বলে নাই—"তোমায় আমি চিনি দেবকুমার। আমার দেহের বিনিময়ে তুমি লালসার সুখ কিনিয়াছিলে—আবার আজ আসিয়াছ আমার মনের বিনিময়ে পুণ্য কিনিতে?" এই জন্তই তখন সাগরের অত্যন্ত দুঃখ হইল।

নিজে প্রতি ধিক্কার এবং দেবকুমারের প্রতি ঘৃণা ও রোষ মিলিয়া তখন সাগরিকাকে এমন করিয়া তুলিল যে, সে যদি খানিকটা মদ পাইত তাহা হইলে তখনই তাহা খাইয়া নিজেকে অজ্ঞান করিয়া রাখিত। কিন্তু হাঁসপাতাল ত জেলখানার ডিগ্রি নয় যে মেটকে টাকা দিলেই মদ মিলিবে! এখানে যে হিরণ ডাক্তার না বলিলে একটি ফোঁটা সুরাও পাইবার উপায় নাই! কিন্তু হিরণ ডাক্তারকে দেখিলে সাগরিকা বাঘের মত ভয় করিত। তাহার লোলুপ দৃষ্টিকে সাগর মনে করিত শিকারের সন্ধানে ব্যাধের দৃষ্টি!

সাগরিকা সুরার সন্ধানে হিরণ ডাক্তারের কাছে গেল না—নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং সমস্ত রাত্রি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

বসন্ত-সেনা

নটী বসন্ত-সেনা—
সঙ্গীতে রূপে নৃত্যে মোহিনী,
নগরে সবার চেনা;
কেহ ঘুরে তার সঙ্গীত লাগি,
কেহ বা নৃত্য-লীলা-অনুরাগী,
কেহ বা তাহার ফিরে রূপ মাগি—
সবাই তাহার কেনা।

প্রতি নিশি-দিন ধরি—
নব নব তার স্তাবক-কণ্ঠে
উঠে জয়-গান ভরি।
স্তূপাকার ধন বসন ভূষণে
নিতি জমে ভেট, আনে ধনিজনে,-
নটী কভু তাহা দেখে না নয়নে
এতটুকু কৃপা করি।

সে-দিন রাজার পালা—
বসন্ত-সেনা বসি বিষণ্ণা,
মুখখানি কালি-ঢালা।
পুছিলা নৃপতি—"কেন সুন্দরি,
নিশি-গন্ধার ম্লান মুঞ্জরী,
এ মধুর রাতি কি দুখে গুমরি—?
সহে না প্রাণে এ জ্বালা।"

বসন্ত-সেনা কহে—
"আমার এ ব্যথা শুনিয়া কি ফল,
এ যে গো যাবার নহে।
তোমাদের এই কপট করুণা
দয়া করে' আর ক'রো না, ক'রো না,
আর শেলাঘাতে দাসীরে মেরো না—
মরিতেছি, প্রাণ দহে।"

কহে প্রমত্ত রাজা—
"চাও দিতে পারি, অর্থ অথবা
বুকের রক্ত তাজা।"
নটী কহে ধীরে—"অর্থ আমার
যত আছে, নাই কোষেতে রাজার ;
বুকের রক্তে এই কারবার—
ও সব দারুণ শাজা।"

নৃপ কহে আরো জোরে—
"যা' বলিবে তাই নিশ্চয় দিব,
এবার বল', কি, মোরে।"
কহে নটী—"আছে নাম উদয়ন,
ভিক্ষুক এক দীন ব্রাহ্মণ,
ভিক্ষা আমার লয় না সে জন—
আসে না ও—মোর দো'রে।

"কত দিন আমি নিজে
যাচিয়া ভিক্ষা দিতে গিয়েছিনু,
লয় নি' সে ভেবে কি যে!
ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর
সকলেরে দিই ভিক্ষা প্রচুর,
শুধু এই জন করে মোরে দূর—
শাজা দাও এই দ্বিজে।"

নৃপতি হৃষ্ট-মন,
কহিল সোহাগে—"এই ? এরি লাগি
কেন এত আবেদন ?"
রাজার আদেশে পরদিন প্রাতে,
বাঁধিয়া আনিল দিয়া দড়ি হাতে
উদয়নে দূত রাজার সভাতে—
নর-নারী অগণন।

রাজ-অনুরোধ ক্রমে,
আদেশ হইতে দণ্ডে উঠিল
হুঙ্কারে সপ্তমে।

উদয়ন শুধু নত-আঁখে রহি
স্পর্দ্ধার দান লইবে না কহি—
মৃত্যু-আজ্ঞা নির্ভয়ে বহি
ফিরিল নিজাশ্রমে।

বরষা-বাদল রাতি—
বজ্র-ডমরু জলদ-মাদলে
বাত্যা-নৃত্যে মাতি,
নাচে নট-নাথ ; নিবিড় আঁধার—
ঘাট বাট মাঠ জলে জলাকার,
বিদ্যুৎ-কশা-সঘন-প্রহার,
শিহরে বিশ্ব-ভাতি।

বসন্তসেনা ধীরে,
নমি উদয়নে, সিক্ত বসনে
উপজিল এ কুটীরে!
ধ্যান ভাঙি দেখি দ্বিজ এ নিভৃতে,
নটীরে এ হেন প্রলয় নিশীথে
নীরবে ভিতরে কহিয়া আসিতে,
দাঁড়াইল নত শিরে।

রমণী কহিল কাঁদি—
"ক্ষম' ব্রাহ্মণ, নির্ব্বোধ নারী,
আমি অতি অপরাধী।
তেয়াগিয়া সব ধন জন মন
এসেছি রিক্ত তোমারি সদন
লইতে তোমার চরণে শরণ—
দুটি পায় ধরি সাধি।"

কহে উদয়ন—"মাতা,
আজ তব দান লব' বহু মানে,
অবনত করি মাথা।
নারী যে চির—"মা"—গণিকা সে নয়,
পণ্য-শালা কি ও দেহ-হৃদয়,
প্রাণ যে-স্তন্যে মুকুলিত হয়,
দেহে যে জীবন-দাতা ?"
বাহিরে তখন সুনীল গগন
ধরণী জ্যোৎস্না-স্নাতা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাবুলে বাঙ্গালী

বাঙ্গালীরা ভারতের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। রাজপুতনা, বেহার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে ত করিয়াছেনই—এতদ্ব্যতীত আফগানিস্থান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, আণ্ডামান, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেও বাঙ্গালীর উপনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহারা বঙ্গদেশ হইতে সে সকল প্রদেশে অর্থার্জ্জন হেতু গিয়া পরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, অথবা অন্য কোন কারণে সে প্রদেশে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই।

আফগানিস্থানে যে বাঙ্গালী আছে তাহার নমুনা এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ও তৎপরবর্ত্তী কালে বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী কৃষ্ণানন্দ কাশীর পশ্চিমে ভারতের শেষ পশ্চিম প্রান্তের সহর গুলিতে বাঙ্গালীর হিতার্থে ৺কালী দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দির স্থাপন করেন, উহা অদ্যাপি বাঙ্গালীদের ব্যয়ে চলিতেছে। আমি সে সকলের অধিকাংশ কালীবাড়ীই দেখিয়াছি। সে সকল বাঙ্গালীদের তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খল বিধানে চলিতেছে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ বা দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাঙ্গালীদের তেমন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান দেখা যায় না। যে সকল স্থানে কালীবাড়ী আছে সে সকল কালীবাড়ীর সংলগ্ন এক একটি লাইব্রেরী বা পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলি আধুনিক। সেই সকল লাইব্রেরীতে সর্ব্ব-সাধারণের পাঠার্থ বাঙ্গলা, ইংরাজী পুস্তক রক্ষা করা হইতেছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালা পুস্তকই বেশী। উপন্যাস বাহুল্য হেতু অনেক উপন্যাস এখানে আছে। বাঙ্গালীরা চাঁদা দিয়া এইরূপ লাইব্রেরীসমূহ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

স্বামী কৃষ্ণানন্দ বাঙ্গালী। তিনি কাবুলে গেলে তাঁহার মন্ত্রৌষধিতে বহু লোক তাঁহার বাধ্য হয়। ইতিপূর্ব্বে কাবুলে বাঙ্গালী না থাকিলেও, কাবুলে হিন্দুর বসতি ছিল, উহারা সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা কম হইলেও নিতান্ত কম নহে। স্বামী কৃষ্ণানন্দ সেখানে সশিষ্য আশ্রম করিয়া লইলেন। তাঁহার মন্ত্রৌষধির গুণে বহু লোক তাঁহার বাধ্য হইল। আমীরের দরবার পর্য্যন্ত তাঁহার সুযশের কথা গিয়া পঁহুছিল।

তখন আমির দোস্ত মহম্মদ কাবুলের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় আমীরের একমাত্র কন্যা সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হন, জীবনের আশা চিকিৎসকেরাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় রাজ্যের যত মন্ত্রী ও বন্ধু, স্বামী কৃষ্ণানন্দের দ্বারা তদীয় কন্যার চিকিৎসা করাইতে দোস্ত মহম্মদকে উপদেশ দিলেন। তৎপর স্বামিজী আমীরের দরবারে নীত হইলেন। স্বামীজি চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সেই সময় এক প্রবাদ বাক্যের মত কথা প্রচার হয়—"যে ব্যক্তি আমীর কন্যাকে চিকিৎসায় আরোগ্য করিতে পারিবে তাহাকে আমীর সরকার হইতে কাবুলের অর্দ্ধরাজ্য দিয়া সন্তুষ্ট করা যাইবে।" স্বামীজীর চিকিৎসা চলিল।

ভগবৎ প্রসাদাৎ কিছু দিনেই স্বামীজী রোগীকে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করাইলেন। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলে আমীর সহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পুরস্কার স্বরূপ কি চাহেন?"

স্বামীজী উত্তর করিলেন, "আমি আপনার অর্দ্ধরাজ্য চাহিনা, আমার প্রার্থনা সামান্য।" তৎপরে আমীরের আদেশ ক্রমে স্বামীজী কহিতে লাগিলেন, "কাবুলে গোহত্যা হয়, সর্ব্বপ্রথম আপনার এলাকায় গোহত্যা নিবারণ করিবেন ইহা আমার প্রথম প্রার্থনা। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, কাবুলে একটী কালীদেবী প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিব তাহার ব্যয়ভার সরকার বহন করিবেন। আর ইহার যথারীতি চলিবার জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়া দেবোত্তর বা জায়গির ভুমি দান করিতে

হইবে। এবং বাঙ্গালীরা এখানে আসিলে তাহাদের প্রতি সরকারের কাবুল অধিবাসীদের ন্যায় তুল্য অধিকার দিতে হইবে। ভারতবাসী মাত্রকেই তদ্রূপ অধিকার দিতে হইবে। ইহাই আমার প্রার্থনা।"

স্বামীজীর প্রার্থনা পূর্ণ হইল। যথারীতি কালীদেবীর সেবা ও পূজার জন্য প্রচুর ভূমি সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হইল, সুন্দর ও সুদৃঢ় মন্দির স্থাপিত হইল। স্বামীজীর বাসের জন্ম উহারই নিকট একটী সুন্দর ও বড় বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর স্বামীজীর গুণের কথা দেশময় বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইল। এই দেবীর সেবা পূজা অদ্যাপি বাঙ্গালী দ্বারা হইয়া আসিতেছে। তদবধি প্রত্যহ এখানে একটী ছাগবলি দিয়া পূজা হয়। আমার কাবুল ভ্রমণকালে আমি এই দেবী মন্দির দেখিয়া আসিয়াছি। আমির প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমির আয় দ্বারা স্বচ্ছন্দে দেবীর সেবা ও পূজা চলিতেছে।

স্বামীজীর প্রথম প্রার্থনা গোবধ নিবারণ,—গোবধ নিবারণের আদেশ রাজ্যময় প্রচারিত হইল। যে ব্যক্তি গোবধ করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে ব্যবস্থা হইল। প্রাণদণ্ডের ভয়ে রাজ্যে অতি সত্বর গোবধ রহিত হইয়া গেল। স্বামীজী তাঁহার জন্ম নবনির্ম্মিত বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। দেবীর সেবা পূজার জন্ম আর তাঁহার ভাবিতে হইল না। তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গালী শিষ্য ছিলেন, তাহার প্রতি দেবীর সেবা পূজার ভার অর্পিত হইল।

স্বামীজীর বাঙ্গালী শিষ্য বালক, তাহার নাম দ্বারকানাথ ব্রহ্মচারী। দেবীর সেবা পূজার ভার অপর শিষ্যের প্রতি অর্পণ করিয়া তিনি দ্বারকানাথকে লইয়া ভারতে আসিলেন। দ্বারকানাথের বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলায়। স্বামীজী তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর সস্ত্রীক তিনি তাহাকে লইয়া পুনরায় কাবুল যাত্রা করিলেন। কাবুলে তিনি হিন্দুদের সহিত চলিতে পারিলেন না। স্থানীয় হিন্দুগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত, তজ্জন্ম তিনিও তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। এই অবস্থায় দ্বারকানাথের বড় অসুবিধা হইল। স্বামীজী আমীর সরকারে পুনরায় প্রার্থী হইলেন, "দ্বারকানাথকে কাবুলী হিন্দুদের সহিত প্রচলিত করিয়া দিতে হইবে।" তদনুসারে আমীর সরকার হইতে উপযুক্ত আদেশ প্রচারিত হইল। দ্বারকানাথ স্থানীয় হিন্দুদের সহিত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার আর দেশে আসিবার পথ রহিল না।

আমি দ্বারকানাথকে তাঁহার প্রাচীন অবস্থায় তথায় দেখিয়াছি, বোধহয় তাহা পঁচিশ বৎসরের কথা। দ্বারকার কয়েকটী পুত্র, কন্যা হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই কাবুলী হিন্দু ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিয়াছেন, তাহাদেরও পুত্র কন্যা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বাঙ্গলা ভাষায় আলাপ করিতে জানেনা। দ্বারকানাথ ও তদীয় স্ত্রীও বাঙ্গলা ভাষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পোষাকাদিও কাবুলী ধরণের, দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া চিনে কার সাধ্য! বাঙ্গালী ধরণের আহার বিহারও তাঁদের নাই। এতদিন হয়ত দ্বারকানাথ ও তাহার স্ত্রী বাঁচিয়া নাই! তাঁহাদের পুত্রকন্যারা সে দেশীয়ের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, আর দু'এক পুরুষ পরে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বা বাঙ্গালীর বংশধর বলিয়া বাছিয়া লওয়া সম্ভব হইবে না।

স্বামীজী কাবুল স্বাস্থ্যকর ও সুবিধাজনক মনে করিয়া সেখানেই বাস করেন ও সেখানেই তাঁহার অতি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণান্ত হয়। তিনি তাঁহার জীবন কালে কাবুলে আরও বাঙ্গালী লইয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। তৎপরে তাঁহার শিষ্য ও দেবীর সেবায়েত দ্বারকানাথ ব্রহ্মচারী বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হইয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি আমাকে এরূপ বাঙ্গালী সংগ্রহ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কোন বাঙ্গালীই এরূপ প্রায়ঃ-বাঙ্গালীহীন স্থানে যাইতে রাজী হয় নাই। স্বামীজী জীবিত থাকিতে সময় সময় দুই চারি জন বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী গিয়া সেখানে বাস করিতেন, কিন্তু এরূপ বাঙ্গালীর বাস তিনি পছন্দ করিতেন না। সস্ত্রীক ও সপরিবারে বাঙ্গালী বাসের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আমার মনে

হয় এখনও যদি কোন দরিদ্র বাঙ্গালী সেখানে যায়, তবে সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে।

আমীর দোস্ত মহম্মদ রাজ্যচ্যুত হইয়া দেরাডুনে ইংরেজ রাজের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাসিত হইলেন। তখন আমি এই মহাপুরুষকে দেরাডুনে দেখিয়াছি। ইহা বাংলা ১৩০৫ সালে। ঐ বৎসরই তাঁহাকে আর একবার দেখিয়াছিলাম হরিদ্বারের পথে—তিনি শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। আমার সঙ্গে ঐ দুই স্থানে তাঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েক জন ইংরেজ ও অন্যান্য লোক ছিল। একজন ইংরেজ কমিশনার—তিনি পেন্‌সন্ পাইয়া তার পর এই চাকরী লন। দোস্ত মহম্মদের নির্ব্বাসনের পর আব্দুর রহমান কাবুলের আমীর হন। তিনি দেখিলেন, একটা পশু হত্যার জন্য একটা নরহত্যা সমীচীন নহে—তাই তিনি আইন করিলেন, যে ব্যক্তি গোহত্যা করিবে তাহার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইবে। এই হইতে প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা উঠিয়া গেল।

আবদর রহমানের পুত্র আমীর হবিবুল্যা কলিকাতা বেড়াইতে আসিলে দিল্লীর মুসলমানেরা তাঁহাকে ইদের সময় দিল্লীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তথায় ইদ উপলক্ষে গোবধ হইলে তিনি যাইবেন না বলিয়া পাঠান। তারপর সেবৎসর গোবধ হয় না, তিনি দিল্লী যান। আমি যখন কাবুলে গিয়াছিলাম তৎকালে আবদর রহমান আমীর ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার দুইচার দিন দেখা হইয়াছিল। আমি তখন রাজ-অতিথি হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। এখন আবদর রহমানের পৌত্র কাবুল রাজ সিংহাসনের আমীর—অদ্যাপি কাবুলে গোবধ হইতে পারেনা। হিন্দুদের তথায় উচ্চ অধিকার আছে। মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার করেনা। কাবুলে যদি তৎকালে আরও কতিপয় বাঙ্গালী পরিবার যাইত, তবে বাঙ্গালী উপনিবেশ চিরকাল চিহ্নিত করিয়া পরিচয় রাখা যাইত। কাবুলে গিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম সিপাহী বিদ্রোহের সময় কয়েকজন বাঙ্গালী ইংরেজের বিরুদ্ধ আচরণ করায় তাহারা তাড়িত হইয়া কাবুলে গিয়া অবস্থান করে। তাহাদের স্ত্রী,পুত্রাদি ভারতে রহিয়া যায়, সেখানে গিয়া তাহারা বিবাহাদি করে, এখন আর তাহাদের সন্তানগণকে বাঙ্গালী বলিয়া বাছিয়া লওয়া সম্ভব নহে।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশে বহু কাবুলী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে। আমীর দোস্ত মহম্মদ রাজ্যচ্যুত হইলে আমীর আবদর রহমান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহী কাবুলীগণকে ভারতে নির্ব্বাসিত করেন। তাহারা ভারতে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। তাহাদের বিবহাদি কাবুলের অধিবাসীদের সঙ্গে হইয়া থাকে। যে সকল কাবুলী ভারতে নির্ব্বাসিত তাহাদের সহিতও বিবাহাদি হইয়া থাকে। নির্ব্বাসিত কাবুলীরা অনেকেই কাবুল হইতে বহু ধন রত্নাদি আনিয়া এদেশে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় বাস করিতেছে। এ দেশে ইহাদের অনেকে আছে বলিয়া, তাহারা ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না। কাবুলে বিদ্রোহ হইলে সময় সময় বিদ্রোহী কাবুলী দিগকে হিরাট, পারস্ত ও ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হয়। পরে রাজানুগ্রহে কেহ কেহ দেশে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ আর দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা করে না। হিরাটে যাহারা নির্ব্বাসিত হয় তাহারা কেহ কেহ ফিরিয়া দেশে গিয়া স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা কাবুলীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে, সে দেশ হইতে কন্যাপুত্র আনিয়া থাকে, অভাব হইলে হিরাট অঞ্চলের মুসলমানদের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। ভারতেও এই অবস্থা, অভাব হইলে তাহারা ভারতীয় মুসলমানদের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

পরম প্রশ্ন

(রবীন্দ্রনাথের "প্রণয় প্রশ্নের" সুরে)

এ কি তবে সবি সত্য ?
জিজ্ঞাসে তব ভক্ত,
আমার বুকের গোপন দুখের বেদনা
তোমার করুণ পরাণে জাগায় চেতনা,
এ কি সত্য ?
আমারি অশ্রু নয়নে তোমার
মুক্তা ধারায় ব্যক্ত—
জিজ্ঞাসে তব ভক্ত,
এ কি সত্য ?

এ হৃদি-যন্ত্র তোমারি ছন্দে বাজে কি ?
এ চিৎ-কমলে ও পদ যুগল রাজে কি ?
এ কি সত্য ?
নিশার আঁধারে ছিনু দূরে দূরে উভয়ে
হৃদয়ে হৃদয়ে পরশ অরুণ উদয়ে,—
এ কি সত্য ?
জীবন-লীলার নাগর দোলায়
রাখিবে অপ্রমত্ত,
জিজ্ঞাসে চির ভক্ত,
এ কি সত্য ?

শ্রান্ত পথিকে পথ বলে' দাও আঁধারে,
মরু-যাত্রীর ঘুচাও আঁখির ধাঁধারে,—
এ কি সত্য ?
ভক্ত-জনের চিত্ত নিত্য ভরিয়া
বাজাও বংশী সব সংশয় হরিয়া,
এ কি সত্য ?
তোমারে যে পায় থাকে সে হেথায়
সংসারে অনাসক্ত,
জিজ্ঞাসে চির ভক্ত,
এ কি সত্য ?

অযাচিত সুধা বিলাও তৃষিত লাগিয়া,
জননীর স্নেহে থাক যে শিয়রে জাগিয়া,
এ কি সত্য ?
অমৃত-ধারায় ভরাও বক্ষ পলকে,—
গাগরী ছাপায়ে ধরায় সে বারি ছলকে,
এ কি সত্য ?
গোকুলে গোপীর মরম-ফলকে
লেখা ও পরম তত্ত্ব,
জিজ্ঞাসে তব ভক্ত
এ কি সত্য ?

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদেশিকী
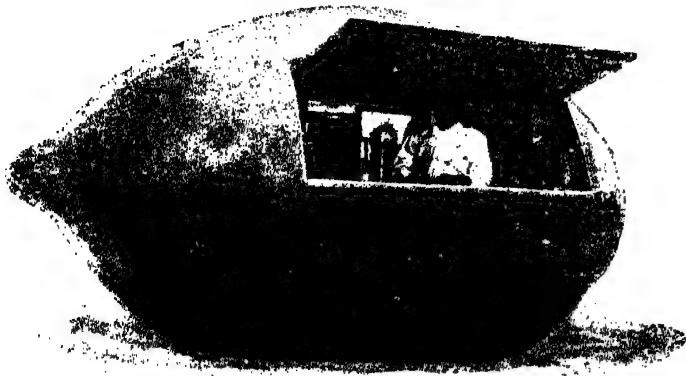
সঙ্কলন

১। **বিচিত্র জলযোগাগার :**—দেখিতে পাতিলেবুর ন্যায় এই জলযোগাগার এক দ্বারবিশিষ্ট। ইহার দ্বার বন্ধ করিলে বায়ু রুদ্ধ হয় এবং খাদ্যদ্রব্যাদি নষ্ট হয় না।

২। **উইলিয়ামেট্ উল্কাপ্রস্তর :**—অরিগনের নিকট প্রাপ্ত এই উল্কাপ্রস্তর ওজনে প্রায় ৩ ,১০৭ পাউণ্ড।

৩। জার্ম্মাণি এবং সুইটজারলণ্ডে আবহ-পরিমাপ-জন্য এক প্রকার সবুজবর্ণের ভেক জীবন্ত অবস্থায় বোতলের মধ্যে রাখা হয়। যেদিন বাত্যাবৃষ্টির কোন চিহ্ন থাকে না সেই দিন ভেক জল ত্যাগ করে, কিন্তু বাত্যাবৃষ্টির সূচনায় উহা জলমধ্যেই অবস্থান করে।

সাধারণত এই ফুলের বর্ণ নীলাভ কিন্তু ইহার বর্ণ রক্তিমাভ হইলে ঝটিকার সম্ভাবনা বুঝা যায় এবং অনিশ্চিৎ আবহ-অবস্থায় ইহার আনীললোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

৪। চিকিৎসা চুম্বক :—চক্ষু-চিকিৎসক এই চুম্বকের সাহায্যে চক্ষুমধ্য হইতে ধাতুকণা আকর্ষণ করিয়া চক্ষু যন্ত্রণামুক্ত করেন।

৫। বৈদ্যুতিক মনুষ্য :—চিত্রস্থিত যন্ত্রমনুষ্য ঘণ্টা বাজায়, বৈদ্যুতিক আলোকের চাবি চালনা করে এবং অন্যান্য আদেশও পালন করে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, টেলিফোনযোগে ওয়াসিংটনস্থিত জলাধারের জল পরিমাণ জানিতে চাহিলে তাহা বলিয়া দেয়।
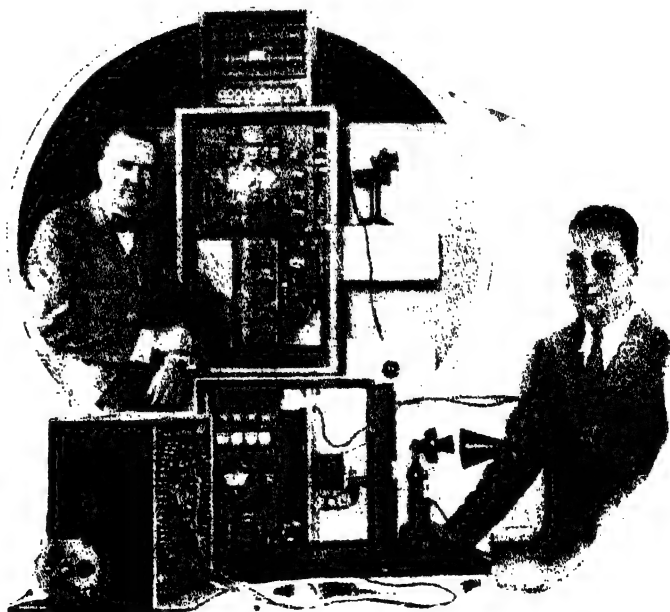
৬। যন্ত্র ক্ষুর :—এই ক্ষুরের ভিতরের ফলা ঘাসকাটা কলের ন্যায় এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে চলে। ইহা ছদ্দম শ্মশ্রুর জন্য ব্যবহৃত হয়।

৭। এই অম্বরী খণ্ডটী একটি তিমিমৎস্যের অন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া একজন ধীবর ইহা ৬৭২০ ডলার মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে।
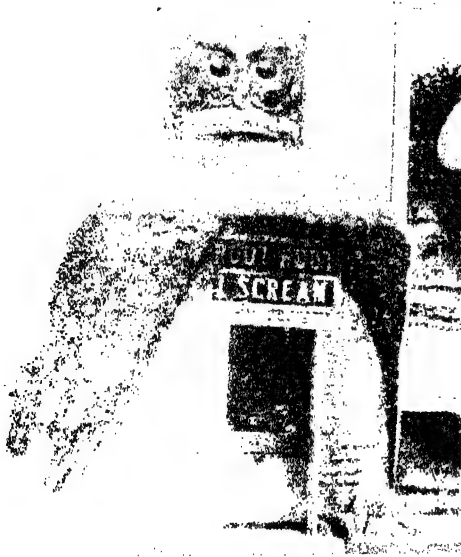
৮। দক্ষিণ কালিফোরনিয়ায় এই বিচিত্র বিক্রয় মঞ্চে সরবৎ বিক্রয় হয়।
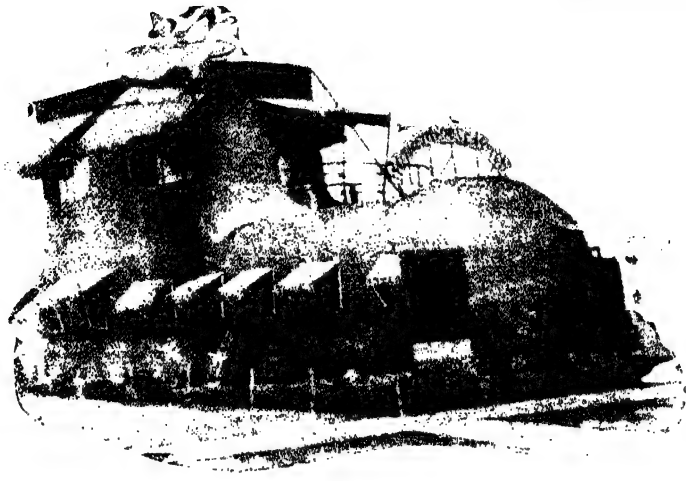
৯। স্থপতিবিদ্যার অপরূপত্ব :—এই পাদুকাকৃতি বাসগৃহ সম্প্রতি কালিফোরনিয়া নগরে নির্ম্মিত হইয়াছে।
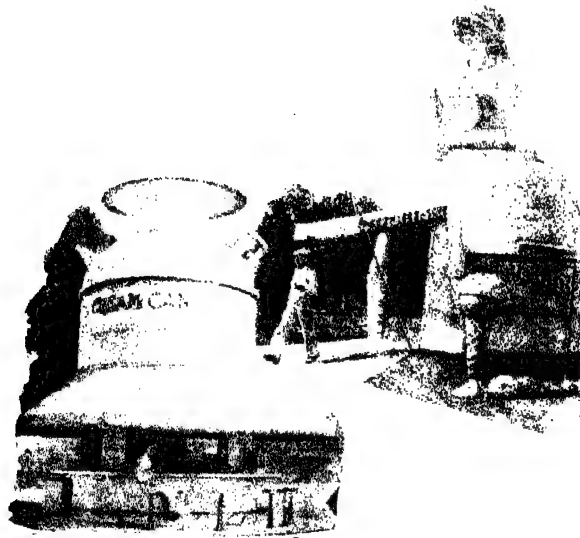
১০। এই বিরাট মূর্ত্তির তলদেশ দোকানঘররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

সাহিত্য

অমরত্ব

জেমস্ অলিভর কারউড্ দৃঢ়চিত্তে বলিতে চান যে. তাঁহার অপঘাত মৃত্যু না ঘটিলে তিনি স্বচ্ছন্দে একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারিবেন। তিনি বলেন, "জরা তাহার জীর্ণ চিহ্ন লইয়া যদি অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে আমার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া সসম্ভ্রমে বিদায় দিব।"

ঐ প্রশান্ত প্রাচীন-দেহ প্রান্তরটি, কত যুগের ইতিহাস তাহার মৃত্তিকার স্তরে স্তরে লুকাইয়া রাখিয়া উপরে শ্যামল আবরণ টানিয়া দিয়াছে। কতবার উহার শ্যামল আবরণে মরুস্পর্শ ঘটিল, কিন্তু উহার কি ক্ষতি হইল ?

প্রকৃতির কোন মহৎ নিয়ম সাফল্যে ঐ দেবদারু বৃক্ষ ৫০০ বৎসর দেবতাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। এই ধরাশয্যায় ১০০ বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে সে মৃত্তিকায় মিশাইতেছে। সম্মুখে আর একটি বৃক্ষ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে গগনের দিকে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। যৌবন, জরা, মৃত্যু এই তিনের পূর্ণতায় বায়ু আশার বাণী বহন করিয়া ছুটিয়াছে। জীবনের এই চরম সাধনের পার্শ্বে অকালে লুটাইবার জন্যই কি তোমরা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ? তোমারই জন্মের সহিত যে বৃক্ষবীজ অঙ্কুরিত হইল, তাহারই কৈশোরের চাঞ্চল্যের মাঝে কি তোমার শেষ নিশ্বাস বহিবে ? তোমার অন্তরের পরম সত্তায় যে আত্মানুরাগ জাগিয়াছে তাহাতেই জীবনের প্রতি তোমার এক প্রবল আসক্তি বুঝা যায়। তাহাতে ত ক্ষুদ্রত্বের ক্ষণিক উন্মাদনা নাই— তাহাতে যে বিরাট জীবন স্পন্দনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে এবং এই মৃত্যুঞ্জয় ভাবে বিভোর হইয়া তোমার মধ্যে জীবনপ্রবাহ সফল হয়। মৃত্যু কেবল তোমাদের জন্য সীমা হইতে অসীমের পথে তর্জ্জনি নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু এ বিশ্বাস ত সাম্প্রদায়িক কলহে ও স্বার্থপরতায় স্থির থাকে না। কারউড বলেন—"অনন্ত গতির বলেই তোমার জ্ঞানবৈচিত্র্যে তুমি সর্ব্বব্যাপক ও অমর।" একথা আমাদের জানিতে হইবে, কারণ,— "বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাদ্বা প্রত্যগাত্মেহ:চাচ্যতে।" এই বলে তোমার দেহও সর্ব্বব্যাপক ও অক্ষয়। তোমার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান স্পৃহার যে একটা অতৃপ্ত কামনা জাগিল তাহার তৃপ্তি যে অমরত্বে। পরম একাগ্রতায় তাহাকে সজীব রাখিলে তোমাকে অমর হইয়া থাকিতেই হইবে। আমাদের ঋষিরাও বলেন "জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ।"

তোমরা পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুকে আহ্বান পত্র দিয়া রাখিয়াছ। তুমি মরণশীল এই ধারণায় তোমারই মধ্যে ক্ষয় আরম্ভ হইল এবং তোমার নির্জ্জীব বিশ্বাসেই মরণের প্রহেলিকা দেখিলে। মৃত্যুর সহিত যদি তোমার এত নিকট সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে তাহার নামে ভয় পাও কেন ? কেবলমাত্র ওই দুর্জ্জন সংসর্গে লিপ্ত থাকিয়াই তোমার এইরূপ অবস্থা। সর্ব্বদা মনে রাখিও যে তুমি নিত্যতৃপ্ত ও অমর ;—"স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্ত এব।"

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

"ফাগুনে,'

(গল্প)

আজ ১লা ফাল্গুন। দুই বছর আগে এই ১লা ফাল্গুনেই তিনি বাড়ী থেকে চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন, কি করছেন, কোন সংবাদই দেন নি। কত অনুসন্ধান করা হয়েছে, যেখানে যেখানে আমাদের আপনার জন আছে, মা সকলকেই চিঠি লিখেছিলেন; কেউই তাঁর কোন সংবাদ জানে না।

তিনি ত দেখে গিয়েছিলেন আমি পূর্ণগর্ভা আমার খবর না হয় নাই নিলেন, তাঁর বিধবা মায়ের কথাও না হয় না-ই ভাবলেন; কিন্তু তাঁর যে সন্তান আমি তখন গর্ভে ধারণ করে ছিলাম, সে ছেলে না মেয়ে, সে সংবাদটাও তিনি নিলেন না! এমন পাষাণ দিয়ে প্রাণ বেঁধে তিনি কেমন ক'রে আছেন?

দুই বছর আগের এই ১লা ফাল্গুনের সব কথাই আমার মনে আছে—তার এক বর্ণও আমি ভুলি নি।

মা ত এমন কোন কথাই বলেন নি, যাতে তিনি আমাদের একেবারে ত্যাগ করে যেতে পারেন! মা বলেছিলেন, "এমন ক'রে আর ক'দিন চলবে? বৌমার যা দুখানি পাঁচখানি গয়না ছিল, তা বেচে ত এতদিন চললো। এখন কি হবে? আর, দু' দিন পরেই যে আর একটি আসবে, তার কথাও ত ভাবতে হয়!"

এই কথাতেই তাঁর রাগ হ'লো, তিনি বললেন, "আমি অত ভাবতে পারিনে

মা সেই কথা শুনে বলেছিলেন, "ছেলে হবে তোর, আর ভাববো আমি? চব্বিশ বছর বয়স হ'লো। লেখা-পড়াও শিখেছিস্। একটা পয়সা উপার্জ্জন করবিনে, খাবি কি?"

এই কথা শুনেই তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন—"কি বল্লে? খাবার কথা ব'লছ? বেশ, আর তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকব না, এই আমি চ'ল্লাম।" এই ব'লেই সেই যে ১লা ফাল্গুন তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন, আজ ঠিক এই দু-বছরের মধ্যে তিনি আর ঘরে ফিরলেন না।

মা বড় কষ্টেই কথা কয়টি বলেছিলেন; কিন্তু তাতে কি কোন ছেলের মনে এমন অভিমান হ'তে পারে? তিনি ত আমাদের দুরবস্থার কথা সবই জানতেন। তিনিই যে বিধবার একমাত্র সন্তান—সংসারের একমাত্র অবলম্বন।

আমার শ্বশুর যখন মারা যান, তখন আমার স্বামী কলেজে আই-এ পড়তেন, তার একবছর আগেই আমি এবাড়ীতে বৌ হয়ে এসেছিলাম। শ্বশুর মশাই কোন্ অফিসে কায করতেন; এক-শ টাকা মাইনে পেতেন। তাই দিয়ে সংসার চালাতেন, আবার কিছু কিছু জমাতেন। এই যে বাড়ীতে আমরা বাস করছি, এখানিও তিনিই তৈরী করেছিলেন। মায়ের কাছে শুনেছি, এই বাড়ী তৈরী করতে তাঁর কাছে যা কিছু ছিল, তা ত খরচ হয়ে গিয়েছিলই, তা ছাড়া আমার শাশুড়ীর যে ক'খানা সামান্য গয়না ছিল, তাও বাঁধা দেওয়া হয়েছিল। তা আর উদ্ধার করতে পারেন নি। তাতেও সব খরচ কুলিয়ে ওঠেনি; ছয় সাত-শ টাকা ধার করতে হয়েছিল। সে ধার তিনি ছেলের মাথায় দিয়ে যাননি; নিজেই শোধ করে গিয়েছিলেন। তাই তিনি যখন মারা যান, তখন আমাদের মাথা রাখবার স্থান ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, যাতে আমাদের দু-চার মাসও গ্রাসাচ্ছাদন চলে।

আমার শ্বশুর যখন মারা যান, তখন আমার বি-এ পড়ছিলেন। অন্য কেউ জানতে না পারলেও আমি জানতে পেরেছিলাম, তাঁর পড়ার দিকে মন ছিল না; তিনি কু-সঙ্গে মিশেছিলেন; কলেজে যাবার নাম ক'রে বাড়ী থেকে বেরুতেন, কিন্তু কলেজের কাছেও যেতেন না; কু-সঙ্গে সময় কাটিয়ে রাত ন'টা দশটায়

বাড়ী আসতেন। মা জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা কথা বলতেন, ক্লাসের কোন ছেলের বাড়ী পড়াশুনা করতে দেরী হয়েছে। মা সেকথা বিশ্বাস করতেন। আর আমার শ্বশুর—তিনি ন'টায় আফিসে বেরিয়ে যেতেন, আর সেই রাত আটটায় লালদিঘীর ধারের আফিস থেকে হেঁটে আমাদের বাগবাজারের বাড়ীতে আসতেন। তারপর আর তাঁর ঘর সংসারের কিছুর দিকে দৃষ্টি ক'রবার শক্তিও থাকত না, কিছু দেখতেনও না; সংসারের যা কিছু ভার, মায়ের উপর দিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। সংসারও বড় ছিল না; আমার স্বামীই তাঁর একমাত্র সন্তান।

শ্বশুর মশাই স্বর্গারোহণ করলে ;মা একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। ছোটই হোক আর বড়ই হোক, এ ক'টী মানুষের ভরণপোষণ ত নির্ব্বাহ করতে হবে! আমার স্বামীকে সব কথা বলতে তিনি বললেন, "তাহ'লে পড়া ছেড়ে দিয়ে একটা কাযকর্ম্মের চেষ্টা দেখি।"

মা বল্লেন, "আর পাঁচটা মাস গেলেই তোমার পরীক্ষা শেষ হবে; এ ক'টা মাসের জন্যে আর পড়া ছেড়ে কায নেই; আমার যে দু'চারখানা অলঙ্কার এখনও আছে, তাই দিয়ে কোন রকমে চালিয়ে নেব; তুমি এখন মন দিয়ে পড়। বি-এটা পাশ করলে একটা ভাল চাকরী নিশ্চয়ই জুটবে, ততদিন কষ্টেসৃষ্টে চলুক।"

আমি ব'ললাম, "মা, তোমার অলঙ্কার আর ক'খানিই বা আছে? যা ছিল তার অনেকগুলিই ত বাড়ী তৈরীর জন্যে বন্ধক দেওয়া হয়েছিল; তা আর উদ্ধার করা হ'লো না; আর যে হবে তারও সম্ভাবনা নেই। তোমার যা দু' একখানা আছে, তা থাকুক। উনি এখন থেকেই একটা চাকরীর চেষ্টা দেখুন। যে দিনকাল পড়েছে, তাতে চাকরীও সহজে মিলবে না, দু'চার ছ' মাস হাঁটাহাঁটি করলে যদি কিছু হয়।"

মা বললেন "না না, সে হবে না; বি-এটা পাস করা চাই।" আমি আর কি ক'রে বলবো যে, বি-এ পাশ আর ওঁর দ্বারা হবে না। এতদিন কর্ত্তা বেঁচে ছিলেন, তাই উনি যাহোক কলেজের নাম ক'রে, যাহোক ক'রে বেড়াতেন। এখন আর তাও করবেন না, অকারণ কলেজের মাইনে গুলো ন দেবায় ন ধর্ম্মায় যায় কেন? আর সে টাকাও যোগাতে হবে আমাদের গয়না বিক্রি ক'রে!

মায়ের কথা শুনে উনি বল্লেন, "মিছামিছি টাকা খরচ করে কি হবে মা? তার থেকে এখনই কলেজ ছেড়ে দিয়ে যা হয় একটা চেষ্টা দেখি। কতদিন ঘুরতে হবে তা ত বলা যায় না! দুমাস ছমাসেও হ'তে পারে, দু'বছরেও লাগতে পারে। কেরাণীগিরি করতে গেলে বি-এ পাশও যা, আই-এ পাসও তাই। মুরুব্বির জোর চাই। আমার ত সে জোর নেই, নিজেকেও দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে।"

মা বল্লেন, "যা ভাল বোঝো কর বাবা! এতকাল ত কোন কষ্ট করবার দরকার হয় নি; কর্ত্তা ছিলেন, যে কোন প্রকারে চালিয়েছেন। আচ্ছা, এক কায করলে হয় না? কর্ত্তা যে আফিসে কায করতেন, সেখানকার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে একটা চাকরী চাইলে তিনি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করবেন।"

আমার স্বামী বল্লেন, "তা কি আমি করি নি? তিন চার দিন সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন, তাঁদের আফিসের অবস্থা ভাল নয়। বাবার যায়গায় লোক নেওয়া হবে না, আরও অনেক লোককে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। যখন আফিসের অবস্থা ভাল হবে তখন দেখা করতে বলেছেন। অর্থাৎ, ওটা একটা ভদ্রতা মাত্র; বাবার আফিসে কিছু হবার সম্ভাবনা নেই।"

মা বল্লেন, "তা হলে আরও ত আফিস আছে, সেখানেই চেষ্টা দেখ।"

তিনি সেই চেষ্টা দেখবেন বললেন, কিন্তু আমি বেশ জানতাম তিনি কোন চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হন নি; এমন কি আমার শ্বশুরের আফিসের সাহেবদের সঙ্গেও দেখা করে' ছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি কোনও দিন তাঁকে কাযকর্ম্মের চেষ্টা করতে অনুরোধ করি নি, কারণ এই সুদীর্ঘ কালের পরিচয়ে আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি আমার

কোন কথা, কোন অনুরোধই শুনবেন না। আমার মনে হয়েছিল, কর্ত্তার মৃত্যুর পর যখন সংসারের ভার তাঁর উপর পড়বে, তখন তাঁর চরিত্র সংশোধিত হবে, তার আগে কারও কোন চেষ্টা ফলবতী হবে না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমার ভ্রম আমি বুঝতে পারলাম। ভাল হওয়া দূরে থাক, কর্ত্তা বেঁচে থাকতে তাঁর যা একটু সঙ্কোচ বোধ ছিল, তাও আর রইল না, অথচ, তাঁর নানা দুষ্কর্ম্মের খরচ যে কি করে সংগ্রহ হয়, তাও ত জানতে পারিনে। বাড়ী থেকে একটা পয়সাও পাওয়ার সম্ভাবনা নেই এ কথা তিনি জানতেন। মায়ের সামান্য দুই একখানি অলঙ্কারে হাত দিতে না দিয়ে, আমার অলঙ্কার এক-একখানি বিক্রি ক'রে যে সংসার খরচ চলছে এ কথাও তিনি জানতে পেরেছিলেন। তবুও তিনি কোনও দিকে দৃষ্টি না করে, নিজের পথেই চলতে লাগলেন, আর আমরা অতি কষ্টে কোন রকমে দিন কাটাতে লাগলাম।

এই সময় আমার শাশুড়ী একবার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, এত কষ্ট স্বীকার না করে, আমি কিছু দিনের জন্যে আমার মামার কাছে গিয়ে থাকি, তারপর ওঁর একটা ভাল চাকরী হলে তখন আসবো। আমি আমার শাশুড়ীকে ফেলে যেতে স্বীকার করি নি; বিশেষ আমার ত পিতৃকুলে কেউ নেই; মামা দয়া করে পিতৃমাতৃহীনা ভাগিনেয়ীটাকে মানুষ করেছিলেন এবং বিয়ে দিয়েছেন। এখন কি ব'লে আবার তাঁর উপরে গিয়ে পড়ি? আরও এক কথা; আমি যদিই বা লজ্জাসরম ত্যাগ করে মামার কাছে যাই, তা হলে আমার স্বামী একেবারেই অধঃপাতে যাবেন; এখন তবুও দিনান্তে বা দু' দিন পরে একবার বাড়ী আসেন; আমি চলে গেলে তাও আসবেন না। একটা কথা না ব'লে পারছিনে; আমার স্বামী অসচ্চরিত্রই হোন, আর যাই হোন, কোন দিন আমাকে একটা দুর্ব্বাক্য বলেন নি, বা কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করেন নি। তারও কারণ ছিল; তিনি আমাকে ভালবাসুন আর না বাসুন, আমি যে কোন দিন একটি কথাও তাঁকে বলি নি, তারই জন্যে আমাকে নিতান্ত নিরীহ বেচারী মনে করে তিনি আমাকে কিছু বলতেন না।

এই ভাবে প্রায় একবছরের উপর কেটে গেল। তার পর একদিন—এই আজ যে ১লা ফাল্গুন, দু' বছর আগে ঠিক এই ১লা ফাল্গুনে মায়ের সঙ্গে ছেলের যে কথা হয়েছিল, তা গোড়াতেই বলেছি। সেই যে তিনি চ'লে গেলেন, আর কোন খোঁজ এই দু'বছরে পাওয়া গেল না।

সেই ১লা ফাল্গুন তিনি প্রাতঃকালে গৃহত্যাগ করে গেলেন, সেই দিনই বিকাল বেলায় আমার প্রসব বেদনা আরম্ভ হল। মা যে কি করবেন, ভেবে পান না। কলকাতা সহরে নাকি পাশের বাড়ীর লোকও অপর বাড়ীর কারও খোঁজ নেন না। কিন্তু, বাগবাজারে আমাদের যে পাড়ায় বাড়ী, সে পাড়ার সকলেই এখানকার অনেক দিনের অধিবাসী। তাই, আমাদের সঙ্গে পাড়ার অনেকেরই জানাশুনো, এমন কি বিশেষ আত্মীয়তাও জন্মেছিল। পাশের বাড়ীর কর্ত্তাটি বড়ই ভাল লোক। তিনি যখন শুনলেন যে, আমার স্বামী বাড়ীতে নেই, তখন তিনি আর তাঁর বাড়ীর মেয়েরা এসে তখনকার মত যা কর্ত্তব্য, সবই করলেন। রাত্রি এগারটার সময় আমার একটি খোকা হল। মা সারা রাত পথের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু, কোথায় তিনি—কোথায় তিনি!

তিন চারদিন কেটে গেল। তখন আমরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম। মা বললেন, "আমি এমন কোন কথাই ত বলি নি মা, যার জন্যে সে আমাদের এই অবস্থায় ফেলে যেতে পারে।"

এ কথার আমি আর কি উত্তর দেব? মা তখন বল্লেন, "আর ত কোন উপায় দেখছি নে। সোণার চাঁদকে বাঁচাবো কি করে? তুমি যদি মত কর মা, তা হলে একটা কায করি। আমাদের এই বাড়ীর নীচেতলাটা কাউকে ভাড়া দিই। নীচে দুটো ঘর আর বারান্দা আছে, পাশে রান্নাঘর আছে, সবটাই ভাড়া দিই। আমরা উপরের ঘর দুটো নিয়ে থাকি; উপরের

বারান্দার এক পাশেই আমাদের রান্না হবে। তা ছাড়া ত কোন পথই দেখি না।

আমি বল্লাম, "তাই কর মা। ওবাড়ীর কর্ত্তাকে বল্লে তিনি কোন ভদ্রলোক পরিবারওয়ালা ভাড়াটে ঠিক করে দিতে পারবেন। গয়নাগাটি যা ছিল, সবই ত গিয়েছে। থাকবার মধ্যে এক যোড়া বালা আছে। তা আমি বেচতে পারব না, আমায় খোকার বৌয়ের জন্যে রেখে দেব।"

অত দুঃখেও মা হেসে বল্লেন "দেখ দেখি পাগলীর কথা। এই সবে চার দিনের ছেলে, এখনই ওর বিয়ের ভাবনা! আচ্ছা বৌমা, খোকার নাম কি রাখা যাবে?"

আমি বললাম "বসন্তকালের প্রথম দিনে খোকা হয়েছে, ওর নাম হয় বসন্ত, আর না হয় মলয় রাখুন।"

মা বল্লেন, "যদি কোন দিন সে ফিরে আসে তখন দু'টা নামের একটা পোষাকী নাম করা যাবে। এখন ওকে আমরা ফাগুনে বলেই ডাকব।"

আমি বল্লাম, "বেশ নাম মা, ও আমাদের ফাগুনে। ফাগুনের প্রথম দিনে ও এসেছে, ওর এই নামই ভাল। আর এ দিনেই—"

মা বল্লেন, "সে কথা আর তুলো না মা। সে যে এমন করবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

আমার খোকার নাম ফাগুনেই বহাল হল, কিন্তু কৈ, তিনি ত এলেন না, একবার ত আমার সোণার বাছাকে আদর করলেন না!

পাশের বাড়ীর কর্ত্তার চেষ্টায় ভাড়াটে পাওয়া গেল। একটী ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে আমাদের নীচে দুটি ঘরে বাস করতে লাগলেন। ভাড়া স্থির হ'লো বাইশ টাকা। কলকাতা সহরে এই বাইশ টাকার উপর নির্ভর ক'রে আমরা সংসার চালা'তে লাগলাম। কি ক'রে চলছে, তা মাথার উপর যিনি আছেন, তিনিই জানেন। মায়ের সঙ্গে আমিও একবেলা খাই, শুধু একাদশীর দিন স্বামীর কল্যাণ-কামনায় আমি আমিষ স্পর্শ করি। এমনই দুরদৃষ্ট যে, আমার এত সাধের ছেলে ফাগুনেকে পেট ভ'রে দুধটুকুও দিতে পারিনে। কি ক'রব, সবই অদৃষ্টের ফল!

এমন দিন এই দুই বৎসরের মধ্যে যায়নি, যেদিন তাঁর কথা আমার মনে না হয়েছে। কি যে আমার হয়েছে, আমি রাত্রিতে ঘুমোতে পারিনে, একটু শব্দ হলেই আমার মনে হয় ঐ বুঝি তিনি এলেন! কোথায় তিনি?

শেষে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়ল; সংসারের কষ্টে দুশ্চিন্তায় আমি এমনই অবসন্ন হয়ে পড়লাম যে, এক একদিন বিছানা থেকে উঠতে পর্য্যন্ত কষ্ট হ'তো। কিন্তু উপায় নেই। আমার বুড়ো শাশুড়ীর যে সাহায্য ক'রবার কেউ নেই,—আমার ফাগুনের যে মা, ঠাকুরমা ছাড়া যত্ন ক'রবার তৃতীয় লোকটি নেই। রোজ জ্বর হয়, কাউকে বলিনে। ব'লেই বা কি হবে? দুবেলা যাদের আহার জোটে না, তাদের আবার রোগের চিকিৎসা হবে কোথা থেকে?

আমার আজ শুধুই মনে হচ্ছে, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, আমার যন্ত্রণার অবসান হতে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু মনে বড়ই কষ্ট রইল যে, তাঁকে একবার না দেখেই আমার জীবন শেষ হবে। কোনও দিন ত আমার মনের এ অবস্থা হয়নি! আমি যদি মরে যাই, আজই যদি আমার জীবন শেষ হয়, তা হলে আমার ফাগুনের কি হবে? তিনি যদি একবার এসে দাঁড়াতেন, তাঁর কোলে যদি আমার সর্ব্বস্ব ধনকে দিতে পারতাম, তা হ'লে ত আমার মরণের ভয় ছিল না। ছেলেকে তাঁর হাতে সমর্পণ ক'রে, তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আমি যাত্রা করতাম। আজ এই দু' বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও ত আমার মনের ভাব এমন হয় নি। তারই জন্যেই ত এতকাল পরে এই কথা কয়টি লিখতে বসেছি।

কিন্তু, আর যে আমি ব'সে থাকতে পারছিনে; আমার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। তবে কি সত্যিসত্যিই তাঁকে একবার না দেখেই আমায় চোখ বুজতে হবে?

না, না, সে কিছুতেই হবে না—আমার ফাগুনেকে একলা ফেলে আমি যেতে পারব না,—তাঁর মুখখানি না দেখে আমি মরতে পারব না। মা সতীরাণী, আমার জীবনের সাধ কি অপূর্ণই থেকে যাবে? আমি যে কায়মনোবাক্যে এতকাল তাঁরই নাম করেছি। সে কি বিফল হবে?

ঐ শোন, কার যেন পদশব্দ পাচ্ছি আমাদেরই সিঁড়ি মধ্যে। ও শব্দ যে আমার চেনা—দু'বছর কেন, দুশো বছর পরেও ও শব্দ আমি চিনতে পারি।

আর না—এইখানেই কথা শেষ। তিনি যে এসেছেন, মা সতীরাণী, তুমি আমার বেদনা বুঝতে পেরেছিলে? ঐ যে শব্দ!

আর আমার ফাগুনে, আজ তো ফাগুনে নাম ঘুচে গেল—আজ এই নব-বসন্তের প্রথম দিনে তুই মলয়কুমার না, না,—তুই আমার ফাগুনে!

শ্রীজলধর সেন।

জগদিন্দ্র-স্মৃতিপূজা

[১] স্মরণে

ছিলে কমলার স্নেহের দুলাল, বাণীমন্দিরে পূজারী,
বিপুল বিত্তে লভনি তৃপ্তি—নিত্যধনের ভিখারী ;
বাণীর চরণ-কমলে যেথায় গুঞ্জরে মধু অলি,
খেলে কুতূহলে মানস মরাল, বিকাশে কমল কলি ;
চির বসন্ত যেথা বিরাজিত প্রকৃতির সম্ভারে ;
সদা সঙ্গীতে দিক্ মুখরিত স্বর্ণবীণার তারে ;
ছিল সে লোকের আনন্দগীতে হৃদিখানি পরিপূর,
মধু নিক্কণে ধ্বনিয়া উঠিত বাণীর বীণার সুর।

চির সুন্দর "শ্যামসুন্দর" তোমার নয়ন আগে
চিত্রিত করি শ্যামলা ধরণী ধরেছিল অনুরাগে ;
বাঞ্ছিত লাগি বিরহ বেদন গুমরি গুমরি উঠি
চির ভাস্বর হয়ে আছে, আজ 'সন্ধ্যাতারা'য় ফুটি।
"এত দিবসের এত তপস্যা ব্যর্থ" ত আজ নয়,
অমৃতের মাঝে তুমি মহারাজ, প্রীতি স্মৃতি হেথা রয়।

শ্রীঅবনীকুমার বসু।

[২] কবি মহারাজের কথা

বড় ডিগ্রী নাই, অর্থবল নাই, পদগৌরব নাই, সুকণ্ঠ নাই, কাযেই ধনিলোকের সঙ্গে পরিচয়ের কোন সুযোগ সুবিধা হয় নাই। সাহিত্য লইয়া নাড়াচাড়া করার অভ্যাসটা বরাবরই আছে, সেই সুবাদে দুই জন ধনিলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া গিয়াছিল—একজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আর একজন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। আর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ পরিচয় তাঁহাদের স্বভাবসুলভ স্নেহময় অনুগ্রহেই ঘটিয়াছিল।

ধনিলোকের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের গৌরবে দেখি, অনেকে আমাদিগকে রীতিমত কৃপা করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন—নিম্নশ্রেণীর জীব মনে করিয়া আমাদিগের সঙ্গে কথা বলিতেও তাঁহারা কৃপণ। ধনিলোকের সঙ্গে পরিচয় কেন, বন্ধুতাতেও কোন গৌরব আছে বলিয়াও আমার মনে হয় না। লোকে বলিবে, ইহা দম্ভের কথা। বটেই ত! দম্ভ ত কাহারও একচেটিয়া নয়। ধনে দম্ভ জন্মে—দৈন্যেও দম্ভ কম জন্মে না।

আমি যে দু'টী ধনিলোকের নাম করিলাম—তাঁহাদের সহিত পরিচয়ে সত্যসত্যই গৌরব আছে। দেশবন্ধুর ত কথাই নাই। আমি মহারাজের কথাই আজ বলিব।

মহারাজ ধনী ছিলেন। কিন্তু সে ধন ত তাঁহার কেবল মাত্র লক্ষ্মীর দানে নয়—লক্ষ্মীর কৃপা অপেক্ষা সরস্বতীর স্নেহ তাঁহার উপর ছিল ঢের বেশী। কিন্তু তাহাতেই বা তাঁহার সহিত পরিচয় গৌরবজনক এমন কি হইল? কাহার দানে জানি না, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য যে তাঁহার অনেক বেশী ছিল একথা খাঁটি সত্য। ধনের কথা বলিতেছি, তাই ঐশ্বর্য্য বলিলাম। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের 'ঐশ্বর্য্য' ও 'মাধুর্য্যে'র প্রভেদ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দোষ ধরিবেনই।

তাঁহার বিষয়সম্পত্তি কত, আয় ব্যয় কত, এসকলের সন্ধান কোন দিনই রাখি নাই—রাখিবার প্রয়োজনও দেখি নাই। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার হৃদয়ভাণ্ডার

পরিপূর্ণ, হৃদয়ের দ্বারে অবিরত দানসত্র চলিয়াছে, আমরা জুটিতাম সেই দানসত্রে,—কখনও বিমুখ হই নাই।

হৃদয়ের অফুরন্ত মাধুর্য্য ছিল বলিয়াই তিনি ধনী-দরিদ্রের প্রভেদটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যেমন রসজ্ঞ ছিলেন, তেমনি গুণজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রীতির মধ্যে আন্তরিকতা ছিল অগাধ। কাযেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া স্বাভাবিকই ছিল।

তাঁহার সহৃদয়তার বিবৃতি পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, আমি আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না। আমার নিজের সঙ্গে ব্যবহারেও তাঁহার সহৃদয়তার উদাহরণ ঢের আছে। কিন্তু তাঁহার গুণগানচ্ছলে নিজের কথা পাঁচ কাহন করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে চাহি না। আমিত্বের চাতুর্য্যে আর মাধুর্য্যকে ম্লান করিতে চাহি না। আমি কেবল দেখাইব তাঁহার স্বভাব-সুলভ সহৃদয়তায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কত লাভ হইয়াছিল।

সহৃদয়তার জন্ত তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক ও মজলিসী। মজলিস মসগুল বা জৌলুস করিবার জন্ত যে যে গুণের আবশুক, সবই ভগবান তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছিলেন। সহৃদয়তা লোক বাছিয়া বাছিয়া ঘনিষ্ঠতা করে না। সেজন্ত যে সকল লোকের কোন গুণবৈশিষ্ট্য বা বৈদগ্ধ্য নাই, এমন বহুলোকের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সকল লোক তাঁহার সাহচর্য্য পাইয়া সৌজন্ত বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রে উন্নত হইয়াছে। রাজ-পরিবারে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও তিনি যে বঙ্গের দীনতম কুটীরের তুচ্ছতম সংবাদটি পর্য্যন্ত রাখিতেন, ব্যবহারিক জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা-বৈচিত্র্যের যে সন্ধান রাখিতেন, সর্ব্ববিধ লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে অভ্রান্ত অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা কেবল সম্ভব হইয়াছিল সকল শ্রেণীর লোকের সহিত নির্ব্বিচারে মেশামিশির ফলে।

গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার হৃদয় ছিল নিরাবরণ, নিরাভরণ। সামাজিক জীবনে তাঁহার সহৃদয়তা ছিল বিদ্যালঙ্কার-মণ্ডিত। শম্বুক যেমন আপনার প্রকৃতিদত্ত গৃহ পূর্ব্বে বহন করিয়াই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করে, পৃথিবী যেমন তাহার মেঘময় পরিবেষ্টনী ও উপগ্রহমণ্ডলী সঙ্গে লইয়া সৌরমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে, মহারাজও তেমনি তাঁহার চারি পাশের পণ্ডিতবর্গ ও বিদগ্ধমণ্ডলী সঙ্গে লইয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার চারি পাশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে লইয়াই মহারাজের সম্পূর্ণ সত্তা ছিল।

যে সকল বিদ্বান ও সুধী সজ্জন উপগ্রহের মত তাঁহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন তাঁহার হৃদয়েরই আকর্ষণে—জ্ঞান রশ্মিজালে নয়। তাঁহার চারিপাশের সারস্বতসমাজে ছিল সংস্কৃতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, বড় বড় ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যসেবী, সাহিত্যজ্ঞ, কবি, গায়ক, সম্পাদক,—রাজনীতিজ্ঞ ও দেশনেতা। এই যে দেশের শ্রেষ্ঠ গুণীজ্ঞানীদের সঙ্গে সংসর্গ, সাহচর্য্য, কথোপকথন, ভাবের আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনা তাহার ফল কি সামান্ত? ইহার ফলে মহারাজ যে বৈদগ্ধ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র বিশ্ব বিদ্যালয়েই কেহ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অবশ্য ইহার সঙ্গে তাঁহার নিভৃত অধ্যয়ননিষ্ঠা ছিল, দেশ-ভ্রমণ ছিল, নিজস্ব চিন্তাশীলতা ছিল। তাঁহার বৈদগ্ধ্য-লাভের প্রধান নিদান কিন্তু তাঁহার সহৃদয়তা।

মহারাজ যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিলেন এই বিদ্বৎ-সংসর্গে। আমাদেরও লাভ কম হয় নাই। আমরা এই বিদ্বৎসমাজের এককোণে স্থান পাইয়া তাঁহার প্রসাদে ও প্রাসাদে অনেক কিছু শিখিয়াছি—অনেক গুণী জ্ঞানীর সহিত পরিচিত হইয়াছি। গুণীজ্ঞানীরাও মহারাজকে বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করিয়া যে 'পরিমল-মণ্ডল' রচনা করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহাদেরও জ্ঞানোন্নতির সহায়তা করিয়াছিল। মহারাজের সহৃদয়তার সূত্রে যে মণিমুক্তাগুলি মাল্যে গ্রথিত হইয়া এক দিন বঙ্গবাণীর কণ্ঠে শোভা পাইয়াছিল, আজ মহারাজের অভাবে তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

বাংলা দেশে সহজে একটি বিদ্বৎগোষ্ঠী বা সারস্বত-

সমাজ গড়িয়া উঠে না। কে গড়িবে? তাহাতে দেশের সারস্বত-সাধনা অপূর্ণাঙ্গ থাকিয়া যায়। সম্মিলনের শক্তি যে সাধনাকে পরিপূর্ণতা দেয়, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশাখার পরস্পর আনুকূল্যে দেশের সমগ্র জ্ঞানমহীরুহই সম্পূর্ণ সবল ও সফল হয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ব্রতিগণের মধ্যে প্রীতিবন্ধন যে সারস্বত সাধনায় লক্ষ্মী-শ্রী সম্পাদন করে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সুযোগ কোথা? দেশে মহারাজের মত সহৃদয় জ্ঞানানুরাগী কৈ?

মহারাজের হৃদয় মাধুর্য্যের মধ্যে দুইটি প্রকৃতি ছিল—একটি পৌরুষ-প্রকৃতি, আর একটি নারী-প্রকৃতি। মাধুর্য্যের পৌরুষ প্রকৃতি ফুটিয়াছিল পৌরুষসামর্থ্য সুলভ ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌতুকে—ও নানা প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে। আর মাধুর্য্যের নারী-প্রকৃতি ফুটিয়াছিল সঙ্গীতাদি সুকুমার কলায়, মৈত্রীবন্ধনে ও সাহিত্য-সাধনায়।

সাহিত্য-সাধনাতেও তাঁহার ঐরূপ দুইটি প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বিরাট সভায় বিরাট কণ্ঠে যখন তিনি তাঁহার বক্তৃতা আবৃত্তি করিতেন, তখন পৌরুষ রাজশ্রী বিজয়িনী হইত। আর গদ্য রচনার গাম্ভীর্য্যে মেঘমন্দ্রে ওজস্বিতায়, নির্ভীক ভঙ্গিতে ধ্বনিত হইত তাঁহার শাস্ত্র রসাস্পদ পৌরুষ-মহিমা। নারীত্বের লালিত্য ফুটিয়াছিল তাঁহার কলঝঙ্কৃত লাস্যহিল্লোলিত কবিতাবলীতে।

মহারাজের গদ্য রচনার ভঙ্গি কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের রচনার অনুবর্ত্তী। ইহার ধ্বনি গম্ভীর, গতি মন্থর, ভাষা সমাসবহুল, রাজশ্রীমণ্ডিত, শুচি-মার্জ্জিত ও অনবদ্য সুনির্ব্বাচিত বিশেষণের ঐশ্বর্য্যে সমারোহময়। এই ভঙ্গিকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলাম—

"তব পারদে ঝঙ্কৃত পদে বিরচিত নবকাদম্বরী
গৌড়ী রীতির ভূষণে দিয়াছ বঙ্গমাতার অঙ্গ ভরি।"

বাক্যাবলীর মধ্যে একটা তরঙ্গায়িত ছন্দের সাড়া পাওয়া যায়, যথা—

"এই দুঃখ দারিদ্র্য ক্লিষ্ট, রোগ-শোকপ্রপীড়িত, জরা-মরণসন্ত্রস্ত ধরণীমণ্ডলে অমৃতরূপিণী নারী তুমি কাহার অনুপম সৃষ্টি? অন্নহীন ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার সময় তুমি অন্নপূর্ণা,—অসহ্য রোগযাতনাক্লিষ্ট রোগীর শয্যাপার্শ্বে তুমি মূর্ত্তিমতী করুণা,—পরার্থে আত্মোৎসর্গ-জনিত স্বর্গের, দধীচি অপেক্ষাও তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারিণী। হিমসন্নিপাত ক্ষুণ্ণা নিরাভরণা দীনা প্রকৃতি সুন্দরী যেমন বসন্তের করস্পর্শে বর্ষে বর্ষে পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকে ও কোমল কিশলয় শোভায় পরিশোভিতা হইয়া লোক-লোচনের আনন্দ সম্পাদন করে, তেমনি মানবের হিংসাদ্বেষ-কলুষিত কুলিশ কঠোর ও অনুর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে নন্দনের পুষ্পসমাকুল-কল্পলতিকার বিকাশের যে আভাস আমরা মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি, তাহা, হে নারি, তোমারি সুধাময় স্নেহস্পর্শের বিস্ময়করী শক্তির অনির্ব্বচনীয় অভিব্যক্তি।"

(নূরজাহান)

শব্দালঙ্কারের ঘটা ও অর্থালঙ্কারের ছটা দুইএর একত্র সমাবেশ পাওয়া যায়, এই রাজশ্রীমণ্ডিত ভাষায়—

"একজনের জীবিত কালে তাহার স্নেহব্যাকুল বাহুর বেষ্টনের মধ্যে ফাল্গুন পূর্ণিমার রজতকিরণধারায় স্নান-স্নিগ্ধা মেদিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য মালঞ্চবিতানোত্থিত মল্লীমালতীর মনোমদ গন্ধ, আম্রমঞ্জরীর সুধারসতৃপ্ত বসন্ত-বৈতালিকের মনোমোহন কণ্ঠ যেমন করিয়া দেহ-মন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন করে, সেই স্নেহবাহু দু'টী যখন কালের অকরুণ হস্ত আসিয়া আমার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া দেয়, তখনো চিরদিনের সেই বসন্তবর্ষাশরদধিষ্ঠিতা প্রবীণা ধরণী বর্ষে বর্ষে তেমনি করিয়া নবীনা হইয়া উঠে। মলয়াচল-সম্পৃক্ত মন্দানিল বর্ষে বর্ষে বসন্তের পুষ্পবাটিকায় তেমনি করিয়াই অতিথির বেশে উপস্থিত হয়। শ্যাম-কান্তি নব-জলধরের স্নিগ্ধকান্ত মনোমোহন মূর্ত্তি আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নিদাঘের যজ্ঞানল তেমনি করিয়াই নির্ব্বাপিত করিবার জন্য পরিপূর্ণ শান্তিকুম্ভ হস্তে গভীর মন্দ্রে অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করে। কিন্তু হায়! যাহার চক্ষে জগৎ দেখিতাম, সে চক্ষু আজ নিমীলিত।" (নূঃ জাঃ)

শব্দ বৈভবের সঙ্গে অর্থ গৌরবেরও অভাব নাই—

"মোগলের আদি পুরুষ তৈমুরের শস্ত্রশক্তির ভীষণ

পরিচয় জগৎ একদিন পাইয়াছিল, তাহার কৃত নরমুণ্ডের মসজিদ-চূড়াগ্রভাগ একদিন ভারতবর্ষের শান্ত-সুনীল আকাশতলে হাহাকার ধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের ইরাণী নাদির এবং আফগান আবদালীর কীর্ত্তি-কুশলতায় দিল্লীপুরীর পাষাণপথ শোণিতের কর্দ্দমে একদিন পরিপূরিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মোগল-সাম্রাজ্যের অভ্রভেদী মর্ম্মর-মন্দির যাহার সুবর্ণ-চূড়াগ্রভাগের রশ্মি-রেখায় ভারতের নীলাকাশ একদিন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—সে অত্যুজ্জ্বল মণি-হর্ম্ম্যের 'নন্দা' 'ভদ্রা' 'জয়া' প্রভৃতি শিলার বিন্যাস নির্ম্মমতার বজ্রলেপে সুদৃঢ় হয় নাই—তাহা আকবর শাজাহান প্রভৃতি লোকোত্তর পুরুষগণের দয়া-ধর্ম্ম স্নেহমমতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।" (সুঃ জাঃ)

এ শ্রেণীর গদ্য-রচনা-ভঙ্গি আজকাল আর চলে না—মহারাজই এই ভঙ্গির শেষ লেখক। বরজলালের দিন গিয়াছে—"এখন গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি।" তাই মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—

"তোমার সভা হল ভঙ্গ
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গ।"

তাঁহার বিদায় দিনে তাই বলিয়াছিলাম—

"হে গুণী রসিক, তোমার বিহনে ধ্রুপদের সভা ভঙ্গ হবে
হে জগদিন্দ্র, রাঢ় বরেন্দ্রে মুরজ মন্দ্র স্তব্ধ র'বে।"

সাহিত্যে মহারাজের নারীত্ব-মাধুর্য্য ফুটিয়াছে তাঁহার কবিতায়। কবিতাগুলির ভাব সুকুমার, ভঙ্গি লীলায়িত, গঠনসৌষ্ঠব সুসমঞ্জস, ছন্দ লাস্যচটুল ও ভাষা ললিত স্বচ্ছ-তরল লাবণ্যময়।

মহারাজের গদ্য কৈলাসের কেশরালঙ্কৃত তেজস্বী সিংহ —আর কবিতা বৃন্দাবনের গোষ্ঠচারিণী পয়স্বিনী শ্যামলী ধেনু।

যৌবনের কুঞ্জশালায় যে কাব্যলক্ষ্মীর আসিবার কথা, তিনি এলেন যৌবনান্তে বনস্পতির ছায়ায়। তাই তাঁহার কবিতায় কারুণ্যের সুর—নৈরাশ্যের ইঙ্গিত রচনার সৌকুমার্য্যকে বেদনাতুর করিয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

গোধূলি এসেছে জীবনে আমার, আঁধার আসিছে নেমে
পরাণে ললিত আশাবরী যত সকলি গিয়াছে থেমে,—

কবি ললিত আশাবরী গাহিবার অবসর পান নাই বটে, তবে পূরবী বেহাগ গাহিয়া গিয়াছেন। কবি আক্ষেপ করিয়াছেন—

সে দিন ছিল মলয়ানিল পিকের কলতান
বিহগরবে প্রভাতে যবে খুলিত দু'নয়ান,
সুনীল নভে চাহিয়া যবে দিগন্তের পারে
বসিয়া ধ্যানে উদাস মনে খুঁজেছি যেন কারে।
বন-বিতানে মধুপ গানে জুড়াত যবে কান
বিহান সাঁঝে হৃদয় মাঝে বাজিত যবে গান,
তখন তুমি কোথায় ছিলে ওরে কাঙাল মোর ?
রাজার ধনে দিতাম ভ'রে রিক্ত ঝুলি তোর।
মলয় আর বহেনা হেথা ফাগুন দিন নাই
বসন্তের পুষ্পশোভা এখন কোথা পাই ?
মালতী যুথী বকুল যত ঝরিয়া গেছে সব
নীরব আজি কুঞ্জবনে বিহগ কলরব।
সুচিরাগত অতিথি, কেন এমন দিনে এলে ?
ফিরিতে হবে বুঝি বা আজ আঁখির জল ফেলে!

অতিথি সুচিরাগত সত্য,—কিন্তু অতিথিকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হয় নাই। অতিথি যে কয়েক তিথি ছিলেন, তাঁহার সেবার ত্রুটী হয় নাই,—রাজার ধনে তাহার রিক্ত ঝুলি ভরে নাই বটে, কিন্তু সেবকের ভক্তি নিষ্ঠা আকূতিতে তাঁহার অন্তর এমনি ভরিয়া ছিল যে, যখন তাঁহার চির-বিদায় লইতে হইল, তখন "আঁখির জল ফেলেই" যাইতে হইল।

জীবনের অকাল-অপরাহ্ণের অবসানের দীর্ঘছায়া অজ্ঞাতসারে তাঁহার মগ্ন-চৈতন্যে পড়িয়াছিল। জীবনের অন্তক্ষেত্রে তাহা বুঝা না যাউক, যে রস ছন্দ অবচৈতন্যকে আলোড়িত করিয়া জাগিয়াছিল তাহাতে স্পষ্টই জাগিয়াছিল—

আজি সূর্য্য বসিয়াছে পাটে
রুদ্ধ বিপণির দ্বার জীবনের হাটে,
সন্ধ্যা আসে সুধীরে নামিয়া
শ্রান্ত নয়নের 'পরে ধূসর অঞ্চল টানি দিয়া।
মধুমত্ত মধুপের রব
বিহঙ্গ কাকলি গীতি স্তব্ধ আজি সব।
আসে অই আসন্ন আঁধার
উচ্ছ্বসিত অশ্রুবিন্দু, নাই নাই সীমারেখা তার।
দিন যে ফুরায়ে যায় মম
হে অন্তরতম
আর যে গো প্রতীক্ষার নাহি অবসর,
জীবন দোসর,
মরণ-সাগর-বেলা শুষ্ক বালুকায়
তোমারে হেরিয়ে যেন মোর শেষ নিমেষ ফুরায়।

আর একটি 'দিন ফুরানোর গান' কবির বুকের রক্তে লেখা,—নৈরাশ্যময় যৌবনাত্যয়ের অনুভূতি 'অর্থান্তর' রস অলঙ্কারে ঝঙ্কৃত।

শ্যাম, সবারি দিন ফুরালে শ্যামা হয়ে যায়,
শিখিপুচ্ছ রয়না ভালে, ললাটবহ্নি ভায়
মোহন বাঁশী আর বাজে না প্রেমের শত ছলে,
বক্ষে তিলক হার রাজে না, বরগুঞ্জ গলে,
ভস্মরাগের অনুরাগে পীতধড়া ম্লান,
অসি হ'য়ে বাঁশী জাগে, নিকুঞ্জ শ্মশান।

'নিকুঞ্জ আজ শ্মশান,—'স্মরের' দিন আজ ফুরাইয়াছে স্মরহরকে স্মরিবার দিনে তুমি 'বসন্ত' আর বৃথা কেন আসিয়াছ?—কবি ক্ষুব্ধ অভিমানে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

কোন্ দেবতার পূজার মন্ত্র পাঠের তরে
কে তুমি এসেছ আমার দীর্ণ জীর্ণ ঘরে?
ফিরে যাও ওগো, তোমার হেথায় নাহিক কায
স্মর নয়—যিনি স্মরহর, তাঁরে স্মরিব আজ।

জীবনের সন্ধ্যা আসন্ন—সে সংবাদ কবি অন্তরেই জানিতে পারিয়াছিলেন। জীবন-দেবতার ইঙ্গিত, তাই জীবনের লাভ লোকসানের হিসাবের খাতার এক কোণে লিখিয়া গিয়াছেন—

রবি ডুবে যায়, পূরবীর সুরে বাজে রাখালের বেণু
উন্মনা গাভী গোঠে ফিরে আসে উড়ায়ে গোখুর রেণু
খেয়া শেষ করি তরণী বাহিয়া পারাণী চলেছে ঘর,
রক্তিম রাগ রঞ্জিত ছবি অস্তগিরির পর।
আমি একমনে বসি বাতায়নে খুলি জীবনের খাতা,
ধূসর আলোকে পড়িতেছিলাম শেষের কয়টি পাতা
লাভের আশায় দিয়াছি দাদন, কড়িটি পাইনি ফিরে,
বিশাল শূন্য রহিয়া গিয়াছে নিরাশ জীবন ঘিরে।

জীবনে কত ব্যথা তিনি পাইয়াছিলেন, কত আশা তাঁর পূর্ণ হয় নাই, কত ক্ষোভ ক্ষতি ক্ষয় তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে,—তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কি করিয়া জানিব? আমরা তাঁহাকে সদানন্দ সদাপ্রফুল্লই দেখিয়াছি। তিনি আনন্দের ভাগই আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন, নিভৃত দুঃখের ভার ভোগপিচ্ছিল ঐশ্বর্য্য-কণ্টকিত পথে একাই বহিয়া গিয়াছেন। অন্তরে তিনি যাহা গোপন করিয়া গিয়াছেন, কবি তাহা ধরাইয়া দিয়াছে—

পূর্ণ হয়ে আসে দিন আজি
ডাকিছে সঘনে ওই খেয়া-পার করিবার মাঝি,
ঘনাইয়া আসিছে আঁধার
তরঙ্গ উদ্বেল সিন্ধু একাকী হইতে হবে পার।
নাহি শক্তি নাহিক সম্বল
শুধু আছে ভাঙ্গা বুক—আছে অশ্রুজল
সংসারতরুর শাখে বাঁধিতে পারিনি সুখনীড়
জীর্ণ পঞ্জরের তলে দুরাশা করেছে শুধু ভিড়।
সন্ধ্যা হয় হয়,
ক্ষোভক্ষতি শোক সুখ গণিবার নহে এ সময়
আসিয়াছে বিদায়ের বেলা
ভাঙ্গিতে হইবে আজি লাভ-হীন বাণিজ্যের মেলা।

অথবা—

জীবনের অপরাহ্নে, খেয়া পরিহরি
ঘাটে এনে বাঁধিয়াছি জীর্ণ মোর তরী।
দাঁড় তুলে পাল খুলে বসেছি নীরবে
প্রতীক্ষা করিয়া আছি কবে সন্ধ্যা হবে।

এতবার খেয়াঘাটে করি আনাগোনা
কাঠের তরণী মোর নাহি হলো সোনা।

তাঁহার সোনার তরণী যে "তুলসী কাঠের" হইয়া গিয়াছিল, তাহা আমরা জানি—কিন্তু কোন্ কাঠের তরণী যে তাঁহার 'সোনা' হয় নাই তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

কবির নৈরাশ্য বেদনার মূল উৎস কোথায়? আমরা নানাপ্রকারেই অনুমান করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তকবি যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, 'অনুযোগ' কবিতায়, তাহাই আসল বলিয়া মনে হয়।

যুগযুগান্ত জুড়ি' দুই পাণি অশ্রু সাগর তটে
করি আরাধন, দৈবে যদি গো দেব দরশন ঘটে।
আশা নিরাশায় কেটেছে দিবস, আসে বিভাবরী আজ
জীবনে আমার নেমেছে সন্ধ্যা পরণে গেরুয়া সাজ।
এখনও যদি হয়নি সময়, আর কি সময় হবে?
ঘনায়ে আসিল মৃত্যুলগ্ন, মিলনলগ্ন কবে?

কবি বৃন্দাবন লীলা লইয়া কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই বিষাদের সুর—মাথুর ব্যথায় আতুর, স্বর্ণ পিঞ্জরে লাঞ্ছিত লীলাশুকের কলরোদন।

শ্রাবণ ও মধুমাস তাঁহার প্রাণে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল—তাহাও সেই বেদনার তারে।

কবির "শ্রাবণ ধারা" সন্তাপ নিবারণের অশ্রুধারা—তিনি জানিতেন অশ্রু বিনা জীবনে 'শ্যাম সমারোহ'ত ঘটিবে না—জীবনের ঝুলনদোলা দুলিবে না।

মধুমাসের বরণে কবি কারুণ্যমন্থর অপূর্ব্ব সুন্দর ছন্দে গাহিয়াছেন—

আজি যে কিছু নাই নাই—
তোমারে কোথা দিব ঠাঁই?
দুখের ভারে বুকের হাড় ভাঙ্গা,
মনের বনে পুষ্প যত
ঝরিয়া গেছে লক্ষ শত
বেদনা শুধু শিমুলসম রাঙা।
সেদিন আজি স্বপ্নসম
ব্যথিত এই বক্ষে মম
ঝোলেনা আজ দোলের ফুলডোর।
নিবিড় ঘন এ আঁধারে
বেদনাভরা পারাবারে,
মরণ ভেলা চোখের আগে মোর।
ফাগুনে আজি ফুলবাসে
বিরহিজন পরিহাসে,
বিধুর কর বিষের শর হানে,
বিরস দিন প্রাণহীন
কেমনে আজি কাটিবে দিন
মনের ব্যথা দেবতা শুধু জানে।

শ্যামহারা বৃন্দাবন আর যৌবনহীন বসন্তশ্রী দুই-ই কবির কাছে সমান। তিনি জানিতেন, যৌবনের সহিত বসন্তের মিলনেই কবি-জীবনের চরম সার্থকতা! মহারাজের কবিজীবন সুরু হইয়াছিল যৌবনাত্যয়ে, প্রাবৃট্‌ ও শরতের সহিত তাঁহার কবিজীবনের মিলন হইয়াছিল। বসন্তের সম্পদ্ অফুরন্ত বটে, কিন্তু প্রাবৃটেরও দিবার কিছু আছে, শরৎও নিঃস্ব নয়। কাব্যলক্ষ্মী নৈরাশ্য ব্যথায় অবসন্ন কবিকে যাহা বলিতে পারিতেন, তাহা কবি ধরণীকে বলিয়াছেন—

ফাল্গুনের মালতী মঞ্জরী
পড়িয়াছে ঝরি।
নাহি খেদ তার তরে,
আষাঢ়ে আগ্রহভরে
ফুটিবে আবার
কুটজ কদম্ব ভার—
হবে অভিনব যৌবন সঞ্চার।
অঞ্চল তোমার
ভরিবে আবার
অশ্রুধৌত শিশিরের সুধাগন্ধ সেফালি-সম্ভার।
নিদাঘের সব নিষ্ফলতা
মিটিবে তা'
সুন্দর সে শ্যাম' শোভা জলদের স্নেহধারা দানে
প্রাবৃটের রাত্রি দিনমানে।

তাই বলি, মহারাজের কবিজীবন চরম সার্থকতা

লাভের অবসর না পাইলেও ব্যর্থ হয় নাই। মহারাজ যে জীবন লইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই ব্যক্ত হইয়াছে—

পূজা সাঙ্গ নির্ব্বাপিত দীপ্ত হোমানল,
যজ্ঞ তিলকের চিহ্নে ললাট উজ্জ্বল।
মধু ঘৃত সচন্দন পূর্ণ আজি নিবেদন
কুসুমে নির্ম্মাল্য গাঁথা-জীবন সফল,
শান্তিজলে সর্ব্ব অঙ্গ পবিত্র শীতল।

কবি ত পূজা সাঙ্গ করিয়া বিদায় নিলেন—কিন্তু দেবতার ত পূজা পাইবার লোভ মিটে নাই—তাই দেবতা আজিও আক্ষেপ করিতেছেন—

দেউলে দেউলে মন্দিরে কত বাজে উৎসব বাঁশী
লক্ষ পূজারী বন্দনা গায় নিত্য নিয়ত আসি।
হে মোর ভক্ত, সেবক আমার, তোর দেখা নাই আর!
কোথা অর্চ্চনা আয়োজন যত, উপচার সম্ভার?

মধ্য বয়সেই মহারাজ চলিয়া গিয়াছেন—

তাই—মধ্য দিনের ষোড়শোপচার আজিকে নিরুৎসব।

শ্রীকালিদাস রায়।

[৩] পদ-প্রান্তে

দুই বৎসর যাহা পারি নাই, আজও তাহা পারিব না। মনে কত কথা উঠে, কিন্তু ভাষায় তো ফোটে না। অনেকে কত কি লিখিলেন, নাটোর-মহারাজের অন্তরঙ্গ যাঁহারা, তাঁহারা কত ভাবে বেদনা ব্যথা ব্যক্ত করিলেন। আমি কতবার হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছি, কিন্তু নয়ন বাষ্পপূর্ণ হইয়াছে—শব্দ-স্ফূর্ত্তি করিতে পারি নাই; এজন্য মানসী-ও-মর্ম্মবাণীর কর্ম্ম-কর্ত্তাদের নিকট বহুবার অনেক রকম দুষ্পাচ্য উক্তি হজম করিতেও বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু যাঁহার মধুর সান্নিধ্য সম্ভোগের সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গ ঘরের লোকের মত ব্যবহার পাইয়াছিলাম, যিনি আন্তরিক স্নেহ ঢালিয়া দিয়া আমাকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিয়োগে আমি যে ব্যথা অনুভব করিয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা আমার নাই। মহারাজের কাছে কোন কথা বলিতে গিয়া সঙ্কোচ কখনও মনে স্থান পায় নাই। মহারাজও নিঃসঙ্কোচে তাঁহার রাজশ্রী আমাদের দারিদ্র্যের ভিতর এমনই করিয়া ডুবাইয়া দিতেন যে তাঁহাকে কখনও বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী মহারাজ বলিয়া ভাবিতে পারিতাম না। তিনি পুরাপুরি আমাদেরই হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে আমাদের দলের মধ্যে অবাধে সহজে টানিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। আজ মহারাজ জগদিন্দ্র নাই, আমরা আছি। কিন্তু তিনি ভাবের যে ঝঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবাসীর মনে তাহা চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

অনেক দিনের কথা, সমস্ত মনে নাই, ঠিক এক যুগ চলিয়া গিয়াছে। বাইশ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। আমাদের তখন গরমের ছুটী। বেজায় গরম, কোন কাজ করা যাইতেছে না। একখানা বই লইয়া বসিয়া আছি এমন সময় 'মানসী'র কর্ণধার শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত মহাশয় দর্শন দিলেন। আমি তাঁহাকে বসাইয়া বলিলাম, "ব্যাপার কি? এই দারুণ রোদে কি কাজ জুট ছিল না?"

উত্তরে তিনি বলিলেন, "জরুরি কাজেই এসেছি। মহারাজ আপনাকে বিকালে ডেকেছেন। বিশেষ কথা আছে।"

আমি 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম।

অপরাহ্নে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "ওরে অমূল্য, একটা নতুন সাহিত্যিক সাপ্তাহিক বেরুচ্ছে যে।"

আমি। কোত্থেকে ?

মহারাজ। তা আমি জানি না। তুই তার সম্পাদক—তুই বল্ না কোথা থেকে।

আমি। এ মজা মন্দ নয়। মহারাজ দেখ্ছি কাগজ বের কচ্চেন। তা করুন না—আমরা পড়তে তো পাব।

সুবোধ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বেরুবে। তাতে কেবল সাহিত্যিক ব্যাপার থাকবে। গল্প, কবিতা, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, সমালোচনা ইত্যাদি। মহারাজ আর আপনি তার সম্পাদক। এখন ঠিক করুন কি রকম করে বের করবেন।"

আমি বলিলাম, "মহারাজের নাম সম্পাদক বলে দেওয়া হোক্। আমি খেটে খুটে দেবো।"

মহারাজ বলিলেন, "তা হয় না। দুজনেই সম্পাদক—তুমি হবে de facto সম্পাদক, আর আমি de jure। আচ্ছা, কাগজ তো বার করবে—তবে যেন 'দুর্জ্জন-দমন-মহানবমী' হয়ে না দাঁড়ায়।"

সুবোধ বাবু বলিলেন, "সে আবার কি ?"

মহারাজ।—আরে,

> "ধর্ম্মবিহিংসক দ্বিপদপশূনাং
> কণ্ঠগলিতরুধিরং স্পৃহয়ন্তী।
> সম্প্রত্যুদয়বতীহ নগর্য্যাং
> শ্রীদুর্জ্জন-দমন-মহানবমী ॥"

সুবোধ বাবু বলিলেন, "কিছুই বুঝলাম না।"

তখন মহারাজ আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"প্রত্নতত্ত্বে এর সন্ধান মিলবে। সেকালে এই নামে একখানা কাগজ বের হত, আর তার মাথার উপর ঐ শ্লোকটা লেখা থাকত।"

আমি সুবোধ বাবুকে বলিলাম, "১২৫৪ সালের বৈশাখ মাসে ঐ কাগজের জন্ম—"

সুবোধ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন কাজের কথা হোক। প্রস্তাবিত কাগজ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হোক।" প্রথমে কাগজের নাম লইয়া অনেক আলোচনা হইল। মহারাজ কাগজের নাম রাখিতে বলিলেন, 'বাণী'। সুবোধ বাবু বলিলেন, "বাণী নামে অমূল্য বাবুর একখানা কাগজ ছিল। অন্য নাম দিলেই ভাল হয়।" মহারাজ বলিলেন, "'বাণী' নামটী বেশ। যদি 'বাণী' নাম না চাও—তবে নাম রাখ 'মর্ম্মবাণী'। সকল শক্তির আশ্রয়ভূমি—সমগ্র শক্তির উৎপত্তি-স্থান 'মর্ম্ম'। মর্ম্ম থেকেই সকল শক্তির স্ফুরণ বিকাশ হয়ে থাকে। মর্ম্মের বাণী যা তাই শক্তিময়ী বাণী। ঠিক ঠিক প্রয়োগ করতে পারলে মর্ম্ম নিশ্চয়ই স্পর্শ করবে। দেখ এ নাম পছন্দ হয় ?"

তারপর কাগজের নাম রাখা হইল—মর্ম্মবাণী। সম্পাদক হইলাম আমরা দুই জন—মহারাজ ও আমি। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়কে সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়কে কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা সাব্যস্ত হইল। অতঃপর সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ। আমি বাড়ী ফিরিলাম।

পরে শ্রীমানি বাজারের সম্মুখে দোতলায় একটী ঘর ভাড়া লইয়া সেখান হইতে ১৩ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার 'মর্ম্মবাণী' প্রথম প্রকাশিত হইল।

তাহার পর নিয়মিতভাবে ছয় মাস কাগজ বাহির হয়। কাগজের বেশ সুখ্যাতিও হইয়াছিল। তবে নানা কারণে অনেক দেনা হইয়া পড়ে। মহারাজ তখন ৺গয়াধামে অবস্থান করিতেছিলেন। কাগজ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মহারাজ আমাকে গয়ায় যাইবার জন্য লেখেন। যথাসময়ে আমি ও সুবোধ বাবু গয়ায় উপস্থিত হইলে মহারাজ সকল কথা শুনিলেন। পরদিন তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে 'মর্ম্মবাণী' 'মানসীর' সহিত সম্মিলিত হউক। কাজেও তাহাই হইল। মহারাজ মর্ম্মবাণীর সমস্ত দেনা মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

গয়ায় মহারাজের নিকট আমি তিন দিন ছিলাম। এই তিন দিন মহারাজের সঙ্গে সাহিত্যের বহু বিষয়ের আলোচনা হয়। সাহিত্যের তিনি কত রকম খবর রাখিতেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। অনেক দিন মেলা-

যেখায় তাঁহার সাহিত্য-সাধনা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পূর্ব্বেও কিছু কিছু পাইতাম। আজ নানা বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার স্বরূপ ধরা পড়িয়া গেল। বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস তিনি একরূপ জানিতেন। তবে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত তাঁহার ভাল করিয়া জানা ছিল না। সেগুলাকে তিনি সাহিত্যের 'খোসা' বলিতেন, কিন্তু সাহিত্যের শাঁসের—প্রকৃত রসের—সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ খবর রাখিতেন। তাঁহার মত সাহিত্যের, বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের সমঝদার বিরল বলিলেও চলে। সংস্কৃত সাহিত্যের রসের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটুকু তিনি বিশ্লেষণ না করিয়া ছাড়িতেন না।

গয়ায় গিয়া দ্বিতীয় দিন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় মহারাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসিয়া বলিলেন, "ওহে বিদ্যেভূষণ, ভাসের নাটকগুলো কেমন লাগে?" আমি বলিলাম "বেশ লাগে।"

মহারাজ বলিলেন, "শুধু বেশ বল্লে চলবে না, দুটো বচৎ কও।" বলিয়া আমাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া নিজেই 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ও 'মধ্যমব্যায়োগে'র উক্তি আওড়াইতে লাগিলেন। আর মধ্যে মধ্যে সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এটা কেমন বল দেখি?" "এরকমটা ক'জন লিখ্‌তে পারে?" ইত্যাদি।

আমি বলিলাম, "মহারাজ আপনি সব বইগুলো গুলে খেয়েছেন নাকি?"

এমন সময় কোথা হইতে একটা ময়ূর ডাকিয়া উঠিল। মহারাজ ময়ূরটাকে দেখাইয়া সুস্পষ্ট বিলম্বিতস্বরে বলিলেন—

"অতরুণমদতাণ্ডবোৎসবান্তে
স্বয়মচিরোদ্গত মুগ্ধলোলবর্হঃ।
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে
নদতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী॥"

আমি বলিলাম, "ভবভূতির শ্লোকও আপনার কণ্ঠস্থ যে।"

তিনি বলিলেন, "বকাটে ছেলে, পড়লাম আর আর কোথায়? কাব্য নাটকগুলো না পড়লে যে ইজ্জৎ থাকে না।" বলিয়া আবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জদ্বলয়-সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ।"
আমি। এ যে দেখি মেঘদূত।
মহারাজ।—

কেকা কর্ণামৃতন্তে সকুসুমকবরী কান্তিহারী কলাপঃ
কণ্ঠচ্ছায়াঃ পুরারের্গলরুচি রুচিরা সৌহৃদং মেঘনাদৈঃ।
বিশ্বদ্বেষিদ্বিজিহ্বস্ফুরদুরুপিশিতৈর্নিত্যমাহারবৃত্তিঃ।
কৈঃ পুণ্যৈঃ প্রাপ্তমেতৎ সকলমপি সখে চিত্ররূপং ময়ূর॥"
এটা কোন্ কবির জানি না। তুমি বল্‌তে পার?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় এটা শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে আছে।"

মহারাজ। ঠিক বলেছ—ঐখান থেকেই এটা আমার পড়া।—তারপর কত বিষয়ে আলোচনা হইল। আমি দেখিলাম, মহারাজ কাব্য, নাটকের কোনখানিই বাদ দেন নাই। আর এই সমস্ত গ্রন্থের যাহা কিছু সার সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন উচ্চারণ, তেমনই ব্যাখ্যা করিবার শক্তি। তারপর তিনি অলঙ্কার-শাস্ত্র লইয়া পড়িলেন। রস, বক্রোক্তি, রীতি পন্থীদের বা গুণপন্থীদের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা হইতে সুরু করিয়া ভামহ, রুদ্রট, বামন, উদ্ভট, বক্রোক্তি-জীবিতকার ও ভট্টনায়কের ধ্বনিতত্ত্ব বিচার এমনি সুন্দরভাবে করিলেন, মনে হইতে লাগিল যেন একজন বিশিষ্ট আলঙ্কারিকের পদপ্রান্তে বসিয়া আমি উপদেশ লাভ করিতেছি। অলঙ্কারের আলোচনা আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু এমন আক্কেল দিয়া বুঝাইতে কাহাকেও দেখি নাই। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। পুঁথি বাড়িয়া চলিল; আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

[৪] স্মৃতি-পূজা

জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ অপরিমেয় সৌভাগ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন—একথা সহজেই মনে আসে। কিন্তু তাঁর সেই সাধনার মন্ত্রগুলি যেন আমার কাণে মুখরিত হত, যখনই আমি তাঁর সংস্পর্শে আসতাম,—"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং চ মাং কুরু। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।" মহারাজ ছিলেন যেন এই মন্ত্রের সাধনার সিদ্ধি। সুদর্শন, সুপুরুষ, মিষ্টভাষী—সত্যই তাঁর রূপ ছিল মনোহর। জয়যুক্ত হতেন তিনি সকল কাযে। কারণ সাফল্যের যেটুকু প্রাণ—আন্তরিকতা—তা ছিল তাঁর সর্ব্ব অনুষ্ঠানে। জগদিন্দ্রের যশ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে বহুদিকে প্রসার লাভ করেছে। শত্রু তাঁর কেউ ছিল এ সন্দেহ মনে স্থান পায় না। প্রসিদ্ধ নাটোর রাজ-তখ্‌তে লক্ষ্মীবন্তই অধিষ্ঠিত হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। তিনি সেস্থান উজ্জ্বল করেছিলেন এবং নিজের নির্ভীক স্বাধীন মনস্বিতার প্রভাবে রাজবংশের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

আমরা যে যুগে জন্মেছি, সে যুগ পুরাতন ও আগন্তুক যুগের সন্ধিস্থল। এক যুগের আদর্শ অন্য যুগে স্থান পায় না—সে কাল-ধর্ম্ম। পুরাতন যুগে মানুষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করত প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম লাভ ক'রে, অর্থ সঞ্চয় ক'রে, রাজ-সম্মান পেয়ে বা নিজের চরিত্রগত বিশেষত্বের প্রভাবে। কৃতিত্বের তত সম্মান ছিল না, যত কুলের বা ধনের ছিল। নবীন যুগ—বিশেষ আগন্তুক কাল—চায় যে, কৃতিত্বের মর্য্যাদার আসন হবে সর্ব্বোচ্চে। "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" নীতি আবার যেন নবীন আবরণে এসে নিজের স্থান অধিকার করতে সচেষ্ট। অবশ্য এ বিদ্যা কেবল পুঁথিগত প্রাণহীন শিক্ষা নয়—এ বিদ্যা অর্থে সেই জ্ঞান, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে দেয়। ভবিষ্যতের উদ্ভিন্ন কোরকের মধ্যে আমরা এই মানবতার প্রতিচ্ছায়ারূপ মন্দারের সন্ধান পাই।

বর্ত্তমানে বর্ণাশ্রমী হিন্দু অন্ততঃ, যে কুলের মর্য্যাদা বিস্মৃত হয়েছে, সেকথা বলা যায় না। কিন্তু বংশের প্রতি শ্রদ্ধা এখনও পূর্ব্ববৎ সমান আছে একথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে বা বিদ্বান্ ধনকুবেরকে এখনও জগৎ পূজা করে। কিন্তু চরিত্রহীন ব্রাহ্মণ বা রূঢ় প্রকৃতি ধনাঢ্যের এখন সমাজে আর প্রতিষ্ঠা নেই। এদের উভয়ের অপেক্ষা চরিত্রবান্ শূদ্রের ও দরিদ্র পণ্ডিতের সম্ভ্রম বেশী। উচ্চ বংশোদ্ভব মূর্খের আসন টলেছে—অদূর ভবিষ্যতে তাকে বিপন্ন হতে হবে—এ বাণী স্পষ্ট শোনা যায়।

নাটোরের পরলোকগত মহারাজ যেন এই কাল-ধর্ম্মটুকু বুঝেছিলেন। তিনি বংশগত মর্য্যাদার সঙ্গে বিদ্যা ও সাধনা-লভ্য সম্মানটুকুকে তাই নিজস্ব ক'রে নিয়েছিলেন। ফলে তিনি এতটা শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। যদি ঐতিহাসিক বংশের তিনি প্রতিনিধি নাও হতেন, যদি ইংরাজ রাজের উপাধির ভার তাঁর নাও থাকত, তাহলেও জগদিন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালীর চক্ষু হ'তে অশ্রু উপহার ঝ'রে তাঁর শ্রাদ্ধ-বাসরকে সমান ভাবে পবিত্র করত। আমরা আজ এই দুইবৎসর পরেও জগদিন্দ্রনাথের স্মৃতিতে অশ্রু-তর্পণের অনুষ্ঠান করতে সম্মিলিত হয়েছি, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর নিজের মানবতা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

যেসকল সাধনা মানুষের জীবনকে উন্নত করে সেগুলি সমস্তই স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। এ বৈচিত্র্য ভরা জগৎকে উপভোগ করিতে গেলে প্রথমে চাই স্বাস্থ্য। সেদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ মাত্রায়। দেশের যুবকদের মধ্যে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার প্রসারের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছিলেন, প্রভূত অর্থব্যয় করেছিলেন। ব্যায়াম-পুষ্ট দেহের নিয়ামক স্বাধীন ও জ্ঞানদীপ্ত চিত্ত না হ'লে শরীর পশু-দেহ হয়

মাত্র। জগদিন্দ্রনাথ স্বয়ং যেমন নির্ভীক ও তেজস্বী ছিলেন, তেমনি তেজস্বী ও নির্ভীক প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবককে দেখবার তিনি সাধ রাখতেন। আর সেই নির্ভীকতা যাতে বিনয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাই তিনি ছোট বড় সকলের আদর করতেন, অথচ কারও চোখরাঙানির তোয়াক্কা রাখতেন না। তাঁকে নিগৃহীতও হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি সে নিগ্রহকে হাস্যমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। ইংরাজ সিংহের থাবার সেবায় আত্ম-সমর্পণ করে অনেক শ্রুতি-মধুর উপাধি লাভ করাকে তিনি জীবনের একটা ছোট খাট উদ্দেশ্য বলেও কোন দিন স্থির করেন নি। তিনি স্বজাতির হৃদয় সিংহাসনকে প্রাণহীন রাজদরবার অপেক্ষা অধিক রম্য স্থান বিবেচনা করতেন।

আমরা সাহিত্যিক, আমরা সমাদর করি জগদিন্দ্র-নাথের সাহিত্য সাধনাকে। কলা-বিদ্যা যাঁদের প্রিয়, তাঁরা মহারাজের মার্জ্জিত চারুশিল্পের নৈপুণ্যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। সঙ্গীতজ্ঞের বিশেষ প্রিয় ছিলেন তিনি, কারণ বাণীমন্দিরে তাঁর ভেদ-জ্ঞান ছিল না—কেবল গুণীর গুণকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, দরিদ্র বা ছিন্ন-বসন শিল্পীকে মহারাজের নিকট হতে দূরে অপসারিত হতে হত না।

সুরসিক মহারাজের কথা লিখতে ব'সে সোজা সরল ভাবে তাঁর গুণের পরিচয় দেওয়া, তাঁর রসিকতার আভাস দেওয়া, আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ সোজাসুজি সে কথা ভাবতে গেলে তাঁর স্মৃতিতে চক্ষে জল আসে, তাঁর অভাব এমনই বিরাট্ হয়ে ওঠে যে, সেই অভাবে দিশাহারা হতে হয়। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ। আর এই সাহিত্য-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তিনি ছোট বড় সকল সাহিত্য-সেবীকে এমন আপনার ক'রে নিয়েছিলেন যে, তাদের পক্ষে স্থির হ'য়ে শুষ্ক চোখে তাঁর বিষয় আলোচনা করা সম্ভবপর নয়।

আজ অন্যান্য সাহিত্যিকও তাঁর স্মৃতি-পূজার পূজারী রূপে আহূত হয়েছেন। সে আহ্বান আজ আমাকেও ধন্য করেছে। আজ আমি দুই ফোঁটা অশ্রু-উপহারে স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথের চরণ সিঞ্চিত করতে এসেছি। উপহার দিবার প্রাণের সামগ্রী আমার আর কিছু নেই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

দুর্জ্জন

মেঘে মেঘে থর্ থর্
বৃষ্টির ঝর্ ঝর্
তরুশাখা মর্ মর্
    আজিকার রাতে—
        প্রান্তর নির্জ্জন,
        থাকি থাকি গর্জ্জন
        কোথাকার দুর্জ্জন
            কিসে আজ মাতে

পিঙ্গল জটাজূট,
রক্তিম করপুট,
জীমূতের কি-মুকুট
    শোভা পায় শিরে—
        বজ্রের নিঃস্বনে
        কথা কয় কার সনে
        দুঃসহ পরশনে
            কার পাছে ফিরে

অন্ধ আবেগে মাতি,
কার লাগি দিবারাতি
জ্বালায়ে রেখেছে বাতি
অন্তর তলে !
ভৈরব হুঙ্কারে,
শরাসন টঙ্কারে
সব- কিছু শঙ্কারে
চরণেতে দলে !

দাপিছে মহান্ দর্পে,
যেন রে অযুত সর্পে,
কঙ্কাল- কালেরে অর্পে
অর্ঘ্যের ভার—
আবার অমনি ফিরে,
ভাসিছে নয়ন-নীরে,
দুঃখের জল কি রে
মুক্তার হার !

থাকি থাকি ছাড়ে ডাক্,
যেন রে প্রলয়-শাঁখ—
ত্রিভুবন নির্ব্বাক্
নিশ্চল হায় !
চপলার বাণ সনে
চঞ্চল বিনাশনে
চতুর হেমাসনে
ধেয়ে চলে যায় !

লয়ে তার সম্বল
বিনাশিছে দুর্ব্বল
অমরার অরিদল
চূর্ণিছে সব,
ত্রিশূলে বিদ্ধ করি
হানিছে শূন্য 'পরি
উঠিছে অভ্র ভরি
হাহাকার রব !

বাহিরে অট্ট-হাস—
বুকের ভিতরে বাস
পীড়িত সে নিঃশ্বাস
সদা ব'য়ে চলে,
সংহার নাহি সয়
তবু না-করিলে নয়—
মানবের পরিচয়
দহে পলে পলে !

তেয়াগিয়া রাজপাট্,
শক্তির পূজা-পাঠ,
পার হ'য়ে পারঘাট
যবে চলে যায়—
আঁখি মেলে চারিভিতে,
কেহ নাই বুঝে নিতে,
কি- বেদনা বাজে চিতে
কে বুঝিবে হায় !

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় ।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ।—মাঘ ।

সম্পাদকের সাজি—সম্প্রতি ডাঃ বেন্ট্‌লী সাহেব আদা-ছোলার উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, এখন হইতে আদাছোলা "সমাজে চলিত" হইবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে আদা ও ছোলার গুণাগুণ সম্পাদক মহাশয় বিবৃত করিয়াছেন।

নরদেহ-তত্ত্ব—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন। চলিতেছে।

কাস—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন। কাসরোগের প্রকার-ভেদ ও বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা। সুলিখিত প্রবন্ধ।

আহার সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন। কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লেখক আমাদের বলিয়াছেন। আহারের নিয়মের ব্যতিক্রমে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের আয়ু—শ্রীযুক্ত বিজয় গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশে জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালীর আয়ুর গড়পরতা উপস্থিত আন্দাজ তেইশ বৎসর মাত্র। পরাধীনতা, কৃত্রিমজীবন-যাত্রা প্রণালী, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক কারণ, রোগ, জরা প্রভৃতি আধিভৌতিক কারণ মুখ্যতঃ ইহার জন্ত দায়ী। লেখক পরাধীনতা ও কৃত্রিম জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রতীকার-কল্পে সুপ্রজননতত্ত্ব প্রভৃতির চেষ্টা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ, এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ শক্তির উদ্বোধনের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে পিত্তের কথা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন। পিত্ত দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। পিত্তের সূক্ষ্ম স্বরূপেই মানুষের শক্তি, শৌর্য্য, বীর্য্য, ওজঃ, তেজ, ক্রোধ, সাহস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত। পিত্তকে পরিরক্ষা করিবার ও পিত্তের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার কয়েকটি শাস্ত্রমত ব্যবস্থা লেখক মহাশয় বলিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি।

ত্রিদোষ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য—চলিতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বসু। ব্রহ্মচর্য্য পালন বিষয়ে শ্রীমদ্ স্বামী প্রণবানন্দের কয়েকটি বহুমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন। কয়েকটি রোগের গার্হস্থ্য চিকিৎসা। কুষ্ঠের ন্যায় দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ইন্দ্রযবের প্রলেপে শুধু কোনও ফল হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইহা কি লেখকের পরীক্ষিত?

স্বাস্থ্য-সমাচার—মাঘ।

অজীর্ণ রোগে স্বায়ত্ত চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। অজীর্ণ রোগের কারণগুলি এবারে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের লিখন-ভঙ্গী অতি সুন্দর, বক্তব্য বিষয়টি তিনি নিপুণতার সহিত গুছাইয়া বলিয়াছেন।

জীবনকল্যাণ—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দাস। এটিও ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আলোচ্য সংখ্যায় গাঁজা, চরস, ও সিদ্ধির শরীরের উপর ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধটিও সুন্দর চলিতেছে।

স্বাস্থ্য—দীনসেবক। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম।

ঔষধার্থে রসাঞ্জন—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। অ্যাণ্টিমণির আভ্যন্তরিক প্রয়োগ, ও ইন্‌জেকশন-বিধি, বিষক্রিয়া প্রভৃতি লেখক আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম দুইটি প্রবন্ধের ন্যায় এটিও সুলিখিত ও বহুল তথ্যে পূর্ণ।

শোকে সান্ত্বনা—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষাল। শোকার্ত্ত ব্যক্তি এ প্রবন্ধ পাঠে নিশ্চয়ই সান্ত্বনা লাভ করিবেন।

শিশুর পরিচর্য্যা—রোগে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শিশুর শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় লক্ষণ ও শুশ্রূষা। সুলিখিত প্রবন্ধ।

জরা প্রতিষেধ—শ্রীযুক্ত চক্রধর সাহা। ডাঃ হুকারের মতগুলি লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপদেশগুলি অবশ্যপালনীয়।

স্বাস্থ্য সমাচারের আলোচ্য সংখ্যাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সাহিত্য

প্রবাসী—মাঘ।

'কয়েকখানি পত্রে' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নানা বিষয়ে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়া দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার সুবিধা পাইবেন। প্রতিমা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোন বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্ত্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহ'লেই মুস্কিল থাকে না। তাঁকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির ক'রে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে এ কথা আমি মনে করিনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে। ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরাণো, ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা।' এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য, তিনি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (Personality of God) বিশ্বাস করেন কি না? Personal God সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কি জানিবার জন্ত আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। ঠাকুরকে খাওয়ান পরাণো বা তাঁহার বিবাহ দেওয়ায় ধর্ম্মের দিক হইতে

ভক্তি, ভাব এবং অনুভূতির দিক হইতে হিন্দুদিগের কোনরূপ আপত্তি ত নাই, বরং এ কার্য্য প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থই করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ধারণার সহিত এ সকল কার্য্যের বিরোধিতা ত নাই। কবিবর জীব-সেবাকেই যে ঠাকুরের প্রকৃত সেবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। দেবপূজার প্রণালী সম্বন্ধে তিনি সত্যই বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে ভক্তির যে প্রণালী তাহা হৃদয়বান সাধকের পক্ষেই উপযোগী, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর; তাহারা তাহার মধ্য হইতে যেটুকু রস পায় তাহার চেয়ে মূঢ়তাই বেশী সঞ্চয় করে।" অপর একখানি পত্রে তিনি গুরুর আসন লইতে চান নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি কবি মাত্র—আমি পথ চলিতে চলিতে গান গাহি—গম্যস্থানের খবর লই-ও না, কাহাকেও দিই না। কেহ যখন জিজ্ঞাসা করে, কেমন করিয়া সাধনা করিব, আমি বলি আমি ত সাধনা করি নাই।" অপর এক খানি পত্রে তিনি যে সত্যের সন্ধান দিয়াছেন, সেদিকে সকলেরই অবহিত হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছেন—"নিজের সুখ দুঃখ ও অবস্থার প্রতি সর্ব্বদাই করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, উহাতে নিজেকে প্রশ্রয় দিয়া কেবলি দুর্ব্বল করিয়া তোলাই হয়। নিজেকে ভুলিবার সাধনাই জীবনের প্রধান সাধনা এবং আমার যেটুকু নাই তাহার চেয়ে আমার যাহা আছে তাহা যে অনেক বেশী এই কথা স্বীকার করিতে পারাই সত্যকে স্বীকার করা।"

৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিত 'দেবেন্দ্র বাবুর উপদেশ উপাসনা ও দীক্ষা পদ্ধতি' সুন্দর আলোচনা সম্পাদক মহাশয় সাধারণে প্রচার করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে অনেক নূতন তথ্য আছে।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসুর সুচিন্তিত 'ভক্ত কবি শাহ আবদুল লতিফ ও সিন্ধুদেশের সুফী সম্প্রদায়' প্রবন্ধে জানিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। সুফী ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্ম ও বেদান্তবাদের সমতা ও পার্থক্য কোথায় তাহা লেখক সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের 'সত্তর বৎসর' পূর্ব্বের মতই সুন্দরভাবে চলিতেছে। পুরাতন কথাকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিবার ক্ষমতা শ্রদ্ধেয় লেখকের বেশ আছে।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'যবদ্বীপের পথে' পূর্ব্বের মতই সুন্দরভাবে চলিতেছে। বর্ণন-ভঙ্গীও মনোরম।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'আমার জীবনের কতকগুলি কথা'য় এবারে নূতন কিছুই পাইলাম না। তিনি ইংরাজি ভাষায় ও বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং আপনার জীবনের কাহিনীগুলি যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়ের নিকট হইতে আশা করি নাই।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'তে বিশেষ কিছুই দেন নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গৃহীত জয়পুরের ঔপনিবেশিক ও প্রবাসী বাঙ্গালী দিগের ফটো ও তাহাদের নাম ধাম দিয়াছেন।

বিচিত্রা—মাঘ।

জাভা-যাত্রীর পত্র—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে। দেশীয় নাচের বৈচিত্র্য, মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্যের সুন্দর বিবৃতি পাঠ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে হয়। রামায়ণ মহাভারতের আখ্যান ভাগ লইয়া এ দেশের লোকেরা নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এ দেশবাসীর জীবনের উপর এই দুই মহাকাব্য কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ভানুসিংহের পত্রাবলী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই রসোজ্জ্বল পত্র গুলি অনুপম নিসর্গ শোভা বর্ণনায় ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। আমরা দুইটী অনবদ্য সুন্দর উপমা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

'মাঘের দুপুর বেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগচে। এই রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না—আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখীটির মত চুপ ক'রে রোদ পোহায়।'

(২) 'তুমি জানো আমি নদী ভালোবাসি। কেন বলবো? আমরা যে ডাঙ্গার উপরে বাস করি, সে ডাঙা ত নড়ে না, স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিন রাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে চিন্তা-স্রোত ব'য়ে যাচ্চে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে—এই জন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব।'

রস ও রুচি—"পরশুরাম।" আজকাল একদল সাহিত্যিক সাহিত্যের বাজারে প্রচার করিতে চান, 'আমরা যা-কিছু বাঞ্ছনীয় বরেণ্য পরম উপভোগ্য মনে করি তার অনেকেরই মূলে কাম বর্ত্তমান। আর এই জঘন্য বৃত্তিই না কি আমাদের রসভোগের প্রবৃত্তি।' ইহাদের ভ্রম দূর

করিবার জন্ত অল্প কথায় পরশুরাম এই সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

পথে প্রবাসে—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

নরসিংহ মেহতা—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু। গুজরাটী কবিগুরু, পদাবলী রচয়িতা নরসিংহ মেহতার জীবন ও কাব্যালোচনা অল্প পরিসরের ভিতর সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের সহিত আমরাও বলি, 'এই পদগুলি এত সরল, সরস, তাহাদের মধ্যে মানুষের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের অতীত অথচ তাহার সহিত একান্ত ভাবে জড়িত অতীন্দ্রিয় রসলোকের ছবি সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

চীনে হিন্দু সাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। এই সঙ্কলিত প্রবন্ধে জানিবার অনেক কথাই আছে; কিন্তু লেখক মনোজ্ঞ করিয়া বলিতে পারেন নাই। প্রবন্ধে পাদটীকায় কোথা হইতে বক্তব্যগুলি গৃহীত লেখা থাকিলে ভাল হইত।

ভারতবর্ষ—মাঘ।

শাব্দিক কবি ও শব্দ মন্ত্র—শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে। লেখক বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীন ছড়া অবলম্বন করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন, 'গ্রাম্য ছড়া যতই অশ্রদ্ধেয় বা উপেক্ষিত হউক না কেন, এ গুলি হইতে দেশের আদিম অবস্থা অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। এই স্তরের শাব্দিক কবি মানুষের মনের উপর সমাজের উপর কত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।' লেখক আরও বলিতে চান, 'এগুলি বাংলা কবিতা রচনার প্রাক্-চেষ্টা—এই সকল লয় ভগ্ন ছন্দ হইতেই যে বাঙ্গালার বিভিন্ন ছন্দের রূপ গঠিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।' যাঁহারা বলেন পার্শী বয়াৎ হইতে বাংলা ছন্দের উৎপত্তি তাঁহাদের সহিত লেখক এক মত নন। এই সুন্দর প্রবন্ধে উচ্ছ্বাসের আধিক্য না থাকিলে আরও শোভন হইত।

শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক অপ্রকাশিত সরকারী চিঠিপত্র হইতে এই সুলিখিত প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়াছেন। অনেক নূতন কথা আছে।

বিশ্বসাহিত্য লেনিন্ ও ব্যক্তিত্ববাদ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ।

ভ্রমণ কাহিনী গুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর মুান সেনের চিত্রশালা (২) পূর্ব্বের মতই সুন্দর হইয়াছে। চিত্রকরদের পরিচয় লেখক মনোজ্ঞ ভাষায় যেমন লিখিয়াছেন, চিত্র-ব্যাখ্যাও তেমনি সুন্দর ভাবে করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'দক্ষিণে' ক্রমশঃ প্রকাশ্য সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী। পূর্ব্বের মত সরস ভাবেই চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেনের 'শ্রীপাদ দর্শন'—সোয়েসং তীর্থে ও পথে—সচিত্র মনোজ্ঞ ভ্রমণ কাহিনী। লেখক 'ভারতীয় সাধনার পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত' বৌদ্ধ পুণ্য তীর্থের কাহিনী শুনাইয়া পাঠকের কৌতূহল যে উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়াছেন তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়।

ভ্রাম্যমানের জল্পনা—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও 'পনের দিন'—শ্রীযুক্ত জলধর সেন। এই দুইটী ভ্রমণ-কাহিনী নিরাভরণা হইয়া বাহির হইয়াছে। বার্টরাণ্ড রাশেলের সহিত দেখা করিতে ভ্রাম্যমান দিলীপকুমার কর্ণওয়ালে গিয়াছিলেন এবং সেখানে তাঁহার সহিত যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন।—শেষোক্ত ভ্রমণ কাহিনী পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কাশীর কথা এত অধিকবার লিখিত হইয়াছে যে, সে সকল কথা বলিতে গেলে পুনরুক্তি না হইয়া যায় না; কিন্তু শ্রদ্ধেয় লেখক সে পথে না চলিয়া হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও কাশীর বাঙ্গালা স্কুল এই তিনটীর বিবরণ সরস করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মোটের উপর রচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

মাসিক বসুমতী—পৌষ।

রাজশেখর কবি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ তর্কভূষণ। সংস্কৃত কবি রাজশেখরের পরিচয় সামান্যভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার নাটকগুলি সংস্কৃত ভাষাবিদের নিকট সম্যক্ আদরণীয়। সম্প্রতি তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কবি সংস্কৃত-কবিতা ও কবি সম্বন্ধে যে সকল বিষয় অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় করিতেছেন। প্রবন্ধ ক্রমশঃ-প্রকাশ্য, মাত্র দুই পৃ বাহির হইয়াছে।

'বাস-গৃহ'—ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য। সুপণ্ডিত লেখকমহাশয় বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রকাশিত নানাবিধ গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন এ দেশে বাসগৃহ নির্ম্মাণ হইত, এবং সে গুলির নির্ম্মাণ পদ্ধতির উৎকর্ষ ছিল। সেগুলি সাধারণের মনোরঞ্জন করিত। এদেশের সভ্যতা যে কত প্রাচীন, বাস্তুবিদ্যার প্রচলন হইতে তাহা সহজেই অনুমেয়। নানাবিধ বাসগৃহের পরিকল্পনায় বাস্তুবিদ্যাবিশারদগণের চিন্তা যে কেবলমাত্র ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নহে, বাসগৃহের কক্ষাদির আসবাবপত্র

সাজসরঞ্জামের বিস্তারিত বিবরণ এবং উহাদিগকে 'অন্তর্ভূষণ' ও 'বহির্ভূষণ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহারা এ দিকে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্য—রামায়ণ কথা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এবার দশরথের চরিত্র আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। এ আলোচনায় নূতনত্ব নাই। প্রবন্ধের আরম্ভ পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম যে তিনি বুঝি উত্তর কাণ্ডটা প্রক্ষিপ্ত কি না তাহাই আলোচনা করিবেন; কিন্তু আলোচনা নামের মত কিছুই করেন নাই। এ দিকে হাত না দিলেই ভাল করিতেন।

সাহিত্য ধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষাল। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে অল্প কথার ভিতর সাহিত্যের ধর্ম্ম কি তাহা লেখক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধ পড়িয়া প্রীত হইলাম।

কবিতা

ভারতবর্ষ—মাঘ।

বিয়োগে—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুকবি ৺রমণীমোহন ঘোষের অকাল প্রয়াণে বিয়োগ-ব্যথাতুর কবি-বন্ধুর হৃদয়োচ্ছ্বাস। কবি যে অশ্রুসজল নয়নে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে।

সাথী—হুমায়ুন কবির। ভাব ও ভাষা স্বচ্ছ ও সরল। দু' একটি গদ্যাত্মক লাইনের অনধিকার প্রবেশও আছে। শেষ ১২ লাইন অনাবশ্যক। মূল ভাবের অভিব্যক্তি হইলেই কবিতারও সমাপ্তি হওয়া উচিত। না হয় একটু বহরে ছোটই হইত!

বরযাত্রী—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কাব্য-রসে ভরপুর সুন্দর কবিতা। কবি বর্ণনা করিতেছেন:—

প্রণয়ের দেশে প্রজাপতি মোরা
মধুপের মধু সঙ্গী।

প্রেমের শক্তি (Mrs Browning হইতে)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ। প্রেমের শক্তি বুঝাইতে যে কাব্য-শক্তির প্রয়োজন হয়, লেখক মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিলে এ দুর্দ্দৈব ঘটিত না।

শ্রীপঞ্চমী—শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সুরের জোতনা"—"বাণীর জোছনা", "আজিকে"—"রাজিকে" প্রভৃতি ভাল ভাল মিল ও শব্দ-যোজনা আছে। মা সরস্বতীকে এই প্রকার আবাহনের বিড়ম্বনা হইতে রেহাই দেওয়াই উচিত। এই রকম দু' চারিটা অভ্যর্থনার আয়োজন হইতে থাকিলে মা বাংলাদেশের মাটীও মাড়াইবেন না।

ছবি—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে আজও রবীন্দ্রনাথের সেই সুপ্রসিদ্ধ 'ছবি' দেখেন নাই, তাঁহারা এই ছবি দেখিয়া হয়ত 'তাক্' লাগিয়া যাইবেন; আর যাঁহাদের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তাঁহারা দু' এক লাইন পড়িয়াই পাতা উল্টাইয়া যাইবেন।

নমস্কার—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবের প্রবাহে স্থানে স্থানে ছন্দ মিল 'হাবুডুবু' খাইয়াছে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে 'মানে'টাও আন্দাজ করিয়া লইতে হয়।

বিচিত্রা—মাঘ।

আর এক দিন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সরল গদ্যে কথা-বার্ত্তা বা বস্তু-বর্ণনার মধ্যে পদ্যের মিল যেন আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়া রচনাটিকে বিচিত্র সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে; একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

দ্বিধা ভরে মিনিট কুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
ডাক-বাবুদের কাছে
শুধাই এসে "আমার নামে চিঠি পত্তর আছে?"
জবাব পেলেম "কই কিছু তো নেই"।

•

শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বল্লে হঠাৎ কোন পথিকে
"মাথা খেয়ো, কাল ক'রোনা দেরী।"
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।

আর্টকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কবি এখানে আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। কবি-গুরু প্রদর্শিত এই প্রকৃষ্ট পথটি ধরিয়া আধুনিক কবিগণ চলিতে পারিলে বাণী-মন্দিরে পৌঁছিতে তাঁহাদের যে বিলম্ব হইবে না এ কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। কিন্তু তুষারাবৃত পথের মত এ পথটি যেমনি মসৃণ তেমনি পিচ্ছিল, একটু অসাবধান হইলেই পতন অনিবার্য্য।

তাজমহাল—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ। তাজমহাল অনেক কবিকেই কবিতা লেখাইয়াছে, অবশেষে কান্তি বাবুকেও ধরিল। এতগুলি ভাল ভাল কবিতার পর তাজের উপর আবার নূতন করিয়া লিখিতে যাওয়া অসমসাহসিকের কায। কান্তি বাবু এটা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হইল। তাই তিনি যতটা পারেন আসল তাজকে এড়াইয়া বাজে বস্তুকেই সাজ পরাইয়া একটা কবিতা খাড়া করিয়াছেন। ইহাতে কবির চতুরতা যতটা প্রকাশ পাইয়াছে কবিত্ব ততটা প্রকাশ পায় নাই। তবে বলিতেই হইবে কবি গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান না দিয়া একটা 'নূতন কিছু' করিয়াছেন।

খেয়ালিয়া—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বেশ

লঘু হস্তে ললিত মধুর রচনা। একটি প্রচ্ছন্ন করুণ সুর হৃদয়কে স্পর্শ করে। কবিগুরুর প্রভাবটি কিন্তু আদৌ প্রচ্ছন্ন নয়।

মিলন-তৃপ্তি—শ্রীমতী চারুলতা দেবী। প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়-স্পন্দন, মিলন-বাসনা, প্রেমের সাধনা ও সিদ্ধির পবিত্র ইতিহাস টুকু বেশ ধীর সংযত ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়া পাঠকের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়াছে। ভাব নূতন না হইলেও রচনা কৌশলে কবিতাটি সুখ-পাঠ্য।

ঘর ছাড়া—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। যুগ যুগ ধরিয়া জন্ম-প্রবাহ সমান টানে চলিয়াছে, আদি অন্ত কেহই জানে না। মাঝে মাঝে যেন চড়ায় ঠেকিয়া, কিছু ক্ষণের জন্য তৃণ গুল্মের দেখা সাক্ষাৎ, পরক্ষণেই ভাসিয়া যাওয়া, আবার নূতন চড়ায় ঠেকা ও নূতন নূতন সঙ্গীদের সঙ্গে মেলা-মেশা—এই রকম করিয়া পথ চলিয়াছি—কোথায় শেষ কেহই জানে না। কবি ঘর-ছাড়ার এই গানটি বেশ চটুল সুরেই হাল্কা করিয়াই গাহিয়াছেন এবং সেই সঙ্গেই আবার ভিতরের করুণ রসটিরও ইঙ্গিত দিয়া ইহার বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন।

ওপারে—শ্রীযুক্ত নরেন্দু বসু (রুপার্ট ব্রুক অবলম্বনে)। ওপারের মতই অস্পষ্ট।

অরুন্ধতী—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী (প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ)। বেশ কবিত্ব পূর্ণ। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সরস। প্রমথ বাবু অনুবাদ করিয়া যে সব নমুনা দিতেছেন তাহা পড়িয়া আসামী কবিতার উপর আমাদের শ্রদ্ধা জন্মিতেছে।

পাখীর প্রাণ—(জাপান হইতে) শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত। খাঁচার পাখীর দুঃখ প্রকাশ। ঘরের "খাঁচার পাখী ও বনের পাখী" থাকিতে জাপান হইতে এ "খাঁচার পাখী আমদানী করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। তবে কোন কোন পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্ত হইতে পারে। যদি অনুবাদই করিতে হয় তবে জাপানের ভাল ভাল কবিতা গুলিরই অনুবাদ প্রকাশ করা উচিত।

যাবার বেলায়—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। যখন "যাবার বেলা" তখন একটু করুণ রস উদ্রেকের চেষ্টা থাকাই সম্ভব। ঠিক কিন্তু মালুম হইল না।

মাসিক বসুমতী—পৌষ।

আমিত্বের অভিমান—শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। তত্ত্ব থকিতে পারে, কবিত্ব নাই। 'ক্ষুদ্র' ভগবানের স্পর্শে 'মহীয়ান' হইয়া আমিত্বের অভিমান করে, কবির এ কল্পনা মৌলিক হইতে পারে কিন্তু সর্ব্বনাশকর।

বিশ্ব-গীতি—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল বি-এ। বিশ্বে যেথায় যত সুর উঠিতেছে তাহারই একটি অসম্পূর্ণ তালিকা। যে যার নিজস্ব গান স্বতন্ত্র ভাবে শোনে, কবি কিন্তু সব গানেই সমস্ত সুর এক সঙ্গে শুনিতেছেন। অকবির সহিত কবির পার্থক্য এই গান শোনার তারিফেই। যাহারা বেচারা গোবিন্দ দাসেরই মত ও রসে বঞ্চিত তাহারা ইহার উপর আর কি বলিবে?

প্রকৃতির ভুল—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। সুরচিত সুমিষ্ট কবিতা। বাচ্যার্থের অন্তরালে যে ব্যঙ্গার্থ প্রচ্ছন্ন তাহাই ইহাকে উপাদেয় করিয়াছে। "বুল বুল হীন বাগানে গোলাব" আর বাল বিধবার হৃদয়ে কামনা দুইটিই ব্যর্থ, দুইটিই 'প্রকৃতির ভুল"।

সঞ্জীবন—৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। বেশ ললিত গম্ভীর সংযত রচনা। পরলোকগত কবির সংস্কৃত সাহিত্য জ্ঞানের পরিচায়ক। কবিতাটি স্বচ্ছ শীতল সরোবরের মত, নদী-বেগ নাই, তরঙ্গও নাই,—মলিনতাও নাই, ফেন বুদ্বুদও নাই।

পাঠকের প্রতি সৎসাহিত্য—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। সৎসাহিত্য কি নয় প্রথমে তাহারই একটা বিবরণ, অর্থাৎ সৎসাহিত্য বেলের বা ঘোলের পানার মতন তরল ও শীতল নয়, চা'র মতন ও গরম ও আরামদায়ক নয়, সুরাও নয়, খেজুর রসও নয় ইত্যাদি এই রূপে প্রথমে নেতি নেতি করিয়া সৎ সাহিত্য নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন—তার পর তুলনার সাহায্যে জিনিষটা যে কি বস্তু তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং হতভাগ্য পাঠককে দস্তুরমত শাসাইয়া কবি গম্ভীর বজ্র-নির্ঘোষে বলিতেছেন—

> রসের তৃষ্ণা শাঁসের ক্ষুধা থাকে যদি তোমার তবে
> করতে হবে বৃক্ষ আরোহণ
> হাতের জোরে উচ্চশাখা নোওয়ায়ে ফল পাড়তে হবে
> সইতে হবে মৌমাছি দংশন।

এই রকম আরও আছে। শুনিয়াছি শব-সাধনার পথে বিভীষিকা আছে, কিন্তু কবি কালিদাস বর্ণিত সৎ সাহিত্য সাধনার পথ দেখিতেছি আরও বিপদসঙ্কুল। এই কলিযুগে উচ্চ শাখায় উঠিয়া ফল পাড়িয়া খাওয়া কি সহজ কথা? স্মরণ হয় রাস্কিন বলিয়াছেন যে সৎ-সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে হইলে পাঠককে অষ্ট্রেলিয়া বাসী খনকদের মতন ভূমি খনন করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। সেটা বরং সহ্য হয়, কিন্তু একেবারে বৃক্ষারোহণ! আমাদের কিন্তু আশা হইতেছে কবি তাঁহার পাঠকদের উপর এতটা জুলুম করিবেন না, তিনি নিজেই ফলন্ত গাছের ডালটা নোয়াইয়া ধরিবেন, ফল ছাড়াইয়া পাঠকের মুখের কাছে আনিবেন, কারণ ইহারই মধ্যে কালিদাস নিজেই নিজের 'মল্লিনাথ' হইয়াছেন। কিন্তু সৎ সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষণ কি এই?

নিরাশায়—মহারাজকুমারী ৺অনঙ্গমোহিনী দেবী। সরলতায় হৃদয় স্পর্শ করে।

শীতের বাতাস—শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ লঘু বাতাসে কাব্য-রস জমে নাই।

প্রবাসী—মাঘ।

শিয়াম—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-ভারতীর উন্নতি কল্পে কবিগুরুর বৌদ্ধ-প্রধান দেশ সমূহে এই যাত্রা নানা কারণে চির-স্মরণীয় হইবে। এই পরিভ্রমণের ফলে কবির অন্তর হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্দেশে যে সমস্ত অপূর্ব্ব স্তব-গান উচ্ছ্বসিত হইতেছে, আলোচ্য কবিতাটি তাহারই একটি। প্রিয়দর্শী দিগ্বিজয়ী কবি সম্রাটের এই সকল কাব্য লীলা-লিপি পাঠকমাত্রেরই হৃদয় শিলায় অক্ষরে অক্ষরে উৎকীর্ণ থাকিয়া তাহার সশোক হৃদয়কে অশোক করিবে।

কবি—শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। অভিব্যক্তি তেমন ভাল হয় নাই। আরও সংযত হইলে ভাল হইত। ভাবের পারম্পর্য্য ঠিক রক্ষিত হয় নাই।

নবীন মন্ত্র—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী। 'মন্ত্র' আদৌ 'নবীন' নয়, তবে কবি নবীন। ছন্দটি ভাবের উপযোগী হয় নাই।

কথা-সাহিত্য

ভারতবর্ষ—মাঘ।

জীবনের নিত্য-স্রোতে—শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরী। বর্ণনাভঙ্গী মন্দ নয়, তবে গল্প জমিয়া উঠে নাই। প্রতি-পাদ্য বিষয় অস্পষ্ট—পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাহায্যে তাহা সুপরিস্ফুট হয় নাই। রচনায় উন্নত কলানৈপুণ্যের অভাব লক্ষিত হয়। প্লটে নূতনত্ব নাই, লেখকের কথনীয় বস্তুতেও যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একটি বিক্ষিপ্ত চিত্তের ছবি—এ ছবির সৌন্দর্য্যও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

হট্টমালার দেশে—শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসু। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শ্রুত গল্পের অস্ফুট স্মৃতি অবলম্বনে লিখিত। গল্পটি সুলিখিত। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকুও উপভোগ্য।

কুহেলিকা—শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দেব। তিলকা ও কনকের মধ্যে এক সময় নিন্দনীয় একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। স্বামী অশেষ তবুও তিলকাকে ক্ষমা করিয়া কনকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। রচনায় উন্নত রুচির পরিচয় আছে, ভাষায় লালিত্য আছে। রচনা আরও সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত।

এ সংখ্যায় অন্যান্য রচনা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

মাসিক বসুমতী—মাঘ।

ঋতুরঙ্গ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বনাট্যশালায় ছয়টি ঋতুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি যে দর্শন ও কাব্যের সুন্দর সমন্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা উপভোগ্য। তবে ভাবের নূতনত্ব খুব অল্পই লক্ষিত হইল। এই রচনায় রসাভিব্যক্তির জন্য শুধু বাক্য নয়, সুরেরও আবশ্যকতা আছে। অভিনয় ও গীতের সহযোগে ইহা এক অভিনব মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

অরসিকেষু—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গল্পটি সুন্দর, সুসংযত, ঈষৎ হাস্যরসাত্মক—উপভোগের সামগ্রী।

গুরুচরণের মুক্তি—শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। গল্পটি করুণরসাত্মক। শিল্পচাতুর্য্যের অভাব স্থানে স্থানে লক্ষিত হইলেও ইহা পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে। রচনায় বৈচিত্র্য নাই। প্রতিপাদ্য বস্তু সুন্দর ও সুসঙ্গত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

অতিবুদ্ধি—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভূধরের অতিবুদ্ধি চিত্রিত হইয়াছে। রচনা দীর্ঘ। চিত্রে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় নাই। প্লট পুরাতন—বর্ণনা আরও সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত।

বিচিত্রা—মাঘ।

দেশছাড়া—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক। শীকার করিতে গিয়া নায়ক একজোড়া ঘুঘুর একটিকে নিহত করিলেন। অপরটির আর্ত্ত চীৎকার তাঁহার অসহ্য হওয়ায় তাঁহাকে দেশছাড়া হইতে হইল। গল্পের আখ্যান বস্তু এইটুকু। এই বিষয় লইয়া মোপাসাঁ একটি মর্ম্মস্পর্শী গল্প রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান রচনাটি তাহারই অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। তবে বর্ণনাংশ আমরা কয়েক স্থলে উপভোগ করিয়াছি।

বাঁশীর ডাক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার। গল্পটি নাট্যাকারে রচিত। সুনীরা ডোমেদের একটি পরিত্যক্ত শিশুকে মানুষ করিতে গিয়া পিতা ও শ্বশুরের সমাজ হইতে বঞ্চিত হইল। তাহার মনের মত মানুষ হইল বরুণ, তাহার বাঁশীর ডাকে সুনীরা মুগ্ধ হইল। স্বামী চরণ পত্নীকে লইয়া যাইতে চাহিল, সুনীরা বলিল, "আমি চিরদিনই এই নদীতে পদ্মের পাপড়ি ভাসাব আর বাঁশী

শুনব।" চরণ আবার অনুরোধ করিল। সুনীরা বলিল, "দেখ মনের যেখানে যে তারে ঘা পড়েছে—এখন এই দেহটার জন্য তার আর কিছুই আসে যায় না।"

গল্পটির মধ্যে হয়ত কোন একটা গভীর তথ্য প্রচার করা হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের জিনিস ইহাতে নাই বলিলেও চলে। রচনায় রবীন্দ্রনাথের ধরণটি অনুকৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্য কোথাও লক্ষিত হয় না। বাঁশীর ডাকের কথা প্রধানতঃ গানে ও কবিতায় আছে, তাহাকে নাট্যের বিষয় করিতে গেলে যে কলাকৌশলের আবশ্যক তাহার পরিচয়ও অতি সামান্য। নাট্যের পূর্ব্বাংশ অনেক স্থলে উপভোগ্য, কিন্তু উত্তরাংশ অস্ফুট, জটিল ও নীরস।

পরিসমাপ্তি—শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। একটি মৃত্যু দুইটি বিবদমান বংশের মধ্যে কেমন করিয়া প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত করিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ভাব নূতন নয়। ঘটনাগুলির সমাবেশ নিপুণতার সহিত করা হয় নাই।

ডাকবাক্স—শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। E. V. Lucasএর রচনা অবলম্বনে লিখিত। ডাকবাক্সে চিঠিদের কথাবার্ত্তা বর্ণিত হইয়াছে। রচনা নূতন ধরণের, তবে অপরিণত।

সার্থকতা—বনফুল। একটি গদ্য কবিতা। তত্ত্বকথা আছে, তবে কাব্যরসের অভাব।

গোলাপের কথা—এম, ওয়াজেদ আলি। একটি রূপক। রচনা আরো সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত। বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী হয় নাই।

প্রবাসী—মাঘ।

বেতারের বিপদ—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ পণ্ডিত।

বেতারযন্ত্রের (Wireless) সুর বাঁধা না হইলে তাহাতে গানবাজনার শব্দ একটা বিকট আওয়াজে পরিণত হয়। এই সত্যটিকে অবলম্বন করিয়াই গল্পটি রচিত হইয়াছে। রচনাটি নিতান্তই বাজে। ইহার মধ্যে এমন কোন জিনিস নাই যাহা পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। লেখক বেতারযন্ত্রের যে রহস্যটুকু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য দুই চারিটি কথাই যথেষ্ট, এত বড় একটা গল্পের কোন আবশ্যকতা ছিল না।

শাঁওরী—শ্রীমতী অনামিকা দেবী। এই গল্পে লেখিকা একটি নিম্নজাতীয় বালিকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বালিকাটি বনের পাখীর মত, সামাজিক বাঁধন তাহার অসহ্য। চিত্রে তনত্ব কিছুই নাই। রচনার বাহুল্য অংশ পরিত্যক্ত হয় নাই। অঙ্গ ও অঙ্গীর অসঙ্গতিও লক্ষিত হয়।

ধর্ম্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—মাঘ।

উপনিষদ্ ও গীতা—শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়, এম্-এ। প্রত্যেক বেদের মোটামুটি দুইটা অংশ—সংহিতা ও ব্রাহ্মণ; সংহিতা মন্ত্র সমষ্টি এবং এই সকলের মধ্য দিয়া জগতের অধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণে যজ্ঞাদি বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা কেমন করিয়া নিজ জীবন গড়িয়া তোলা যায় সেই বিষয় বলা হইয়াছে। বেদের শিক্ষা লইয়া কালক্রমে এই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ ঘটে, গীতা কিরূপে তাহার সমাধান করিয়াছেন তাহা অনিলবাবু চৈত্রমাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন উপনিষদ্ অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে গীতা তাহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই দেখান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধ বেশ সুলিখিত এবং সারগর্ভ। আমরা প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠকদিগের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"সকল সম্বন্ধবিহীন বিশ্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ সাধারণ দেহধারীর পক্ষে সম্ভব নহে। তাই গীতা জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও ভক্তির পথ যোগ করিয়াছে। ভগবান্ আমাদের সকল সম্বন্ধের অতীত নহেন; সকল সম্বন্ধের অতীত নির্গুণ-অক্ষর অবস্থা ভগবানের কেবল একটা দিক্ মাত্র। কিন্তু ইহারও উপরে আছে যে অবস্থা, তাহাই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের সহিত জীবের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। জ্ঞানের দ্বারা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে; কর্ম্মের ভিতর দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে, ও প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে—ইহাই গীতার মতে শ্রেষ্ঠ যোগ, শ্রেষ্ঠ উপাসনা।"

"সাংখ্যের মতে শ্রেষ্ঠ দিব্য সত্তা হইতেছে মুক্ত পুরুষ; সেখানে সংসার নাই; প্রকৃতি নাই। তবে পুরুষের নীচের বদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত থাকে।...বেদান্তের মতে ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে...উহা নীচের অবস্থা। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'অজামেকা' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সুতরাং পুরুষের দুই অবস্থা—একটী মুক্ত, একটী বদ্ধ; কিন্তু একজন মনুষ্য মুক্ত হইলে অন্য সকলে হয় না কেন?...প্রচলিত সাংখ্য এই সমস্যার সমাধান

করিয়াছে বহু পুরুষ স্বীকার করিয়া...কিন্তু গীতা বহুপুরুষ বাদের স্বীকার করে না।...তাহা হইলে একই সময়ে একই পুরুষ মুক্ত ও বদ্ধ হয় কেমন করিয়া? গীতা বলিয়াছে ভগবানের মধ্যে ইহা সম্ভব। একই সময়ে তিনি সংসার-লীলায় মগ্ন বটেন, আবার সংসার-লীলার অতীতও বটেন।—উচ্চের স্তরে ঊর্দ্ধের প্রতিষ্ঠায় তিনি সংসার-লীলা হইতে মুক্ত; কিন্তু নীচের স্তরে সেই সময়েই তিনি সংসার-লীলায় মগ্ন। (মুণ্ডকোপনিষদে দ্বা সুপর্ণ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।) * * * কিন্তু এক কি করিয়া বহু হইল! পুরুষ একই; কিন্তু প্রকৃতিকে ধরিয়া হইয়াছেন বহু। বহুত্ব বা ভেদ পুরুষে নাই, প্রকৃতিতে আছে। একই পুরুষ প্রকৃতির ভিন্ন অংশকে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীব হইয়াছেন—মামৈবাংশ জীবলোকে জীবভূতাং।...প্রত্যেক জীবেই ভাগবত প্রকৃতির এক একটি অংশের বিকাশ হইতেছে। সর্ব্বত্র সকল জীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া পুরুষোত্তমই প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাকে পরিচালনা করিতেছেন (গীতা ৯।১০)। গীতার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম মুক্ত পুরুষই শ্রেষ্ঠ সত্তা নহে; লীলাময় পুরুষোত্তমই পরব্রহ্ম।"

মাসিক বসুমতী—পৌষ।

'সাধন ও মুক্তি'—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন। কর্ম্মনিষ্পাদন ব্যাপারকেই সাধন অথবা সাধনা বলে; এই কর্ম্ম তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। কোন্ কর্ম্ম কিরূপ ভাবে করিলে মুক্তি পাওয়া যায়, লেখক সেই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রবন্ধের মধ্যে নূতনত্ব অথবা বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই,—বহুবার বহু পত্রিকায় এই সকলের আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার, এম্ এ মহাশয় লিখিত "ভারতের আদর্শ ও কর্ম্মের সাড়া" দপ্তরের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ভারতকে য়ুরোপ করিবার চেষ্টা না করিয়া ভারতকে ভারত রাখিয়াই ইহার উন্নতি করিতে হইবে,—প্রবন্ধের বক্তব্য। এইরূপ করিতে হইলে ভারতের পুরাতন আদর্শকে সম্মুখে রাখিতে হইবে—অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ভগবানের নামে এবং তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া করিতে হইবে। এবং ইহাও চিত্তশুদ্ধি ও তপস্যা-সাপেক্ষ।

আজকাল রাজনৈতিকগণের কর্ম্মপদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে এইসব কথার অবতারণা করা একটা ঢঙ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের যে আদর্শ প্রাচীন কালে কার্য্যকর ছিল, সে আদর্শ এখনও কার্য্যকর হইবে, এ রকম ধারণা করা ভুল। দেশ, কাল ও পাত্র হিসাবে আদর্শ ভিন্ন হইয়া যায় ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পাঁচ হাজার বছর আগে যে রকম ব্যবস্থা ছিল, এখনও কি ঠিক সেই ব্যবস্থা চলিতে পারে? মানুষের মধ্যে কি কোনও পরিবর্ত্তন হয় না? সেকি পাথরের মত অচল অটল হইয়া বসিয়া আছে?

ফাল্গুনে

পিকের কণ্ঠ সুধায় উঠিল পূরে
মধুলোভে বাজে ভ্রমরের পাখা সুরে,
শিশু-কুসুমের বুকে
পরশ বুলায়ে সুখে
বায়ু কহে 'জাগো অভিমানী
ভীতু কেন? আসে ঋতুরাণী'।

কিশলয়ে জাগে নব সবুজের রেখা
দিকে দিকে আজি রঙ্গে রঙে প্রীতিলেখা
কে এল রে চুপে চুপে,
চোখ ভ'রে গেল রূপে
ছিল যে গো মন পিপাসিত
এস এস তুমি আশাতীত।

তব মাধুরীর মিনতি-ললিত বাণী
বসুধারে আজি কি কহিল, নাহি জানি!
একি উচ্ছল শ্রীতে
শ্যাম তার তনুটিতে
প্রিয়-মিলনের অভিসারে
লাবণ্য আঁকা ফুল-হারে।

হে সুষমাময়ি হৃদয়-হরণ বেশে
নিয়ে যাবে তুমি কোন্ প্রণয়ের দেশে
চাঁদের আলোর ছলে
বঁধুর শয়ন-তলে
অনুরাগ-দীপে সারারাতি
শিখার কি সেথা রহে ভাতি!

নিঃশেষে আজি নিজেরে করিনু দান
তোমার বাঁশীর, ক'রে রেখো মোরে গান।
কোমল হিয়াটি বেছে
বিলাইয়া দিয়ো যেচে
মোরে তুমি, ওগো মনোরমা
লবে লবে চিনি, প্রিয়তমা।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।
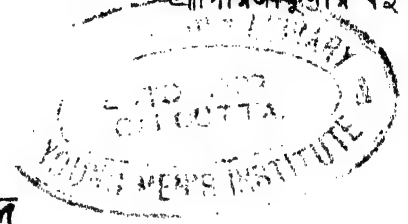
বিদায় আশীর্ব্বাদ

(গল্প)

কুসুমিকার মাতা স্বামীর বিয়োগে শয্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি আলিপুরের ফৌজদারী আদালতের উকীল ছিলেন। অনেকে তাঁহার খুব পসার ছিল বলিত, কিন্তু মৃত্যুকালে দেখা গেল, তিনি পত্নী ও কন্যাকে শুধু শোকসাগরে ভাসাইয়া যান নাই, ঋণেও ডুবাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ল্যানস্‌ডাউন রোডের 'উজ্জলিত নাট্যশালা সম' বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও কন্যা এক ক্ষুদ্র বাইলেনের মধ্যে সামান্য দ্বিতল একটি গৃহে আশ্রয় লইলেন।

দিন কোনও মতে চলে না। কুসুমিকার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে কৃপণতা করেন নাই। ডাইওসিজান কলেজে সে আই-এ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরে অবস্থার সহিত যখন রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে, তখনও সে হাল ছাড়িয়া দিল না। কোনও মতে আই-এ পাশ করিল বটে, কিন্তু মাকে নিরাশা নিসঙ্গ অবস্থায় ফেলিয়া কলেজের 'বাসে' চড়িয়া আর যাওয়া চলে না। সুতরাং এক দিন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ও কয়েক বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া কলেজের বাস-ড্রাইভার সৈদুকে বলিয়া দিল যে, আর তাহার কলেজে যাওয়া হইবে না। বৃদ্ধ সৈদু দিদিমণির সহিত মৌন সমবেদনা জানাইয়া নিঃশব্দে 'চাকায়' পাশে আসিয়া বসিল।

কলেজে যাওয়া বন্ধ করিলেও সংসার কুসুমিকাকে ক্ষমা দিল না। মায়ের শুশ্রূষা ও তার নিজের ভরণ পোষণের কোনও কূল কিনারা সে সহজে দেখিতে পাইল না। এক জোড়া কাপড় কোনও মতে সংগ্রহ হইলে এক খানি মাতা ও একখানি কন্যা পরিতে লাগিলেন। মাতা এই 'অলক্ষণ' সহিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। কিন্তু কন্যার জন্য পাড়ওলা শাড়ী আনিতে দিবার অর্থ যে অনেক দিন ফুরাইয়া গিয়াছে! মাতার সহিত কন্যা বৈধব্যের সমস্ত চিহ্ন বণ্টন করিয়া লইল। কেবল হাতের দুগাছা রুলি তাহার বৈশিষ্ট্য হইয়া রহিল। কোনও কোন ও সময় সে 'লক্ষণ'টিও যায় যায় হইত, কিন্তু শুধু মাতার ক্রন্দনে যে কুসুমিকা বিরত হইত, তাহা নহে। রুলী দুগাছা তাহার হাতে এমন করিয়া বসিয়া গিয়াছিল যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহা খুলিতে পারে নাই।

এমনি করিয়া একটি সুদীর্ঘ বৎসর কাটিল। কুসুমিকার মাতা রোগ-শয্যায় পড়িয়া কল্পনা করিতেন যে, একদিন হয়ত তাঁহার কন্যার জন্য একটি সুপাত্র আসিয়া জুটিবে এবং তাঁহার দুঃখের অমানিশার অবসান হইবে।

কিন্তু তাঁহার ভাগ্য গুণে পাড়াপড়শী গুলি সকলেই এই 'ধেড়ে' মেয়েটিকে কিছু অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে আরম্ভ করিল। অনেক সময়ে ইহারই প্রসঙ্গে তাহাদের মজলিস জমিয়া উঠিত। সুতরাং 'বর' আসিবার কোনও নিকট সম্ভাবনা দেখা গেল না। একবার পড়সীদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ কৃপা করিয়া কন্যাটিকে উদ্ধার করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৬৫ পার হইয়া গিয়াছিল। ঘটক যখন রোগিণীর নিকট বসিয়া গম্ভীর ভাবে সেই অনতিতরুণ বরের নানা ঐশ্বর্য্যের তালিকা পেশ করিতেছিল, তখন স্নেহময়ী জননী ঘামিয়া উঠিলেন। ঘটক-প্রবর আশার সুদীপ্ত বর্ত্তি জ্বালিয়া অবসর গ্রহণ করিলে কুসুমিকা বহুক্ষণ ধরিয়া জননীকে বাতাস করিয়া তবে স্থ করিতে পারিল।

'বর' সহজে ঘনাইয়া না আসিলেও অনশনে মৃত্যুর ছায়া ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। এক দিন কুসুমিকা জননীর নিকট প্রস্তাব করিয়া বসিল যে সে চাকরী করিবে। জননী কোনও জবাব দিলেন না; শুধু কপালে একবার ক্ষীণ অঙ্গুলির দ্বারা করাঘাত করিয়া জানাইয়া দিলেন যে দুরদৃষ্টের আরও কত নির্ম্মম আঘাত সহিবার জন্য তিনি বাঁচিয়া রহিয়াছেন।

কুসুমিকা খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিল। বিজ্ঞাপনদাতার স্ত্রী রুগ্না, তাঁহাকে গান গাহিয়া, গল্প করিয়া খুসী রাখিতে হইবে এবং তাঁহার একটি ৬ বৎসরের কন্যাকে লেখা-পড়া শিখাইতে হইবে। কুসুমিকা এ সব কায কখনও করে নাই। শিক্ষয়িত্রী ও পার্শ্বচারিণী এ দুই কায সে পারিয়া উঠিবে কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল না। দরখাস্তের উত্তরে যখন সে মনোনীতা হইল, তখন অল্প সময়ের মধ্যে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া তাহাকে দেওঘর রওনা হইতে হইল। মাতার মতামত ঘোর অভাবের তীক্ষ্ণশরে অর্দ্ধপথে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

২

কুসুমিকা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। উইলিয়ম্‌স্ টাউন দেওঘরের একটি অংশ, সেখানে তখনও বেশী বাড়ী ঘর হয় নাই। উহারই মধ্যে একটি বড় গোছের বাড়ীতে শরৎকুমার স্বাস্থ্যের জন্য পত্নীসহ বাস করিতেছেন। পত্নী লীলা প্রায় শয্যাগ্রস্তা। বায়ু পরিবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেও কোনও প্রকার পরিশ্রমের কায করিতে অক্ষম। ডাক্তারেরাও তাঁহাকে উঠিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নূতন সঙ্গিনী পাইয়া তিনি সারা সকাল বেলা ধরিয়া তাহাকে এক দৃষ্টে দেখিয়া লইলেন। এই শিক্ষিতা, সুন্দরী, যুবতীর মনের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল। কিন্তু হায়, চর্ম্মচক্ষু দিয়া মনের রহস্য দর্শন করা যে অসম্ভব।

শরৎকুমারের কন্যা ললিতা সবে সাত বছরে পড়িয়াছে। সে একজন নূতন সঙ্গী পাইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। যেদিন প্রভাতে কুসুমিকা এই 'গিরিনিবাসে' প্রথম পদার্পণ করিল, সে দিন নমিতা শারদ প্রভাতের এক ঝলক রোদের মত হাসিতে তাহার ঘরখানি ভরিয়া দিল। সে কুসুমিকার হাতের একটি অঙ্গুলি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর দেখাইয়া দিল। কুসুমিকা আলনায় তাহার গায়ের কাপড়খানি রাখিয়া এ জানালা ও জানালায় দাঁড়াইয়া ঘর খানি ও তার আশপাশের জায়গা ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইল। এ দিকে নন্দন পাহাড়ের চূড়া মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে, ও দিকে ফাঁকা, খোলা মাঠ ছুটিতে ছুটিতে শালবনের অন্তরালে গিয়া লুকাইয়াছে। কুসুমিকা তাহার বাক্সটি ঘরের এক কোণে রাখিয়া দেওয়াইল ও জানালার নীচের খড়খড়ি তুলিয়া তাহার পাশে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। সে ভাবিতে লাগিল তাহার এই নূতন কর্ম্ম-জীবনের ক্ষুদ্র স্রোতটি কোন দিকে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

নমিতা তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি সকাল বেলা রোজ খাবার খাই।"

"আচ্ছা, তুমি খেয়ে এস।"

বালিকা চলিয়া যাইবার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করিল

মানসী ও মর্ম্মবাণী

ENGRAVED AND PRINTED BY
KING HALF TONE PRESS.

না। কুসুমিকা তখন তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল—

"যাও, লক্ষ্মীটি, খেয়ে এস, তার পর গল্প বলব 'খন্।

বালিকা তার চক্ষু দুটি কুসুমিকার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝি তাহাকে খাবার খাইবার জন্ত ডাকিতে আসিল; তথাপি বালিকা নড়িল না! শেষে ঝি আসিয়া যখন কুসুমিকাকে জলযোগের আয়োজন হইয়াছে বলিয়া ডাকিল, তখন নমিতাও নাচিতে নাচিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইল। কুসুমিকা এই ক্ষুদ্র বালিকার চোখে মুখে যে আত্মীয়তার পূর্ব্বাভাস পাইল, তাহাতে আশ্বস্ত হইল।

কুসুমিকা চা ও জলযোগ শেষ করিয়া গৃহিণীর নিকট গেল। তিনি সাদরে তাহাকে শয্যার প্রান্তে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া তিনি তাহার হাত খানি ধরিয়া বসাইয়া দিলেন ও কন্তাকে ডাকিয়া তাহার হাত কুসুমিকার হাতে দিয়া বলিলেন, 'আজ হতে নমু তোমারই হলো।"

তাঁহার চক্ষু দুইটি আর্দ্র হইয়া উঠিল। কুসুমিকা চোখ ফিরাইয়া লইল।

"তোমায় কি বলে ডাক্‌ব, বোন?"

"আমায় কুসুমিকা বলে' ডাক্‌লে আমি খুসী হবো।"

"আচ্ছা, আমায় তুমি লীলা দি বলে ডেকো। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়!"

লীলা কুসুমিকার হাতদুটি নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি বড় অল্প বয়সে চাকরী করতে বেরিয়েছ! দেখ, আমায় তুমি পর মনে করো না। যা যখন দরকার হবে, তখনি আমায় বলো, আমার ত আর কেউ নেই এখানে। তুমি আমার আপনার বোনের মত থাক্‌বে, কেমন?"

কুসুমিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল। তাহার কর্ম্ম জীবনের উদ্বোধনটা বেশ ভালই হইল বলিয়া সে মনে মনে কৃতজ্ঞ হইল।

৩

শরৎকুমার প্রাতর্ভ্রমণ সমাপন করিয়া যখন গৃহিণীর কক্ষে দেখা দিলেন, তখন কুসুমিকা তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়িল। তিনি যে গৃহস্বামী, একথা কেহ তাহাকে না বলিয়া দিলেও তাহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। শরৎকুমার শিক্ষয়িত্রীকে পত্নীর কক্ষে দেখিতে পাইবেন বলিয়া মনে করেন নাই। সুতরাং তিনি কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিলেন। কুসুমিকা সহসা বাহির হইয়া গেলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া পত্নীর নিকটে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসিলেন,

"কেমন দেখলে?"

লীলা উত্তর করিলেন,

"কথাবার্ত্তা ত বেশ! তবে আর একটু বয়েসটা পরিণত হলে ভাল হতো।"

শরৎকুমার একটু থামিয়া বলিলেন, "হুঁ! দরখাস্ত থেকে ঠিক বুঝা যায় নি যে, এত অল্প বয়সের হবে।"

"বোধ হয় খারাপ অবস্থায় পড়ে চাকরী করতে বেরিয়েছে।"

"তা ত বটেই; যারা মেয়েদের সাধারণতঃ শিখিয়ে বেড়ায়, সে রকম ত মোটেই নয়। এ কোনও ভদ্র ঘরের মেয়ে হবে, বলে ত বোধ হয়।"

"বিধবা?"

"তাই ত মনে হয়। আহা, তা না হলে আর এই বয়েসে খেটে খেতে আসে? চেহারা মন্দ না; তবে একটু বেশী ঢ্যাঙা। মেয়েছেলেরা ঢ্যাঙা হলে অতি বিশ্রী দেখায়—"

লীলা কিছু খর্ব্ব এবং সেই খর্ব্বতার জন্য গর্ব্বটি তাঁহার যোলো আনা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার স্বামী কুসুমিকার চেহারার সমালোচনা সম্বন্ধে কোনও প্রকার আগ্রহ দেখাইলেন না। কাযেই লীলা আর কিছু বলিবার সুযোগ পাইলেন না। শরৎকুমারও কিছুক্ষণ পরে অন্য কাযে চলিয়া গেলেন।

নারীর বয়স ও রূপ সম্বন্ধে শরৎকুমারের বিশেষ কোনও পক্ষপাতিত্ব ছিল না। ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা সুযোগ সত্ত্বেও বিপথে পদার্পণ করে

নাই, শরৎকুমার তাহাদের মধ্যে একজন। বি-এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশ্ববাণীর সহিত তিনি এখনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়াছেন। লেখাপড়ার চর্চ্চায় তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। কুপথ হইতে আত্মরক্ষার আর এক মহাস্ত্র তাঁহার ছিল; সেটি একনিষ্ঠ পত্নী-বৎসলতা। লীলাকে তিনি এতই ভাল বাসিতেন যে, অন্যদিকে তাঁহার মন যাইতে পারিত না। অনেকে এজন্য তাঁহাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে ক্রটী করিত না। তিনি বিষয়কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্ত্রীকে লইয়া সুদীর্ঘ দুইটি বৎসর নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া সম্প্রতি দেওঘরে বাস করিতেছেন। পত্নীর স্বাস্থ্যলাভ সম্বন্ধে তাঁহার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তথাপি চেষ্টার একটুও শিথিলতা না হয়, এজন্য তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

রুগ্না পত্নীর সহিত ঘুরিয়া এই সুদীর্ঘ কাল সর্ব্বপ্রকার সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া শরৎকুমারের ধৈর্য্য যে একটুও শিথিল হয় নাই, তাহার কারণ তাঁহার জীবনটা কিছু দিন হইতেই নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িতেছিল। যে সরসতা যৌবনের প্রথম আবেগে প্রেমে ও পুলকে জীবনের প্রতি পরমাণুতে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা রোগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পরিচর্য্যায় প্রতিদিন শুষ্ক হইয়া উঠিতেছিল। কেমন করিয়া যে চঞ্চল জীবন-প্রবাহ আপনা আপনি স্থির হইয়া আসিল, শরৎকুমার তাহার খোঁজ রাখিতেন না; লীলা কিছু কিছু বুঝিতেন। কিন্তু কোনও উপায় ত নাই। রোগিণী বিনিদ্র নয়নে ভাবিতেন, আবার সেই পুলকে পাগল করা দিনগুলি ফিরিয়া আসে না! শরৎকুমার যে অকারণ গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিলেন, ইহাতে লীলার রোগ-বিশুষ্ক প্রাণও ব্যথায় টন্ টন্ করিয়া উঠিত।

একদিন কুসুমিকা লীলাকে উপন্যাস পাঠ করিয়া শুনাইতেছিল। উপন্যাসের নায়ক সৌখীন লোক; তাঁহার পত্নী চিররুগ্না। তাঁহার চিকিৎসার জন্য একজন লেডি ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বামী সেই লেডি ডাক্তারকে লইয়া এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে, রোগিণী অবশেষে সেই লেডি ডাক্তারের করে স্বামীর সুচিকিৎসার ভার দিয়া সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন। লেডি ডাক্তারের সঙ্গে নায়কের প্রেম-নাটিকা এরূপ বাস্তব ও জীবন্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, লীলা অজ্ঞাতসারে হাঁফাইতে লাগিলেন।

"কুসুম—কুসুমিকা!"

"কি লীলাদি? এইখানে রাখব কি?"

"কুসুমিকা! মরবার কোনও ওষুধ বলে দিতে পার? এমন ওষুধ, যাতে কেউ টের না পায়; অথচ খেলে আস্তে আস্তে ঘুম আসে—"

"সে কি লীলা দি! আপনি এ সব কি বকচেন?"

"বুঝতে পারছ না? কিছুই কি বুঝতে পারছ না? না—না, বুঝে তোমার কায নেই। আমি অন্যায় বলেছি বোন্, আমায় ক্ষমা কর—"

কুসুমিকার মনে হইল যেন সে কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে। যেন এই উপন্যাসের মধ্যে লীলা তাহারই অদৃষ্ট লিপি পাঠ করিতেছে। যেন তাহার রুগ্ন, ব্যর্থ জীবন স্বামীর নির্ম্মম অবহেলায় কাতর হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।—কিন্তু সত্যই কি তাহার স্বামী তাহাকে এমন অবহেলা করিতে পারেন? কাহার জন্যই বা করিবেন? কুসুমিকা শিহরিয়া উঠিল।

প্রথম প্রথম শরৎকুমার কুসুমিকার ছায়া মাড়াইতেন না। আর একজন লোক যে এ বাড়ীতে আসিয়া জুটিয়াছে, সে কথা তাঁহার কখনও মনে পড়িত না। কিন্তু নমিতা প্রায়ই তাহার কুসুমিকা মাসীর গল্প তাঁহাকে না শুনাইয়া ছাড়িত না। কুসুমিকামাসী কেমন সুন্দর গল্প বলে, কেমন চমৎকার গান করে, রঙীন কাগজ কাটিয়া কেমন সুন্দর ফুল, প্রজাপতি তৈরী করে, ইত্যাদি। শত সুখ্যাতি সে বালিকার মুখে শুনিয়া শুনিয়া শরৎকুমার তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। একদিন

কুসুমিকা যখন হারমোনিয়ম বাজা নমিতাকে গান শিখাইতেছে, তখন শরৎকুমার সে গানের সুরে আকৃষ্ট না হইয়া পারিলেন না—

সুন্দর লালা, শচীর দুলালা,
নাচে শ্রীহরি কীর্ত্তনমে।

সহজ সুরের সহজ গান। পূর্ব্বেও শরৎ এ গান কতবার শুনিয়াছেন। কিন্তু আজ মনে হইল গলাটি যেন বড়ই মিষ্ট! ভাবের সঙ্গে সুরের অপূর্ব্ব মিলন। স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি স্ত্রীকে বলিলেন—"লীলা, তোমার মেয়ের গুরু-মা দেখছি বেশ ভাল গাইতে পারেন! তুমি ওঁর গান মাঝে মাঝে শুনো; তোমার অনেকটা সময় ভাল কাটবে।"

"না, আমার সময় কাটাবার জন্যে আর ও ভদ্দর লোকের মেয়েকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? গায় ভাল; সেটা আমি অস্বীকার করছি নে। তবে গলাটা একটু বেশী সরু, না?"

শরৎ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, যেটুকু সরু মেয়েদের গলায় মানায়, তার চাইতে বেশী না। যেমন গলা মিষ্টি তেমনি গাইবার ধরণ। আমার ত খুব ভাল লাগল—"

লীলা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কুসুমিকা অনেক সময়ে লীলার সহিত গল্প, খেলা, আলোচনায় কাটাইয়া দেয়। সে সময়ে শরৎকুমারের আসিবার কথা নহে। সুতরাং নিঃসংকোচে দুই জনের একত্র গল্প-গুজবে কাটে। নমিতা মাঝে মাঝে সেই ঘরেই কুসুমমাসীর কাছে পড়া বলিয়া লয়। কোনও কারণে স্বামীকে ডাকিবার প্রয়োজন হইলে, কুসুমিকাকে অন্যত্র যাইতে বলিয়া দেওয়া হয়। লীলার ইচ্ছা নয় যে, কুসুমিকা শরতের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হয়। তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন চাঁদ খসিয়া ভূতলে পড়িয়াছে। দেওঘরের জল-বায়ুর গুণেই হউক বা লীলার যত্নের জন্যই হউক, কুসুমিকার রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এখানে আসিয়াও সে আহার ও বেশভূষা সম্বন্ধে মায়ের ন্যায় চলিতে লাগিল। তাহার বেশ-ভূষা দেখিয়া সকলে তাহাকে বিধবা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহার আহার নিয়ম সম্বন্ধে কেহ বড় একটা খোঁজ লওয়া দরকার মনে করে নাই। নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা পাড়িলে কুসুমিকা তাহার উত্তর দিতে চাহিত না। কাযেই লীলা মনে করিলেন যে, অভাগিনী তাহার অতীত সুখের স্মৃতি লুকাইয়া রাখিতেই চাহে। তবে তাহার ম্লান সৌন্দর্য্য ভেদ করিয়া যখন হাসির তরঙ্গ ছুটিত, তখন তাঁহার সময়ে সময়ে সন্দেহ হইত যে, সে বুঝি কখনও জীবনের গুরুত্ব কখনও উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় নাই। হয়ত বা বাল্যকালেই স্বামি-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে!

লীলার চোখে শরৎকুমারের মত সুন্দর মানুষ বুঝি আর কেহ নাই। সুতরাং তাহার স্বামীকে দেখিয়া কোনও রমণী যে মোহিত না হইতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারিত না। একদিন সে হঠাৎ কুসুমিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা, আমার স্বামীকে তোমার কেমন লাগে?"

লজ্জায় কুসুমিকার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। সে শুধু উত্তর করিল—"ভাল।"

লীলা আবার জিজ্ঞাসিলেন, "পুরুষ মানুষের মধ্যে এমন রূপ কখনও দেখেছ?"

"না; উনি খুব সুন্দর।"

কুসুমিকা সরল ভাবেই বলিল। সত্যই যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নে শরৎকুমার একজন দেখিবার মত মানুষ বলিয়া তাহার বোধ হইয়াছিল। সরলা বালিকা রূপের মোহে লুব্ধ মধুপের মত প্রমত্ত না হইলেও, শরৎকুমারের সম্মুখে পড়িলে তাড়াতাড়ি কাটিয়া সরিয়া যাইত।

শরৎকুমার প্রথম প্রথম শিষ্টতার অনুরোধে কুসুমিকার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতেন না। তিনি তাহাকে দেখিয়াও দেখিতেন না। কিন্তু দেওঘরের মত নির্জ্জন প্রদেশে একই বাড়ীতে বাস করিয়া দুই জন মানুষ পরস্পরের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। শরতের বুভুক্ষিত চিত্ত এই সদ্যবিকসিতযৌবনা ললনার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না।

এক দিন নমিতার অনুরোধে কুসুমিকা একটি আতাগাছের ডাল ধরিয়া তাহাকে একটি আতা পাড়িয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর; দাসদাসীরা স্নানাহারে ব্যাপৃত। লীলা বোধ হয় নিদ্রালু। শরৎকুমার জানালা হইতে কুসুমিকার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। অলক্ষিতে তাহার পশ্চাৎ হইতে তাহার দোলায়মানা তনু-লতা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নমিতা এবং কুসুমিকা উভয়েরই চক্ষু সেই অ-বিনত আতার দিকে নিবদ্ধ।

কুসুমিকা হঠাৎ একটু ফিরিয়াই তাঁহাকে দেখিল। নমিতা হাত তালি দিয়া উঠিল, কারণ কুসুমিকার বসন বিস্রস্ত। যথা সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কুসুমিকা বসন সংযত করিয়া লইল। শরৎকুমার মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। কুসুমিকা এইরূপ ব্যবহার অন্যায় মনে করিলেও, কেন যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটি পুলক-শিহরণ উপস্থিত হইল।

শরৎ একটু সাহস করিয়া বলিলেন, "ও আপনার কাজ নয়। আপনি সরুন, আমি আতা পেড়ে দিচ্ছি। যার কায তারে সাজে—"

কুসুমিকা যাইতে প্রস্তুত হইল। শরৎকুমার বলিলেন, "বাঃ, আপনারা দুজনে চলে যাবেন; আর আমি একলা আতা পেড়ে মরবো বুঝি। জানেন ত দুপুর বেলায় গাছে উঠ্‌তে মানা। বলে, এ সময় গাছে ভূত থাকে—"

নমিতা চোখ দুটী পাকাইয়া গল্প শুনিতে প্রস্তুত হইল। কুসুমিকা তাহার হাত ধরিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। শরৎকুমার গাছের দুই ডালের মধ্যে পা দিয়া অনায়াসে সুপক্ব ফলটি পাড়িয়া কুসুমিকার করে দিলেন।

"দেখবেন, নমিতা যেন সবটা না খায়। এত বড় আতা ওর একলা খেয়ে কায নেই।"

শরৎকুমার চলিয়া গেলেন। কুসুমিকা যেন কিসের পরিমলে লুব্ধ হইয়া সে আতা গাছের তলা হইতে অন্যত্র যাইতে পারিতেছিল না। নমিতা ডাকিল,

"কুসুম মাসী এস। বাইরে থাকলে রোদ লাগবে যে-

কুসুমিকা আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক ভাবে তাহার সঙ্গে চলিয়া গেল। কত কি ভাবনা যে তাহার ক্ষুদ্র বক্ষে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই।

বিকালে মায়ের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ছলিতে ছলিতে যখন নমিতা সেই আতা পাড়ার গল্প করিতে লাগিল, তখন লীলা গম্ভীর হইলেন, কুসুমিকা অকারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। লীলা ভাবিলেন, তাহার অপরাধ কি? তিনি নিজে রোগশয্যালীনা না হইলে ত এমন ঘটিত না। কুসুমিকা ভাবিল, একথাটি লীলাদির কাছে না বলিলেই ভাল হইত!

শরৎকুমার ইহার পরে প্রায়ই লীলার ঘরে ও নমিতার পড়ার ঘরে দেখা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অশান্ত মন কোনও কাযেই আর বসিতে চাহিল না। যতই তিনি কুসুমিকাকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন, ততই যেন শত বাঁধনে মনকে সেই দিকে টানিয়া আনিত। প্রথমে তিনি আপনাকে বশে আনিবার জন্যে প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক ক্ষণ বাড়ীর বাহিরে থাকিতে লাগিলেন। বৈষয়িক কাগজ-পত্র লইয়া ঘাঁটিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে শিমূলতলা, গিরিডি প্রভৃতি দেখিয়া আসিবার জন্য গৃহত্যাগ করিতেন। কিন্তু কিছুতেই মন প্রবোধ মানিল না। বাধামুক্ত ঝরণার ন্যায় তাঁহার মন অদম্য বেগে ছুটিয়া চলিতে লাগিল। শেষে একদিন তিনি সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া দিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন।

নানা ছল করিয়া তিনি কুসুমিকার সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। উপঢৌকন তাহাকে ত দেওয়া চলে না; কাযেই ভাল ভাল বাঁধানো বই প্রভৃতি সপ্তাহে কলিকাতা হইতে আসিতে লাগিল। কুসুমিকা দেখিত তাহার অজ্ঞাতসারে কোনও দিন একখানি বই, কোনও দিন একখানি ছবি, কোনও দিন বা একটি ফুলের

স্তবক তাহার টেবিলে বা বিছানায় রক্ষিত হইয়াছে। এখন তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, উপহার দাতাটি কে! সময়ে সময়ে তাহার দুঃখ হইত, রাগ হইত কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্ত মনকে শাসাইয়া দমন করিতে গেলে সে আরও বেগ সঞ্চয় করে। কুসুমিকা ভাবিতে লাগিল।

শরৎকুমার নানা ছলে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করিতেন। সেই স্বাধীন অথচ নম্র, শিক্ষিতা অথচ অবলা, অপূর্ব্ব সুন্দরী অথচ প্রভাতকল্প জ্যোৎস্না-রজনীর স্থায় ম্লান, মেয়েটিকে দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার চিত্ত তৃপ্ত হইত না।

লীলা বিশেষ কিছু দেখিতেন না, কিন্তু স্ত্রীজাতির যে অশিক্ষিতপটুতা আছে, তাহারই বলে তিনি অনেক কিছু অনুভব করিতেন। তাঁহার মন তাঁহাকে বলিয়া দিত যে, কোথাও কিছু গলদ ঘটিয়াছে। বীণার তারের সুর অকস্মাৎ ছাড়িয়া যাইতে বসিয়াছে। শরৎকুমারের স্নেহের নদীতে ভাঁটা পড়িতে সুরু হইয়াছে। তিনি আর তেমন করিয়া কাছে বসেন না কেন? তেমনি করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দেন না কেন? তেমনি করিয়া শীর্ণ চিবুকখানি তুলিয়া ধরিয়া আশার বাণী শোনান না কেন? লীলা ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।

কখন কখনও মনে হয় কুসুমিকাকে বিদায় করিয়া দিলেই ত সব পাপ চুকিয়া যায়! তাই করিতে হইবে; স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে। কিন্তু কার সাধ্য? যে বাঁচিতে চাহে না, তাহাকে কি বাঁচানো যায়? স্বামী ব্যথা পাইবেন অথচ আমারও কোন লাভ নাই! যে সুখ নিজে দিতে পারি না; সে সুখ হইতে এক জনকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কি? নমিতাও ত আমার নিকটে তেমন আদর পায় না। সে কুসুমিকাকে পাইয়া আমায় প্রায় ভুলিয়াছে। ক্ষতি কি? যদি একদিন যাইতে হয়, ত নমিতা আদর যত্নের অভাব বোধ করিবে না।

লীলার চোখে জল আসিল।

৫

লীলা যে হঠাৎ শুকাইয়া উঠিতেছে; তাহা কুসুমিকা দেখিল। সে নিজেই যে ইহার জন্ত অনেকটা দায়ী এইরূপ একটা আশঙ্কা তাহার মনে ঘনাইয়া উঠিল। তাহার প্রতি শরতের অনুরাগ যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, লীলার জীবন বর্ত্তিটী তেমনই দ্রুত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তাহার নিজের মনও এ বিষয়ে নিরপরাধ নহে। যে কখনও কোনও পুরুষ মানুষের ছায়া মাড়ায় নাই, সে হঠাৎ এইরূপ বিজন স্থলে একজন সুশ্রী যুবা পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির আকর্ষণ সহজে এড়াইয়া উঠিতে পারিবে কেন? ক্রমেই তাহার মনে শরৎকুমারের অপামাস্থ রূপ, অপরিসীম দয়া ও মদির চাহনি গভীর রেখাপাত করিতে লাগিল।

একদিন সে লীলার কক্ষে বসিয়া তাঁহাকে মাসিক পত্রের গল্প পড়িয়া শুনাইতেছে। একস্থলে নায়িকার নিকট নায়ক নানা ভঙ্গীতে প্রেম নিবেদন করিতেছে, তাহা পড়িতে পড়িতে কুসুমিকা যেন মাতিয়া উঠিল। বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াও যে সে বেচারীর চিত্ত নিঃশেষে আপনাকে প্রেমাস্পদের পদে অঞ্জলি প্রদান করিতেছে, ইহার তাড়িত-প্রভাব যেন কুসুমিকা নিজেই অনুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্বে এ সকল অতি সাধারণ ভাবে কুসুমিকা পড়িয়া যাইত। কিন্তু আজ তাহার চোখে মুখে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা দেখা গেল। ভাবের উচ্ছ্বাসে তাহার স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। লীলা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার চোখে মুখে যেন মরণ-কালিমার ছায়া পড়িল। তিনি সাগ্রহে কুসুমিকার হাত ধরিয়া বলিলেন,

"সত্যি বল, তুমি কি বিধবা? আমার মাথা খাস্ বোন, আমায় আজ সত্যি কথাটি বল?"

কুসুমিকার হাত হইতে বই খসিয়া পড়িল। সে স্তব্ধ নির্ব্বাক বিস্ময়ে লীলার উত্তেজিত শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

লীলা উঠিয়া বসিয়াছিলেন, পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

সেই দিনই কুসুমিকা নমিতাকে লইয়া শালবনের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে শরৎকুমার আসিয়া সঙ্গে জুটিলেন। কুসুমিকা বড়ই মুস্কিলে পড়িল।

কারণ আজকাল দেখা হইলেই শরৎ কুমার তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। আর তাঁহার সকল কথার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত তাঁহার প্রাণের ব্যাকুল আবেগ ভরা মিনতিটি। আজ তিনি কিন্তু গম্ভীর। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কি বিধবা? সত্যি করে' বলুন আমায়।"

"কি হবে আপনার জেনে?"

"না, আমার সেটা জানতেই হবে, আপনি বলুন, দোহাই আপনার।"

"আপনাকে বলে কোন লাভ নেই।"

"কেন?"

"আমি বিধবা হই বা অবিবাহিতা হই, সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি তাই আগে বলুন।"

"সে আমি বল্‌তে পারবো না। আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না; নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি শুধু বলুন; একবার আমাকে দয়া করে' বলুন, আপনি কি বিধবা?"

"কেন? আমায় সধবা করতে চান নাকি?" এই কথা বলিয়া কুসুমিকা নিজেই অনুতপ্ত হইল। বলিল,—

"দেখুন, জেনে আপনার কোনও লাভ নেই। আমি কাল কল্‌কাতায় যাচ্ছি।"

কুসুমিকা চক্ষু মুছিল। নমিতার হাত ধরিয়া সে দ্রুত চলিতে লাগিল। শরৎকুমার দূরের শৈল-শৃঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমস্যার কোনও সমাধান দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যার অন্ধকারের মত তাঁহারও মনের অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আসিতে লাগিল।

৬

বাড়ী ফিরিয়া তাহার নির্জ্জন কুঠুরীতে বসিয়া কুসুমিকা অনেকক্ষণ কাঁদিল। শেষে হাতে মুখে একটু জল দিয়া সে লীলার নিকটে গেল। নমিতা আগেই সেখানে আসিয়া বলিয়াছে যে কুসুমিকা ও তাহার পিতা আজ ঝগড়া করিয়াছে।

কুসুমিকা লীলাকে বলিল যে সে ক্রমেই অসুস্থ বোধ করিতেছে। আর সে দেওঘরে কাজ করিবে না স্থির করিয়াছে।

লীলা একখানা পাখা তুলিয়া সজোরে আপনাকে বাতাস করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। লীলা তাঁহার হাত হইতে পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। লীলা ধীরে ধীরে বলিলেন—

"সত্যি, তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে?"

"হ্যাঁ দিদি, আমি আর কিছুতেই থাক্‌তে পারছিনি। আমায় আপনারা মাফ করুন।"

"নমিতার জন্যে কষ্ট হচ্ছে না?"

এইবার কুসুমিকার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে বলিল,—

"চাকরী করতে এসে এমন সোণায় চাঁদ মেয়ে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু ছেড়ে ত যেতে হবে।"

"কেন যেতে হবে বোন?"

"আমার এ শুধু চাকরী বই ত নয়! আজ এক জায়-গায়, কাল এক জায়গায়, যেখানে অদৃষ্ট নিয়ে যায় সে খানেই যেতে হবে ত?"

"না-ই বা গেলে। এখানেই না হয় থেকে গেলে? পাঁচ জায়গায় যে যেতে হবে এমন ত কোন কথা নেই।"

"না তা নেই বটে; কিন্তু আমি কিছুতেই থাকতে পারছি নে। কাল ১০টায় রওনা হব স্থির করেছি। চাকরী আর করবো না।"

"ওঃ এই কথা? আচ্ছা!" বলিয়া লীলা বালিশের নীচে হইতে একখানি চিঠি ও একতাড়া নোট বাহির করিলেন। কুসুমিকা আলোর নিকটে চিঠি খানি লইয়া পাঠ করিল।

প্রিয় ভগ্নি!

তোমার সঙ্গে অল্পদিনের দেখা; এরি মধ্যে তুমি আমাদের হৃদয় জয় করে ফেলেছ। কিন্তু নানা কারণে তোমার আর এখানে চাকরী করা ভাল দেখায় না। তোমার প্রাপ্য ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দিলাম। গ্রহণ করিও। ইতি—

লীলা।

কুসুমিকা দুঃখের মধ্যেও একটু হাসিল। বলিল, "তাহ'লে আপনিও তাই আগে থেকে ঠিক করে রেখেছেন। বেশ ভালই হলো; আপনাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে পারা সৌভাগ্য বলে মনে করি।"

"যেতে পারবে কিনা, তাত জানিনে।"

"কেন, আপনি ত আমাকে জবাব দিলেন।"

"হ্যাঁ, চাকরীতে জবাব দিলাম বটে।"

"তবে?"

"স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রাখবো। তুমি কি আমাদের ছেড়ে যেতে পার বোন?"

শরৎকুমার দরজায় দেখা দিলেন। লীলা তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার অধীর চিত্ত গুমরিয়া উঠিলেও তিনি মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। কুসুমিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৭

কুসুমিকার কলিকাতায় যাইবার বিলম্ব পড়িয়া গেল। নমিতাকে বুঝাইতে দুইদিন কাটিয়া গেল। তারপর লীলার অসুখ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কুসুমিকার উপরেই তাহার শুশ্রূষার ভার পড়িল, কেননা দেওঘরে কোনও শুশ্রূষাকারিণী পাওয়া গেল না। কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিয়াও তিন চার দিনের মধ্যে একজন রমণী মিলিল না। কুসুমিকার নিপুণ শুশ্রূষায় লীলা অত্যন্ত আরাম বোধ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমারও সারাদিন রাত্রি স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শুশ্রূষায় যতই আরাম বোধ হউক, রোগের কোনও উপশম দেখা গেল না।

একদিন রোগিণী প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

"বিধবা! বিধবা! না, না, এত ভালবাসা। না। কুসুম! দিদি, ভগ্নি!"

শরৎকুমার চুপি চুপি বলিলেন,

"দেখ, ওঁকে আর রহস্যের মধ্যে রেখো না। দেখছ না, উনি ঐ ভেবে ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন।"

পরদিন লীলা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে কুসুমিকা বলিল, "দিদি আমি আপনাদের এত দিন বলিনি; আমায় ক্ষমা করবেন। আমার বিয়ে হয় নি। বিয়ে দেবার সময়েই বাবা গেলেন। কাযেই আমার বিয়ে হতে নানা বিঘ্ন হলো। লোকে পাছে ঘৃণা করে এই আশঙ্কায় কাউকে বলি নে। মার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও তাঁর মত সমস্ত আচরণ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।"

শরৎ তখন উপস্থিত ছিলেন না। লীলার অধরে একটু মৃদু হাসি দেখা দিল। তাঁহার হস্ত খানি কুসুমিকার স্কন্ধে অর্পণ করিয়া বলিলেন—

"যাই হও, বোন। আমার এ সংসার তুমি ফেলে যেও না।"

শরৎকুমার আসিলে লীলা কুসুমিকাকে উঠিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার হাত বাক্স হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া শরৎকুমারকে পড়িতে বলিলেন। চিঠিখানি কুসুমিকার মায়ের লেখা। তাহাতে কুসুমিকার জীবনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও তাহাদের বংশপরিচয় আছে। শরৎকুমারের পাঠ শেষ হইলে, লীলা, তাঁহার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "আমার জীবন ফুরিয়েছে। তোমরা সুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

অপমান

দুঃখ দিয়েছো, দিয়েছো বন্ধু, সে নিঠুরতাও ক্ষমিতে পারি;
গভীর দুখও যে ভুলাইয়ে দাও, এই অপমান সহিতে নারি।
দুখী আত্মার দুঃখই মান, সে সম্মান সে হারা'ল যদি,
দুখিনী মায়ের কাঁথা ভুলাইল, ধনী শশুরের আরাম গদি,
করি প্রাণপণ যে দুখ-মোচন দুর্ভাগাগণ করিতে নারে,
মায়া বুলাইয়ে তুমি সে দুখের স্মৃতিটুকু যদি ভুলাও তারে,
বলাও তাহারে যুক্তকরেতে—'ধন্য হে প্রভু ধন্য তুমি,
অমন ব্যথাও ভুলে যেতে দাও, হে দয়াল তব চরণ চুমি!'
তবে বল তার কি থাকে বাকী?
মানুষ যে হয় সে কি কভু চায়,—মদের আড়ালে ঢাকি?
দুঃখের বোঝা বহিতে না পারি, তার মান রেখে মরিতে পারি,
ওই দয়া তব, ওই মায়া তব, ওই পরিহাস সহিতে নারি।

চিরবিদ্রোহী মানব-আত্মা, আজিও তোমার মানেনি বশ,
জনে জনে তারা বিশ্বামিত্র হরিতে বিশ্বকর্ম্মা-যশ।
কাম পুড়াইয়ে সৃজিয়াছে প্রেম, দেহ মথি তারা তুলেছে স্নেহ,
মনের ফানুস্ ছেড়েছে আকাশে, আকাশ বাঁধিয়া গড়েছে গেহ।
এ জগতে তব স্বেচ্ছাতন্ত্র, তাই নর তার জবাব দিতে
গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তরে প্রাণপাত করে এ পৃথিবীতে।
মরণ-বারণ রসায়ন লাগি আজিও তাহার চলিছে তপ,
দুঃখ-তারণ মন্ত্র-কারণ ওঙ্কার সাথে সোহং জপ।
হিংসা ভাসায়ে দয়ার প্লাবনে সংযমে রিপু করেছে জয়,
আপন হাতের কর্ম্মের ফাঁসে কর্ম্ম কাটিয়া করেছে ক্ষয়।

রাজা অনায়াসে ত্যজিয়াছে রাণী, যুবরাজ হ'ল কানন-বাসী
কারা-বন্ধনে মা'র ক্রন্দনে আসি ধরে ছেলে ত্যজিয়া বাঁশী।
পরিবর্ত্তিতে তব বিধান,
শিরে অপমান-কাঁটার মুকুট মহাপ্রাণ ক্রুশে ত্যজেছে প্রাণ
আজিও ত নর অপরাজিত;—
মেঘের আড়ালে কর মায়ারণ, বন্ধু, এ নহে ক্ষত্রোচিত!

নর-নারায়ণে অসম এ রণে, এই সুরাসুর রণস্থলে,
হায়! মহাকাল আপনা বিকালো ওই মহামায়া-চরণতলে!
প্রেমিক ভুলিয়া প্রেমের দুঃখ কামসুখমোহে লুটায় শির,
পায়ে দ'লে তারে ছিন্নমস্তা ছিন্নমুণ্ডে হেসে অধীর!
কালীর কটিতে দোলে কাটা ছেলে,—চেলি 'পরে মাতা পূজিছে পা,—
শবের মুখেও ফুটে ওঠে হাসি, হাসে মহামায়া হা হা হা হা!
অমাবস্যার গহন নিশীথে হ'য়েছে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা,
নরমুণ্ডের মালা সাজাইতে গাঁথিতেছে নারী ফুলের মালা।
বামে অসি ঘা'য় ভক্ত পলায় দক্ষিণ-হাতের অভয়-ছায়ে;
নরের এ মোহে হেসে মহামায়া ঢলে' পড়ে মহাকালের গায়ে।
চেয়ে দেখে নর,—দেউল খালি!
কোথায় দেবতা, কোথায় বা জয়! কাঁদিছে ললাটে হোমের কালি!

দুঃখ আমারে দিয়েছ বন্ধু,
সে নিঠুরতা ত ক্ষমেছি আগে;
দুঃখের মোর হ'ল অপমান,—
রাবণের চিতা চিত্তে জাগে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

বালুর দেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রাহ্মণেরা এই প্রকারে তিলকাঙ্কিত হইয়া ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; এবং তাড়াতাড়ি স্থানসংগ্রহ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে একটু বিশেষত্ব দেখিলাম, প্রায় সকলের হস্তে এক একটি লোটা এবং একখান করিয়া পিতলের থালা। অধিকাংশ লোকই থালা ও লোটা লইয়া নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। যাহারা শূন্য হস্তে আসিয়াছিল তাহাদের এক একখানি করিয়া শুষ্ক শালপত্র দেওয়া হইতেছিল।

ইহাদের ব্রাহ্মণ-ভোজনের আর একটু নূতন ব্যাপার আছে; ছোট দুগ্ধ-পোষ্য বালক বালিকাগণও ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল। এক একজন দুই তিনটি করিয়া পুত্র কন্তা লইয়া বহু দূর গ্রাম হইতে আসিয়াছে। কুমারীগণও ব্রহ্ম পুরির (ব্রাহ্মণ ভোজনের) তালিকাভুক্ত। আমাদের দেশে যেমন কেবল উপবীতধারিগণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা হয়, এবং যাহাদের উপনয়ন সংস্কার কার্য্য হয় নাই, ব্রাহ্মণ ভোজনে নিমন্ত্রণে আসিলেও দক্ষিণা দেওয়া হয় না, এখানে কিন্তু সে রীতি প্রচলিত নাই।

রাজপথের দুই ধারে পূর্ব্বকথিত মত সারি দিয়া প্রায় এক হাজার ব্রাহ্মণ বালুর উপর পরমানন্দে উপবেশন করিল। কিছুমাত্র দ্বিধা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইল না। তারপর পরিবেষণ—এখানে সর্ব্বজাতি এ কার্য্য করিবার অধিকারী। পরিবেষণকারিগণ বড় বড় থালাপূর্ণ সেই বৃহদাকার লাড্ডু লইয়া ভোজন-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বীরদর্পে অবতীর্ণ হইল। প্রথমে লাড্ডু—থালায় বক্ষঃ কাঁপাইয়া ঠকা-ঠক্ শব্দে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল। তারপর যত রকমের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারাও দর্শন দিল। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। রাক্ষসেরা যেমন করিয়া রামসেনা উদরসাৎ করিয়াছিল, ইহাদের ভোজন ক্রিয়া তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম ভীষণ নয়। এক এক জনে সেই কামানের গোলার মত লাড্ডু দশ বারটা করিয়া অনায়াসে গলাধঃকরণ করিতেছে। তাহার পর যাহা যাহা আসিল তাহাও বড় কম নয়। মনে হইল যেখানে আহার করিবার শক্তি আছে সেখানে আহার্য্যের তেমন স্বচ্ছলতা নাই। ইহার পর যখন আহারাদি শেষ হইল, তখন অপর গেট দিয়া তাহাদের এক একজন করিয়া রেলের গেটের মত ছাড়া হইতে লাগিল। প্রত্যেককে একটি করিয়া টাকা দক্ষিণা দেওয়া হইল—ছোট ছোট কোলের ছেলেমেয়েগুলিও দক্ষিণা হইতে বঞ্চিত হইল না। কারণ, ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যাও ব্রাহ্মণ। প্রায় দুই হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন হইল এবং দক্ষিণাও পাইল। এ প্রকার অদ্ভুত ব্রাহ্মণ ভোজন আর কোথাও হয় কি না জানি না। বেলা আন্দাজ একটার ভিতর সমস্ত চুকিয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা সহস্র মুখে কর্ম্মীর সুখ্যাতি করিতে করিতে প্রস্থান করিল। পরে আমাদের ভোজনটা বেশ সুচারু রূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল—কিন্তু উহা শেঠজির বাড়ীতেই।

এই ব্যাপার হইয়া যাইবার সাত আট দিন পরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। শেঠজিদের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর পুত্রের বিবাহ। এই বিবাহে আমারও যথারীতি নিমন্ত্রণ হইল। ক্ষুদ্র গ্রামটির মধ্যে বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল। সকালে বিকালে মধ্যাহ্নে সজ্ঞবদ্ধ পুরনারীদের সে কি ভীষণ সঙ্গীতালাপ! এই প্রকার সঙ্গীত হয়ত অনেকেই কলিকাতাস্থ হ্যারিসন রোডে শুনিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু এখানে নিজ দেশের মধ্যে বড় বড় ঘরের কুললক্ষ্মীগণ প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া বরকে সঙ্গে করিয়া আত্মীয়-স্বজনের গৃহে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতে লইয়া যান। গানের অর্থ বহু চেষ্টা করিয়া বুঝিতে

না পারিলেও—এটা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে ইহারা অশ্লীল ভাষায় কাহাদের প্রতি গালিবর্ষণ করিতেছে। আধুনিক শিক্ষিত মাড়োয়ারীরা এই প্রকার অসভ্য প্রথাকে মোটেই প্রশ্রয় দিতে রাজি নন; কিন্তু বৃদ্ধ কর্ত্তাদের উপেক্ষা বা আপত্তি করিয়া চলিবারও ইঁহাদের শক্তি নাই। মাড়োয়ারীদের ভিতর আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার দেখিয়াছি—যাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইঁহারা গুরুজনদের এমন অতিরিক্ত মাত্রায় শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন, যাহা অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব ও অশোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা যে কেবলমাত্র মৌখিক ও বাহ্যিক, তাহা যে-কোন তীক্ষ্নদৃষ্টি ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

বরপক্ষ হইতে আমাকে বরানুগমন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করিবার আশঙ্কাই আমাকে তাঁহাদের অনুগমন হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। প্রায় ১৮ মাইল দূরে বিবাহ হইবে। বহু লোক উট হাতী ঘোড়া পাল্কী রথ প্রভৃতি চড়িয়া এবং বন্দুক বর্ষা তরবারিধারী দশ পনর জন রাজপুত তাহাদের রক্ষক হিসাবে শোভাযাত্রায় অনুগমন করিয়াছিল। কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বর বিবাহ করিতে চলিয়া গেল; কিন্তু সঙ্গীত পূরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। বর বিবাহ করিয়া আসিলে বৌভাতের আয়োজন চলিতে লাগিল। শেঠজির নিকট হইতে বরের পিতা তৈজষপত্র ছাড়া ক্রিয়া উপলক্ষে কিছু মিঠা জল প্রার্থনা করিলেন। কারণ তাঁহার সঞ্চিত জলে সংকুলান হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শেঠজিদের প্রচুর বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা আছে। এই জলসাহায্য বুঝিলাম একটা বড় রকমের সাহায্য। বর ও ক'নে আসিয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে গৃহে ভোজ খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। নিরামিষ দেশের 'বৌ-ভাত' পূর্ব্ববর্ণিত লাড্ডু ও কচুরী, তবে পাকা রসুইয়ের সঙ্গে কাঁচা রসুই তিন চার রকম শাক ছিল। পাঁচ ছয় রকম চাট্‌নি ছিল—বেশীর ভাগ ছিল 'মীরা'—উৎকৃষ্ট বাদামের হালুয়া। যথাসময়ে সেদিন ডাক্তারবাবু ও আমি বৌ-ভাত খাইয়া ফিরিয়া আসিলাম—তবে বৌ-দেখার প্রথা আছে কি না বুঝিতে পারিলাম না। কারণ কাহাকেও ত বৌ দেখিতে যাইতে দেখিলাম না। তবে আত্মীয়-স্বজনগণ পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের উপঢৌকন পাঠাইয়া থাকিবেন। ইঁহাদের বিবাহে পুরোহিত অপেক্ষা পরামাণিকেরই প্রাপ্য অধিক। বিবাহপ্রথা প্রায় অনেক খানি আমাদের মতই, তবে বর অশ্বপৃষ্ঠে বীর-সজ্জায় ভূষিত হইয়া বিবাহ করিতে যায়। বিবাহের সময় বর রক্তবর্ণ পাগড়ী পরিয়া থাকে।

ইহার কিছু দিন পরে শেঠজি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পান্নালালের চুল দিবার জন্য 'সালেশ্বর' যাইবার আয়োজন আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যেও দেবতার নিকট শিশুর মস্তক মুণ্ডন প্রথা প্রচলিত আছে। যতদিন পর্য্যন্ত দেবতার নিকট মানসিক দেওয়া না হয়, ততদিন শিশুর কোন প্রকার সংস্কার হয় না। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া দেবতার পূজা দিবার জন্য আসিবেন আসিবেন করিয়া আর সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কলিকাতা হইতে অনেকেই দেশে আসেন এই প্রকার কোন কার্য্য উপলক্ষে বা পীড়িত হইয়া; নতুবা বাঙ্গালা দেশের সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই জলহীন শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি প্রদর্শন করিতে খুব কম লোকেই আসিয়া থাকেন। কলিকাতা হইতে সপরিবারে দেশে পদ-মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া আসিতে দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়া যায়।

শেঠজির দেশে আসার প্রধান উদ্দেশ্য সালেশ্বরের পূজা দেওয়া। সুজানগড় হইতে সালেশ্বর দেবতার মন্দির মরুভূমির মধ্যে দিয়া প্রায় আশী মাইল দুর্গম পথ। বহু লোকজন অস্ত্র-শস্ত্র ভিন্ন এ পথে যাওয়া নিরাপদ নহে। ডাকাতের ভয় আছে। আমাকে যাইবার জন্য শেঠজি অনুরোধ করিলেন। আমি যাইতে সম্মত হইলাম যদি আমাকে রথ দেওয়া হয়—কারণ উটের পিঠে আরোহণে অতদূর যাওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। শুনিলাম, ডাক্তারবাবু আমাদের সঙ্গে যাইবেন, যদি পথে কাহারও কোনরূপ অসুখ বিসুখ হয়
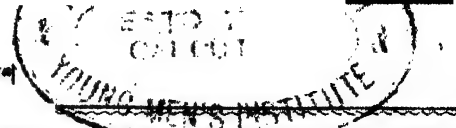
বলিয়া। ডাক্তারবাবু যাইতেছেন শুনিয়া আমারও যাইবার আগ্রহ হইল—এত দূর আসিয়া, ইঁহাদের প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবতাকে দর্শন করিব না? আর এতখানি পথ মরুভূমির মধ্যে দিয়া সে-খানে যাওয়া হয়ত জীবনে আর ঘটিবে না। আমি যাইতে স্থির সঙ্কল্প করিলাম।

এক সপ্তাহ পরে যাইবার দিন স্থির হইল। বেলা ৩টার সময় রওনা হইতে হইবে এবং পরদিন বেলা ৮টার সময় সেখানে গিয়া পৌছান যাইবে। এবং সেখানে পূজাদি দিয়া সন্ধ্যার পর বাহির হইয়া পর দিন প্রাতে সুজানগড় ফিরিয়া আসা যাইবে। একটা নূতন ধরণের অভিযানের জন্য আশা-পথ চাহিয়া রহিলাম।

যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন সকাল হইতে উট ঘোড়া রথ সব জড় হইতে লাগিল। তিনজন বলিষ্ঠকায় রাজপুত অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিন এখান হইতে দুইটি গরুর গাড়ি মিঠাপানী, বাসন ও আসবাব-পত্র লইয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে ৪।৫ জন লোকও সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য গিয়াছে। ভোর রাত্রিতে দুই স্বতন্ত্র গরুর গাড়ি মিঠাই ও অন্যান্য আহার্য্য লইয়া রওনা হইয়াছে। পরে শুনিলাম সেখানে এক শত ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হইবে, তাহার উপযুক্ত সমস্ত জিনিস-পত্র এখান হইতে পূর্ব্বাহ্নে প্রেরিত হইয়াছে। শেঠজির নিকট শুনিয়াছিলাম, সেখানে তাঁহাদের একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন হইতেছে, তাহার জন্য ইতিমধ্যে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন পুষ্করিণী বাঁধানো কার্য্য চলিতেছে, আরও বিস্তর টাকার প্রয়োজন হইবে। মরুভূমির মধ্যে সালেশ্বরের মন্দির—বহু লোক এই তীর্থে আসিয়া থাকেন। এখানে আসিতে বহু অর্থ ব্যয় হয়, কারণ এখানে কিছুই পাওয়া যায় না। সমস্ত জিনিস সঙ্গে করিয়া আনিতে হয়, এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত—কারণ এখানে অত্যন্ত জলকষ্ট। সেই নিমিত্ত শেঠজিরা পুষ্করিণী কাটাইয়া দিতেছেন।

বেলা ৩টার সময় রওনা হইবার কথা থাকিলেও সমস্ত জোগাড় করিতে বেলা প্রায় ৪॥টা বাজিয়া গেল। সেটা বৈশাখ মাসের শেষ, তখনও সূর্য্য-কিরণ বেশ প্রখর অনুভূত হইতেছিল। তপ্ত বালির উত্তাপে বাতাস উষ্ণ বোধ হইতেছিল। আকাশ নির্ম্মেঘ—কোনখানে একটুখানিও মেঘের লেশ ছিল না। এমনি পরিষ্কার দিনে মহানন্দে আমরা যাত্রা করিলাম। ডাক্তারবাবু উটের পৃষ্ঠে, আমি একখানি রথে—আমার সঙ্গী কিন্তু একটী স্ত্রীলোক ছিলেন—তাহার শরীর এত অধিক স্থূল ছিল যে, আমাকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বসিতে হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটী পরে জানিলাম ইঁহাদের বাড়ীর পুরাতন দাই—অর্থাৎ দাসী। আমাদের দলটি বেশ পুষ্ট ছিল। সম্মুখে দুইজন সশস্ত্র অশ্বারোহী—পশ্চাতে একজন। মধ্যখানে প্রথমে উষ্ট্রপৃষ্ঠে দশজন ভৃত্য, তাহাদের পশ্চাতে শেঠজির রথ তাহাতে শেঠজির স্ত্রী ও দুইটি ছোট পুত্র। তাহার পর মদনলালের রথ, তাহার পর ডাক্তার বাবু, তাহার পর আমার গাড়ি। তাহার পর শোভনলাল সস্ত্রীক। মহা সমারোহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করা হইল। গ্রামের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত অনেকেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বিদায় লইয়া গেল। ধীরে ধীরে আমরা শেঠজিদের গোশালার পার্শ্ব দিয়া মুক্ত মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সে কি বিরাট দৃশ্য—কেবল বালুর তরঙ্গ ধু ধু করিতেছে। কোথাও একটী মাত্র বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে না। দূরে মাঝে মাঝে কখনও একদল হরিণ, কখনও এক ঝাঁক ময়ূর দেখা দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল। অনন্ত নীল আকাশের প্রান্তে মাঝে মাঝে বড় বালুর স্তূপ পর্ব্বত আকার ধারণ করিয়াছে। তখন আমরা গ্রাম ছাড়াইয়া আন্দাজ প্রায় মাইল তিনেক আসিয়াছি—ইতিমধ্যে মদনলালকে আমার গাড়িতে ডাকিয়া আনিয়াছি এবং দাইকে তাহার স্থলাভিসিক্ত করিয়া দিয়া হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া আরাম উপভোগ করিতেছি। এমন সময় ডাক্তার বাবু হাঁকিলেন, "মশাই কেমন আছেন?"

বলিলাম, "পথে নারী বিবর্জ্জিতা—কথাটা না মেনে বড়ই কষ্ট পাচ্ছিলাম এতক্ষণ।"

"সেটা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন ত ?"

"মদনলালের কৃপায়।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

ডাক্তার বাবু তখন ধীরে ধীরে আমাদের মন্থরগতি গাড়ির পার্শ্বে আসিয়া পৌছিলেন, এবং আমরাও গাড়ির গতি অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত করিয়া গল্প করিতে করিতে চলিলাম। ডাক্তার বাবু গলা ছাড়িয়া দিলেন—তিনি যে এত সুন্দর গান করিতে পারেন, তাহা এত দিন বলেন নাই বা জানিতে দেন নাই। সত্যই সেদিনকার মত আনন্দ বোধ হয় জীবনে খুব অল্পই মিলিয়াছে। বেশ মনে আছে, সে সময়টা প্রায় পুর্ণিমার কাছাকাছি। বালির উপর চন্দ্রালোক পড়িলে যে কি সুন্দর দেখায়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সুনীল নভোমণ্ডলে শশাঙ্ককে অভিনন্দন করিবার জন্য মন আকুল আগ্রহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। কতরকম কল্পনা মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল। মরুভূমির সম্বন্ধে কত সম্ভব অসম্ভব গল্পই না মনে পড়িতেছিল।

এমন সময় পশ্চিম আকাশ প্রান্তে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মসী-রেখা তুল্য এক খণ্ড মেঘ দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিবিড় কালো মেঘ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা সেই অন্ধকারের মধ্যেই ডুবিয়া গেল। তখন সকলেই বড়ই বিপদ গণিল। কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। শেঠজি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর অগ্রসর হবার প্রয়োজন নেই—এখনি কে কার ঘাড়ের উপর এসে পড়বে—মহা বিপদ হবে—যে যেখানে আছ, সেখানেই থাক।"

সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মেঘ গর্জ্জন সুরু হইল। মনে হইল মরুভূমির মুক্ত বক্ষের উপর দিয়া ভৈরব নিনাদে ইন্দ্রের বজ্র ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুস্ফুরণ—যেন আতঙ্ক বাড়াইয়া শাসাইয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে দেখিলাম—সকলে অত্যন্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। তারপর প্রবল বেগে বায়ু সঞ্চালিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি বালি আসিয়া চোখে মুখে প্রবেশ করিতে লাগিল। মুখের উপর কাপড় ঢাকা দিলাম। চক্ষু খুলিবার কোন উপায় নাই। আমি কিন্তু প্রথমটা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বরং এই নূতন ব্যাপারে বড়ই আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। একটু খানি অগ্রসর হইতেই একখানি গরুর গাড়িতে বাধা পাইলাম।—সে গাড়িতে শেঠজি ছিলেন। তিনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "যান, শীঘ্র গাড়ির ভিতর গিয়া বসুন—যদি বেশী জল এসে পড়ে তা হ'লে গাড়ীর নীচে গিয়ে বসবেন।"

অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে গাড়ীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি গাড়ীর গরু খুলিয়া পশ্চাতে বাঁধা হইয়াছে। গাড়োয়ান গাড়ির নীচে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মদনলাল গাড়ির মধ্যেই মুড়ি সুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। আমার গাড়ীচালক বলিল, "শীঘ্র ভিতরে আসুন, ঝড় বাড়িতেছে।" তখন খুব বৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছিল। আমার গায়ের পাঞ্জাবী ভিজিয়া গিয়াছিল—তথাপি আশঙ্কার পরিবর্ত্তে আমার আনন্দই হইতেছিল, এব্যাপার এক নূতন অভিযান। এক একবার বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল আর আমার মনে হইতেছিল যে, অদূর সম্মুখে যেন এক অট্টালিকা আছে। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিলাম, এই গভীর মরুভূমির মধ্যে এমন অট্টালিকা কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? কেই বা এই বনমধ্যস্থ শূন্য মরুভূমির মধ্যে বাস করিতে আসিবে? দ্বিতীয় বিদ্যুৎস্ফুরণের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তখন বেশ জোরে বৃষ্টি নামিয়াছে। রথের ছাউনি ভিজিয়া জল টপ টপ করিয়া ভিতরে পড়িতে সুরু করিয়াছে। বেশ শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। এবার বিদ্যুৎচমকে যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, এবারও তাহাই আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমি তাড়াতাড়ি মহোল্লাসে গাড়ী হইতে নামিয়া অট্টালিকার দিকে ছুটিলাম। আশা—আশ্রয়স্থান আবিষ্কার করিয়া শেঠজিকে স্তম্ভিত করিয়া দিব।

আমাকে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া, মদনলাল বার বার নিষেধ করিল। সে চীৎকার

করিয়া বলিল, "এরূপ অবস্থায় একস্থান চুপ করে বসে থাকাই নিরাপদ। ফিরে আসুন, নতুবা মহা বিপদে পড়বেন।"

মনে হইল গাড়ীর নীচে হইতে গাড়োয়ানও যেন কি বলিতেছে; বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সেই অট্টালিকাকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎচমকের সঙ্গে সঙ্গে আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মাথার উপর অজস্র বারি ধারা পতিত হইতেছিল। আমার পরিধানে ছিল, মাত্র গ্রীষ্মকালোপযোগী একটী পাতলা গেঞ্জি, তাহার উপর একটী লংক্লথের পাঞ্জাবী। সুতরাং সে গুলি ভিজিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। তার পর বালির উপর জল পড়িলে যে কি অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা মুহূর্ত্তের ভিতর হয় তাহা বলা যায় না। দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে গরমে সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতেছিল—এখন যেন মন হইতেছিল অকস্মাৎ মাঘ মাসের দারুণ শীত আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে! ইহার তুলনায় ম্যালেরিয়া জ্বরের শীত ও কম্প কিছুই নয়। কাঁপিতে কাঁপিতে আমি কিন্তু সেই অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সে সময় আমার মনের মধ্যে নুরজাহানের জন্ম-কথা ও বিপদের কথা উদিত হইল এবং তাহাদের অভিভাবকের তখনকার অবস্থা আমার অন্তরে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম। আমার মত একজন বাঙ্গালীর এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মরুভূমির মধ্যে জীবনে কোন দিন আসিতে পারে, স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল এখানে অট্টালিকা আছে, ইহা কিছুতে আমার মনের ভ্রম হইতে পারে না। তখন শেঠজির গাড়ীর নিকট হইতে অনেক খানি চলিয়া আসিয়াছি। এত শীত ধরিয়াছে যে, আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। ভয় হইল—এখানেই পড়িয়া বুঝি মরিয়া যাইব। ঠিক এই সময় পুনরায় বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। দেখিলাম অট্টালিকার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—তাড়াতাড়ি দেওয়ালে হাত দিয়া অনুভব করিলাম সত্যই ইহা একটী পাথর-নির্ম্মিত বাড়ী বটে। তখন আর আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। কোন রূপ বিচার না করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম,—"মদনলাল, তোমরা সকলে এদিকে চলে এস বাড়ী পাওয়া গিয়েছে।" দুই তিনবার ডাকিলাম, তাহারা বৃষ্টির মধ্যে আমার কথা শুনিতে পাইল কি না, বলতে পারি না। কেহই যখন আসিল না তখন অগত্যা আমি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং একটী ঘরের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইলাম। সেই ঘরের মধ্যে একজন লোক একটী হেরিকেন জ্বালিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিল, আমার পদশব্দে উঠিয়া বসিল এবং পার্শ্বস্থিত দীর্ঘ যষ্টি টানিয়া লইল।

অকস্মাৎ এই দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে একজন বিদেশী বাঙ্গালীকে অন্ধকার রাত্রিতে দেখিলে কাহার না ভয়ের উদ্রেক হয়? তাহাকে সংক্ষেপে আমাদের বিপদের কথা জানাইলাম এবং গাড়ীতে শেঠজি এবং সকলে কি ভাবে কষ্ট পাইতেছে তাহা বলিয়া তাহাদের ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ করিলাম। আমার কথা শুনিয়া লোকটী কোন উত্তর না করিয়া, লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া ভিজিতে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে শেঠজিরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটি ঘরে চাবিবন্ধ ছিল, লোকটি উহা শেঠজিদের খুলিয়া দিল। জন্তু জানোয়ার সব সেই মরুভূমির মধ্যে গাড়ীর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া সকলেই সেই বাড়ীর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শেঠজি আমায় এই আশাতীত আবিষ্কারকে শত মুখে প্রশংসা করিতে ছাড়িলেন না। যে ঘরখানির মধ্যে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম সেখানি নিতান্ত ছোট না হইলেও, এতগুলি প্রাণীর স্থান সঙ্কুলানের পক্ষে খুবই অল্প পরিসর তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন মতে তাহার মধ্যে সকলেই প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলাম—কোনরূপ আভিজাত্য অভিমান এখানে আত্ম-সম্মান ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। চাকর বাকরেরা সম্মুখের খোলা দালানে একখানি বড় সতরঞ্চ খাটাইয়া

বৃষ্টি ও বায়ুর বেগ প্রতিহত করিতে প্রয়াস পাইল। মদনলালের জননী তাঁহার বহুমূল্য অলঙ্কারের বাক্সটি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালী-বাবু, হুসিয়ারিসে রাখ্‌খো।" বলিয়া তিনি আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নবব্রতীর উদ্দেশে

বাণীর পূজাঙ্গনে যারা দিচ্ছ হামাগুড়ি,
আজকে যারা কল্পবনে খেলছ লুকোচুরি,
তোমাদের আজ শ্রদ্ধাভরে করছি নমস্কার,
মনে মনে বড় আশায় দিচ্ছি অনেক ভার।
যে ভার দিলেন মোদের শিরে পিতৃপিতামহ,
সে ভার সঁপি তোমাদেরই আশীর্ব্বাদের সহ।

হাতে হাতে সে ভার নিতে পারবেনাক জানি,
কোমল কচি ঘাড়ে ভারী লাগবে সে ভার, মানি,
তোমাদেরই বইতে হবে অদূর ভবিষ্যতে
আজকে না হয় দু'দিন পরে অনাগতের পথে।
মনে মনে তোমাদেরই সঁপি সকল ভার
বিশ্রামের আর স্বস্তিটুকুর চাই যে অধিকার।

শ্রান্ত হয়ে দু'দিন বাদে মুদ্‌বে দু'নয়ন,
তার সাথে কি বিফল হবে সকল আয়োজন?
মরব মোরা—নইত অমর—খেদ নাহি তায় তত,
মোদের সাথে মর্‌বে কি হায় জীবনাধিক ব্রত?
না না তা' নয়, তোমরা আছ, তোমরা মোদের কি যে
কতই আশার মূর্ত্তস্বপন—জানই না তা' নিজে।

ব্রত মোদের রইবে বেঁচে,—তোমরা বাঁচাইবে
প্রাণ চেয়ে যা বড়, তারে নূতন জীবন দিবে।
বিফল হবেনাক মোদের জীবনব্যাপী ব্যথা
অপূর্ণ যা মোদের মাঝে, পাবে তা পূর্ণতা।
জীবন যোড়া মোদের যা, তা হবে জগৎজোড়া
সেই আশাতেই আপাততঃ আশ্বাসিত মোরা।

আদ্‌রা এঁকে যাচ্ছি মোরা মোহন তুলি ধ'রে
পূর্ণ ছবি আঁক্‌বে, নানান্ রঙ দিয়ে তায় ভরে।
সত্য ফলে পাবে স্বপন মুকুল পরিণতি।
কল্পনির্ঝর হবে ভাবে—ভাষায় স্রোতস্বতী।
মুক্তিরণে আন্‌বে লুটে বিজয়ী গৌরব
সেই ভরসায় সইছি মোরা লাঞ্ছনা লাজ সব।

গড়ছি যে পথ বন কেটে আজ, মোদের ভারই বহি'
চলবে তা'তে সেই ভরসায় সকল শ্রমই সহি'।
মোদের শোণিতাশ্রু শোষণ করছে আজি ধরা,
তোমাদেরি লাগি তা' যে হতেছে উর্ব্বরা।
আমরা লাগাই গাছপালা সব, তোমরা পাবে ফল,
সেই ভরসায় খুঁড়্‌তে মাটি পাচ্ছি হাতে বল।

মোদের গড়া সৃষ্টি কতক হয়ত ভেঙে, গ'ড়ে
তুলবে নূতন কিছু, যুগের উপযোগীই ক'রে।
ভালোই যা' তা করবে জানি, ভাঙবে সকল ভ্রম,
ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়াই সফল হবে শ্রম।
বাঁচবে না তায় ব্রত মোদের কালের কৃপা যেচে,
সগৌরবে জয়ী হয়েই রইবে তাহা বেঁচে।

মোদের অভাব হলেও ব্রতীর হবে না অভাব,
মরার আগে এই ভরসাই মোদের পরম লাভ।
তোমাদেরি মাঝে মরেও অমর হবো শেষে
সব নিবেদন বইবে মোদের অনন্ত উদ্দেশে।
তোমরা মোদের পরলোকের জীবন,—পরপারে।
আগে হতেই কৃতজ্ঞতা জানাই নমস্কারে।

শ্রীকালিদাস রায়।

চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ গল্পলেখক পিউ সঙ্‌ লিঙের

তিনটী অদ্ভুত গল্প

নগরকর্ত্তার পরীক্ষা

আমার জেষ্ঠ ভগিনীর দাদাশ্বশুর সুঙ্‌তাও উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। একদিন অসুস্থ অবস্থায় তিনি আপন কক্ষে শুইয়া ছিলেন এমন সময় পত্র হস্তে অশ্বারোহী দুত আসিয়া জানাইল যে, তাঁহাকে সে ইক্ষণেই আচার্য্য পরীক্ষায় জন্য যাইতে হইবে। সুঙ মহাশয় অনুযোগ করিলেন যে, প্রধান পরীক্ষক অবর্ত্তমানে এত ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। দুত এই অনুযোগ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে যাত্রা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিল। অবশেষে সুঙ মহাশয় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দূতের অনুগমন করিলেন। এক অপরিচিত পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটী নগরে উপস্থিত হইলেন এবং কোন উচ্চকর্ম্মচারীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহের সম্মিলন কক্ষের চাকচিক্য দর্শনে সুঙ্‌ মহাশয় চমৎকৃত। দেখিলেন যে, কক্ষের একপার্শ্বে দশজন রাজপুরুষের একটী ছোট সভা বসিয়াছে তন্মধ্যে কেবলমাত্র বীর কুয়ান্‌জী ব্যতীত সকলেই তাঁহার অপরিচিত। কক্ষসম্মুখস্থিত বারান্দায় ২টি আসনের মধ্যে একটীতে একজনকে উপবিষ্ট দেখিয়া অপর আসনে সুঙ মহাশয় বসিলেন। হটাৎ আটটী শব্দ বহনপূর্ব্বক একটী প্রশ্নপত্র তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পতিত হইল। তাহাতে লিখিত ছিল—"একটী মনুষ্য, দুইটী মনুষ্য; ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত।" টেবিলের উপর লিখিবার উপকরণ ছিল। সুঙ্‌ মহাশয় তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ করিয়া সভাসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"ইচ্ছাকৃত পুণ্যকর্ম্ম ফলপ্রদ নহে, অনিচ্ছাকৃত পাপের শাস্তি নাই।

পরীক্ষকবর্গ এই রচনায় অতিশয় প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "হোনানের জন্য একজন সুদক্ষ নগরকর্ত্তা আবশ্যক এবং আমরা সুঙকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম।" আদেশ শুনিয়া সুঙ মহাশয় নতমস্তকে সাশ্রুনয়নে নিবেদন করিলেন, "আমার ন্যায় অযোগ্য পাত্রের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু, আমার মাতার শেষদশা উপস্থিত, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহার দেহান্ত না ঘটে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে আমাকে অনুমতি দেওয়া হউক।"

এই কথা শুনিয়া সভার মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তি সঙ মহাশয় সুঙ-জননীর ভাগ্যলিপি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সকলেই ইহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহার আদেশ মত এক দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ভাগ্যলিপি দেখিয়া বলিল যে, সুঙ জননীর দেহান্ত ঘটিতে এখনও ৯বৎসর বিলম্ব আছে। পুনরায় সভায় মন্ত্রণা চলিল এবং স্থির হইল যে এই ৯বৎসর যাবৎ চ্যাং মহাশয় উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। বীর কুয়ান্‌জী সুঙ মহাশয়কে বলিলেন, "তোমার মাতৃভক্তি দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়া তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম, কিন্তু, ৯বৎসর পরে তোমার নিকট আহ্বান পত্র প্রেরিত হইবে।

অভিবাদন করিয়া সুঙ মহাশয় কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন এবং অপর ব্যক্তিও তাঁহার অনুগমন করিলেন। বহির্দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সুঙ মহাশয়ের করমর্দ্দনপূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি চ্যাং শান নগরবাসী, আমার নাম চ্যাং—শান।" বিদায় অভিনন্দন স্বরূপ একটী কবিতার এক অংশ আবৃত্তি করিলেন, তাহার অর্থ এইরূপ,—

"পুষ্পের সৌরভে ও মাদকতার মাঝে আমাদের জীবন এক বসন্তেই শেষ হয়, কিন্তু, কেবল তোমার জ্যোৎস্নালোকেও তোমার আনন্দেই চির-বসন্ত জাগিবে।"

সহাস্য বদনে বিদায় গ্রহণ করিয়া সুঙ মহাশয় অল্পক্ষণ পরেই স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। শয্যায় উপ-

বেশন পূর্ব্বক তাঁহার মনে হইল যেন তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কিন্তু পরে জানিলেন যে, তিন দিন পূর্ব্বে তিনি ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন এবং কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হঠাৎ তাঁহার মাতা তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া শবাধার হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। বহুক্ষণ পরে বহু কষ্টে সুঙ মহাশয়ের বাক্ স্ফুরণ হইল এবং তিনি চ্যাং শানের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া অবগত হইলেন যে, তাঁহার মৃত্যু দিবসে চ্যাং শানেরও মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ভাগ্য-লিপির নির্দ্দেশ মত ৯ বৎসর পরে সুঙের মাতার মৃত্যু ঘটিল। মাতার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া শুদ্ধি স্নানান্তে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্রই সুঙের দেহান্ত ঘটিল। সুঙের শ্যালকেরা সেই নগরের পশ্চিম তোরণের নিকট বাস করিত। হঠাৎ তাহারা দেখিতে পাইল যে, বহু যান-বাহন সহ রথারোহণে সুঙ মহাশয় অভিবাদনার্থ তাহাদের গৃহের নিকট ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। সুঙ মহাশয়ের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাদের হিংসা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা জানিতে পারিল যে পূর্ব্বেই সুঙ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার আত্মা শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছিল।

(২) চক্ষু তারার কথা।

চ্যাং-স্নান নগরে ফ্যাংটুং নামে এক সাহিত্যিক বাস করিত। সাহিত্যিক হইলে কি হইবে, সে বড় লম্পট ছিল এবং পথে কোন স্ত্রীলোক দেখিলেই সে তাহার সঙ্গ লইত এবং গায়ে পড়িয়া আলাপ করিত। একবার বসন্তোৎসবের পূর্ব্ব দিনে সে নগরপ্রান্তে ভ্রমণ কালে দেখিতে পাইল যে, মখমল মণ্ডিত জরীর ঝালর বেষ্টিত একটি অশ্বযানের পশ্চাতে অশ্বারোহণে কয়েকটি সুন্দরী যুবতী চলিয়াছে। তন্মধ্যে একটির রূপ-লাবণ্য ফ্যাঙের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং ফ্যাং তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে অশ্বযানের উদ্বন্মুক্ত পর্দ্দার অন্তরালে এক মোহিনী ষোড়শী মূর্ত্তি দেখিয়া ফ্যাং প্রথম দৃষ্ট সুন্দরীর কথা ভুলিয়া গেল। তখন উন্মত্তপ্রায় ফ্যাং কখনও তাহাদের পশ্চাতে কখনও বা পার্শ্বে অনুসরণ করিয়া কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল।

হঠাৎ পথিমধ্যে প্রধানা সঙ্গিনীকে ডাকিয়া ষোড়শী বলিল, "আমার সম্মুখের পর্দ্দা সরাইয়া দাও, আমি ঐ অসভ্য লোকটাকে দেখিতে চাই।" প্রধানা সঙ্গিনী আদেশ পালন পূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ফ্যাংকে বলিল, "ইনি অমরাপুরীর রাজপুত্রবধূ, সাধারণ গ্রাম্য বালিকা নন যে যথেচ্ছা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে। এই লও তোমার চরিত্রহীনতার পুরস্কার!" বলিয়া এক মুষ্টি ধুলি লইয়া ফ্যাঙের চক্ষুতে নিক্ষেপ করিলেন।

যন্ত্রণায় চক্ষু মুছিয়া ফ্যাং কিছুই দেখিতে পাইল না। যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু চিকিৎসার ফলে যন্ত্রণার লাঘব হইলেও দৃষ্টি শক্তি ফিরিল না। দেখা গেল যে তাহার দুই চক্ষুতেই ছানি পড়িয়াছে। কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া ফ্যাং স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফলভোগে তীব্র অনুশোচনায় কাল কাটাইতে লাগিল এবং মনে মনে ভগবানের নিকট মৃত্যুকামনা করিল। এইরূপ অবস্থায় সকলেরই ধর্ম্ম মতি হয়, ফ্যাঙেরও তাহাই হইল এবং সে কুয়াং মিং সূত্র আনাইয়া পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ভক্তিগদ্গদ চিত্তে নিত্য তাহা শুনিতে লাগিল।

এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর তাহার মন কথঞ্চিত শান্ত হইল। ইত্যবসরে সে একদিন নির্জ্জনে শুনিতে পাইল, কে যেন মশক-তুল্য রবে তাহার দক্ষিণ চক্ষু-কোটর হইতে বলিতেছে "বড়ই অন্ধকার বোধ হইতেছে।" উত্তরে বাম চক্ষু মধ্য হইতে কে যেন বলিল, "চল না একবার বেড়াইয়া আসি, তবু একটু আনন্দ পাওয়া যাইবে।" হঠাৎ তাহার নাসিকার মধ্যে কি যেন নড়িয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে ফ্যাং পুনরায় শুনিল, "বহু দিন বাগানটির প্রতি লক্ষ্য রাখি নাই, ফুল গাছগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ফুলগাছ ফ্যাঙের বড়ই প্রিয় বস্তু ছিল, সে তৎক্ষণাৎ তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিল।

পরদিন যথাসময়ে ফ্যাং-গৃহিণী অন্তরাল হইতে দেখিল যে, তাহার স্বামীর নাসিকা হইতে কৃষ্ণ কলাইয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি নির্গত হইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া পুনরায় নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন ফ্যাং শুনিতে পাইল, তাহার বামচক্ষুবাসী ব্যক্তি বলিতেছে, "এত ঘুরিয়া যাওয়া পোষায় না, সম্মুখের পর্দা ভেদ করিয়া পথ প্রস্তুত করা যাক।" উত্তরে দক্ষিণচক্ষুস্থিত ব্যক্তিটী বলিল, "আমার পর্দাটা বড়ই কঠিন ও দুর্ভেদ্য।" বামচক্ষু হইতে প্রত্যুত্তর শুনা গেল—"আমার দ্বার খুলিয়া ফেলিব এবং দুজনেই তাহা ব্যবহার করিব।"

হঠাৎ ফ্যাং তাহার বামচক্ষুতে যন্ত্রণা অনুভব করিল এবং পরক্ষণেই নিজকক্ষের আসবাব-পত্র দেখিতে পাইয়া উল্লাসভরে স্ত্রীকে ডাকিল। স্ত্রী আসিয়া স্বামীর চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে বামচক্ষুর ছানি বিদীর্ণ হইয়াছে এবং ছিদ্রপথে উজ্জ্বল কৃষ্ণতারা দেখা যাইতেছে। পরদিন প্রাতে ছানির চিহ্নটীও রহিল না এবং আশ্চর্য্যের বিষয় দেখা গেল যে, এক চক্ষুতেই দুটী তারা বর্ত্তমান। সেইদিন হইতে ফ্যাং প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও সে কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি পাপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না।

চীনদেশে এই বিশ্বাস এখনও প্রচলিত আছে যে, চক্ষুতারায় ক্ষুদ্র মনুষ্যাকৃতি দেবতা বাস করেন। যে কেহ অপরের চক্ষু নিরীক্ষণ করে, সেই নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে ঐ কথাই মানিয়া লয়।

৩। চিত্রিত প্রাচীর

মেংলিং টান নামক একজন গ্রাম্য লোক রাজধানীতে আসিয়া তাহার বন্ধু অধ্যাপক চু'র সহিত একত্রে বাস করিত। একদিন ভ্রমণকালে দৈবক্রমে তাহারা এক বৌদ্ধমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তথায় মন্দিরের উপযুক্ত বৃহৎ উপাসনা মণ্ডপ বা ধ্যান-কক্ষ ইত্যাদি কিছুই নাই, কেবলমাত্র কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে একটী কক্ষে একজন পুরোহিত বাস করেন। অতিথি সমাগত দেখিয়া পুরোহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া সেই স্থানের দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্তই দেখাইতে লাগিলেন। উপাসনা কক্ষে চী কুঙের প্রতিমূর্ত্তি এবং প্রাচীর গাত্রে বহু নরনারী ও পশুপক্ষীর চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত। কক্ষের পূর্ব্বপ্রাচীর গাত্রে কয়েকটী অপ্সরীর চিত্র; তন্মধ্যে একটীর কেশ অলুলায়িত এবং সেই পুষ্পচয়নরতা কিশোরীর রঞ্জিত ওষ্ঠে হাসির ঝিলিক! চুর চক্ষু স্পন্দন হরাইল। ধীরে ধীরে যেন এক মোহিনীশক্তি বলে সে ইহজগৎ বিস্মৃত হইয়া চিন্তার বিচিত্র স্রোতে ভাসিয়া চলিল। প্রাচীর ভেদ করিয়া সুসজ্জিত কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া চু একস্থানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তথায় এক বৃদ্ধ পুরোহিত একটী জনতার মাঝে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। চু সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল। হঠাৎ কে যেন তাহার অঙ্গরাখার প্রান্ত আকর্ষণ করিল। চু ফিরিয়া দেখিল সে দূরে পলাইয়া হাসিতেছে। চু সেই পথে ধাবিত হইল, কিন্তু, প্রচীর অতিক্রম করিতে তাহার সাহস হইল না। দূরে দাঁড়াইয়া কিশোরী তাহার হস্তস্থিত পুষ্পগুচ্ছ নাড়িয়া আহ্বান করিল। সাহস পাইয়া চু অগ্রসর হইয়া দেখিল স্থানটী জনশূন্য। সেই স্থানে তাহারা জানু পাতিয়া বসিয়া একত্রে স্বর্গমর্ত্ত্যের পূজা সমাধা করিয়া, স্বামী স্ত্রীরূপে পরস্পর আলিঙ্গন করিল। তার পর সেই স্থানে চুকে নীরবে অবস্থান করিতে বলিয়া যুবতী চলিয়া গেল। দুইদিন পরে যুবতীর সঙ্গিনীরা চুর সন্ধান পাইল এবং তাহাকে টানিয়া আনিয়া যুবতীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিল, "আর কেন কুমারী বেশ, বোন?" অতঃপর তাহারা তাহাকে নব-বিবাহিতার পরিচ্ছদে সাজাইল এবং "দুইয়ে সঙ্গসুখ—অধিকে নয়" বলিয়া চপল হাস্যে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পত্নীর পরিবর্ত্তিত বেশ দেখিয়া চু আনন্দিত হইল।

সুন্দর মুখ খানির উপর কৃষ্ণচূড়া খোঁপা ও কর্ণে স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পগুচ্ছ চমৎকার মানাইয়াছে। হঠাৎ চুর ধ্যানভঙ্গ করিয়া গুরুভার পাদুকাবিক্ষেপ, শিকলের ঝন্ ঝন শব্দ ও সরোষ কথোপকথন উত্থিত হইল। ভয়চকিত হইয়া দুইজনে লুকাইয়া দেখিল যে, স্বর্ণবর্ম্মাচ্ছাদিত দেহ এক ঘোর কৃষ্ণকায় ব্যক্তি হস্তে শিকল ও চাবুক লইয়া এবং কয়েকটী বালিকা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই ব্যক্তি দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা সকলেই আছিস্ ত ?" উত্তরে বালিকারা সম্মতি জানাইল। সে পুনরায় বলিল, "যদি কোনও মানুষ তোদের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে আমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ কর্ এবং তাহার জন্য দুঃখ করিস না।" সকলেই সমস্বরে জানাইল যে তাহারা কোন মানুষকে এতাবৎ দেখে নাই। তথাপি সেই ব্যক্তিকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে দেখিয়া ভয়ে যুবতীর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে তৎক্ষণাৎ চুকে শয্যাতলে লুকাইতে বলিয়া স্বয়ং প্রাচীরগাত্রে অদৃশ্য হইল। সেই ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ দেখিয়া চলিয়া গেল। ক্রমশঃ সে স্থানটী নির্জ্জন হইল কিন্তু তবুও চু ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিতে পারিল না।

মেংলিং, বহুক্ষণ চুকে না দেখিতে পাইয়া চিন্তিতস্বরে চু'র কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে পুরোহিত বলিলেন "সে নীতি শিক্ষা করিতেছে।"

সাশ্চার্য্যে মেং জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ?"

পুরোহিত হাসিয়া উত্তর দিলেন, "এই নিকটেই।"

অতঃপর পুরোহিত প্রাচীরগাত্রে অঙ্গুলি আঘাত করিয়া বলিলেন, "বন্ধু চু, তুমি এতক্ষণ কি করিতেছ ?"

দেখিতে দেখিতে চু'র প্রতিমূর্ত্তি প্রাচীরগাত্রে ফুটিয়া উঠিল,—মূর্ত্তি উদ্‌গ্রীব হইয়া কি যেন শুনিতেছে।

পুরোহিত বলিলেন "তোমার বন্ধু তোমার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন।"

ভয়বিস্ফারিত চক্ষু চু কম্পিতপদে প্রাচীরগাত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সভয়ে মেং তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাহার এইরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। চু বলিল সে শয্যাতল হইতে বজ্রাঘাতের ন্যায় ভীষণ শব্দ শুনিয়াছে এবং তাহার কারণনির্ণয়ার্থ বহির্গত হইয়াছে।

তাহাদের সান্ত্বনায় চু অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল এবং প্রাচীরগাত্রে কিশোরীর অঙ্গে বিবাহিতের বেশ দর্শনে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া পুরোহিতকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

পুরোহিত বলিলেন, "স্বপ্ন যে দেখে সেই তাহার মর্ম্ম জানে, আমি কিরূপে ইহার কারণ বলিব ?"

উত্তরটী চু'র মনঃপুত হইল না এবং ভীত মেঙ্ও অধিক জানিতে ইচ্ছুক ছিল না। দুই বন্ধুতে নীরবেই সেস্থান ত্যাগ করিল।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

ফুল-হারা

দূরে থেকে দেখেছিনু বসিয়া সে নিরালায়
চরণের বাধা খুলে' আল্‌তা পরাতো তা'য়।
কাঁচা-সোনা-তনু-ঝরা কিশোর-লাবণি তার
নয়নের তারা দিয়ে পিয়েছিনু শতবার।
দেখেছি আড়ালে থেকে নীল-অলকের ছায়
কাজলের রেখা চোখে চমকে বিজলি প্রায়।

কবে তা'র বাম-করে কু-লগনে রাঙা ডোর
জড়াইনু সাবধানে, ভাঙেনি ঘুমের ঘোর।
মিনতি সে রাখিল না, হ'ল না রে দরদিয়া,
গরবিণী, এলালতা জুড়ায়ে না গেল হিয়া।
মিছে যাচিলাম সেই চপলার পরশন,
রোষারুণ-আঁখি-রুচি দুখ, দিল' অকারণ।

যুগ সম গণি যার তিলার্দ্ধের ছাড়াছাড়ি,—
থা'ক্ সে মনের সুখে, সব যে নিয়েছে কাড়ি'।
ভুলি নাই তরুণীর পলাতক আঁখি-তারা,
ক্ষণ-তরে ফুলশরে করেছিল কুলহারা।
তারি কথা কাণাকাণি করে তরু-লতা-ফুল,
পিউ কাঁহা ডাকে আহা পিয়ারী করেছে ভুল;
লতা-গোলাপের ডালে লাল-কাঁটা বিঁধে বুক,
গাহে মুসাফীর পাখী. ভোলেনি সে মায়া-মুখ।

কেনরে উতলা-পাখী আবার উঠিলি ডেকে?
কেনরে পারুল-বীথি রাঙিলি ফাগুয়া মেখে'?
এমনি রঙীন দিনে ধ্যানের সে প্রতিমায়,
খোয়াইনু পাষাণীকে পাশরিয়া আপনায়।
কাঁদে গো অতৃপ্ত-স্মৃতি, তৃষা গাঁথা-বাঁশীসুর,—
তারি দান এ বেদনা সুখ-চেয়ে-সুমধুর।
ফাগুনিয়া-হাওয়া আজি পরিহাস করে' যায়,
জ্যোছনায় আলিপনা শেল হানে কলিজায়।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লিখিতে বসিয়াই প্রথম সমস্যা উপস্থিত হইল—কোন্ ভাষায় লিখিব? বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে হইবে, তাহা জানি। কিন্তু, তাহার যে এখন দুইটী শাখা বাহির হইয়াছে—একটী সাধু ভাষা, আর একটি—অ-সাধু বলিলে ঠিক বলা হয় না, সুতরাং কথোপকথনের ভাষা অর্থাৎ চল্‌তি ভাষা, বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্য-রসিকেরা যাহার নাম দিয়াছেন বীরবলী ভাষা। 'মানসী'র সম্পাদকদ্বয়, তথা সমালোচক-সঙ্ঘের সম্বন্ধে আমার যতটুকু ধারণা আছে, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারা বীরবলী ভাষাকে তেমন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন না; সুতরাং, যখন তাঁহাদের আদেশ মতই লিখিতেছি, তখন বীরবলকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিয়া সাধুর বস্ত্রই পরিধান করিতে হইল,—স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, সে প্রশ্নই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

— — —

কিন্তু, বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখক ও পাঠকগণকে সবিনয় নিবেদন করিতে চাই যে, উপরি উক্ত দুই রীতির মধ্যে গুরুতর পার্থক্য কি আছে? সাধু ভাষায় অর্থাৎ লোহারাম-সম্মত ভাষায় যে সকল ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, চলিত বা বীরবলী ভাষায় সেই ক্রিয়াপদগুলির সঙ্কোচ বিহিত হইয়াছে,—'হইয়াছে'র স্থানে 'হয়েছে', 'করিয়াছি' স্থানে 'করেছে' প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আর ত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে, বীরবলী ভাষায় অনেক প্রাদেশিক ও হিন্দু-উর্দ্দু শব্দ ব্যবহার করা হয়, যাহা সংস্কৃত ভাষীদিগের নিকট শ্রুতিকটু। কিন্তু, একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে সকল শব্দের প্রচলনে সাহিত্যের মর্য্যাদা হ্রাস হওয়ার পরিবর্ত্তে ভাষার সম্পদ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। 'যদৃচ্ছা'র পরিবর্ত্তে যা-ইচ্ছে-তাই প্রয়োগ সাহিত্যের পরিষদে মারাত্মক অপরাধ বলিয়া বিবেচিত না হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু, যাঁহারা ক্রিয়াপদকে কর্ত্তার স্থানে স্থাপিত করিয়া কর্ত্তাকে যে কোন স্থানে অপসৃত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যথেচ্ছাচারকে আমরাও সমর্থন করি না, বীরবলও করেন না। এ প্রসঙ্গের এই স্থানেই পরিসমাপ্তি।

———

বাঙ্গলাদেশের যেখানে যত বিদ্যালয় আছে, প্রায় সর্ব্বত্রই ছাত্রেরা সরস্বতী পূজা আরম্ভ করিয়াছেন;

মাদ্রাসা ও মক্তব ব্যতীত এমন বিদ্যালয় অতি অল্পই আছে যেখানকার ছাত্রেরা সরস্বতীপূজা করেন না। পূর্ব্বেও অনেক বিদ্যালয়ে এই পূজার অনুষ্ঠান হইত; কিন্তু এখন তাহাদের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। এমন যে পাশ্চাত্য-আলোকোজ্জ্বল কলিকাতা নগরী, এখানেও এমন বিদ্যালয় নাই বলিলেই হয়, যেখানকার হিন্দুছাত্রেরা এই উৎসব করেন নাই। বর্ত্তমান বৎসরে দুইটী বিদ্যালয় ব্যতীত আর কোথাও কোনপ্রকার গোলযোগ হয় নাই। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় সরস্বতী বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার যে যে রাজপথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, পূজার্থীদিগের তাহা মনঃপূত না হওয়ায়, দেবী সরস্বতী উক্ত বিদ্যালয়ের পূজকদিগের পুষ্পাঞ্জলিতে বঞ্চিত হইয়াছেন। আর কলিকাতার সিটি কলেজ-সংসৃষ্ট রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ একটা গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সিটি কলেজ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সেই কলেজের ছাত্রাবাসে যাঁহারা প্রবিষ্ট হন, তাঁহাদের উপর এই নিষেধ-বিধি আছে যে, তাঁহারা ছাত্রাবাসে বা আবাস-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কোন মূর্ত্তিপূজা করিতে পারিবেন না। তদনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে কলেজের অধ্যক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়াও ছাত্রেরা ছাত্রাবাসে পূজার অধিকার পান নাই, তাঁহারা অন্যত্র পূজা ও উৎসব করিয়া আসিতেছেন। এ বৎসর তাঁহারা স্বাধিকার বা স্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রাবাস-প্রাঙ্গণেই পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ছাত্রাবাসের কর্ম্মকর্ত্তার বাধাপ্রদানে ছাত্রেরা কর্ণপাত করেন নাই, কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ক্ষুব্ধ হইলেও পূজা পণ্ড করিতে অগ্রসর হন নাই। এখন শুনিতেছি, ছাত্রগণের এই অবাধ্যতার শাস্তিপ্রদানের মন্ত্রণা হইতেছে। তবে বে-সরকারী কলেজগুলি ছাত্রগত-প্রাণ; সুতরাং মন্ত্রণা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে বলা যায় না।

বাঙ্গলা দেশের ছাত্রগণের এত অধিক পরিমাণে সরস্বতীর প্রতি ভক্তির কারণ কি? সত্যসত্যই কি তাঁহাদের প্রাণে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও হিন্দুদেবদেবীর উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে? অথবা এই সরস্বতীপূজা উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা দুইদিন পরস্পরের সহিত মিলনানন্দের ব্যবস্থা করেন? হিন্দু দেবদেবীর উপর ভক্তিপ্রবণতা অতীব সুখের কথা। তাহা না হইলেও, এই পূজা-উপলক্ষে ছাত্রগণের সম্মেলন আরও সুখের ব্যাপার। আমার কিন্তু মনে হয়, সরস্বতীপূজায় জন্য অত্যধিক আগ্রহের আরও একটী নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা আছে। যাঁহারা আমাদের পুরাণাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আমাদের এই তেত্রিশ-কোটি দেবদেবীর অনেকেই পূজালাভের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। প্রমাণ স্বরূপ চাঁদ সদাগরের কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে এখন অন্নচিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়াছে। এ সময় লক্ষ্মীর আরাধনা না করিলে দেশের আর মঙ্গল নাই। এদিকে লক্ষ্মীদেবী পাশ্চাত্য দেশেই, বলিতে গেলে, স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছেন; এদেশেও, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে তাঁহার কৃপালাভে বাঙ্গালী অকৃতকার্য্য হইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় লক্ষ্মীর পূজা করাই বাঙ্গালী ছাত্রগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু, লক্ষ্মী বিদেশবাসিনী—তাঁহার সপত্নী সরস্বতী এদেশে রহিয়াছেন। এখানকার ছাত্রেরা যদি অধিক পরিমাণে সরস্বতীর প্রতি তাঁহাদের প্রীতি-প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সপত্নী-বিদ্বেষে পীড়িত হইয়া বাঙ্গালী ছাত্রগণের নিকট হইতে পূজা আদায় করিবার জন্য লক্ষ্মীর এদেশে আগমন হইতে পারে। এপ্রকার ঘটনার নজীর পুরাণে আছে। আমার মনে হয়, এই কারণেই সরস্বতীপূজা করিয়া লক্ষ্মীলাভের বাসনাই ছাত্রদিগকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা মহোদয়গণের সম্মুখে এই তত্ত্বের সামান্য ইঙ্গিত করিলাম মাত্র।

সরস্বতীপূজা শেষ হইতে না হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষে হরতালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপার এই যে, এ দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য—অর্থাৎ ভারতবাসীরা নাবালকত্ব অতিক্রম করিয়া

সাবালকত্ব লাভ করিয়াছে কি না, নয় বৎসর পূর্ব্বে তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের যেটুকু অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ ব্যবহার তাহারা করিয়াছে কি না, ভবিষ্যতে তাহাদের আরও অধিক অধিকার লাভের যোগ্যতা জন্মিয়াছে কি না, এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্ত বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটি কমিসন বসাইয়াছেন। সেই কমিসন যে সাতজন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ নাই, সকলেই শ্বেতাঙ্গ এবং সার জন সাইমন নামক বিলাতের একজন প্রধান ব্যবহারাজীব এই কমিসনের কর্ণধার। এই ভাবে শ্বেতাঙ্গ সমষ্টি গঠিত কমিসনকে এ দেশবাসিগণ সাদরে গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। কারণ এ দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় কাহাকেও এই সাইমন-সপ্তকের মধ্যে স্থানদান করা হয় নাই। ইহাতে এ দেশবাসীকে শুধু তুচ্ছ করা নয়, অপমান করা হইয়াছে, ইহাই ভারতের নেতৃবর্গের সুদৃঢ় অভিমত। অতএব তাঁহারা এই কমিসনকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবার জন্ত সঙ্কল্পারূঢ়। এই সঙ্কল্পের প্রথম অভিব্যক্তি বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী যখন এই কমিসনের সদস্যগণ বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করিয়াছিলেন সেই দিনে ভারতব্যাপী হরতাল। কমিসন-বর্জ্জনকারী দল বলিতেছেন হরতাল চোদ্দ আনাই সফল হইয়াছে; বিরোধীদল অর্থাৎ যাঁহারা কমিসনের স্বপক্ষে, তাঁহারা বলিতেছেন, না, না, চৌদ্দ আনা নয়, এই—দশআনা ছয়আনা।

———

পাটীগণিতের এই অঙ্কের সমাধান করিবার প্রয়োজন নাই। এই হরতাল সর্ব্বত্র নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হয় নাই। কলিকাতা ও মান্দ্রাজে এ উপলক্ষে যথেষ্ট উপদ্রব হইয়াছে। একদল লোক যেমন হরতালকে নিরুপদ্রবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর একদল তেমনই উহাকে সোপদ্রব করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এই কলিকাতার রাজপথে অনেকে আহত হইয়াছেন, অনেকে নির্য্যাতন ভোগও করিয়াছেন। কমিসন বর্জ্জনকারী নেতৃবর্গ কিন্তু কলিকাতার জন-সাধারণকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত কেহ যেন গৃহত্যাগ না করেন। সে আদেশ, সে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন; আর দুর্ভোগ ভুগিয়াছেন স্বেচ্ছাসেবক দল; অথচ এই স্বেচ্ছাসেবক দল সেদিন অবনত মস্তকে নীরবে সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন।

———

এ সকল ত গেল পথের কথা; ঘরের কথা অতীব শোচনীয়। আবার সে ঘরও যেমন-তেমন ঘর নহে—দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যামন্দির কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। বেথুন কলেজে এই গোলযোগের ঢেউ লাগিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যাপারের কথা বলিতে গেলে একটু পূর্ব্বের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনের দিবস উপলক্ষে প্রতিবৎসরই একটা উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই উৎসব পরিচালনার ভার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণের যে সম্মেলন আছে, তাহারই উপর প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সম্মেলনের সভাপতি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেব এবং সম্পাদক ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ প্রমোদ কুমার ঘোষাল। এবারে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত হইয়াছিল এবং আমাদের জাতীয় পতাকা ব্যবহৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন বলেন যে, এই দুইটী কার্য্যই তাঁহার অজ্ঞাতসারে ও বিনানুমতিতে করা হইয়াছে। সেই কারণে তিনি শ্রীমান্ প্রমোদকুমারকে ডাকিয়া তিরস্কার করেন এবং এই জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সহিত কথা বলেন। শ্রীমান্ প্রমোদকুমার ইহার প্রতিবাদে সংবাদ পত্রে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। প্রিন্সিপাল সাহেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীমান প্রমোদকুমারকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, "বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধে তিনি অন্যায় কথা বলেন নাই। প্রমোদকুমার ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রিন্সিপাল মহাশয় তাঁহাকে অস্থায়ী

ভাবে কলেজ হইতে বিতাড়িত করেন এবং কলেজের কার্য্যকরী সমিতির শেষ আদেশের প্রতীক্ষা করেন। এই কারণে ক্ষুব্ধ হইয়া কলেজের প্রায় তিন শত ছাত্র লাট সাহেবের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়া প্রতীকার প্রার্থী হন। প্রিন্সিপাল মহাশয়ের আত্মসম্মান এই কারণে আহত হয় এবং তিনি কলেজের ও কলেজসংসৃষ্ট ইডেন হিন্দু হষ্টেলের ছাত্রগণের উপর বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের শাস্তির জন্য সচেষ্ট হন। এই সময়েই শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে হরতালের ভেরী বাজিয়া উঠে।

তাহার পরের ব্যাপার অতীব শোচনীয়। এই হরতাল উপলক্ষে কলিকাতার অনেক স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সে দিনের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ রাখেন। আবার অনেকে বিদ্যালয় খোলা রাখেন, কিন্তু ছাত্রগণের উপর কোন আদেশ প্রচার করেন না,—তাহারা উপস্থিত হয় ভাল কথা, উপস্থিত না হয় তাহাতেও কোন কথা নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন মহাশয় পূর্ব্বোক্ত কারণে ছাত্রগণের উপর বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, এখন এই সুযোগ পাইয়া তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, সেদিন সমস্ত ছাত্রকে কলেজে উপস্থিত হইতেই হইবে। ইহাতেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ছাত্রেরা পূর্ব্ব হইতেই বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিল, এখন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কলেজে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিল এবং হরতালের দিন যে অল্প সংখ্যক ছাত্র কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য কলেজের প্রবেশ দ্বারে সমবেত হইল। তখন আর কি! সংবাদ পাইয়া পুলিশ ও মিলিটারী রণসজ্জা করিয়া কলেজ স্কোয়ারে উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে যাহাকে পাইলেন, তাহাকেই "ডিসিপ্লিন" শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কলেজ স্কোয়ারে তাণ্ডব আরম্ভ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীমান প্রমোদকুমারই পুলিশের হস্তে বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিলেন এবং গুরুতর ভাবে আহত হইলেন। সম্মুখস্থ হিন্দু স্কুলের দ্বারবান ও শিক্ষকদিগের কেহ কেহও অব্যাহতি লাভ করিলেন না। বিদ্যামন্দিরের পবিত্রতার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করিলেন না বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা গৃহ-প্রাঙ্গণেও লাঠি খেলা চলিল। তাহার পর যাহা হইল তাহা আরও শোচনীয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালের আদেশে কলেজ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, ইডেন হিন্দু হষ্টেলে যে সমস্ত ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে হষ্টেল ত্যাগ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। ছাত্রগণ নীরবে আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিয়া যে যেখানে পারিলেন সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি যখন লিখিতেছি, তখন এই পর্য্যন্তই হইয়াছে। তবে, প্রেসিডেন্সি কলেজের কার্য্যকরী সমিতি শ্রীমান্ প্রমোদ কুমারের কলেজ বহিষ্কারের অস্থায়ী আদেশকে স্থায়ী করিয়াছেন। ও দিকে মহাজনের পন্থা অনুসরণ করিয়া বেথুন কলেজের ইংরাজ মহিলা-প্রিন্সিপাল মহোদয়া কলেজ ছাত্রাবাসের ছাত্রী দিগকে কলেজে উপস্থিত হইবার আদেশ প্রচার করেন, ছাত্রীরা সে আদেশ প্রতিপালন করেন নাই। এ জন্য ছাত্রীগণকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে বেথুন কলেজের গোল মিটিয়া গিয়াছে, কোন ছাত্রীর প্রতি শাস্তি বিহিত হয় নাই। হরতাল উপলক্ষে এই যে কাণ্ড সংঘটিত হইল, ইহার জন্য দায়ী কে, সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না।

৺পশুপতিনাথ শাস্ত্রী

একটা মানুষের মত মানুষ চলিয়া গিয়াছে। আজ আজ অত্যন্ত মর্ম্মাহত চিত্তে প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, পশুপতিনাথ শাস্ত্রী আর ইহ জগতে নাই। গত ২১শে মাঘ শনিবার সন্ন্যাস রোগে অকালে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত পশুপতিনাথ একজন খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। এ যুগে তাঁহার মত উচ্চ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এরূপ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ খুবই কম দেখিতে পাওয়া

যায়। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এই উক্তি প্রিয়দর্শন শাস্ত্রী মহাশয়তেই সার্থক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মত উন্নত চরিত্র, সদা পরহিতে রত বাঙ্গালী আমরা খুব কমই দেখিয়াছি।

১২৯১ সালের ১৯শে চৈত্র ২৪ পরগণা হরিনাভি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা পণ্ডিত শ্যামানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ন্যায়শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালাতেই পশুপতিনাথের বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। উক্ত পাঠশালা হইতে প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৯৭ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলে তিনি ভর্ত্তি হয়েন। সেই অবধি তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়।

প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষাতে তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে পশুপতিনাথ বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া জুবিলী পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পদক লাভ করেন। এম-এ পরীক্ষায় বৈদিক বিভাগে তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর বৎসর তিনি মীমাংসা ও স্মৃতি বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট পদক ও সোণামণি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ সালে ও ১৯০১ সালে পশুপতিনাথকে দুই দুইবার সরকারী বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া উক্ত প্রস্তাব দুই বারই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বি-এল পরীক্ষাতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

পশুপতিনাথ ইংরাজী ও সংস্কৃতে যেরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন, সেইরূপ জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক এবং ওলন্দাজ প্রভৃতি বহু ভাষাতেও তাঁহার উচ্চ অধিকার ছিল। 'ইজি ফ্রেঞ্চ রিডার,' 'জার্ম্মন রিডার,' সায়নের ঋগ্বেদ ভাষ্যের টীকা সহ ভূমিকা, সায়নাচার্য্যের ভাষ্য সংগ্রহ, পূর্ব্ব মীমাংসার অনুক্রমণিকা প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। 'পূর্ব্ব মীমাংসার অনুক্রমণিকা" লিখিয়া ১৯২৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি (ডক্টর অব্ ফিলসফি) উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বারানসীর ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল হইতে "বিদ্যা সুধাকর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

এম-এ পাশ করিয়া পশুপতি নাথ বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ খুলিলে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন।

দেশে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি কল্পে তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীপতি কাব্যতীর্থের সহযোগে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত পরিষদের সম্পাদকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের উদ্যোগে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করাইয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যত দিন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ থাকিবে ততদিন তাঁহার নাম পণ্ডিত মহলে অমর হইয়া থাকিবে।

বসন্তে

গান ছিল সে কোন্ গহনে, গন্ধ ছিল কোথায় হারা,
যৌবনের এই বর্ণবিলাস, উৎসারিত হাসির ধারা,
রাঙা হল কোন্ কামনা কৃষ্ণচূড়া-পলাশ-শাখে,
কোন্ আনন্দ হিন্দোলিল বল্লীতরুর ঘোমটা-ফাঁকে,
মল্লী চাঁপা বকুল যুথী গন্ধরাজে মুঞ্জরিয়া
কোন্ মাধুরী তৃপ্ত হল সঙ্গোপনে সঞ্চারিয়া ?—
সবুজ কহে—কে জানে তা ভাই,
বসন্তে আজ সমুখ-চলা,
পেছন ফিরে চাইতে সময় নাই!

দখিণ হাওয়ার বার্ত্তা এল শুকনো বনের মনের কাছে,—
হারায়নি সে, বন্ধু তোমার মর্ম্মপুটে সুপ্ত আছে ;
শীর্ণ তোমার তরুর বুকে পল্লবেরি জন্মব্যথা,
রিক্ত তোমার শাখায় লতায় পুষ্পকলির স্বপ্নকথা!
—কোকিল ছিল কোন্ আড়ালে কণ্ঠে লয়ে নীরব ভাষা
লুপ্ত হয়ে কোথায় ছিল নূতন বাণী নূতন আশা ?—
সবুজ কহে—কে খোঁজে তা ভাই,
বসন্তে আজ ফোটার পালা,
ভাবনা বোঝার নেইকো হেথা ঠাঁই!

কে গেল হায় শীর্ণদেহের শুভ্র কেশের কুণ্ঠা নিয়া,
জীর্ণতারে ধন্য করি যৌবনেরে জন্ম দিয়া ;
কণায় কণায় অঙ্গহতে লাবণ্য তার চয়ন করি'
জাগ্‌ল রূপের তিলোত্তমা স্বপ্নলোভায় চিত্ত ভরি'!
মূর্ত্ত হয়ে ছন্দ সুরে গন্ধরূপে মুঞ্জরণে
শীর্ণ শীতের স্বপ্ন জাগে ফাল্গুনে আজ মর্ম্মে বনে।—
সবুজ কহে—কে ভাবে তা' ভাই,
বসন্তে আজ চলার নেশায়
জীর্ণতারে চূর্ণ করে যাই!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বিজয়া

(গল্প)

বিজয়া দশমীর প্রণাম, আলিঙ্গন ও 'মিষ্টিমুখে' সারা গ্রাম উৎসব সময়।

বছরে এই একদিন মাত্র বাঙ্গালীর মিলনোৎসব—মনের ধুলো-কাদা মুছে ফেলে এই দিন বাঙ্গালী শত্রু-মিত্র ভুলে, জাতি ভেদ ভুলে সকলকেই আপনার বাহুপাশে টেনে নেয়। এই দৃশ্য মরা-প্রাণে আনন্দের পুলক-শিহরণ এনে দেয়—বুক দশ-হাত উঁচু হয়ে ওঠে। হায়, কবে এই ভাব ভারতে চির-আধিপত্য লাভ করবে!

নীলমণি সকলকেই আদর-আপ্যায়ন ক'রে 'মিষ্টি-মুখ' করিয়ে দিচ্ছিল। "আয় কমল আয়, তোর একটা খাসা রাঙা টুকটুকে বর হোক্—ওকি তুই লজ্জায়

পালিয়ে যাচ্ছিস বুঝি? ও গিন্নি, কমলিকে ধরে নিয়ে যাও ত। আচ্ছা, যাহোক আমি তোর রাঙা বর না এনে ছাড়ছি না।"

"আয় চামেলি আয়, ভাল আছিস ত?—বাঃ তোর খোকাটি ত বেশ হয়েছে! আয় শালা আমার কোলে আয়—বাঃ তোর বুড়ো দাদাকে নাল-ঝোল মাখিয়ে বেশ ভাব করে নিলি ত! শালার হাসি নয় ত যেন হীরের জলুষ। যা, মার কোল যোড়া হয়ে থাক্—যাও চামেলি ভিতরে যাও—'মিষ্টিমুখ' না করে কি আজ যেতে আছে বাছা!"

"হাঁ মাসীমা, আমার প্রণামটা নিন। আপনার মেয়ে কেমন আছে?—জামাইয়ের আগেকার তিন চারটে ছেলে-পুলে আছে বুঝি? বয়েস যে কিছু বেশী তা ত বোঝাই যাচ্ছে। কি করবেন বলুন, পণ-প্রথা যে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে—বাঙ্গালী পায়ে পায়ে ধ্বংসের দিকে চলেছে, তবু তার চোখ খোলে না। তবে যদি ভগবানের দয়া থাকে, ওতেই আপনার সোণাদানা ক'লে যাবে। দয়া করে একবার বাড়ীর ভিতরে যান।"—ইত্যাদি।

ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিল।

নীলমণি হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে, "যাই, বামুন-পাড়া থেকে ঘুরে আসি।" ব'লে, চাদরটা ঘাড়ে ফেলে, লাঠিটা নিয়ে, চটিজুতা ফট্ ফট্ করতে করতে বাহির হল—"জয় দুর্গে, দুর্গতি নাশিনী।"

বাঁশ ঝাড়ের তলা দিয়ে শুক্‌নো পাতায় মড়্ মড়্ শব্দ করতে করতে সে এগিয়ে চল্লো।—দূরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ কাণে আসছে।—দু'একটা রাত-চরা পাখীর আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছে।—ঘেঁসা-ঘেসি বাঁশ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চাঁদ উঁকি মেরে মাঝে মাঝে খানিকটা জায়গা শাদা করে দিয়েছে।

ঐ সরু পথটার মোড়ে ঘরের চেঁচা-বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

নীলমণি হঠাৎ ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার অতীত জীবনের একটা ঘটনা মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে উঠলো।

সে আজ দশ বছর আগেকার কথা—

তার তের বছরের মেয়ে সুকুমারীকে একদিন রাত্রে জনকয়েক মুসলমানে ধরে নিয়ে যায়। একমাত্র কন্যার অন্তর্দ্ধানে তারা স্বামী স্ত্রী মড়ার মতন হয়ে গেল। শোক ও দুঃখের প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পর নীলমণি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে এর প্রতিকারের জন্যে বেরিয়ে পড়লো। তাকে সকলেই ভক্তি করতো, ভালবাসতো। পাড়ার যুবকদের সাহায্যে সে পরদিনই মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। গাঁয়ের জমিদার এই বিশ্রী ব্যাপারটাকে আদালতে না পাঠিয়ে, হামিদের কিছু জরিমানা ক'রে, তার উপর কড়া নজর রাখলেন।

হামিদের বাড়ীতেই সুকুমারীকে পাওয়া গিয়েছিল। হামিদ তার উপর কোনরকম অত্যাচার করে নি। কিন্তু সামাজিক গোলমাল মিটলো না। মুসলমানে ছুঁয়েছে ব'লে তাকে ঘরে নিলে নীলমণি যে একঘরে হবে সেটা সকলেই তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলে।

পিতৃস্নেহ ও সমাজের টান—এই দুটোর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে লাগলো। পিতৃস্নেহ একমাত্র কন্যাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। আবার সমাজ পেছনে টানছে—তার হ'ল উভয়সঙ্কট—'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ'।

সুকুমারী পিতার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, দ্রব্যগুণের সাহায্যে মরণকে বরণ করে নিলে।

শোকে মুহ্যমান হয়ে নীলমণি হামিদকে বললে, "আমাদের যেমন তুই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলি, তোরও তেমনি যেন এক একটা অঙ্গ খসে প'ড়ে দুঃসহ যন্ত্রণায় জীবনের শেষ হয়।"

মানুষের দেবত্বও ঐখানেই। গভীর দুঃখে মানুষের মনের যে কথা বেরিয়ে আসে, তা কখনও নিষ্ফল হয় না।

এই সব কথা নীলমণির আজ মনে হতেই তার কোটর গত চক্ষু থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বার হতে লাগলো—ধমনীতে ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হয়ে তার দেহ সঘন কম্পিত হতে আরম্ভ করলে। হাত আপনা হতেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে আপনাকে সামলে নিলে। হঠাৎ

তার মনে পড়লো, সে না বিজয়া মিলনোৎসবের আহ্বানে চলেছে? এখন কি তার প্রতিহিংসা-বৃত্তি মনে স্থান পাওয়া উচিত?

একটু অগ্রসর হতেই একটা ক্ষীণ করুণ স্বর তার কাণে এল।

নীলমণি ধীরে ধীরে নিকটে গিয়ে ঝাঁপের দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলে, সেই হামিদ, ঘরের এককোণে প'ড়ে যাতনায় কাতরাচ্ছে।—তার সর্ব্বাঙ্গে ঘা।—পা খসে পড়েছে।

নীলমণির মন ঠেলা দিয়ে উঠলো—"দিইনা এই পাষণ্ডের মাথায় একটা লাঠির ঘা—নারীর উপর অত্যাচারের কি ভীষণ পরিণাম তা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দিই।"

কিন্তু তখনই ক্ষমা এসে ক্রোধের স্থান অধিকার ক'রে নিলে। অতীতের সমস্ত ঘটনা ভুলে গিয়ে তার হৃদয় করুণায় ভরে উঠলো। তারই অভিশাপের আগুন ত একে পুড়িয়ে মারছে। হঠাৎ রাগের মাথায় সে করেছিল কি!—মুসলমান হলে কি হয়, এও ত তার ভাই!—সকলেই যে জগদীশ্বরের সন্তান, সকলেই যে ভাই ভাই।

নীলমণি স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে—"হামিদ!"

হামিদ চমকে সেদিকে চাইলে। মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক হঠাৎ সুস্বাদু জলের সন্ধান পেলে যেমন আনন্দিত হয়, তারও মুখে চোখে সেই রকম একটা ভাব জেগে উঠলো। সে দেখলে যেন কোন্ দেবতা তাঁর অমৃতের ভাণ্ড হাতে নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে—তাঁর চোখের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে যেন হামিদের যাতনা অনেকটা লাঘব হয়ে গেল।

হামিদ ঐ প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে করেছিল কি! ঐ দেবতার সর্ব্বনাশ করেছিল। সে যে পাপ করেছিল, এ দণ্ড তার তুলনায় অতি তুচ্ছ। এর চেয়ে হাজারগুণ কঠিন শাস্তি তার হওয়া উচিত ছিল! অনুতাপ তার হৃদয়কে ভেঙে মুচড়ে দিয়ে গেল। চোখ তার বাধা মানলে না, ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো!

নীলমণির অন্তর বেদনায় ভরে গেল। সে বল্লে —"হামিদ, অতীতের কথা ভুলে যাও। তোমার এ দুরবস্থার জন্তে আমিই দায়ী বাবা! সাময়িক উত্তেজনার বশে সে কায করেছিলে, তারপর অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে তুমি খাঁটি সোনা হয়ে গেছ! কিন্তু আমি মহাপাপী, তোমায় তিলে তিলে দগ্ধ করেছি—আমায় ক্ষমা কর!"

নীলমণি কাতরভাবে হামিদের দুর্গন্ধময় গলিত হাতটি স্পর্শ করলে।

হামিদ বুঝতে পারলে না, সে স্বর্গে না মর্ত্তে। অতিকষ্টে সে বল্লে, "দেব্‌তা, একটু পায়ের ধুলো দাও। খোদাতাল্লা—আমায় কি দেখালে!"

সে হাঁপাতে লাগলো। পরে বল্লে, "আল্লা, মোছলমান যেন আর হিন্দুর উপর অত্যাচার না করে; তাদের তফাৎ মুছে দাও খোদা! হিন্দু মোছলমান দুই ভাই হয়ে যাক।"

হামিদের জীবন দীপ নিবে গেল। মুখে তার একটা আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। বাবুদের বাগানের একরাশ হাস্নাহানার মিষ্টি গন্ধ ভেসে এসে সমস্ত ঘরটাকে সুরভি করে দিলে।

শ্রীআদিত্যপদ দত্ত।

গরীব স্বামী

(উপন্যাস)
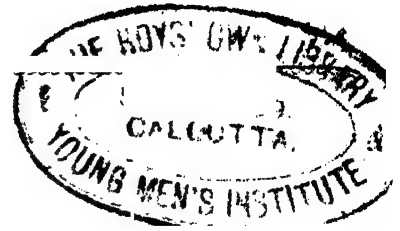
[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক—দেবেন্দ্র বাবুর বয়স ৩০ বৎসর, তিনি সুশিক্ষিত, অবিবাহিত, ও বিপুল ধনের অধিকারী। একটি ছোট মেয়েকে আনিয়া, তাহাকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া পিটিয়া ভাল রকম লেখা পড়া শিখাইয়া, তার পর বিবাহ করিবেন এই উদ্দেশ্যে উষার পিতা মধুবাবুকে দেশ হইতে কলিকাতায় আনিয়া, বাড়ী কিনিয়া দিয়াছেন। ইহাও লেখা পড়া করিয়া দিয়াছেন যে, যদি অবশেষে কন্যাটি তাঁহার মনের মত না দাঁড়ায়, অথবা বিবাহ করিবার পুর্ব্বেই তাঁহার নিজের মৃত্যু হয়, তবে উষার বিবাহের জন্য সমস্ত ব্যয় তিনি বা তাঁহার এষ্টেট বহন করিবে, অন্য পাত্রের সঙ্গে উষার বিবাহ হইবে। দেবেন্দ্রবাবু উষাকে দার্জ্জিলিঙে রাখিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন স্থির করিয়াছেন। এজন্য কুমারী লীলাবতী সেন বি-একে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

একাল ও সেকাল

মধুসূদন বাবু খোলা গায়ে বৈঠকখানায় বসিয়া বাঁধা হুকায় তামাকু সেবন করিতেছিলেন। বেলা তখন তিনটা। দেবেন্দ্র বাবুর মোটর গাড়ী আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি জানালা পথে দেখিতে পাইলেন, দেবেন্দ্র বাবু আজ শুধু একা নহেন, তাঁহার পার্শ্বে নব্য বেশ বেশভূষা পরিহিতা কে একজন মহিলা বসিয়া। উষার ভবিষ্যৎ শিক্ষয়িত্রী কুমারী লীলাকে আজ লইয়া আসিবেন এ কথা দেবেন্দ্র বাবু ইঁহাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়া রাখেন নাই, —তাই মধুসূদন বাবু একটু বিস্মিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর গৃহে ত কোনও আত্মীয়া মহিলা নাই—তবে তাঁহার সহিত এ কে আসিল? মেম-ভাবাপন্না বাঙ্গালী মহিলার সম্মুখে গা খুলিয়া বাহির হওয়া যে বে-আদপি ইহা মধু বাবু সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া ব্যস্ত ভাবে নিজ গেঞ্জি অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। সেটা যে ছাই উপরের ঘরেই আছে—এ ঘরে ত আনা হয় নাই! তখন নিরুপায় হইয়া কোঁচার খুঁট খুলিয়া তাহাই গায়ে জড়াইতে লাগিলেন—এমন সময় লীলাকে সঙ্গে করিয়া দেবেন্দ্র বাবু আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "চাটুয্যে মশাই!"

মধু বাবু তাড়াতাড়ি তক্তপোষ হইতে নামিয়া বলিলেন, "এস বাবা, এস।"—বলিতে বলিতে তিনি দ্বারদেশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন, "এই, এঁরই কথা আপনাকে বলেছিলাম। এঁরই নাম কুমারী লীলা সেন। বি-এ পাশ করেছেন। ইনি দয়া করে আমাদের উষার শিক্ষার ভার নিয়েছেন।"

লীলা স্মিতমুখে মধু বাবুকে নমস্কার করিল। কলিকাতার নব্যতন্ত্রের লোকেরা ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে পরস্পরকে "নমস্কার" অভিবাদন করিয়া থাকে এই অনাচারের বিষয়ও মধুবাবু অধুনা জানিতে পারিয়াছিলেন। লীলাবতী সেন বৈদ্য বা কায়স্থ কন্যা হইয়া তাঁহাকে "প্রণাম" না করিয়া "নমস্কার" করিল, ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না বটে, কিন্তু তাহাকে 'নমস্কার' বলিতে মধুসূদনের সংস্কারে বাধিল, তাই তিনি কেবলমাত্র "বেঁচে থাক বাছা" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দেবেন্দ্র বাবু তখন বলিলেন, "আজই বিকেলের ট্রেণে, আমি বাড়ী ঠিক করতে দার্জ্জিলিঙ রওয়ানা হচ্চি। ফিরতে আমার ৪।৫ দিন কিম্বা এক সপ্তাহও বিলম্ব হতে পারে। এ ক'দিনের অবসরে মিস্ সেন উষার সঙ্গে একটু ভাব সাব ক'রে নিতে চান—আপনাদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হয়ে থাকে,

তাও এঁর ইচ্ছা। তাই এঁকে আমি আজ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি—ভিতরে মার কাছে এঁকে নিয়ে যাবেন?"

"ওঃ—ভিতরে এঁকে নিয়ে যাব? তা বেশ ত—বেশ ত—নিয়ে যাচ্চি তার আর কি? তা' তুমি বাবা কি এখনই রওয়ানা হচ্চ, না একটু বসবে?"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপনি উপর থেকে হয়ে আসুন, তারপর আমি যাব। সাড়ে চারটায় গাড়ী। এখনও দেরী আছে।"—বলিয়া হাস্যমুখে লীলাকে নমস্কার করিলেন। চট্টোপাধ্যায় লীলাকে বিনীত ভাবে "আসুন আমার সঙ্গে" বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

গৃহিণী সেই মাত্র শয়নকক্ষে দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া জর্দ্দা সহযোগে একটি পাণ খাইবার অভিলাষে, পাণের ডাবর সম্মুখে লইয়া পাণ সাজিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার কেশ বেশ তখন কিঞ্চিৎ "আলুথালু", পরণের আধময়লা শাড়ীখানা অত্যন্ত লাট হইয়া গিয়াছে, সেমিজটাও পরা নাই। সিঁড়িতে স্বামীর চটি জুতার ফট্ ফট্ শব্দ শুনিতে পাইয়া তিনি মাথায় গায়ে কাপড় ঠিক করিয়া লইতে লইতে দ্বারের দিকে চাহিলেন। ক্ষণকাল পরে, স্বামীর পার্শ্বে একজন সুবেশা সুসজ্জিতা তরুণীকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মধু বাবু বলিলেন, "ওগো, —এই ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

গৃহিণীর এই বিব্রত ও সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া, লীলা চট্ করিয়া চারিদিকে নেত্রপাত করিল। বারান্দার অপর দিকে একটি কক্ষের মুক্ত দ্বার ও জানালার ভিতর দিয়া বসিবার কক্ষের উপযোগী গৃহসজ্জাদি দেখিয়া বলিল, "ঐটি আপনাদের বসবার ঘর বুঝি? ইনি এখন ব্যস্ত রয়েছেন, আমি ততক্ষণ বরঞ্চ ঐ ঘরটায় গিয়ে বসি, ইনি কায সেরে আসুন!"

গৃহিণীর অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া, মধু বাবুও অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তাই চলুন।"—বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া, লীলাকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া এক খানি চেয়ারে বসাইলেন। লীলা মুখ তুলিয়া বিদ্যুৎ পাখার প্রতি চাহিতেই, মধু বাবুর বুদ্ধি যোগাইল, তিনি পাখার সুইচ্ টিপিয়া দিলেন।

"আচ্ছা, আপনি বসুন তা হলে, আমি, ওঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি"—বলিয়া মধুবাবু স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গেলেন।

গৃহিণী নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, ও কে এসেছে?"

মধু বাবু নিম্নস্বরে বলিলেন, "দার্জ্জিলিঙে উষাকে পড়াবার জন্যে,দেবেন একেই ঠিক করেছে কি। না দেবেন আজ বাড়ী খুঁজতে দার্জ্জিলিঙে চল্ল,—তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে ওকে সঙ্গে করে এনেচে।"

গৃহিণী হাসিতে হাসিতে, গাল হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা সব্বরক্ষে!—আমি বলি বুঝি কোন্ খিষ্টানী মেম আমাকে যীশু ভজাবার চেষ্টায় এসেছে! তা আমায় এখন কি করতে হবে?"

মধু বাবু বিজ্ঞভাবে বলিলেন, "কি আর করতে হবে! বসে খানিক কথাবার্ত্তা কইবে। তার পর বলবে, 'একটু জলটল খেয়ে যান—খাবার টাবার কিছু আনিয়ে দিই।' খাবে না নিশ্চয়,—তবু বলাটা ভাল। তুমি চট্ করে এক খানা ফর্শা শাড়ী পরে নাও চুলটা একটু আঁচড়ে নাও। হাঁ, ভাল কথা, ছেলে মেয়েরা সব কোথা? উষাকে দেখতে চাইবে ত!"

গৃহিণী বলিলেন, "তারা ত সেই খাওয়ার পরই পাশের বাড়ীতে খেলা করতে গেছে। রাত্রে পুতুলের বিয়ে,—কুটনা বাটনা সব হচ্চে কি না! ডাকিয়ে পাঠাব?"

মধুবাবু বলিলেন, "না, থাক্, আজ আজ আর দরকার নেই। এবার যেদিন আসবে, সেই দিন উষাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখ আগে থাকতে। নাও নাও, তুমি চট্ ক'রে কাপড় খানা বদ্‌লে নাও। আমি নীচে চল্লাম, দেবেন বসে আছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ গা, ও হল একজন লেখাপড়া জানা মেয়ে, আমি ওর সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কইব? আমার যে ভয় করে!"

মধু বাবু বলিলেন, "হলই বা লেখাপড়া জানা, বাঙ্গালীর মেয়ে ত বটে! তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে

তোমার ভয় কিসের শুনি? একটা কথা বলে দিই, ও যদিও তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তবুও, ওকে 'তুমি' বোলো না, 'আপনি মশাই' বলে কথা কইবে। নাও চট্ ক'রে নাও!"—বলিয়া মধু বাবু প্রস্থান করিলেন।

গৃহিণী তখন আলমারি খুলিয়া একটা সেমিজ ও একখানা ধোয়া আটপৌরে শাড়ী বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। তাড়াতাড়ি গামছায় চোখমুখ মুছিয়া, মাথায় চিরুণী বুলাইয়া, একটা পাণ ও একটু জর্দ্দা মুখে দিয়া, শঙ্কিত চরণে বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ইঁহাকে দেখিয়া, লীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সহাস্য মুখে নমস্কার করিয়া বলিল, "অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধ হয়!"

গৃহিণী বলিলেন, "না না,—আমাদের আবার সময় অসময় কি? বসুন বসুন।" বলিয়া তিনি নিজে একটা সোফায় উপবেশন করিলেন।

তাহার পর এই তরুণী ও প্রবীণার মধ্যে সাধারণ ভাবের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। কিন্তু তেমন জমিল না। একদিকে শঙ্কা এবং সঙ্কোচ—গৃহিণীর কেবলই মনে হইতেছিল, আমি পাড়াগেঁয়ে মূর্খ মেয়ে মানুষ, আর এ, একে সহুরে মেয়ে, তাই ইংরেজিতে মহাপণ্ডিত—আমার কথাবার্ত্তা শুনে মনে মনে হয়ত কতই হাসছে;—অপর দিকে, লীলার মনে হইতেছে, কি প্রসঙ্গ লইয়াই বা ইঁহার সঙ্গে আলাপ করি! ইঁহারা পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে, গৃহস্থালী ঘর সংসারের কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকেন,—কিন্তু এ ধরণের গৃহস্থালীর কোনও অভিজ্ঞতাও ত আমার নাই।—অবশেষে লীলা বলিল, "আপনার যে মেয়েটিকে আমি দার্জ্জিলিঙে নিয়ে গিয়ে পড়াবো, তাঁকে ত কৈ দেখতে পাচ্ছিনে!"

গৃহিণী বলিলেন, "উষার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? সে আজ বাড়ী নেই—আপনি আজ আসবেন, আগে ত জানতাম না। আপনি এখন মাঝে মাঝে আসবেন ত?"

লীলা বলিল, "আমি এখন রোজই আসবো—এসে দুই এক ঘণ্টা করে থাক্‌বো। উষাকে দার্জ্জিলিঙে পাঠিয়ে আপনি থাক্‌তে পারবেন ত?"

এতক্ষণে লীলা, ইঁহার অন্তরের একটি তারকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইল। গৃহিণী ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "উষা যেদিন জন্মেছে, সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত, একদিনের জন্যেও তাকে ছেড়ে আমি থাকিনি! তাকে মানুষ করবার, লেখাপড়া শেখাবার এই প্রণালীই যখন এঁরা স্থির করে ফেলেছেন, তখন আর উপায়ই বা কি? আমি না হয় কোনও রকমে মনকে বুঝিয়ে বুক বেঁধে প'ড়ে থাকবো,—কিন্তু মেয়ে যে আমায় ছেড়ে সেখানে কি ক'রে থাক্‌বে, সেই ভাবনাতেই আমি আকুল হচ্চি কি না!"—বলিতে বলিতে গৃহিণীর চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

লীলা বলিল, "মেয়েকে সেখানে আনন্দে রাখবার ভার আমার উপর। প্রথম প্রথম দু'চার দিন তার মন খারাপ হবে বৈকি! তার পর, নূতন আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নেবে। আপনি নিজে থাকতে পারলেই হল। আপনার ত আরও দুটি মেয়ে একটি ছেলে আছে, আপনি তাদের নিয়ে থাকবেন। আপনাদের মেয়ের ভালর জন্যে এটুকু কষ্ট সইতে পারা ত আপনার উচিত।"

গৃহিণী বলিলেন, "পারা ত উচিত, কিন্তু মন মানে কৈ।"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার অভিলাষে লীলা বলিল, "দেবেন্দ্র বাবু আপনাদের কে হন? কোনও আত্মীয়, না শুধু বন্ধু?"

গৃহিণী বলিলেন, "একরকম আত্মীয়ই, বলতে গেলে।"

"বাঙ্গালী ঘরে, ও বয়সের পুরুষ ত প্রায়ই অবিবাহিত দেখা যায় না। আপনারা ওঁর বিবাহ দেবার চেষ্টা করেন নি?"

"উনি বলেছেন, এখন বিয়ে করবেন না। আজকাল এই রকমই ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে কি না! ছেলেরাও সহজে বিয়ে করতে চায় না,—আর লেখাপড়া জানা মেয়েরাও সেই সুর ধরেছে। নইলে, ধর না কেন, তোমারও ত—" বলিয়াই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, ঐ যাঃ, তুমি বলে ফেল্লাম যে!

লীলা তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার যে বাপ মা নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "দেবেনরও নেই—নইলে কি আর এতদিন তাঁরা ছেলেকে সংসারী ক'রে দেবার চেষ্টা করতেন না?"

লীলা ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, "সাড়ে তিনটে বেজে গেছে—আপনার অনেক খানি সময় নষ্ট করে দিলাম—আচ্ছা, এখন তা হলে উঠি?"

এত শীঘ্র লীলার উঠিবার কথা ছিল না। পরামর্শ ছিল, দেবেন্দ্র বাবুর গাড়ী তাঁহাকে শিয়ালদহে পৌছাইয়া দিয়া, ফিরিয়া এখানে আসিবে এবং লীলাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু তাহা হইলে আরও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব করিতে হয়। কিন্তু, সময় যে এরূপ অচল হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ত লীলা বা দেবেন্দ্র বাবু কেহই ভাবেন নাই! এক ত বয়সের পার্থক্য অনেক খানি। তাহার উপর, শিক্ষা দীক্ষা রুচি ও আদর্শের বিভিন্নতাও সাগর সদৃশ। কি বিষয় লইয়াই বা কথাবার্ত্তা চালানো যায়! তাই লীলা উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইল। ভাবিল, বাহিরে গিয়া একখানা ট্যাক্সি লইয়া বাড়ী যাইবে।

লীলার উঠিবার প্রস্তাবে গৃহিণীও স্বস্তি অনুভব করিলেন। তথাপি বলিলেন, "এখনই উঠবেন? একটু জলটল খেয়ে যান।"

লীলা বিনীত ভাবে বলিল, "এ সময় কিছু খাওয়া ত আমার অভ্যাস নেই।"

"সামান্য কিছু—দুই একটা মিষ্টি টিষ্টি? গেরস্ত বাড়ী থেকে, একটু মিষ্টি মুখ না করে চলে যাবেন, সেটা কি ভাল?"

লীলা হাসিল। বলিল, "কাল ত আবার আমি আসছি। কাল এসে মিষ্টি মুখ ক'রে যাব। আজ ত আমার আসাই বৃথা হল, উষার সঙ্গে দেখাই হল না। কাল সে বাড়ী থাকবে ত?"

"হাঁ, তা থাকবে বৈকি। রোজই ত থাকে, আজ হঠাৎ—"

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কাল তা হলে আমি এই সময় আসবো?"

"আসবেন বৈকি!"—বলিয়া গৃহিণীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আচ্ছা - আসি তা হলে,—নমস্কার"—বলিয়া লীলা কক্ষের বাহির হইল। এটা সে লক্ষ্য করিল যে, গৃহিণী তাহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন না। কিন্তু ইহাও বুঝিল যে এ ত্রুটি তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে—অজ্ঞতাপ্রসূত মাত্র।

"কিছু খেলেন না?"—বলিতে বলিতে গৃহিণীও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইলেন। সিঁড়ির নিকট আসিয়া তাঁহাকেও সিড়ি নামিতে উদ্যত দেখিয়া লীলা বলিল, "আহা, আপনি কেন আবার কষ্ট করে নীচে আসছেন? আমি ঠিক চিনে যেতে পারবো এখন। না না, আপনি থাকুন।"—বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া, খুট খুট করিয়া দ্রুত পদে লীলা সিঁড়ি নামিয়া গেল।

লীলা অদৃশ্য হইলে, ঘাম দিয়া যেন গৃহিণীর গায়ের জ্বর ছাড়িল। জুতা মোজা পরা নবশিক্ষিতা "মেম-ভাবাপন্না" বাঙ্গালী কুলকন্যা দুই চারিটি তিনি ইদানীং দূর হইতে দেখিয়াছিলেন। সেই অজ্ঞাতপূর্ব্ব জীবের সান্নিধ্য লাভে তিনি যে মনে মনে কৌতুকই অনুভব করিতে লাগিলেন তাহা নহে, কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমেরও উদয় হইল। ভাবিলেন, উষাও ত একদিন ঐ রকমটি দাঁড়াইবে! মনে মনে কন্যার সেই ভবিষ্য-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় খুসীই হইল। মনে মনে বলিলেন, "হাঁ—এই রকম ত ভাল!—বাঙ্গালী অন্তঃপুরের ঘোমটা ঢাকা জুজুমানার চেয়ে অনেক ভাল বৈকি!"

কিয়ৎক্ষণ পরেই চট্টোপাধ্যায় উপরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, উষার মাষ্টারণীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কি রকম জম্‌ল?"

গৃহিণী বলিলেন, "ওরা হল লিখুনে পড়ুনে মেয়ে—আমরা মুখ্য সুখ্য মানুষ, আমাদের সঙ্গে আর আলাপ পরিচয় জমবে কি বল?"

মধুবাবু বলিলেন, "লিখুনে পড়ুনে বলতে! বি-এ পাস করেছে, সোজা কথা! দেবেন বল্লে, ইংরেজি কয় ঠিক একেবারে মেমেদের মত। আমার সঙ্গে অবিশ্যি কথাবার্ত্তা বেশী হয়নি! কিন্তু এত যে লেখাপড়া শিখেছে, দেমাক্ ত

দেখলাম না একটুও! তুমি কি রকম দেখলে?"

"না, কোনও দেমাক্ কি ঠ্যাকার আমিও কিছু দেখলাম না। বেশ মিষ্টি কথাবার্ত্তা—বেশ অমায়িক—বিনয়ী।"

"তা হবে না? তা যে হতেই হবে! নইলে শাস্ত্রই যে মিথ্যে হয়ে যায়। বিদ্যা দদাতি বিনয়ং কি না!" বলিয়া—মধু বাবু নিজ গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া, একটা পাণ লইয়া, নীচে চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

দম্পতী-জীবন

কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্যব্যাকরণতর্কতীর্থ প্রাপ্তিস্থান—গয়ানাথ ঔষধালয়, ১৬।১এ বীডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মূল্য ৷৹

আলোচ্য গ্রন্থখানি "আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা"য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা সমূহ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ সুপ্রণালীক্রমে লিখিত হইয়াছে। এই অনাচার-প্লাবিত যুগে যাহাতে বাঙ্গালী জাতির বংশধরেরা নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন, গ্রন্থকার তজ্জন্য যত্নবান হইয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের যৌনবিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের ন্যায় এই গ্রন্থ আদৌ কুরুচিপূর্ণ নহে। গ্রন্থকার একজন বহুদর্শী কবিরাজ। আমরা তাঁহার নিকট হইতে আরও কিছু প্রত্যাশা করি। মহিলাদিগের পক্ষেও এ পুস্তক অবশ্যপাঠ্য। স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধনের উপায় হইতে শিশুচর্য্যা পর্য্যন্ত প্রত্যেক উপদেশটি পালনীয়।

লেখক বলেন, "যিনি প্রকৃতির কার্য্যকলাপের সহিত সুপরিচিত, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন সংসার সুখের; এই বিশ্বসংসারের সমস্ত কার্য্যে যাঁহারা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারেন না, কেবল তাঁহাদেরই মনে মায়া ও লীলা স্থান পায়, প্রকৃতপক্ষে মায়া ও লীলা বলিয়া কিছুই নাই।

ইংরাজীতে যে শাস্ত্রকে Domestic Economy (গার্হস্থ্য-বিদ্যা) বলা হয়, তাহাই গ্রন্থকার দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। খাদ্য, পানীয়, আহার, বিহার প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলির যুক্তিবত্তা ও সারবত্তা আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সংসার সম্বন্ধে অনেকগুলি ভ্রান্ত ধারণা হইতে পাঠক মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকার দার্শনিকতত্ত্ব ছাড়িয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের অধিকতর আলোচনা করিলে গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি পাইত। ভাষার দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। সেইজন্য অনেকস্থলে তাহা দর্শন সঙ্গত বা বিজ্ঞান সঙ্গত হইতে পারে নাই।

ব্রতকথা

প্রথম ভাগ। প্রণেতা শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কলিকাতা ঝামাপুকুর ৪নং গোপাল বসু লেন হইতে শ্রীকালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৵৹

কয়েকটি ব্রত কেমন করিয়া করিতে হয় ও তৎসংক্রান্ত উপাখ্যান এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ব্রতগুলি স্ত্রীলোকের অনুষ্ঠেয়। ঐগুলির কথা কোন শাস্ত্র গ্রন্থে না থাকিলেও, কালক্রমে গ্রাম্য সমাজে এগুলি খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সুখের সংসার

শ্রীবিপিনবিহারী বটব্যাল প্রণীত। প্রকাশক বটব্যাল এণ্ড কোং ১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১৲

জীমূতবাহন

প্রণেতা শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ। প্রকাশক—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।৵৹

নাটকখানি ছেলেদের জন্য রচিত। গল্লাংশ নাগানন্দ নামক সংস্কৃত নাটক হইতে গৃহীত। লেখক বলিয়াছেন, "আমার ছেলেদের জন্য এই নাটক লিখিয়াছিলাম। ছেলেদের অভিনয়োপযোগী বাঙ্গালা নাটক খুব বেশী নাই। তাই অভিনয়ের জন্য বালকদিগের প্রীতির জন্য ইহা মুদ্রিত করিলাম।" বইখানি ছেলেদের উপযোগী, তবে অভিনয়ের পথ সুগম হয় নাই। গ্রন্থখানি শিশু সাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিবে।

পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস

শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী। 'মানসী' প্রেসে মুদ্রিত পৃঃ ১২৮, মূল্য ২৲ ।

"পাশ্চাত্য-বৈদিক শ্রেণী" বলিতে কি বুঝায় তাহা গ্রন্থকর্ত্রী ভূমিকায় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"গাজনবী ১০১৯ খৃঃ অব্দে কান্যকুব্জ জয় করিলে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে পলায়ন করেন···যাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।" এই সমাজের ইতিহাস ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা শাস্ত্র ও ইতিহাসের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বেশ দক্ষতা-সহকারে, বেশ প্রমাণ প্রয়োগের সহিত আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধেয়া লেখিকা তাঁহার পাণ্ডিত্যের, বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানি যে প্রভূত পরিশ্রম ও একান্ত অধ্যবসায়ের ফল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ১ম ভাগ আঙ্গিরস, ভৃগু, কাশ্যপ প্রভৃতি আর্য্য ঋষিদের বংশাবলীর পরিচয়—অবশ্য খুব সংক্ষেপেই দেওয়া হইয়াছে। ২য় ভাগে পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমন ও সমাজ গঠনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই পলায়ন প্রসঙ্গ পড়িয়া লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। পলায়নপর ভীরু কাপুরুষদের সমাজগঠন বিড়ম্বনা বলিয়াই মনে হয়। ৩য় ভাগে যে আধুনিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈদিক কুল-পঞ্জিকা হইতে গৃহীত। এই রকম সামাজিক ইতিহাসের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সকল সামাজিক ইতিহাসই একখানি সমগ্র পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের মাল-মশলা যোগাইবে। ছাপা, কাগজ চলনসই।

সাহিত্য-সমাচার

বর্ত্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১। হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক—নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র।

২। হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক—হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।

৩। তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কায করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।

৪। রামগোপাল রৌপ্যপদক—'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৫। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (ক)—'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।

অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র।

৭। জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক—মাইকেলের ছন্দ।

৮। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক—মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার—১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপখ্যান-সমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

২। গগনচন্দ্র পুরস্কার—৫০৲স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। কেবল ৬ষ্ঠ বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ্চ, ১৯২৮) তারিখের মধ্যে ২৪৩১ অপার সার্কুলার রোড, ঠিকানায়, বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

শ্রীধাম শান্তিপুরের "বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ্" প্রবর্ত্তিত বঙ্গভাষায় পুরাণের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা আগামী আষাঢ় মাসে গৃহীত হইবে। পরিষদ্ গত ২০ বৎসর হইতে এই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে উপাধি, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকাদি পুরস্কার প্রদান করিয়া আসিতেছেন। দেশে বর্ত্তমানে পৌরাণিক আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার বিশেষ আবশ্যক বিবেচনায় আমরা আশা করি যে, প্রতি জেলার শিক্ষিত মহোদয়গণ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া স্ব স্ব জেলায় বিদ্যালয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিবেন।

———

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত নূতন কাব্যগ্রন্থ "নীহারিকা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

———

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন প্রণীত "নেশা" ফাল্গুন মাসেই প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা ১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে

বিজনে

Engraved and Printed by
Halftone Press, Calcutta

—BOUCHER

মানসী ও মর্ম্মবাণী

২০শ বর্ষ
১ম খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩৪

১ম খণ্ড
২য় সংখ্যা

বেদ-কথা।

১০ (গ) সোমযজ্ঞ

যে যজ্ঞে সোমরস দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়, তাহার নান সোমযজ্ঞ। সমুদয় যজ্ঞের মধ্যে সোমযজ্ঞ প্রধান। একদিনে সম্পাদ্য সোমযাগের নাম ঐকাহিক সোমযাগ; দুই হইতে বার দিনে সম্পাদ্য যাগের নাম অহীন; আর তদধিক দিনে সম্পাদ্য সোমযাগের নাম সত্র।

জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞ ঐকাহিক। উহার সাতটি প্রকারভেদ বা সংজ্ঞা আছে, যথা—অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, অত্যগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, আপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়। এই সপ্তবিধ সোমযজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমই সর্ব্বাপেক্ষা সরল। এই অগ্নিষ্টোমই সকল সোমযাগের প্রকৃতি। অগ্নিষ্টোমের বিধি সকল সোম যাগেই অনুষ্ঠেয়, অন্যান্য যাগে কেবল কতিপয় বিশেষ বিধি আছে মাত্র। এই জন্য ঐতরেয়াদি গ্রন্থে অগ্নিষ্টোমের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তৎপরে অন্যান্য যাগের বিশেষ বিধি গুলি সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে মাত্র।

দ্বাদশাহ যাগ বার দিনে সম্পাদ্য, এই জন্য উহা অহীন বা সত্র উভয়রূপে গণ্য হইতে পারে। সংবৎসর ব্যাপী সত্রের মধ্যে গবাময়ন সত্র প্রকৃতি আদিত্যানাময়ন, অঙ্গিরসাময়ন প্রভৃতি সত্র উহার বিকৃতি।

এই সকল সোমযাগ ব্যতীত অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি কতিপয় অনুষ্ঠানবহুল আড়ম্বরপূর্ণ সোমযাগের বিবরণ পাওয়া যায়।

অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত ইষ্টিযাগ

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ইষ্টিযাগ নহে। কিন্তু অগ্নিষ্টোমের সম্পূর্ণতার জন্য উহার পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি ইষ্টিযাগ বিহিত। সে গুলি দর্শ পূর্ণমাসের বিকৃতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ইষ্টিযাগ গুলির বিবরণ আছে। পূর্ণমাস যাগের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রভেদ জানিবার জন্য এই ইষ্টিযাগ গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিবার জন্য সপত্নীক যজমানকে কর্ম্মারম্ভে দীক্ষিত হইতে হয়। এই দীক্ষা গ্রহণের আনুষঙ্গিক ইষ্টির নাম দীক্ষণীয়া ইষ্টি। দীক্ষা গ্রহণের পরদিন প্রাতে কর্ম্মারম্ভসূচক প্রায়ণীয়া ইষ্টি। সেই দিন সোম ক্রয় করিয়া ক্রীত সোমকে যজ-

শালায় লইয়া যাইতে হয়। যাজ্ঞিকগণের মতে সোম রাজা। রাজা গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অতিথি সৎকার আবশ্যক। এই উপলক্ষে যে ইষ্টিযাগ হয় তাহার নাম **আতিথ্যেষ্টি**। আতিথ্যেষ্টির পর সেই প্রাতঃকালেই প্রবর্গ্য নামক কর্ম্ম বিহিত। প্রবর্গ্যের পর **উপসদিষ্টি** নামে আর একটি ইষ্টি সম্পাদিত হয়। সেদিন অপরাহ্নে আর একবার প্রবর্গ্য ও উপসদিষ্টি বিহিত। তৎপরদিন ও প্রাতে একবার প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং অপরাহ্নে আর একবার প্রবর্গ্য ও উপসৎ বিহিত। তৎপরদিন প্রাতঃকালেই দুইবার প্রবর্গ্যান্তে উপসৎ সম্পাদিত হয়। অপরাহ্নে পশুযাগ হয়। তৎপরদিন সোমযাগ। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে তিনবার সোম ছেঁচিয়া তাহার রস দেবোদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানত্রয়ের নাম যথাক্রমে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। তৃতীয় সবনের পর অবভৃত স্নানান্তে আর একটি ইষ্টিযাগ আছে, ইহার নাম **উদয়ন্য ইষ্টি**। প্রায়ণীয় ইষ্টি যেমন আরম্ভসূচক, উদয়নীয় ইষ্টি সেইরূপ সমাপ্তিসূচক। তৎপরে আর একবার পশুযাগ করিয়া পুনশ্চ একটি ইষ্টিযাগ করিতে হয়। এই ইষ্টি-যাগেই অগ্নিষ্টোম সম্পূর্ণ হয়। ইহার নাম **উদবসানীয় ইষ্টি**।

অতএব দেখা গেল অগ্নিষ্টোমের কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ দীক্ষণীয় প্রায়ণীয়, আতিথ্য, উসসৎ, উদয়নীয় ও উদবসানীয় এই কয়টি ইষ্টিযাগ বিহিত। সকলগুলিই পূর্ণমাস যাগের বিকৃতি। তবে সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু বিশেষ বিধি আছে।

পূর্ণমাস যাগের পূর্ব্বদিন প্রাতে গার্হপত্য হইতে অন্য দুই অগ্নির উদয়নান্তে সেই তিন অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ দ্বারা অন্বাধান করিতে হয়। অপরাহ্নে যজমান ব্রতগ্রহণ করেন। পরদিন প্রাতে ব্রহ্মার বরণ প্রথম অনুষ্ঠান। তৎপরে প্রণীতা প্রণয়নাদি কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মারম্ভ হয়। কিন্তু অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অন্তর্গত ইষ্টিগুলিকে (দীক্ষণীয় হইতে উদয়নীয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) এই অন্বাধান ও ব্রতগ্রহণ কর্ম্ম করিতে হয় না। ব্রহ্মারও বরণ আবশ্যক হয় না। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের জন্য অন্যান্য ঋত্বিকের সহিত তাঁহার বরণ পূর্ব্বেই হইয়া থাকে। একেবারে প্রণীতা প্রণয়নে এই সকল ইষ্টি আরম্ভ হয়।

অতঃপর প্রত্যেক ইষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

দীক্ষণীয় ইষ্টি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ে যজমানের অগ্নিষ্টোমার্থ দীক্ষা গ্রহণ ও তদুপলক্ষ্যে দীক্ষণীয়েষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দীক্ষণীয়েষ্টির দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু। ঐরতেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন "অগ্নি দেবগণের অবম, বিষ্ণু পরম, অন্য দেবগণ ইঁহাদের মধ্যে অবস্থিত"; "অগ্নিই সকল দেবতা, বিষ্ণুও সকল দেবতা, ইঁহাদিগকে পুরোডাশ দিলে সকল দেবতাকেই পুরোডাশ দেওয়া হয়" (১ম অধ্যায়—১ম খণ্ড)। পুনশ্চ "এই যে অগ্নি আর বিষ্ণু, ইঁহারা দেবগণের মধ্যে দীক্ষার পালনকর্ত্তা। ইঁহারাই দীক্ষাকর্ম্মের প্রভু। অতএব অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দিষ্ট যে হবিঃ তদ্দ্বারা, যাঁহারা দীক্ষায় ঈশ্বর, তাঁহারাই প্রীত হইয়া যজমানকে দীক্ষাদান করেন। যাঁহারা দীক্ষয়িতা, তাঁহারাই দীক্ষিত করেন।" (১ম অধ্যায় ৪র্থখণ্ড) এই উভয় দেবতার উদ্দেশে একসঙ্গে একাদশ কপালে পক্ক পুরোডাশ দিতে হয়। যজমান বিশেষে ঘৃতপক্ক চরুদানেরও বিধান আছে। (১ম অধ্যায়—১ম খণ্ড)

এই যাগে আহবনীয় অগ্নি সমিন্ধনে হোতা সতেরটি সামিধেনী মন্ত্রপাঠ করেন; পূর্ণমাসে পনেরটি সামিধেনী বিহিত। (১।১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১ম অধ্যায় ৪র্থ খণ্ডে পুরোডাশ দানের হোতৃপাঠ্য অনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রধান-যাগের পরবর্ত্তী স্বিষ্টকৃৎ-যাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বিধান আছে।

এই বিশেষ বিধি পালন পূর্ব্বক প্রণীতা প্রণয়ন হইতে সামিষ্ট যজুর্হোম পর্য্যন্ত অন্যান্য কর্ম্ম দীক্ষণীয়েষ্টিতে কর্ত্তব্য। আপস্তম্ব মতে পত্নীসংযাজে ইহার সমাপ্তি।

প্রয়ণীয় ইষ্টি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় ইষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আখ্যায়িকা আছে যে, দেবগণ অদিতির

প্রসাদে যজ্ঞলাভ করিয়াছিলেন, অদিতি তাঁহাদিগের নিকট বর চাহিয়াছিলেন "যজ্ঞসকল মৎপ্রায়ণ (আমাকে লইয়া আরব্ধ) হউক এবং মদুদয়ন (আমাকে লইয়া সমাপ্তি) হউক।" (২য় অধ্যায় ১ম খণ্ড)। তদবধি প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় ইষ্টিতে প্রধান দেবতা অদিতি।

এই ইষ্টিতে অদিতির উদ্দেশে চরু দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পথ্যা (স্বস্তি) অগ্নি, সোম ও সবিতা এই চারি দেবতার উদ্দেশে আজ্য আহুতি দিতে হয়। আহবনীয় অগ্নির মধ্যস্থানে অদিতির উদ্দিষ্ট চরু ও সেই অগ্নির পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিকে যথাক্রমে অন্য চারি দেবতাকে আজ্য দেওয়া হয়। (২য় অধ্যায়, ১ম খণ্ড)। ঐ সকল দেবতাকে কি জন্য আহুতি দিতে হয় এবং এই সকল দেবতার যাগের পূর্ব্বে প্রযাজ নামক পাঁচটি আহুতি অগ্নির কোন্ স্থানে দিতে হইবে তাহার বিশেষ বিধি ২য় অধ্যায়ের ২য় খণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে। ৩য় খণ্ডে পঞ্চদেবতার যাগের যাজ্যা ও অনুবাক্যামাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। ৪র্থ খণ্ডে ঐ সকল মন্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া পরবর্ত্তী স্বিষ্টকৃৎ যাগের অনুবাক্যা ও যাজ্যাবিধান হইয়াছে। কাহারও মতে এই ইষ্টিতে অনুযাজ যাগ বর্জ্জনীয়। ঐতরেয় মতে অনুযাজও কর্ত্তব্য। (২য় অধ্যায় ৫ম খণ্ড) তবে অনুযাজ যাগের পরবর্ত্তী পত্নীসংযাজ ও সমিষ্ট যজুর্হোম নাই, ফলে প্রথম শংযুবাকেই এই কর্ম্মের সমাপ্তি।

প্রায়ণীয় ইষ্টি অগ্নিষ্টোমের আরম্ভসূচক ও উদয়নীয় ইষ্টি সমাপ্তিসূচক। উদয়নীয় ইষ্টিও প্রায়ণীয়ের অনুরূপ। উভয়েরই একই দেবতা, একই দ্রব্য। এমন কি যে স্থালীতে প্রায়ণীয়ের চরু পাক হয়, সেই স্থালীটিই প্রক্ষালন না করিয়াই উদয়নীয়ের চরুপাকার্থ রাখিয়া দেওয়া হয়। কেহ কেহ হাতা ও কুশ পর্য্যন্ত রাখিতে বলেন। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞকে একগাছি দীর্ঘ রজ্জুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। রজ্জু যেমন অবিচ্ছিন্ন, যজ্ঞও সেইরূপ বিচ্ছেদহীন হইবে। উহার অন্তর্গত সমুদয় অনুষ্ঠান পরস্পর সম্পৃক্ত থাকিবে। রজ্জুর যেমন দুই প্রান্তে দুইটি গ্রন্থি দিলে উহা দৃঢ় হয়, অবিচ্ছিন্ন অগ্নিষ্টোমের আদিতে ও অন্তে সেইরূপ প্রায়ণীয় ও উদয়নীয় ইষ্টিদ্বারা উহাকেও দৃঢ়বদ্ধ করা হয়। দুইটি গ্রন্থি যেমন সর্ব্বাংশে একরূপ, এই দুই ইষ্টিও সেইরূপ সর্ব্বাংশে একরূপ। তবে একটাকে উল্টাইয়া ধরিলে অন্যটা হয়। বিম্বের সহিত দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের যেমন সম্বন্ধ, প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়ের কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। সেইজন্য উভয় যজ্ঞের একই দেবতা ও একই দ্রব্যে যাগ বিহিত হইলেও, প্রায়ণীয়ের অনুবাক্য মন্ত্রটিকে উদয়নীয়ের যাজ্যা ও প্রায়ণীয়ের যাজ্যাকে উদয়নীয়ের অনুবাক্যা করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ২য় অধ্যায় ৫ম খণ্ডে ইহা বুঝান হইয়াছে।

আতিথ্যেষ্টি—রাজা সোম ক্রীত হইয়া যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলে তাঁহার আতিথ্য সম্বর্দ্ধনার জন্য এই ইষ্টি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩য় অধ্যায়ের ৪।৫ ৬ খণ্ডে এই ইষ্টি বিহিত হইয়াছে। ইহার দেবতা বিষ্ণু। বিষ্ণুর উদ্দেশে নয়খানি কপালে পক্ব পুরোডাশ দিতে হয়। এই প্রধান যাগের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আজ্যভাগ দানের এবং পরবর্ত্তী স্বিষ্টকৃৎ যাগের যাজ্যানুবাক্যা ৩য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বিষ্টকৃৎ যাগের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ অর্থাৎ ইড়া ভক্ষণেই আতিথ্যেষ্টির সমাপ্তি। অনুযাজ পর্য্যন্ত করিতে হয় না। তৎপরবর্ত্তী পত্নী সংযাজাদির ত কথাই নাই। ঐতরেয় বলিতেছেন, প্রধান যাগের পূর্ব্বে যে প্রযাজ যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই অনুযাজেরও ফল পাওয়া যাইবে। (৩য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

আতিথ্যেষ্টিতে একটি নূতন অনুষ্ঠানের বিশেষ বিধি আছে। পূর্ণমাসাদিতে তাহা আবশ্যক হয় না। পূর্ণমাসে গার্হপত্য হইতে যে অগ্নি লইয়া আহবনীয় স্থানে স্থাপিত হয়, তাহাই সমিৎপ্রক্ষেপদ্বারা সমিদ্ধ বা সন্দীপিত করিয়া তাহাতেই যাগ হয়। কিন্তু আতিথ্যেষ্টিতে বিশেষ বিধি এই যে, অরণিদ্বয় ঘর্ষণ দ্বারা নূতন অগ্নি উৎপাদন করিবে। এবং সেই মন্থনোৎপন্ন অগ্নি আহবনীয়স্থিত অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া লইবে। অগ্নি মন্থনের সাধারণ নিয়ম অগ্ন্যাধান প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

এক্ষেত্রে অগ্নি মন্থনকালে হোতার পাঠ্য ঋক্ মন্ত্রগুলি ঐতরেয়ের ৩য় অধ্যায় ৫ম খণ্ডে দেওয়া আছে। এখানে মথিত অগ্নিকেই হোমদ্রব্যরূপে কল্পনা করিয়া আহবনীয়াগ্নিতে উহার আহুতি বিধান হইয়াছে।

উপসদিষ্টি—অগ্নিষ্টোমের পূর্ব্বে তিনদিন প্রবর্গ্যনামা কর্ম্মের * পর উপসদিষ্টি অনুষ্ঠেয়। প্রথম দুইদিন প্রাতে একবার অপরাহ্নে একবার ও তৃতীয়দিন প্রাতেই দুইবার অনুষ্ঠেয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪র্থ অধ্যায়ে এই ইষ্টির বিবরণ আছে। ঐ অধ্যায়ের ১ম খণ্ডে আখ্যায়িকাদ্বারা, কেন দুইবার অনুষ্ঠান হয়, তাহা দেখান হইয়াছে।

ইহার দেবতা অগ্নি, সোম এবং বিষ্ণু তিনেরই উদ্দেশে আজ্যমাত্র আহুতি দিতে হয়। আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্বভাগে অগ্নির, মধ্যভাগে সোমের ও পশ্চিমভাগে বিষ্ণুর উদ্দেশে আজ্য আহুতি দিতে হয়।

উপসদের বিশেষ বিধি এই যে, ইহাতে প্রধান যাগের পূর্ব্বে প্রযাজাহুতি নাই, তবে পরবর্ত্তী অনুযাজাহুতি আছে। অগ্নিসমিন্ধনে হোতৃপাঠ্য সামিধেনী মন্ত্র নয়টি মাত্র।

পূর্ব্বাহ্ণের উপসদের সহিত অপরাহ্ণের উপসদের উল্‌টা পাল্‌টা সম্বন্ধ। সেইজন্য পূর্ব্বাহ্ণের অনুবাক্যা মন্ত্র অপরাহ্ণে যাজ্যা হয়। পূর্ব্বাহ্ণের যাজ্যা অপরাহ্ণে অনুবাক্যা হয় (৪ অধ্যায় ৮ খণ্ড)।

উদয়নীয়েষ্টি—যাগের সমাপ্তিসূচক উদয়নীয়েষ্টির আর পৃথক বিবরণ আবশ্যক নহে। উহা প্রায়ণীয়েষ্টিরই অনুরূপ।

উদবসানীয় ইষ্টি—অগ্নিষ্টোমের সর্ব্বকর্ম্ম শেষে এই ইষ্টি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বিবরণ দেওয়া হয় নাই। তৃতীয় সবনের পর অবভৃত স্নান, তদন্তে উদয়নীয় ইষ্টি, তৎপরে পশু যাগ, পশু যাগের পর এই ইষ্টি। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইহা শেষ করিয়া সায়ংকালীন অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয়।

এই ইষ্টিতে অগ্ন্যাধান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন পর্য্যন্ত প্রকৃতি যজ্ঞের যাবতীয় কর্ম্মের বিধান আছে। ইহার দেবতা অগ্নি, দ্রব্য পঞ্চকপালে পক্ক পুরোডাশ।

প্রবর্গ্য কর্ম্ম

প্রবর্গ্য কর্ম্ম উপসদিষ্টির পূর্ব্বে বিহিত। প্রবর্গ্য সমাপন করিয়া উপসৎ করিতে হয়। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তিনদিন উপসদের বিধি, প্রতিদিন দুইবার—প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে, দ্বিতীয় দিন তদ্রূপ, তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্ণেই দুইবার। এই ছয়বার উপসৎ অগ্নিষ্টোমে বিহিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক উপসদের পূর্ব্বে প্রবর্গ্যকর্ম্মের বিধান থাকায় প্রবর্গ্যও ছয়বার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবর্গ্য কর্ম্ম যজ্ঞের মধ্যে কতকটা থাকছাড়া, ইহা অন্য কোন যজ্ঞের বিকৃতি নহে। কাযেই প্রবর্গ্যকর্ম্মের যাবতীয় উপদেশ খুলিয়া বলিতে হয়। শাখাভেদে উপদেশেরও অনেকটা ভেদ আছে। কাত্যায়নসূত্রের উপদেশের সহিত আপস্তম্ব বা বৌধায়নের উপদেশ সর্ব্বাংশে মিলে না। কাত্যায়ন মতে নিম্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

ব্রহ্মা, অগ্নীৎ, হোতা, অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা এবং প্রস্তোতা এই কয়জন ঋত্বিক্ প্রবর্গ্যযজ্ঞে আবশ্যক। প্রস্তোতা সামগ ঋত্বিক্, তিনি কর্ম্মের অনুকূল সাম গান করেন।

প্রবর্গ্যের প্রধান হোমদ্রব্য ঘর্ম্ম। তপ্তঘৃতে ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ মিশাইয়া ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। যে মৃণ্ময় পাত্রে ঘর্ম্ম পাক হয়, তাহার নাম মহাবীর। ঘর্ম্মযাগের পূর্ব্বে ও পরে যবে বা ব্রীহিতে প্রস্তুত পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়। এই পুরোডাশের নাম রৌহিণ পুরোডাশ। অন্য পুরোডাশের মত ইহাও মাটির কপালে (খোলায়) তপ্ত করিয়া প্রস্তুত হয়। বোধনাদি কর্ম্ম করিতে হয় না। একেবারে পিষ্ট যব বা ব্রীহি সংগ্রহ করিয়া পুরোডাশ হয়।

কুম্ভ নির্ম্মাণোপযোগী মৃত্তিকায় বল্মীকের মাটির ও

* প্রবর্গ্য কর্ম্মের বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে

বরাহ (শুকর) কর্ত্তৃক উৎখাত মাটি মিশাইয়া মহাবীর গড়িতে হয়। মহাবীর প্রাদেশ মাত্র উচ্চ, মধ্যে সঙ্কুচিত, যেন মুষ্টিতে ধরা যায়। সেই মাটিতেই দুগ্ধ দোহনের ভাণ্ড ও দুই পুরোডাশের জন্য দুইখানি কপাল প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। মাজিয়া ঘষিয়া ও আগুনে পোড়াইয়া এই দ্রব্যগুলি ছাগদুগ্ধে ধুইয়া রাখিতে হয়।

হোতাকে কর্ম্মের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুকূল ঋক্‌পাঠ করিতে হয়। এই ঋক্ মন্ত্রগুলির নাম অভিষ্টব মন্ত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচ খণ্ডে এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য ও প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রস্তোতানামা ঋত্বিক্‌কে মাঝে মাঝে কর্ম্মের অনুকূল সামগান করিতে হয়। অধ্বর্য্যু যজ্ঞ-সম্পাদক।

প্রতিপ্রস্থাতা ও অগ্নীৎ কর্ম্ম বিশেষে তাঁহাকে সাহায্য করেন। বালুকা দিয়া তিনটি খর (উনান) নির্ম্মাণ করিতে হয়। দুইটি খর গার্হপত্য ও আহবনীয়ের উত্তরে থাকে, তৃতীয় যজ্ঞভূমির দক্ষিণে থাকে।

প্রথম খরের ভিতর এক টুকরা রৌপ্য রাখিয়া তৃণের আগুন ধরাইয়া তাহার উপরে ঘৃতাক্ত মহাবীর বসাইতে হয়। মহাবীরের ভিতরে আজ্য (ঘৃত) থাকে। গার্হপত্য হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া মহাবীরের চারিদিকে রাখা হয় এবং ঐ অঙ্গারের উপরে তেরখানা বিকঙ্কত (বৈঁচি) কাঠ দেওয়া হয়। তিনজন ঋত্বিক্—অধ্বর্য্যু, প্রতি-প্রস্থাতা ও অগ্নীৎ—কৃষ্ণাজিন খণ্ডের ধনিত্র (ব্যজনী বা হাতপাখা) লইয়া মহাবীরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে হাওয়া দেন। হাওয়া পাইয়া কাঠ জ্বলিয়া উঠে। প্রস্তোতা সামগান করেন। হোতা অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করেন। অধ্বর্য্যু মাঝে মাঝে মহাবীরে ঘৃতসেক করেন। ঘৃত তপ্ত হইলে আবার মহাবীর প্রদক্ষিণ করিয়া উপস্থান করা হয়। প্রস্তোতার সামগান যখন শেষ হয়, তখন অধ্বর্য্যু একখানি রৌহিণ পুরোডাশ রৌহিণ স্থালী নামক হাতায় (স্রুব) লইয়া আহবনীয়ে আহুতি দেন। ঘর্ম্মদেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। প্রবর্গ্য যজ্ঞকেই দেবতারূপে কল্পনা করা হয়—তিনিই ঘর্ম্ম দেবতা।

যজ্ঞভূমির দক্ষিণে খুঁটি পুঁতিয়া গাভীও রজ্জুতে বাঁধা থাকে। ঘর্ম্মার্থ দুগ্ধ দেন বলিয়া ইঁহারা ঘর্ম্মদুঘা।

অধ্বর্য্যু গাভী দোহন করেন, প্রতিপ্রস্থাতা অজা দোহন করেন। পিন্বন নামক ভাণ্ডে দুগ্ধ গৃহীত হয়। প্রস্তোতা সামগান ও হোতা অভিষ্টব ঋক্ পাঠ করেন।

তৎপরে পূর্ণ মহাবীর খর হইতে নামাইয়া তাহার নীচে একখানি কাঠের বৃহৎ হাতা ধরা হয়—এই হাতার নাম উপযমনী। এই হাতার মাথায় গর্ত্তের উপর মহাবীর বসিতে পারে। তৎপরে অজাদুগ্ধ ও গাভীদুগ্ধ নিক্ষেপ করিলে তিনে মিলিয়া ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয়। উপযমনীতে ঘৃত বা দুগ্ধ কিছু পড়িয়া গেলে তাহাও মহাবীরে ঢালা হয়।

অধ্বর্য্যু এই ঘর্ম্ম লইয়া আহবনীয়ের নিকট যান এবং অতিক্রম ও আগ্রায়ণের পর হোতাকে যাজ্যাপাঠে আদেশ করেন। হোতা যাজ্যার্থ দুইটি ঋক্ পাঠ করেন। পূর্ব্বাহ্নের প্রবর্গ্যের যাজ্যা মন্ত্র ও আপস্তম্বের যাজ্যামন্ত্র এক নহে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ডে অভিষ্টব মন্ত্র মধ্যে পূর্ব্বাহ্নে বিহিত এই যাজ্যামন্ত্র কয়টি দেওয়া আছে। যাজ্যান্তে বষট্‌কার করিলে (বৌষট্ উচ্চারণ করিলে) অধ্বর্য্যু "অশ্বিনা ঘর্ম্মং পাত" (আপস্তম্ব মতে)—অশ্বিদ্বয় ঘর্ম্ম পান কর—এই মন্ত্রে আহবনীয়ে ঘর্ম্ম আহুতি দেন। হোতা "অগ্নে বীহি"—অগ্নি তুমি ভক্ষণ কর—এই বাক্য বলিয়া পুনরায় বষট্‌কার করিলে অধ্বর্য্যু পুনরায় আহবনীয়ে ঘর্ম্মাহুতি দেন। হোতার এই দ্বিতীয় বৌষট্ উচ্চারণের নাম অনুবষট্‌কার। অনু-বষট্‌কার স্বিষ্টকৃতের স্থানীয়। প্রধান যাগের পর, অগ্নি স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশে যাগ করিতে হয়—যাগ সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম—ইষ্টিযাগ প্রসঙ্গে ইহা দেখান হইয়াছে। ঐতরেয় বলিতেছেন (৮ম অধ্যায় ৪র্থ খণ্ড) সোমযাগ, ঘর্ম্ম-যাগ ও বাজিন যাগ পৃথক্ রূপে স্বিষ্টকৃৎ যাগে আবশ্যক হয় না। হোতার অনুবষট্‌কারের পর যে আহুতি দেওয়া হয় তাহাতেই স্বিষ্টকৃৎ যাগ অনুপ্ত থাকে। যাগের পর ব্রহ্মা "বিশ্বা আশা দক্ষিণসাৎ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করেন এবং অধ্বর্য্যু ঘর্ম্মাবশেষ পূর্ণ মহাবীরকে আনিয়া আহব-নীয়ের উত্তর স্থিত দ্বিতীয় খরের উপরে রাখিয়া দেন।

এই সময়ে আর পাঁচখানি বিকঙ্কত কাষ্ঠ ঘর্ম্মাক্ত করিয়া ঐ ঘর্ম্ম অগ্নিতে নিক্ষেপান্তে কাষ্ঠখণ্ড গুলি খরের নিকট কিছুকাল রাখা হয়, আর দুইখানি কাঠ দক্ষিণে ও উত্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

দুইখানি রৌহিণ পুরোডাশের মধ্যে একখানি পূর্ব্বেই আহুতি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পুরোডাশ এই সময়ে আহুতি দিতে হয়। তৎপরে হবিঃশেষ ভক্ষণ, মহাবীরস্থ ঘর্ম্ম শেষ উপযমনে ঢালিয়া লইয়া যজমান ও ঋত্বিকেরা সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করেন। ভক্ষণের মন্ত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা উল্লেখযোগ্য—"হুতং হবিঃ মধু হবিঃ ইন্দ্রতমে অগ্নৌ অশ্যাম দেব তে ঘর্ম্ম, মধুমতঃ পিতুমতঃ বাজবতঃ অঙ্গিরস্বতঃ নমস্তে অস্তু মা মা হিংসীঃ—" অহে দেব ঘর্ম্ম (প্রবর্গ্যাখ্য যজ্ঞপুরুষ), ইন্দ্রতম অর্থাৎ অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান্ অগ্নিতে তোমার যে হোম দ্রব্য আহুতিরূপে অর্পিত হইয়াছে উহা মধু, উহা আমরা ভক্ষণ করিতেছি। তুমি স্বয়ং মধুমান্, পিতুমান্ (অন্নবান্), বাজবান্ (গতিমান্—স্বর্গে গতিশীল) এবং অঙ্গিরোগণের সহিত যুক্ত (অর্থাৎ অঙ্গিরা নামক প্রাচীন ঋষিরা ঘর্ম্ম ভক্ষণ করিয়া তোমার সাযুজ্য পাইয়াছেন।) তোমাকে প্রণাম করি আমাকে যেন হিংসা করিও না।"

অতঃপর তৃতীয় ঘরে উপযমনী ধুইয়া যজ্ঞপাত্র গুলি যথা স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। ছয় প্রবর্গ্য সমাপ্তির পর সমুদয় সামগ্রী যথাবিধি যজ্ঞভূমির বাহিরে লইয়া গিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।

ক্রমশঃ

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

হারুঁ রশীদ ও নওশেরওয়াঁ

ইরাণ দেশে নওশেরওয়াঁ নামক সম্রাট্ বিচার ও ন্যায়পরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদ প্রায়ই গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পর সম্রাটের সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইরাণের লোকেরা তাঁহাকে "নওশের-ওয়াঁ-আদিল" বলে।

ইরাণের লোক বিশ্বাস করে যে, বাগদাদের প্রসিদ্ধ খলীফ হারুঁ-উল-রশীদ একবার পাত্র মিত্র সহ গভীর পর্ব্বত গহ্বরে অতি লুক্কায়িত স্থানে নওশেরওয়াঁর গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। নওশেরওয়াঁর দেহ নানা প্রকার মসলা দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। হারুঁ দেখিলেন তাঁহার শরীরটি একখানি মহামূল্যবান সিংহাসনোপরি বসাইয়া রাখা হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে, কেবল কাণ দুইটি সাদা হইয়া গিয়াছে। নওশেরওয়াঁর মৃত্যুর [৫৭৯ ঈশাব্দ] দুইশত বৎসর পরে [ঈ ৭৮৬] হারুঁ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। একখানি পুস্তকে হারুঁর গোর দর্শন এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

পর্ব্বতগর্ভে গুহামধ্যে ঘোর অন্ধকারে এই গোর-স্থানটি ছিল। গোরের সম্মুখে একখানি স্বর্ণ-সূত্র-খচিত চাদর টাঙ্গান ছিল। যখন হারুঁ সেই যবনিকা সরাইতে চেষ্টা করিলেন, তখন ঐ প্রাচীন জীর্ণ চাদরখানি মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া গেল। হারুঁ দেখিলেন, গোরের চারি দিকের প্রাচীরে এত উজ্জল মণি, রত্ন ও হীরক বসান রহিয়াছে যে, অন্ধকারেও সেস্থান উজ্জল দেখাইতেছে। তাঁহার শরীর যে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল, তাহাও মণি ও হীরকে মণ্ডিত ছিল। তাঁহার শরীর এতই জীবিতের মত বোধ হইতেছিল যে, হারুঁর জীবিত মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইল, এবং তিনি সম্ভ্রমের সহিত মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিলেন।

যদিও মৃত নওশেরওয়াঁর দেহ অদ্ভুত উপায়ে ঠিক জীবিতের মত রক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার কাপড়-গুলি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; হারুঁ যখন যে কাপড় ছুইলেন, তাহাই ঝরিয়া পড়িল। হারুঁ আপনার বহুমূল্য শালখানি দিয়া মৃত সম্রাটের দেহ ঢাকিয়া দিলেন, চারিদিকে নূতন মূল্যবান যবনিকা প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিলেন, এবং সমস্ত গোরস্থান মৃগনাভি, কর্পূর ইত্যাদি সুগন্ধ দ্রব্য দিয়া সুগন্ধিত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

হারুঁ দেখিতে পাইলেন, রত্নখচিত সিংহাসনের গায়ে কিছু লেখা রহিয়াছে। তিনি মোবিদ্‌গণকে ডাকিয়া, পহলব (১) ভাষাতে কি লেখা আছে, পড়িয়া অনুবাদ করিয়া শুনাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে নিম্ন লিখিত নীতি উপদেশগুলি লেখা ছিল।—

১। এই সংসার চিরস্থায়ী নহে, যে ব্যক্তি ইহার বিষয়ে অতি অল্প চিন্তা করে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান।

২। সংসার দ্বারা নিহত হইবার পূর্ব্বে, তাহার সুখ ভোগ করিয়া লও।

৩। তোমার অধীনে যাহারা আছে, তাহাদের প্রতি সেই প্রকার অনুগ্রহ কর, যেপ্রকার তুমি আপনা অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়দের কাছে আশা কর।

৪। মনে রাখিও, তুমি সমস্ত পৃথিবী জয় করিলেও একদিন মৃত্যু তোমাকে পরাজিত করিবে।

৫। সাবধান হও, তুমি আপনার সুখ ও ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতারিত হইও না।

৬। তুমি যাহা করিবে, সেই কর্ম্মেরই প্রতিফল পাইবে, তাহা অপেক্ষা বেশীও পাইবে না কমও পাইবে না।

১। নওশেরওয়ার সময়ে ইরাণ দেশে পহলবী [Pahalvi] ভাষা ও লিপি প্রচলিত ছিল, এবং জরতুশত প্রচারিত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ৬৩৫ ঈশাব্দে অরবরা ইরাণ জয় করিলে দেশে আধুনিক পার্সী ভাষা ও অরবী লিপি প্রচলিত হইল। জরতুশত ধর্ম্মের পূজারী-দের "মোবিদ" বলে, কেবল তাহারাই প্রাচীন লিপি ও ভাষা বুঝিত।

খলীফ দেখিলেন, নওশেরওয়ার হাতে একটি ঘোর রক্তবর্ণ পদ্মরাগ নির্ম্মিত আংটি রহিয়াছে, তাহার গায়ে লেখা আছে:—

১। নিষ্ঠুরতা করিও না। ভাল কায করিবার অভ্যাস কর। কখনও তাড়াতাড়ি করিও না।

২। যদি তুমি একশত বৎসর বাঁচিয়া থাক, তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্য মৃত্যুকে ভুলিও না।

৩। বুদ্ধিমানদের সঙ্গলাভকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান জানিবে।

নওশেরওয়াঁর বাহুমূলে একটি সোণার বালার গায়ে লেখা ছিল—"বৎসরের দ্বিতীয় মাসের দশম দিবসে মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী একজন বড় রাজা আমার সমাধি দেখিতে আসিবেন, তাঁহার সহিত চারিজন সৎ ও একজন অসৎ পারিষদ থাকিবে।"

হারুঁ আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গীদের সংখ্যা পাঁচ বটে, কিন্তু কে অসৎ বুঝিতে পারিলেন না। সিংহাসনের নীচে একস্থানে লেখা ছিল:—

"যে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন, তিনি আমায় সম্মান করিবেন, যদিও তাঁহার শ্রদ্ধার উপর আমার কোনও দাবি নাই। তিনি আমার নূতন বসন করিয়া দিবেন, ও চারিদিকে সুগন্ধ দ্রব্য ছড়াইয়া সুগন্ধিত করিয়া দিয়া আপনার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যে অসদ্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত আসিবে, সে আমার সহিত অসদ্ ব্যবহার করিবে। আমার সিংহাসনের নিম্নে একস্থানে একটি লেখা আছে, আগন্তুক রাজার তাহা পাঠ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। ঐ লেখাদ্বারা তিনি আমাকে স্মরণ করিবেন, এবং আমি যে ইহা অপেক্ষা বেশী দিতে অক্ষম, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

খলীফ সিংহাসনের তলে ঐ লেখাটি পাইলেন। মোবিদেরা পড়িয়া অর্থ করিয়া শুনাইল, কোনও গুপ্ত স্থানে নওসেরওয়াঁ তাঁহার ধনরত্নাদি লুকাইয়া রাখিয়াছেন, সেই কথা লেখা ছিল, তাহার নিম্নে লেখা ছিল:—

আমার যে সম্মান করিয়াছেন, তাহার

বিনিময়ে আমি এইগুলি তাঁহাকে উপহার দিলাম, তিনি লইয়া সুখী হউন।"

হারু যখন গোরস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন একজন পারিষদ বলিলেন, "হে মহামান্য খলীপ, একটি শবের কাছে এতগুলি মূল্যবান রত্ন ফেলিয়া রাখা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যাহাতে জীবিতেরা ইহার ফলভোগ করিতে পারে, তাহাই করা উচিত।"

হারু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন, পরিষদকে কটূক্তি করিয়া বলিলেন, "তোমার মত নীচ-মনা লোকের মতে মৃতের দেহ হইতে মূল্যবান দ্রব্যগুলি চুরি করাই সম্রাটের উচিত কর্ম্ম! তুমি সম্রাটের সহিত থাকিবার উপযুক্ত পাত্র নও।" পরে, বাহিরে আসিয়া ঐ পারিষদের এক সেবককে আজ্ঞা করিলেন, "আমার যাইবার পূর্ব্বে মৃত সম্রাটের মূর্ত্তিকে আমার সম্মান জানাইয়া আইস।"

এই সেবক যখন একা নওশেরওয়ার মূর্ত্তির কাছে আসিল, তখন দেখিল, সে জীবনে এত মূল্যবান দ্রব্য কখন দেখে নাই। সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। মূর্ত্তির অঙ্গুলী হইতে সে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া, আপনার বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

যখন সে খলীফের সম্মুখে আসিল, তখন খলীফ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে কোনও প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। তিনি তাহাকে ধমক দিতেই সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, এবং আপনার অপরাধ স্বীকার করিল। হারু অঙ্গুরীয় লইয়া স্বয়ং মৃতের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া আসিলেন এবং ভবিষ্যদ্ বাণীর অসদ্ ব্যক্তি কে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

হারু যে সকল রত্নাদি পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নানা রত্ন জড়িত একটি মহামূল্য মুকুট ছিল, তাহার পাঁচটি কোণ। প্রত্যেক দিকে নিম্ন লিখিত উপদেশ গুলি লেখা ছিল।

প্রথম দিক

১। আত্মজ্ঞানীদের আমার সম্মান জানাও।

২। পরিণাম বিবেচনা করিয়া কার্য্যারম্ভ করিও। পলাইবার পথ স্থির করিয়া তবে অগ্রসর হইও।

৩। কাহাকেও অযথা যন্ত্রণা দিও না, সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিও।

৪। পরকে যন্ত্রণা দিবার ক্ষমতাকে আপনার ঐশ্বর্য্যের অধিকার বিবেচনা করিও না।

দ্বিতীয় দিক

১। কোনও কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিও। যাহার বহুদর্শিতা নাই, তাহার ভরসায় কার্য্য করিও না।

২। জীবনের জন্য ধন, ও ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিও।

৩। সুনাম অর্জ্জন করিতে আপনার সময় ব্যয় করিও এবং যদি প্রকৃত ঐশ্বর্য্য চাও, তবে সন্তুষ্ট ও ত্যাগী হও।

তৃতীয় দিক

১। যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হারাইয়া গিয়াছে, চুরি গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, বা পুড়িয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখিত হইও না।

২। পরের গৃহে বসিয়া আজ্ঞা করিও না। আপনার গৃহে বসিয়া আহার করিতে অভ্যাস করিও।

৩। রমণীর বশীভূত হইও না।

চতুর্থ দিক

১। মন্দ ও নীচ কুল হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিও না। লজ্জাহীন ব্যক্তির সহিত বসিও না।

২। অসচ্চরিত্র লোক হইতে দূরে থাকিও। যে অনুগ্রহের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না, তাহার সহিত সদ্ভাব রাখিও না।

৩। পরের দ্রব্যে লোভ করিও না।

৪। রাজাদের ভয় করিয়া চলিও, কেননা তাঁহারা অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলে পোড়াইয়া মারেন।

৫। আপনার মূল্য বুঝিবার চেষ্টা করিও। পরের

মূল্যের উচিত সমাদর করিও। তোমা অপেক্ষা যাহারা উচ্চ স্থানে স্থিত, তাহাদের সহিত বিবাদ করিও না।

পঞ্চম দিক

১। রাজা, রমণী ও কবিদের জয় করিয়া চলিও।

২। কোনও ব্যক্তিকে হিংসা করিও না। পরের দোষ অন্বেষণ করিবার স্বভাব ত্যাগ কর।

৩। আনন্দে থাকিতে অভ্যাস কর। সকল সময়ে বিরক্ত মনে থাকিও না। ওরূপ করিলে তোমার জীবন দুঃসহ হইবে।

৪। আপনার বংশের রমণীদের সম্মান করিও এবং রক্ষা করিও।

৫। ক্রোধের বশীভূত হইও না। বিবাদের সময়ে সর্ব্বদা শান্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিও।

৬। তোমার আয় অপেক্ষা তোমার ব্যয় বেশী হইতে দিও না।

৭। প্রথমে নূতন বৃক্ষ রোপণ করিও, তার পর প্রাচীন বৃক্ষ কাটিবার স্পর্দ্ধা করিও।

৮। তোমার বিছানা অপেক্ষা পা বেশী ছড়াইও না।

হান্স গোরস্থান ত্যাগ করিবার সময়ে আজ্ঞা করিলেন উহার পথটি চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে আর কেহ লোভে পড়িয়া মৃতের অসম্মান না করিতে পারে। সেই অবধি ঐ গোরস্থানের পথ চিরকালের মত লুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীতে আর কেহ কখনও সেখানে যাইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও যাইতে পারিবে না। সে গোরস্থান যে কোথায় তাহাও কেহ জানে না।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

নবীনের জয়-যাত্রা

তোমারে চেনে না কেউ,
হে নবীন, হে চীর-নবীন!
নিখিলের খেলাঘরে মুক্ত তুমি, আনন্দ-বিলীন!
বসন্তের অন্তরালে
পত্র-পুষ্প-ভালে,
আশার কাহিনী যবে রহে তরঙ্গিতে,
পরিপূর্ণ মিলনের মোহন সঙ্গীতে,
তুমি আস নবীন কিশোর,
যুগলের হাতে ধরি' বেঁধে' দাও প্রণয়ের ডোর।
নিদাঘের নিশি অবসানে
পাপিয়ার সুধা- ঝরা অবিশ্রান্ত অফুরন্ত গানে—
যেই ভাষা সুপ্ত আছে হায়,
তোমারি প্রসাদে তোরা মুক্তি লভে জীবন্তের প্রায়!
চটুল চাহনি তব,
বিশ্বের বিপুল গতি ক'রে দেয় নিত্য অভিনব;
ব্যথিতের ব্যথাতুর হিয়া
উঠে শিহরিয়া
যবে তা'র বদ্ধ দ্বারে
বারে-বারে
বাজে তব বাঁশরীর তান,
হারাণ- রতন লাগি সব দেহে সাড়া দেয় প্রাণ।

সৃষ্টির প্রথম ক্ষণে,
কোন্ সেই কল্পবনে,
হে কুমার—
জনম তোমার!
বিধির বিস্মিত আঁখি
অপলক থাকি
হেরেছিল ওই রূপরাশি
আনন্দেতে ভাসি'।

নিখিলের মিলিত নিঃশ্বাস,
বারিধির অবোধ উচ্ছ্বাস,
উঠেছিল ঊর্দ্ধ পানে,
অম্বর আবরি' ছিল নবীনের জয়-যাত্রা-গানে!
আনন্দ-কিশোর তুমি!
র'য়েছিলে চুমি',
বিধাতার প্রথম বাসনা;
ধরণীর প্রতি ধুলি-কণা,
লভেছিল প্রাণ—
সঞ্জীবন-মন্ত্রবলে হ'য়েছিল চির-মূর্ত্তিমান্।
বসুধার প্রতি ঘরে-ঘরে
নয়নের 'পরে
হে কুমার!
জীবনের যত আয়োজন
ব্যর্থ ক'রে দেয় যবে কোথাকার দুরন্ত রোদন;
অন্ধকার অমানিশা—
রুদ্ধ ক'রে দেয় যবে মানবের অন্তহীন দিশা;
বৈশাখের কাল-মেঘে,
প্রলয়ের মূর্ত্তি যবে দূর হ'তে রহে শুধু জেগে—
সেই ক্ষণে, হে কুমার!
কোথা হ'তে আস তুমি ল'য়ে তব মোহন সম্ভার!
মুগ্ধ তব ছবি—
দুঃখদৈন্ত হাহাকার মিথ্যা করে সবই,
হে কিশোর কবি!

বরষার ঘন-ঘটামাঝে
যেই ব্যথা রাজে,
যেই গভীরতা,
দিগন্ত-বিস্তৃত যেই মহা-নীরবতা,
তারই মাঝে হে কিশোর—
জেগে আছে সিক্ত তব আনমিত নয়নের লোর।
শরতের সাথে
এক শুভ প্রাতে
নিখিল ভরিয়া দিবে শুভ্র তব হাসি—
দূরে যাবে ক্ষণিকের অমঙ্গল রাশি!

ধরণীর মাঝে,
বিচিত্র বরণ দিয়ে নিত্য যাহা সাজে;
নিদাঘের নিশি-শেষে কাঞ্চনের ছটা,
স্নিগ্ধ শ্যাম বরষার নব-ঘন-ঘটা,
শরতের শেফালির মেলা,
বসন্তে বকুল-বনে, দণ্ড দুই ক্ষণিকের খেলা
ব্যর্থ ইহা নহে তো কুমার,
কণ্ঠে এর দুলিতেছে কিশোরের কমনীয় হার।
বসুধার বক্ষ হ'তে যাহা যায়, যাহা প'ড়ে রয়,
হউক ক্ষণিক তাহা, ব্যর্থ নয়, নয় কভু নয়!
ব্যর্থ নয় বিরহীর আশা,
ব্যর্থ নয় বিধাতার চিরমৌন ভাষা,
বালিকার শিব-পূজা সেও ব্যর্থ নয়,
সবার আড়ালে রাজে নবীনের প্রাণ-পরিচয়!

হে নবীন, হে চির-নবীন!
বন্ধন-বিহীন তুমি—কিন্তু বঁধু, নহ উদাসীন।
বসন্তের উৎসবের মাঝে,
যবে হায় দূর হ'তে বাজে
অনাগত বিরহের তান,
উৎসবের দীপাবলী রজনীর শেষ-যামে মৃদু-কম্পমান্;
চিত্তের আকাঙ্ক্ষা যত,
শুধু অবিরত
চাহে যবে প্রকাশের ভাষা,
দুঃখের দুরূহ-রূপ সম্মুখে দাঁড়ায়ে যবে, চির-সর্ব্বনাশা;
সেইক্ষণে হে কিশোর তুমি আসি দেখা দাও
দয়িতের চোখে,
অন্তরের অন্ধকার নিমেষে উজলি' উঠে
অপূর্ব্ব-আলোকে!

মানবের নিরানন্দ, বহন-দহন-ভার
কোথা চ'লে যায়—
আঁখির সম্মুখে যবে, প্রাণ ভ'রে দেখে তা'র
মূর্ত্ত বাসনায়!

হে কিশোর কবি !
জীবনের বেলাভূমে তুমি শুধু আঁকিতেছ
মিলনের ছবি।
কত যুগ যুগান্তর হ'তে
নিখিলের প্রতি পথে-পথে
ফিরিতেছ পথিকের মত
পরশ-পাথর হাতে, মানবের ঘরে-ঘরে নিত্য অবিরত।

যে তোমারে দিতে পারে সব,
তাহারি অন্তর-তলে নিত্য চলে অনন্ত উৎসব !
যে তোমার পায়নি বারতা,
কতখানি দৈন্য তার, কেমনে কব তা' !

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

ক্ষ্যাপা

(গল্প)

পলাশডাঙ্গা হইতে দশ মাইল দূরে চলন বিল। ক্ষ্যাপা চলন বিলে পদ্ম তুলিতে গিয়াছিল। তাহার নিজের প্রয়োজনে নহে, জমিদার-তনয়ার জন্য। পদ্মফুল বাগানের গোলাপ, বেলা, যূথিকা নয়—তাহা সংগ্রহ করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি বিপদসঙ্কুল ; তাই পদ্ম যোগাইবার ভার পড়িয়াছিল অস্পৃশ্য চণ্ডালের ছেলে ক্ষ্যাপার উপর।

সেদিন বৈশাখের বিজন দ্বিপ্রহরে পদ্মবিলের ধারে রাসমণির সহিত ক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ হইল। রাসমণি চলন গাঁয়ের নিমা দাসের মা। নিমা দাসের খুড়ার সহিত ক্ষ্যাপার পিসীর বিবাহ হইয়াছিল—সে অনেক দিনের কথা, সে পিসাপিসী এখন পরলোকে।

ক্ষ্যাপা বাল্যকালে পিসীর গৃহে রাসমণিকে দুই একবার দেখিলেও, বহু দিনের অদর্শনে সে স্মৃতি তাহার মনের কোণে ঝাপ্সা হইয়া গিয়াছিল। সে রাসমণিকে চিনিতেই পারিল না, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসাকাতর শীর্ণদেহ বিধবাকে পদ্মের নাল ও চাকা তুলিতে দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কাঠফাটা রোদে তুমি নাল তুলতে এসেছ ? দাম দল ঠেলে অথই জলে নাল তোলা আমাদেরই অসাধ্য—এ কি তোমার কাষ ?"

রাসমণি ক্ষ্যাপার নিকষকালো মুখখানির প্রতি চাহিয়া সরোদনে প্রত্যুত্তর করিল, "সাধ্যি অসাধ্যি যে পেট বুঝতে চায় না বাবা ! পেটের জ্বালায় নিত্যি কত দাম দল ঠেলতে হয়। দুঃখীর আবার কষ্ট ! কাঠফাটা রোদ্দুর !"

ক্ষ্যাপা রাসমণির ডালায় কতকগুলি পদ্মের নাল তুলিয়া দিয়া মমতায় বিগলিত হইয়া বলিল, "নিত্যি তোমার এই কষ্ট করতে হয় ? এত চাকা নাল তুমি কাকে খাওয়াও ? ঘরে তোমার কত লোক ? নালসিদ্ধ আর পদ্ম চাকা খেয়ে কি সবাই থাকে ?"

কুড়ি একুশ বছরের ছেলেটির মুখে এই সরল প্রশ্ন শুনিয়া রাসমণি বিস্মিত হইল। এ কোথাকার হাবা গোবা ছেলে ! ইহার কি জানা নাই যে পদ্মের চাকা-ও নালের বিনিময়ে কৃষক রমণীদের নিকট হইতে ধান পাওয়া যায় ! যাহাদের গৃহে প্রচুর ধান তাহারা ধানের বদলে কত কি সংগ্রহ করে।

রাসমণি শতছিন্ন অঞ্চলপ্রান্তে ঘর্মসিক্ত মুখ মুছিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি কোন্ গাঁয়ের ছেলে বাছা ? তোমাদের গাঁয়ে কি ধানের বদলে এ সব বিকোয় না ? আমি দুঃখী মানুষ, আমায় আবার ঘর, ঘরের লোক ! ব্যাটা ভাত দেয় না। নিমা দাসের মা ভিখ্ মেগে খায় শুনলে সকলের কাছে তার মাথা হেঁট হবে ব'লে আমার এত দুঃখ করে খাওয়া। সে যাই করুক, আমি তো তার মা !" বলিতে বলিতে বিধবার দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

ক্ষ্যাপা হঠাৎ রাসমণির পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই ত এতক্ষণে ঠাহর হল। দেখেই যে চেনা চেনা লাগছিল। পিসী থাকতে কতবার তোমাদের গাঁয়ে গেছি। এখন সে পিসী না থাকলেও ত তুমি আমার এক পিসী রয়েছ! আমায় চিনতে পারলে না? আমি দুখি মণ্ডলের ছেলে—পলাশডাঙ্গার দুখি মণ্ডল।"

রাসমণি সস্নেহে ক্ষ্যাপার মস্তক স্পর্শ করিয়া সোৎসাহে বলিল, "তুমি দুখি দাদার ছেলে ক্ষ্যাপা? আমার পোড়া কপাল এতক্ষণ চিনতেই পারিনি। আর চিনবই বা কি করে? কত বছর দেখিনি। সে চেহারা তো এখন নেই! দিব্যি বড় হয়েছ। কোথায় বিয়ে থাওয়া করলে বাবা? মা ভাল আছে?"

মায়ের প্রসঙ্গে ক্ষ্যাপার মুখ ম্লান হইল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ক্ষ্যাপা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আর মা! আর ভাল! আজ আটমাস হল মা আমায় ছেড়ে গেছে পিসী! সংসারে আমি একেবারে একলা। গাঁয়ের ছিদাম সর্দ্দারের মেয়ের সাথে বাপ মা বিয়ে ঠিক করে রেখেছিল, সে ঠিক করা পর্য্যন্তই রয়ে রয়েছে।"

"আহা মা নেই? ভাগ্যিমানিরা অল্পেই উদ্ধার পায়, আমাদের যমেও ভুলে থাকে। তা বাছা দুঃখ ক'রে কি হবে? ঠাকুর যাকে দয়া করে তাকে কেউ রাখতে পারে না। এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, মায়ের ঠিক করা মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে সংসারী হও। ভাগ্যে আজ বিলের ধারে এসেছিলাম, তাই মুখখানি দেখতে পেলাম। আর, যদি কোন দিন চন্দনগাঁয়ে এস তা হলে পিসী বলে একটা খবর নিও। তোমরা বেঁচে থাক। আমার তো মরণ নেই, আবার দেখা হবে।"—বলিয়া রাসমণি গমনোদ্যত হইল।

ক্ষ্যাপা তাহার গমনে বাধা দিয়া কহিল, "এত তাড়াহুড়ো কেন পিসী? চল ঐ বটগাছের ছায়ায় একটু বসিগে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

ক্ষ্যাপার অনুরোধে বটগাছের ছায়াশীতল তলদেশে রাসমণিকে অগত্যা বসিতে হইল। ক্ষ্যাপার পদ্ম তোলা হইয়া গিয়াছিল। ঝাঁকার পদ্মগুলি পাতায় ঢাকিয়া ক্ষ্যাপা রাসমণির পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা পিসী, পিসীর যা' তো সম্বন্ধে পিসীই হয়? আমার এক পিসী যখন চলে গেছে, তখন তুমিই আমার সত্যিকারের পিসী হয়ে থাক না কেন? তোমার সঙ্গে তো আমার ফেলা সম্বন্ধ নয়!"

রাসমণি ক্ষ্যাপার কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মূঢ়ের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এ ছেলেটি কি বলিতে চায়? ইহার উদ্দেশ্য কি? যাহার নিজের ছেলে বন্ধন কাটাইয়া মায়ের মুখদর্শন করে না, পরের ছেলে তাহার জন্য মায়াজাল বিস্তার করিতে ব্যগ্র কেন? রাসমণির কণ্ঠে কথা ফুটিল না। সে মৌন হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

ক্ষ্যাপা পিসীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না। কাহারও মনোভাব লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতে সে জানিত না। তাহার চক্ষু এ দৃশ্যমান সংসারকে ভালরূপে দেখিতে পাইত না। শরতের লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় সে আপনার খেয়ালে আপনি ভাসিয়া বেড়াইত। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ যে আপত্তি করিতে পারে এ ধারণা নিমেষের জন্যও তাহার মনে উদয় হইত না। এ ক্ষেত্রেও হইল না।

ক্ষ্যাপা উদাস দৃষ্টি দূরদিগন্ত মাঠের দিকে মেলিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, "একটু রোদ পড়ে এলেই আমরা উঠে পড়বো পিসী। তোমাকে কিছুতেই আমি চন্দনগাঁয়ে যেতে দেবো না, একেবারে পলাশডাঙ্গায় পাড়ি দেওয়াব। তুমি এক ছেলের ভাত না খেয়ে আর এক ছেলের খুঁদকুড়ো খেয়ো। নিমা দা নাল তুলতে দিয়েছিল, আমি কিন্তু দেবো না।"

পরের ছেলের মুখের এমন মিষ্ট কথায় রাসমণি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না। পুত্রের হৃদয়হীনতার শত চিত্র, শত স্মৃতি দুঃখিনীর হৃদয়নদীতে তরঙ্গ তুলিয়া চোখে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিল। বৈশাখের উতলা বাতাসে গাছের পাতা সর্ সর্ করিয়া উঠিল, বিলের জল কাঁপিয়া কাঁপিয়া পদ্মপত্রে শিহরণ তুলিল।

দূরের প্রান্তর হইতে রাখালের বাঁশের বাঁশীর করুণ রাগিণী বায়ুহিল্লোলে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

রাসমণি চক্ষু মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, "তোমার বড় দয়ার শরীর বাবা, এমন আর দেখিনি! যার নিজের ছেলে ভাত দিলে না, তার যে অন্যের কাছে যেতে মন সরে না। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না বাবা, আমার নিজের পথ নিজেই দেখ্‌বো।"

রাসমণি মুখে পথ দেখার কথা বলিলেও ক্ষ্যাপা তাহাকে নিজের পথ ছাড়িয়া দিতে পারিল না। ক্ষ্যাপার জিদের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া রাসমণিকে ক্ষ্যাপার পথেরই পথিক হইতে হইল।

চলনগাঁ হইতে পলাশডাঙ্গা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রাসমণি যখন ক্ষ্যাপার কুটীর দ্বারে উপনীত হইল, তখন দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে। জলে স্থলে পবনে গগনে সন্ধ্যা তাহার ঘননীল শাড়ীখানি বিস্তার করিয়া দিয়াছে। কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার অভ্যর্থনার জন্য দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।

ক্ষ্যাপা অন্ধকার প্রাঙ্গণে মাথার ঝাঁকাটা নামাইয়া কুটীরদ্বার মুক্ত করিয়া প্রদীপ জ্বালাইতে বসিল। মাটির প্রদীপটি সযত্নে গৃহকোণে রক্ষা করিয়া বারান্দায় তাল-পাতার চাটাই বিছাইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "এস পিসী, বসবে এস। এতটা পথ হেঁটে তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। একটু জিরিয়ে নিয়ে, তোমার ঘরসংসার বুঝে নাও।"

"কাকে ঘরসংসার বুঝিয়ে দিচ্ছ ক্ষ্যাপা?" বলিতে বলিতে উত্তর পাড়ার ছিদাম সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্ষ্যাপা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ভাবী শ্বশুরকে বারান্দায় বসাইয়া কলিকায় তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল, "আজ চলনগাঁয়ে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে পিসীকে এনেছি। তাকে সব বুঝে সুঝে নিতে হবে তাই বলছিলাম।"

ছিদাম চাটাইয়ে বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিসী! তোমার পিসা পিসী তো কোন্ কালে ম'রে ভূত হয়ে গেছে। দুখি দাদার তো একটিমাত্র বোন ছিল, এ পিসীর কথা তো কখনো শুনিনি!"

ক্ষ্যাপা জ্বলন্ত কলিকাটা হুঁকার মাথায় বসাইয়া ছিদামের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, "বাবার এক বোন থাকলেও আমার পিসীর দুঃখ নেই। এ পিসী নিমা দা'র মা। নিমাদা ভাত দেয় না তাই আমি আমার কাছে এনেছি।"

ছিদাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বাবা, বড় যে দরদ দেখছি! লোকে কথায় বলে, মামীর মা, তার আবার বড় মা! ছেলে দিল না ভাত কাপড়, পড়সী হল দয়ার সাগর। তোমারও দেখছি তাই!" বলিয়া ছিদাম অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করিয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিল।

একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের মুখে এ মর্ম্মান্তিক পরিহাসে রাসমণি লজ্জায় দুঃখে এতটুকু হইয়া, অন্ধকারে বেড়ার পাশে আশ্রয় লইল।

ছিদামের বিদ্রূপ ক্ষ্যাপা প্রসন্নমুখে গ্রহণ করিতে পারিল না। রাগে তাহার মাথার রক্ত চন্‌চন্ করিতে লাগিল। ক্ষ্যাপা মূর্খ, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য—মনে এক মুখে এক শিক্ষা তাহার হয় নাই। সমস্ত দিবাব্যাপী অনাহার ও পরিশ্রমে, সহ্য করিবার ক্ষমতাও তাহার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইল। ক্ষ্যাপা তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "পিসীর ছেলে তাকে ভাত দিক্ বা না দিক্ তা নিয়ে তোমার দরকার কি সর্দ্দারের পো? তোমার বাড়ীতে তো কেউ ভাত খেতে যাবে না! খামখা বাড়ী বয়ে তুমি পাঁচ কথা শোনাতে এলে কেন?"

ছিদাম গম্ভীরভাবে বলিল, "খামখা আসিনি, যার হাতে মেয়ে দেবার কথা ছিল সে আমার মেয়ের যুগ্যি কিনা সেইটে ভাল ক'রে দেখতে এসেছি। যার নিজের পেট অচল, সেই আবার পথকুড়ানো মাসীপিসী জোটায়! কার ক্ষেতে যে কত ধান তা তো আমার জানতে বাকী নেই।"

"জানতে বাকী থাকবে কেন, অনেককালই তো জান। জেনে শুনেই তো বাবা মাকে কথা দিয়েছিলে। তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে হলে সকলকে যে ত্যাগ করতে হবে, এমন কথা তো কোনদিন হয়নি। তোমার টাকাকড়ি আছে, আমার না হয় নেই। তাই ব'লে পেট অচল বলে গাল দেও কেন? যার মনে জোর থাকে, গায়ে বল থাকে, তার পেট কিছুতেই অচল হয় না।"

"হয় কিনা তা দুদিন পরেই টের পাবে। আজ আমি জমিদার বাড়ীতে খাজ্‌না দিতে গিয়ে সমস্তই শুনে এসেছি। সে কথা শোন্‌বার পর কেউ তোমার সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে না, আমিও দেবো না। আমার মেয়ের সমন্ধ আমি অন্য জায়গায় ঠিক করেছি। তোমার এই ভিঁটের উপর জমিদার মেয়ের পূজোর মন্দির করবে, ফুল বাগান করবে। যখন গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াবে তখন লম্বা লম্বা কথা কোথায় থাকে দেখা যাবে।" বলিয়া ছিদাম হাতের হুঁকাটা খুঁটির গায়ে রাখিয়া সদর্পে প্রস্থান করিল।

ক্ষ্যাপার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দৃষ্টিপথ হইতে মুহূর্ত্তের জন্য ধরিত্রীর আনন্দশ্রী মুছিয়া গেল। এতবড় বিশাল বিশ্বের ভিতর এই ক্ষুদ্র ভিটাটুকু—এতটুকু স্থান—এটুকুও সে নিজস্ব ভাবিয়া মাটির মায়ের শীতল কোলে মাথা রাখিতে পারিবে না? এ তো তাহার ভিটা নহে, এ যে পুণ্যতীর্থ ভূমি! পিতার পদরেণু, মাতার চরণচিহ্ন এ গৃহের প্রতি ধূলি কণায় মাখা রহিয়াছে। এটুকু নহিলে জমিদারের সাধের কুঞ্জকানন, দেবমন্দির সমস্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে?

ক্ষ্যাপার নতনেত্র চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া রাসমণি আর দূরে থাকিতে পারিল না। সসঙ্কোচে ক্ষ্যাপার নিকট আসিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় কি হল, বাবা? ঐ লোকটা তোমায় কি সব ব'লে গেল আমি তো বুঝতে পারছি নে। কিসের মন্দির, কিসের বিয়ে?"

ছিদামের কঠোর বাক্যাবলী তখনও গুঞ্জিয়া রহিয়া ক্ষ্যাপার হৃদয় দংশন করিতেছিল, তখনও তাহার চিত্ত শান্ত হয় নাই। পিসীর মমতাপূর্ণ প্রশ্নে যে ঝাঁঝের সহিত প্রত্যুত্তর করিল, "নিজের কাণেই তো সব শুনলে পিসী, আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন? যে এসেছিল ওরই নাম ছিদাম সর্দ্দার, ওর মেয়ে সোহাগীর সঙ্গে বাবা মা আমার বিয়ে ঠিক করে রেখেছিল। ও শুনেছে জমিদার আমায় তাড়িয়ে দিয়ে এইখানে বিধবা মেয়ের শিবপূজোর মন্দির করে দেবে, সেই ছুতোয় ও আজ আমার মুখের উপর অধর্ম্মের কথা বলে গেল। দেখ পিসী বড় লোকের খেয়াল কেমন; আমার ভিটেটুকু ঘরের কাছে বলেই সকলের আগে এইটুকুর ওপর নজর পড়েছে। জমিদার তো জানে না, এই মাটিতে আমার কি আছে! ছিদাম সর্দ্দারও জানে না। জানলে কি"—ক্ষ্যাপা কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। অশ্রুজলে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এ সব প্রসঙ্গে কি করিয়া সান্ত্বনা দিলে ক্ষ্যাপাকে শান্ত করা যাইবে, রাসমণি অনেক ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে পারিল না। স্থির করিতে না পারিলেও চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে ভাবিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "তুমি সমস্তদিন খাওনি বাবা, এখন হাত পা ধুয়ে যাহোক দুটি মুখে দাও। কাল সকালে জমিদারের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ো, তোমার কথা জমিদার ঠেলতে পারবে না। আর ছিদাম সর্দ্দারের ধমকে এত দুঃখ কি ক্ষ্যাপা? ছিদামের মেয়ে ছাড়া কি মুল্লুকে আর মেয়ে নেই? আমি এমন মেয়ে তোমায় এনে দেবো, ছিদামের মেয়ে যার দাসীরও যুগ্যি হবে না।"

ক্ষ্যাপা আহতভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না পিসী ও কথা বলো না। সোহাগীকে ছাড়া আর কাউকে আমার বিয়ে করবার জো নেই। সাত বছর আগে বাবা সোহাগীকে বউ করবার কথা বলেছিল। বাবা মরে গেলে মা ঐ আশা নিয়ে বেঁচে ছিল। তারা যাকে ঠিক করে গেছে, তাকে ছাড়া এ অধর্ম্মের কাষ আমায়

দিয়ে হবে না। আমি ফুল দিয়ে এসে পরে হাত পা ধুচ্ছি। তুমি পা ধুয়ে শিকের ওপর থেকে চিঁড়ে গুড় বের করে নাও। আজ ঐ খেয়েই থাকা যাবে। আমার আর দেরী হবেনা, ঐ তো জমিদার বাড়ী, পুকুরটা ঘুরে যেতে আর কতক্ষণ?"—পিসীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ক্ষ্যাপা প্রাঙ্গণ হইতে ফুলপূর্ণ ঝাঁকাটা মাথায় তুলিয়া লইল।

পিসীর হিতোপদেশে পরদিন প্রভাতে আশা আকাঙ্ক্ষায় কম্পিত হৃদয়ে ক্ষ্যাপা জমিদার ভবনে উপনীত হইল। জমিদার রাজীবলোচন রায় নিদ্রাভঙ্গের পর সবে বাহিরে আসিতেছিলেন, সম্মুখে ক্ষ্যাপাকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না। তিনি গম্ভীর মুখখানি আরও একটু গম্ভীর করিয়া চড়া গলায় হাঁকিলেন, "তোর না মাধুর পূজোর পদ্মফুল দেবার কথা ছিল? সেটা বুঝি কাণেই যায়নি? অসুখের ভান করে আজ বুঝি নাকে কাঁদতে এসেছিস?"

ক্ষ্যাপা রাজীব রায়ের পায়ের কাছে মৃত্তিকায় মাথা ঠেকাইয়া যুক্তকরে উত্তর দিল, "না হুজুর, ফুল আমি কাল রাতেই দিয়ে গেছি। আপনার চরণে আমার একটা নিবেদন আছে যদি অভয় দেন তাহ'লে বলি।"

ক্ষ্যাপার মিনতিতে জমিদারের কঠিন হৃদয় ঈষৎ কোমল হইল। তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর মুখেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা বলবি চট্ করে বল, আমি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না।"

ক্ষ্যাপা বেদনাজড়িত স্বরে কহিতে লাগিল, "কাল ছিদাম সর্দ্দার আপনার এখানে খাজনা দিতে এসে শুনে গেছে, আপনি নাকি আমাকে উঠিয়ে দিয়ে ঐ জায়গাটিতে মন্দির আর ফুলের বাগান করবেন?"

"হাঁ, ছিদাম তোকে মিথ্যা বলেনি। ঐ জায়গাটি আমার ভারী দরকার হয়ে পড়েছে। না হলেই চলছে না। সেজন্যে তোর চিন্তা নেই, এবার তোকে একটা ভাল জায়গাই দেওয়া যাবে।"

ক্ষ্যাপার চোখের কোণ সহসা ভিজিয়া উঠিল। ক্ষ্যাপা ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলিল, "হুজুর আপনি গরীবের বাপ মা, দয়া করে আমার চৌদ্দপুরুষের মাটিতে থাকতে দিন। ঐ মাটিটুকু আমার স্বর্গ, আমি ওর চেয়ে ভাল জায়গা আর চাই না। যেখানে আমার বাপ ঠাকুর্দ্দা মরেছে, দয়া করে আমাকেও সেখানে মরতে দিন।"

রাজীব রায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—"ছোটলোকের আস্পর্দ্ধাও কম নয়! আমার জায়গা আমি দখল করবো তাতে আবার কাঁদুনি দেখ না! চৌদ্দ পুরুষের কেনা মাটি পেয়েছেন। আমার এমন সোণার বাড়ীর পাশে তোর ভাঙ্গা কুঁড়ে, দেখলেই গা জ্বলে ওঠে। এবার আর ওটি থাকতে দিচ্ছি না—কোন কথাই আমি শুনবো না। দু'মাস সময় দিচ্ছি, আষাঢ় মাসের ভেতর অন্য জায়গা দেখে নিতে হবে।"

মেদিনী কম্পিত করিয়া সদর্প পাদক্ষেপে জমিদার কাছারী বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। আশাহত হতভাগ্য ক্ষ্যাপা বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানে বসিয়া রহিল। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। বৃক্ষশীর্ষ হইতে প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্রটি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল—সমস্ত জগৎ কর্ম্ম-কোলাহলে চঞ্চল হইল।

বিনা প্রয়োজনে জমিদারের অঙ্গনে ক্ষ্যাপা অধিককাল থাকিতে পারিল না—তাহাকে গৃহে ফিরিতে হইল। গৃহে ফিরিয়া ক্ষ্যাপা কোন কাযেই মন দিতে পারিল না। অকর্ম্মণ্য অলসের ন্যায় ক্ষুদ্র কুটীরের শীতল মেঝেয় শুইয়া গ্রামের সদাপ্রফুল্ল চিন্তাশূন্য যুবকটি জীবনে এই প্রথম অকূল চিন্তা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। নবাগতা রাসমণি তাহার মুখভাব নিরীক্ষণ করিয়া একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না তথাপি এই পিতৃমাতৃহীন আশ্রয়দাতা ছেলেটির দুঃখে তাহার মাতৃহৃদয় বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল।

রাসমণি গৃহেরই শাকপাতার দ্বারা ভাত তরকারী রাঁধিয়া ক্ষ্যাপাকে খাওয়াইতে বসাইয়া, এ বিপদে জমিদার-তনয়ার শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিল। মাধবীকে সে একবার বলিলে যে সব ঠিক হইয়া যাইবে

একথা ক্ষ্যাপার অজানা ছিল না। মাধবী ক্ষ্যাপার অপরিচিত নহে। মধুর বাল্যে বংশগরিমা ভুলিয়া, উচ্চ নীচ ভেদ ভুলিয়া মাধবী কত প্রফুল্ল প্রভাতে, নীরব মধ্যাহ্নে ক্ষ্যাপার সহিত খেলা করিয়াছে। বিজন বন হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া, গাছের সুপক্ক ফল পাড়িয়া দিয়া সখীর মনোরঞ্জন করিয়াছে। আজ একে একে সেই সব কথা তাহার হৃদয়দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। মাধবী যতদিন সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে বসিয়া ছিল ততদিন ক্ষ্যাপার কাছে সে দুর্ল্লভ ছিল না। উৎসবে আনন্দে শতদিন শতছলে তাহার স্নেহমমতার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়া আসিয়াছে। বৎসরাধিক কাল হইল ভগবানের নিষ্ঠুর বিধানে মাধবী নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বামী হারাইয়া জগতের নিকটে, ক্ষ্যাপার নিকটে, একেবারেই দুর্ল্লভ হইয়া গিয়াছে। তাহার স্নেহধারার মুখ রুদ্ধ হইয়াছে কিনা ক্ষ্যাপা তাহা জানে না, কিন্ত এক বছরে সে এতটুকু স্নেহের পরিচয়ও পায় নাই।

বিশ্ব হইতে লোকচক্ষু হইতে বিধবা নিজেকে যেন লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শুধু সন্ধ্যার অন্ধকারে পুষ্করিণীর নিভৃত সোপানে অনেকদিন মাধবী ক্ষ্যাপার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে।

সন্ধ্যায় নির্জ্জন বাপীতটে মাধবীর নিকট আর্জ্জি পেশ ছাড়া আর অন্য উপায় ক্ষ্যাপা খুঁজিয়া পাইল না। অগত্যা তাহাকে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। অপরাহ্ণ অতীত হইয়া সন্ধ্যা আসিল—বাঁশঝাড়ের মাথার উপর কৃষ্ণপক্ষের মলিন চাঁদ উদিত হইলেন। বনফুলের মিষ্ট গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেল। ক্ষ্যাপা এপার হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পরপারের শুভ্র সোপান আলো করিয়া শ্বেতবসনা মাধবী স্বপ্নময়ী প্রতিমার মত বসিয়া রহিয়াছে—আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু দুইটি কালো জলের উপর নিবদ্ধ। মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমা যেন কিসের ধ্যানে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

ক্ষ্যাপা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। এপার হইতে ওপার যাইবার পথটুকু বেশী দূর নয়। অনতিবিলম্বে পথটুকু অতিক্রম করিয়া ক্ষ্যাপা মাধবীর পশ্চাতে গিয়া ডাকিল—"দিদি।"

মাধবী চমকিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার শান্ত নয়নে বিরক্তির ছায়া খেলিয়া গেল, আধ আলো ও অন্ধকারের মধ্যে ক্ষ্যাপার নিকটে তাহা লুকান রহিল না। ক্ষ্যাপা বিচলিত হইল, যাহা বলিতে আসিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়া থতমত খাইয়া বলিল, "আমার একটা কথা ছিল, সেই কথাটা বলতে চাই, সেইজন্য আমার এখানে আসা।"

মাধবী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, কথা শোনবার এ সময় নয়, তুমি যাও।"

মাধবীর মাথা নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষ্যাপার আশার প্রদীপ নিবিয়া গেল। যে পথে আসিয়াছিল, বিপুল ব্যথা ও অভিমানের বোঝা বুকে বহিয়া লইয়া ক্ষ্যাপা সেই পথেই গৃহে ফিরিল। যে তুলসীতলায় তাহার পিতা শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল, মাতা চিরতরে নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল, ক্ষ্যাপা সেই তুলসীতলায় "মা মা" বলিয়া অবোধ শিশুর মত লুটাইয়া পড়িল।

৪

সেই দিন হইতে ক্ষ্যাপার হাসি গানের স্রোত থামিয়া গেল। 'জন' খাটাইবার নিমিত্ত ক্ষ্যাপার দ্বারে কত লোক আসিয়া ফিরিয়া যায়, তাহার দেখা পায় না। ক্ষেতের কায বন্ধ। এক ভিটা ভাঙ্গিয়া অপর ভিটা গড়িবার দুঃখে যে মানুষ এমন হইতে পারে, রাসমণি কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার বয়স হইয়াছিল, সংসারে দেখাশোনাও কম ছিল না। কয়েকদিন ভাবিয়া রাসমণি সিদ্ধান্ত করিল, ছিদাম-কন্যার ভালবাসায় পড়িয়াই ছেলেটার এমন দুর্দ্দশা হইয়াছে। যে পথের ভিখারিণীকে আনিয়া নিজের যথা সর্ব্বস্বের অধিকারিণী করিয়াছে, তাহার জন্য নিজের মান খোয়াইয়া রাসমণি একদিন ছিদামের কুটীরে গিয়া জানিয়া আসিল যে, ছিদাম সত্যই অন্যস্থানে মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়া বরপক্ষকে 'পাকা' কথা বলিয়া পাকা খাওয়া দিয়াছে। আষাঢ়ের প্রথমে বিবাহ। বিধাতা যে বন্ধন দৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন, মানুষ এক কথায় তাহা ছিন্ন

করিয়া ফেলিয়াছে।—রাসমণি দুঃখিত হইলেও হাল ছাড়িয়া দিল না। সেদিন আপনার দূর সম্পর্কীয় ভাইঝি টগরকে আনাইয়া ক্ষ্যাপার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সগর্ব্বে কহিল, "ক্ষ্যাপা, চেয়ে দেখ্ আমি কাকে এনেছি; আমার যে ভাইঝির কথা তোকে বলেছিলাম এই আমার সেই ভাইঝি টগর। তোদের সমস্ত পলাশ-ডাঙায় এমন মেয়ে খুঁজে পাবি না। শুধু রূপেই নয় ঘরকন্নার কাযেও টগরের মত মেয়ে হয় না। এর কাছে ছিদাম সর্দ্দারের মেয়ে! সোণা ফেলে আঁচলে গেরো! দু'হাত এক হওয়ার পর দেখবি পিসী তোকে কি রত্ন এনে দিয়েছে।"

ক্ষ্যাপা চোখ তুলিয়া বিস্মিত হইয়া রহিল। পিসীর বর্ণনা একটুকুও অতিরঞ্জিত নহে, সত্যই টগর বড় সুন্দরী। ছোট ঘরে সচরাচর এত রূপ দেখা যায় না। মেয়েটির বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায়, সুন্দর হইলেও পিতৃহীনা এই মেয়েটির উপর এ পর্য্যন্ত কাহারও কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নাই।

ক্ষ্যাপা দুই তিন বার মেয়েটির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসি মুখে কহিল, "পিসী, আমার টগর দিদি ভারি সুন্দর। আমাদের ঘরে এমন মেয়ে একটিও দেখিনি। তোমার ভাইঝি, সে যে আমার বোন হয়। হাতটাত ব'লে ভাইবোনদের গাল দিয়ো না। শোন পিসী, দুলাল বলে আমার এক বন্ধু আছে, ধান চালের কাযে সে খুব রোজগার করে। সে ধানের ক্ষেপে মোকামে গেছে, ফিরে এলেই টগরের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবো।"

পিসী মনে মনে বলিল, "দুলালের সঙ্গে টগরকে বিয়ে দিতে হবে না, ওর কায কর্ম্ম দেখলে, ওর কথাবার্ত্তা শুনলে নিজেই বর সাজতে পথ পাবে না। আমার অমন ঢের ঢের ভাই বোন দেখা আছে।"

রাসমণির ঢের দেখা থাকিলেও ক্ষ্যাপার কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

দিনের পর দিন কাটিয়া ধরণীর দ্বারে আষাঢ় আসিয়া দেখা দিল। ঘননীল আকাশের গায়ে মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতে লাগিল। বাতাস প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিল। বর্ষার সলিলধারা কলহাস্য-সহকারে শীর্ণ ধরাকে সরস করিয়া তুলিল।

আষাঢ়ের প্রথমেই সোহাগীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বদিন নৌকা সাজাইয়া শানাই বাজাইয়া সোহাগীকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া গেল। ক্ষ্যাপা দূর হইতে নৌকা খানির প্রতি চাহিয়া রহিল—বর্ষা বিস্ফারিত নদী যেন ধরিত্রীর উদ্বেলিত অশ্রুরাশির ন্যায় ছল্ ছল্ করিতেছে! ঘাটে লোকের ভিড়, গ্রামের লোক সোহাগীর শ্বশুরবাড়ী যাত্রা দেখিতে আসিয়াছে। সে ভিড়ের ভিতর ক্ষ্যাপা যাইতে পারিল না, কেহ তাহাকে একটিবার ডাকিলও না! যখন নৌকখানি ঘাট ছাড়িয়া অনুকূল পবনে ভাসিয়া চলিল, তখন ক্ষ্যাপার মনে হইল মায়ের কথা—মা যে বড় সাধ করিয়া সোহাগীর নিমিত্ত চন্দ্রহার ও গুলবাহার শাড়ী রাখিয়া গিয়াছে, তাহা তো সোহাগীকে দেওয়া হয় নাই! এখনও সময় আছে, দৌড়িয়া বাঁকের মুখে যাইতে পারিলে নৌকা ধরা যাইতে ।

ডুরে গামছার ভিতরে শাড়ী ও চন্দ্রহারটি জড়াইয়া, বাঁশের লাঠিগাছটি হস্তে লইয়া ক্ষ্যাপা দ্রুতপদে তখনই নদীর পথে ছুটিল। মায়ের গচ্ছিত দ্রব্য সোহাগীর হস্তে তুলিয়া দিয়া ক্ষ্যাপা তাড়াতাড়ি ফিরিতে পারিল না—অন্ধকার নদীতীরে উদ্ভ্রান্তের মত বসিয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে নৌকা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। নদীর খোলা জলে মেঘভাঙা চাঁদের ছায়া, তীরের বৃক্ষচ্ছায়া একবার পড়িয়া আবার ভাঙিতে লাগিল। তাহার মাথার উপর দিয়া কয়েকটা নিশাচর পক্ষী বিকট শব্দ সহকারে উড়িয়া গেল। খাদ্যানুসন্ধানে দুইটা শৃগাল আসিয়া পায়ের কাছে দাঁড়াইল। ক্ষ্যাপার কিছুই যেন অনুভব হইল না—গৃহে ফিরিবার কথাও মনে পড়িল না।

গভীর রজনীতে মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জনে বাতাসের শীতল স্পর্শে ক্ষ্যাপার অনুভূতি ফিরিয়া আসিল। আর কাহারও জন্ত না হোক, পিসীর জন্ত যে তাহাকে ঘরে ফিরিতে হইবে। গামছাখানি কোমরে বাঁধিয়া, লাঠি গাছটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ক্ষ্যাপা বনপথে পা বাড়াইয়া

চলিল। কিন্তু অধিক দূরে তাহার অগ্রসর হওয়া ঘটিয়া উঠিল না। সহসা অন্ধকার ঝোপের পার্শ্ব হইতে ভীত রমণীকণ্ঠের অস্ফুট রোদন ধ্বনি শব্দহীন প্রান্তরের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। লাঠিখানা জোর করিয়া ধরিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া ক্যাপা উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিল।

অমিত সাহসে লাঠির অপূর্ব্ব শিক্ষায় তিনটা হৃদয়-হীন পিশাচকে বিতাড়িত করিয়া, অর্দ্ধমূর্চ্ছিত নারীকে লইয়া ক্যাপা যখন আপন কুটীরে আসিয়া থামিল, তখন তাহার শরীর বেতস পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। অত্যধিক পরিশ্রমে আততায়ীর নিষ্ঠুর আঘাতে চোখের পাতা দুটি বুজিয়া আসিতেছিল, ক্ষত মস্তক হইতে তাজা রক্তের ধারায় বক্ষস্থল ও পরিধানের বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। রাস্তায় ক্যাপা নীরব যন্ত্রচালিতের মত রমণীর হাত ধরিয়াই আসিয়াছে, তাহার পানে একটুকুও চাহিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই, কোন কথাও জিজ্ঞাসাও করে নাই, কিন্তু এইবার কথা কহিতে হইল। রমণীর হাতখানি হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া ক্যাপা কাতরস্বরে বলিল, "আর আমি দাঁড়াতে পারছি নে,— তোমায় কোন্ বাড়ী দিয়ে আসবো বল, দিয়ে আসি।"

রমণী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে জবাব দিল, "আমায় কোথায়ও দিয়ে আসতে হবে না। তোমায় এমন অবস্থায় রেখে আমি যেতে পারবো না, চল তাই আমি তোমার ঘরেই যাই।"

ক্যাপা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি! তুমি মাধবী দিদি! তোমায় এমন করে—"

"হ্যাঁ ভাই, আমি মাধবী। বাবা চাকর বাকর সব নিয়ে মহালে গেছেন, রাতে ফিরতে পারবেন না, কাল সকালে ফিরবেন। এই খবর জেনেই ওরা আমায় পুকুর ঘাট থেকে—"

মাধবী কাঁদিতে কাঁদিতে ক্যাপার অবশ হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

মাধবীর উপর দেহভার রক্ষা করিয়া অতিকষ্টে ক্যাপা প্রাঙ্গণ হইতে বারান্দায় উঠিয়া, আর পারিল না। মাধবীর পায়ের কাছে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

৫

অপরাহ্নে ক্ষণকালের জন্য ক্যাপার লুপ্ত চেতনা ফিরিলে সে বিস্মিতের ন্যায় গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোথায় রহিয়াছে সে? এ কি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল? তাহার দীন কুটীরে আজ কাহারা আসিয়াছে? গ্রামের প্রবলপ্রতাপ জমিদার মহকুমার বিজ্ঞ চিকিৎসকের সহিত কিসের পরামর্শ করিতেছেন? টগর ম্লানমুখে পায়ের কাছে বসিয়া কেন? পিসীই বা অমন ভাবে তুলসীতলায় কি করিতেছে? মাধবী তাহার মস্তক কোলে লইয়া বসিয়া আছে—তাহার নেত্রযুগল হইতে অজস্র স্নেহ-বারি ঝরিয়া পড়িতেছে। মাধবীর হৃদয়ে এত স্নেহ মমতা থাকিতে সেদিন কেন সে তাহাকে অমন করিয়া বিমুখ করিয়াছিল? অভিমানে ক্যাপার চোখে জল আসিল। আপনার বস্ত্রাঞ্চলে ক্যাপার সিক্ত চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিয়া মাধবী ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "ভাই, কান্না কিসের? বড় কি কষ্ট হচ্ছে?"

ক্যাপা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "না দিদি কষ্ট নয়। তোমরা আমায় এত ভালবাস, বাড়ী ছাড়ার কথা বলতে গিয়ে-ছিলাম বলে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিলে কেন? তোমরা জান না দিদি, এই মাটিটুকুতে আমার কি আছে।"

দুঃখে অনুতাপে মাধবীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কষ্টে ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দমন করিয়া মাধবী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি আগে জানতাম না দাদা। আজ বাবার কাছে সব শুনেছি। তোমার মাটী তোমারই অক্ষয় হয়ে থাকবে। এ মাটী কেউ কখনও ভোগ-দখল করতে পারবে না।"

ক্যাপার বিবর্ণ মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া কহিল, "পিসীকে আমি আশা দিয়ে এনেছিলাম, তার কিছুই করতে পারলাম না। পিসী যতদিন থাকে তাকে এই বাড়ীতে থাকতে দিয়ো দিদি, তারপর শিবমন্দির করো।"

"না ভাই শিব-মন্দির নয়, তোমার ভিটেয় দেব-মন্দির

হবে না। নারী রক্ষকের, আমার প্রাণ রক্ষকের স্মৃতির মন্দির হবে। তোমার বোন যতদিন বেঁচে থাকবে, সে মন্দির ফুল দিয়ে সাজাবে, প্রদীপ দিয়ে আরতি করবে। দাদা, ভাই আমার, তুমি শান্ত হও। আমি পিসীর ভার নিলাম, টগরের ভার নিলাম।"

ক্ষ্যাপা অতিকষ্টে ধীরে ধীরে বলিল, "আর আমার কিছু কষ্ট নেই দিদি। বড় সুখ, যে মাটীতে আমার সকলে মিশে গেছে, তোমার মান বাঁচিয়ে আমিও সেই মাটীতে মিশে যাব। শুধু একটি ভিক্ষা। যারা মা বোনের অপমান করে, তাদের কখনো মাপ করো না দিদি, কিছুতেই মাপ করো না।"

বলিয়া ক্ষ্যাপা চিরতরে নীরব হইল। তাহার চোখের পাতা দুইটি দেখিতে দেখিতে স্থির হইয়া গেল।

পিসী করুণকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা আমার!" কঠোর হৃদয় জমিদার নীরবে চক্ষু মুছিলেন। মাধবীর অবারিত উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলের ধারা দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় ক্ষ্যাপার প্রাণহীন ললাটে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অস্পৃশ্য মূর্খ চণ্ডাল-পুত্রের শোকে জননী জন্মভূমি সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ ঢাকিলেন।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

আনার কলি

আনার কলি—ডালিম ফুল
সবুজ বনের অপ্সরী;
তরুণ প্রেমের রক্তমুকুল
কোমল কনক-বল্লরী।

পল্লী মায়ের আঁচল ছিঁড়ে
আন্‌লে বুড়ো বাদ্‌শা বীর;
মুকুট সম রাখ্‌লে শিরে
তোমায়, সেরা সুন্দরীর!

ভারত-পতি তোমার পথে
ছড়িয়ে দিলে ভোগের ফুল;
প্রেম যে আসে প্রাণের রথে
বুঝ্‌তে সেটা করলে ভুল।

হীরে মতির পান্না-চুনির
ঝালর ঘেরা অন্দরে,—
আক্‌বরী সে মুক্তামণির
ভোগ-বিলাসের কন্দরে,—

জোছ্‌না ঢালা ফাগুন রাতের
আবেশ মাখা আকাশে,—
ছড়িয়ে গেল সুর-বাহারের
পরশ দখিণ বাতাসে।

বিলাস শিখা উঠ্‌ল জ্বলে
দিল্লী-পতির দিলের মাঝ;
বাঁদীর পায়ে লুটিয়ে দিল
বদ্‌শাহী সে শিরের তাজ্।

বাদ্‌শাজাদা সেলিম ছিল
তরুণ প্রেমিক দিল্‌-বাহার;
নয়ন কোণে ঢাল্‌লো নবীন
প্রাণের প্রণয় কুসুম-সার।

আনার কলি—ফুলের রাণী,
প্রেম ছিল তার অন্তরে;
শুন্‌লে সে ওই প্রাণের বাণী
মলয় হাওয়ার মন্তরে।

উঠ্‌লো কেঁপে ভুরুর কালোয়
প্রেমের ধনু মনোহর ;
কুটিল নয়ন হাসির আলোয়
ছড়িয়ে দিল পঞ্চশর।

ক্ষণেক যেন মুগ্ধ চেতন
থম্‌কে দিল চরণ দুটি ,
ব্যথিয়ে ওঠা কণ্ঠ-গীতি
মিলিয়ে গেল আধেক ফুটি।

এই বিনিময় তরুণ প্রাণের,
এই যে প্রেমের দিব্য আভা,-
ফুটিয়ে দিল ব্যর্থ-কামের
চিত্তে রোষের রক্ত-জবা।

জ্বল্‌ল ধু ধু হিংসা অনল
ছুটল জ্বালার খর স্রোত,—
ভস্ম হল সাধের কমল,
ভাসিয়ে নিল ন্যায়ের বোধ।

আস্‌লো ভ্রমর আচম্বিতে—
চুম্বিতে যেই কমল-কলি,
ছিনিয়ে নিল দম্‌কা হাওয়া,
ব্যথায় কেঁদে ফির্‌ল অলি।

আক্‌বরের-ই ক্ষুব্ধ রোষে
ফেনিল হলো ধ্বংস-বিষ ;
হুকুম হলো—"কবর খুঁড়ে—
জ্যান্ত বাঁদীর কবর দিস্।"

উঃ কি হুকুম!—বজ্রপতন!
বেগম্ বাঁদী চম্‌কালো ;
বিজ্‌লী আলো নিবিয়ে যেন
আঁধার এলো যম-কালো।

মোগল শিবির দুন্দুভিতে
বাজ্‌ল হঠাৎ ভৈরবী ;
ব্যথায় রাঙা অশ্রু-তিতে
বিদায় নিল ঐ রবি!

সম্রাটেরি হুকুম নিয়ে—
জল্লাদ্ এলো উল্লাসে ;
শয়্‌তানির এ গন্ধ পেয়ে
মাত্‌ল পিশাচ্ উল্লাসে।

উঠ্‌ল মাটি, ফুট্‌ল কবর—
ধরার শ্যামল বক্ষেতে ;
প্রেম যে ম'রে রইলো অমর,—
দেখ্‌ছে জগৎ চক্ষেতে।

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী।

দীপঙ্কর অতীশের ছাত্রজীবন ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত

"হে ভিক্ষুগণ, আমি ঐহিক ও পারত্রিক সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। এখন তোমরা যাত্রা কর, এবং বিশ্বের প্রতি করুণার বশবর্ত্তী হইয়া নিখিলের শুভ-সম্পদ—দেবতা ও মানবের শুভ-সম্পদের নিমিত্ত জগতে পরিভ্রমণ কর। কোনও কোনও লোকের মানস-দৃষ্টি ধূলির আবরণে অবরুদ্ধ নহে, কিন্তু তাহাদের নিকট এই ধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার না করিলে তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। অতএব হে ভিক্ষুগণ! প্রত্যেক দেশে গমন করিয়া যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই তাহাদিগকে এই ধর্ম্মে আনয়ন কর, বেদনা-বিদগ্ধ জগতে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রদান কর। সুতরাং করুণায় পরিপূর্ণ অন্তরে প্রত্যেকে পৃথক ভাবে যাত্রা কর, বিশ্বকে উদ্ধার কর ও ধর্ম্মে গ্রহণ কর।"

(ভিক্ষুদের প্রতি প্রচার কার্য্যে ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ-বাণী)

বৌদ্ধযুগে বহির্ভারতে যাহারা ভারতীয় শিক্ষা সভ্যতা

ও ধর্ম্ম বিলাইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালার গৌরব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ অন্যতম মহাপুরুষ। দীপঙ্কর ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মভূমি তৎকালের বজ্রাসনের (বুদ্ধ গয়ার) পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বিক্রমপুর। বিক্রমপুর বর্ত্তমানে একটী বড় পরগণা। সে সময়ে বঙ্গদেশে এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে বিক্রমপুর ধর্ম্মালোচনা, বিদ্যাচর্চ্চা, সভ্যতা এবং বাণিজ্য বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে শিক্ষার্থী, এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বহু লোক বিক্রমপুরে আসিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের চরণ-প্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। শ্রীসম্পদবিশিষ্ট বিক্রমপুরের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া অনেকেই স্থায়িভাবে এখানে বাস করিতে থাকেন। গৌড়ের রাজবংশের কোন একটী শাখা শিক্ষা উদ্দেশ্যে আসিয়া রাজধানী রামপালের সন্নিকট বজ্রযোগিনী * গ্রামে স্থায়ী-বাস স্থাপন করেন। তাঁহাদের নবগৃহীত বাসস্থান এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, উক্ত রাজবংশের ধর্ম্মপিপাসু পণ্ডিতাগ্রগণ্য কল্যাণশ্রীর (তিব্বতী ভাষায় Dge Vahipal) ঔরসে মাতা প্রভাবতীর গর্ভে মহাপুরুষ দীপঙ্করের জন্ম। নবকুমারের সুন্দর মুখশ্রী, বিমল কান্তি দেখিয়া পিতামাতা ও প্রতিবেশীরা সকলেই যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শুভদিনে নামকরণ যজ্ঞে তাঁহারা নব-কুমারের "চন্দ্রগর্ভ" নাম রাখিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে "দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, অতীশ," প্রভৃতি উপাধিগুলিই তাঁহার পিতৃমাতৃ দত্ত "চন্দ্রগর্ভ" নাম ঢাকিয়া দিয়া তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচায়ক হইয়া জনসমাজে ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিখ্যাত হইতেছে। জগদ্বরেণ্য দীপঙ্করের কীর্ত্তি ও যশে আজ জন্মভূমি বিক্রমপুর পৃথিবীময় শ্রীবিক্রমপুর নামে পূজ্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে দীপঙ্করের জন্মভূমি বিক্রমপুরের ও বঙ্গ মগধের তখনকার ও তৎপূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের অবস্থা কথঞ্চিৎ আলোচনা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নদী-মাতৃকা বিক্রমপুর চিরকালই প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনীয়া, কৃষি, বাণিজ্য এবং উর্ব্বরতায় উর্ব্বর বাঙ্গলাতেও অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বেও বিক্রমপুর মানব-সমাজে সুপরিচিত; মহাভারতাদি পুরাণেতিহাস গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। দীপঙ্কর নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন, তখন শিক্ষা-সভ্যতার লীলাভূমি বিক্রমপুরের বিদ্বজ্জন সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোরতর প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। সম্রাট্ অশোক ও হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি পরাক্রান্ত সম্রাট্গণের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে প্রবল স্রোত বহিয়াছিল, বিক্রমপুর তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই; সেই হইতে কখনও প্রবল, কখনও মৃদু, এই ভাবে এই স্রোত বিক্রমপুরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মদ্বয়ের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা হইত, বড় বড় সভায় তর্কযুদ্ধ চলিত। নানাস্থান হইতে পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। ইহাই তখনকার প্রচলিত নিয়ম ছিল; ধনী, নির্দ্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেরই ইহাতে যথেষ্ট উৎসাহ দৃষ্ট হইত। ইহারই ফলে বিক্রমপুর-বাসী আপামর সাধারণ প্রত্যেক পুরুষ এবং প্রত্যেক নারী বিদ্যানুরাগী ছিলেন, অদ্যাপি তাহারই ফলে বিক্রমপুর-বাসিগণ বিদ্যানুশীলনে পরম উৎসাহশীল।

পর পর প্রবল পরাক্রান্ত দেব, চন্দ্র, বর্ম্মণ, পাল ও

---

* "বজ্রযোগিনী" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তি এই যে—দীপঙ্করের কোন পূর্ব্বপুরুষ, বাস-ভবনের সন্নিকটে "বজ্রতারা" দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং উক্ত দেব-মন্দিরে কয়েকটী সাধিকা যোগিনী সাধন-ভজন জন্য অবস্থান করিতেন; দেবী "বজ্রতারা" ও সাধিকা "যোগিনী" হইতেই গ্রামের নাম "বজ্রযোগিনী" বলিয়া বিখ্যাত হয়।

দীপঙ্করের যেখানে বাসভবন ছিল, এখনও সেখানে একটী মৃত্তিকা স্তূপ দৃষ্ট হয়। এই স্তূপ বা ভিটাকে লোকে অদ্যাপি "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" বলিয়া নির্দ্দেশ করে। বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী ব্রাহ্মণগণ, পরম সাধক অদ্বিতীয় পণ্ডিতকে "নাস্তিক" আখ্যা দিতে ত্রুটি করেন নাই। উক্ত ভিটার নিকট একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটি বৌদ্ধ দেব-দেবী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে "বজ্রতারা" মূর্ত্তিও উদ্ধার হয়।

সেন বংশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভূপালগণ বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক অসংখ্য-বেষ্টনী—প্রবল স্রোতস্বিনী পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী—পরিখার ন্যায় বিক্রমপুরকে ঘিরিয়া থাকায়, বহিঃশত্রু হইতে সুরক্ষিত লক্ষ্য করিয়া এবং শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া রামপাল ও তৎসংলগ্ন স্থান ব্যাপিয়া তাঁহারা রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকায় সম্রাট্ অশোকের সময়ের সে একছত্র অবস্থা কখনই আনয়ন করিতে পারে নাই।

ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে উত্তর ভারতে রাজা যশোবর্ম্মণ, মিহির পাল বা রাজা ভোজ এবং বঙ্গে আদিশূরের রাজত্বকাল। ইঁহারা বিষ্ণু-উপাসক এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে (৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে) অনেক বারই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পূর্ণ পুনরুত্থানের চেষ্টা হয়। ৭৫০ খৃঃ হইতে ৮১৬ খৃঃ পঁচাত্তর বৎসর উত্তর ভারতে ঘোরতর বিপ্লবের কাল। ঐ সময় মিহিরপালের পরিবার কুলের প্রবল প্রতাপ রাজগণ, পাল বংশের ধর্ম্মপাল এবং কাশ্মীরের ললিতাদিত্য প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ চলিতে থাকে। ফলে উত্তর ভারত বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এই আত্মকলহে সামাজিক দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। ধর্ম্মে গ্লানি প্রবেশ করিয়া সমাজকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী সম্রাট্ আদিশূর * তাঁহার রাজধানী বিক্রমপুরে বৃহৎ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নানা স্থান হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন, এবং যজ্ঞান্তে তাঁহাদিগকে দেশে চিরস্থায়িভাবে স্থাপন করেন। তাঁহারা, পরে তাঁহাদেরই বংশধরগণ বৌদ্ধদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দেশে বাস করিতে লাগিলেন। এই উভয় ধর্ম্মের পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য, তাঁহাদের পরস্পর মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচারাদি ও শাস্ত্রালোচনা সর্ব্বদাই চলিত, ইহা দীপঙ্করের জ্ঞান পিপাসা বৃদ্ধির একটী শ্রেষ্ঠ কারণ। উত্তর ভারতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের এবং বঙ্গের যখন এইরূপ চঞ্চল অবস্থা, সেই আলোড়ন বিলোড়ন কালেই ভারতাকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতুলনীয় শক্তিমান্ অতিমানব শঙ্করাচার্য্য উদিত হইলেন। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং উহার উচ্ছেদ সাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহারই চেষ্টার ফলে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ন্যায় প্রতিযোগী হিন্দু সন্ন্যাসী দল সৃষ্টি করেন, সমগ্র ভারতবর্ষময় ইঁহারা হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্প স্থানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত ছিল, কিন্তু কিছুকাল হইতে বৌদ্ধদিগের নিকট শাস্ত্রের যুক্তিতর্কে পরাজিত ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠালাভের জন্য এবং সহজে লোকের মন আকর্ষণ জন্য তান্ত্রিক সাধনার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া একান্ত কুৎসিত লোমহর্ষণ ক্রিয়াকলাপ সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সমাজ তখন নরকে পরিণত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ এই তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই, প্রধান প্রধান বিহারে * মঠে এই মতে সাধন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ইহা তিব্বত প্রভৃতি বহির্ভারতে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এই সময় দীপঙ্করের ন্যায় সংস্কারকের হস্তের স্পর্শ না পাইলে পবিত্র সদ্ধর্ম্ম একটা হীনতর ধর্ম্মে দাঁড়াইত।

* সম্রাট আদিশূরের পর তাঁহার পুত্র ভূশূর এবং পৌত্রাদি যথাক্রমে ক্ষিতিশূর, মহীশূর, ধরাশূর, পৃথ্বীশূর, চন্দ্রশূর, সর্ব্বশেষ রাজা সোমশূর এই ৮ জন শূরবংশীয় নরপতি ৩০০ শত বৎসরের উর্দ্ধকাল বঙ্গে রাজত্ব করেন। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ঘটককারিকা

* A. D. 800 to 1050 during the Pal Dynasty the Vikramsila Vihara was the great centre of Tantrist learning, Mantravajracharyas flourished there.—H. Kern's Manual of Buddism.

এই সময় (নবম শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে) বঙ্গে দেববংশের রাজত্বকালে দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গ ও বিক্রমপুরে তখন যথেষ্ট বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছিল। শত শত বাণিজ্য তরী পদ্মা মেঘনা বহিয়া দেশদেশান্তরে বাণিজ্য সম্ভার লইয়া যাইত। দূরদেশ, এমন কি সমুদ্র বক্ষস্থ দ্বীপ সমূহ হইতে, ধন-রত্ন আনিয়া সওদাগরগণ ব্যবসা করিতেন, এবং নানাদেশের ধনরত্ন আহরণ করিয়া বিক্রমপুরকে তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিলেন। এই ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া লুণ্ঠনকারী মগ দস্যুগণ এবং পর্টুগীজ জলদস্যুগণ সর্ব্বদাই উৎপাত করিত। এই উৎপাতের একটা শুভ ফল এই হইয়াছিল যে, বাধ্য হইয়া লোকে আত্মরক্ষা জন্য সমরকৌশল শিক্ষা করিত। বাণিজ্যতরী ব্যতীত রণতরী সর্ব্বদা পদ্মা মেঘনাতে প্রস্তুত থাকিত, আবার প্রাকৃতিক পরিখার উপকারিতা বুঝিয়া ভূস্বামিগণ স্ব স্ব আবাসস্থল এমন কি গ্রাম প্রভৃতি পরিখা খনন করিয়া সুরক্ষিত করিতেন। এখনও ঐসব চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, এইজন্যই দস্যুগণ ভিতরে প্রবেশ করিতে কখনই সমর্থ হয় নাই। দীপঙ্করের যখন ৪৩ বৎসর বয়স, তখন দাক্ষিণাত্যের দুর্দ্দান্ত দস্যু রাজেন্দ্র চোল ১০২৩ খৃঃ নানাস্থানে উৎপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিক্রমপুরে বিফল মনোরথ হইতে হইয়াছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কৌশল ও সমরকৌশলে দীপঙ্কর যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, উত্তর কালে মগধ কনৌজ সমরে তাহা সুফল প্রদান করিয়াছিল।

দীপঙ্করের ছাত্র জীবন।

দেশের যখন এই অবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লব, ধর্ম্মে গ্লানি, তখন দীপঙ্করের আবির্ভাব। দেশের ও সমাজের মঙ্গল জন্য সদ্ধর্ম্মের আশ্রয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক যাহাতে সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে, সেজন্য কল্যাণশ্রী অপত্যস্নেহে অন্ধ না হইয়া সপ্তমবর্ষ বয়সে, বিখ্যাত পণ্ডিত অবধুত জেতারির হস্তে প্রিয় বালককে অর্পণ করিলেন। অক্ষর পরিচয় ও শিশুর যে শিক্ষা তাহা পিতার নিকট ও মাতার অঙ্কে বসিয়াই সমাধা করিয়া, গুরুগৃহে থাকিয়া শিক্ষার জন্য ঐ বয়সেই বালক প্রস্তুত হওয়ায় পিতা মাতা নিশ্চিন্ত মনেই তাঁহাকে তাঁহার জীবনের প্রধান ও প্রথম গুরুর হস্তে অর্পণ করিলেন। অবধুত জেতারির নিকট তিনি বিজ্ঞানের সাধারণ শাখার যথাক্রমে পাঁচটী বিভাগে শিক্ষা পূর্ণ করায়, উচ্চতর দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে তাঁহার অধিকার জন্মে। পাঁচ বৎসর তিনি এই প্রথম গুরুগৃহে ছিলেন। এই স্বল্পকাল মধ্যে তাঁহার এরূপ সফলতা দেখিয়া গুরু বড়ই প্রীত এবং আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র দ্বাদশ বর্ষ।

গুরু জেতারির আশ্রমে শিক্ষা সমাধা করিয়া দীপঙ্কর তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পিতার আদেশ ও উপদেশ লইয়া বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে একাগ্রমনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি হীনযান শ্রাবকদিগের চারি শাখার ত্রিপিটকে গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া, ক্রমে বৈশেষিক দর্শন, মহাযান শাখার ত্রিপিটক, মধ্যমিকা শাখার গভীর উচ্চতম দর্শন শাস্ত্র, যোগাচার্য্য এবং তন্ত্রের চারিশাখা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া, দেশময় বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যে তীর্থিকদিগের দুর্জ্জেয় শাস্ত্রে অসীম জ্ঞানী এবং অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া আদৃত হইয়াছিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পণ্ডিতগণ বৌদ্ধাচার্য্যদিগকে শত্রুর মত জ্ঞান করিতেন, শাস্ত্রের বিচারে জয়ের লিপ্সা তাঁহাদের অত্যন্ত প্রবল ছিল। দীপঙ্করের বৌদ্ধধর্ম্মে অচলা নিষ্ঠা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যখ্যাতি শুনিয়া তখনকার একজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহাকে শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করেন। দীপঙ্কর অল্পবয়স্ক যুবক মাত্র, এই তাঁহার প্রথম শাস্ত্র লইয়া বিচার, কিন্তু সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বালকের নিকট পরাজিত হইয়া অবনত মস্তকে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং ধর্ম্মপিপাসা

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা অপেক্ষা ধর্ম্মানুষ্ঠানই মানবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ায়, বৌদ্ধধর্ম্মের অধ্যাত্ম বিভাগে মনোনিবেশ করিয়া তদনুষ্ঠানের ত্রিশিক্ষা অর্থাৎ আত্ম-শুদ্ধি, যোগাভ্যাস এবং পরমার্থ (morality, meditation and divine) চিন্তায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহাতে সফলতা ও সাধনফল লাভ জন্য তিনি একান্ত আগ্রহে তথনকার দেশবিখ্যাত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ রাহুল গুপ্তের চরণপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ জন্য কৃষ্ণ-গিরির বিহারে গমন করেন। এখানে তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মান্তর্গত পবিত্র সন্ন্যাসের গুহ্য তত্ত্বে দীক্ষিত করিয়া "গুহায় জ্ঞানবজ্র" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এইরূপে তিনি অত্যল্পকাল মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে শিক্ষা সমাপন করিয়া যখন পবিত্র শ্রাবক ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ জন্য উদণ্ডপুরীতে বিখ্যাত মহাসাঙ্গিক আচার্য্য শীলরক্ষিত সমীপে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসে দীক্ষাগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। এই বয়সে তিনি অনন্ত শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া সকল বিভাগে—জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রে—যেরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা ও অতুলনীয় তীক্ষ্ণধীর পরিচায়ক। দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে তরল যৌবনে এরূপ প্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। এই উদণ্ডপুরীর আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শীলরক্ষিতের নিকটই তিনি "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান" উপাধি লাভ করেন।

উদণ্ডপুরীর প্রধান আচার্য্য মহাসাঙ্গিক শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের গভীরতম দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় যৌবনের অবশিষ্টাংশ—উনিশ হইতে ত্রিশ বর্ষ পর্য্যন্ত—দশ বৎসর আশ্রমে বাস করিয়া, সংসারের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কঠোর জ্ঞান-সাধনায় কাল কর্ত্তন করেন। আত্মশুদ্ধি ও চরম জ্ঞান লাভ জন্য যোগিশ্রেষ্ঠ শীলরক্ষিত এবং অপরাপর মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের সহিত সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। কঠোর সন্ন্যাস জীবনের নিয়ম পালন এবং অভিজ্ঞতা লাভ জন্য নানাস্থানে,—শিক্ষাকেন্দ্রে এবং তীর্থে—পর্য্যটন করিতেন। এই ভাবে দশ বৎসর কঠোর সাধনার ফলে একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি আচার্য্য কর্ত্তৃক ভিক্ষু শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিলেন। ঐ সময়েই, যখন তাঁহার একত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স, মগধের সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধাচার্য্য পণ্ডিতপ্রধান ধর্ম্মরক্ষিতের পদপ্রান্তে উচ্চতর বিভাগে শিক্ষা শেষ করিয়া, পবিত্রতম বিশিষ্ট বোধিসত্ত্বের আরাধনা প্রণালীতে নিজকে উৎসর্গ করিয়া, মগধের সে সময়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত দর্শন, মনো-বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্ম-তত্ত্বে সমুচিত শিক্ষালাভ করেন। "দৃশ্যমান জগতের সমুদয় অণু-পরমাণুর শেষ পরিণাম কি ? নির্ব্বাণ কি শূন্যে বিলয় ?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কঠোর সাধনার ফলে এই সময় তিনি সাধারণ মানব-শক্তির অতীত দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

এই সময়ে বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা এবং নানাপ্রকার গভীর বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ ঘোরতর রূপে আন্দোলিত হইতে থাকে। নানা দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্রবে আসিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র ও অতি বিশুদ্ধ মতের বিকৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। দ্বিধা ভঞ্জন করিয়া দেয়, তেমন উপযুক্ত লোক দেশে তো নাই। কোথায় কাহার নিকট গেলে ভগবানের যথার্থ বিশুদ্ধ উপদেশ ও ধর্ম্ম মত জানিতে পারেন, এই ভাবনায় মন চঞ্চল হইয়া উঠে। তাঁহার অসম্বিৎসু মনে শান্তির অভাব বুঝিয়া, কি জানি পাছে প্রকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, এই ভয় উপস্থিত হওয়া মাত্র সঙ্কল্প স্থির করিলেন—কালবিলম্ব না করিয়া সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশে) যাইয়া বৌদ্ধ-জগতের সে সময়ের সর্ব্বজনপূজ্য, বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রের চরম মীমাংসক জগদ্গুরু চন্দ্রকীর্ত্তির পদপ্রান্তে সকল দ্বিধা ভঞ্জন ও শিক্ষা সমাপ্ত করিবেন। কি উপায়ে সুবর্ণদ্বীপে যাওয়া যায় তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই একখানি বাণিজ্য তরী সে দেশে যাইবে জানিলেন, সওদাগরের নিকট তাঁহার সঙ্কল্প জানাইলে, তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণে সেই সমুদ্রগামী বৃহৎ তরীতে

সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করেন। দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র পার হইয়া লক্ষ্যস্থান সুবর্ণদ্বীপে যাইতে তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঝড় বৃষ্টি তুফান সহ্য করিয়া প্রাণ লইয়া তথায় পৌছিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। সেকালে এখনকার মত উন্নত প্রণালীর কল কৌশল যুক্ত সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল না, সাহসী ভারতীয় নাবিকগণ পাল চালিত নানা শ্রেণীর বাণিজ্য তরীতে ভারতের পণ্য দ্রব্য লইয়া দেশ দেশান্তরে গমন করিত এই উপায়েই সওদাগরগণের সঙ্গে শিক্ষার্থী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্ম্মপ্রচার জন্য, জীবন তুচ্ছ করিয়া, ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতা বিলাইয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের সময়েই পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম শিক্ষা এবং ধর্ম্মপ্রচার জন্য প্রচারকগণ দেশ দেশান্তরে যাইতে আরম্ভ করেন। ইহা মানবেতিহাসে ভারতের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি। তাঁহার পূর্ব্বে এমন কি বহুকাল পরেও, শিক্ষা সভ্যতা বা ধর্ম্মপ্রচার জন্য দেশ দেশান্তরে যাওয়া কোথাও কোনও জাতিই জানিত না। ধর্ম্মাশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ সওদাগর দিগের দূরগামী তরীর সাহায্যে শ্যাম, ব্রহ্ম, সুমাত্রা, কম্বোজ, সিংহল প্রভৃতি দেশ সমূহে ভারতীয় সভ্যতা এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই এই পবিত্র কার্য্যের ফলে এসিয়া, আফ্রিকা এবং ইয়ুরোপ তিনটি মহাদেশ ধর্ম্ম ও শিক্ষায় সংযুক্ত হইয়াছিল।* ২৫০ খৃঃ পূঃ জগতের ধর্ম্ম প্রচার প্রবর্ত্তক সম্রাট অশোকের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র এবং তাঁহার ভগিনী ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা, সিংহলের রাজা দেবানাম্ পিয় তিশের সাদর নিমন্ত্রণে সিংহল গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

দীপঙ্কর ও তাঁহার সহযাত্রিগণ যে বাণিজ্যতরীতে গমন করেন, তাহা সমুদ্রে ভয়ানক তুফানে প্রায় চূর্ণ হইয়া যায়। অতিকষ্টে বহুদিন তাঁহারা সুবর্ণদ্বীপের কূলে পৌঁছামাত্র, দীপঙ্কর কালবিলম্ব বা বিশ্রামেচ্ছায় সময় নষ্ট না করিয়া আচার্য্য জগদ্গুরু চন্দ্রকীর্ত্তির বিহারে গেলেন, এবং পাদবন্দনা করিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। শিক্ষা উদ্দেশ্যে দীপঙ্করের এমন আগ্রহ, জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তি জন্য সাগরপারে উপস্থিত হওয়া, যৌবনেই তাঁহার এত গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, এই সমস্ত দেখিয়া আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি একান্ত স্নেহের সহিতই তাঁহাকে প্রিয় শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ক্রমে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার তর্ক ও দ্বিধাদি মিটাইয়া দিতে লাগিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্যরূপে সুবর্ণদ্বীপে অতীশ ১২ বৎসর ছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের মৌলিক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত ও পরম পবিত্র ধর্ম্মোপদেশ সমূহের বহু স্থানেই বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তাহার সে সনাতন মৌলিক ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানেই দীপঙ্করের এই অসাধারণ চেষ্টা। ভাগ্যক্রমে তিনি উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় পাইয়াছিলেন। সে সময়ে আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তির সমকক্ষ লোক কেহ ছিল না। তাঁহারই চরণতলে বসিয়া দ্বিধাতর্ক ইত্যাদি ভঞ্জনে কৃতকার্য্য হইয়া, মনের যে শান্তি হারাইতেছিলেন, দীপঙ্কর তাহা ফিরিয়া পাইয়া, শিক্ষা সমাধা করিয়া, ১০২৫ খৃষ্টাব্দে আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ ও সুবর্ণদ্বীপের রাজা শ্রীধর্ম্মপালের উপহার "শিক্ষা সমুচ্চয় অভিসময়" নামক মূল্যবান পুঁথি সুবর্ণদ্বীপের স্মৃতিচিহ্ন

* "Conversion of Asoke to Buddhism turned the better fortune of Budhism. The missioneries of Asoke and his successors carried the doctrines of Buddhism from the banks of the Ganges to the snows of Himalayas, the deserts of Central Asia and the bazzars of Alexandra....Thus embracing three Continents Asia, Africa and Europe... In this way Buddhism which had been nerely the creed of a local Indian sect became one of the chief religions of the World—may be said to have changed the faiths of the World."

. Vincent Smiths "Ancient India."

স্বরূপ লইয়া, পূর্ব্বের স্থায় একখানি বাণিজ্য তরীতে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে কয়েকটী ঘোর জঙ্গলে পূর্ণ দ্বীপে এবং সিংহলে নামিয়া ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য ও ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া তখনকার শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার অর্জ্জিত বিদ্যার আলোচনার বেশ সুযোগ হওয়ায় দীপঙ্করের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। ঋষিতুল্য পণ্ডিত শান্তি, নরোপন্থ, অবধুতী, তন্বী প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তখন মগধে বাস করিতেছিলেন। দীপঙ্কর তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্ম শাস্ত্রালোচনায় কিছুদিন বিক্রমশিলা বিহারে কাটাইয়া, পরে সেখান হইতে নিভৃত স্থানে গভীর চিন্তা জন্ম বজ্রাসনে গিয়াছিলেন। মগধে অবস্থানকালে তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও মহাপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া সকল শ্রেণীর লোক একমত হইয়া তাঁহাকে জননায়ক স্বীকার করিয়া, সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাঁহাকে মগধের বৌদ্ধ ধর্ম্মসঙ্ঘের সভাপতি পদে বরণ করিয়া সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। পরে তিনি কিছুকাল বজ্রাসনে আত্মচিন্তায় কাটান। বজ্রাসনে যখন ছিলেন, তখন ভিন্ন মতাবলম্বী তীর্থিক পণ্ডিতগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রের বিচারে লিপ্ত হইতেন। ক্রমে তিনি তিনবার তাঁহাদিগকে মহাবোধি মন্দির প্রাঙ্গণে বৃহৎ সভামধ্যে পরাজয় করিয়া, মগধে অপর সকল ধর্ম্মের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা স্তায়পাল তাঁহাকে অতি আদরের সহিত বজ্রাসন হইতে আনাইয়া তাঁহার পিতামহ দেবপাল প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বিক্রমশিলা বিহারের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পূর্ণ এবং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা জন্ম তাঁহাকে বিহারের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া জগদ্গুরু পদে অভিষিক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ৫০ উত্তীর্ণ হয় নাই। ১০৩০ খৃঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী স্তায়পাল মগধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দীপঙ্করের পাণ্ডিত্য এবং সকল বিভাগে তাঁর অভিজ্ঞতা দেখিয়া রাজ্যশাসন ইত্যাদি সমস্ত জটিল বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়ে ও তাঁহার দূরদর্শিতা, লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে কনৌজের রাজা বহু সৈন্ত লইয়া মগধ আক্রমণ করেন। রাজা স্তায়পাল তেমন প্রস্তুত না থাকায় হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পরাজিত হন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্গে অবস্থান করিয়া কর্ত্তব্য স্থির জন্ম সকল মন্ত্রিগণের এবং দীপঙ্করের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এদিকে শত্রুসৈন্ত রাজধানী অবরোধ করিয়া নগরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অবস্থান করিতে থাকে। অবরোধের ফলেই মগধরাজ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন কনৌজ রাজের ইহা আশা ছিল। কিন্তু মন্ত্রী ও দীপঙ্করের পরামর্শে রাজা যথেষ্ট পরিমাণ বলসঞ্চয় করিয়া প্রচণ্ড বেগে শত্রুসৈন্ত আক্রমণ করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। তখন পরাজিত কনৌজেশ্বর মগধরাজের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন। রাজা স্তায়পাল নগর রক্ষা এবং এই সন্ধি বিষয়ে দীপঙ্করের সুপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে উভয় রাজ্য চিরবন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কথা যে দীপঙ্করই উভয় রাজার মধ্যে সখ্যস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ; এবং তাঁহারই রাজনীতি জ্ঞানের ফল স্বরূপ * তাঁহারই সাহায্যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়া উভয় রাজ্যের অধীশ্বর কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিলেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ।

---

* "A. D. 978 to 1030 at the time when King Mahipal was ruling the destinies of Maghada, Dipankar Srijnana had already acquired the fame of being the first Budhist scholar of India. The King invited Dipankar to Maghada from Vajrasana. The Buddhists of Maghada now acknowledged him as their chief and unanimously declared him to be the Hierarch of Maghada. Nayapal ascended

অমিল

বসন্ত এসেছে নিখিল ভুবনে,
আকাশের নীলে, মলয় অনিলে,
কোকিলের কাকুতি-ভাষায়,
কুসুমের উন্মুখ আশায়,
পুলক আকুল চরাচরে।
শুধু আজ নয়নে ও মনে,
আজিকার এই শুভক্ষণে
এক সাথে নাহিক সঞ্চরে,
সে এক অবাধ আলো, অবোধ সলিলে
অকস্মাৎ মধুরূপ কে গো মুছে নিলে?

চারি ধারে, বারে বারে,
কুসুম নোয়ায় মাথা, চরণ ছোঁয়ায়,
মলয় ফিরিয়া ঘরে যায়!
পূবের বাতাস, আকাশ ধনুকে আঁটি
ঝটিকার ছিলা,
লুকায়ে আছিল কোথা দূরে পরিপাটী—
খুঁজিয়া অছিলা—
দেখি মেঘে, বায়ুবেগে
দেখা দিল সমুখের পথে ছুটে এসে,
পুষ্পমেলা ওই হায়, ভেঙে যায় ভেসে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা

ভারতীয় সঙ্গীত-কলা

মানব ইতিহাসের প্রথম যুগ হইতে সুসভ্যদেশ মাত্রেই সঙ্গীতের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। প্রাচীন ভারতীয়, গ্রীক্ ও রোমীয় সভ্যতার যুগে সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব লক্ষিত হইত। সেই সময়ে,—যখন লিখন-প্রণালী সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয় নাই, তখন সঙ্গীতই ছিল শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রচারের প্রধান উপায়। রাজপুতনার ভট্ট কবিদের কথা অনেকেই জানেন,—সেইরূপ প্রায় সকল দেশেই সঙ্গীত-ব্যবসায়ী জাতিরা তাহাদের গানের ভিতর দিয়া পুরুষানুক্রমে ইতিহাস ও কাব্যাদি সমগ্র দেশে প্রচার করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় ভূম্যধিকারিগণ ভারতীয় নৃপতিদের ন্যায় কালোয়াত এবং ওস্তাদগণকে ধনসম্পত্তি দ্বারা পালন ও সংরক্ষণ করিতেন। এইরূপ রাজা মহারাজাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সাধারণ জনগণ সঙ্গীত শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিত। যাহা হউক, এই যুগে আর সেই যুগে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

ভারতীয় সঙ্গীতালোচনার প্রথম যুগের সহিত

---

the throne of Maghada in 1030 A. D. At his request Dipankar accepted the post High Priest of Vikramsila. At this time Maghada was invaded by the King of Kanouj. Nayapala's armies first suffered defeat, but was victorious at last, when his enemy sued for peace, and a treaty was signed by which friendship was established between the two kingdoms. At this time Dipankara was not only the High Priest but a trusted Councillor. In this treaty Dipankara took an active part. It was he who brought about a reconciliation between the King of Kanouj and Nayapala."

V. Smith—Ancient India.
S. Das from Beal's.

অধুনাতন যুগের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সুদীর্ঘ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর এবং সুর, তাল, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে সঙ্গীতের অবস্থা ক্রমেই অবনত হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ অতি প্রস্ফুট,—অধীনতার নাগপাশ ভারতীয় নরনারীকে ক্রমশঃই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে ; দিন দিন তাহাদের রুচির পরিবর্ত্তন, শারীরিক ও মানসিক বলের অভাব, এবং সাংসারিক অভাবের আধিক্য ঘটিতেছে। নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ভেদের কারণ সঙ্গীতের এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। বিশেষতঃ বিদেশীয় শাসনশক্তির নিকট হইতে সঙ্গীতকলার উৎকর্ষের নিমিত্ত কোন সাহায্যই পাওয়া যাইতেছে না।

ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র আলোচনা করিতে হইলে বর্ত্তমান যুগকে বাদ দিয়া অতীত যুগের কথা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। কারণ, ঐ যুগেই ভারতীয় সঙ্গীতকলা উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি সমবায়ে তৌর্য্যত্রিক বা সঙ্গীতবিদ্যা নামে অভিহিত। সঙ্গীত-বিদ্যার মধ্যে গীতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১ গানের শক্তি অতি আশ্চর্য্য। প্রাচীন ঋষিগণ যখন তাল, মান, লয়ের সহিত সঙ্গীত সাধন করিতেন, তখন বনের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হইয়া সেই গীতরস পান করিত। কথিত আছে, গ্রীস দেশীয় গায়ক অর্ফিয়স্ যখন বীণা সংযোগে গান ধরিতেন, তখন নদীর জল অকস্মাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইত, আকাশ-বাতাস স্তব্ধ হইয়া তাঁহার গান শুনিত, বনের পশুগণ ক্ষণকালের জন্ম আহার ও হিংসা ভুলিয়া যাইত। গানের সঙ্গে সঙ্গে গায়কদের চিত্তে ভাবের তরঙ্গ বহিয়া যাইত। এই শ্রেণীর ভারতীয়গণের মধ্যে সম্রাট্ আকবরের সভাসদ্ মিঞা তানসেন, রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ জয়দেব, উদয়পুরের মহারাণা কুম্ভের পত্নী মীরাবাই, সুরদাস, আমীর খস্রু, দোঁহাবলী রচয়িতা তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, নিধিরাম প্রভৃতির নাম বিশেষে ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের মোটামুটি সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। আকাশ হইতে নাদ অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি হয়। এই ধ্বনিই গানের প্রধান উপকরণ। নাদ দুই প্রকার,—বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠতালুর সহায়তায় যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাহাই বর্ণাত্মক। দুই প্রকার দ্রব্যের পরস্পর আঘাতজাত যে বিশেষ শব্দ, তাহাই ধ্বন্যাত্মক। এই বর্ণাত্মক অথচ স্নিগ্ধ ও রঞ্জনগুণ বিশিষ্ট ধ্বনিকেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে স্বর অথবা সুর বলা হয়। ২ সুর সাত প্রকার ; তাহার নাম যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ। অঙ্কশাস্ত্রে যেমন প্রথম নয়টি অঙ্ক এবং শূন্যই মূল ভিত্তি, তেম্‌নি এই সুর সপ্তকই গানের মূল উপাদান। মূল গীত-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে এই সাতটি সুর যথাক্রমে ময়ূর, বৃষ, ছাগ, শৃগাল, কোকিল, অশ্ব ও হস্তীর সুর অবলম্বনে গৃহীত হইয়াছে। এই সুর সপ্তকের উচ্চ গতির নাম অনুলোম ও নিম্ন গতির নাম বিলোম। সুর তাল সংযুক্ত হইয়া কণ্ঠে অথবা যন্ত্রে উচ্চারিত ধ্বনিই সঙ্গীত। ৩ নাভি, বক্ষ ও মস্তক হইতে যে সুরসপ্তক উচ্চারিত হয়, তাহাদের নাম উদারা, মুদারা এবং তারা। গীতের চারিটি পদ,—অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। গীত দুই রকমের,—কণ্ঠ্য ও যান্ত্রিক। অনুলোম ও বিলোমের দ্বারা রাগাদির সম্যক্ বিস্তারের নাম তান। রাগ ছয় প্রকার, যথা—শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত, মেঘ ও নট-নারায়ণ। প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়া রাগিণী। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ রাগিণী,—ভৈরবী, বিভাষ, আলা-হিয়া, দেবগিরি, কুকুভা, বাগেশ্রী, বাহার, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, ললিত, ভূপালী, জয়-জয়ন্তী, মুলতান, মল্লার পূরবী, অহং, বেহাগ, কাফি, মিশ্র, কালাংড়া, আশোয়ারী, জংলা, টোরী, রামকেলী, ইমন, সিন্ধু

(১) "গানাৎ পরতরং ন হি।"

(২) "যথা স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে।"

(৩) "ধাতু-মাত্রা-সমাযোগঃ গীত ইত্যভিধীয়তে।"

গৌরী, দেওগিরি, সরফরদা, তুরু, মোহিনী ইত্যাদি। গীতের ছন্দানুযায়ী কালবিভাগের নাম তাল। গীতের যে যতি তাহাকেই লয় বলে। ৪ গানের সময় যেখানে তালের সঙ্গতি হয়, তাহাকেই সম্ বলা হয় এবং যে স্থান হইতে তাল আরম্ভ হয়, তাহার নাম ফাঁক। এই তালের প্রারম্ভ হইতেই গান আরম্ভ করিতে হয়। বাদ্য গীতের অনুগামী। বাজ্‌না ও গানের সুরে শব্দের ওঠা নামা এবং সরল ও বক্রগতি সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রত্যেক সুরের সঙ্গে সঙ্গে শরীর যথারীতি হেলাইয়া দুলাইয়া তালানুযায়ী পাদক্ষেপের নাম নৃত্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ভাষায় পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য বলা হয়। সর্ব্বাগ্রে তা, দিৎ, থু, ন্না,—এই চারিটি তালের বোল উৎপন্ন হয়। এই চারিপ্রকার তাল হইতে এক্ষণে চৌতাল, খটতাল, ধামাল, কাওয়ালী, মধ্যমান, তেওরী, ঠুংরী, ঠেকা, আড়াঠেকা, তিওট, যৎ, খেম্‌টা, ঢিমেতেতালা, ত্রিতালী, একতালা, পোস্তা, অদ্ধা, সোয়ারী প্রভৃতি বাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রত্যেক রাগ-রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। আজকালকার দিনে সকল বিষয়েই মানুষের ভিতর একটা কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়। আগেকার যুগে মানব-হৃদয় কুটিলতা ও কৃত্রিমতা পূর্ণ ছিল না। তাহাদের হৃদয় প্রাকৃতিক ভাবে সতত পরিস্ফুট থাকিত। এই জন্যই প্রাচীন কবিগণের পদাবলী নীরস কিংবা কষ্ট-কল্পিত হইত না। যে যুগের মানব ভারতীয় গীতি-কলার চরম উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিশুর মত সরল হৃদয় প্রকৃতির লীলা-ভূমি ছিল বলিলেও চলে। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইত, সেখানেই তাঁহারা সযত্নে সামঞ্জস্য বিধান করিতেন। এমন কি দৈনন্দিন ব্যাপারেও তাঁহারা স্বভাবের অনুসরণ করিয়া চলিতেন। সঙ্গীত-কলাতেও আমরা তাহার পরিচয় পাই। যে সময়ে যে সুর-তাল-মান-লয় সব চাইতে স্বাভাবিক হইবে, প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যগণ তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। যেমন,—প্রত্যূষে রামকেলী, ভৈরবী, বিভাষ; মধ্যাহ্নে সিন্ধু, সারঙ্গ; অপরাহ্নে মুল্‌তানী, পূরবী, পিলু; সন্ধ্যায় গৌরী, শ্রীরাগ; নিশীথে খাম্বাজ, বেহাগ এবং উষাতে ললিত রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়।

এইরূপ গানের ছন্দে প্রকৃতির অনুসরণ করিতে আর কোনও দেশের কবি ও গায়ক পারিয়াছেন কি না জানি না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা নীল আকাশের উজ্জ্বল প্রভা, অভ্রভেদী শৈলমালার বিরাট গাম্ভীর্য্য, অসীম সাগরের ভৈরব কল্লোল, গিরি-নির্ঝরের ঝর্ ঝর্ ধ্বনি, গভীর অরণ্যের বিরাট স্তব্ধভাব ও বন-কোকিলের মর্ম্মস্পর্শী কূজন—সমস্ত হৃদয় দিয়া সম্ভোগ করিতেন। সেই অনাদি কবি ভারতীয় প্রাচীন ঋষিদের দ্বারা এই অপার্থিব গীত-কলা প্রচার করেন। সেই যুগে এই গীত-শাস্ত্রের চরম উন্নতি লাভ হইয়াছিল। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই কলার এতদূর সমাদর করিতেন যে, তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।"

ক্রমেই ভারতীয় গীতি-কলা রূপান্তরিত হইয়া পড়িতেছে। অধুনা অনেকেই দেশীয় সঙ্গীত ছাড়িয়া বিদেশীয় সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নোটেশন বা স্বরলিপি ও হারমণি (Harmony) লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতেছেন। ইহা দেশের পক্ষে ভাল কি মন্দ, কে বলিবে? তবে বিদেশী সঙ্গীত চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থিগণ দেশীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গেলে তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতবর্ষ চিরকালই সঙ্গীতের দেশ। এখানকার জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে অবিরাম গীত ধ্বনিত হইতেছে। ভারতীয় কবির ভাব-ধারায় গীতের উৎস ঝরিয়া পড়ে। আমাদের কবিও এই গীতের সন্ধান দিয়াছেন—

(৪) "লয়ঃ প্রবৃত্তিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে।"

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে—
বহিয়ে যায় সুরের সুরধুনী।"

সৃষ্টির প্রথম যুগে ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে যে গান উঠিয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত সেই সুধা-ধারা প্রকৃতি জগতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পুরাকালে সঙ্গীতাচার্য্যগণ সেই সুরকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেন, প্রকৃতির গানের সঙ্গে আত্ম-হারা হইয়া গাহিতেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত, তাঁহারা যেন কোন্ এক স্বপ্ন-লোকে চলিয়া যাইতেন। অধুনা ভারতীয় কবি সেই অদৃশ্য সুরের সন্ধান দিতেছেন—এই জড়-জগতে সঙ্গীতের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু সেই সুরকে জাগ্রত করিয়া তুলিবে কে? ইহার উপাসক কোথায়? ভারতের যাহা কিছু প্রাচীন গৌরব সবই রহিয়াছে,—কিন্তু সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্ত সাধনার প্রয়োজন; এই লুপ্ত গরিমা ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত একাগ্রতা আবশ্যক। জানি না, কতদিনে আবার ভারতবর্ষে তানসেন জয়দেবের উদ্ভব হইবে, প্রাচীন সঙ্গীত-কলা আবার সজীব হইয়া উঠিবে।

শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবর্ণ রেখা

স্মৃতির সুবর্ণ রেখা, সাগর বাহিনী,
উষর বালুর 'পরে স্বর্ণ রেণু দীপ্তি করে,
আলোর নীরব কথা অন্তর কাহিনী!

কভু লীন ক্ষীণ তনু সৈকত শয়নে,
আছে কিনা আছে ধারা, ভাষায় দেয়না সাড়া,
মন্থর অন্তর গতি পড়েনা নয়নে!

কভু জাগে কুলু কুলু লহরী মুখর,
তরঙ্গের বাহুভঙ্গে, কে যেন সন্তরি রঙ্গে
আলিঙ্গন লাগি ধায়, জাগিয়া প্রহর!

ব্যথার আবেগ কভু সামালিতে নারি,
গর্জ্জিয়া অশান্ত স্রোতে, নামে শৈল শির হ'তে,
আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে বক্ষ আপনারি!

মরণের ভীম কান্তি নেত্রে ওঠে ভাসি,
জীবনতটের রেখা, আর তো যায় না দেখা
সীমাহীন পারাবারে প্রাণ পরবাসী!

২।১০।২৭
রাঁচি-পথে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

(২য় পত্র)

শ্রীমান্ অশোকনাথ, কল্যাণবরেষু—

দেরাদুন সহরটি একেবারেই আধুনিক। এর মধ্যে নূতনত্ব বিশেষত্ব কিছুই বড় দেখছি না। জসিডি প্রভৃতি আধুনিক সব যেমন, সেই গোছেরই। হাজারিবাগের সঙ্গেও অনেকটা মিল আছে, তবে সাহেবী পাড়াগুলো তার চেয়ে জমকালো এবং সব শুদ্ধ জড়িয়ে সহরটাও বেশ বড়। হাজারিবাগের মত ছোট নয়, রাস্তা ঘাট তরতরে ঝরঝরে, চওড়াও খুব। দু'ধারে ছোট বড় বাগানবাড়ীগুলি, চিত্রাঙ্কিতবৎ সুদৃশ্য। আর একটি জিনিষের এখানে প্রাচুর্য্য—সেটি গোলাপ গাছের, বিশেষ ক'রে নানা রঙের গোলাপ লতার। এই গোলাপ লতাগুলি দেখবার মত জিনিষ বটে! প্রত্যেক বাড়ীর ফটকের মাথায় মাথায় অসংখ্য ফুলে ভরা নানা রঙের গোলাপের লতাগুলি যেন রাস্তা পথ আলো করে আছে। ফুল এখানের কোন গাছে এক-আধটা ফোটে না, থোলো থোলো হয়ে ফুটে থাকে—তা' সে কি লতায় কি গাছে। লতানে গোলাপ এখানে দু'রকম দেখা যায়,—এক, এক-পাপড়ীর, আর একরকম খুব ছোট ছোট, মোমের বা গটাপার্চার ফুলের মতন অনেক পাপড়িযুক্ত, ভারী চমৎকার দেখতে। সমস্ত ফুলই নয়সৌ জাতীয় গোলাপের মতন স্তবকে স্তবকে তোড়া বাঁধা হয়ে ফুটে থাকে, তাতেই অত বাহার! আমাদের এই 'ঝেলি লজের' বাগানেও গোলাপ ফোটার হিসাব নেই! গাছ গুলোর ডাল-পাতার রং যে সবুজ, সে যেন এখানে খুঁজে বের করতে হচ্চে, ওর সমস্তটাই ফুলের রঙে সাদায় লালে রঙীন হয়ে গেছে। বাস্তবিক এ দেশটাকে গোলাপের রাজ্য বল্লেও মন্দ হয় না!

ইউক্যালিপ্‌টস্ গাছ যতদূর উঁচুতে মাথা তুলতে পারে, তা' তুলে রেখেছে। এ দেশের গাছেদের মাথাই একটু বেশী উঁচু। বাঁশ ঝাড়গুলো যদি দেখ, অবাক হয়ে যাবে। এক একটা ঝাড়ের বাঁশ আবার এম্‌নি মোটা, আমাদের বাংলা দেশের সুপারি গাছের মতন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আবার আর এক জাতীয় বাঁশ আছে, তাদের ঝাড়গুলি সরলোন্নত সমানই বটে, কিন্তু সেগুলি কঞ্চির মতন সরু এবং আখের খাদির মতন আঁক দেওয়া দেওয়া, দেখলেই তোমার একটা সংগ্রহ করে লাঠি তৈরি করবার সাধ যে হ'তো, তাতে আর সংশয় নেই। আচ্ছা, এখানের আর একটা জিনিষ দেখলেও তুমি কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে!—কি বল ত? এখানের আকাশে উত্তর দিকে অনেকগুলো অতিরিক্ত নক্ষত্র ওঠে, যা তোমরা দেখতে পাওনা! এটা খুব আশ্চর্য্য নয় কি? এ থেকে তোমার মনে পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে একটু সন্দেহ দেখা দিচ্চে, না? আচ্ছা, সেগুলো কোথা থেকে এখানে এল বল ত? তাই সে কি দু'একটা! দেওয়ালীর আলোর মালার মতন ঝাঁক-বাঁধা, আবার সপ্তর্ষির মতন, এক সঙ্গে জটলা পাকানো তাও আছে—নানা আকার, বিভিন্ন ভঙ্গী। বুঝতে পারচো না ত? আচ্ছা, তাহলে বলাই যাক্। না হলে তোমার মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে হয়ত বা তুমি এই নিয়ে বিষম একটা তর্কই লাগিয়ে দেবে আবার! যে তার্কিক তুমি! এগুলো মসুরি পাহাড়ের আলো। হঠাৎ দেখতে এমন মজা লাগে, মনে হয় যেন হোয়াই-জনের কাছটায় কতকগুলো নক্ষত্র গড়িয়ে এসে জমে রয়েচে। তুমি এলে নিশ্চয় রোজ সন্ধ্যাবেলা তাই দেখতে এই ময়দানটায় এসে হাজির হতে!

আচ্ছা, আর কি দেখতে তোমার ভাল লাগতো? কৈ বিশেষ কিছু তেমন তো,—হ্যাঁ ঠিক কথা! ঐ যে ইষ্ট কেনাল নাম দেওয়া বাঁধান নালাটা কোন্‌খানকার ঝরণাকে বেঁধে এনে অর্দ্ধেক সহরের জল যোগাচ্চে,

আমাদেরই বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে রাস্তার ওধার ধ'রে সে চলে গেছে, সেটা তুমি দিনের মধ্যে কতবার দেখতে যেতে বল তো? উঁচু থেকে সে বেশ একটু কল্লোল শব্দে গর্জ্জে নেমে চলেচে। স্রোতটুকুও বড় মন্দ নয়। বার কতক যেতে বৈকি! না? তোমার রাঙ্গাদাদাও তাই করচে। স্বস্তি বড় নেই তাদেরও। আর আশা করচে যে, গাড়িবারান্দার থামে জড়িয়ে যে আঙ্গুর লতাটা ফুলে ভ'রে উঠেছে, ওটার ফল তারা না খেয়ে এখান থেকে যাচ্ছে না। ফুল থেকে ফল ধরতে কতটুকু দেরি সে তারা দুবেলাই তদারক করে।

এখানে বাঙ্গালী পরিবার সংখ্যায় নিতান্ত কম না হলেও, সবাই এখানকার স্থায়ী লোক নয়। কিছু চাকুরে বাঙ্গালী এবং অনেকেই আমাদের মতন কুম্ভ স্নানের উপলক্ষ্যে সমাগত বাঙ্গালী। এই দুই দলে মিলে গিয়ে একটু বর্দ্ধিত সংখ্যা হয়ে পড়েছে। এখানের বাঙ্গালীদের মধ্যে কিন্তু বেশ একটু উৎসাহ দেখলাম। এঁদের একটি সাহিত্য-সভা আছে, নিজস্ব বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী আছে, এখানে নাকি দুর্গা পূজাও হয়েছিল। আমার সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ও ভদ্র মহিলার নিজগুণে খুব সদ্ব্যবহার করচেন। প্রথমেই তাঁরা দেখা ক'রে গিয়ে, বাড়ীর মেয়েদের পাঠিয়ে দেন। বিমলাবাবু লাইব্রেরী থেকে মাসিক-পত্র প্রথম মোড়া খুলেই আমায় পাঠান, ভারী ভদ্রলোক এঁরা।

আমাদের সাম্‌নেই রমণীমোহন বাঁড়ুযো ইঞ্জিনীয়ার থাকেন। ছেলেটিকে প্রথম দেখেই বড্ড স্নেহ হল, তোমার দিদির বয়সী—কি বছর দুইএর বড়ই হবেন। বিলাতে পাশ, কিন্তু স্বভাবটি বিলিতি হয়নি। তাঁর মাকে দিদি বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই মতন স্নেহপ্রবণ স্বভাব। —এখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হচ্চে। আচ্ছা, তুমি শুণে যেও। এক নেপাল ধর—"ওগো তোরা আমাই দেখ্‌সে আয়"—গ্রামোফোনের সেই গানের গায়ক। তোমার দিদির বিয়ের স্ত্রী-আচারের সময় এই গানটাই গেয়েছিলেন। আমার বাবার বড় ভক্ত। বৃদ্ধ দেখা করতে এসে কত চোখের জল ফেল্লেন। দুই—পুসার ডাক্তার যতীন সেন পি, এইচ-ডি, পি আর এস—তাঁর বাড়ীর মেয়েরা। তিন—কলকাতার অ্যাডভোকেট জেনারেল'—এঁর সহপাঠি—বি, এল, মিত্রের মা। তাঁর দাদা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র, তাঁর স্ত্রী প্রভৃতি। আরও যাঁদের সঙ্গে দেখাহ লো তাঁদের বুঝিবা তোমরা কেউই চেন না—তাই নাম লিখলুম না। কাশীর চেনাও অনেকে আছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতা এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্রের ভাগবত ব্যাখ্যা, ডাক্তার সেনের ওখানে শোনা গেল। তোমরা ভাল আছ ত? শীঘ্র শীঘ্র খবর যেন পাই। আশীর্ব্বাদ নিও এবং তোমার বৌদি কণুকে দিও।—তোমার মা।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

পুনর্জ্জন্ম

(উপন্যাস)

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সাগরিকার মোকদ্দমা হাইকোর্টে উঠিল। এক ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব যখন বসিলেন, তখন শুধু দেবকুমার কেন, অনেকেই মনে করিলে যে সাগরিকা মুক্তি পাইবে। কিন্তু তাহা হইল না—সেসন জজের রায়ই বহাল থাকিয়া গেল। অর্থের অভাবে যে কয়জন কয়েদী আপিল করিতে পারে নাই, খরচ-পত্র করিয়া দেবকুমার তাহাদের মোকদ্দমাও হাইকোর্টে তুলিয়াছিল। তাহারা সকলেই খালাস হইয়া গেল।

কাংড়া উপত্যকার মেষপালক

(কাংড়া চিত্র)

যুক্ত অজিত ঘোষ—চিত্র সংগ্রহ হইতে

Engraved and Printed by
King Halftone Press, Calcutta

এক চক্ষে জল ও আর এক চক্ষে হাসি লইয়া দেবকুমার উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। একখানা জাহাজের চোঙ্গার মুখে তখন হু হু করিয়া ধুম বাহির হইতেছিল। দেবকুমারের মনে হইল, বুঝি উহা কয়েদীদের লইয়া আন্দামানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

দেবকুমার কিছুক্ষণ প্রিন্‌সেপ্‌স ঘাটে যাইয়া বসিল বটে, কিন্তু কোনো-কিছুই বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিল না। একটা চিন্তা শেষ না হইতেই আর একটা আসিয়া তাহার মনে উঠিতে লাগিল। দেবকুমার যে কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া ছিল তাহা সে জানিল না। একখানা জাহাজের মোটা বাঁশী ভোঁ-ও-ও করিয়া ডাকিয়া উঠিল। স্বপ্ন দেখিবার পর মানুষ যেমন হঠাৎ জাগে, বাঁশী শুনিয়া দেবকুমারও ঠিক সেইরূপ জাগিয়া উঠিল এবং বরাবর গঙ্গার ধার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে দেবকুমার তাহা জানিত না। পথে মোটরকার ছুটিয়াছে, জুড়ীগাড়ী হৈ হৈ করিয়া চলিয়াছে, ট্রাম দৌড়াইতেছে—লোকে হাঁটিতেছে, ছুটিতেছে, দাঁড়াইয়া হাসিয়া কলরব করিতেছে—কিন্তু এত বড় একটা অবিচার যে আজ হাইকোর্টে ঘটিয়া গেল, তাহাতে কাহারো দিনের কাযের এতটুকুও ওলোট-পালোট হইল না! দেবকুমার ব্যথিত হইল। ভাবিল, পৃথিবীর মানুষ গুলাই যেন এক রকম—দয়ামায়া হারাইয়াছে, ন্যায় ধর্ম্ম ভুলিয়াছে—দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া জয়ী হইবার জন্য সকলেই উন্মুখ!

একদিন সাগরিকাও ঠিক এমনিই ভাবিয়াছিল।

চলিতে চলিতে দেবকুমার দেখিল, সম্মুখেই হাওড়ার পোল। পোলের উপর জলের স্রোতের মত লোকের স্রোত চলিয়াছে, গাড়ীর স্রোত চলিয়াছে। কাহারো জন্য কেহ এতটুকুও অপেক্ষা করে না। একদিন এই পোলের উপর দাঁড়াইয়া সাগরিকাও এই সবই দেখিয়াছিল। সে-ও দেখিয়াছিল, নীচে জল ছুটিয়াছে, উপরে জীব ছুটিয়াছে—তুমি মর আর বাঁচো, কেহ তোমাকে শুধাইবে না।

পোলের উপর দিয়া ধীরপদে হাঁটিতে হাঁটিতে দেবকুমারের মনে পড়িল ঘোলাডাঙ্গার হরমণির কথা। সাগরিকা বলিয়াছিল, প্রথমে সেইখানে আসিয়া সে কঠিন রোগে শয্যা লইয়াছিল—সেইখানেই দেবকুমারের শিশু, আপন জীবন দিয়া পিতৃঋণ শুধিয়াছে!

এতক্ষণে দেবকুমার একটা কায হাতে পাইল। সে হরমণির খোঁজে ঘোলাডাঙ্গার দিকে চলিল। পাড়ায় যাইয়া যখন সে ঘরে ঘরে হরমণির খোঁজ করিতে লাগিল, তখন দেখিতে পাইল, পৃথিবীর যত দারিদ্র্য, যত দুঃখ, যত পাপ, যত ব্যাধি বোধ হয় সকলই আসিয়া সেইখানে আশ্রয় লইয়াছে।

বালক বালিকা, যুবতী বৃদ্ধা সকলেই যে কৌতূহলী হইয়া দেবকুমারের দিকে চাহিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে পণ করিল যে, হরমণিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। দেবকুমার যখন প্রত্যেক ঘরে হরমণির নাম করিতেছিল, তখন একখানা ভাঙ্গা খোলার ঘরের ভিতর হইতে কাকের ন্যায় কর্কশকণ্ঠে একজন বলিল—"কি গা, কাকে চাও?"

দেবকুমার কহিল, "আমি হরমণিকে চাই।"

পরক্ষণেই একচক্ষুহীনা একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তীরের মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মূর্ত্তি দেখিয়া দেবকুমার শিহরিয়া উঠিল। কহিল, "তুমিই কি হরমণি?"

"আমি যে হরমণি, এ পাড়ায় তা কে না জানে মোশাই! কোনো কথা থাকে যদি এস—বসবে এস।" বলিয়া হরমণি একটী কঙ্কালসার শিশুর হাত ধরিয়া পা বাড়াইল।

দেবকুমার কহিল, "সাগরিকা বলে' একটী মেয়ে মানুষকে কি তুমি জানতে?"

কোটরগত চক্ষু আরও কোটরে প্রবেশ করাইয়া হরমণি বলিল—

"সাগরিকা? কৈ না? মনে পড়ে না ত!"

"তোমারই ঘরে তার বড় ব্যারাম হয়েছিল। যদি সব খবর বলতে পারো, এখনি টাকা পাবে।"

বৃদ্ধা তাঁহার 'শণের নুড়ী'গুলি এক হাতে একবার

টানিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ—হয়েছে—মনে পড়েছে। সেই ছুঁড়িটে বুঝি—যার একটা চোখ একটু টেরা—ধব্‌ধবে গায়ের রং ?"

"হ্যাঁ—সেই।"

হরমণি দুঃখ জানাইয়া কহিল, "আহা, তার কথা আর মনে নেই ! খুব আছে। তার যখন অসুখ হলো, কত যে আমি কেঁদেছি। সে বল্‌তো বটে, একজন বড়মানুষের ছেলের নজরে পড়েছিল—বেশী দিন থাকতে পারে নি, তাকে সবাই তাড়িয়ে দিলে।"

কম্পিত কণ্ঠে দেবকুমার কহিল, "আমিই সেই।"

হরমণি একটুও বিস্মিত হইল না। কহিল, "তার মুখেই শুনেছি, একশোটা টাকা তুমি তাকে দিয়েছিলে। তার বেশী আর কি করবে ব'ল! গরীবের মেয়ের আবার দাম কত ? ক'জনেই বা অত দেয়! ছুঁড়ি বুঝি রাগ-টাগ করে' বেরিয়ে এসেছিল ?"

দেবকুমারের সম্মুখে যদি তখন বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও সে বোধ হয় অত চমকিত হইত না, হরমণিও কথায় সে যত হইল। দেবকুমার ভাবিতে লাগিল, এই কি আমাদের সমাজ, গরীব যেখানে তেল-নুনের দামে বিকায় ? নারীর মান যে কোথায়, সমাজের অত্যাচারে গরীবের মেয়ে সেটা পর্য্যন্ত আর বুঝিতে পারে না!

হরমণি বলিতে লাগিল, "যখন হ'য়ে বয়ে গেল, সাগরিকা ত তখন অজ্ঞান। তার উপর আবার কি বিষম খেঁচুনি! আর সে জ্বরের কথাই বা কি বোলবো! ধম্ম জানে, ডাক্তার বদ্যির এতটুকুও হেলা করিনি। তবে ত সে বাঁচলো।"

শুষ্ককণ্ঠে দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর ?"

"একটা ছেলে হয়েছিল বাবু। সে কি ছেলে, যেন রাজপুত্তুর! টানা-টানা চোখ, কোঁকড়ানো চুল মাথা ভরা গোলগাল হাত পা। আর মুখখানা ? এই অনেকটা তোমারই মত। মা মরে—আমিই তখন সে সোনার চাঁদকে তুলে' নিলাম।"

দেবকুমারের মনে হইল, তাহার পা দুইখানা টলিতেছে। সে মুখ তুলিয়া হরমণির দিকে চাহিল। হরমণি বলিতে লাগিল, "তখন আমাদের পাড়াতেই একটা মাগী থাকতো—নামটা আবার আমার মনে থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই কেষ্টার মা। ছেলে কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে পালতো।"

দেবকুমার বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ বলিল, "বল কি ?"

একটু হাসিয়া হরমণি বলিল, "তা আর জান না বাবু ? —ছেলে মেয়ের ভাবনা কি ? আমরা অমন কত পাই। কলকাতায় যারা কুড়োনো ছেলে মানুষ করে, তারা এসে খুঁজে খুঁজে নিয়ে যায়। আমি আর তখন পারি কি ? সাগরিকার ছেলেকেও কেষ্টার মার কাছে দিয়ে এলাম।"

উত্তেজিত দেবকুমার বলিল, "তার পর—তার পর ?"

"দিন পনেরো বুঝি সেখানে ছিল। তার পরই শুকিয়ে উঠতে লাগলো।"

"কেন ?"

"দুধ ত আর পায়নি। সাবু বার্লির জলে কি আর শরীর থাকে ?"

ধরা গলায় দেবকুমার বলিল, "তোমাদের এখানে কি দুধ নেই ?"

হি হি করিয়া হাসিয়া হরমণি বলিল, "দুধ থাকবে না কেন বাবু—কত চাও তুমি ? গরীবের ছেলে আবার দুধ খেয়ে মানুষ হয় ? তারা খায় বার্লির জল আর আর জল মেশানো ভাতের ফেন! ওরা শুধু কাণেই শোনে যে লোকে গাইয়ের দুধ খায়। মিথ্যে বলবো কেন বাবু—দু'পা এগুলেই ত গঙ্গা! কেষ্টার মা যতদূর পারে তা করেছিল। কিন্তু সে ছেলে কিছুতেই থাকলো না—শুকিয়েই মরে' গেল।"

দেবকুমার আর সেখানে দাঁড়াইল না। একেবারে বাসায় ফিরিয়া নিজের ছোট ঘরটীর মধ্যে অন্ধকারে শুইয়া পড়িল। তাহার অন্তরটা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—শুধু যে তাহার নিজের সন্তানের জন্য তাহা নয়—বাঙ্গালা দেশের গরীবের শিশুদের জন্য। সে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল, বাঙ্গালী মরিতেছে। বার্লির জলে যাহার শোণিত ও অস্থি গড়িয়া উঠে, যৌবনের কোটাতেই যে সে কেমন করিয়া পৌঁছায়, এই কথাটা আজ দেবকুমারের

কাছে সকল অপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বাঙ্গালীর শিশু বার্লির জল খাইতে খাইতে শুকাইয়া মরে। কেন? দুধ নাই। দুধ নাই কেন? সবল ও সুস্থ গাভী নাই। নাই কেন? গ্রামে আর গোচারণ ভূমি দেখা যায় না—পর্য্যাপ্ত ঘাস নাই। দেবকুমার ভাবিতে লাগিল, গোচারণ ভূমি কি তবে কর্পূরের মত উবিয়া গেল? না, তাহা যাইবে কেন? জমীদার যে খাজনার প্রজা বিলি করিয়াছে। দেবকুমার শুইয়া ছিল, বেগে উঠিয়া বসিল। আপন মনে বলিল—বাঙ্গালার জমীদার অধঃপাতে যাউক!

দেবকুমার আজ দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিল যে কৃষিপ্রধান বাঙ্গালা দেশের বেশী লোকের প্রধান দুঃখই এই যে, জমীর মালিক তাহারা নয়। একবেলা লবণ ও ভাত এবং একবেলা এক ঘটী পচা জল খাইয়া যাহারা জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতেও সেই জমীতে লাঙ্গল দেয়, তাহারা শুধু লাঙ্গল দিবারই কর্ত্তা, ফসলের কর্ত্তা নয়। একদিকে জমীদার, আর একদিকে মহাজন সেই ফসল বাঁটিয়া খায়—উহারা পায় শুধু খোসা আর ভুষি! ভগবানের মাটী—প্রকৃতির দান। উহা বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি—নদীর জলের মত, আকাশের বাতাসের মত, রবির কিরণের মত। দেবকুমার স্থির করিল, আবার সে নিজের জমীদারীতে যাইবে এবং তাহার সকল সম্পত্তি প্রজাদিগকে দান করিয়া আসিবে—অধিকার যাহার, দেবকুমার তাহাকেই তাহার ন্যায্য আসনে স্থাপন করিবে। নিকটেই নারায়ণের মন্দিরে তখন সন্ধ্যার আরতি বাজিয়া উঠিল। দেবকুমারের কাতর হৃদয় আকুল হইয়া ডাকিতে লাগিল—"জয় নারায়ণ, জয় নারায়ণ!"

আজ দেবকুমারের সেই কথা মনে পড়িল, যে দিন সে ছোট একটী বালকমাত্র। মার কাছে শুইয়া শুইয়া দেবতার কথা, মহত্ত্বের কথা, দানের কথা, সেবার কথা শুনিত। শুনিতে শুনিতে সে তখন মুগ্ধ হইয়া যাইত অনেক দিন—অনেক দিন পরে দেবকুমার আজ তাহার হৃদয়ের মধ্যে জননীর পবিত্র স্পর্শ অনুভব করিল। সে কাতর কণ্ঠে ডাকিল—"মাগো—মা!"

দেবকুমারের দুইটী চক্ষু দিয়া অবিরল জল ঝরিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিতেই দেবকুমারের প্রথমে মনে হইল হাইকোর্টের আদেশের কথা। দেবকুমার মনে মনে বিশ্বাস করিত সাগরিকা নির্দ্দোষী—হাইকোর্টের মীমাংসার পরও সেই বিশ্বাসই করিল যে সাগরিকা বিনা অপরাধে দণ্ড ভোগ করিল। অবিচারের সেই দুঃসংবাদটি সাগরিকাকে দিবার জন্য দেবকুমার আবার জেলখানার হাঁসপাতালে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহার আরও একটু কায ছিল। ক্ষমা চাহিয়া দয়া ভিক্ষা করিয়া লাট সাহেবের কাছে আবেদন। সে যদিও মনে মনে জানিত যে তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হইবে না, তবুও সে উহা নিজে লিখিল। কেমন করিয়া যে সে সাগরিকাকে পুণ্যের সিংহাসন হইতে পাপের ধূলার নীচে নামাইয়াছে তাহা সেই জানিত সকলের অপেক্ষা বেশী। সুতরাং ব্যারিষ্টার সাহেবকে বলিয়া, সেই আবেদন পত্র লিখিবার ভার সে নিজে লইল। যাহা হউক, লেখা শেষ হইলে উহা সাহেবকে দেখাইলেই চলিবে। আইন সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতে হয় তাহা ব্যারিষ্টার সাহেব লিখিবেন। সে দিন প্রভাতে দেবকুমার যখন আবেদন-পত্র লিখিতে বসিল তখন তাহার অন্তরের দেবতা কহিলেন—"দেবকুমার, সত্যই সকলের বড়—তাহার আশ্রয় কর। যদি নারায়ণের কৃপা পাইতে চাও তবে সত্যের পূজা কর।"

দেবকুমার অকপটে সকল কথাই লিখিল—তিলমাত্র ছাড়িলনা; তাহার পর উহা লইয়া প্রথমে জেল-হাসপাতা-লের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিচিত ওয়ার্ডার হীরা সিং সেলাম করিয়া জানাইল যে, পারুল আর হাঁসপাতালে নাই, আবার ডিগ্রিতে বদলী হইয়াছে।

বিস্মিত হইয়া দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" ওয়ার্ডার একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া কহিল, "বাবু সাহেব, এ সব মেয়ে মানুষ ভয়ানক নচ্ছার! কিছুতে ওদের লজ্জা নেই।"

হীরা সিং এর ভনিতা শুনিয়াই দেবকুমারের মুখ শুকাইয়া উঠিল। নিম্ন অথচ অধীর কণ্ঠে সে কহিল, "সে কি করেছিল হীরা সিং?"

"হাঁসপাতালে সেদিন হিরণ ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কি সব ঘটনা হল, বড় ডাক্তার বাবু জানতে পেরেই ওকে হাঁসপাতাল থেকে বিদায় করেছেন। ডিগ্রিতে যে যা খুসি করে—হাঁসপাতালে কি ওসব চলে বাবু?"

অতর্কিতে কাহারও মাথায় মাঠি মারিলে সে যেমন স্তব্ধ হইয়া যায়—মুখে কথা সরেনা, দেবকুমারেরও যেন তাহাই হইল। হঠাৎ কোনও পরমাত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইলে বুকে যেমন লাগে, দেবকুমরের বুকেও তেমনি প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগিল। একটা দারুণ ঘৃণা দেবকুমারের মনকে অধিকার করিয়া বসিল। সে ভাবিয়াছিল হাঁসপাতালে আসিবার পর হইতে সাগরের অন্তরটা হয়ত দিন দিনই পবিত্র হইতেছে। বড় আশা করিয়া সে এই কথাই ভাবিতেছিল যে, সাগর আবার সাগরই হইয়াছে—তাহার মন ফিরিয়াছে, মতি গতি ফিরিয়াছে। কিন্তু এ কি নিদারুণ সংবাদ! দেবকুমার বিড়ম্বিত হইয়া নিজের কাছেই লুকাইতে চাহিল! তাহার মনে হইতে লাগিল, সাগরিকা যে এতদিন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে, রোষে ও দুঃখে এত চক্ষের জল ফেলিয়াছে—সে বড় লাঞ্ছিতা, বড় পীড়িতা, মর্ম্মে মর্ম্মে বড়ই আহতা সে—এ সবই ভাণ, বারনারীর ছলনা মাত্র! এই জন্যই বুঝি সে দেবকুমারকে বিবাহ করিতে সম্মত নহে! সাগরিকা বুঝি এই ফিকিরেই ফিরিয়াছে যে যেমন করিয়াই হউক দেবকুমারকে দিয়া তাহার নিজের কায হাঁসিল করিয়া লইবে—তাই তাহার চক্ষে এত জল, মুখে অত মেঘ নয়নে অত ভ্রুকুটির অভিনয় হইয়া গেল! দেবকুমারের মনে পড়িল, এই হাঁসপাতালেই দেবকুমারের সঙ্গে শেষবার সাক্ষাতের কথা। তখনও সে দেখিয়াছিল সাগরিকার প্রতি কথায় অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি।

দেবকুমার অত্যন্ত চাপা গলায় আপন মনে বলিল—"যাক্", এবং পরক্ষণেই হন্ হন্ করিয়া হাঁসপাতালের বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া সে ভাবিতে লাগিল—

এখন করি কি? এই ত সাগরিকা—তার সঙ্গে পণরক্ষার আর প্রয়োজন? এই নূতন ব্যভিচার কি দেবকুমারকে সাগরের নিকট হইতে চিরদিনের মত পৃথক করিল না? সাগরিকার প্রতি দেবকুমারের যাহা কর্ত্তব্য ছিল, আর কি দেবকুমারকে তাহা পালন করিতেই হইবে? আজ কি সাগরই তাহাকে সে দায় হইতে মুক্তি দিল না?

দেবকুমারের অন্তরের মধ্যে কে যেন বজ্রকঠোর কণ্ঠে কহিল—"না।" দেবকুমার মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মন বলিল—"আজ যদি সাগরকে জন্মের মত ত্যাগ কর, তবে দণ্ডটা কাহার হইবে? তোমার, না সাগরের? তুমি না দণ্ড লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে পণ করিয়াছ?"

দেবকুমার ভীত হইয়া উঠিল। পথের দুই পার্শ্বের বাড়ী গুলা মুহূর্ত্তে দেবকুমারের চক্ষের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, একজন পথিক তাহাকে টপ্ করিয়া ধরিয়া বলিল—"বাবু, তোমার কি অসুখ করেছে? অমন কচ্ছ যে? এসো—এই সিঁড়িটার উপর একটু বস্‌বে এসো। এখনি যে মোটর চাপা পড়তে!"

দেবকুমারকে একটা বড় বাড়ীর ছায়াশীতল সিঁড়ির উপর বসাইয়া দিয়া পথিক যখন চলিয়া গেল, দেবকুমার তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর শেষে সে এই সিদ্ধান্তে আসিল যে, যাহার যেটুকু কর্ত্তব্য, এ সংসারে তাহার তাহা পালন করিতেই হইবে—অন্য একজন যদি তাহার নিজেরটুকু না করে, নাই করিল, তাহাতে কি?

দেবকুমার এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত সহজে নিঃশ্বাস

ফেলিতে পারিল। ভাবিল, সাগর যাহা খুসী করুক—তাহাতে দেবকুমারের কিছু আসিয়া যায় না। দেবকুমারের নিজের কর্ত্তব্যটা ত তাহার নিজেরই হাতে। সে কর্ত্তব্য চায় আত্মদান, সর্ব্বস্বত্যাগ, জীবনমৃত্যু! সাগরকে বিবাহ না করিলে দেবকুমারের সে মৃত্যু ঘটিল কৈ?

দেবকুমার আবার ধীর পদে জেলখানায় ফিরিয়া গেল এবং সাগরিকার সহিত দেখা করিতে চাহিল। বড় বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেমন দেব বাবু, আমি আগেই বলেছিলাম কিনা—কয়লার ময়লা ধুলে যায় না! আচ্ছা বসুন, আমি পারুলকে আনাচ্ছি।"

বড় বাবুর হাসিটা দেবকুমারের বুকের ভিতর ছুরির মত বিঁধিল বটে, কিন্তু দেবকুমরে সে ব্যথা সহ্য করিল এবং তাহার সেই পরিচিত কামরায় বসিয়া সাগরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

দেবকুমারের সঙ্গে সাগরিকার আবার দেখা হইল। সাগরিকা আজ দেবকুমারের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিল, তাহার চোখে মুখে সে মমতা আর নাই। মনে হইল দেবকুমারের মুখ যেন কঠিন পাথরে গড়া। সাগরিকার অন্তরের ভিতর শিহরিয়া উঠিল এবং শাড়ীর অঞ্চলের একটা কোণ মুড়িতে মুড়িতে ভূ-লগ্নদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাগরিকার এই বিহ্বলভাব দেখিয়া দেবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হাঁসপাতালে সে এখনই যাহা শুনিয়া আসিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই সত্য। সাগরের মুখের দিকে একটা কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে দেবকুমারের একবার ইচ্ছা হইল বটে, কিন্তু চাহিবা মাত্রই তাহার অন্তর ভয়ানক ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

দেবকুমার চক্ষু ফিরাইয়া লইল এবং আবেগ-লেশ-হীন গম্ভীর ও সহানুভূতিশূন্য কণ্ঠে বলিল, "আজ তোমায় একটা দুঃসংবাদ শোনাতে এসেছি।"

সাগর মাথা তুলিল না। দেবকুমার বলিল, "আপিলে কোনো ফল হলো না—সেসন জজের হুকুমটাই বাহাল রইল।"

বিকৃত-কণ্ঠে সাগরিকা কহিল, "এমন যে হ'বে তা আমি আগেই জানি।" সাগরের শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল—তাহার চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল।

সে চোখের জল দেবকুমারের মনকে গলাইতে পারিল না, বরং উহা তাহার বিরাগকেই বাড়াইয়া তুলিল। দেবকুমার তখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল। সেই যুদ্ধে শেষে তাহারই জয় হইল। অপেক্ষাকৃত কোমল ও সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সে বলিল, "এখনো আশা আছে; আমি লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠাব। তিনি হয়ত দয়া করতে পারেন।"

দেবকুমারের দিকে সজল নয়নে চাহিতে চাহিতে অতিশয় কাতর ভাবে সাগর বলিল, "আমি মুক্তি চাই নে—সে জন্য আমি ভাবছি না।"

বিস্ময়-বিকৃত-কণ্ঠে দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে?"

"তুমি ত হাঁসপাতালে গিয়েছিলে? আমি উপরতলার ডিগ্রি থেকে তা' দেখেছি।"

"হাঁ, গিয়েছিলাম।"

"সেখানে ওরা বোধ হয় অনেক কথাই—"

বাধা দিয়া দেবকুমার বলিল, "তাতে আর কি হয়েছে? সে তোমার কাষ—তুমিই তা' ভাল জান।"

দেবকুমারের ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, গলার স্বরে এতটুকু ক্ষমাও প্রকাশ পাইল না। লাঞ্ছিত গর্ব্বের নিরুদ্ধ রোষ হাঁসপাতালের নামমাত্রেই সহসা মুক্তি পাইয়া দ্বিগুণ বলে দেবকুমারকেই আঘাত করিল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মত বিদ্বান্ ও ধনবান বরের হস্তে কন্যা দান করিতে পারিলে বাঙ্গালার যে কোনো ভদ্রলোক নিজেকে ধন্য মনে করিত! সেই দেবকুমার স্বেচ্ছায় পণ করিল, সাগরকেই বিবাহ করিবে এবং সেবায় ও ভালবাসায় তাঁহার অনাগত জীবনকে যতদূর সম্ভব শান্তিময় করিয়া তুলিবে—কিন্তু সেই লাঞ্ছিতা পতিতা হৃতসর্ব্বস্বা সাগরিকার কিনা দণ্ডমাত্রও বিলম্ব সহিল না—হাঁসপাতালের হরেন্ ডাক্তারকে সে আত্মবিক্রয় করিল! ছি ছি! কি ঘৃণিত ইতর এই সাগরিকা—কি বীভৎস উহার চরিত্র!

দেবকুমার নীরব হইয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুইটী জানালার ভিতর দিয়া আকাশের গায়ের মন্থরগতি লঘু মেঘগুলি পর্য্যন্ত পৌঁছিল বটে, কিন্তু সে উহা দেখিতে পাইল না। ঘৃণা, দয়া, রোষ ও ক্ষমা তখন দেবকুমারের হৃদয়ের ভিতর ঘোরতর সমরে লিপ্ত হইয়াছিল। দেবকুমারের ক্ষত-বিক্ষত রুধিরসিক্ত অন্তরে শেষে ক্ষমার জয়-পতাকাই প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবকুমার আপন মনে বলিল, "সাগর যা-ই কেন হোক্ না, আমার পণ টল্‌বে না।" সে প্রকাশ্যে কহিল, "আমার কথার নড়-চড় হ'বে না। যদি তোমার আন্দামানেই যেতে হয়, আমিও সঙ্গে যাব।"

সাগরের মুখখানি সহসা প্রভাতের স্থলকমলের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুখে বলিল, "তাতে আর ফল কি?"

তখনই সাগরিকার ডাক পড়িল। দেবকুমারের উত্তরটা শুনিবার জন্ত সে আর দাঁড়াইতে পারিল না।

দেবকুমার যখন জেলখানার বাহিরে আসিল তখন পৃথিবীর কাহারো উপর তাহার আর কোনো বিরাগ রহিল না। একটা নবীন আনন্দের অপূর্ব্ব স্বাদ পাইয়া দেবকুমার নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। সে অন্তরে অন্তরে বুঝিল যে বিশ্বের নারায়ণ আজ তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন—আজ সে সত্যই প্রেমের প্রসাদ পাইল —স্বার্থ সম্বন্ধহীন, আশা-আকাঙ্ক্ষা হীন, স্বচ্ছ, পবিত্র— প্রতিদান-প্রত্যাশার শৃঙ্খলে তাহা আর বদ্ধ নহে।

দেবকুমার ভগ্নহৃদয়ে জেলখানায় প্রবেশ করিয়াছিল, পুলকিত অন্তরে গৃহে ফিরিল।

হিরণ ডাক্তার ও সাগরিকা সম্বন্ধে যে কথাটা তখন জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যেও আলোচনার বস্তু হইয়াছিল, দেবকুমারও যাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা আসলে ছিল এইরূপ—

একদিন সন্ধ্যার সময় হাঁসপাতালের প্রধান নার্স একটি রুগ্ন কয়েদীর ঔষধের জন্ত সাগরিকাকে হাঁস-পাতালের 'দাওয়াইখানা'য় পাঠাইল। সেখানে যাইয়া সাগর দেখিল, কম্পাউণ্ডার নাই, আছে হিরণ ডাক্তার। সাগরের প্রতি হিরণ ডাক্তারের অযাচিত স্নেহ ও সহানুভূতি বরাবরই সাগরের অন্তরে একটা সন্দেহ ও শঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া, ডাক্তারকে দেখিলেই সাগর কার্য্যান্তরে সরিয়া যাইত।

'দাওয়াইখানা'য় হিরণ ডাক্তারকে দেখিয়াই ঔষধ না লইয়া সাগর চলিয়া যাইতেছিল। হিরণ ডাক্তার মুহূর্ত্তে সাগরের হাত ধরিল। তীব্র ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিয়া সাগরিকা ডাক্তারকে এমন একটি প্রবল ধাক্কা দিল যে, সে টলিতে টলিতে ঔষধপূর্ণ একটা আলমারির উপর যাইয়া পড়িল। আলমারির কাঁচ ভাঙ্গিয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া মেঝেতে পড়িল এবং গোটাকতক শিশি-বোতল পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কার্ব্বলিক এসিডের বোতলটা ভাঙ্গিয়া খানিকটা এসিড ছিটিয়া গিয়া ডাক্তারের পাৎলুন ও হাতের কোনো কোনো স্থান দগ্ধ করিল।

শিশি-বোতল ভাঙ্গার শব্দ শুনিয়া বড় ডাক্তার বাবু সেই দিকে ছুটিয়া আসিতেই দেখিলেন, সাগরিকা সেই ঘর হইতে উত্তেজিত ভাবে বাহির হইতেছে। এমন অবস্থায় সিদ্ধান্তে আসিতে আর কত দেরি হয়? সাগরিকা যে বারবিলাসিনী, খুনী আসামী তাহা আর কে না জানে? বড়বাবু তখনই স্থির করিলেন, সকল দোষ এই অভিসারিকা সাগরিকার। নতুবা সন্ধ্যার অন্ধকারে হিরণের কাছে তাহার ত কোনো কায থাকিতে পারে না! আন্দামানে যাইবার জন্ত এক-পা বাড়াইয়াও মাগীদের কি ভয় আছে, না লাজ আছে! আর ইহাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া কায নাই, সকলকে নষ্ট করিবে! উহাকে দূর করিয়া ডিগ্রিতে তাড়াইয়া দাও।

বড় ডাক্তারবাবু তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট লিখিতে বসিয়া গেলেন।

সাগরিকা যখন শুনিল যে এই ব্যাপারটা তাহারই অভিসার-কাহিনীরূপে রটিয়া গেল, তখন তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। বিশ্ব যে তাহার প্রতি বিমুখ সে জন্ত সাগরের বেশী দুঃখ ছিল না। দেবকুমার শুনিলে যে মর্ম্মাহত হইবে এই ভাবিয়াই সাগরের বুক ভাঙ্গিল।

সাগরিকা যেদিন দেবকুমারকে দেখিয়াছিল সেই

দিন হইতেই তাহার কাছে আর সকলেই মরিয়াছিল, কেবল বাঁচিয়া ছিল একমাত্র দেবকুমার। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের পর তাহার চিত্ত কখনো বা আবার সেই দেবকুমারের দিকেই ধাইতেছিল, কখনো বা সঙ্কুচিত হইয়া হটিয়া আসিতেছিল। সাগরিকা যখন দেখিল যে তাহার অতীত ভ্রান্তির অপরাধটাকেই বড় করিয়া লইয়া শুধু সেই মানদণ্ডেই জেলখানার একটা নগণ্য রক্ষী পর্য্যন্ত তাহার বর্ত্তমানকেও বিচার করিতেছে—চরিত্রহীন হিরণ ডাক্তার পর্য্যন্ত মনে করিতেছে সাগরিকাকে লাঞ্ছনা করিবার ও 'জবরদস্তি' করিয়া তাহার দেহটাকে ভোগ করিবার একটা অবাধ দাবীই যেন তাহার আছে—তখন সাগরিকার নিষ্পিষ্ট অন্তর এতই ব্যথিত হইল যে, সে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অন্য নার্সদের কাছে সে যখন দুই একবার নিজের নির্দ্দোষিতার কথা কহিল, তখন দেখিল তাহাদের চক্ষু অবিশ্বাসপূর্ণ ব্যঙ্গের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়াছে! সাগরিকা সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে শুধু এই বলিল যে—হে ভগবান, তোমার কাছেও কি ক্ষমা নাই? —তখনো সাগরের বিশ্বাস ছিল যে দেবকুমার কিছুতেই এমন একটা কথা বিশ্বাস করিবে না—অন্ততঃ একটিবার সাগরকে জিজ্ঞাসাও করিবে।

আজ যখন সে দেবকুমারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ভাবিল, তাহাকে সকল কথাই বলিবে—তাহার যে কোনো অপরাধ নাই ইহা দেবকুমারকে বুঝাইয়া দিবে। দেবকুমার সে অবসর দিল না, কিছু জিজ্ঞাসাই করিল না। তাহার চক্ষু ও মুখ এবং কণ্ঠস্বর সাগরকে জানাইয়া দিল যে, দেবকুমার তাহার কথায় বিশ্বাস করিবে না। সাগরিকার চোখের জল মুখের ভাষাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সে শুধু কাঁদিয়াই ফেলিল, কথা বলিতে পারিল না। মুখরা সাগরিকাকে বাক্যহীনা দেখিয়া দেবকুমার ধরিয়া লইল, হাঁসপাতালের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সত্য।

সাগরিকার বিশ্বাস ছিল যে সে তখনো দেবকুমারকে ক্ষমা ত করেই নাই, বরং সে তাহাকে ঘৃণা করে। সাগর বুঝিতে পারে নাই যে, দেবকুমারের প্রতি তাহার পূর্ব্ব প্রেম তাহার অজ্ঞাতে আবার জাগ্রত হইয়াছে বলিয়াই সে দেবকুমারের উপদেশ ও ইচ্ছাকে মানিয়া লইয়া নিজের বন্দী জীবনকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে, আর্ত্তের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়া ডিগ্রির সুরা, সিগারেট ও সঙ্গিনী সকলই ত্যাগ করিয়াছে।

নারীর মন দিয়া একথা সাগরের বুঝিতে বাকি ছিল না যে দেবকুমার তখনো তাহাকে ভালবাসে—কিন্তু সে ভালবাসায় আর দেওঘরের ভালবাসায় যে প্রভেদ অনেক, সাগর তাহা দেখিতে পাইল। পতিতার প্রতি মহতের কৃপা একটির কারণ, আর অন্যটি ছিল প্রাণের সহিত প্রাণের স্বাভাবিক বিনিময়। সাগরিকা বুঝিয়াছিল, তাহাকে বিবাহ করিলে সমাজ কখনই দেবকুমারকে ক্ষমা করিবে না এবং পূর্ব্ব প্রেমের শ্মশান ভস্মকে দিনের পর দিন করুণায় সিক্ত করিয়া দেবকুমারও কোনো দিন সুখী হইতে পারিবে না। দেবকুমারের জন্যই সাগরিকা বিবাহের প্রস্তাবটা রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সে জানিত দেবকুমারকে বিবাহ করিলেও, অন্যের কাছে দূরে থাকুক—দেবকুমারের কাছেও সে আর নারীর মর্য্যাদা দাবী করিতে পারিবে না।

দেবকুমার ভুল বুঝিল। সে মনে করিল, সাগরিকা তাহাকে ঘৃণা করে বলিয়াই বিবাহ করিতে চায় না—সে তখনো পারুলই আছে, পারুলের চিতার আগুনে দেওঘরের সাগরিকা প্রস্ফুট হয় নাই। দেবকুমারের এই ভুলটা সাগরের কাছে ধরা পড়িল, তাই সে যখন শুনিল যে হাইকোর্টেও তাহার দণ্ডটা ঠিকই আছে তখন তাহার কোনো দুঃখ হইল না। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল এই ভাবিয়া যে, দেবকুমার তখনো তাহাকে বিশ্বাস করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে।

একদিন-না-একদিন যাহাতে দেবকুমারে ভুল ভাঙ্গে, নিজেকে তেমনি করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সাগরিকা পণ করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

ফাগুন-রাণী

সাত সাগরের ওপার হতে আস্‌লো ফিরে
ফাগুন রাণী
সর্ষে ক্ষেতের সোণার রেখায় লুটায় রে তার
আঁচল খানি।
আলের পাশে বাব্‌লা গাছের বুকের তলে
বাতাস লাগা মস্‌নে ফুলের চুম্‌কি জ্বলে
যবের বনে মটর শিশু কৌতুকে চায়
আগুন হানি
ভুবনভরা হাসির মেলায় এসেচে আজ
ফাগুন রাণী।

মৌমাছিদের গুঞ্জরণে আমের বোলে
যে-ভাব জাগে,
না-বলা-কোন্ অফুট কথা—ধ্বনিতে তার
পুলক লাগে।
তরুণী ওই পদ্মকুঁড়ির আঁখির নীরে
নীহার ঝরে নিশীথ ব্যাপি ভুবন ঘিরে,
দূর্ব্বা' পরে সজ্‌নে ফুলের ঝালর বোনা
ঘোম্‌টা টানি',
মধু ঝরার মহোৎসবে এসেচে আজ
ফাগুন রাণী।

ঝরা পাতায় মর্ম্মরিয়া—অশোক ভেঙে
চরণ তলে
কিশলয়ে দাগ রেখে আজ পথিক বধূ
সমুখ চলে।
ঝাউয়ে যখন বাজ্‌লো বাঁশী ভোরের বেলা
শিমুল ফাগে সুরু হল আবির খেলা
পলাশ-কুঁড়ির হাসির সনে ফুট্‌লো ধীরে
ঠোঁটের বাণী—
উলুখড়ের বেণীর দোলে বন-ভবনে
আস্‌চে রাণী।

জামের বনে দখিণ হাওয়া মাতাল হল
হঠাৎ আজ
ফাগুন প্রিয়ার গন্ধ যেন আস্‌লো ভেসে
মনের মাঝ।
কচি ডালিম ফুলচে যেন বুকের 'পরে,
নেবু ফুলের হাওয়ায় মনে আগুন ধরে,
মৌরী ধ'নে উতল হ'য়ে করচে নীরব
কানাকানি।
কুহুর ডাকে দেখচি চেয়ে এসেচে আজ
ফাগুন রাণী।

বন্দে আলী মিয়া।

জাতীয় সঙ্গীত

সম্প্রতি ইংরাজী দৈনিক সংবাদ-পত্রে কলিকাতা হাই-কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় একটি তর্ক তুলিয়াছেন যে "বন্দে মাতরম্" এতদেশে জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে না। উহাতে যখন প্রতিমার উল্লেখ আছে তখন দেশীয় মুসলমান্ ও খৃষ্টান গণের পক্ষে উহা সঙ্গত হইতে পারে না। জাতি গড়িতে হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলকেই আবশ্যক; জাতীয় সঙ্গীত সকলেরই গান করিবার যোগ্য হওয়া

উচিত। সুতরাং মূর্ত্তিপূজার ভাবে পরিপূর্ণ "বন্দে মাতরম্" গীত জাতীয় সঙ্গীত হইবার যোগ্য নহে। অপরে সরকার মহাশয়ের এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ঐ সঙ্গীতে প্রতিমার কথা যাহা আছে তাহা দেশমাতৃকার প্রতিমা, তাহা কোন মূর্ত্ত দেবতার প্রতিমা নহে। এ কারণ "বন্দেমাতরম্" গীত জাতীয় সঙ্গীত হইবার যোগ্য।

আমার নিকট কতিপয় ভদ্র সজ্জন এই তর্কের মীমাংসা চাহিয়াছেন; এবং পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে যেখানে যেভাবে হওয়া উচিত তাহাও প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমার নিজ অভিমত এস্থলে উল্লেখ না করিলেও চলে। কারণ সরকার মহাশয়ের তর্ক সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা আমার বিবেচনায় সমীচীন হয় নাই। যখন কতিপয় বৎসর হইতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড সভাস্থলেও "বন্দে মাতরম্" সমস্ত ভারতবর্ষেই গীত হইয়া আসিতেছে, পৌত্তলিকতার ভাব পরিপূর্ণ বলিয়া কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, তখন অনর্থক সরকার মহাশয় এই মিত্রভাবের স্থলে অমিত্রভাব জাগাইয়া তুলিতে চান কেন? হিন্দু মুসলমানে কলহ বাধাইয়া দিবার লোকের অভাব নাই; সরকার মহাশয় নিশ্চয়ই সে শ্রেণীর লোক নহেন। যাহা অবাধে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে দ্বৈধভাব উৎপন্ন করা অথবা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করা কিংবা উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ বাক্য ব্যবহার করা সরকার মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক যখন এইরূপ একটা দ্বিধা উঠিয়াছে, তখন এই গানটির দুই এক স্থানে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করা আমার নিকট অসঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি ৺বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় হস্তক্ষেপ করা এত কঠিন যে, সহসা কোনও সুধী ব্যক্তি এইরূপ করিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু পরিবর্ত্তন হওয়াও আমি অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ করি। এই গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমি নিয়ে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতটি আনন্দমঠ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম এবং যে স্থানে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ করি তাহাও প্রকাশ করিলাম।

লক্ষ্য করিবেন যে দশম পংক্তি অন্য কারণে কিছু পরিবর্ত্তন করিলাম। এই পরিবর্ত্তিত ভাবে সঙ্গীতটার সহিত আনন্দ মঠের আর বিশেষ কোন সংস্রব থাকিল না—কেবল জাতীয় সঙ্গীতেরই উপযোগী হইল।

(১) বন্দে মাতরম্
(২) সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্
(৩) শস্য শ্যামলাং মাতরম্।
(৪) শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
(৫) ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্,
(৬) সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্,
(৭) সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
(৮) সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
(৯) দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃত খর করবালে,
(১০) অবলা কেন মা এত বলে।
(১১) বহুবল ধারিণীম্, নমামি তারিণীম্
(১২) রিপুদলবারিণীং মাতরম্॥
(১৩) তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
(১৪) তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
(১৫) ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
(১৬) বাহুতে তুমি মা শক্তি,
(১৬) হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
(১৮) তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
(১৯) ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
(২০) কমলা-কমল দল বিহারিণী
(২১) বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
(২২) নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্,
(২৩) সুজলাং সুফলাং মাতরং
(২৪) বন্দে মাতরম্।
(২৫) শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
(২৬) ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

দেখা যাইতেছে যে এই সঙ্গীত বাঙ্গালার সন্তান নামধারী সন্ন্যাসিগণ বাঙ্গালা দেশকে লক্ষ্য করিয়াই গাহিয়া-

ছিলেন। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গীত হইতে হইলে অষ্টম ও নবম পংক্তিকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় :—

(৮) ত্রিংশকোটি কণ্ঠ-কল-কল নিনাদ করালে

(৯) ষষ্টি কোটিভুজৈর্ধৃত খর করবালে

দশম পংক্তিকে এইরূপ করিতে পারা যায়—

(১০) অবলা তোমায় কেন মা বলে ?

বর্ত্তমান তর্ক ১৮।১৯।২০ পংক্তি সম্বন্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই কয়েকটি পংক্তি নিম্নলিখিত মত পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

(১৮) তোমারি সাধনা করি অন্তরে বাহিরে।

(১৯) ত্বং হি শত শক্তিপ্রহরণ ধারিণী,

(২০) মঙ্গলা সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়িনী—

একুশ পংক্তির পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক।

এইভাবে "বন্দে মাতরম্" গীত সংশোধন করিয়া লইলে সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কি, সমস্ত পৃথিবীতে নিরাপত্তিতে গীত হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগের জাতীয় সঙ্গীত রূপে গণ্য হইবার কোন বাধা থাকিতে পারে না।

শ্রীশশধর রায়।

আশা বৈতরণী

আকাশের মত চাই—রহি আমি অসীমে ব্যাপিয়া,—
সীমার বীণায় রেখে কাণ,
দিবা-নিশা যেন মোর পোষা দুটি কোকিল-পাপিয়া,
কালের খাঁচায় গাহে গান!
রবি শশী আঁখি খুলে
ছবি দেখে থাকি ভুলে,
ধরার প্রাণের কূলে
কই কথা নীরব ভাষণে—
ব'সে এই নীলিমা-আসনে।

বাতাসের মত চাই ছেড়ে যাই অকরুণ মরু,
কুসুম- অরুণ উপবনে,
নাচে যেথা গীতায়নে মর্ম্মরিত তরুণিম তরু,
শ্যামলের নিরালা ভবনে।
প্রজাপতি ক'রে সাথী
বনফুলে মালা গাঁথি,
দুলায়ে বলাকা-পাঁতি
কবি-চোখে নাচাই স্বপন—
মেঘ ঠেলে জাগাই তপন।

তটিনীর মত চাই ছুটি আমি স্বাধীন আমোদে
জল-বেণী এলায়ে এলায়ে,
বিদেশে স্বদেশ করি' গীতি রচি' ভৈরবী, কামোদে—
ছায়া-মায়া লীলায় খেলায়ে।
জীবনের তৃষা নাশি'
জগৎকে ভালবাসি,
ভাবের সাগরে আসি
ভূমানন্দে আমিত্ব বিলাই—
কূল ভুলে অকূলে মিলাই।

পর্ব্বতের মত চাই গর্ব্বে জাগি সর্ব্বদা আপনি,
বসুন্ধরা লুণ্ঠিত চরণে!
ব্যর্থ করি বজ্র জ্বালা, ঝটিকার বজ্র আলাপনী,
তুচ্ছ করি জীবনে-মরণে!
প্রস্তর-মর্ম্মের তলে
নর্ম্মদ নির্ঝর চলে,
কল্পনার গল্প বলে,—
তাও শুনি নিস্তব্ধ গৌরবে—
ভুলিনাকো পুষ্পের সৌরভে।

ঝঞ্ঝার মতন চাই উন্মত্তের প্রচণ্ড চীৎকারে—
ভূমণ্ডলে চণ্ডাল-কৌতুক !
সূর্য্য-সোমে মূর্চ্ছা হেনে, চূর্ণ করি হাস্য, প্রীত,—আর
ক্ষুদ্রে সঁপি রুদ্রের যৌতুক !
মৃত্যুকেই মিত্র মানি,
নিত্য তারি চিত্র আনি,
ধ্বংসে মোর নৃত্য জানি,
চিত্তে খেলে আর্ত্তের যন্ত্রণা,
বিশ্বে আনি বিদ্রোহ-মন্ত্রণা !

এ-জীবনে আছে মোর কত ধ্যান কত না সাধন—
—ভাবা ভরা আশা বৈতরণী !
দীপক-ভৈরব জানি, সাধিনাকো পূরবী-কাঁদন,
মর্ত্তে গড়ি স্বর্গের সরণী !
পা-মোছা ধূলট মাখি
ঝুরিতে চাহেনা আঁখি,
মনোপটে লিখে রাখি
অমরের মহা-অবদান—
ত্রিভুবনে হইতে প্রধান।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চীনে বিদেশী সমস্যা

বর্ত্তমান সভ্য-জগতের দৃষ্টি চীন দেশের দিকে আকৃষ্ট রহিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশ সমূহের দৈনন্দিন সম্বন্ধ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আজ চীনের অবস্থা হইতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদিত হয়, চীন কি চায়? কিসের জন্ত তার এই অবস্থা এবং কি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা সে করিতেছে, এবং কিসের জন্ত এই রক্তপাত হইতেছে এবং আরও হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে? চীনাগণ, বিশেষতঃ তরুণ চীন সভ্য (Young Chinese party) প্রতীচ্য বিদেশীয়দের চীনদেশে অন্যায়রূপে অধিকার স্থাপনের উপরই সমস্ত দোষারোপ করিতেছেন এবং তাঁহাদের মতে বিদেশীয়-দের এই অনধিকার প্রবেশই যত অনর্থের মূল।

চীনে কি করিয়া বিদেশীর অধিকার স্থাপিত হইল এবং সেই অধিকার গুলিই বা কি এবং চীনাদের ইহাতে আপত্তিই বা কি, এই ইতিহাস একটু আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টন (Canton) নগরীতে পর্ত্তুগীজদের আবির্ভাব হয় এবং সেই হইতেই আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের সহিত চীনের সম্বন্ধ আরম্ভ। ইহার প্রায় শতাধিক বৎসরের পর ওলন্দাজগণ এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং ক্যান্টনের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ফর-মোজাতে (Formosa) তাঁহাদের এক দুর্গ ও প্রথম বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ বণিক-গণ জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারাও ক্যান্টন নগরীতে প্রথম পদার্পণ করেন। প্রায় এই সময়েই আবার এক সীমান্ত প্রদেশের ভিতর দিয়া স্থলপথে রুষদের সহিত চীনের প্রথম সম্বন্ধ আরম্ভ হয় এবং এই সাধারণ সীমান্ত স্থলের মধ্যে দিয়াই রুষদের সহিত এক সংঘর্ষও উপস্থিত হয়। তার ফলে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে নীপচুতে (Nipchu) প্রতীচ্য এক জাতির সহিত চীনের প্রথম সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ চীনের সমুদ্রোপকূলের একাধিক স্থানে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এময় (Amoy), নিংগপো (Ningpo), ফরমোজা (Formosa) এবং

প্রধানতঃ ক্যাণ্টনে (Canton) এই সব বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা নির্দ্দিষ্ট হয়। বলা বাহুল্য চীনারা এই বিদেশীয় বাণিজ্য বিস্তার কখনই প্রীতির চক্ষে দেখিত না। চীনারা স্বভাবতঃই, বিদেশীয়—বিশেষতঃ পাশ্চাত্য—লোকদিগকে একটু ভয় করে এবং অন্ত দেশের লোকদের কাছ হইতেও তারা স্বভাবতঃই দূরে থাকিতে চায়। এই দুই কারণে বিদেশীয়দের বাণিজ্য বিস্তার তাহাদের দেশে সহজ-সাধ্য হয় নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ন্যানকিংএর (Nanking) সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদেশীয় বণিকগণ লাভের আশায় এই সকল বাধা-বিঘ্ন অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লইতেন।

এশিয়া মহাদেশে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ শক্তিদ্বয়ের ক্রমশঃ পতনের সহিতই চীনে ইংরেজ বণিকদের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলে। এ অবস্থায় বিদেশীয় বাণিজ্য বিস্তারে চীন যে সব বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করিত এবং বিদেশীয়দের অধিকার সঙ্কোচ করিতে যে চেষ্টা সে করিত, তাহা ইংরেজদের নিকট নিতান্তই অসহনীয় হইয়া উঠে। সুতরাং এই গুলি দূর করিয়া বাণিজ্যের অবাধ গতি স্থাপনের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে লর্ড মেকার্টনীর (Lord Macrtney) এবং পরে লর্ড আমহর্ষ্টের (Lord Amherst) নায়কত্বে দুইবার চীনে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ (charter) নবীকরণ (renewal) সময়ে কোম্পানীর একচেটে ব্যবসায় রদ করিয়া চীনের বাণিজ্য সর্ব্ব-সাধারণের জন্ম উন্মুক্ত হওয়ায় চীনের মনঃক্ষোভ বাড়িয়া যায়। ভারতে ইংরাজ-অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চীনেও তাঁহাদের বাণিজ্য প্রসারিত হওয়াতে চীনের মনে এক ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অধিকন্তু বৎসরের পর বৎসর বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে চীনে আফিংএর আমদানী বাড়িয়া চলিতে থাকে এবং চীনেরা এই জন্ম ইংরেজকেই দায়ী মনে করিতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা যায় যে চীনে মাত্র বৎসরে ২০০ শত বাক্স বিদেশী আফিং আমদানী হইত, কিন্তু সেই স্থলে ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৎসরে ১৭০০০ হাজার বাক্স আফিং আমদানি হইতে থাকে। চীন সরকার আইন দ্বারা আফিং খাওয়া বারণ করেন সত্য, কিন্তু অবৈধ উপায়ে বিস্তর আফিং আমদানী হইতে থাকায়, লোকের মাদকতা ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এই সব কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া চীন ক্রমে ইংরেজের সহিত যুদ্ধে (Opium war) নিযুক্ত হইয়া পড়ে। চীনের দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হইতে বেশী সময় লাগিল না এবং ব্রিটীশ নৌ-বাহিনী চীনের দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলে অগ্নি বর্ষণ করিয়া ইয়াংসি নদের তীরে অবস্থিত দুর্গ গুলি অচিরে দখল করিয়া লইল। দুর্ব্বল চীন তখন সন্ধি স্থাপনের জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই স্থানেই এবং এই সময় হইতেই চীনের বিপদ ঘনাইয়া আসে এবং তার রাজ-শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ন্যানকিং-এর (Nanking) সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। এময় (Amoy), নিংপো (Ningpo), সাংহাই (Shanghai) এবং ক্যাণ্টনে (Canton) বিদেশীয় অবাধ বাণিজ্য স্থাপনের অধিকার চীন স্বীকার করিল। ফলতঃ ইয়াংসি-নদের দক্ষিণস্থ চীন উপকূলের সমুদয় স্থান গুলিই বিদেশীয় বাণিজ্যের অবাধ গতির জন্ম উন্মুক্ত হইল। চীন ইংরেজ সরকারকে যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ২১,০০০,০০০ ডলার দিতে বাধ্য হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হংকং (Hong-kong) নগরী ইংরেজ অধিকারভুক্ত হইয়া যায়।

ইংরেজের সহিত সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইবার অনতি-কাল পরেই অপরাপর বিদেশীয় জাতি সমুহও তাঁহাদের নিজ নিজ দাবী লইয়া চীনের নিকট উপস্থিত হন এবং সরকার অনন্যোপায় হইয়া তাহাদের সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হোয়াম্পোতে (Whampoa) ফরাসীদের সহিত চীনের এক সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয় ; ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ওয়াংহাইতে (Wanghai) মার্কিনের সহিত এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টনে সুইডেন ও নরওয়ের সহিতও সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই

সকল সন্ধিতে ইংরেজদিগকে চীন দেশে যে যে সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, অপরাপর পাশ্চাত্য জাতি সমূহকেও সেই রকম অধিকার ও সুবিধা দেওয়া হয়। ফলতঃ যে যে প্রদেশ সমূহে বিদেশীয়দিগকে এই সকল সুবিধা ও অধিকার দেওয়া হয়, সেই সকল স্থানে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার ও উপস্বত্ব নিতান্তই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কাযেই ঐ সকল স্থানের লোক গুলি ক্রমশঃ নিতান্তই উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। ক্যান্টন নগরীতেই এইরূপ চাঞ্চল্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে চীনের সহিত ইংরেজের আবার যুদ্ধ বাধে। কিন্তু চীন পরাজিত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিয়েনসিনে (Tientsin) এবং পুনরায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পিকিংএ (Peking) সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ হন। এইক্ষণে পূর্ব্বের অধিকারগুলি পুনঃ আলোচিত হইয়া আরও পরিবর্দ্ধিত ও পাকাপাকি রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের স্থানকিংএর (Nanking) সন্ধির দিন হইতে ৮৫ বৎসর ব্যাপিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন ও রুষ এবং সম্প্রতি জাপান যে সকল উপস্বত্বলাভ ও অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, তাহার ফলে আজ চীনের একাধিপত্যের বিশেষ অপচয় ঘটিয়াছে। অবশ্য কেবল বিদেশীয়দিগের প্রতি সমুদয় দোষ আরোপিত করিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে। চীনের অরাজকতা, অন্তর্বিদ্রোহে এবং বিদেশীয় মাঞ্চু বংশীয় রাজাদের প্রতি চীনাগণের সাধারণ ঘৃণা এবং উপরিউক্ত রাজগণের বিদেশীয়দের সাহায্যে চীনদের স্বাধীন প্রবৃত্তি দমন করিবার বাসনা এই সকল পাশ্চাত্য বিদেশীয়দিগকে আধিপত্য স্থাপনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। চীনবাসিগণ কিন্তু বিদেশীয়দিগের প্রতি ক্রমেই বীতরাগ হইয়া উঠে, এবং ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদেশীয়দিগকে তাড়াইবার জন্য Boxer Rising নামে এক ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বহুকষ্ট ও রক্তপাতের ভিতর দিয়া এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয় এবং ন্যূনাধিক বিদেশী সকল শক্তি সমূহই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। চীন সরকার বিদেশীয়দিগকে সম্যক ক্ষতি পূরণ দিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু ক্ষতিপূরণের টাকা একত্র করিতে অক্ষম হইলে সমুদয় দেশের আমদানী ও রপ্তানির উপর প্রতিষ্ঠিত শুল্ক আদায়ের ভার বিদেশীয়দের হাতে ছাড়িয়া দেন। বিদ্রোহানল আপাততঃ নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু বিদেশীয়দের প্রতি ঈর্ষা ক্রমে চীনাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাতীয় জাগরণরূপে পরিস্ফুট হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত মাঞ্চুবংশীয় রাজাদের শক্তি চীনে অক্ষুন্ন ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত বাহ্যতঃ চীন পুনঃ পুনঃ বিদেশীয়দের নিকট মস্তক অবনত করিতে বিশেষ দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সময় হইতেই এক নূতন চীন জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ চীনের যুবকগণ যাঁহারা বিদেশে শিক্ষিত হইয়া বিদেশী আচার পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোথায় কি কর্ত্তব্য তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই এক তরুণসঙ্ঘ স্থাপন করিয়া বিদেশীয় পরিবর্জ্জনের উপকারিতা দেশে প্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা রুষ-জাপান যুদ্ধের উদাহরণ দেখাইয়া প্রাচ্য জাতির আত্মশক্তির বিবরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আরও প্রচার করিতে লাগিলেন যে, প্রতীচী যখন মহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর জাতিসমূহের সমক্ষে স্বকীয় শাসন তন্ত্র নির্ণয়ের অধিকার (self determination) পুনঃ পুনঃ তারস্বরে বিঘোষিত করিয়াছে, তখন আর কোন্ মুখে চীনকে সেই শক্তি হইতে বঞ্চিত করিবে? একটি সমধর্ম্ম সম্পন্ন চীন জাতির এবং চীন সাধারণ তন্ত্র রাজ্যের একাধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্য বিদেশীয়দিগের অধিকার ও সন্ধি সর্ত্তের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই স্থানে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের অর্থবল চীনের জন্য কি করিয়াছে তাহা স্বীকার না করিলে চীনের পক্ষে নিমকহারামী হইবে। এক কথায় বিদেশীয় অর্থ চীনের স্থল ও জলপথ, রেলপথ, বন্দর, পোতাশ্রয়, খনি প্রভৃতি খনন সমুদয়েরই ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। তাঁহারা

অবশ্য নিজেদের স্বার্থের জন্যই এইভাবে তাঁহাদের অর্থ নিয়োজিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে পরোক্ষে যে চীনেরও প্রভূত উপকার হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? তবে একাধিপত্য (sovereignty) শব্দটির সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেশের সীমার মধ্যে বিদেশীয় অধিকার কখনই সহনীয় হইতে পারে না। অধিকন্তু চীনের জাতীয় জাগরণের দিনে ও তরুণ চীন সঙ্ঘের উন্নতির আশাপথে তাহারা কখনই বিদেশীয় প্রভুত্ব মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইতে পারে না। বিদেশীয়েরাও আপনাদের ধন সম্পত্তি ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন এবং প্রভুত্ব না থাকিলে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের উপায়ই বা কি হইবে ইহা ভাবিয়া নিজেদের অধিকার সঙ্কুচিত করিতে বিশেষ প্রস্তুত নহেন। কাযেই এখন স্বার্থে স্বার্থে প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে।

নবীন প্রজাতন্ত্র চীনের গৃহশত্রুর অভাব নাই। উত্তর ও দক্ষিণ চীনে আবহমান কাল হইতে চিরশত্রুতা চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উপর আবার রাজশক্তি ও সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চীনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সকলেই লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছে। সুতরাং স্থায়ী শাসন শক্তির অভাবে প্রাণ, মান কিংবা সম্পত্তি রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আইনের কঠোর শাসনের অভাবে দেশে চুরি, ডাকাতি ও ঠকামীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। এমন অরাজকতা বুঝি আজ পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই। কিন্তু তরুণ চীন সঙ্ঘ এই সমুদয় দোষের ভার বিদেশীয়দের স্কন্ধেই আরোপিত করেন। তাঁহারা বলেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য চীনের অরাজকতা বিদেশীয়দের চির আকাঙ্ক্ষিত। সুতরাং বিদেশীয় শক্তির অপচয় না ঘটিলে চীনের জাতীয় জীবনের ও একতার ভিত্তি সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

চীনাগণ বিদেশীয়দের মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লব্ধ সন্ধিসর্ত্তগুলি সঙ্কোচ করিতে না পারিলে যে আর নিজদের একচ্ছত্র শক্তি স্থাপিত করিতে পারিবেন না, সে বিষয়ে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন। বহুবিধ স্বত্ব ও অধিকারের মধ্যে নিম্নে আলোচিত ৪টী সন্ধি সর্ত্তই যে চীনের স্বায়ত্ত শাসনের প্রধান অন্তরায় সে বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

(১) চীন যে যে বিদেশীয় শক্তি সমূহের সহিত সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই জাতিগণের নিকট হইতে তাহাদের আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্য সম্ভারের উপর নির্দ্দিষ্ট অপরিহার্য্য শুল্ক ব্যতীত শুল্ক আদায় করিতে পারিবে না। আজ ৮৫ বৎসর কালাবধি চীন নিজ রাজ্যে শুল্ক তহসিল সম্বন্ধে স্বাধীনতা হারাইয়া বসিয়াছে। বিদেশীয়েরা নাম মাত্র শতকরা ৫ ভাগের বেশী শুল্ক দেয় না, কিংবা চীন ইহার বেশী দাবী করিতে পারে না। ইহাতে জাতীয় উন্নতির কথা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে চীনের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, কোনও কোনও বিদেশীয় জাতি তাহা স্বীকার করিয়া পিকিং শুল্ক সংস্কার নামে এক সমিতির আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমিতি চীনের অভিযোগ ন্যায্য মনে করিয়া সাধারণ পণ্যের উপর পূর্ব্বোক্ত ৫ ভাগ শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া ৭॥ ভাগে পরিণত করিতে এবং বিলাস সামগ্রীর উপর শুল্কের হার ১০ ভাগে পরিণত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই নূতন সংস্কার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া চীনকে আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে। সেদিন কেন্টোতে গণ্ডগোলের ফলে এবং ব্রিটিশ সরকারের শান্তি রক্ষার নিদর্শন স্বরূপ, এই পরিবর্ত্তিত হার নাকি এখন হইতেই প্রবর্ত্তিত হইবার কথা হইয়াছে।

(২) চীনের স্বায়ত্ত শাসনের দ্বিতীয় প্রধান অন্তরায় বিদেশীয়দিগের রাষ্ট্রীয় বহির্ভূত ক্ষমতা (rights of extra-territoriality) নিচয়। সকল দেশেই বিদেশীয়েরা যে যে স্থানে থাকেন সেই দেশেরই আইন কানুনগুলি তাঁহাদের মানিয়া চলিতে হয়—কিন্তু চীনদেশে বিদেশীয়েরা যাঁর যাঁর নিজ দেশীয় বাণিজ্য পল্লী-

কার্য্য রাজকর্ম্মচারী (Consul) কৃত আইন কানুনের অধীন। যে যে জাতির যে যে স্থানে সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে আধিপত্য অথবা বসতি বিস্তার ঘটিয়াছে,সে সে স্থানে সেই সেই জাতির আইনই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। দেখা যায় এই ভাবে চীনের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজী, ফরাসী, মার্কিন, জাপানী ও অন্যান্য আইন বিদেশীয়দের সুবিধা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচলিত হইতেছে। জাতীয় স্বাধীনতার ইহা এক প্রধান অন্তরায়। পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ ঘটনা স্বপ্নেরও অগোচর। ফরাসী দেশে জার্ম্মাণীর আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। বিদেশীয়েরা কিন্তু চীনে অশান্তি অরাজকতা চিরবিদ্যমান থাকার দরুণ, জীবন ও সম্পত্তির কোন নির্ব্বিঘ্নতা না থাকায়, এই সর্ত্ত আদায় করিয়া লইয়াছেন। এই স্থানেও চীনের অভিযোগ বিদেশীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—একটি আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক এখন এই বিষয়টির আলোচনা করিতেছেন। এই বৈঠক চীন দেশীয় আইন কানুন, আদালত ও জেলখানা প্রভৃতি পাশচাত্য দেশ সমূহের সভ্যতার অনুপাতে চলনীয় কি না এসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। সুতরাং কবে এই সন্ধি সর্ত্ত উঠাইয়া লওয়া হইবে কিংবা একেবারে উঠাইয়া লওয়া হইবে কি না, তাহা বিদেশীয়দের উপরই নির্ভর করিতেছে। সম্প্রতি সর্ত্তভোগী অধিকাংশ শক্তি সমূহেরই অভিমত যে, যতদিন পর্য্যন্ত সুশাসনের বন্দোবস্ত হইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিদেশীয়েরা কিছুতেই নিজেদের জীবন, মান, অর্থ ও সম্পত্তির উপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করিবেন না।

(৩) চীনে বৈদেশিক উপনিবেশ সমূহ (settlements) এবং অর্পিত স্থান সমূহ (concessions) যেখানে চীন সরকারের আধিপত্য নাই এবং যেখানে বিদেশীয় জাতিগণ তাঁহাদের নিজেদের আইন কানুন অনুসারে শাসন পদ্ধতি পরিচালিত করেন, সেই গুলিই চীনের তৃতীয় মনস্তাপের কারণ। কোনও রাজ্যাধিকারে এই প্রকার পররাষ্ট্রীয় অধিকার স্থাপন রাজ্যের একাধিপত্যের প্রধান বিঘ্ন। এই প্রকার অর্পিত স্থানে যে বিদেশীয় শক্তিকে প্রথম সেই স্থান অর্পিত হইয়াছিল সেই জাতির কনসালই (Consul) সেই স্থানের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা, এবং তিনি পিকিংএ অবস্থিত তাঁহার নিজ দেশের রাজদূতের নিকট এবং নিজেদেশের সরকারের নিকট তাঁহার কার্য্যাবলীর জন্য দায়ী। তিনি চীন সরকারের কোন ধার ধারেন না। স্থানীয় শাসন প্রণালী করদাতা গণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত এক মিউনিসিপাল সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তাঁহার নিজ জাতীয় লোক সকল দীর্ঘকাল ব্যাপী জমির ইজারা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য বিদেশীয় লোক সমূহও তাঁহাদের সমান অধিকার সত্ত্বে সেখানে জমির ইজারা লইতে পারেন, কিন্তু কোনও চীনদেশবাসী নিজ নামে সেখানে সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে পারেন না। বৈদেশিক নানা জাতির উপনিবেশ সমূহে (settlements) বিভিন্ন শক্তির কনসাল (Consul) গণই সমবেত ভাবে শাসন সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। এই সকল স্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় চীনাগণের কোনও অধিকার বা সত্ত্ব নাই—যদিও তাহারা অন্যান্য বৈদেশিক অধিবাসীর ন্যায় কর ও শুল্কাদি সমভাবেই দিতে বাধ্য। এই সকল স্থানগুলি যে বৈদেশিক বণিকদের হাতে বিশেষ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এই সকল স্থানের বাণিজ্য প্রসার ও প্রতিপত্তি চীনবাসিগণকে যথা সম্ভব আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি যদিও এই সকল স্থানের মোট লোক সংখ্যার শতকরা নব্বই জনই চীনদেশীয়, তথাপি আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কোনই অধিকার দেওয়া হয় নাই। যতদিন মাঞ্চুবংশীয় রাজাদের প্রতিপত্তি অপ্রতিহত ছিল, ততদিন কেহই এই বৈদেশিক স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনও বিশেষ প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু গণতন্ত্র স্থাপন হইবার পর হইতেই রাজ্যের এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই অন্তরায়ের বিরুদ্ধে এই ভীষণ প্রতিবাদ উঠিয়াছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের পাঁচটী, ফরাসী দেশের চারিটী, জাপানের দুইটী, ইতালী এবং বেলজিয়ম প্রত্যেকের

একটী এই ভাবের সন্ধি সর্ত্ত প্রদত্ত স্থান গুলি (concessions) চীন দেশের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। মার্কিনকে প্রদত্ত তিয়েনশিন (Tientsin) এবং সাংঘাই (Shanghai) ইংরেজ উপনিবেশ সমূহে পরিণত হইয়াছে।

(৪) অবশেষে তরুণ চীন সঙ্ঘ যথার্থই মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন বিদেশীয়েরা তাঁহাদের দেশে আমদানী রপ্তানীর মালের উপর ধার্য্য শুল্ক নিজ নিজ স্বকার্য্য সাধনের জন্যই দখল করিয়া বসিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চীন রাজ সরকার বক্সার বিদ্রোহের ক্ষতি পূরণ দিতে অসমর্থ হইলে,এই শুল্ক আদায়ের ভার বিদেশীয়দের হস্তে অর্পিত হয়। এই শুল্ক আদায়ে বিদেশীয়েরা যে সততা ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন, তাহারই ফলে শুল্ক আদায়ের জন্য স্থায়ী বিদেশীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হন। এই খানেই চীন দেশস্থ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহের শুল্ক আদায় জন্য বিদেশীয় Inspectorate General নামীয় কার্য্য বিভাগের উৎপত্তি হয়, এবং এখনও এই প্রকার রাজস্ব আদায়ের ভার ইহার উপরই রহিয়া গিয়াছে। এই কার্য্য-বিভাগের সততা ও পারদর্শিতা চীনের প্রজাতন্ত্র সরকারও স্বীকার করিয়াছেন, এবং ইহার সততায় বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া এবং ইহার সুশাসন ও সুব্যবস্থায় নির্ভর করা সম্ভব মনে করিয়া বিদেশীয় অর্থ প্রচুর পরিমাণে চীন রাজ্যে নিয়োজিত হইতেছে। বিদেশীয় শক্তি সমূহের দিক হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত চীন বিদেশীয়দের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত এই রাজস্ব আদায়ের বিভাগ বিদেশীয়দের হাত হইতে তুলিয়া চীনাদের হস্তে অর্পিত হইতে পারে না। কিন্তু তরুণ চীনসঙ্ঘ অনিশ্চিত ভাবে কতকাল তাঁহাদের দেশের এক বিশেষ লাভজনক রাজস্ব বিভাগ বিদেশীয়দের করতলগত থাকিতে দিতে পারেন? তাঁহাদের আশা ও অভিলাষ দুই আছে, এমতাবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে বিলম্ব অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয়দের দেনা শোধ করিয়া যদি স্বাধীন ভাবে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সে ব্যবস্থা কোনদিনই হইয়া উঠিবে না। কারণ, যাঁহারা ঋণদাতা, ঋণ শোধ করিবার ভারও যদি তাঁহাদেরই উপর অর্পিত হয়, তবে সেই ঋণ কখনও শোধ হয় কি না সন্দেহ।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত কারণে পাশ্চাত্য ভাবে উদ্দীপিত চীনীয় সমাজ বিদেশীয়দের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং আজ চীনে যে অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা যায়, ইহাই তাহার মূল কারণ।

শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মিশর দেশের কথা

মিশরবাসীরা বহু পুরাতন জাতি। আজ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাদের ইতিহাস অনুসরণ করা যায়। এই দশ হাজার বৎসরের মধ্যে ত্রিশ বার বিভিন্ন আক্রমণ মিশরকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু আক্রমণকারীরা যতই ইহার আচার ব্যবহার ইত্যাদি উল্টাইয়া দিয়া যাক, কয়েক শতাব্দী মধ্যেই মিশর পুনরায় নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মিশর যে সেই আদিম যুগের মিশরের ধারা অনেকটা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে, তাহা আমরা প্রসঙ্গক্রমে বুঝিতে পারিব।

বর্ত্তমান মিশর আরব দেশের ভাষা, ধর্ম্ম ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। মিশরের সভ্যতাও অনেকটা আরব প্রকৃতির। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মিশরের মূল ধারা বিকৃত হয় নাই। কত বিদেশীয় শাসন মিশরের উপর

১। মিশরের সরু গলির মধ্যে এইরূপ গাধার গাড়ীর প্রচলন আছে। অনেক লোক উঠিলেও ভার সমতার দিকে দৃষ্টি রাখায় গাধার বিশেষ কষ্ট হয় না।

২। বিবাহোপলক্ষে কন্যা বরের বাড়ী যাইতেছে
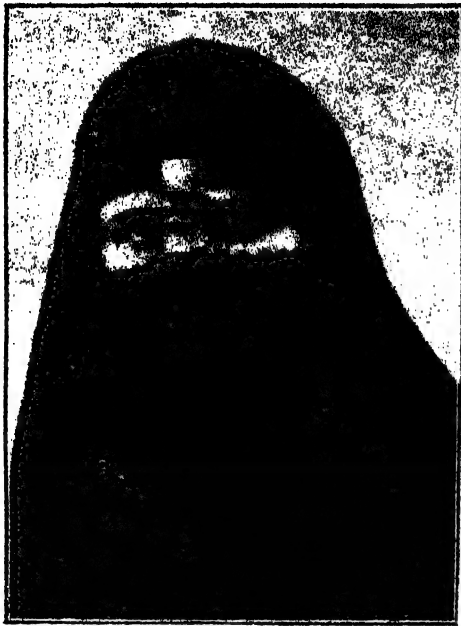
৩। মিশর রমণীর 'ভেল' পরিবার ধরণ।

দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ সকলের মধ্য দিয়া Moslems এবং Copts,—মিশরবাসীর দুইটা প্রধান ভাগ ঠিক ভাবেই আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। Cairoর মত বড় বড় সহরে লোকে যাহাই ভাবুক, মিশরের চাষারা (fellatere) পিরামিডের (Pyramids) পুর্ব্বে যুগেও যেমন চাষ আবাদ করিত এখনও সেরূপ করে। এই চাষাদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী—প্রায় এক কোটী আঠাইশ লক্ষ।

মিশর খণ্ডের প্রধান নদী—'নীল' (Nile) এবং তাহার দুই শাখা; ইহা ভিন্ন বহু খাল খনন করিয়া মিশরের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য যে রাস্তাগুলি আছে সেগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অযত্নরক্ষিত। খুব প্রশস্ত রাস্তা (ইংরাজীতে যাহাকে high road বলে) নাই বলিলেও চলে। একখানা মোটর গাড়ী ভাল করিয়া চলিতে পারে, এ রকম রাস্তার সংখ্যাও অতল্প। স্থানীয় অধিবাসীরা সেই জন্য বেশী দূর যাতায়াত করিতে হইলে গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে অথবা উটের উপরেই চড়িয়া যাতায়াত করে। বড় বড় জমীদারেরা ছোট ছোট ঘোড়ার গাড়ীও ব্যবহার করেন, কিন্তু গৃহস্থ অধিকাংশ ভদ্রলোক গর্দ্দভ পৃষ্ঠে চড়াই সুসঙ্গত মনে করেন। এখন অবশ্য রেলওয়ের বিস্তার হওয়ায় যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছে।

এইবার একটু চাষাদের কথা বলি। এরা খুব সামান্য রকমের কুঁড়ে ঘরে বাস করে, তাদের দেওয়াল রৌদ্রে শুখানো ইটের তৈয়ারী, আর চাল খড়ের। ঘরগুলি সামান্যই আলো-বাতাস পায়, আর আসবাব পত্র একেবারে নাই বলিলেও চলে। ঘরের মেঝেয় দুইচার খানা মাদুর ছড়ানো আছে আর আছে গুটি কয়েক মাটির বাসন-পত্র। চাষাদের মধ্যে দুইএকখানা দ্বিতল কুঠিও দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। কাইরোর পথে ঘাটে এই সব ভিস্তিরা তৃষিত-লোককে জলদান করে।

৫। মহিষের পরিবর্ত্তে উট দিয়াও ক্ষেত্র কর্ষণ করা হয়।

অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিদিগের বাড়ী যুরোপীয় আদর্শে গঠিত। সেগুলি প্রায় সাদা অথবা গোলাপী রঙের; বাড়ীর সম্মুখে বারান্দা থাকে। গ্রামের মধ্যেও এই রকম দুই চারি খানি বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি এত অপটুতার সহিত তৈয়ারী যে, তাহারা কি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। হোটেলের কক্ষ সমূহে বেড়াইবার সময়, সেগুলি দুলিয়া উঠে এবং মচ মচ শব্দ করে। বাড়ীর দেওয়াল গুলা চারিদিকে হেলিয়া আছে; বাথরুম (স্নান কক্ষ) নামক কোনও জিনিষের অস্তিত্ব নাই।

মিশরের চাষারা বেশী মাংস খায় না; তবে রমজান মাসে খায়—কারণ সেই মাসে সমস্ত দিন তাদের উপবাস করিয়া থাকিতে হয় এবং রাত্রে একবার খাইতে হয়; সুতরাং এই একবেলার রাত্রের খাওয়া অধিকতর পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। তাহাদের প্রধান খাদ্য রুটী, পেঁয়াজ, সীম, এবং গৃহ-প্রস্তুত মাখন। সিগারেট গৃহস্থ এবং ধনী সকলেই খুব ব্যবহার করে; তবে প্রাচীনপন্থীরা এখনও হুঁকার পক্ষপাতী।

ইহাদের পোষাক আরব দেশের লোকের মতন। মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করে, এবং পাজামা পরে। জুতা অনেক সময় পকেটের মধ্যে লইয়া যায়, এবং আবশ্যক হইলে তাড়াতাড়ি পরিয়া লয়। মেয়েরাও পাজামা ও আলখাল্লা পরে এবং মুখ আবৃত করিয়া রাখে। চাষার মেয়েরা এক রকম শাল মুড়ি দিয়া যায় এবং আবশ্যক হইলে মুখের উপর ফেলিয়া দিয়ে veilএর মতন ব্যবহার করে। ঝগড়া করিবার সময় চাষারা খুব চিৎকার করে, মুখ খুব কাছাকাছি লইয়া আসে এবং হাত চারিদিকে ঘুরাইতে থাকে, কিন্তু গুরুতর মারপিট কচিৎ করে। তাহারা খুব ধূর্ত্ত এবং বিশেষ যে সত্যবাদী তাও নয়; কিন্তু তথাপি তারা নম্র, পুত্রবৎসল, মিতাচারী। Arthur Weigall সাহেব বলছেন—"Their gentleness, their light-heartedness, their love of their children, their often strict morals, their abstemiousness, their great capacity for hard work and many other good quali-
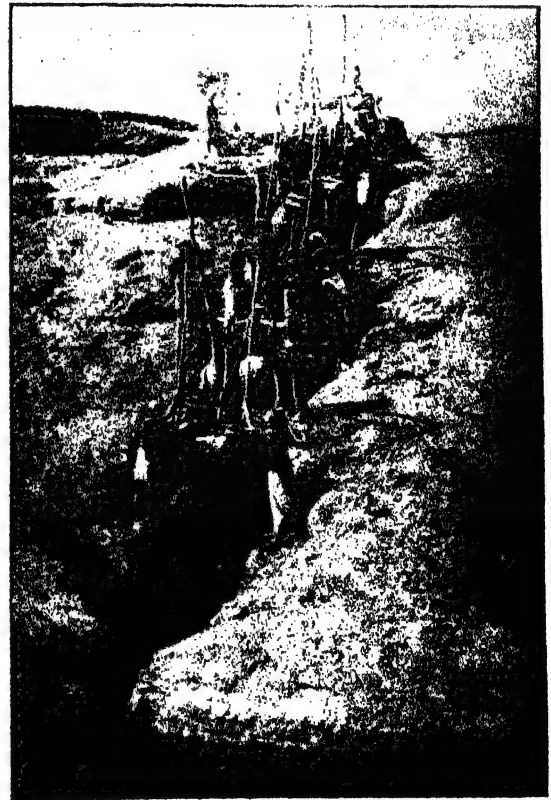
৬। নিম্নভূমি হইতে জল তুলিয়া উপরের জমিতে দেওয়া হইতেছে।

জল সেচনের আর এক প্রকারের ব্যবস্থা।

ties cause them generally to be regarded as a fine race of men."

মিশরী কৃষিজীবীরা অত্যন্ত অশিক্ষিত। গ্রামের বিদ্যালয়ে পঠিত কোরানের বাহিরে তাহাদের বিদ্যা অগ্রসর হয় না; অতি অল্প সংখ্যক লোকই লিখিতে পড়িতে জানে। জাতীয় সাহিত্য-সম্পদ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নয়; যে সমস্ত গান তাহারা গায়, সেগুলির সুর খুব মিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কাব্য হিসাবে ভাব-সম্পদ কিছুই নাই।

মিশরে ক্ষেত্রকর্ষণ অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। সারা মিশরে ধান্য-ক্ষেত্রগুলি জল-সিঞ্চিত করিতে হইলে ঐ একমাত্র নীল নদীই ভরসা। বর্ষার মুখে নদী কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়, হেমন্তে বাঁধ ভাঙ্গিয়া চারিদিকে প্লাবিত হয়। লৌহ দরজা ও নল প্রভৃতি নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে জল আবদ্ধ ও নিকাশের ব্যবস্থা করা

৮। বেদুইন বালিকা।

হইয়াছে, এবং ইচ্ছামত ক্ষেত্রে জল সিঞ্চিত করা হয়। সব চেয়ে শ্রমসাধ্য ব্যাপার নীচু হইতে জল তুলিয়া উপরের জমিতে জল দেওয়া। কৃষকেরা ক্ষেতের এই সব কায করে, উট, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদির সেবাযত্ন করে—মিশরী

৯। নিউবিয়া প্রদেশের মরুসুন্দরী।

কৃষকেরা একটুও হাঁফ ছাড়িবার সময় পায় না। কিন্তু তবুও গ্রামের নানারূপ সামাজিক ব্যাপারে তাহারা যোগদান করে। গ্রামে একটা না একটা কিছু লাগিয়াই আছে, হয় জন্মোৎসব, নয় তো বিবাহোৎসব, নয় তো খুব ঘটা করিয়া কোনও ধনী ব্যক্তির শব-যাত্রা। এই সব সামাজিক উৎসব ছাড়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আরও উৎসবাদি অবশ্য আছে। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় গ্রামবাসীরা নানারূপ নৃত্য করে এবং 'লাইলাহা' বলিয়া অনবরত মাথা দুলাইতে থাকে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত একরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া না পড়ে। গ্রামের মধ্যে এই সকল ব্যাপারে সুরাপানজনিত মত্ততা এবং কাম প্রণোদিত অনাচার খুব অল্পই দৃষ্ট হয়—কারণ মুসলমান ধর্ম্মে সুরাপান নিষিদ্ধ। তবে যে সকল গ্রামবাসীরা সহরের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

কাইরো এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরে পাশ্চাত্য ধরণে শিক্ষিত লোকেরা অধিকাংশই বাস করে; তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্স হইতে শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আজ-কাল ধনী মিশরবাসীদের প্রথা হইতেছে—পাশ্চাত্য ধরণে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া তাহাতে ফরাসী আসবাপত্রে পূর্ণ করা। উচ্চ ঘরের মেয়েরা অত্যন্ত পর্দ্দানসীন। তাহারা যখন রাস্তায় বাহির হয়, মাথার উপর একটা রেশমী আবরণ থাকে এবং মুখের উপর পাতলা সাদা জাল থাকে। এমন কি থিয়েটার প্রভৃতিতেও তাহাদের আসনের সম্মুখে সাদা লেসের পরদা থাকে।

নীল নদীর আশে-পাশে একদল লোক বাস করে—ইহারা বেদুইন। তহাদের সহিত কেহ মেশে না; সহরে বাস করিয়া সরকারকে খাজনা দেওয়া তাহারা দাসত্ব বলিয়া মনে করে। তাহাদের কোনও স্থির বাসস্থান নাই; মরুভূমির উপরে আজ এখানে কাল সেখানে এমনি করিয়া জীবন কাটায়।

১০। অনাবৃতমুখী মিশর-রমণী

১১। নীল নদী হইতে সন্ধ্যাবেলা জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

মিশরবাসী সকল শ্রেণীরই মধ্যে নানা রকম কুসংস্কার ও অদ্ভুত বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অনেকগুলি ফারাওদিগের সময় হইতে প্রচলিত আছে। একটা উদাহরণ মিশরবাসীরা বিশ্বাস করে যে যমজ সন্তানের মধ্যে যেটি ছোট, সে ইচ্ছা করলেই নিজেকে বিড়ালে পরিণত করিতে পারে। ইহা ব্যতীত ভূত ও প্রেতাত্মায় তাহাদের বিশ্বাস তো আছেই।

মিশর দেশে নানা জাতীয় ফল ও ফুলের গাছ আছে। এতদ্ভিন্ন বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত বড় বড় গাছ প্রখর রৌদ্রে পথিকদের ছায়াদান করে। মিশরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও খুব মনোরম।

শ্রীঅনিলকুমার বসু।

টমাস হার্ডি

নিত্য নহবতের বংশী শ্রবণে অভ্যস্ত মন্দিরের পূজারী মন্দির পথে গির্জ্জার মধুর অর্গান বাদন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবে—"কে বাজায়! কি মধুর বাজায়!" তাহাদের সমাজে বাদনের সমালোচনা চলিল, বাদকের পরিচয় কেহ দিল না। অনেকেই টমাস হার্ডির উপন্যাস পড়িয়াছেন, কিন্তু লেখার সাহায্যে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় গ্রহণ বোধ হয় অল্প লোকেই করেন। ১০ বৎসর পূর্ব্বে কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাথে পুরাতন পুস্তকস্তূপের মধ্য হইতে একখানি জীর্ণ পুস্তক দুই আনা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম। সেইদিনই আমার টমাস হার্ডির সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে। তাহার পর এক উদ্যমেই টমাস হার্ডির ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছিলাম।

প্রত্যেক প্রতিভাশালী লেখকের পৃষ্ঠপোষক সমালোচক দল তাঁহার প্রাথমিক অতি তুচ্ছ দানেরও বৈশিষ্ট্য অন্বেষণে তৎপর হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ টমাস হার্ডির সেইরূপ পৃষ্ঠপোষক দল ছিল না। একজন সম্পাদক "The Poor man and the Lady" শীর্ষক প্রথম গল্পটি অমনোনীত করিয়াছিলেন। সেই একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধক স্বদেশে বিদেশে পাঠকবর্গের হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে প্রতিভা অজেয়। রসমুগ্ধ পাঠকবর্গ স্বীকার করিল, লেখা পাঠ করিয়া লেখককে না দেখিয়া থাকিতে পারা যায় না, তখন দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত দর্শনপ্রার্থিগণ তাঁহার বৈরাগ্য ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইল। একদল যুক্তরাজ্যবাসী এক সময়ে বিলাতের একটি হোটেলে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিল, "টমাস হার্ডি কোথায় বাস করেন?"

উত্তরে অধ্যক্ষ বলিলেন, "তাঁহার বাড়ী এই স্থান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে; কিন্তু মিঃ হার্ডি এ সময় বাড়ী থাকেন না এবং থাকিলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব নহে, কারণ বাহিরের লোকের সে গৃহে প্রবেশাধিকার নাই।"

তাহাদের মধ্যে একজন মহিলা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বেশ। আমি যে তাঁহার ভক্তদের মধ্যে একজন! আমি যে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য তাঁহার সমস্ত পুস্তকগুলি আমার ব্যাগে ভরিয়া আনিয়াছি। আমি কি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও কবির সাক্ষাৎ পাইব না? অন্ততঃ দেশে গিয়া পরিচয় দিতে চাই যে আমি এই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানিবেন তাহা অসম্ভব।"

অধ্যক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা ডরচেষ্টরে উপস্থিত

টমাস হার্ডি

টমাস হার্ডির জন্মস্থান

ম্যাক্সগেট, ডরচেষ্টরে

হইয়া নগরটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও তৃপ্ত হইল না, কারণ তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই বিফল হইল।

পর দিবস অধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনার সন্তোষের জন্য বলিতেছি যে আপনার সাধ মিটিয়াছে। গত কল্য আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ঐ পার্শ্বের টেবিলে একটি ভদ্রলোক দুইটি ভদ্রমহিলার সহিত একত্রে বসিয়া জলযোগ করিতেছিলেন, সেই ভদ্রলোকটীই মিঃ টমাস হার্ডি।"

মহিলাটি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সত্য না কি? আমাকে কেন তখন বলিলেন না? আপনাদের ইংরাজ জাতির এই অনালাপ অভ্যাস বড়ই বিরক্তিকর। আমাদের দেশে এইরূপ গোপনতা করা চলে না।"

এইরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিত। ইহারাই টমাস হার্ডির যথার্থ ভক্ত ও অনুরক্ত। প্রাণান্তেও ইহারা হার্ডিকে দুঃখবাদী বলিয়া স্বীকার করিবে না এবং তাঁহার কবিতা ব্যবচ্ছেদের প্রবৃত্তিও ইহাদের নাই। সমস্ত গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্ককে উপেক্ষা করিয়া, অযথা স্তুতি-বাদ ও অন্যায় প্রতিবাদকে অবজ্ঞা করিয়া ইহারা নত

ডরচেষ্টারে অবস্থিত শান্তিকুটীর সংলগ্ন হার্ডির পাঠাগারের প্রাচীর গাত্র গ্রন্থকারের বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক চিত্রে পরিপূর্ণ এবং তাহাদেরই এক পার্শ্বে একটী প্রাচীন বহুমূল্য বেহালা তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় চিত্রগুলির একটীও সার্থক হয় নাই। তাঁহার বন্ধু চিত্রকর উইলিয়ম ষ্ট্র্যাং বার বার তাঁহার চক্ষু অঙ্কনে অকৃতকার্য্য হইয়া বলিতেন——"তোমার সদা ভাবপরিবর্ত্তনশীল চক্ষুর্দ্বয় আমাকে উচ্চপদের ডিটেক্‌টিভ করিয়া ছাড়িয়া দিবে।" প্রসিদ্ধ চিত্রকলাবিৎ W. R. Ouless ও Herkomer উক্ত মত সমর্থন করেন। বাস্তবিকই হার্ডির সরল চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি সকলকেই বশীভূত করিত।

আমরা লয়েড জর্জ্জের বহু চিত্র দেখিয়াছি—তাঁহার কর্ম্মপটুতায় সফলতা সূচক হাস্য আমরা অনুমোদন করি না; সার উইলিয়ম হারকোর্ট চতুর হাস্যে আমাদিগকে জয় করিতে পারেন নাই; লর্ড চার্লস্ বেরেস্‌ফোর্ডএর অলস হাস্য ও বোনার লয়ের করুণ হাস্যেও আমরা তৃপ্তি পাই না। কিন্তু হার্ডির সংযত স্বচ্ছ হাস্য তাঁহার চোখে মুখে ও কথার রহস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করে। অনেকেই বলেন যে হার্ডি দুঃখবাদী বলিয়া চক্ষু উন্মীলিত করিয়া হাসিতেন এবং আরও বলেন যে, এতবড় একটা প্রতিভার পক্ষে দুঃখবাদী হওয়ায় কলঙ্কের বিষয়। ইহার প্রতিবাদ করে হার্ডি তাঁহার কোন উপন্যাস চরিত্রের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "মনুষ্য জীবনের শুভ ও অশুভ নৈমিত্তিকতার প্রতি সমান ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া সে দুঃখবাদী আখ্যা লাভ করিয়াছিল।" ("He was a pessimist in so far as that character applies to a man who looks at the worst contingencies as well as the best in human conditions.")

হার্ডির সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় আমরা তাঁহার পুস্তক হইতেই যথেষ্ট পাই। তাঁহার কক্ষপ্রাচীর গাত্রে বিলম্বিত বেহালার কথায় Under the Greenwood tree" উপন্যাসের বৃদ্ধ ডিউইর কথা মনে পড়ে—"তন্ত্রীর ন্যায় কেহ তোমার মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবে না।" ইহা হার্ডির প্রাণের কথা। তাঁহার সঙ্গীত চর্চ্চার সম্বন্ধে তাঁহার এক বন্ধু বলিয়াছেন, "সঙ্গীতজ্ঞের মতই হার্ডির কর্ণদ্বয় বৃহৎ ও সুগঠন।"

হার্ডির দৈনিক জীবনের প্রত্যেক পট পরিবর্ত্তনে তাঁহার গভীর বুদ্ধির স্বচ্ছন্দগতির উল্লেখ করিয়া বলিতে হয় যেন কোন নাটক চরিত্রের নিয়মবদ্ধ গতি লক্ষ্য করিতেছি। আমাদের মনে হয় এই তরুণ বৃদ্ধ (aged youth) চরিত্রাঙ্কনে সেই প্রবীণের লেখনী ব্যতীত সম্ভব হয় না।

ডেভিড গ্যারিকের বিশ্রাম কুঞ্জরূপে ও জাঁ জাক ও রুসোর পদস্পর্শে এডেলফি টেরেসের স্থানমাহাত্ম্য আছে। উক্ত পবিত্র আবাসস্থলে সৌধশিল্পী সার আর্থার ব্লোমফিল্ডের সহকারী পদ গ্রহণ করিয়া টমাস হার্ডি ১৮৬২ খৃঃ লণ্ডনে আগমন করেন। তাঁহার বাল্যজীবনও লণ্ডনে অতিবাহিত হইয়াছিল। বোধ হয় উক্ত স্থানমাহাত্ম্যের জন্য হার্ডির মনে সাহিত্যানুরাগ জাগিয়া উঠে। সারাদিন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি রাত্রে কবিতা লিখিতেন। এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রৌঢ়বয়স পর্য্যন্ত উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত থাকিয়া, বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে হাজরফোর্ড মার্কেটের নিকট এক ভোজনালয়ে তিনি প্রত্যহ জলযোগের সময় থ্যাকারে ও ও অন্যান্য পণ্ডিতগণকে দেখিতেন, কিন্তু কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন নাই। এইরূপ আত্মবশতাই হার্ডি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

একদিন হার্ডির এক চিত্রকর বন্ধু হার্ডির উপন্যাস লিখনভঙ্গীর একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া উহার "Writing another novel" (নূতন উপন্যাস প্রণয়ন) নামকরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে হার্ডি হাসিয়া বলেন, "পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে কাহারও যুবক-যুবতীর প্রেমের বিষয়ে কৌতূহল থাকে না।" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় হার্ডি বার্দ্ধক্যে

উপন্যাস ছাড়িয়া কবিতার প্রতি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। বন্ধুবয়ের চিত্রাঙ্কন কার্য্য চলিল। হঠাৎ একদিন হার্ডি তাঁহার অঙ্কিত রেখাচিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার অঙ্কনকৌশল ও যত্নের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "আমার পাণ্ডুলিপিগুলি আমি বড়ই ভয়ে ভয়ে রাখিতাম, কারণ আমার প্রতিলিপি (copy) রাখার অভ্যাস ছিল না। এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্ম আমি একটী নিত্য নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতাম—যতশীঘ্র সম্ভব সেগুলি ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতাম। পরে আমার সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলি চিঠি ছাপিবার কলে ছাপিতে আরম্ভ করি। ইদানী টাইপরাইটারের সাহায্যে অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া লইতেছি।"

বৃদ্ধ হার্ডি যুবকের ন্যায় দৃঢ় হস্তে সুন্দর ছাঁদে লিখিতে পারিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "কবির স্বহস্তেই কবিতা লেখা উচিত।"

লিপিচাতুর্য্য যাহার আয়ত্ত, সে বয়সের অক্ষমতা মানিবে কেন? বৃদ্ধ হাস্যোজ্জ্বল চক্ষে দৃঢ়স্বরে এই সমস্ত উপদেশ দিতেন। প্রত্যেক উক্তিতেই তাঁহার গভীর চিন্তার ইঙ্গিত থাকিত।

আমরা টেসের চিত্র দর্শনে হার্ডিকে দুঃখবাদী বলি বটে, কিন্তু শুভবাদ ও অশুভবাদের সামঞ্জস্য-নীতির উপর তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাস প্রতিষ্ঠিত। শুভবাদই জাগতিক ঘাতপ্রতিঘাতে অশুভবাদে পরিণত হয় এবং ইহাই মনুষ্যধর্ম্মের পরিণত অবস্থা। সুখবাদের লালনে কাল্পনিক সুখরাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পরম দুঃখবাদী ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মই মিথ্যা হইয়া যায়। দেখা যায় যে কেবল দুঃখে বিরাগবশতঃ সকলেই সান্ত্বনার জন্ম সুখবাদীর নিকট ধাবিত হয় এবং সেইজন্মই বোধ হয় তাহারা হার্ডি দুঃখবাদী বলিয়া তাঁহার প্রতিভাকে হীনপ্রভ মনে করে। সর্ব্বসময়েই আখ্যানবস্তুর দোষ গুণ বিচার করা চলে না, লেখকের বিভূতি-পটুতার বিচার করিতে হইবে।

উপন্যাস চরিত্র সম্বন্ধে হার্ডি বলেন, "পাঠক উপন্যাস-চরিত্রকে বাস্তব মানিয়া মূল আদর্শের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে যে চরিত্র যতটা বাস্তব বলিয়া মনে হয়, উহা সেই অনুপাতেই কাল্পনিক।"

হার্ডির পত্রগুচ্ছ অস্বাভাবিক কল্পনায় পরিপূর্ণ হইলেও তাহা সাধারণ মনুষ্য জীবনের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে মাত্র। যে অনুনয়পূর্ণ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা টেস তাহার স্বামীকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ম অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিল, তাহা হার্ডি ব্যতীত অপর কেহ ধারণা করিতে পারিত কি না সন্দেহ। হার্ডি বলেন, "প্রাতে অন্যান্য কার্য্যের ফাঁকে আমি ওগুলি লিখিতাম।" ইহাই হার্ডি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

পুস্তক পরিচয়ে যে গ্রন্থকার ললাটে রাজটীকা লাভ করেন, পাঠক মাত্রেই সসম্ভ্রমে তাঁহার পাদমূলে পাদ্য-অর্ঘ্য রক্ষা করে। কিন্তু লোকালয়ের অন্তরালে নিভৃত চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া স্নেহ-শূন্য ব্যর্থতায় যে এতদিন কঠোর তপস্যা করিল, তাহার কোমলতার করুণ মর্ম্ম কে বুঝিল? তাঁহার দানের মহত্বে ধনীজনোচিত বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্য নাই। হৃদয়-তন্ত্রীর ঝঙ্কারে যে কর্ম্মের নিঃস্বার্থ বৈজয়ন্তী নাচিয়া উঠে তাহার আনন্দময় নৃত্যগাথা সকলেরই মর্ম্মস্পর্শী হইয়া ভেদাভেদ নির্ব্বিচারে অক্ষয় হইয়া থাকে। সেই দানেই গৌরব যাহার বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত স্বচ্ছ-দর্পণে প্রতিফলিত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের, যশাকাঙ্ক্ষার নিকট মস্তক অবনত করে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, কিন্তু সেই স্বর্গগত আত্মা স্বদেশ ও বিদেশের ভক্তি অর্ঘ্য লাভ করিয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ দানের তৃপ্তি অনুভব করিবেন।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

বিদায়

বিদায় আজি গভীর রাতে, বিদায় আজি ভাই,
জগৎ হ'তে মানব হ'তে বিদায় আজি চাই,
বিদায়, ওগো নিথর রাতি,
আর না চাহি জীবন বাতি
জ্বালাতে আমি তপন সাথে, বাঁচিতে বল নাই;
আঁধার-যবনিকার তলে গলিয়া ঝরে' যাই।
স্তব্ধ আজি সকল দিশা,
সকল গতি হয়েছে নিশা,
সকল ধ্বনি মরণ বুকে লুটায়ে অবসান;
আমার বুকে দুলিছে মৃদু সভয় মম প্রাণ।
আকাশ চাহে হাজার চোখে,
দানব যেন মরণ লোকে
ডাকিছে ঘন ডাকিছে মোরে অচল ইসারায়,
কাঁপিছে দেহ কাঁপিছে প্রাণ, শকতি শিথিলায়।
কহিতে ভাষা শকতি নাহি,
বিমূঢ় চিতে বিদায় চাহি—
বিদায় আজি বিদায় প্রিয়া আঁধার-হিয়া-মণি,
বিদায় স্নেহপুতলী শিশু হরষ-সুখ-খনি।
বিদায় যেবা বেঁধেছ মোরে
ক্ষণিক স্নেহ প্রীতির ডোরে,
হরষ দিয়ে হাস্য দিয়ে জিনিলে যেবা মন,
চলিতে পথে মধুর ভাবে যে দিলে প্রেম ধন।
বিদায় মম কিশোর প্রিয়া,
নিকটে দূরে নয়ন দিয়া
যে দিলে মোরে পরাণ ঢালি' পরাণে কত দিন,
বিদায় ওরে পাগল শিশু চপল দুখহীন।

বিদায় আজি বকুল চাঁপা মল্লিকা ও যুঁই,
ফুটিয়া থাক, আজিকে তব বয়ানে চুমা থুই;
চুমিয়া তব পরাগ স্নেহে
অধর ভরি মাখায়ে দেহে
সুবাস ভরা তোমারি তলে বিদায়-নত শুই;
বিদায় লব, চাহিয়া শেষ মুদিব আঁখি দুই।

বিদায় দেহ আমারে আজি হে তৃণ মাথা-তোলা,
কঠোর পায়ে দলেছি কত ক্ষম গো ক্ষমা-ভোলা,
ক্ষমগো মোরে বিদায় কালে
তোমার বুকে তপ্ত ভালে
লুটায়ে পড়ি গভীর দুখে জুড়াতে ক্ষতজ্বালা,
ভালে ও চিতে পরশ দেহ শীতল স্নেহঢালা।

বিদায় দেহ আমারে মা গো ধরণী স্নেহময়ী,
কত যে ঋণী তোমার কাছে কেমনে তাহা কহি?
ভ্রূণের রূপে তোমার বুকে
লুকায়ে ছিনু যুগে ও যুগে,
করিয়া জীব জাগালে মোরে অকূল বেলা 'পরে,
কীটের রূপে গড়ায়ে এনু শকতি-সুখ-ভরে।
সে কীট হতে গড়িলে মোরে
প্রবল দৃঢ় মানব করে';
তোমারি বায়ু তোমারি জল অন্নে পালি তব
করিলে কীটে মহিমময় মানব অভিনব।
বিদায় নিতে তোমারি পাশে
এ বুক মম ফাটিয়া আসে,
তুমি যে মম সবার সেরা মায়ের সেরা মাতা,
ভালো যে বাসি তোমার মাটী ধূলি ও তৃণ পাতা।
তবুও মা গো বিদায় মাগি
জননী সুখ দুখের ভাগী,
গভীর রাতে কে মোরে ডাকে, মরণ যেন চিনি,
কত না ক্ষণে তাহার সনে হয়েছে ঝিকিমিকি।

সে আজি ডাকে তারার চোখে,
সে আজি ডাকে গভীর শোকে,
আঁধার হাতে পরশ করে আমার দেহখানি,
নিবিছে বাতি, থামিছে গতি, তাহারি জয় মানি।

বিদায় আজি বিদায় মাগি—
মানব, ধরা তৃণের লাগি,
প্রীতির শ্বাস রাখিয়া গেনু নিয়ো গো নিয়ো তুলি,
বিদায় নিল পাগল কবি চপল লীলা ভুলি।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল ফোর্স

ছয় বৎসর হইল উপরি-উক্ত সৈন্য দলটি বাঙ্গালা দেশে গঠিত হইয়াছে এবং গত ১৯২২ সাল হইতে প্রতি বৎসর একমাস করিয়া ইহারা কলিকাতায় সমবেত হইয়া সামরিক শিক্ষা লাভ করিতেছে। এই সৈন্য দলটি এ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে দেশবাসীর দৃষ্টি বা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আমি এই প্রবন্ধে এই সৈন্য দলটি সম্বন্ধে "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র পাঠক পাঠিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাঙ্গলা দেশের যুবকেরা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার অবসর ও সুযোগ পাইতেছে। যুদ্ধাবসানে তাৎকালীন প্রয়োজনীয় সৈন্য দলগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইহা যেরূপ বাঙ্গলা দেশে সেইরূপ অন্যান্য প্রদেশেও হইয়াছিল এবং যুদ্ধকালে প্রস্তুত নবগঠিত সৈন্য দলগুলি এখন কোনও প্রদেশে বর্ত্তমান নাই। বাঙ্গলা দেশের যুবকেরা যাহাতে সামরিক শিক্ষার সুযোগ একেবারে না হারায়, সেইজন্য বাঙ্গলা দেশে ইউনিভার্সিটি ট্রেণিং কোর ও টেরিটোরিয়াল ফোর্স নামক দুইটি সৈন্য দল গঠিত হয়। প্রথমটিতে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডারগ্রাজুয়েটদের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে এবং দ্বিতীয়টিতে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। প্রথম দলটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাহাদের শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়গুলির ন্যায় যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা করিয়া থাকে কিন্তু দেশের শান্তি রক্ষার জন্য বা যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে যোগ দিবার জন্য তাহারা বাধ্য নহে। দ্বিতীয় দলটি ভারতীয় রেগুলার ফোর্স বা পাকা সৈন্য দলের একটি সাহায্যকারী অংশ। ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য। রেগুলার ফোর্স বা সাধারণ ফৌজ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে,এই দলটিকে যুদ্ধ করিবার জন্য কখনও ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে হয় না। মনে করুন তুরস্কের সহিত ভারতবর্ষের যুদ্ধ হইতেছে এবং তুর্কি ফৌজ ভারতের সীমার ভিতর সিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এমত অবস্থায় টেরিটোরিয়াল পল্টনগুলিকে ভারতবর্ষের ভিতর তুর্কি সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু মনে করুন সাংহাইতে বৃটিশ সরকারের সহিত চীনের যুদ্ধ চলিতেছে, এমত অবস্থায় ভারতের বাহিরে—চীনে, যুদ্ধ করিবার জন্য এই সৈন্য দলটিকে লইয়া যাইতে পারা যাইবে না। এই দ্বিতীয় দলটিই আমার প্রবন্ধের বিষয়।

এই দলভুক্ত যুবকদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বৎসরে একমাস করিয়া সমবেত করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহা প্রতি ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় সমবেত হয় এবং দলটি কেল্লার নিকটবর্ত্তী ময়দানের একাংশে শিবির সন্নিবেশ করে। এই একমাস ইহারা রেগুলার ফোর্সের নিয়মাদি পালন করে এবং কুচ্, কাওয়াজ, বন্দুক ও সঙ্গীনের ব্যবহার এবং লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিয়া থাকে।

প্রতিদিন প্যারেড বা কুচ্ কাওয়াজের পূর্ব্বে শারীরিক ব্যায়াম (সুইডিস ড্রিল্) শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বৈকালে ফুটবল, হকি প্রভৃতি ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। আহারাদির ব্যবস্থা ভারতীয় অন্যান্য পল্টনগুলির ন্যায়। রন্ধনের কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে। বাঙ্গলা দেশের টেরিটোরিয়ল ফোর্সের যে দলটি আছে তাহা বর্ত্তমানে সামরিক বিভাগে গ্রুপ্ রেজিমেন্টের নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় জন্য ১৯ সংখ্যক হায়দ্রাবাদ রেজিমেন্টের ১১শ দল (ব্যটালিয়ান) বলিয়া পরিচিত। এই গ্রুপটি প্রধান দস বেনারসে অবস্থান করে। আমি এই সৈন্য দলের কার্য্য কলাপ বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এ বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় সৈন্য দলের যুবকেরা পূর্ব্বে কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন এবং কুচ্ কাওয়াজ ও সৈনিক শিবির সম্বন্ধে তাহাতে আলোচনা করিয়াছেন। আমার প্রধান উদ্দেশ্য দেশবাসীর সামরিক শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা।

সামরিক শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান সুফল ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্ত্তিতা অথবা আদেশানুবর্ত্তিতা অভ্যাস। অধিক সংখ্যক লোক একত্র কোনও কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে তাহারা যদি সেই কার্য্যের সহায়ক কয়েকটি নিয়ম পালন না করে, অথবা কার্য্য পরিচালকের আদেশ পালন না করে, তাহা হইলে তাহারা কিছুতেই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহাদের অভীষ্ট কার্য্যে সফল হইতে পারে না। ইহার সত্যতা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এই গুণটির অনুশীলনের সুযোগ আমরা খুব কমই লইয়া থাকি। এই ডিসিপ্লিনের অভ্যাস সামরিক শিক্ষায় যেরূপ হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কৃষিকার্য্যে, বিদ্যালয়ে, ব্যবসা বাণিজ্যে, নৌকা চালনায় আমাদের দেশের লোকও নিয়মবদ্ধভাবে কার্য্য করে ও তাহার উপকারিতা বুঝে। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের অনুশাসনগুলি নিয়মবদ্ধ জীবনযাত্রার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ ভাবে একাঙ্গীন ও নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক বলিয়াই বিশেষরূপে পালিত হইয়া থাকে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সার্ব্বজনীন উপকারক কোনও কার্য্য করিতে হইলে ইহা অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন। আমাদের দেশে কোনও দল হইলে কয়েকদিনের মধ্যেই যে তাহার বহু শাখা প্রশাখা বিভিন্ন মত লইয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে বিশেষরূপে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনও কার্য্য করিতে হইলে যে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন তাহা আমাদের এখনও আয়ত্ত হয় নাই। "আমার স্বার্থের বিরুদ্ধ হইলেও সর্ব্বসাধারণের উপকারক বলিয়া আমাকে ইহা করিতে হইবে।" "এ কার্য্য আমার মতবিরুদ্ধ কিন্তু দলস্থ সকলেই ইহাতে মত দিয়াছে অতএব সাধারণের উপকারক বলিয়া অটুট আগ্রহের সহিত আমাকেও ইহা করিতে হইবে।" এই প্রকার নিয়মানুবর্ত্তিতাই প্রকৃত ডিসিপ্লিন। এই নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্পূর্ণ ভাবে দলপতির আদেশ পালনের উপর নির্ভর করে। এই গুণটি আমাদের মধ্যে একান্ত বিরল। আমরা সমকক্ষ, পরিচিত বা সমশ্রেণীর নেতার আদেশ পালনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই। এ দোষটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই বেশী দেখা যায়। ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। দলপতির কোনও আদেশ পাইলেই আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই এবং আমাদের স্ব স্ব মত প্রচলনের চেষ্টা করিয়া থাকি। এ প্রকার মনোভাব যে সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের ঘোর অনিষ্টকারক তাহা আমরা সকলেই জানি, তবুও কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ জাতীয় দোষ ভুলিতে পারি না। এই দোষ হইতে মুক্ত হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় সামরিক শিক্ষাধীন হওয়া। দলপতির আদেশ পাইবা মাত্র সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, স্ব-ইচ্ছায় এইকার্য্য করিতেছি এই মনোভাবের সহিত সেই কার্য্যটি সম্পাদন করার নামই আদেশানুবর্ত্তিতা। টেরিটোরিয়ল ফোর্সে যোগদান করিলে বঙ্গীয় যুবকেরা এই দুর্লভ গুণের অধিকারী হইবেন এবং তাঁহাদের ভ্রাতা ভগিনী, সন্তান সন্ততি ও সমাজে তাঁহাদের সংশ্রবে যাহারা আসিবে তাহাদের ভিতর এই গুণের বিকাশ করিয়া পরোক্ষভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপকার করিতে সমর্থ হইবেন।

সামরিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুফল "এ স্প্রি-দ-কোর" বা সঙ্ঘপ্রীতি। হিন্দুস্থানী সিপাহিরা এই কথাটির পরিভাষায় "ভাই-বেরাদরি" বলিয়া থাকে। এই ভাই বেরাদরির উপরই দেশপ্রীতি নির্ভর করে এবং যে দেশের অধিবাসীদের ভিতর ভাই বেরাদরি ভাবটি নাই, তাহাদের পক্ষের স্বদেশভক্তির কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র। বিগত বৎসর হইতে যে ভীষণ আত্মকলহে সমগ্র বঙ্গদেশ বিক্ষুব্ধ হইতেছে, তাহাতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, আমরা এখনও প্রকৃত স্বদেশ প্রেমের অধিকারী হই নাই। সঙ্ঘপ্রীতি শিক্ষা সাহিত্যে, বক্তৃতায় এবং দৃষ্টান্তে কিছু কিছু হয় বটে, কিন্তু সামরিক শিক্ষায় ইহা যেরূপ সহজে হইয়া থাকে এইরূপ আর কিছুতেই হয় না। আমি বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক সামরিক আন্দোলনের সংবাদে রাখিয়া থাকি। একত্র সামরিক বিভাগে কার্য্য করিয়াছে এরূপ হিন্দু মুসলমানের ভিতর বা উচ্চ বর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভিতর যেরূপ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ্য দেখিয়াছি তাহা বাস্তবিকই আনন্দজনক।

এই টেরিটোরিয়ল ফোর্সে কেহ মনেও করে না যে সে হিন্দু বা মুসলমান। সকলেই নিজেকে বাঙ্গালী সিপাহী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এ মনোভাব কেবল মাত্র সৈনিক শিবিরেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; দলস্থ যুবকেরা দেশের গ্রামে ও পল্লীতে ইহার প্রচার করিবে ও দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ইহা যে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইবে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

টেরিটোরিয়ল ফোর্স, দেশবাসীকে দেশরক্ষার সুযোগ প্রদান করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে। দলভুক্ত যুবকেরা জানে যে তাহাদের দেশ কোনও বিদেশী জাতি দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহারা দেশ রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণে অধিকারী। ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমরা প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশের পতাকা তলে আছি বলিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতেছি এবং বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত দেশের কি দুরবস্থা হয় তাহা সম্যক বুঝিতে পারিতেছি না। সে সময় পিতাপুত্র, স্বামীস্ত্রী, ভ্রাতাভগিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, শত্রু কর্ত্তৃক লুণ্ঠন ভয়ে বণিক তাহার বাণিজ্যে বিরত হয়, চাষী তাহার ক্ষেতে হলচালনা করে না, বিদ্যাচর্চ্চার বিঘ্ন ঘটে এবং সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। এ সময়ে দেশরক্ষার ভার, স্ত্রীজাতির সম্মান রক্ষার ভার দেশের যুবকদের উপর ও পুরুষদের উপর নির্ভর করে। এই পুরুষের দল যদি আদেশানুবর্ত্তিতা, সঙ্ঘপ্রীতি বা অস্ত্রচালনায় অজ্ঞ হয়, তাহা হইলে তাহারা দেশ রক্ষায় অসমর্থ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী ব্যাপিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসরেই কয়েকটি পরাক্রান্ত ও প্রবল জাতির পতনও জগদ্বাসী এখনও বিস্মৃত হয় নাই। সে বলদর্পিত জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য আর নাই, অষ্ট্রীয়ার নামে আর কেহও ভয় পায় না, বিশাল রুষ সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগদ্ব্যাপী রোম সাম্রাজ্য কয়েক বৎসরেই হীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। মনে করুন কোনও যুদ্ধ বিগ্রহে অথবা নৈসর্গিক কারণে যদি বৃটেনের হীন অবস্থা ঘটে, যদি স্বদেশ রক্ষার জন্য পুরাতন রোমান ফৌজের ন্যায় সমুদায় বৃটিশ সৈন্য এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে কি আমরা আমাদের বাঙ্গলা দেশ পার্শ্ববর্ত্তী বলবান জাতিদের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব? হইতে পারে যে দেশরক্ষার জন্য দলে দলে যুবকেরা সমবেত হইবে, কিন্তু অশিক্ষিত সহস্র লোকেও শিক্ষিত শত যোদ্ধার গতিরোধ করিতে পারে না। সত্য বটে টেরিটোরিয়ল ফোর্সে মাত্র চারিশত যুবকের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং মাত্র চারিশত সিপাহী-কোনও দেশরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কিন্তু এই চারিশত ব্যক্তির স্থানে যদি উচ্চশিক্ষিত চারিশত যুবক যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন, তবে তাঁহারা নিজেরাই অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রতি পঞ্চাশ জনকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন—অর্থাৎ ৪০০শত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী যুবকের দ্বারা বাঙ্গলা দেশ তিন মাসের মধ্যে বিশ হাজার শিক্ষিত যোদ্ধা পাইতে পারিবে। এই পাঁচ বৎসরে বাঙ্গলা দেশ হইতে চারিশত যুদ্ধবিদ্যার্থীও উপস্থিত হয় নাই ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়।

আমরা যদি এ বিষয়ে উচিত আগ্রহ দেখাইতাম তাহা হইলে সরকার হইতে এতদিনে পূরা ব্যাটালিয়ন পাইবার অধিকারী হইতাম।

বঙ্গীয় টেরিটোরিয়ল ফোর্স সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে অনেকেই রাজনৈতিক দাবী প্রভৃতি নানা অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এই সৈন্য দলটি গভর্ণমেণ্ট নিজেদের উপকারের জন্য করেন নাই, সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের উপকারের জন্যই করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় চারিশত যোদ্ধা না হইলে বিশাল বৃটিশ বাহিনীর কিছু মাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, অথচ আমরা যদি ইহার সুযোগ গ্রহণ করি তাহা হইলে নানারূপে উপকৃত হইতে পারিব।

বাঙ্গালী জাতি অসামরিক জাতি বলিয়া পরিচিত এবং আমরা এই অপবাদে অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ এই অখ্যাতি মোচনের সুযোগ উপস্থিত হইলে যদি তাহার সদ্ব্যবহার না করি তবে ক্ষতি আমাদেরই।

বৎসরে একমাস কলিকাতায় সৈন্য শিবিরে কাল যাপন করিবার সময় ও অবসর বাঙ্গলা দেশের বহু সংখ্যক যুবকের আছে। আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

মাধবী

এস মরাল আমার ত্যজিয়া সুদূর
মানস পথের যাত্রী,
এস স্মৃতির মৃণাল মুখে লয়ে, নাশি
তুহিন শীতের রাত্রি!
কুসুম শৈলে গড়িয়া নূতন দ্বীপ
জ্বালাব' আমার কামনার মণিদীপ,
নিবিড় মিলন সুখ-শিহরণ-নীপ-
বিলসিত এই বক্ষে
মম বেদনার ধূপ সুখ সুরভিত
জাগর উজর কক্ষে।

এস জীবন-বন্ধু ভুজ-বন্ধনে
রূপের অলকনন্দা,
এস চন্দন-বন-গন্ধ-উতল
তন্দ্রা ভুলানো চন্দ্রা!
এস হেথা এস, পূজা লও, কথা কও,
তৃষিত এ মোর অন্তর ভরি রও,
চঞ্চল তব দৃগঞ্চলেতে লও
অকিঞ্চনের গর্ব্ব,
এস ধ্যানের প্রতিমা, কর সার্থক
সেবকের পূজা পর্ব্ব!

আমি চুম্বনে চারু চরণ-চিত্র
রচিব চির এ চিত্তে
মম চাহনি চারণ চামর ঢুলাবে
তোমার পরম তীর্থে।
কণ্ঠ আমার নকীব হইবে তব
গাবে অবিরত স্তব নিতি নব নব
চিত্ত শতদলে তোমারে ঘিরিয়া র'ব
চির বসন্ত নর্ম্মে—
এস আলো আঁধারীর ধূপছায়া পথে
মর্ম্মের হেম হর্ম্ম্যে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নাপতিনীর নাকাল

(গল্প)

মঙ্গলা ঝি চিৎকার করিয়া বলিল, "ও দিদিমণি, শাঁক বাজাও গো—এই তোমাদের বামী নাপ্‌তিনী এসেছে। বলি হ্যাঁ গা ভাল মানুষের মেয়ে, তুমি এতদিন ছিলে কোথা বল ত? তোমার ঘরে গিয়ে দেখে আসি তালা বন্ধ! বুড়ো বয়সে কি ধেড়ে রোগে ধরেছিল নাকি? সেই নিতাই ঘোষকে—"

নাপতিনী বলিল, "আ—মরণ, গেয়ানশক্তি হয়েছিস্ নাকি? চুপ কর্ পোড়ারমুখি, ঐ গিন্নী এসছে, কার সামনে কি বলিস্?"

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "তাই তো রে বামী, তুই যে একেবারে কপ্পূর হয়ে উবে গেছলি, এতদিন ছিলি কোথা?"

বামা নাপতিনী গল-বস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, "আর মা, বুনপো দেশ থেকে কুটুম সাক্ষাৎ নিয়ে ছিরি-খেত্তোর যাবার জন্তে এল, তা আমায় বল্লে, মাসি, তুমিও চল; তাই মা একটু তিথি করতে গেছনু।"

মঙ্গলা বলিল, "মর্, তা একটু বলেও যেতে হয়! আজ এক মাস দেখা নেই, বৌ-ঝি কেউ কামাতে পাচ্ছে না, আমায় দিদিমণিরা রোজ বলেন অন্ত নাপতিনী ডেকে আনতে; গিন্নী-মা বারণ করেন, বলেন, 'না—না, আহা থাক আর দিন কতক, তার বাঁধা ঘরটা হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।"

বামী বলিল, "কি করব মা, যেদিন সবাই এল, সেদিন একটুও সময় পেনু না, তা এসবো কি! আর সেই আত্তিরেই সব গেনু কিনা। তা হ্যাঁ মা, বড় বৌদিদির না এই মাসে খালাস হবার কথা?"

গৃহিণী হাসিভরা মুখে বলিলেন, "বেশ দিনে এইচিস্ বাছা, বড় বৌমার খোকাটী হয়েছে, কাল পাঁচুটে। তোর হকের পাওনা যাবে কোথা?"

একমুখ হাসিয়া বামা বলিল, "আমিও তাই বুনপোরে বনু কিনা; বুনপো বলে, 'মাসি, চল দিন কতক দেশে ঘুরে এসবে'। আমি বলি তাকি পারি, বড়-বৌদির ভরা ন' মাস দেখে এসেচি, আমায় ফিরতেই হবে। তা মা দিদিমণিরা সব কোথা গেলেন? এস না গো একে একে—"

গৃহিণী উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "ও সুশী,—টুনি, তোদের হল রে? ঢুকেছিস তো এক ঘণ্টা। জানিস্ বামী, ওরা সব দল বেঁধে কলের ঘরে ঢুকলে আর বেরবার নাম করে না। একবার গল্প পেলে হয়।"

নেপথ্য হইতে সুশী বলিল, "মা তুমি আরম্ভ কর ততক্ষণ—আমাদের এই হল, যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, তোদের আবার এখনি হবে কিনা! চুল টানতে, মুখে সাবান ঘষতে, এলবাস্ পোষাক করতেই দিন ফুরোবে।"

বেশ একটা হাসির লহরী শুনিয়া বামা বলিল, "দিদিমণিরা হাসচেন দেখ মা!"

"হাসুক রে বাছা, হাসুক, এই তো হাসবার বয়েস। নে, আয়, আমিই তবে আগে বসি।"

গৃহিণী আলতা পরিতেছেন, ক্রমে ক্রমে বধূ ও কন্যারা একে একে আসিতে লাগিল। কাহারও পরণে ডুরে, কাহারও রঙীন, কাহারও বা শাদা কাপড়। সুশী আসিয়া বামাকে তাহার অনুপস্থিতির জন্ত আর এক চোট অনুযোগ করিয়া লইল।

ডুরে পরা ফুটফুটে একটী কিশোরী বধূকে দেখাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "এই দেখ আমার মেজ-বৌমা। বিয়ের সময় সেই যা এসেছিল, তারপর এক বছর পরে আজ দশ বার দিন হল এসেছে। এস মা, তুমি এবার বস। আহা, বাছা আমার সেই যা বাপের বাড়ী থেকে

আলতা পরে এসেছে, একদিনও এখানে পরতে পায় নি।"

বামী বলিল, "এই যে মা, এবার আমি এসেছি, এবার থেকে রোজ রোজ ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানি টুকটুকে করে দেবো এখন। আহা দিব্যি বৌটী, কি সুন্দর ঠোঁটের গড়ন;—মেজদাদা বাবুর ভাগ্যি ভাল। (আলতা পরাইতে পরাইতে) দেখ মা, মেজবৌদির পায়ে আলতা কেমন মানায়!—হ্যাঁ দিদিমণি ঐ ওপাশের বাড়ীর বত্তিরা কোথা গেল গা? তাদের ন' বোয়ের পায়েও আলতা এই রকম মানাত গো—আজ এখেনে এসবার পথে সে বাড়ীতে ঢুকেছিনু, তা দেখি তারা নেই, বাবুদের বইএর দোকান হয়েছে—"

হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া সুশী বলিল, "দূর, বইএর দোকান কেন? ক্লাব, লাইব্রেরী হয়েছে রে,—পাড়ার ছেলেরা মিলে করেছে। বত্তিরা উঠে গেছে।"

"আহা বত্তিরা উঠে গেল গা!—গিন্নী বেশ মানুষ ছেলেন। সে বার ন' ছেলে পাস হতে আমায় কত খাবার দিয়েছিলেন। তা হ্যাঁ মা, মেজ দাদাবাবুর সব কটা পাস হয়ে গেছে?"

সুশী বলিল, "মেজদাদা রাত দিন সুন্দর বৌয়ের মুখ ধ্যান করবে তো পড়বেই বা কখন আর পাস দেবেই বা কখন?"

গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, তুই থাম্, আর বাচালপনা করতে হবে না। এখন আলতা পরিস্ তো বোস্।"

সুশী বসিল। বামী আলতা পরাইতে পরাইতে বলিল, "মা গো মা, আজ ও-বাড়ী গিয়ে যা নাকাল হয়েছিনু তা আর কি বলব!"

সুশী বলিল, "বল্‌না, কি নাকাল হয়েছিলি রে, বলতে বলতে থামলি কেন?"

"আজ ভোরে তো টেরেণ থেকে নাবনু। তা ঘরে গিয়ে তালা খুলে দেখি, ইঁদুরে মেজেটা যেন চষামাঠ করে ফেলেছে। সেই সব পাটঝাঁট দিয়ে, গুছিয়ে গাছিয়ে রাখতে করতেই এগারটা বেজে গেল। তা গেনু একবার বাজারের দিকে; অত বেলায় আর কিনব কি মা, বাজার যেন আগুন! এমনি এমনি আঙুলের মতন ট্যাংরা মাচগুলো বেচ্‌চে, বলে বার আনা সের! আমি সে নিনু না। মাগো, ঐ অত দাম দিয়ে কি ঐ রকম টেংরা গুলো নেওয়া যায়? তা দু প'সায় এক ভাগা চিংড়ি নিনু,—দিলে তো এত ক'টি; তবুও বেশ খায়া খায়া টাটকা ছেলো। তারপর এক ফালি কুমড়ো নিনু, মা গো মা সে তো কুমড়ো নয়, যেন পিত্তিপদের চাঁদ! তাই আবার 'এক পয়সা দাও!' সবই আগুন নেগে গেছে মা কি করে যে চালাই জানি না—"

সুশী বাধা দিয়া বলিল, "তোর বাজারের হিসেব কে শুন্‌তে চাইছে?—নাকালের কথা বল্‌না শুনি।"

"এই যে ভাই, বলি। সব কথা গোড়া থেকে না বল্লে বুঝতে পারবে কেন?—তা ঐ চিংড়ি মাছ, কুমড়ো আর আলু কিনুনু, আলু ভাতে দিনু, আর কুমড়ো-চিংড়ি কনু। সমস্ত রাত ধরে টেরেণে এইচি, গা মাতা ঘুরছেল, দুটো খেতেই কি ছাই পারনু? ভাত কটা তো জল দিয়ে ওব্‌লার জন্তে তুলে রেখে. একটু গড়াতে গেনু। তিনটের সময় গড়িয়ে উঠে ভাবনু, যাই বত্তিদের বাড়ী হয়ে তোমাদের এখেনে এসবো। তা মা, বদ্যিদের বাড়ী ঢুকে যা নাকাল হয়েচি!"

বামাকে থামিতে দেখিয়া সুশী বলিল, "না তুই বড় জ্বালালি দেখছি! তোর নাকালের কথাই তো শুন্‌তে চাইছিরে,—থামলি কেন, বল্‌না—"

"এই যে দিদি, বলি। এস্‌তে এস্‌তে চুপড়িটী নিয়ে গুটি গুটি ও-বাড়ীর ভেতরে ঢুকেচি, আর বোন! মনে করতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! চার পাঁচ জন বাবু তেড়ে এল,—'কে রে, কে রে, তুই বই চুরি করতে এইচিস?'—একজন হাতে ঘড়ি পরা বাবু আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বল্লে, 'চল্ তোকে পুলিসে দেবো!' আমার তো মা, সব আকাট মেরে গেল, মুখে একটা কথা সরলো না, দাঁড়িয়ে থর্ থর করে কাঁপতে নাগনু। একজন বাবুর বুঝি দয়া হ'ল, বল্লে, 'না হে, দেখছ না, চুপড়ি নিয়ে এসেছে, নাপতিনী, ছেড়ে দাও।' সে হাতে-ঘড়ি-বাবু তো কিছুতেই শুনবে না,

বলে, 'কক্ষণো নয়, নিশ্চয় চোর, ও চুপড়ি টুপড়ি সব বদমায়েসি। ওই চুপড়ির ভেতর করে বই নিয়ে যাবে, আমি ওকে নিশ্চয় পুলিসে দেব।' যাই হোক মা; শেষে পাঁচজনে বলে কয়ে আমায় বিদেয় করলে। আমার তো মা হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছ্‌ল, বেরিয়ে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বাবুদের বুঝি নতুন বইয়ের দোকান; তাই খালি ভয় পায় কখন চুরি যাবে।"

সকলকে হাসিতে দেখিয়া বামাও হাসিয়া বলিল, "এখন তো সবাই মিলে হাসছ। যদি সত্যি সত্যি কোর্টে নিয়ে যেত, তখন কি হত? (ব্যস্তভাবে মাথায় কাপড় টানিয়া) হ্যাঁ মা, ঐ যে বাবুটী ওপরে উঠে এলেন ও কে গা?"

"সে কিরে, চিনতে পারলিনি? ওই যে আমার ছেলে অমল—"

"ও মা! উনিই যে আমার পুলিসে দিতে চেয়েছেলো গো!"

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

হিন্দুর পূজা ও ধর্ম্ম

বর্ণ নির্ব্বিশেষে হিন্দুর পক্ষে পূজা ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ। বৈদিক যুগে প্রকৃতিপূজার অন্তরালে, সুক্ত-ছন্দের গীতি-বন্দনায়, প্রথম প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে রুদ্র, বিষ্ণু দেবতার পরিকল্পনায়, ঋষিপ্রাণে সঙ্গীতের লহর বহিয়া যাইত, পৌরাণিক যুগে সে সব দেবতা মূর্ত্তি ধরিয়া জগতের বুকে প্রকট হইয়া ক্রমে নানারূপে পল্লবিত, রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে, শুধু ধ্যানের রূপপটে, মানব মনের মহিমময় তীর্থে যে দেবের দর্শন লাভ করিয়া সাধক বিমোহিত ছিল, ক্রমশঃ মনোশক্তির হ্রাস বিপর্য্যয়ে মানব সমাজের ক্রমবৃদ্ধির কল্যাণে, আর কাল শক্তির অক্ষুন্ন প্রভাবে সে দেবমূর্ত্তি চাক্ষুষ ও মূর্ত্তিবদ্ধ হইলেন। সে মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূজা ও বন্দনা আরম্ভ হইল। একই জাতিতে সামাজিক স্তরের তারতম্যে যেমন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ব্যক্তিগত জীবনেও মানব এই পূজা বন্দনাকে আপনার চিন্তাধারার উপযোগী করিয়া লইতে অবিরত প্রয়াস পাইতেছে। তবে এই পূজার ও ধর্ম্মের আর একটা দিক আছে,সেটা জাতিগত ভাবে—এবং সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাহাতে জাতি সংগঠনের ও সংরক্ষণের একটা বিরাট শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

ধর্ম্মের সহিত এই জাতিগত পূজা পদ্ধতির চুল-চেরা সম্বন্ধ বিশ্লেষণ না করিলেও চলে, কারণ ধর্ম্ম হিসাবে আরাধনা, ধ্যান, বন্দনা ব্যক্তিগত ধারণা ও শক্তির উপর নির্ভর করে, সে সাধনা ও পন্থা সাধারণের ধারণার উপযোগী না হইবারই সম্ভাবনা। মানবের সনাতন ধর্ম্ম-সাধনাকে অন্তর দ্বারাই বিচার করিতে হইবে; সেই নীতি পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে সমস্ত মন গ্রহণ করিল কিনা তাহাই বিচার্য্য।

প্রাচীনতম যুগ হইতে যখন হিন্দুর মন জাতিগতভাবে এই চিন্তা ধারাকে সারা অন্তরের কামনা দিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, তখন এই রীতি সাধনা যে তাহার ধর্ম্ম-জীবনের পরিপোষক, এবং মনের ও ধারণার উন্নতির পক্ষে একান্ত স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণজনক তাহার সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই।

আরাধনাই ধর্ম্মের প্রাণরূপে খ্যাত হইয়াছে; আর প্রকার-ভেদে প্রতি ধর্ম্মের মূলমন্ত্রই এই আরাধনা। জগতের যে কোনও ধর্ম্ম-সংস্কারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিলেই এই কথার তাৎপর্য্য লক্ষিত হইবে।

এই আরাধনা পদ্ধতি যে জাতির যত সঙ্ঘবদ্ধ, সে জাতিই তত পরাক্রমশালী। এই জাতিগতভাবে আরাধনা-পদ্ধতির মূলে, ধর্ম্মজীবনের আত্মিক উন্নতির সাধনা বা কতটুকু, আর তাহাতে সিদ্ধিলাভই বা কতটুকু তাহা বিবেচ্য বটে, কিন্তু এই আচার নীতির মধ্যে সংহতি সাধনার এমন একটা প্রেরণা ও শক্তি আছে যাহাকে কোনও মতেই অবহেলার চক্ষে দেখা যায় না। সাধারণ খৃষ্টান, মুসলমান ও ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে, গির্জ্জা ঘরে, মসজিদে, আর উপাসনা মন্দিরে, নিয়ম বিধির প্রতিপালনে, লৌকিক আইন কানুন পরিরক্ষণে, এমন কি ভগবদ্‌ভক্তির পরিপন্থী ও অপরিপোষক কার্য্য কলাপে যদিও ধর্ম্ম জীবনের কোনও সহায়তা করে কিনা সন্দেহ, তবুও ব্যক্তিগত উপাসনা অপেক্ষা সমাজগত এই বিচিত্র আরাধনায়, সমাজের দেশের ও জাতির যে প্রভুত উপকার সাধিত হয় তাহা বলাই বাহুল্য। হিন্দু-সমাজ আজ এ বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। আর হিন্দু সমাজের স্থাবরতা ও নিচেষ্টতার মূলীভূত কারণও এই সংহতি-হীনতা।

সামাজিক হিসাবে ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতির তারতম্য সকল সমাজে সর্ব্ব সময়ে আছে ও থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্ম সাধনায় এবং উপাসনা মন্দিরে এই অসামঞ্জস্য শুধু আত্মহত্যার পরিচয় প্রদান করে মাত্র। ধর্ম্মের চক্ষে, অথবা জাতীয়তার হিসাবে যে ভাবেই দেখি, এই উপাসনা ক্ষেত্রই আমাদের সার্ব্বজনীন মিলন-ভূমি; এই মিলনের উপর জাতীয়তার সকল শক্তি ও সাধনার ভিত্তি, আর তাহার উপরই আমাদের ব্যক্তিগত প্রেরণার প্রাণশক্তি; এই সঙ্ঘশক্তিই সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্ব সমাজে ও সর্ব্ব সময়ে আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সার সত্য ও তথ্যকে নির্ব্বিচারে ভুলিয়াছে বলিয়া আজ হিন্দুসমাজ এত বিপর্য্যস্ত, সংখ্যায় ক্ষুন্ন না হইয়াও শক্তিহত, তেজে সমকক্ষ হইয়াও ভীত—এক কথায় সর্ব্ব সম্পদে গৌরবান্বিত হইয়াও একেবারে রিক্ত।

সমাজ জীবনে হিন্দুর পূজা পদ্ধতিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অবশ্য আত্মিক উন্নতির হিতার্থে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-সাধনার নানাপ্রকার রীতি পদ্ধতির কথা আমরা আলোচনা করিতেছি না এবং সে ক্ষেত্রে এই প্রকার পূজা পদ্ধতির আলোচনার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। সাধারণতঃ প্রথম বিভাগে, দৈনন্দিন বিগ্রহ পূজা, দ্বিতীয়তঃ সাময়িক দেবদেবী পূজা। দৈনন্দিন বিগ্রহ পূজার সামাজিক হিসাবে বিশেষ কোনও মূল্য নাই, সেটা কতকটা ব্যক্তিগত, এবং আচার নিয়ম ও ধ্যান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্গা পূজা, কালী-পূজা প্রভৃতি সাময়িক পূজার যে সামাজিক হিসাবে, ও জাতিগতভাবে বিশেষ মূল্য আছে এবং তাহার যে একটা বিরাট সার্থকতা আছে তাহাই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়।

এই সকল সমাজগত পূজা-রীতি সার্ব্বজনীন হিন্দু-সমাজের সঙ্গে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গভাবে সম্বদ্ধ। এই যে এক একটা বিরাট দেবোপাসনা, এই যে এক একটা সমপ্রাণতা ও সহযোগিতার উৎসারিত উন্মাদনা, এই যে একটা সমাজ-অন্তরের সংহত বিপুল কামনা, তাহার মূল্য অল্প নহে। কত শত বর্ষ ধরিয়া অত বড় একটা প্রকাণ্ড সাধনার ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে, কত শত সংস্কারের মধ্য দিয়া এই সৃষ্টি অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছে, আর সঙ্ঘপ্রেরণার এমন একটা সহজ ও অনাবিল গতিচ্ছন্দে অবিরত পরিপোষিত হইয়া আসিয়াছে তাহাই লক্ষ্যের বিষয়। এমন একটা বিরাট আদর্শকে ও কর্ম্ম-ধারাকে কেন্দ্র করিয়া নব হিন্দুসমাজের শক্তি সাধনার সৃষ্টি করা খুব একটা কঠিন কথা নয়, আর শুধু এই বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের উপর আধুনিক হিন্দু সমাজের শক্তিহীনতা ও স্থবিরতার সমাধান নির্ভর করে।

এই সাময়িক পূজা রীতির আর একটা দিক আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সামাজিক স্তরের তারতম্যে মানব ব্যক্তিগতভাবে আপনার ধারণা, ধর্ম্মসংস্কার ও মানসিক অবস্থান্তরের উপযোগী করিয়া মনোমত পূজা পদ্ধতির সৃষ্টি এবং ক্রমে ক্রমে নানাভাবে দেবশক্তির পরিকল্পনা করিয়া পরে একেবারে মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া

ফেলিয়াছে। এই নূতন দেব পরিকল্পনার আনন্দ মানবের ব্যক্তিগত ভাবে উপভোগ করিবার ইচ্ছা অধিক দিন থাকে না—চারিদিকে পরিব্যাপ্ত করিবার একটা আন্তরিক কামনা, আর সমাজগত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সে আনন্দকে সঞ্জীবিত রাখিবার একটা অদম্য প্রেরণা সহজভাবে মনে অনুভূত হয়, এবং সে অনুভূতি তাহাকে একটা বিরাট প্রচেষ্টার দিকে অবিরত টানিয়া আনে।

এই সমস্ত নবোদ্ভূত দেবপূজার প্রচলনে, সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাস, অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা অত্যন্ত সহায়তা করে। উপরন্তু প্রচলনকর্ত্তার স্বকীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসের নির্ভরতায় যে সব ভীতিকর তথ্যপ্রকাশ সংঘটন হয়, দেবে ভক্তিহীনতার পরিণাম সম্বন্ধে যে সব কথার রচনা ও প্রচার হয়, আর স্বকীয় দেবের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে যে সব রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করা হয়, তাহার যে কোনটাই সমাজের স্তর বিশেষের উপর নানারূপে প্রভাব প্রচারে যথেষ্ট। ক্রমশঃ এই সব নূতন দেবতা নানারূপে ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ লাভ করে, এবং সংস্কার ভিত্তির উপর আপনার বিরাট সৌধ গড়িয়া তোলে। ক্রমশঃ এই নবদেবতা পূজা-কর্ম্মে একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এইরূপে মনসা, শীতলা প্রভৃতি শত শত দেবতার সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জ্বরাসুর, ওলাবিবি প্রভৃতি একেবারে মানব জীবন জুড়িয়া বসিয়াছে।

এইরূপে দেবতার বৃদ্ধি নিয়মিতরূপে দৈনন্দিন নিত্য কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ক্রমশঃ কুসংস্কার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংহতির ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। নবীনতর দেব বন্দনার অধিকাংশই সাধারণতঃ ভীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তাহাতেই উহা সর্ব্বপ্রকারে সমাজ দেহে বিষের সঞ্চার করিতেছে। এই সকল দৈব বন্দনার অন্তরালে যে পুরুষকার ও প্রচেষ্টার একান্ত অভাব আছে, যে সংস্কারের বিরাট পাশ বিস্তৃত, তাহা ক্ষণে ক্ষণে সমাজকে পঙ্গু ও অসমর্থ করিয়া তোলে। এই সংস্কার বন্ধন হইতে আজ এই মুক্তির যুগে হিন্দুকে মুক্ত হইতে হইবে—ধর্ম্মের সার তথ্যকে লক্ষ্য করিয়া, সাধনায় উদ্দিপীত ও পরাক্রান্ত হইতে হইবে।

এই অকারণ ও ভীতিকর দৈব বৃদ্ধির প্রাচুর্য্য আমাদের হিন্দু সমাজকে গ্রাস করিয়াছে সত্য, কিন্তু আর একদিকে আমাদের একটা বিরাট শূন্যতা রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে এ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের নিতান্ত অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

হিন্দুসমাজ একদিকে নির্ব্বিচারে এই সব দেবতার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী ও তদ্দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রভাবান্বিত বটে, অন্য দিকে আবার তেমনি বীরপূজা ও যুগবতার পূজায় অন্যায় রূপে শিথিল ও অমনোযোগী,—এমন কি এবিষয়ে চিন্তা করিবার লোকের পর্য্যন্ত অভাব হইতে চলিয়াছে। এই একান্ত উদাসীনতা ও বিচারের অভাবের ফল নিষ্ঠুরভাবে জাতীয় জীবনের উপর দাগ কাটিয়া ফেলিয়াছে।

বীরপূজা ও যুগাবতার পূজায় গোটা জাতির মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ম্মীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে যেমন কর্ম্মের প্রতি ক্রমশঃ আসক্তি জন্মে, তেমনি বীরাবতারের পুজোপলক্ষে জাতীয় জীবনে প্রাণশক্তির উদ্বোধন হয়। বীরস্মৃতির সঙ্গে একটা মহৎ প্রেরণা আসে, বিশেষতঃ ইতিহাসের এই সকল মহাপুরুষদের বন্দনায় জাতিকে শুধু ধর্ম্ম ও দৈবশক্তি সাধনায় উদ্বুদ্ধ করা হয়না, পরন্তু সার্ব্বজনীন মানব ধর্ম্মের প্রতি সচেতন ও মনোযোগী করা যায়। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অতিমানবদের স্মৃতিতর্পণে, দোষে গুণে জড়িত নর মানবের সাধনার প্রাচুর্য্য ও শক্তিলাভের ব্যপদেশে সাধারণ মানবের বুকে যে সামর্থ্য লাভের প্রেরণা জন্মে, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে গোপনে যে আত্মসম্মান ও আত্মশক্তির উদ্বোধন হয় তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে একটা মস্ত লাভ।

যুগাবতার রূপে আজ যদি হিন্দু সমাজ সার্ব্বজনীন ভাবে খৃষ্ট, বুদ্ধ ও জরথুষ্ট্রের পূজানিবেদন রচনা করে, বীরপূজাক্রমে যদি শিবাজী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতির স্মৃতিতর্পণে অবহিত হয়, এবং সার্ব্বজনীন পূজা আরাধনা

সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করে, তবে অচিরে এবং অদূরে অমরা এক বৃহত্তর হিন্দুসমাজের দর্শনলাভ করিতে পারি।

সমগ্র হিন্দুসমাজ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধানিবেদন করে সত্য, কিন্তু যে মহাপুরুষ নব ঝঙ্কারে নবীন ছন্দে বিরাট এই অহিংসা মন্ত্রের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন; ধর্ম্ম জীবনে সঙ্ঘশরণের সত্য করিয়া জাতীয় জীবনের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিয়া গিয়াছেন; যিনি এই যুগ যুগান্তর পরেও অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইতে পারেন, তিনিও যে এই আর্য্যধর্ম্মের অঙ্গীভূত তাহা কয়জনে মনে করিতে পারেন? তাও বা দুই চারি জনে করেন সত্য, কিন্তু যে সাগ্নিক ঋষি আর্য্যজাতির প্রথম অবতার রূপে আলোক পন্থা নির্দ্দেশ করেন, যাঁহার চরণতলে ইরাণ আর ভারত কোন্ সে যুগগর্ভে একত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্মরাখীর সন্ধি করেন, শত শত বর্ষ পরে আজিও যাঁহার ধর্ম্ম সাধনার গীতি মানবের প্রাণে প্রাণে আঘাত করিয়া ফিরে—সে যুগাবতার জরথুষ্ট্রদেবের কথা কয় জন হিন্দু আজ স্মরণ করে?

অথচ এই সব মহাপুরুষ আমাদেরই নিজস্ব—আমরা হেলায় আজ নির্ব্বিচারে দূরে সরাইয়া দিয়া তাঁহাদের স্থলে নানা উপদেবতার সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিয়াছি। এটা কি কম পরিতাপের কথা?

সমাজ ও জাতির উপর এই পরিবর্ত্তনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যে সব সঙ্কীর্ণতা আজ হিন্দু-সমাজের রক্তমোক্ষণ করিতেছে, যে সকল অজ্ঞতা ও মূর্খতা আজ ব্যক্তিগত সাধনার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এই যুগাবতার বুদ্ধ ও জরথুষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় পাইবে। আজ যাঁহাদিগকে দূরে রাখিয়া হিন্দু-সমাজ অত্যাচারে, অবিচারে, জর্জ্জরিত ও নিষ্পেষিত, ভবিষ্যৎ কালে এই ছন্ন-ছাড়া জাতীয়তা একটা প্রকাণ্ড সংহত শক্তিতে পৃথিবীর প্রধানতম শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে—এই একই বৃক্ষের তিনটি শাখার ছায়ায় প্রাচ্য জগতের তিনটি নিতান্ত আপন সঙ্ঘের সংমিশ্রণ পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে।

আমরা সামগ্রিক পূজা সম্বন্ধে যে সাম্যবাদের পূজা-বন্দনার কথার ইঙ্গিত করিয়াছি, এ ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য।

এই সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম্মজীবনের স্থিতি ও প্রাণ-প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বিরাট চেষ্টা ও একান্ত ভরসা ছিল গুরুগোবিন্দ সিংহের। তাই তিনি মুষ্টিমেয় শিখ-সংহতির ব্যপদেশে শুধু আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট হন নাই, অধিকন্তু ভারত সম্রাট দিল্লীর বাদশাহের সুপ্রতিষ্ঠিত মসনদের ভিত্তিতে আঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ এই যুগসন্ধির সংশয়-ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজ কি তাঁহার এই জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফলকে অবহেলা করিবে?

বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র কিছু হিন্দুর চক্ষে নূতন নহে—যুগাবতার বলিয়া তাঁহাদের পায়ে হিন্দুজাতি সর্ব্বদাই মাথা নোয়াইতে স্বীকৃত; সে মহানুভবতা ও উদারতা এ সমাজে অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তাঁহাদের পর ভাবিয়া আজ শুধু মাথা নোয়াইয়া গেলেই চলিবে না—আমাদের এই বিযুক্ত শাখাকে নিজেদের ভিতর টানিয়া আনিয়া নিতান্ত আপন করিয়া লইতে হইবে।

পরিশেষে হিন্দুর পূজা-স্থান সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আলোচনা শেষ করিব। তীর্থক্ষেত্র গুলি যে আজকাল এক একটা পাপের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে, সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস এই তীর্থধর্ম্মের অন্তরালে যে প্রাণের অবমাননা করিতেছে সে কথা বিস্তৃত ভাবে বলা এ স্থলে আবশ্যক নাই। চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি এই বিরাট কলিকাতা নগরীর মধ্যস্থলে, কালীঘাট তীর্থে অর্থ ব্যক্তিরেকে দেব-দর্শনে বঞ্চিত হইতে হয়। শুনা গিয়াছে শুধু বৌদ্ধ বলিয়া দূরদেশাগত জন কয়েক চীনবাসীকে বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই! এমনতর অনাচার, অত্যাচার প্রভৃতির কথা কাহাকেও মনে করাইয়া দিতে হইবে না। আজ হিন্দুর পূজাসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ-সংস্কারের স্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে—তীর্থ সার্ব্বজনীন, দেবমূর্ত্তি সার্ব্বজনীন, পূজা বর্ণবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের

নিজস্ব নহে—এই উদার বাণী ঘরে ঘরে সঞ্জীবিত করিয়া না তুলিলে হিন্দু-সমাজের বিপদ।

এই তীর্থ সংস্কারে আর একটা জিনিষ প্রধানতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। এই সকল তীর্থে অর্থপ্রাচুর্য্যের কথা সর্ব্বজনবিদিত—অথচ হিন্দু-সমাজের এই আগ্রহের দান প্রায়শই কোনও পরিবার বিশেষের ভোগ-লালসার ইন্ধন যোগায়—কিঞ্চিৎ অংশ বা তীর্থফণ্ডে জমা থাকে। বৈদ্যনাথ মন্দিরের রিসিভার মহাশয় তাঁহার ফণ্ডের অর্থ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আমাদের পক্ষে কোনও ক্রমেই উচিত নহে। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার এই বছর তিনেকের কর্তৃত্বে ফণ্ডে যে অর্থ জমিয়াছে, তাহাতে অনায়াসে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে পারে। বিস্ময়ের কথা নহে কি?

হিন্দু-সমাজের এই দুর্দ্দিনে, এই বিক্ষিপ্ত সঙ্ঘের নিত্য অত্যাচারের যুগে, দরিদ্র দেশের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সমগ্র সমাজে আশীর্ব্বাদী পুষ্পের মত বিতরিত হইলে জাতি-গত ভাবে যে কত উন্নতির সোপান রচনা করা যায় তাহা ভাবিবার বিষয়। এই আশীর্ব্বাদী পুষ্প কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, গোটা সমাজের সাধারণ সম্পত্তি। একটা জাতির বুকে উৎসারিত এই কামনাঞ্জলি, কত অনাথা, নিরাশ্রয়, মুমূর্ষুর জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, কত লাঞ্ছিত বঞ্চিতের এই অভাবনীয় আত্মত্যাগ অকারণে ও অন্যায়রূপে নষ্ট হইয়া জাতীয় প্রাণ-শক্তির অবমাননা ও সঙ্কোচ-সাধন করিতেছে সে দিকে সকলের লক্ষ্য ও শুভচেষ্টা কামনা করি।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"রামী"

নব-কৈশোরের ধারা যৌবন-সিন্ধুর পানে,
ধাবমান যবে দ্রুতগতি,
কাহার জীবন-স্রোত হেনকালে প্রত্যাসন্ন
হ'ল দেবী—বাশুলীর প্রতি?
পরিচর্য্যা সেবা-ব্রতে কে তুষিল শ্রদ্ধা-ভরে—
বাশুলীরে দিবস-যামিনী—
অবলা সরলা নারী কবি চণ্ডীদাস-প্রিয়া
পল্লীবালা রজকি রামিনী।
পরকীয়া রসাশ্রয়ে সে কবির সাধনায়
মূর্ত্তিমতী রাধিকা প্রতীক,
সাধ- সমুদ্র মাঝে দিশাহারা চণ্ডীদাস
হেরি যারে নির্ণয়িলা দিক্।
অকুল পিরীতি-সিন্ধু মন্থনে ব্যাপৃত যবে
প্রেম-গুরু বড়ু চণ্ডীদাস,
বিভ্রান্ত সাধন-ক্লান্ত সহজিয়া সাধকেরে
সিদ্ধি-রূপে কে দিল আশ্বাস?
কাহার চরণ দুটী শীতল ভাবিয়া কবি
শরণ লইলা চিরতরে,
কারে "পিতৃ-মাতৃ"-রূপে বন্দিলা বিহ্বল কবি,
"গায়ত্রী"-ও অপিলা সাদরে।
কাহার সে হৃদয়ের সুগভীর প্রেমাস্বাদে
মন্ত্রমুগ্ধ রসিক ব্রাহ্মণ,
পিরীতি-সাধন-তত্ত্ব মঞ্জুল মধুর ছন্দে
বিশ্ব-জনে করিলা বণ্টন।
কার কাছে দীক্ষা পেয়ে গেয়েছিলে কবিবর—
"ভবে দুখ-সুখ দুটী ভাই",
কার কাছে শিখেছিল পূজারী ঠাকুর—ওগো,
প্রেম-যজ্ঞে জাতি-ভেদ নাই।
সুখ লাগি প্রেম করা প্রেমের আদর্শ নয়,—
এ দর্শন কে শিখালো তাঁরে?
কার ভাবে মত্ত কবি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিল—
প্রেম-তত্ত্ব বেদান্তের পারে।
"নীল শাড়ী নিঙ্গাড়িয়া" চলিতে দেখিয়া কারে,
কবি-চিত্তে স্ফুরে রাঙা-রূপ,
"দুখিনী রামিনী" সে যে—কবির কল্পনা-লক্ষ্মী
কাব্যসুধা ভাব-রস-কূপ।

শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান—ফাল্গুন।

আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন। লেখক দুঃখ করিয়াছেন যে নূতন জ্বরে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় কোনও ফল হয় না জনসাধারণের মনে এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য মনিষীদের কয়েক খানি "প্রশংসাপত্র" পেশ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন দিয়া যদি আয়ুর্ব্বেদের প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।

নবজ্বরে পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে লেখকের ধারণা ভ্রান্ত। আজকাল জ্বর-বিচ্ছেদ-কারক ঔষধ নিতান্ত অনভিজ্ঞ চিকিৎসক ভিন্ন অন্য কেহ প্রয়োগ করে না ও জ্বরের বিরাম পাইলেই কুইনিন দিয়া তাহা রোধ করিতে চেষ্টা করা শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের একচেটিয়া নহে। তাহারা বরং কুইনিন কুইনিন নামেই দিয়া থাকেন। জ্বরের নিদান (আয়ুর্ব্বেদ মতে) আলোচনা করিয়া লেখক ভালই করিয়াছেন, তবে এইরূপ তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে জ্বর সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের আধুনিক তথ্যগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রসের কথা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়। ছয়টি রসের বিবরণ। প্রবন্ধটি অত্যন্ত মুখরোচক হইয়াছে।

সংক্রামক রোগ ও জীবাণুতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন। লেখক আয়ুর্ব্বেদীয় ও পাশ্চাত্য মতে রোগ সংক্রমণের কারণগুলি সুচারুরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

ব্যায়াম চর্চ্চা—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন। ব্যায়াম-চর্চ্চার উপকারিতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই সামর্থ্যমত প্রত্যহ কিছুক্ষণের জন্য ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

যক্ষ্মা এবং উরঃ-ক্ষত রোগের সাধারণ চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শাস্ত্রীয় মতে চিকিৎসা ও আহার-বিহার সম্বন্ধে উপদেশ।

আমাদের দেশের গাছপালা—শীর্ষক প্রবন্ধে এবার বাবলা ও জয়ন্তীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন। জ্বর প্রভৃতি কয়েকটি রোগের সহজ চিকিৎসা।

সম্পাদকের সাজি। অন্য সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা কবিরাজী ঔষধই কলিকাতায় অধিক পরিমাণে বিক্রীত হয়। দুঃখের বিষয় আজ-কাল অধিকাংশ স্থলেই কবিরাজী ঔষধ শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয় না; সেই জন্য শাস্ত্রোক্ত ফলও পাওয়া যায় না। এমন কি কবিরাজীর সহিত এলোপ্যাথিক ঔষধ মিশাইয়াও কেহ কেহ কবিরাজী বটিকা বা কবিরাজী অরিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না।

উপরিউক্ত কথাগুলি বলিয়া তাহার পরে সম্পাদক মহাশয় যাহা নিবেদন করিয়াছেন, তাহা সাংঘাতিক! "আমরা অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখি। সাধারণের মঙ্গলের জন্য সে সকল কথা ক্রমশঃ আমরা প্রকাশ করিয়া দিব।" ইহাতে ফল হইবে এই যে সাধারণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের প্রতি ও কবিরাজগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং হয়ত বা "ঠক বাছিতে গ্রাম উজাড়" হইয়া যাইবে। উপরন্তু কবিরাজ মহাশয়দের মধ্যে এইরূপ 'স্বজাতি-প্রীতি'র অভাব দেখিয়া শত্রু হাসিবে।

পরিশেষে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন যে, যদি কেহ বলেন যে ডাক্তারী ঔষধের সাহায্য ব্যতীত কবিরাজী চিকিৎসা আজ-কাল আর চলিবে না, তাহা হইলে কলিকাতা ও মফঃস্বল হইতে সকল চিকিৎসককে একত্র করিয়া ইহার জন্য পরামর্শ-সভা আহ্বান করা হউক—সকলের পরামর্শে যদি স্থিরীকৃত হয় যে শাস্ত্রোক্ত ঔষধে সকলে রোগ নিবারণ করা আর সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে গোপনে বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহার না করিয়া আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্নিহিত করিয়া প্রকাশ করা হউক।

এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। অন্ততঃ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার কেলেঙ্কারী অপেক্ষা অনেক ভাল। এ প্রবন্ধ পাঠে অনেক কবিরাজ, সম্পাদক মহাশয়ের উপর খড়্গহস্ত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্পাদকের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—মাঘ।

কবি রাজশেখর—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এবারেও রচনা সম্বন্ধে কবিদিগকে রাজশেখর যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে লেখকের লোকচরিত্রাভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবিদিগের চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ—অসূর্য্যম্পশ্য, নিষণ্ণ, দত্তাবসর ও প্রায়োজনিক—কেবলমাত্র তৎকালোচিত নহে, এখনও উহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য।

সুন্দরবন—শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত। এই সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী এবারে শেষ হইল। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

বাঙ্গালার বিপ্লব কাহিনী—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুনগো। এবারে এই কাহিনী শেষ হইয়াছে।

দাদামশাই—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। এবার 'আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ'কারের জীবন-চরিতে বিশেষ জ্ঞাতব্য কোন কথা নাই।

পশ্চিমের আত্মরক্ষা—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধে অল্পপরিসরের ভিতর লেখক মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ লইয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতামত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন Defence of the West পুস্তকের লেখক Massis ও তাহার সমধর্ম্মী পণ্ডিত ভিন্ন অপর কয়েকজন মনীষীর বিশ্বাস, 'পূর্ব্ব-পশ্চিমের সভ্যতার পরস্পরের আদান-প্রদানের উপরই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি নির্ভর করছে।' মাসির বিশ্বাস 'য়ুরোপ তার স্বধর্ম্ম রক্ষা করেই আত্মরক্ষা করতে পারবে। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম তাঁর কাছে ভয়াবহ, কেননা, তা য়ুরোপের পক্ষে পরধর্ম্ম। রবীন্দ্র নাথকে এ শ্রেণীর লোক ভয়াবহ মনে করেন, কেন না তিনি য়ুরোপে পরধর্ম্ম প্রচার করছেন।'

জগতে নারীর স্থান—সঙ্কলিত প্রবন্ধ। লণ্ডনের 'ডেলি ক্রনিকেল' পত্রিকায় শ্রীমতী জোয়ান সাদার্ল্যাণ্ড দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, চিত্রশিল্পে, সঙ্গীতে, এমন কি সাহিত্যেও বিরাট প্রতিভা লইয়া কম রমণীই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? উত্তরে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তবে কি প্রকৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশক্তির ভার নারীর উপর অর্পণ করিয়াছে বলিয়া নারী অন্য প্রকার সৃষ্টি-শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন?' এবং একথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন 'প্রজনন-শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশক্তি হইলেও উহাতে প্রতিভার বিকাশের প্রয়োজন নাই, অথচ শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি-শক্তিতে উচ্চাঙ্গের প্রতিভা বিকাশের প্রয়োজন।' ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রজনন-শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হইল কিরূপে এই আশঙ্কা লেখিকার মনে উদয় হওয়ায় তিনি লিখিয়াছেন, 'শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা জগৎকে শোভিত সজ্জিত করা হয় মাত্র, কিন্তু সন্তান-প্রজনন দ্বারা জগৎকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করা হয়; ইহার উত্তরে আলোচনাকারী বলিয়াছেন জন্মও যেমন প্রয়োজন, রসও তেমনি প্রয়োজনীয়। কি এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই।

গোধন—শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর সচিত্র সঙ্কলন প্রবন্ধ।

প্রবাসী—ফাল্গুন।

রবীন্দ্র-পরিষদে কবির অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদিগকে কয়েকটি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন—(১) নতুন প্রাণ নতুন রূপ সৃষ্টি করে, কিন্তু পুরাতনের জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে প্রাণ-শক্তি হারায়। (২) নবযুগ একটা কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়—তাকে বুঝতে সময় লাগে যে, নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। (৩) সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। (৪) নূতনত্ব ও নবীনত্বের পার্থক্য তাঁহার ভাষায় এইরূপ,—'নূতনত্ব কালের ধর্ম্ম, নবীনত্ব কালের অতীত।' রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই 'তরুণ' বলিতে চান 'যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন রক্তরাগে অরুণ বর্ণে সহজে নবীন।' এই সুন্দর অভিভাষণের মধ্যে এক স্থলে আমরা শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে অভিমানের বাণী শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, 'ভবিষ্যতের সাহিত্যে আমার জন্যে যদি জায়গার টানাটানিও হয়, তবু এ কথা সবাইকে মানতে হবে যে, সাহিত্যের মাটির মধ্যে গোচরে অগোচরে প্রাণের বস্তু কিছু রেখে গেছি।' ভবিষ্যতের বঙ্গ-সাহিত্যে কেন, জগতের সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায় হইবে তাহা দুই একজন অকালপক্ব তরুণ বাঙ্গালী লেখক ছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন; আর আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালায় এত বড় অপর একজন মনীষীর আবির্ভাব একশত বৎসরের মধ্যেও যদি হয় তবে বঙ্গদেশ ধন্য হইবে।

সত্তর বৎসর—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। রচনা চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এবার বড় বেশী কিছু নাই।

যবদ্বীপের পথে—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে।

ঋষি জরথুশ্‌ত্র (অধ্যাপক ডাঃ তারপুরওয়ালার প্রবন্ধের অনুবাদ)—অনুবাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত। জগতে যাঁহারা ধর্ম্মের নূতন আলোক দান করিয়া গিয়াছেন, ঋষি জরথুশ্‌ত্র তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এই মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত্র ও ধর্ম্মমত অল্প পরিসরের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে।

চিত্রশিল্পী মুকুলচন্দ্র দে—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। শিল্পীর সাধনার পরিচয় এই সচিত্র প্রবন্ধে সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

জয়পুর—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক মহাশয় আলোচ্য প্রবন্ধে জয়পুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থলে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহার বিবরণ দিয়াছেন এবং কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে আপনার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ—ফাল্গুন।

রূপ-কথার রূপ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য। প্রাচীন কাল হইতে জগতের বিভিন্ন দেশে কিরূপে রূপকথার প্রচলন ছিল তাহার খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া, বাঙ্গালা দেশের রূপকথার বৈশিষ্ট্য সরস করিয়া বলা হইয়াছে।

দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী। বরিশাল জেলার চাঁদশী গ্রামের নিকটবর্ত্তী রামসিদ্ধি গ্রামে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র শীল কবিরাজের ঘরের একখানি ১০ পাতার পুথি

ও ফরিদপুর জেলার শালদহ গ্রামের শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে যে দুইখানি পুথি লেখক পাইয়াছেন তাহা হইতেই আলোচ্য প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। বীরভূমির নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসেও এ পদ গুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধে পাঠান্তর মিলাইয়া লেখক সুন্দর ভাবে আলোচনা করিতেছেন।

শিল্প—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ। লেখক Art শব্দের প্রতিশব্দ শিল্প লিখিয়াছেন। টলষ্টয়ের আর্ট শব্দের সংজ্ঞার আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রবন্ধের শেষাংশে বিবৃত করিয়াছেন। নূতন কিছু বলিতে পারেন নাই; তবে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি সহজ সরল ভাবে করিয়াছেন।

ভ্রাম্যমানের জল্পনা—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। ক্রমশঃ প্রকাশ্য। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল-সদনে লেখকের সহিত তাঁহার যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাই বিবৃত হইতেছে। এবারে নূতন জানিবার বা শিখিবার কিছুই নাই। বড়লোকদিগের সহিত যা কিছু কথাবার্ত্তা হইবে তাহাই কি সাহিত্যে স্থান পাইবে?

বিশ্ব-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এবারেও কর্ম্মবীর লেনিনের ব্যাক্তিত্ববাদ কোথায় কি ভাবে সুস্পষ্ট, লেখক তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিচক্রে "ক্যালকাটা হুইলার্স"—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুস্তোফী। সচিত্র ভ্রমণ কাহিনী। এবারে কলিকাতা হইতে 'ঝালদা' পর্য্যন্ত পথের বিবরণ আছে।

দক্ষিণে—শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সচিত্র সুন্দর ভ্রমণ কাহিনী। পূর্ব্বের মতই চলিতেছে।

পথের দিন—শ্রীযুক্ত জলধর সেন। এবারে এই ভ্রমণ কাহিনী শেষ হইল। এই প্রবীণ সাহিত্যিককে নিকটে পাইয়া দিল্লীর বাঙ্গালীরা যে ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ও দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখাইয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির উপর মাঝে মাঝে লেখক মহাশয় যে চিন্তাপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

বিচিত্রা—ফাল্গুন।

'জাভা যাত্রীর পত্র' ও 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুইটাই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। পূর্ব্বের মতই মনোজ্ঞ ভাবে চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সুন্দর উপমা গুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গ্রন্থাগার—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। All Bengal Library Conference এর ২১শে জানুয়ারীর অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ। কি করিয়া বাঙ্গলা দেশে সাধারণ লাইব্রেরীর প্রচার বৃদ্ধি করা যায় তাহার কথা আলোচনা কালে, লেখক অন্যদেশে কি ভাবে Public Library organise করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুস্তক সংগ্রহ করাও যেমন চাই, তেমনি পুস্তক distribute করিবার কৌশলও আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। লাইব্রেরীর পশ্চাতে যে মস্ত বড় সমস্যা আছে সে কথাও লেখক ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। সর্ব্বোপরি, সাধারণের প্রীতি ও উৎসাহ না থাকিলে চলিবে না। পুস্তক সংগ্রহই যাহাদের জীবনের ব্রত, এমন সকল লোকই public library গড়িয়া তুলিতে পারেন।

পথে-প্রবাসে—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য ভ্রমণ-কাহিনী পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে। সুইট্জারল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য পল্লী লেজ্যাঁর বিবরণ এবার প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে যক্ষ্মা-রোগের সৌর-চিকিৎসার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। লেখক দেখাইয়াছেন এখানে কি ভাবে 'ইউরোপিয়রা রোগ শোককে তুচ্ছ ক'রে খেলার দাপটে জরাকে ভাগিয়ে দেয়।' স্ত্রী পুরুষের মিলিত বল নাচ সম্বন্ধে লেখক যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। নৃত্যের আমরা পক্ষপাতী, কিন্তু তাই বলিয়া যৌথ-নৃত্য বা স্বৈরথনৃত্যের সমর্থন করিতে পারিনা।

চীনে হিন্দু সাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। এবারে অনেক নূতন কথা আছে।

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়। ইতালীর প্রসিদ্ধ লেখিকা যিনি এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহার জীবনের ও রচনার বিবরণ। লেখক শ্রীমতীর রচনার বৈশিষ্ট্য এই ভাবে লিখিয়াছেন—'দেলেদ্দার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নীতি ও আর্টের ভিতর একটি চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর্টের দোহাই দিয়া যাঁরা নগ্ন জীবন-চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, দেলেদ্দা সে দলের একজন নন, অপর দিকে যাঁরা শুধু মনে করেন লোকশিক্ষাই আর্টের উদ্দেশ্য তিনি তাঁহাদেরও বিরোধী। তাঁহার রচনা যেমন সরস ও সুন্দর তেমনি তাহা মানব-মনের আদিম ও মহৎ ভাব সমূহের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি প্রকৃতি হইতে মানব জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, পরন্তু প্রকৃতির সহিত মানব জীবনের একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া ইহার অংশরূপেই দেখিয়াছেন।' আমরা লেখিকার কোন রচনার অনুবাদ পড়িবার সুযোগ পাই নাই, কাযেই কোন কথা বলিতে পারিব না।

মার্কিন মহিলা কবি ও স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন। এ কবির নাম মিসেস এলা হুইলার উইলকক্স। ইঁহার কয়েক খানি কাব্য এদেশের শিক্ষিত লোকদিগের ভিতর এককালে বেশ সমাদর লাভ

করিয়াছিল। লেখক তাঁহার আত্মজীবনী হইতে স্বামীজীর প্রভাবের কথা অল্পের ভিতর আলোচনা করিয়াছেন।

কথা-সাহিত্য

বিচিত্রা—ফাল্গুন

খুন—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল রায়। সুকুমারী ও তাহার মায়ের জ্বালা-যন্ত্রণার কাহিনী ও পরিশেষে তাহাদের অপঘাত মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক যে উপহার পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা লোমহর্ষণ হইতে পারে, কিন্তু মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই। রচনায় বস্তুনির্ণয়ের সময় হয়ত মোপাসার 'চোরের' কথা লেখকের মনে আসিয়াছিল। দুঃখ-দারিদ্র্যের বর্ণনাটুকু বিশদভাবেই করা হইয়াছে। তবে সংযম, নৈপুণ্য ও আন্তরিকতার অভাব একাধিক স্থলে লক্ষিত হয়।

মুণ্ডমালিনী প্রেস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক। প্লটে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তবে রচনাটি হাস্যরসাত্মক—বর্ণনায় লেখকের বেশ কৃতিত্ব আছে। পাঠক ইহার রস উপভোগ করিবেন।

স্ত্রী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। লেখক দেখাইয়াছেন প্রসন্ন অলস, অকর্ম্মণ্য স্নেহাতুর ও বুদ্ধিহীন। তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ললিতা বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। প্রথম পক্ষের পুত্র লইয়া স্ত্রীর প্রতি স্বামী কিছু বিরূপ হইলেন। স্ত্রী অভিমান ভরে স্বামীকে পরিত্যাগ করিলেন। —ইব্‌সেনের সমাজে হয়ত ইহার আদর হইত, আমাদের নিকট ইহার উপসংহার প্রীতিপ্রদ নয়। প্রতিপাদ্য বিষয়টিও অস্পষ্ট, চরিত্রগুলিও লেখকের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল।

বুলবুল—শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ভৌমিক। বিষয়টি সুন্দর, কিন্তু বস্তুর বিবৃতিতে আরও নৈপুণ্য আবশ্যক ছিল। পাখী দুটির বিজ্ঞ মানুষের মত অত পরামর্শ আধুনিক যুগে শোভন হইতে পারে না। পাখীকে পাখীর মত করিয়া আঁকিলেই ভাল হইত।

মাসিক বসুমতী—মাঘ।

আনন্দময়—শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য। আনন্দময়ের চিত্রটি মন্দ নয়। পত্নী উর্ম্মিলা নবীনা, কিন্তু পুরাতন আদর্শে অনুপ্রাণিতা। একটি উন্নত স্তরে উভয়ের মিল বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক আপনার বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে দেখাইয়াছেন। তবে রচনায় কাট-ছাঁট আবশ্যক ছিল। গল্পের প্রতিপাদ্য কি তাহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। রচনা মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাবও লক্ষিত হয়।

অত্যাচারে—শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র গুপ্ত। দারুণ অত্যাচারে প্রপীড়িত একটি ক্রীতদাসের কথা এই গল্পে প্রকাশিত হইয়াছে। ছবিটি জমকাল, কিন্তু প্রাণস্পর্শী নয়। তুলিকাঘাত বড়ই স্থূল। সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্যের একান্ত অভাব।

মুষ্টিযোগ—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্য-রস-প্রমত্ত শ্যামলের কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক একটু হাস্য-রসের আয়োজন করিয়াছেন। তবে বিষয় পুরাতন, রচনায় কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

প্রবাসী—ফাল্গুন।

পণ্ডিতের পরাজয়—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। হিউয়েন স্যাংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখিত। বর্ণনভঙ্গী অনেকটা ইতিহাসের মত। বিষয় পুরাতন—সেই দাম্ভিক পণ্ডিত ও বিনীত বিদ্বানের তর্ক-যুদ্ধ, ফল পণ্ডিতের পরাজয়। ইতিহাস বা দর্শনের হাটে রচনাটির মূল্য সামান্য; রস-সাহিত্য হিসাবেও ইহা দীন। লেখকের লিপিকুশলতার বিশেষ পরিচয়ও আমরা দেখিতে পাইলাম না।

নিস্তারিণীর নিস্তার—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল রায়। নিস্তারিণী নির্ব্বোধ নীলকান্তের পত্নী। তাহারই দুঃখ ও সহিষ্ণুতার বর্ণনা করিয়া লেখক এই গল্পটি রচনা করিয়াছেন। ইহার করুণ রসটুকু উপভোগ্য। রচনা দীর্ঘ, চিত্র স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়।

ঊর্দ্ধরেখা—শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ মৈত্র। গল্পটি কৌতুকপ্রদ। তবে পাত্রগুলিকে নিতান্ত অপদার্থ করিয়া আঁকা হইয়াছে। লেখক দুই এক স্থলে আরও সংযম দেখাইতে পারিলে রচনার মূল্য বাড়িয়া যাইত।

বুড়ী ঝি—শ্রীযুক্ত কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। একটি স্নেহপ্রবণ বুড়ী ঝির চিত্র—পাঠকের উপভোগ্য, বিষয় পুরাতন হইলেও হৃদয়গ্রাহী।

ভারতবর্ষ—ফাল্গুন।

"নারায়ণের পরিণীতা"—শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। গল্পাংশ আদৌ চিত্তাকর্ষক হয় নাই, চরিত্রও ফুটে নাই। নায়িকা সবিতা কুলীনের মেয়ে। একটা পা বাঁকা। পাত্রাভাবে নারায়ণশিলার হাতে সে সমর্পিত হয়। তাহার বাল্য-সহচর সতীশ বিদেশে ডাক্তারী করে। একদিন দেশে ফিরিয়া সতীশ রোগ-শয্যায় শায়িত সবিতাকে দেখিতে যায় এবং নানা বাক্যবাণে বিদ্ধ এবং সবিতার ব্যর্থ জীবনের জন্য ব্যথিত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসে। ক্রুদ্ধ সতীশ অতঃপর সবিতার পাণি-গ্রহণ প্রস্তাব করে। সে প্রস্তাবের উত্তরে অনেক ফিলজপি আওড়াইয়া সবিতা এক পত্র লিখিল এবং তাহাতে অনুরোধ রহিল, সে যেমন অবিবাহিতা অথচ কুমারীও নহে, সতীশও যেন সেইরূপ থাকে। বলা বাহুল্য, ভালবাসার হিমালয়-শৃঙ্গ সতীশ সে অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে বিশ বৎসরের মধ্যে সে সবিতাকে দেখে নাই, সংবাদও লয় নাই। সাবাস, একেইত বলে Hero। এই তো গল্পের আর্ট।

স্বামী-স্ত্রী—গল্পটি শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাকা হাতের রচনা। ইহাই গল্পাংশে বর্ত্তমান সংখ্যার মর্য্যাদা রাখিয়াছে। প্লটটী ভাল। আধুনিক সাহেবীয়ানার উপর লেখক প্রচ্ছন্ন ভাবে যে চাবুক চালাইয়াছেন, তাহা 'নায়ক-নায়িকা'র পথাবলম্বীর শিক্ষণীয়। তাহার উপর ইহাতে মনস্তত্ত্ব আছে, আর্ট আছে এবং চরিত্রগুলিও ভাল

'পথের কাহিনী'—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত। ছোট গল্প আখ্যাভুক্ত হইতে পারে না। আখ্যানবস্তুতে করুণ রসের সমাবেশ আছে। অল্প বয়সে গৌরীদান করিলে কন্যার স্বাস্থ্য নষ্ট ও জীবননাশ পর্য্যন্ত ঘটে 'পথের কাহিনী'র তাহাই সম্ভবতঃ প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু রচনা হিসাবে গল্পটী একেবারে বিশেষত্ব

দর্শন

ভারতবর্ষ ফাল্গুন

বেদ মানিব কেন?—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। বেদ আমরা মানি কারণ বেদ অনাদি, নিত্য, অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। কেন আমরা বেদকে অনাদি, অভ্রান্ত ও কোনও পুরুষের রচিত নহে বলি, তাহার যুক্তি সকলও রাজেন্দ্রবাবু এই পবন্ধে অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় প্রভৃতি বলিবার কারণ বেদ অর্থবদ্ধ বর্ণাত্মক শব্দরাশি। বর্ণাত্মক শব্দ ও তাহার অর্থের সহিত সম্বন্ধ না শিখিলে মানব তাহা স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারে না। সুতরাং 'পৃথিবী উৎপন্ন হইবার পর প্রথমোৎপন্ন মানবের ভাষা-বিকাশের জন্য যে উদ্বোধক স্বীকার করা হয়, তাহা জগতের পিতৃ-মাতৃ স্থানীয় কোন অনুৎপন্ন নিত্য পুরুষের ভাষা শ্রবণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।' এই ভাষাই সেই বেদ, আর জগতের পিতৃ-মাতৃ স্থানীয় সেই অনুৎপন্ন নিত্য পুরুষই ব্রহ্মা বা ঈশ্বর। আর ঈশ্বর অনাদি, নিত্য এবং সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত বেদও অনাদি নিত্য ও অভ্রান্ত। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, বেদ ঈশ্বরের রচিত গ্রন্থ নহে, উহা ঈশ্বরসম নিত্য। বেদের মধ্যেই আছে "ব্রহ্ম নিঃশ্বসিতং বেদঃ"; যাহা নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয়, তাহার রচনা সম্ভব হয় না। কারণ বেদকে যদি ঈশ্বর রচিত বলিতে হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে—বেদ রচিত হইবার পূর্ব্বে উহা ছিল কি না? যদি 'ছিল' বলা হয়, তবে আর রচনাই সম্ভবপর হয় না। আর যদি 'ছিল না' বলা হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে, সেই বেদ ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচনার পূর্ব্বে ঈশ্বর জানিতেন কি না? যদি ঈশ্বর জানিতেন, তবে আর তাহার রচনা সম্ভবপর হয় না। আর যদি ঈশ্বর জানিতেন না বলা হয়, তবে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিলেন না। অতএব বেদ ঈশ্বরেরও রচিত নহে ইহাই বলিতে হইবে।

আমাদের দেশে দার্শনিক সাহিত্যে রাজেন্দ্র বাবুর নাম সুপ্রসিদ্ধ; এই প্রবন্ধে তাঁহার সেই সুনাম অক্ষুন্ন রহিয়াছে। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, বেদ ঈশ্বর সম নিত্য কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যদি বেদ ঈশ্বর সম নিত্য হয়, তবে অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তক সেরূপ নহে কেন? যদি বলা যায়, অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তকের ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি মনুষ্য প্রণীত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বলিব, বেদের সম্বন্ধে সেইরূপ কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় নাই বলিয়া সেই অজ্ঞতাই কি বেদকে ঈশ্বর সম নিত্য বলিবার কারণ হইতে পারে? আর যদি বর্ণাত্মক ভাষা সৃষ্টির দিক দিয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বলিব, পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই ব্রহ্মা বা ঈশ্বরের ভাষা শ্রবণ। মূলতঃ কোনও ভাষাই এরূপ ভাবে সৃষ্টি হয় নাই; ভাষা মানব জাতির সমসাময়িক; যে দিন হইতে মানুষ অস্পষ্ট ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই ভাষার সৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমাদের মনে হয় বেদে ঋষিদিগের অনুভূতি সমূহ তদানীন্তন ভাষায় বর্ণিত আছে, এবং ইহাই বেদ মানিবার কারণ।

মাসিক বসুমতী—মাঘ।

'খৃষ্টীয় দর্শন শাস্ত্র'—শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী। খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্র রূপ দুরূহ এবং জটিল শাস্ত্রের একটা মোটামুটি ইতিহাস। খৃষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের বিপুল গ্রন্থরাজি মথিত করিয়া এই যে সরল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা প্রশংসার বিষয়।

বিজ্ঞান

প্রকৃতি—হেমন্ত সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় 'সুন্দর বনের উদ্ভিদ-সংস্থান' নামক প্রবন্ধে সুন্দর বনের সাধারণ বর্ণনা প্রদান করিয়া উক্ত প্রদেশের উদ্ভিদ-সমষ্টির (Flora) বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক মহাশয়ের মতে সমাবেশের পার্থক্য হিসাবে সুন্দরবনে পাঁচ শ্রেণীর উদ্ভিদ বর্ত্তমান আছে। সমগ্র সুন্দবনে ৩৩৪ জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত উদ্ভিদ্ সমূহ ২৪৫টি গণে ও ৭৫টি প্রাকৃতিক বর্গে বিভক্ত। লেখক মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সুন্দরবনে কোনও অন্তর্জাত উদ্ভিদ নাই এবং এই ৩৩৪ জাতির উদ্ভিদের মধ্যে ৯৬টি সমুদ্র, ৯৪টি মানব, ৫৩টি পক্ষী, ৫০টি বায়ু ও ৪১টি নদী দ্বারা বাহিত হইয়াছে।

প্রত্ন জীবতত্ত্বের এক অধ্যায়—প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত

কতিপয় সরীসৃপের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সাধারণ হিসাবে মন্দ না হইলেও, 'প্রকৃতি'তে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রবন্ধের গোড়ার কথা—সরীসৃপের পর্য্যায় বিভাগের কথা সম্বন্ধেই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে Squamata পর্য্যায় Dolichosauria ও Pythonomorpha এই দুই উপপর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু পুস্তকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই পর্য্যায় চার উপপর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কোনও হেতু প্রবন্ধ লেখক ব্যক্ত করেন নাই এবং তাঁহার বর্ণিত পর্য্যায়-সমূহের মধ্যে Squamata পর্য্যায়ভুক্ত অপর দুই উপপর্য্যায়ের—যাহা Lacertilia ও Ophidia—কোনও স্থান খুঁজিয়া পাইতেছে না। যেরূপ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই এইরূপ ত্রুটি সে প্রবন্ধ 'প্রকৃতি'র মত পত্রিকাতে বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

'অলসক' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোক সেন বলিয়াছেন যে, দার্জ্জিলিং ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান হইতে সংগৃহীত অনেক 'অলসক 'নামহীন অপরিচিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।' আশা করি যে অধ্যাপক মহাশয়, অলসক সম্বন্ধে গবেষণাতে নিজকে নিয়োজিত করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে অলসকের চর্চ্চা কোন সময়েই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।'

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয়ের 'জ্যোতিষ পরিচয়' নামক প্রবন্ধে বিশেষ কিছু নূতন তথ্য দেখিতে পাইলাম না। এই ধরণের প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথের ও একেন্দ্রনাথের দুইটী প্রবন্ধ এখনও ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহার 'সুরভি-সংবাদ' প্রবন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রবন্ধের ভাষা আরও পরিমার্জ্জিত হইলে ভাল হইত। সৌরভ-শিল্পিগণ এই প্রবন্ধ পাঠে লাভবান্ হইবেন বলিয়া আশা করিতে পারা যায়।

এই সংখ্যাতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের কীট-পতঙ্গ বিষয়ক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতা

প্রবাসী—ফাল্গুন।

দুর্দ্দিনে—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জীবনের সব দিনই যে 'সুদিন' হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না বটে, কিন্তু বিশ্বকবির হস্তে লেখনী থাকিতে কাব্য-গগনে রবিচ্ছটার যে একেবারে অভাব হইবে না—বঙ্গ-সাহিত্যে 'দুর্দ্দিন' কখনও আসিবে না—এই 'দুর্দ্দিন' কবিতাটি পড়িয়া এই কথাই আমের মনে হইতেছে।

ভারতবর্ষ ফাল্গুন।

ক্ষেত্রমণির বাণী—আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার। গরীব গৃহস্থ-বধূ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর কাযে অবিরাম খাটুনীর মধ্যে স্বামী ও সন্তানের সুখ চাহিয়া যে অপার্থিব সুখ-শান্তি পাইয়া ধন্য হয় তাহারই একটি চিত্র।

প্রচ্ছন্ন—শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত। একটু অতিরিক্ত গোছের জমাট বাঁধায় ভাষার চাপে স্থানে স্থানে ভাবটি 'প্রচ্ছন্ন' থাকিয়া কবিতাটিকে সার্থক-নামা করিয়াছে।

অরূপ রতন—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র। 'রতনেই রতন চেনে'—সুতরাং আমরা পারিলাম না। শেষ তিন ছত্র এই—

কবিজনের র'য়ে গেল বড় বেশী দাবী ?—
তাই ভাবি
তাই—তাই ভাবি!

এই কয় ছত্র খুবই suggestive। এর পর নিম্নলিখিত কয় পংক্তি হতভাগ্য পাঠকের মনে উদয় হওয়া বিচিত্র নহে—

অর্থ চাই, কোথা পাই ?—হারায়েছে চাবী—
খাই খাবী
খাই—খাই খাবী !!!

পত্রলেখা—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। ললিত-মধুর রচনা, অমৃত-সঞ্জীবনী সুধায় ভরা। অতকরণকেও ত্রিশ বছরের আগের কথা স্মরণ করাইয়া, হিসাবের খাতা ফেলিয়া চিঠি লিখিতে উৎসাহিত করিবে।

প্রাতে ও রাতে—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। একটু ছন্দ-মাত্রার গোল-যোগ ঘটিলেও, কবিতাটি সু-পাঠ্য। সার্ব্বজনীন প্রীতি ও একনিষ্ঠ প্রেমের তারতম্য প্রকাশের চেষ্টা কবিতাটির মধ্যে দেখা যায়।

মৃত্যু-সুধা (হাকিম আজমল খাঁর তিরোভাবে) গোলাম মোস্তাফা বি-এ, বি-টি। সমদর্শী দেশনেতা মহাপ্রাণ হাকিম আজমাল খাঁর আকস্মিক পরলোক-প্রয়াণে কবির এই শ্রদ্ধা-নিবেদন বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। দরদী কবি যথার্থ আন্তরিকতার সহিত এই শোক-গাথা রচনা করিয়াছেন—তাই ইহা এত প্রাণ-স্পর্শী।

মৌন সঙ্গী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ। 'বাতায়নের ফাঁকে' একটি নারিকেল শাখায় কবি দিনে ও রাতে, নানা ঋতুতে বিচিত্র শোভা দেখিয়া ক্লান্ত হৃদয় মন পরিতৃপ্ত করেন। ঐ নারিকেল শাখাই কবির 'মৌন দিনের সাথী' এবং 'মৌন রাতের সাথী'। কবিতাটি ভাবুকতায় ভরা, অভিব্যক্তিও সুন্দর। একটা সামান্য নারিকেল শাখা দেখিয়া কবির মনে এত 'ভাব' আসিতে পারে, কিন্তু একটা গোটা নারিকেল বাগান দেখিয়াও অ-কবির কিছুমাত্র ভাবোদয় হয় না, সে কেবল দেখে কোন গাছে কত ডাব! 'যে খেলিতে জানে সে কাণা-কড়িতেও খেলিতে পারে' এবং যে নাচতে জানে না সে উঠানেরই দোষ দেয়!

বসুমতী—মাঘ।

রূপহীনার ব্যথা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'রূপ-হীনা'র ব্যথায় হৃদয় ব্যথিত হয়, তবে মনে হয় 'রূপহীনা' যেন একটু প্রগল্‌ভা। অতটা 'প্রকাশ করিয়া বলিবার' এমন কি আবশ্যকতা? এই ব্যথার মূল কারণ দূর করা বাঙালীর কেন, বিশ্ব-সংসারেরই চিরন্তন সমস্যা। যদি কোন 'তরুণ' কবি 'রূপহীনের' ব্যথা প্রচার করিয়া উল্টা propaganda করিতে পারেন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আরও হইতে পারে যদি 'রূপহীনারা' হৃদয়-হীনা হইয়া ভালবাসা-ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব-কবির সেই অপূর্ব্ব কবিতার প্রথম লাইন মনে পড়ে—

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে,
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!

পথ-হারা—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। করুণ রস-ধারায় সিক্ত সুরচিত কবিতা। পতিতার অনুতাপ বেশ অল্প কথায় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া ফুটিয়াছে। এত বেদনার মধ্যেও বিপথ-গামিনী নারী 'জননী' হইয়া খোকার চুমায় স্বর্গ-সুখের আস্বাদ পাইয়া সুখী। অঙ্কিত চিত্রে অভিনবত্ব আছে, হয়ত সত্যও আছে কিন্তু রসাভাসও আছে। এই 'খোকার চুমায় শান্তির বারিধারায় পরাণ শীতল' করিবার লোভে যদি কেহ 'উল্টা বোঝে' তবেই ত সর্ব্বনাশ!

সহিষ্ণু—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মোটে ছোট্ট ৮ লাইন তাই রক্ষে! নচেৎ পাঠক সহিষ্ণুতা পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ফেল হইত।

নির্ভর—শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন। মাসিক বসুমতীর বিশাল পৃষ্ঠদেশই সব চেয়ে সেরা 'নির্ভর'।

খুঁজিছি—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন। কাব্য 'খুঁজিছি'—পাই নাই। তবে তত্ত্ব থাকা আশ্চর্য্য নয়!

কিসে রহে গর্ব্ব অভিমান—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। উপদেশপূর্ণ সরল শিশুপাঠ্য কবিতা। ১৪ লাইন দেহে অত বড় শিরোভূষণ জিনিষটাকে top heavy করিয়াছে।

হোলকার হুল্লোড়—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। 'ইন্দোর-মিলার' সংবাদ, 'মমতাজের'ও উল্লেখ (allusion) আছে। এটিকে ছন্দোবদ্ধ "সাময়িকী" স্বরূপেই গণ্য করিতে হইবে। কুমুদরঞ্জনের স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্য ও চাতুর্য্যের অভাব নাই।

বাণী-বন্দনা—শ্রীযুক্ত বনবিহারী গোস্বামী বি-এ। 'মাঘ' মাসের 'বসুমতী' কাবেই কর্ত্তৃপক্ষ মামুলী বাণী-বন্দনা গাইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন।

মতভেদ—কুমারী অশ্রুকণা দাস। মতভেদ ভুলিয়া মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবার জন্য কাতর অনুরোধ। এ অনুরোধ যে অবশ্য পালনীয় সে বিষয়ে আর মতভেদ নাই। কবিতাটি স্বচ্ছ ও সরল।

সন্ধ্যাতারা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান। যদি প্রশ্নপত্রে এই প্রশ্ন থাকে—'সন্ধ্যা-তারা' কবিতার উপদেশ লিখ,; ছাত্রেরা কবিতার শেষ দুই লাইন লিখিলেই পুরা নম্বর পাইবে। যথা—

আঁধারের বুকে আলোক রয়েছে
জানাইতে এই বাণী—
অগ্রদূতী সে গোধূলি তারারে
পাঠালো স্বপ্ন-রাণী!

বজ্র—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা 'অশিব' বলিয়া মনে হয়, তাহার পশ্চাতে যে 'শিব' আছেন এই পরম তত্ত্ব কবি বজ্র-নির্ঘোষে প্রচার করিয়াছেন। কবি কালিদাসের আধুনিক বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই একটি সংস্কৃত-সাহিত্যের আব-হাওয়া সৃজন করা, এই কবিতায়ও সেই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইল। শব্দালঙ্কার ও উপমালঙ্কারেরও অভাব নাই। কবি আজকাল মাঝে মাঝে বজ্রাদপি সুকঠোর হস্তেই লেখনী ধারণ করেন, কিন্তু তিনি যে মনে করিলেই 'কুসুমাদপি' মৃদু হইতে পারেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে অনেক পাইয়াছি। আশা হয় এই বজ্রের পর প্রচুর বারিপাতে সরস ক্ষেত্রে কুসুম ফুটিবে।

ব্যথার-আবেদন—শ্রীমতী বিদ্যুৎপ্রভা দেবী। এ ব্যথা এত সাধারণ যে ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি সার্ব্বজনীনত্বে অধিরোহণ করে এবং সার্ব্বজনীন অভিব্যক্তি ব্যক্তিত্বে অবরোহণ করে। আলোচ্য কবিতার 'ব্যথার আবেদন' ব্যর্থ হইবে না বলিয়া মনে হয়।

চন্দ্রশেখর-পাদমূলে—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার রায়। কবির এ ভক্তি-নিবেদন চন্দ্রশেখর পাদমূলে পৌঁছিলে আমরা তৃপ্ত হইব।

অভিসারের গান—শ্রীমতী আরতি দেবী। আগে সকলের অলক্ষ্যে গোপনেই 'অভিসার' চলিত, এখন দেখিতেছি 'অভিযানের' মত ঢাক বাজাইয়া, হাঁক ডাক করিয়াও 'অভিসার' চলে। অভিসার-যাত্রার প্রারম্ভেই অভিসারিকা সাবধান করিয়া দিতেছেন—'আমায় কেউ পিছু ডাকিও না, আমায় কেউ ভয় দেখাইতে আসিও না, রে মূর্খ! (এ হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে?) আমার চিত্ত জয় করা তোমার সাধ্য নয়।" ইত্যাদি। অভিসারিকার সৎ-সাহস ক্রমশঃই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, যথা—

মলিন চীর-বাসের ফাঁকে
না যদি মোর আবরু ঢাকে
করব তাকে বক্ষে চেপে সকল লজ্জা জয়।

অতএব বেচারা প্রেমাস্পদের জন্য আমরা চিন্তিত রহিলাম। বাচ্যার্থ ধরিয়া এই রকম মনে হয় বটে, কিন্তু যদি বাচ্যার্থের পিছনে কোন 'ব্যঙ্গার্থ' লুকাইয়া থাকে তবে এই কবিতাটিতে সাধনার একটি অবস্থা, পরমাত্মার সহিত মিলিবার জন্য জীবাত্মার উৎকট আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যা হয় কিছু গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ নিহিত আছে বুঝিতে হইবে।

বিচিত্রা—ফাল্গুন।

তে হি দিবসাঃ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিবরের কাব্যলক্ষ্মী ও কল্পনাসুন্দরী যে এখনও অনবদ্য সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠককে অনাবিল আনন্দ দান করিতেছে—তিনি স্বয়ং 'তে হি দিবসাঃ গতাঃ' বলিলেও কেহ শুনিবে না। তাঁহারই আলোচ্য কবিতার শেষ দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরাও বলি ইহাতে আছে—

'দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হাওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলো-ছায়ার ভেলা।

জীবন-সন্ধ্যা—শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার। যৌবনে কবির মনে নির্ব্বেদ আসিল কেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না এখন তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'অনাহুত অচেনা অতিথি' নন, তাঁহার নিকট আমরা আশার বাণী শুনিতে চাই—শুনিতে চাই এমন কাহিনী যাহা দেশের ও দশের প্রাণে সাড়া দিতে পারে; দেশবাসীকে উন্নত আদর্শের পথে লইয়া যাইতে পারে। তিনিই ত গাহিয়াছেন——

'জানি সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা
সুখে দুঃখে ভোগে ত্যাগে আপনা বিস্মৃতি।'

আমরা চাই মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে, তিনি জীবনের পিপাসা বাড়াইবার পথগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিন। এই রসোজ্জ্বল কবিতার সুরটী আমাদের প্রাণে বাথা দিয়াছে বলিয়াই এত কথা বলিলাম।

দলঝরা—শ্রীমতী লীলা দেবী। চলনসই কবিতা।

শেষ বাসনা—শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। কবি মৃত্যুর পর পুনরায় এই দেশে জন্মগ্রহণ করিবার বাসনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহার 'এ জনমে যাহা কিছু রঁহিল বিফল' তাহা পরজন্মে সফল করিয়া লইবেন। দেশে দেখিতেছি কেমন একটা নূতন হাওয়া আসিয়া পড়িল। কবিরাও সংসার বিরাগী শঙ্করাচার্য্যের দলে জুটিয়া পড়িতেছেন।

ব্রহ্মপুত্র নদী যবে—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ। এই চতুর্দ্দশপদী কবিতার শেষ নয় চরণে প্রকৃত কবিত্ব রস আছে

'সাতাশ তারার গাঁথা রাশি চক্র সম
বন মল্লিকার মালা তব কুন্তলেরে
ঘেরে ঘন আলিঙ্গনে; বক্ষ নিরুপম
উলসিয়া ওঠে ক্রমে; ঘিরিয়া দেহেরে
কিঙ্কিণী কঙ্কন কাঞ্চী করে কানাকানি
চক্রান্ত বিরুদ্ধে মোর জানি তাহা জানি।'

মূল কবিতার সহিত পরিচয় না থাকায় বলিতে পারি না যে আলোচ্য কবিতা কতদূর মূলানুগত হইয়াছে।

মনের মানুষ—শ্রীযুক্ত আনন্দশঙ্কর রায়। কবি বাহিরে মনের মানুষকে খুঁজিতে গিয়া না পাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন——

'আমার আপন সৃষ্টি সে জন,
আর গায়ে সে তার আঁখি লেখা।'
'বিচিত্র তার চোখের চাওয়া,
কেশের গন্ধ শাড়ীর হাওয়া,
বিচিত্র তার পরশ বুঝি!'

কবি কল্পনার রঙীন ফানুস বেশ উড়াইয়াছেন।

গতি আবর্ত্ত—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার। বিচিত্রা দেখিতেছি ক্রমশঃ অগতির গতি হইয়া উঠিল। কবি বলিতেছেন 'শৈলে প্রহত বজ্রের রবে চমকিয়া জাগে বেদনা' আর সেই বেদনা বলিতেছে 'মরি নাই আমি মরি নাই আমি, গতি আবর্ত্তে অগাধে।' ইহাতে কবিত্ব নাই, থাকিতে পারে ঐতিহাসিক কিংবা দার্শনিক তথ্য।

শেষের আগে—শ্রীযুক্ত সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য। কবি সুরে, ভাবে বা ভাষায় কোন দিক দিয়াই পাঠককে আনন্দ দিতে পারেন নাই।

স্মৃতি—শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে। এ স্মৃতি বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যাইবে। ইহাতে কবিত্ব আদৌ নাই।

নির্জ্জনতা

উপকথার ঝিনুক-কন্যা যেমন রাজ প্রাসাদের কোলাহল নিবৃত্তির নিরালা নিঝুমক্ষণে ঝিনুক হইতে বাহির হইয়া রাজকক্ষে খেয়াল খেলা জমাইয়া তুলিত, তেমনি মানুষের আনন্দস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ আত্মাও শুধু বিশ্ব কলরোলের বাহিরে আপনার পূর্ণতায় মুক্তির পাখা মেলিয়া দেয়। মানুষের সুন্দরতম মানুষ, মধুরতম মানুষ তাহার Better self, essential being নির্জ্জনতায় নামিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিকে উৎসব গড়িয়া তোলে, ঘিরিয়া ঘিরিয়া মধুচক্র রচনা করে, প্রাচুর্য্যে দেহ মন ভরিয়া রাখে। এই উৎসবেই আপনার সত্তায় সত্য হইয়া মানুষ দাঁড়ায়। "It is in solitude only that a man can be truly revealed to himself." তখন আঁখির তারায় তারায় যে দৃষ্টি তাহার উছলিয়া ওঠে, প্রাণের পরতে

পরন্তে যে বাক্য তাহার উৎসারিত হয়, প্রকৃত জীবন তাহারই মাঝে। এই দৃষ্টি লইয়াই হয় দ্রষ্টা, এই বাক্য ব্যক্ত করিয়াই উদ্গাতা, কবি। জীবনের গভীরতার এই দৃষ্টি ও বাক্য দিয়াই কবি রচনা করেন শ্রেষ্ঠ কাব্য, শিল্পী অঙ্কিত করেন শ্রেষ্ঠ শিল্প, ভাবুক বুনিয়া তোলেন ভাবের জাল, ভক্ত নিবিড় করিয়া বক্ষে পান ভগবানকে। ভক্ত-ভগবানের একাত্ম-মিলন এই নির্জ্জনতায়। সারা বিশ্বে "তুমি আর আমি একা" হইয়া এই নির্জ্জনতারই মাঝে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে অসীম মিলনে যুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, প্রগাঢ় গভীরতার মাঝেই বিশ্বের বিরাট আত্মপুরুষ ও মানুষের নিভৃতবাসী তপস্বী দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তাহারা 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।' নির্জ্জনতার নীরব প্রেমানুভূতিতেই প্রেমের চরম মাধুরী। অতৃপ্তির তৃপ্তিতে প্রেমিকের প্রাণের মাণিক লক্ষ ভঙ্গিমায় অফুরান বিচিত্র ও অপার্থিব হইয়া তাহার চোখের কোণ জুড়িয়া জাগিয়া তাহার প্রেমকে সার্থকতা দান করে।

নির্জ্জনতা হইতেছে ভাব-জীবনের সাধনা-পীঠ। ভাব-রসিক জীবনের জন্মলাভই হইতেছে এই নির্জ্জনতায়। তাই কবিকে বলা হইয়াছে 'The child of solitude', মেটারলিঙ্কের কথায় "Bees will not work except in darkness; thought will not work except in silence; neither will virtue work except in secrecy." সত্য-সন্ধানী কবি-ভাবুক-সাধকের মনোভৃঙ্গ নির্জ্জনতার কুঞ্জবনে জীবনের পূর্ণ মুক্ত কুসুম-কোষে ডুবিয়া পরম তৃপ্তিতে মধু পান করিয়া লয়। দেহ-প্রাণের এই নীরব নিবিড় লীলার ভিতরেই এই আত্মাভিসারের মুহূর্ত্তেই নিখিল বিশ্ব তাহার রূপ মেলিয়া, সকল রহস্য খুলিয়া প্রস্ফুট হইয়া উঠে।

এক অমূর্ত্তের আলোকে তাহার জগৎ ছাইয়া দেয়, অনন্ত মাধুর্য্য-ঢালা এক সঙ্গীতে তাহার শ্রবণ বিভোর করে। এক অখণ্ড যোগ-সূত্রে বিশ্বের সকল ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছন্দিত হয়। বিশ্বপ্রবহমান বিচিত্র তরঙ্গে তরঙ্গে সে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া নাচিয়া দুলিয়া লীলায়িত হইয়া উঠে। পৃথিবীর বুকের ক্ষুদ্রতম স্পন্দনটীও তাহার শ্রুতিতে সুস্পষ্ট হইয়া বাজে। নির্জ্জনতায় দুঃখ তাহার রসের রূপ খুলিয়া দেয়। দুঃখ তাহার লক্ষ কণ্টকের তীব্রতা হারাইয়া, সুখ তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ হারা হইয়া এক অনির্ব্বচনীয়তার মাঝে মিলাইয়া যায়। নির্জ্জনতার অমৃত-হ্রদে নিমজ্জিতের দুঃখ দৈন্য, বেদনা-বিচ্ছেদ অমৃতে অমৃতময় হইয়া উঠে. "সকল কাঁটা ধন্য ক'রে গোলাপ হয়ে ফোটে।" জানা-অজানা জীবনের কত হাসি-ব্যথার গান মূর্চ্ছনার পর মূর্চ্ছনায় নির্জ্জনতার মাঝে প্রাণের পাত্র অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে।

নির্জ্জনতার জীবন-মন্থনে যে অমৃত উত্থিত হয়, তাহা পানে পরিতৃপ্ত না হয় এমন মানুষ কোথায়? গভীরতম জীবনের গান যে নিখিল মানবের জীবন-সঙ্গীত। তাই প্রতি অন্তরের তারে তারে তাহা নাড়া দিয়া যায়। তাই মহাপুরুষের বাণীর, কবির কাব্যের, ভাবুকদের ভাব-নিবেদনের এমন আকর্ষণ। তাই মানুষ অন্তরে অন্তরে তাঁহাদের মন্দির রচনা করে। বিশ্বমানবের কাছে তাহাদের গান যেন ঘর-হারার কাছে ঘরের গান, যেন সুদূর প্রবাসীর কাছে স্বদেশের সংবাদেরই মতো তাহা আবেশ-উন্মাদনায় ভরপূর। মানুষের পীড়িত আত্মা এই অমৃত পানে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

মানুষ দৈনন্দিন জীবনের চতুর্দ্দিকস্থ বিষ-শ্বাসের বহ্নি-দাহে অতিষ্ঠ হইয়া চিৎকার তুলিয়া মাঝে মাঝে নির্জ্জনতায় যাইয়া বাঁচিতে চাহে, অন্তরের 'অমিয়া-সাগরে' ডুবিয়া জীবন শীতল করিতে চাহে। জীবনে ভীড় যখন বাড়িয়া ওঠে, পাপের উৎকট মূর্ত্তি যখন চতুর্দ্দিকে তাণ্ডবে মাতে, সহস্র কুটিলতা জটিলতা যখন চারিদিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া তোলে, মিথ্যার বোঝায় জীবন যখন অসহ্য ভারি হয়, বক্ষ যখন বেদনায় খান্ খান্ হইয়া যায়, বিচ্ছেদ বিফলতা যখন আশার প্রদীপ নিবাইয়া দেয়—তখনই কোলাহলের আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানুষ নির্জ্জনতার ক্রোড়ে ছুটিয়া ঝাঁপাইয়া যাইয়া আত্মস্থ হইয়া জীবন জুড়াইতে চায়। মাতৃস্তন্যের শেষ বিন্দুটী নিঙড়াইয়া দিয়া নির্জ্জনতা তাহাকে বক্ষোনীড়ে আঁকড়াইয়া স্নেহ-সকরুণ সান্ত্বনায় দোলাইতে থাকে। আপনাকে মেলিয়া ধরিয়া বৃহত্তর জীবনের আনন্দের মাঝে মানুষ ভাসিয়া যায়, জীবনভরা ভুলের মধ্য হইতে আপনাকে টানিয়া তুলিয়া পাইয়া সে আত্মহারা হয়। মানুষ শান্তি পায় তাহার প্রকৃতির মাঝে থাকিয়া। আপনার মাঝে আপনি আসিয়া দাঁড়াইতে পারিলেই হৃদয়ের কোষে কোষে মধু জমিয়া ওঠে। মানুষের জীবন যাহা নয় তাহাতে সে আনন্দ পায় না, তাহাতে উৎসব জমে না, তাহার মাঝে সান্ত্বনা নাই। তাহার আনন্দের সেখানে অবলম্বন নাই। ভুয়াকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে যাইয়া কেবলই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া ঝরিয়াই তাহাকে পড়িতে হয়। অতৃপ্তিতে, ব্যথায়,

বিফলতায় তাহার অন্তর-নিবাসী ফোঁপাইয়া ওঠে। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ, জীবনের ক্ষুদ্র সুখের সায়রে ভরিয়া লইবার ভুল বিশ্বাসে দুঃখের সলিলেই পূর্ণ করিতেছে, আত্মপ্রকৃতির বাহিরে সে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাই অপ্রকৃতিকে ধরিয়া মানুষের দুঃখ নিরসনের আপ্রাণ চেষ্টা কেবল দুঃখকে বাড়াইয়াই তুলিতেছে। কিন্তু তাহার পক্ষে যাহা তাহার প্রকৃতি, যে সত্য ধরিয়া সে জীবনকে আনন্দময় উৎসবময় করিয়া তুলিবে, তাহা প্রচ্ছন্ন ফল্গুধারায় তাহার বহির্জীবনের আড়াল দিয়া বহিয়া যাইতেছে, সে রত্ন লুকাইয়া আছে—রামপ্রসাদের ভাষায়—'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।' তাহা আত্মপ্রকাশ করে নির্জ্জনতায়। মেটারলিঙ্ক তাই কোলাহলহীন মুহূর্ত্তকে বলিয়াছেন—"The angel of supreme truth" আর এমার্সনের কথায় "Seclusion, austerity may pierce deep into the grandeur and secret of our being, and so diving, bring up out of secular darkness the sublimities of the moral constitution."

মানুষের বহির্জীবনের অতিচেষ্টা অন্তর্লোককে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। সংসারের স্বার্থ হিংসা দ্বেষ প্রতারণার কোলাহল, হৈ-রৈ-হাঙ্গামা, বিরুদ্ধ বাসনা রাশির ঘাত-প্রতিঘাত, কবি গ্রের কথায় maddening crowd's ignoble strife, উন্মত্ত মানবমণ্ডলীর হীন সংগ্রাম মানুষের সত্যকে, পরমকে, শাশ্বতকে ডুবাইয়া, মানুষকে সংসারে সং সাজাইয়া রাখে। প্রকৃতি-হারা মানুষ যেন "নিজ বাসভূমে পরবাসী"র মতো। স্ব-গৃহের এই প্রবাসকে লক্ষ্য করিয়াই দুঃখের সহিত Coleridge বলিয়াছেন "Alas! the large part of mankind are nowhere greater strangers than at home:" আর এই প্রবাসের দুঃখকে অনুভব করিয়াই সোলোমন বলিয়াছেন—"Dwell at home." ওগো নিজের ঘরে এসে বাস কর—অর্থাৎ আত্মস্থ হও। সংসারের জনারণ্যের মাঝে মানুষের বাহিরের স্বভাবই সহজ হইয়া জাগিয়া আছে। শ্রবণ তাহার সহজ সুখের গুঞ্জনে বধির, নয়ন তাহার সহজ সুখের স্বপ্নে অন্ধ। চায় সে বাহিরের চাক্‌চিক্যে ভাসিয়া বেড়াইতে, জীবনের মাঝে ডুবিয়া আত্মানুসন্ধান করিতে চায় না। ইন্দ্রিয়সেবার মোহে মানুষ চঞ্চল থাকে। তাহার সকল অভিপ্রায়ের গোড়ায় কেনা বেচাই বড়। লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় আর লোকসানের অধৈর্য্যেই মানুষ পাগল।

হীন স্বার্থের সংগ্রামে, আরামের নেশায়, কর্ত্তৃত্বের গর্ব্বে, বাহিরের পারিপাট্যের ব্যস্ততায় সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছে, আর স্বরূপ তাহার বিরূপ করিয়া তুলিতেছে। বাহিরের স্বাচ্ছন্দ্য চেষ্টায় উন্মত্ত মানুষ তাহার প্রাণের বিপন্নতাকে কেবলই বাড়াইয়া বাড়াইয়া তিলে তিলে আত্মহত্যা করিতেছে। মানুষের দৈনন্দিন সংসারে বাহিরের জীবনই বড় হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড় করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে।" অর্থাৎ সকল দিক দিয়াই সে বহুমূল্য নিজত্বকে খোয়াইয়া খোয়াইয়া অমানুষ হইতে চলে। মানুষের অন্তর ও বাহির যেন নদীর দুই তীর। এক কূলে ভাঙ্গন ধরিলে অন্য কূল গড়িতে থাকে। কবির কথায়ও—

"দেহের কূলে ভাঙ্গবে যত
মনের কূলে গড়বে তত।"

একদিন প্রাচীন ভারতের আর্য্য মন এই জ্ঞানেই চালিত হইয়াছিল। বাহিরের বাড়াবাড়িকে তুচ্ছ, খাটো অকিঞ্চিৎকর করিয়া সত্যকার সরল সবল মানব-জীবন গড়িবার কল্পনাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাচীন ভারতের মন্ত্র "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভোগকে ভাসাইয়া দিয়া ত্যাগের কথা নয়, লক্ষ ভোগ হইতে ভোগকে বাছিয়া লইবারই জন্য এই মন্ত্র। ইহাতে ভোগে নিস্পৃহতার কথা নাই, আছে ভোগকে অপভোগের গণ্ডী হইতে বাঁচাইয়া উপভোগে পৌঁছানোরই উপদেশ। 'সুখার্থী সংযতো ভবেৎ" মহাভারতের এই উক্তিই হইতেছে ইহার অন্তর্নিহিত ভাব। অন্তর বিরোধী ভাবের সংক্রামতার সীমা-শেষে যেখানে পরিপূর্ণ অন্তরোৎসব, সেই নির্জ্জনতায় এই চেষ্টাকে সফল করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারতের সভ্যতার সৌধ গভীর নির্জ্জন অরণ্যে তপস্বীর তপোবনের শিক্ষায়। তাহার সংসার-ধর্ম্ম, তাহার রাজ-ধর্ম্ম নির্জ্জনতার মুক্ত-পক্ষ মহা সত্যের বিচিত্র বর্ণে রং ধরিয়া উঠিয়াছিল। এক কথায় তাহার সংসার রূপ পাইয়াছিল বনে। তাই প্রাচীন ভারতের আর্য্যেরা তাঁহাদের জীবন-যাত্রায় এমন একটা সরল, শুভ্র, সতেজ নিরাময় জীবনের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, যাহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর।

মানুষ জন্ম পাইয়াছে আনন্দেরই উৎস হইতে। আনন্দাৎ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেরই শিশু মানুষ। তাহার সেই শাশ্বত সত্যের মাঝে, স্বাভাবিক

ধর্ম্মের মাঝে জীবন জমাইয়া তুলিতে হইলে, আত্ম-প্রকৃতির মাঝে, স্বীয় ঐশ্বর্য্যের মাঝে আপনাকে জিয়াইয়া রাখিতে হইলে, আকণ্ঠ জীবনের মাধুর্য্য পান করিয়া সংসারে বিভোর হইয়া থাকিতে হইলে, জীবনের বৃন্ত ঘিরিয়া আনন্দের সহস্রদল কমল ফুটাইয়া তুলিতে হইলে মানুষ সন্ধানী হইয়া খুঁজিয়া লইবে তাহার চলার পথের পরম বন্ধুকে, শ্রেষ্ঠ চালককে, সেই নির্জ্জনতারই মাঝে—"Where the sweet tender voice of the spirit of Truth can speak within him and be heard."

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

বৈদেশিকী

সঙ্কলন

১। মার্কিন রাষ্ট্রমণ্ডলের জাতীয় পতাকার অনুরক্ত প্রজা—বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহের সৌন্দর্য্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও সামোয়া রমণীর মনের স্ফূর্ত্তি কখনও নষ্ট হয় না।

২। মারকুয়েস দ্বীপ নিবাসী পূত ফল (Bread fruit) হইতে "পই পই" খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে :—ইহা দুর্গন্ধময় খাদ্য পচা ফলের শাঁস হইতে প্রস্তুত হয়।

৩। মারকুয়েস দ্বীপের জাতীয় আহার—সকলে একত্র এক পাত্রেই আহার করে।
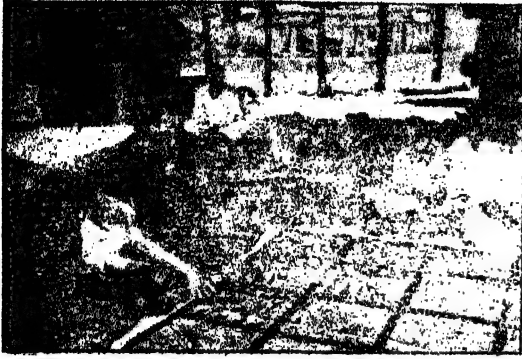
৪। সামোয়ান শিল্পী, "টাপা" নামক বস্ত্র চিত্রিত করিতেছে। বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারের পূর্ব্বে পলিনেসিয়া অঞ্চলে এই বাকল বস্ত্রের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কঁচা বাকলের অংশ গুলি পিটিয়া বিস্তৃত করিলেই বস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম হয়।

৫। সামোয়া দেশের গৃহনির্ম্মাণ—গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ সামোয়া নিবাসীরা প্রচুর বায়ু ভালবাসে। উহাদের গৃহ নির্ম্মাণে প্রেক ব্যবহৃত হয় না এবং সমগ্র চালটী নারিকেল তন্তুর দ্বারা আবদ্ধ থাকে।
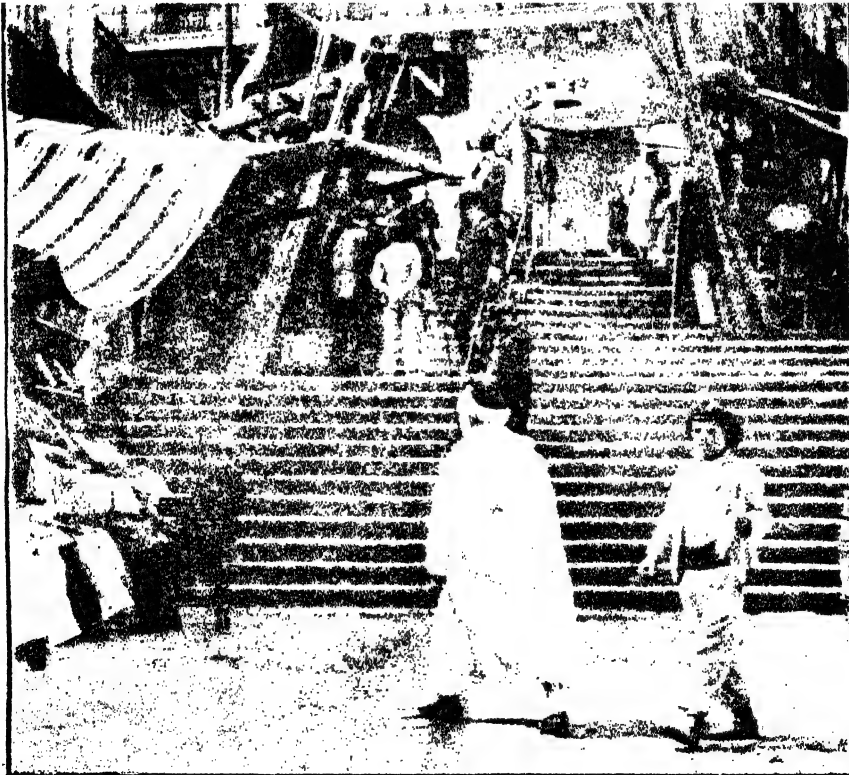
৬। এলজিয়ার্সের সোপান পথে বাজার।

৭। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত নেটালের রিক্সওয়ালা। ইহারা বক্রাকৃতি শৃঙ্গ ও রঞ্জিত পক্ষশোভিত শিরোভূষণ ব্যবহার করে এবং পদদ্বয়ে চূর্ণ লেপন করে।
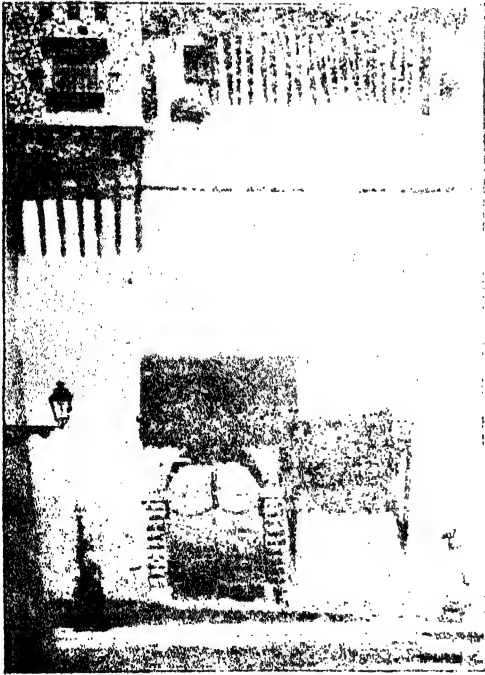
৮। কাস্‌বার দ্বারতোরণে এলজিয়ার্স শাসন কর্ত্তার দুর্গ প্রাসাদ। এক সময় ইহা জলদস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল।

৯। সেন্ট হেলেনা দ্বীপনিবাসী লেস নির্ম্মাতা, ইহাতেই ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

১১। জার্ম্মাণীতে নূতন কৌতুক ব্যবস্থা—ইহাতে জনসাধারণের চিত্তবিনোদনার্থ মুক্ত স্থানে সিংহপিঞ্জর মধ্যে বহুবিধ পশু ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১০। ক্যাপ্টেন হল্যাণ্ড এই পিপীলিকাভুক্ ভল্লুকটী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা আকারে একটি বিড়ালছানার মত।

১২। আকাশমার্গে জীবনমরণ সংগ্রাম—ক্যাপ্টেন হথর্ণ সি গ্রে আকাশযানে চরমোচ্চতায় ৮ মাইল অতিক্রম করিয়াছিলেন। ক্লান্তিবশতঃ অক্সিজেন বাষ্পাধার উন্মোচনে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।
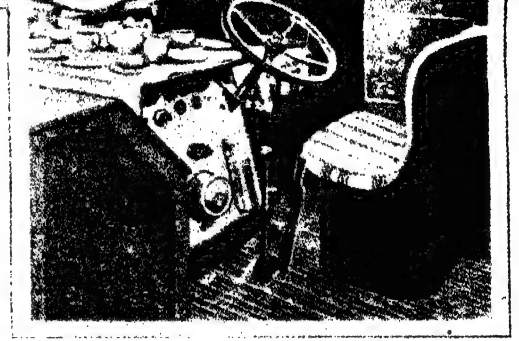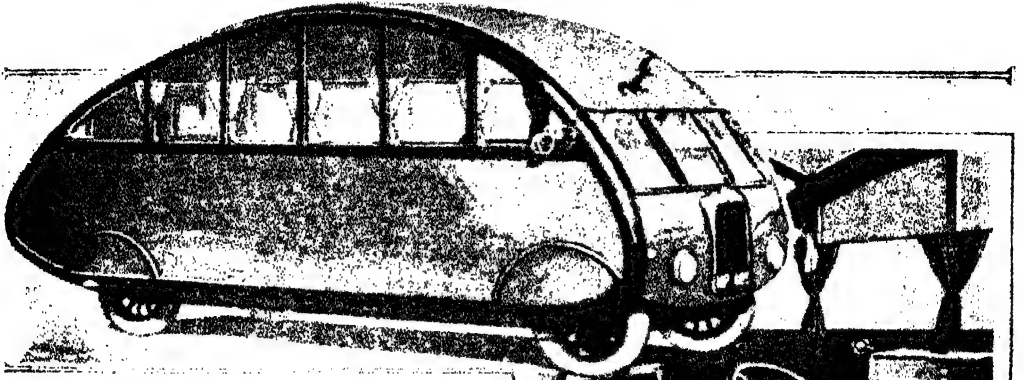
১৩। আরামপ্রদ সুসজ্জিত প্রমোদ যান—ইহাতে দুইটি শয়ন কক্ষ, একটি স্নানাগার, পাঠাগার ও রন্ধন স্থানের ব্যবস্থা আছে।
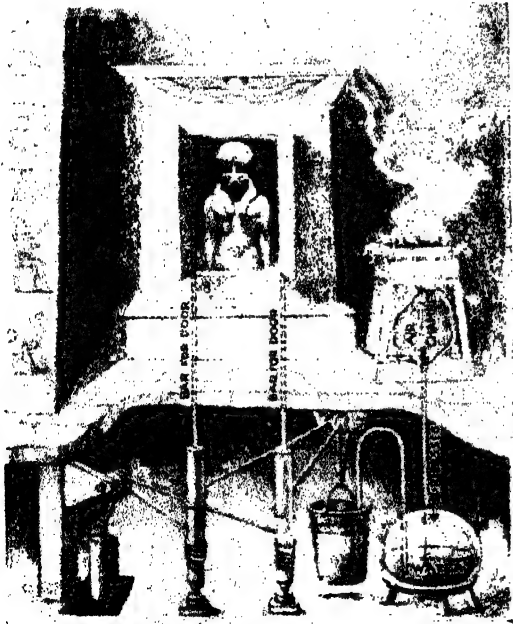
১৪। গোপন বায়ুর সন্তাপে অতিপ্রাকৃত ঘটনা:— মিশর দেশীয় পুরোহিতগণ এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া জনসাধারণকে তাক্ লাগাইয়া দিতেন।
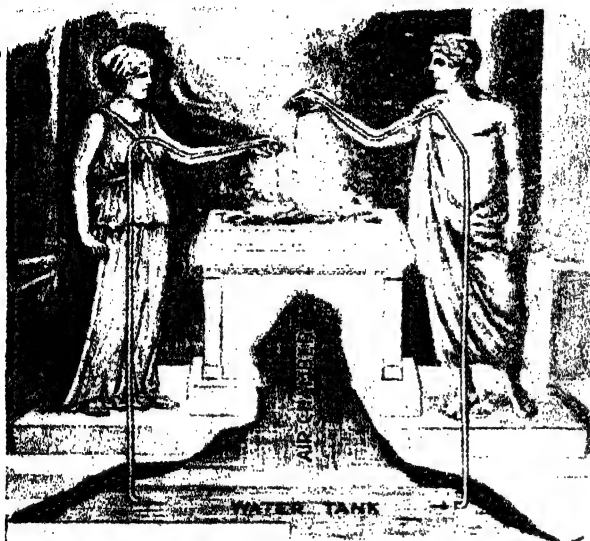
১৫। মিশর দেশীয় পূজারিদের জন্য জল ক্রয় যন্ত্র। উপরে মূর্ত্তিযুগল দেবোদ্দেশে পেয় প্রদান করিতেছে।

১৬। ষোড়শ শতাব্দীর একটি চিত্র—এক দল আরব দেশীয় যাদুকর মিথ্যা যাদুবিদ্যার জন্য অনুতপ্ত।

১৭। থিবসে "গায়ক" কলোসি মূর্ত্তি—রোম সম্রাট হাড্রিয়ান প্রত্যহ ইহাদের সঙ্গীত শুনিতেন। "E" চিহ্নিত জলপৃষ্ঠ সূর্য্যের উত্তাপ বশতঃ বাষ্পে পরিণত হইয়া "A" চিহ্নিত রন্ধ্রে অবনমিত হয় এবং "D" চিহ্নিত বক্রনল সাহায্যে "B" চিহ্নিত রন্ধ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চালিত বায়ু সাহায্যে "F" চিহ্নিত নলের মধ্য দিয়া মূর্ত্তির কণ্ঠে করুণ গদগদ শব্দ উৎপন্ন করে।

১৮। প্রাচীন যুগের বায়ুসঞ্চালন যন্ত্র—বেদীর অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই ইহার সাহায্যে মন্দির দ্বার আপনা হইতেই উন্মুক্ত হয়।

১৯। ষোড়শ শতাব্দীর একটি চিত্র। জ্যেষ্ঠ সেণ্ট জেমস্ যাদুকরের আসুরী মায়ার প্রতিরোধ করিতেছেন। নিম্নে যাদুলুণ্ঠন সাহায্যে রাত্রে অগ্নিদীপ্ত পিশাচমূর্ত্তি দেখান হইতেছে।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

অনাদৃতা

ওই রাশি রাশি শুভ্র শেফালি
পড়িছে ঝরে,
তুমি বোঝো তার কত ব্যথা জাগে
বুকের পরে।
তুমি বোঝো তার মরমের কথা

ওই ছোট বুকে কত আকুলতা
চরণেতে ঠাঁই দাও তারে তাই
সোহাগ ভরে,
নিষ্ফলতার ব্যথা দাও তার
পূর্ণ ক'রে।

তুমি জানো তার কোথা সফলতা
　　লুকানো রহে,
কেহ নাহি চায়, ভূমিয়ে বিলায়,
　　বেদনা সহে ;
চাঁপা করবীর সুষমা নেহারি
কম্পিত লাজে চিত্ত তাহারি
অক্ষমতার ব্যথা ওগো তারে
　　সতত দহে,
সবে ছাড়ে যারে, তুমি লহ তারে—
　　তাই কি নহে ?

গাছে গাছে কত দুলিছে কুসুম
　　সগৌরবে
লুটিছে হরষে অধীর পবন
　　সে সৌরভে,
বাপী মাঝে ওই ছড়ায়ে আলোক
মেলিছে নয়ন কমল কোরক
অলি গুঞ্জরে মত্ত আশায়
　　আকুল রবে,
সেই বাপী তটে কাঁদিছে শেফালি
　　হায়—নীরবে !

কাঁদিছে শেফালি—ও নহে শিশির—
　　অশ্রুরাশি,
ভাবিছে কখন তুমি লবে তারে
　　বেদনা নাশি।
ভয় নাই ওরে, আসিবে লগন
বেদনার ধূলি মুছিবে যখন
সিত সুন্দর স্বরূপে তখন
　　উঠিবে ভাসি',
সে প্রিয়-পরশে ফুটিবে অধরে
　　মধুর-হাসি !

শ্রীবীণাপাণি রায়।

মোসাহেব

(গল্প)

মলিনা তাহার শিশুপুত্র নয়নের চাঁদ নয়নচাঁদের চিন্তায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিল। প্রায় মাস পাঁচ ছয় হইতে চলিল তাহার মদ্যপায়ী, হৃদয়হীন স্বামী বিনোদলাল তাহাকে মারিয়া ধরিয়া, তাহার শেষ সম্বল যে দুই একখানা সোণার অলঙ্কার ছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া, কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও মলিনা তাহার সন্ধান পাইল না।

তাই সে নিরুপায় হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত যে কয়খানি পিতল কাঁসার তৈজস-পত্র ছিল, তাহা হয় বিক্রয় করিয়া না হয় বন্ধক দিয়া অতি কষ্টে চালাইল। আর চলে না ;—সে আজ তিন দিন হইতে নিজে না খাইয়াও যে কয়েক মুষ্টি চাউল অবশিষ্ট ছিল তাহা সিদ্ধ করিয়া পুত্রকে খাওয়াইল। কিন্তু তার পর ? তারপর সে কি করিবে ?—এই চিন্তায় মলিনা মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তাহার জীবন-নাট্যের প্রতি অঙ্কগুলি, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক গুলিও যে এরূপ একটানা করুণ-দুঃখে ভরিয়া উঠিবে, ইহা সে পূর্ব্বে এক দিনের জন্যও ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। মাত্র তাহার সতের বৎসর বয়স ; এই বয়সের মধ্যে এমন একটা দিনেরও সুখের স্মৃতি তাহার সেই বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে স্থান পায় নাই, যাহাকে মনের

সম্মুখে টানিয়া আনিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়া-চাড়া করিয়া সে একটু শান্তি পাইতে পারে।

কোন্ শৈশবে যে নিষ্ঠুর বিধাতা তাহাকে তাহার মাতা-পিতার সহিত চির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন তাহা তাহার আদৌ মনে পড়িত না। মাতুলের অবজ্ঞা জনিত ভ্রূকুটি, মাতুলানীর তর্জ্জন-গর্জ্জন, এবং তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণের নির্ম্মম ব্যবহার,—ইহা ভিন্ন তাহার মনে আর কোন চিহ্নই ছিল না।

এইরূপে মলিনা দীর্ঘ তেরটা বৎসর কাটাইয়া দিয়াছিল। তাহার পর যেদিন তাহার বিবাহ হইল, সে আর্ত্ত-প্রাণে আশার একটা ক্ষীণ আলো সহসা জ্বলিয়া উঠিল;—মনে করিল হয়তো স্বামী-গৃহে যাইলে তাহার দুঃখের অবসান ঘটিবে। কিন্তু স্বামী গৃহে আসিয়া প্রথম দিনেই সে তাহার স্বামীর যে পরিচয়টা পাইল, তাহাতে সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার অন্তরের সেই ক্ষীণ আলোটুকু এক ফুৎকারেই নিমেষের মধ্যে চিরদিনের মত নিভিয়া গেল।

ইহার পর দিন কয়েকের মধ্যেই সে বেশ বুঝিতে পারিল তাহার অভিভাবকহীন স্বামী যেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি মাতাল, তেমনি চরিত্রহীন। মলিনা দেখিল—তাহার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে, তাই সে আগন্তুক দুঃখগুলিকে বরণ করিয়া লইবার জন্য মনে জোর বাঁধিল, এবং বিবাহের পর হইতে চারিটা বৎসর অনেক কষ্টই সহ্য করিল। কিন্তু আর সে যে পারে না। আজিও কোনরূপে তাহার নয়নচাঁদকে খাওয়াইল, কিন্তু কাল হইতে কি হইবে? এই চিন্তায় তাহার এত দিনের ধৈর্য্যও বুঝি ভঙ্গ হইবার উপক্রম করিল;—তাই, মলিনা দিন দিন মলিন হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় মলিনা নয়নকে বুকের কাছে লইয়া শুইবার ঘরে শুইয়া আছে, এমন সময় প্রতিবেশিনী চণ্ডীর মা একখানি গরদের শাড়ী হাতে করিয়া সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে কাপড়খানি ফেরত আনিতে দেখিয়াই মলিনার মুখ শুকাইয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল চণ্ডীর মা, কাপড়খানি কি কেউ নিলে না?"

মলিনার পাশে কাপড়খানি নামাইয়া রাখিয়া চণ্ডীর মা বলিল, "কাপড়খানির আর আদায় নেই, বৌমা, পোকাতে এমনি কেটেছে যে একটা টাকা দিয়েও কেউ নিতে চাইলে না।"

"তাই তো—তবে উপায়? আমার আর যে কিছুই নেই—কি করি এখন?"

মলিনা কাতর নয়নে চণ্ডীর মার পানে তাকাইল।

মলিনার বেদনা-কাতর দৃষ্টিতে চণ্ডীর মার নারীহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে যে কি বলিয়া এই অসহায়া রমণীকে সান্ত্বনা দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। তাই সে মিনিট কতক নীরবে থাকিয়া হতাশ ভাবে বলিল, "কি যে তুমি করবে বৌমা! আমিই বা যে কি করতে পারি, তাও তো ভেবে পাইনে।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চণ্ডীর মা অশ্রুরোধ করিবার প্রয়াস পাইল। তাহার সেই ব্যর্থ চেষ্টা কিন্তু মলিনার নজরে পড়িয়া গেল, তাহারও চক্ষু দিয়া আপনা হইতেই ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। হতাশার নির্ম্মম বেদনায় তাহার বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার ক্ষীণ দুর্ব্বল, কঙ্কালসার দেহলতাটি তাহার পুত্রের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

প্রায় মাস দুই হইতে এইরূপ একটা নূতন রোগ যে মলিনার মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেছে তাহা চণ্ডীর মা জানিত। সে তখন তাড়াতাড়ি একঘটি জল ও পাখা আনিয়া মলিনার মুখে চোখে জলের ছিটা দিয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল। মিনিট দশ পরে মলিনার জ্ঞান ফিরিল। সে একটা সুদীর্ঘ হাঁপ ছাড়িয়া, উঠিয়া বসিয়া বিহ্বলভাবে বলিল, "চণ্ডীর মা, আমি কি করি বল তো? খোকাকে আমার কি করে বাঁচাই? আজ বাছা আমার সমস্ত দিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে! কি করি—এমন অদৃষ্টও আমি করেছিলাম!"—এই বলিয়া মলিনা পুত্রের দিকে উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল।

মলিনার ব্যাকুলতা চণ্ডীর মাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সে তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাপড়ের খুঁট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া মলিনাকে ডাকিয়া বলিল, "বৌমা, এই টাকাটা নাও বাছা, কাপড়টা কেউ যখন নিলে না দেখলুম, তখন নিজের ঘর থেকেই টাকাটি নিয়ে এলুম। কি কি আনতে হবে বলে দাও, দোকান থেকে এনে দেই।"

মলিনা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। সে কিছুক্ষণ চণ্ডীর মার দিকে কৃতজ্ঞ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া ডাকিল—"চণ্ডীর মা।"

আর বলিতে পারিল না, দুই চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

চণ্ডীর মা কিন্তু কোনরূপ কাতরতার লক্ষণ না দেখাইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "কি কি আনতে হবে বৌমা, আমায় শীগ্‌গির বলে দাও। ছেলেটা মড়ার মত পড়ে রয়েছে সেটা দেখতে পাচ্ছো তো?"

মলিনার চমক ভাঙ্গিল। সে অনেকটা সামলাইয়া লইয়া, কি কি জিনিষ আনিতে হইবে তাহা চণ্ডীর মাকে বলিয়া দিল। চণ্ডীর মাও টাকাটা পুনরায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

যাহা হউক মলিনা দিন দুই তিনের মত একটা দারুণ চিন্তার দায় হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাইল।

৩

দিন পাঁচ সাত পরে একদিন চণ্ডীর মা আসিয়া মলিনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বৌমা, তোমার মামার কোন চিঠি পত্তর পেলে বাছা?"

ক্ষুদ্র একটী—"হ্যাঁ"—বলিয়া মলিনা মুখ খানি নত করিল। মামা যে কি উত্তর দিয়াছেন মলিনার মলিন মুখ খানিই চণ্ডীর মাকে অনেকটা জানাইয়া দিল। তবু ব্যাপারটা ভাল করিয়া জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছেন তিনি?"

ছল ছল চক্ষে মলিনা বলিল, "মামা জবাব দেন নি চণ্ডীর মা, দিয়েছেন মামীমা। সেই চিঠি খানা প'ড়েই আমার নিজেরই উপর এমনি একটা ধিক্কার জন্মে গেল চণ্ডীর মা,—যে সেটা প'ড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি;—তা যদি শুনতে, রাগে তোমারও গা গস্ গস্ ক'রত।"

বলিতে বলিতে মলিনার চোখ দুইটা যেন জলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিবার পর মলিনা আবার বলিল, "সকলই অদৃষ্টের গেরো চণ্ডীর মা—সকলই আমার অদৃষ্টের গেরো।"

বিমর্ষ মুখে চণ্ডীর মা বলিল' "তাই তো বৌমা, এরকম ক'রে আর কতদিন চালাবে বাছা? লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটা যে কোন চুলোয় গেল, কেউ তার খোজ খবর পাচ্ছে না গা? এমন মানুষও সংসারে থাকে?"

চণ্ডীর মার কথা শুনিয়া মলিনা একটু দুঃখের হাসি হাসিল মাত্র। সেই হাসিতে তাহার অন্তরের ব্যথা যে কতখানি ফুটিয়া বাহির হইল কেবল চণ্ডীর মাই তাহা দেখিল। তাহার তখন মনে হইতেছিল—কেউ যদি একবার বিনোদের সংবাদ আনিয়া দেয়—তা সে যেখানেই থাক না কেন—তাহার কাণে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে তাহার স্ত্রী পুত্রের দুর্দ্দশাটা একবার দেখাইয়া দেয়।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। চণ্ডীর মা মলিনাকে আজ কি একটা কথা বলিতে আসিয়া তাহার বড়ই বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু আর না বলিলেও যে নয়। সে যে এই অসহায়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে নিজের কন্যার মতই দেখিয়াছে, সে উপস্থিত থাকিতে তাহার কষ্ট দেখিবে কি করিয়া? তাই চণ্ডীর মা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না,—একটা ঢোক গিলিয়া ডাকিল—"বৌমা।"

মলিনা তাহার দিকে চাহিল।

চণ্ডীর মা বলিল—"বৌমা আজ একটা কথা জানতে এসেছি বাছা। একে ভদ্র ঘরের মেয়ে—তাই বলতে ভয় পাচ্ছি।"

দারুণ সন্দেহে মলিনার মুখ খানি শুকাইয়া গেল। সে চণ্ডীর মায়ের পানে কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমি তোমায় মায়ের মত দেখি চণ্ডীর মা। মা হ'য়ে মেয়েকে বলবে এতে ভয় বা লজ্জা পাবার

তো কোন কারণ থাকতে পারে না। আমায় কি বলকে, বল না চণ্ডীর মা।"

মলিনার কথায় কতকটা ভরসা পাইয়া চণ্ডীর মা বলিল, "দেখ, আমার এক বোনঝি ক'লকাতায় এক বড় লোকের বাড়ীতে কায করে! দিন দশ হল সে তার বাপের বাড়ী এসেছিল। আবার কাল কলকাতায় যাবে। আজ সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তারই মুখে শুনলুম—সেই বড় লোকেরা নাকি রাঁধবার জন্যে একটি ভলে বামুনের মেয়ে চেয়েছে। তাই শুনে—আমার বোনঝির কাছে তোমার কথাই বলেছি যদি তুমি—"

চণ্ডীর মায়ের কথা আর শেষ হইতে পাইল না, অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে মলিনা বলিল, "চণ্ডীর মা, আমায় তুমি সেইখানেই কাযের ঠিক করে দাও,—আমার নয়নকে বাঁচাও। আমার মাইনে পত্তর কিছু চাইনে চণ্ডীর মা, কেবল নয়নকে আমার খেতে দেওয়া। এই সু-খবরটা দিতে এত ভয় পাচ্ছিলে চণ্ডীর মা?"

এত সহজেই মলিনা কলিকাতা যাইতে স্বীকৃত হইল দেখিয়া চণ্ডীর মা একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা বেশ, আমি বাড়ী গিয়েই আমার বোনঝি সৌরভীকে বলিগে। সে বোধ হয় কাল বিকেলের গাড়ীতে ক'লকাতা যাবে,—তুমিও ততক্ষণ জিনিষ পত্তর সব গোছগাছ ক'রে রেখে দাও মা।"

একটা ক্ষীণ হাসি সেই কৃতজ্ঞতায় ভরা মুখের উপর টানিয়া আনিয়া দুঃখের সহিত মলিনা বলিল, "জিনিষ পত্তর বলতে আমার আর কি আছে চণ্ডীর মা?—সবই গেছে,—থাকবার মধ্যে আছে তোমারই দেওয়া পরণের এই কাপড় খানা, আর আমার নয়ন, এ ছাড়া—"

আর বলিতে পারিল না,—চোখের জল উপচাইয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। এদিকে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া চণ্ডীর মাও একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর সে আর বেশীক্ষণ থাকিল না, যাইবার সময় কেবল বলিয়া গেল, "তুমি নিশ্চিন্দি থাক মা, যাতে তোমার ক'লকাতায় যাওয়া হয় তার ব্যবস্থা আমিই ক'রে দেবো।"

চণ্ডীর মা চলিয়া গেল। মলিনা তাহার পুত্রটির পাশে শুইয়া পড়িয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার সকল চিন্তাকে ছাপাইয়া কেবলই এই সদ্‌গোপ রমণী চণ্ডীর মার কথাই সকলের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সে আজ না থাকিলে তার আর তার নয়নের কি দশাটাই যে হইত—এই কথাটা ভাবিতে গিয়া মলিনা বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় মলিনার পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল। সে তার স্বাভাবিক অমায়িক ব্যবহারে এবং কর্ম্মপটুতায় এই কয় মাসের মধ্যেই তার মনিব বাড়ীর সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ছোটবাবু অরুণের স্ত্রী শান্তা মলিনাকে বড়ই ভালবাসিত। ইহার কারণও ছিল যথেষ্ট। উভয়েরই সমান বয়স, সমান রূপ, এদিকে দুঃখটাও ছিল একই ছাঁচে ঢালা। কাযেই উভয়ের প্রীতি দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। যাহা হউক, মলিনার দিনগুলি একরূপ নিশ্চিন্ত ভাবেই কাটিতে লাগিল।

একদিন অরুণবাবু তাঁহার নিজের বসিবার ঘরে মোসাহেব বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, লাল জল সকলের চোখ ও মন গুলিকে রাঙাইয়া তুলিতেছে, মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার ও বেসুরা সঙ্গীতে সমস্ত ঘর খানি মুখরিত, উপস্থিত সকলেই আত্মহারা। অরুণবাবু কিন্তু কিছু অন্যমনস্ক। কাহার আগমন প্রতীক্ষায় যেন উদ্‌গ্রীব। মাঝে মাঝে বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিলেন। এমন সময় দূর হইতে তাঁহার প্রত্যাশিত ব্যক্তিটিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, ক্ষুদিরাম আসিয়া উপস্থিত হইল।

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া ক্ষুদিরামের হাত ধরিয়া

বারাণ্ডার দিকে টানিতে লাগিলেন। ভিতরে মদের বোতলের পানে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া ক্ষুদিরাম বলিতে লাগিল, "বেশ লোক তো আপনি ছোটবাবু! এতক্ষণ ধ'রে আপনার কাযে ঘুরে এলুম, আমি এক গ্লাস না টেনে,—"

অরুণবাবুর ইঙ্গিতে হরিয়া খানসামা এক গ্লাস আনিয়া ক্ষুদিরামকে দিলে সে অমনি সমস্তটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া হরিয়ার হাতে পুনরায় গ্লাসটা ফিরাইয়া দিল।

আগ্রহে অরুণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি হে ক্ষুদিরাম?"

ক্ষুদিরাম বলিল, "অনেক কথা বলবার আছে ছোট বাবু, কিন্তু একটু নিরিবিলি দরকার। একটু শলা-পরামর্শ করতে হবে।"

"বেশ এখনি তাড়িয়ে দিচ্ছি"—বলিয়াই অরুণবাবু ঘরের মধ্যে আসিয়া অন্যান্য মোসাহেবদিগকে অসুস্থতার কারণ দেখাইয়া নিজেদের বাড়ীতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে বাহির হইয়া গেল,—ঘর নির্জ্জন হইল।

ক্ষুদিরাম যে অপকার্য্যের জন্য দৌত্য স্বীকার করিয়াছিল, তাহাতে বিফল হইয়া আসিয়াছে—অরুণ বাবুর হাতে নোটের তাড়া ফেরৎ দিয়া বলিল, "ছুঁড়ি কিছুতেই রাজি নয়। সে, নোটগুলোতে লাথি মেরে বলেছে, এরকম কথা আমায় আর কখনও যদি বলিস্ সৌরভী, তা হলে আমি বড় বাবুকে বলে দেবো।"

অরুণ বাবু নোটগুলা হাতে লইয়া বলিলেন, "তাই ত হে ক্ষুদিরাম, বড়ই ভাবিয়ে তুল্লে তো! তুমি তাকে চোখে দেখনি তাই বোধ হয় তেমন যত্ন চেষ্টা করছ না। একবার যদি তার রূপটা দেখতে!"

ক্ষুদিরাম বলিল, "তা কি আমি বুঝতে পারছিনে ছোট বাবু! নইলে কি আপনার মত সৌখীন লোকের মন ভোলে?"

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ চলিল। মদও চলিতেছে। কিন্তু কোন পরামর্শই তখন তাঁহাদের নিকট যুতসই হইয়া উঠিতেছিল না। উভয়েই ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ ক্ষুদিরাম "ব্রেভো" বলিয়া লাফাইয়া সশব্দে হাতে একটা তালি দিয়া বলিল, "বাঃ রে, এমন একটা সোজা উপায় থাকতে কিনা শুধু শুধু ভেবে মরছি। শুনুন দেখি—এদিকে একটু এগিয়ে আসুন, কাণে কাণে ব'লব।"

আগ্রহের সহিত অরুণ বাবু ক্ষুদিরামের দিকে সরিয়া আসিলেন। ক্ষুদিরাম তখন তাঁহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া যে পরামর্শটা বলিল তাহা শুনিবামাত্র অরুণ বাবু আহ্লাদে তাহার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "ঠিক, ঠিক, এত বন্ধু থাকতে সাধে তোমার খোসামোদ করি? সেই ভাল ছুঁড়ীটা রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর সৌরভীর বাড়ী শুতে যায়। এদিকে রাস্তাটা ত গলি-রাস্তা, লোকজনও কম; সেই ভাল—একেবারে মোটরে তুলেই বেলঘরের বাগান বাড়ীতে। বেশ বেশ, খুব ফন্দিটা খাটিয়েছ যা হোক। এখন কাযটা হাঁসিল ক'রতে পারলে তবে জানব।"

উল্লাসে মাথা নাড়িতে ক্ষুদিরাম বলিল, "খু-উ-উ-ব পারব, এটা যদি আর না পারব তবে এতদিন আপনার কাছে আসছি যাচ্চি কি করতে? তবে কিনা আজ আমার হাতে—।"

"হাঃ হাঃ হাঃ, তার আর কি,—এতক্ষণ বলতে হয়।" এই বলিয়া অরুণ বাবু দুইখানি দশটাকার নোট ক্ষুদিরামের হাতে দিলেন। সে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নোট দুইখানি লইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রাবণমাস। সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টির ধারা নামিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন ধুইয়া মুছিয়া ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে, এবং কতখানি কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্যই যেন মধ্যে মধ্যে পৃথিবীর উপর বিদ্যুতের আলো হানিতেছে।

এদিকে তখন অরুণবাবুর বেলঘরিয়ার বিলাস-কক্ষে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের অভিনয় চলিতেছে। ক্ষুদিরামের

সাহায্যে যে রূপসীকে পাইবার আশায় অরুণবাবুর এত উদ্যোগ এত আয়োজন,—তাহাকে হাতের ভিতর পাইয়াও তাঁহার উদ্দাম আশা ক্ষণে ক্ষণে নিরাশার সাগরে ডুবিতে লাগিল। অরুণবাবু মূর্চ্ছিতা রূপসীর কিছুতেই চৈতন্য ফিরাইতে পারিলেন না। মিনিট কুড়ি ধরিয়া তাহার মাথায় জল ঢালিয়া এবং বাতাস করিয়াও যখন সুন্দরীর জ্ঞান ফিরিবার কোন সম্ভাবনা দেখিলেন না, তখন ভয় পাইয়া সাহায্যের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্ষুদিরামকে ডাকিতে লাগিলেন।

ক্ষুদিরাম তখন নীচের হলে বসিয়া তার এই কর্য্যের সফলতায় এবং ভবিষ্যতে পুরস্কার প্রাপ্তির আনন্দটাকে আরও গাঢ়, আরও ঘোরাল করিবার জন্য সেই সবে মাত্র গ্লাসটী মুখের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে। এমন সময় অরুণবাবুর কাতর আহ্বান তাহার কাণে গেল। গ্লাসটী তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া ক্ষুদিরাম সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সিঁড়ির উপরেই অরুণবাবু বিমর্ষ-মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাহাকে দেখিয়াই তিনি আরও দুই ধাপ নামিয়া আসিয়া ভীতিজড়িত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওহে ক্ষুদিরাম, আমোদটা বুঝি সবই মাটী হয় হে! মালীর স্ত্রী আর তার মেয়েতে ধরাধরি ক'রে ছুঁড়ীটাকে সেই যে উপরে তুলে দিয়ে গেছে—সেই থেকেই সেটা একই ভাবে প'ড়ে র'য়েছে,—ম'রে গেছে কি বেঁচে আছে কিছুই বুঝতে পারছিনে। তুমি একবার এসে দেখ দেখি!"

অরুণবাবুর কথায় ক্ষুদিরাম উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "আপনি ভয় পাবেন না, ও সবই ঢং, এটাও আপনি এখনো বুঝে উঠতে পারেন নি?"

ক্ষুদিরামের হাসিতে বিরক্ত হইয়া অরুণবাবু একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, "এসে আগে দেখই না—ঢং কি সং—তার পর বোলো।"

দুইজনে বিলাস-কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতেই ক্ষুদিরাম যুবতীর দেহটাকে দেখাইয়া অরুণবাবু বলিলেন, "প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'তে চল্ল—ঐ এক রকম ভাবেই প'ড়ে র'য়েছে,—তুমি একবার গিয়ে দেখ দেখি জ্ঞান ফেরাতে পার কি না?"

ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে রূপসীর দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু নিকটে গিয়াই,—একটা বিকৃত শব্দ করিয়াই সে চার-পাঁচ হাত পিছাইয়া আসিল। আবার কি মনে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যুবতীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার তাহার ভ্রম ঘুচিল; তখন একটা বিকট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"ওঃ—মলিনা, মলিনা, তুমি এখানে? আমিই তোমার সর্ব্বনাশ ক'রবার জন্যে এখানে ধ'রে নিয়ে এনেছি!"

বৎবরখানেক হইল, গ্রামে একটা অপকর্ম্ম করিয়া, পুলিসের ভয়ে মলিনার মাতাল স্বামী বিনোদলাল কলিকাতায় আসিয়া, নাম ভাঁড়াইয়া ক্ষুদিরাম সাজিয়া, বড়লোকের মোসাহেবগিরি করিয়া দিন কাটাইতেছিল। ক্ষুদিরাম ওরফে বিনোদ মলিনার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া আকুল উদ্বেগে একদৃষ্টে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে অরুণবাবু তাহার কাণ্ড দেখিতেছিলেন; তিনি তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষুদিরাম, তুমি ওরকম ক'রছ কেন? তুমি ছুঁড়ীটাকে চেন না কি?"

উত্তর দিতে গিয়া বিনোদের স্বর জড়াইয়া আসিতে লাগিল, তবু সে অতি কষ্টে টানিয়া টানিয়া বলিল,—"আমার স্ত্রী।"

শ্রীবটকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা শুনিতে পাই যে, বাঙ্গালা দেশের জমিদারগণের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক; সেই কারণে তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রকার অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সকলেই নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে মহাজনের পথই অনুসরণ করিতেছেন, এ কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান জমিদার হইতেছেন গবর্ণমেণ্ট। সেই গবর্ণমেণ্টই প্রতি বৎসর আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন। ইংরাজের বৎসর যদিও ডিসেম্বর মাসেই শেষ হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাদের গভর্ণমেণ্টের কারবারী বৎসর শেষ হয় মার্চ্চ মাসে, এপ্রিল মাস হইতে কারবারী বৎসর আরম্ভ হয়। এই কারবারী বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই আগামী বৎসরের জন্য একটা বাজেট প্রস্তুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটা আনুমানিক আয়-ব্যয়ের খসড়া প্রস্তুত হয়। এবার যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল যে আগামী বৎসরে আয় হইবে প্রায় এগার কোটি টাকা, আর ব্যয় হইবে প্রায় বারো কোটি—এক কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক অনাবশ্যক খরচ বাদ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ শিক্ষা বিভাগ বা স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয় বরঞ্চ কমানো যাইতে পারে, কিন্তু শান্তিরক্ষার ব্যয় কিছুতেই কম হইতে পারেনা। তাহাতে যদি আয়ে না কুলায়, গৌরী সেন আছেন। এখন ত ঋণং কৃত্বা যা হয় হউক; পরে একটা কর বসাইতে পারিলেই সমস্ত ধার দেখিতে দেখিতে শোধ হইয়া যাইবে।

——:০:——

গত মাসে আমরা কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে হরতাল উপলক্ষে গোলযোগ ও হাঙ্গামার কথা বলিয়াছিলাম। এই গোলযোগ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ রাখিবার আদেশ হইয়াছিল এবং ইডেন হিন্দু হষ্টেলেরও দ্বার বন্ধ করা হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের গোলমিটিয়া গিয়াছে, হষ্টেলেরও দ্বার মুক্ত হইয়াছে। কলেজের প্রিন্সিপাল ষ্টেপ্‌ল্‌টন সাহেব এখনও স্বপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন; কিন্তু জনরব এই যে, তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইবে। শুধু তাঁহাকেই নহে, কয়েক জন অধ্যাপককেও স্থানান্তরিত করিলে অচিরেই ছাত্র ও অধ্যাপকগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

হরতাল উপলক্ষে বেথুন কলেজেও একটু গোলযোগ হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী রাইটের অবিবেচনার ফলেই এই অপ্রীতিকর গোলযোগের সূত্রপাত হয়। যাহা হউক কলেজের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের বিশেষ চেষ্টায় গোলযোগ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ছাত্রীগণ পুনরায় অধ্যয়নে মন দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমতী রাইট বোধ হয় এ প্রকার মিটমাটে সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছে মনে করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি আপাততঃ এগার মাসের বিদায় লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন; বোধ হয় আর এ দেশে আসিবেন না। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ওটেন সাহেবও এগার মাসের ছুটি লইয়া মিস্ রাইটের সহিত একই মেলে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। ঢাকা মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস মহাশয়া বেথুনের ভার পাইলেন।

——:০:——

দুইটি কলেজের গোলযোগ মিটিলেও সিটি কলেজের সরস্বতী পূজার গোল এখনও মেটে নাই, বরং সামান্য একটা ব্যাপার হইতে এমন বিস্তৃত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে যে, তাহা শুনিতেও কষ্ট হয়, বলিতেও কষ্ট

হয়। সিটি কলেজের অভিভাবকগণ ছাত্রদিগের এই আচরণ নীরবে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন; ছাত্রেরাও তাঁহাদের পূজার অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত নহেন। কলেজের কর্ত্তা, কয়েকটী ছাত্রকে দশ টাকা হিসাবে জরিমানা করিয়াছেন। ছাত্রেরা বলেন, তাঁহাদের কি অপরাধ হইয়াছে তাহা না জানিলে এবং যথারীতি তাহার বিচার না হইলে তাঁহারা জরিমানার টাকা ত দিবেনই না, সকল ছাত্রই কলেজে অনুপস্থিত হইবেন। তাহাই হইয়াছে। কলেজ কয়েক দিনের জন্ম বন্ধ রাখিয়া বিগত ৮ই মার্চ্চ যখন খোলা হইল, তখন পাঁচ সাতটী ছাত্র ব্যতীত আর কেহই কলেজে যান নাই; অধ্যাপকগণ যথারীতি শূন্য গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন। শুনিতেছি, অনেক ছাত্র নাকি অন্য কলেজে চলিয়া যাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। সিটি কলেজের ন্যায় এমন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দিরে এমন গোলযোগ সঙ্গতও নহে, শোভনও নহে। অথচ দুই পক্ষই যে ভাবে কায করিতেছেন, তাহাতে এ ব্যাপার মিটিবারও কোন পথ দেখা যাইতেছে না। আরও ক্ষোভের বিষয় এই যে, মধ্যস্থতা করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। কলেজের কর্তৃপক্ষেরা কলেজ হষ্টেল ১৬ই জুন পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

——:০:——

সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে বাঙ্গালার অত্যুজ্জ্বল রত্ন, বরিশালের প্রাণস্বরূপ পরলোগত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র উন্মোচন উপলক্ষে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, দেশনেতা অশ্বিনীকুমারের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে বহু-জন-সমাগম হইবে; কিন্তু, আমরা সত্য-সত্যই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম যে, বরিশালে অশ্বিনীবাবুর প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচন সভায় বরিশালেরই অনেকে উপস্থিত হন নাই। তিন চারিশত লোক মাত্র সভায় গিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত ভদ্রলোক দিগের মধ্যে কয়েকজন অশ্বিনী বাবুর গুণগান করিয়াছিলেন এবং সভাপতি মহাশয় অশ্বিনীবাবুর কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে অশ্বিনীকুমারের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে কোন সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে অধিক জন-সমাগম হওয়া বিশেষ প্রার্থনীয়। অশ্বিনীকুমারের গুণমুগ্ধ ব্যক্তির অভাব ত এখনও বাঙ্গালা দেশে হয় নাই।

——:০:——

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইতে এতকাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের যাঁহারা ভাইস চ্যান্সেলর হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই, সকলেই অবসর সময়ে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য-ক্ষেত্র এত বিস্তৃত ছিল না। এখন পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ, আইন বিভাগ, বিজ্ঞান বিভাগের কার্য্য বিস্তৃত হওয়ায় ভাইস-চ্যান্সেলরকেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যে অধিক সময় নিয়োগ করার প্রয়োজন হইয়াছে। পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অদ্ভুতকর্ম্মী ছিলেন; বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল; সুতরাং তিনি যেমন করিয়া হউক ইহার কার্য্য সুচারু রূপে পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। অন্য বিষয়ে যিনি যাহাই বলুন, কার্য্যতৎপরতায় সার আশুতোষের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। কিন্তু, এখন আর তেমন লোক কোথায় পাওয়া যাইবে যিনি ঘরের খাইয়া এই গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন? বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় বিনা বেতনে এবং কোন প্রকার ভাতা পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইতেছেন; হয়ত পুনরায় নিযুক্ত হইলেও কিছু কাল বেতন গ্রহণ না করিতে পারেন। কিন্তু, তাহার পর কি হইবে? যে কারণেই হউক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এতদিন কায করিতেছেন। অতঃপর তাঁহার অবসর গ্রহণের পর অথবা তাঁহার এই আপ-খোরাকী চাকুরীর মোহ কাটিয়া গেলে, বিনা বেতনের লোক দিয়া এত বড় একটা

প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া সত্য সত্যই অসম্ভব হইবে। এই কারণেই আমরা বেতনভোগী ভাইস চ্যান্‌সেলর নিয়োগের সমর্থন করি। তবে তিনি নির্ব্বাচিত হইবেন, কি মনোনীত হইবেন, সে সম্বন্ধে যাঁহারা মত প্রকাশ করিবার অধিকারী, তাঁহারাই মীমাংসা করিবেন।

বড়ই আনন্দের, বড়ই গৌরবের কথা যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আগামী অক্টোবর মাসে হিবার্ট বক্তৃতা দিবার জন্য বিলাতে গমন করিতেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় পণ্ডিতই এই বক্তৃতা প্রদানের জন্য আহূত হইয়া থাকেন। এত দিনের মধ্যে কোনও বাঙ্গালীকে এ সম্মান প্রদত্ত হয় নাই। বাঙ্গালীর মধ্যে নোবেল পুরস্কারও রবীন্দ্রনাথই পাইয়াছেন এবং বাঙ্গালীর মধ্যে এই বক্তৃতা প্রদানের নিমন্ত্রণও তিনিই প্রথম পাইলেন। বলিতে গেলে বিশ্ব-কবির এই সম্মানে তাঁহার দেশবাসীই সম্মানিত হইয়াছে। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি কবিবর সুস্থ শরীরে বিলাতে গমন করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বিশ্ব-সমক্ষেভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন।

শোক-সংবাদ

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতাগ্রগণ্য শশধর তর্কচূড়ামণিকে হারাইয়া বাঙ্গালা আজ একজন রত্নকে হারাইল। দেশে যখন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া যাইতেছিল, তখন যে মনীষী বাগ্মী কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিত সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কোথায় বুঝাইয়া দিয়া বাঙ্গালা দেশকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ আর তিনি ইহজগতে নাই। তাঁহার মুখে হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সে ব্যাখ্যার ভিতর আন্তরিকতা ছিল, যুক্তিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ ছিল, আর সর্ব্বোপরি ছিল ব্যাখ্যাতার ধর্ম্ম-ভাবের উদারতা। তারপর বহু দিন ধরিয়া বাঙ্গালা দেশ তাঁহার বজ্রনির্ঘোষবাণী শুনিতে পায় নাই, তিনি সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোযোগী ছিলেন।

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার বহরমপুরে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। ৩রা মার্চ্চ তারিখে তিনি তাঁহার মধ্যম পুত্র বহরমপুরের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র সিংহের সহিত দেখা করিবার জন্য সস্ত্রীক গমন করেন। তথায় তিন দিন বাস করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। রবিবার দিন এক সান্ধ্য-সমিতিতে যোগদান করিয়া গৃহে আসিয়া যথারীতি আহারাদি করিয়া শয়ন করেন। পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া মাননীয় সুশীলচন্দ্র সিভিল সার্জ্জনকে সংবাদ পাঠান। ডাক্তার সাহেব আসিয়া বলেন, বোধ হয় রাত্রি ৩টার সময় তাঁহার হৃদ্-যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বাঙ্গালার একজন কৃতী সন্তান। স্বাবলম্বন বলে তিনি আপনার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করিয়াছিলেন। মহামান্য হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারী করিবার প্রথম ৮ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে ভয়ানক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর সে ক্ষেত্রেও ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে কৃপাদান করিয়াছিলেন ও ক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব রূপে তিনি গণ্যও হইয়াছিলেন। সরকার বাহাদুর প্রথমে তাঁকে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল করিয়াছিলেন, অবশ্য এ পদ তাঁহার পূর্ব্বে স্বনামধন্য স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ডাবলিউ, সি,

বনার্জ্জি) পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি এডভোকেট জেনারেলের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এ পদ কোন দেশীয়ের ভাগ্যে জুটে নাই। ক্রমশঃ তিনি যশের উন্নত শিখরে উঠিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম আইন-সচিব করেন। তিনিই বাঙ্গালীর ভিতর লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন ও সর্ব্ব প্রথম বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর হন। পরে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের সহকারী নিযুক্ত করেন। তাহার পর তিনি কিংস কাউন্সেল ও প্রিভিকাউন্সিলের বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন। চাকুরী হিসাবে এত বড় সম্মানজনক পদ অন্য কোন দেশীয়ের ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত ঘটে নাই।

দেশের লোকও তাঁহাকে তাহাদের দেয় সর্ব্বোচ্চ সম্মান দিতে কৃপণতা করে নাই—তাহারা তাঁহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত করিয়াছিল। দেশকে তিনি প্রকৃতই ভালবাসিতেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক স্বদেশ-প্রেমিক বড় বিরল ছিল। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা প্রকাশ করিতেন। তিনি বহুবার বলিয়াছেন, ভারতের ভাগ্য ইংলণ্ডের ভাগ্যের সহিত জড়িত। তিনি বিশ্বাস করিতেন ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন ইংরাজকে দিতেই হইবে। রাজনৈতিক মত লইয়া অনেক সময় তাঁহার সহিত মতপার্থক্য দেখা যাইত, কিন্তু কখনই তিনি অপর পথের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নাই। এই প্রতিভার বরপুত্রের অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার মত-সহিষ্ণুতা, তাঁহার একান্ত স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার চিন্তাশীলতা ও নির্ভীকতা, তাঁহার ভারত ও ভারতবাসীর উন্নতি কামনা চিরদিনই তাঁহাকে বরেণ্য করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাগণের এই অপূরণীয় শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

অজ্ঞাত মনের ক্রিয়া

প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে—এ কথা সাধারণ ভাবে সকলেই জানেন। কিন্তু দিনের মধ্যে এমন অনেক সামান্য ঘটনা ঘটিয়া যায়—যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সচরাচর আমরা কখনও যাই না। অনেক ক্ষুদ্র ও নগণ্য ঘটনার কারণ সন্ধান করিতে গেলে মনের গভীর তলদেশ হইতে এমন সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে, যাহাতে আমরা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি না। ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ-পদ্ধতি এ বিষয়ে যুগান্তর আনিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায়ও অল্প বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। এই রীতি অনুসারে যদি আমরা দৈনন্দিন ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে মনের গভীরতম প্রদেশে কি ভাব খেলিয়া যাইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি।

ফ্রয়েড বলেন—আমরা কথা-বার্ত্তায়, কায-কর্ম্মে অনেক রকম ভুল-ভ্রান্তি করিয়া থাকি, অনেক সময় এক কায করিতে গিয়া অন্য কায করি, এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথা বলি, অনেক সময় অতি পরিচিত বিষয় মনে করিতে পারি না, পরিচিত লোক ও স্থানের নাম ভুলিয়া যাই। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনারও বিশেষ কারণ আছে। তিনি এই সমস্ত বিষয়গুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে যে লোক এইরূপ ভুল করে তাহাদের মনের অজ্ঞাতপ্রদেশে তখনকার মত দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। কিন্তু এই অজ্ঞাত মনের ক্রিয়া ধরা সহজ নয় এবং যাহার মনে দ্বন্দ্ব চলিতেছে সে নিজেই এই দ্বন্দ্বের সংবাদ জানিতে পারে না। মনোবিশ্লেষণের দ্বারা তবে ইহা ধরা পড়ে। ফ্রয়েড এই সম্বন্ধে Psycho-Pathology of Everyday life নামক পুস্তকে নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। এই পুস্তক পাঠ

করিলে অনেকের পক্ষে মনোবিশ্লেষণের ব্যাপার বোঝা সহজসাধ্য হইবে। অজ্ঞাত মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমার কতকগুলি এদেশীয় দৃষ্টান্ত সংগ্রহ আছে—তাহারই কয়েকটির এইখানে উল্লেখ করিব।

(১) কোনও ভদ্রলোক ইংরাজী সংবাদ-পত্র পড়িয়া তাহার মধ্যে কৌতুকপ্রদ ঘটনা তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেন। একদিন তিনি উপর্য্যুপরি দুইটি গল্প বলিলেন—তাহার পর আর একটি বলিতে গিয়াই তিনি দেখিলেন যে, সে গল্পটির কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি গল্পটি স্মৃতিপথে আনিবার বহু চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। অথচ এই গল্পটি বিস্মৃত হইবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। তিনি তাহার পূর্ব্বদিন মাত্র এই গল্পটি পড়িয়াছিলেন—এত শীঘ্র তাহা স্মৃতি-পথ হইতে চলিয়া যাইবে তাহা সম্ভব নয়। এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল—তিনি অনেকদিন বাড়ীতে টাকা পাঠান নাই। এই কথাটি মনের মধ্যে উদিত হইবামাত্র তাঁহার বিস্মৃত গল্পটি মনে পড়িয়া গেল।

এখন এই সাময়িক বিস্মৃতির হেতু অনুসন্ধান করিতে হইলে ভদ্রলোকটির অজ্ঞাতমনের চিন্তা বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ভদ্রলোকটি পূর্ব্বে যে দুইটি গল্প বলিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে এই !—

প্রথম গল্প—চারিটি বালক একটি দলগঠন করিয়া মাছ, সাপ, ব্যাঙ্ প্রভৃতি ধরিয়া বিক্রয় করিত এবং সেই পয়সায় চুরুট ও খাবার কিনিয়া খাইত এবং বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখিত। কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ইহাতে তৃপ্ত হইল না। তাহারা যুক্তি করিল—Snake Park হইতে রাত্রে সাপ চুরি করিয়া বিক্রয় করিবে এবং ইহার দ্বারা তাহাদের অভাব অনেকটা ঘুচিবে। তাহাদের উর্ব্বর মস্তকে এই মতলব আসিতেই তাহারা ইহা কার্য্যে পরিণত করিল। একটি চিমটা ও বালিশের খোল তাহাদের সাপ ধরিবার সরঞ্জাম হইল। সন্ধ্যার পর চাঁদের আলোকে তের বৎসর বয়স্ক 'জিমি' দেওয়াল টপ্‌কাইয়া সাপের ঘরে ঢুকিত এবং তাহার সঙ্গী তিন জন বাহিরে পাহারা দিত। জিমি বিষাক্ত সর্প চিম্‌টা দিয়া ধরিয়া বাহিরে আনিত—তারপর হাত দিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বালিশের খোলের মধ্যে পুরিত। এইরূপে কতকগুলি সাপ সংগ্রহ হইলে সে বাহির হইত। এই বালকের দল কয়েকদিন এই ভীষণ সাহসিক কার্য্য চালাইল। একটু অসাবধান হইলেই যে মৃত্যু অনিবার্য্য ইহা জানিয়াও বালকগণ তাহা গ্রাহ্য করিত না। অবশেষে ব্যাপারটি জানাজানি হইয়া গেল। পার্কের সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—উহাদের কিছু না বলিয়া কি ভাবে উহারা এই কার্য্য করে দেখিতে হইবে। পর বালকেরা কি করে দেখিবার জন্ত তিনি সন্ধ্যার একজন লোক প্রেরণ করিলেন। সেদিন জিমি কয়েকটি সাপ থলিতে পুরিবার পর আর একটি সাপকে কিছুতেই বাগ মানাইতে পারিতেছি না। তাহাকে ধরিতে গেলেই সে ভীষণ রবে ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া উঠিতেছিল। বালকটি পিছাইয়া গিয়া আবার ধরিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিল। যে লোকটি চোর ধরিতে আসিয়াছিল—সে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেল। সে তখন বালকের পিছনে আসিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়াই দৌড় দিল। ধরা পড়িয়া বালকটি চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে একজন (সে জিমির ছোট ভাই) তাহার নিকট ছুটিয়া আসে। তখন সেই লোকটি এই দুই ভাইকেই ধরিয়া সুপারিন্টেন্‌ডেণ্টের নিকট লইয়া আসে। সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট তাহাদের পিতাকে চিনিতেন। তিনি ইহাদিগকে ডিটেক্‌টিভ পুলিশের হাতে সমর্পণ করেন। পুলিশ বালকদিগকে সেদিন তাহাদের পিতার নিকট ফিরাইয়া দেয়। পরদিন বালকদের বিচার হইল। বালকদের পিতা বলিল যে, জিমি অত্যন্ত অবাধ্য ছেলে। সে কাহারও কথা শোনে তাহাকে কোনও reformatoryতে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ব্যবস্থাই করিলেন। অন্য বালকগণের পাঁচ-ঘা বেতের আদেশ হইল।

২য় গল্প—কোনও এক সাহেব আফ্রিকার জঙ্গলে শীকার করিতে গিয়া একদল বানরের সহিত একটি বালিকাকে দেখিতে পান। এই বালিকাটি বানরের

দলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ঠিক বানরের ন্যায় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। সে বানরের মত গাছে গাছে লাফাইয়া বেড়াইত, বানরের মত শব্দ করিত—সে ঠিক নারী-দেহধারী বানর হইয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে শিকারী এই বালিকাকে উদ্ধার করেন। তাহাকে উদ্ধার করিতে অনেক বেগ পাইতে হয়—কিন্তু মনুষ্য সমাজের একজন রমণী বানরের দলে মিশিয়া বানরের তুল্য হইয়া যাইবে—ইহা তাঁহার ভাল লাগে নাই। কতকটা কর্ত্তব্যানুরোধে এবং কতকটা দয়াপরবশ হইয়া তিনি বালিকাটির উদ্ধারসাধন করেন। তাহার পর তাহাকে ছোট শিশুর মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। বালিকার পূর্ব্বজীবনের কিছুই তাহার মনে ছিলনা—শুধু এইটুকু তাহার মনে মনে হইত যে, তাহার পিতা এই বনের মধ্যে কোথাও বাস করিত। যে লোকটি এই বালিকার উদ্ধারসাধন করেন তিনি তাহাকে এম্‌নি প্রীতির চোখে দেখিয়াছিলেন যে, তাহার শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিয়া নিজে বালিকাকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হন।

এই দুইটি গল্প সেই ভদ্রলোকের মনের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তুলিয়া দেয়। তাঁহার ধারণা হয় যে প্রথম গল্পের দুষ্ট ছেলের ন্যায় তিনিও দুষ্ট ছেলে। ঐ বালকেরা তাহাদের পিতার বাধ্য নয়—তাহারা নিজে কোনও রকমে উপার্জ্জন করিয়া তাহা দিয়া ফূর্ত্তি করিতেছে। তাহারা যেমন সংসারের কোনও ধার ধারেনা, শুধু নিজেদের স্বার্থ লইয়া আছে—তিনিও হয়ত ঠিক সেই ভাবেই স্বার্থ লইয়া আছেন। সেই দুষ্ট ছেলের ন্যায় তাঁহাকেও reformtoryতে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় গল্পের শিকারীর উদারতায় ভদ্রলোকটির মনের গভীরস্তরের মধ্যে এই চিন্তা খেলিতে থাকে যে, এই শিকারী কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া বালিকার উদ্ধারসাধন করেন। স্বজাতীয় বালিকার প্রতি দয়াপরবশতাই তাঁহার এই আয়াসগ্রহণ করিবার হেতু। এই শিকারী একটি পরের মেয়ের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলেন—আর তিনি নিজ পরিবারবর্গের প্রতি কি কর্ত্তব্য করিতেছেন? তাঁহার নিকট স্বার্থই বড় হইয়াছে। বালিকাটি বানরের সংসর্গে থাকিয়া সব ভুলিয়াছিল, কিন্তু তবু তাহার পিতার কথা ক্ষীণভাবে মনে ছিল। তিনি সভ্য-সমাজে থাকিয়াও হয়ত তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।

এই সব চিন্তা যে তাঁহার মনের জ্ঞাতসারে হইতেছিল তাহা নহে। মনের গভীরস্তরে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল বলিয়াই তাঁহার সাময়িক স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছিল এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও বিস্মৃত গল্পটি মনে করিতে পারেন নাই।—তাঁহার মনের অজ্ঞাতপ্রদেশের দ্বন্দ্ব মনের উপর এই ভাবে প্রকাশ পাইল যে—'তিনি অনেকদিন বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে পারেন নাই।' এই কথা মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত গল্পটি স্মৃতিপথে আসিবার হেতু এই যে—মনের গভীরস্তরের দ্বন্দ্ব ঠিক সেই সময় অবসান হইয়া গিয়াছিল।

(৩) কোনও এক ভদ্রলোক মে মাসের ২৬শে তারিখ তাঁহার আফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র সহি করিবার সময় তাঁহার স্বাক্ষরের নীচে ২৬, ৫, (অর্থাৎ মে মাসের ২৬শে) এর স্থলে ২৬, ১২, (ডিসেম্বর মাসের ২৬শে) লিখিতেছিলেন। তিনি এই ভুল করিবার পর নিজেই তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার একথাও মনে হইল যে, সেদিন মনের উপর অনেকবার ১২ এই সংখ্যাটি ভাসিয়া বেড়াইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, তাঁহার এই ভুল করিবার কোনও কারণ ছিল কি না। তাঁহার মনের ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল—এই ১২ সংখ্যা তাঁহার বড় প্রিয়। বিশ্লেষণের সময় তাঁহার মনে প্রথম এই চিন্তা খেলিয়া যায় যে, তাঁহার মাহিয়ানা বৃদ্ধি হইলে ১২৲ টাকা বৃদ্ধি হইবে। এ বৎসর তাঁহার মাহিয়ানা বাড়ে নাই। সুতরাং এ বৎসর তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই সুবৎসর নহে। তাঁহার আরও মনে হইল যে এ বৎসরে তিনি কোনও রকমে লাভবান্ হইতে পারেন নাই—এই বৎসর তাঁহার নিকট একরূপ দুর্ব্বৎসর।—এই বৎসর কোনও রকমে অতিবাহিত হইলে তিনি

যেন রক্ষা পান ; অর্থাৎ তাঁহার মনের গভীরতম প্রদেশে এই ইচ্ছা ছিল যে সেদিন মে মাসের ২৬শে না হইয়া ডিসেম্বর মাসের ২৬শে হইলে ভাল হইত। কারণ এ বৎসর কোনও রকমে চলিয়া গেলে হয়ত নূতন বৎসর তাঁহার পক্ষে শুভ হইবে এবং সেই সময় হয়ত ১২৲ টাকা মাহিয়ানা বৃদ্ধিও হইতে পারে। তিনি যখন আফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র সহি করিতে বসিয়াছিলেন—তখন মনের গভীরস্তরে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল এবং তাহারই ফলে তিনি এই ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় আমাদের অনেক রকম ভুলভ্রান্তি হইয়া যায়। প্রত্যেকটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি নিজের মনের গভীরস্তরে কি ভাবের স্রোত খেলিয়া যাইতেছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তাহা হইলে সত্যই আমাদের অবাক হইয়া যাইতে হয়।

অনেক সময় আমাদের জীবনে অতি ক্ষুদ্র নগণ্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে—তাহাদের দিকে আমরা তেমন দৃষ্টি দিই না। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যেও অজ্ঞাত মনের ক্রিয়া ধরা কঠিন হইবে না। হাত হইতে জিনিষ পড়িয়া যাওয়া, আছাড় খাওয়া প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাহ্যতঃ ইহার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা না গেলেও বিশেষভাবে তলাইয়া দেখিলে ইহারও গূঢ় কারণ রহিয়াছে দেখা যাইবে।

(৩) কোনও এক বাঙ্গালীভদ্রমহিলার কিছুদিন চিরুণী হাতে করিলে প্রায়ই পড়িয়া যাইত। কেন এত ঘন ঘন পড়িতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। আমাদের দেশে একটি চলতি কথা রহিয়াছে যে, হাত হইতে চিরুণী পড়িয়া গেলে কেহ না কেহ বাড়ীতে আসিবে। ভদ্রমহিলাটি যে স্থানে বাস করিতেন তাহা অতি নির্জ্জনস্থান, সেখানে তাঁহার মিশিবার মত বিশেষ কেহ ছিল না। তাঁহার প্রায়ই মনে হইত যে পরিচিত কেহ তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলে ভাল হয়। এই ইচ্ছা মনের গভীরস্তরে খেলিয়া বেড়াইত বলিয়া তাঁহার হাত হইতে অত ঘন ঘন চিরুণী পড়িয়া যাইত। বিশেষতঃ দেশীয় প্রবাদটিও হাত হইতে চিরুণী স্খলিত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি যে এই চিন্তার সহিত পরিচিত ছিলেন তাহা নহে, ইহা মনের অজ্ঞাতসারেই ঘটিত।

(৪) আমি মেদিনীপুর সেশন কোর্টে একবার জুরর হইয়া যাই। কোর্টের কম্পাউণ্ডে ঘুরিতেছি, মধ্যে জুতাসমেত পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গেলাম। যাহা হউক, একথা মনে স্থান না দিয়া কোর্টে হাজির হইলাম। কিন্তু সেদিন কেস হইলনা—একটি দিন পড়িয়া গেল। আমি কোর্ট হইতে বাহিরে আসিয়া আবার কোর্টের কম্পাউণ্ডের মধ্যে আছাড় খাইলাম।—উপর্য্যুপরি দুইবার এতগুলি লোকের মধ্যে আছাড় খাইয়া আমি বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কোনও উপায় নাই বিবেচনা করিয়া কোনও রকমে ধূলা ঝাড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

তাহার পর আমি নিজের মন বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া গেলাম।—আমি ঝড় বৃষ্টির দিনে পিচ্ছিল রাস্তা দিয়া চলিতেও জীবনে কদাচিৎ আছাড় খাইয়াছি—অথচ শুধু মাটিতে দুই দুইবার পা পিছলাইয়া গেল ইহা আমার নিকট আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইল।

আমি জুরর হইয়া অতি অনিচ্ছাসত্ত্বেই আসিয়াছিলাম। ইহাতে আমার নিজের কার্য্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা এবং আর্থিক ক্ষতি ও শারীরিক কষ্টও সহ্য করিতে হইবে ইহা জানিতাম। এই জন্য জুরর হইয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই এবং কি করিলে ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে তাহাও ভাবিয়াছিলাম।

বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রথমেই একটি লোকের কথা মনে পড়িল। সে আমাকে বলিয়াছিল, আপনি এবার-কার মত অব্যাহতি পাইতে চাহিলে আপনার শারীরিক কোনও অসুখ অথবা রাস্তায় আসিতে পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এইরূপ একটা কিছু অজুহাত দেখাইয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু মিথ্যাকথা বলিয়া অব্যাহতি পাইতে আমার ইচ্ছা হয় নাই। সেইজন্য আমি সে সব ব্যবস্থা না করিয়া কোর্টে উপস্থিত হই।

কিন্তু মনের গভীরতম প্রদেশে তখনও আমার দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, এখানে আসিবার চেয়ে যদি এ সময় শারীরিক কোনও অসুখ হইত, অথবা হাত পা ভাঙ্গিত, তাহা হইলেও হয়ত ভাল ছিল।- মনের গভীরস্তরে এই চিন্তা খেলিয়াছিল বলিয়াই আমার দুইবার পদস্খলন হয়। দ্বিতীয়বার পদস্খলনের হেতু এই যে -- সেবার কেস্ হইল না, আবার ধার্য্য দিনে আসিতে হইবে। সুতরাং এবারও যদি কোন রকমে হাত পা ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে হয়তো কোর্টে হাজির হইতে হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি কোর্টের মধ্যে অতগুলি লোকের সমক্ষে আছাড় খাইয়া নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহারও কারণ আছে দেখা যাইবে। আমার মনের মধ্যে হয়ত নিজেকে শিক্ষিত ও সত্যবাদী বলিয়া অভিমান আছে। অনেকে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিয়া যাহাতে কোর্টে হাজির হইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আমার মন ইহা অনু-মোদন করে নাই! অনেকগুলি লোকের সমক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় আমি অজ্ঞাতে ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলাম যে, যদি আমি কোনও কৈফিয়ৎ দিয়া কোর্টে হাজির না হইতাম—তাহা হইলে সত্য কথাই হইত—অর্থাৎ আমি লুকাইয়া কোনও কায করিতাম না এবং মিথ্যা কথা বলিতাম না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

দ্রব্যগুণতত্ত্ব।

কবিরাজ ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবি-কণ্ঠ-ভূষণ বিরচিত। কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। পি, এম, বাকৃচি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬ পৃঃ, মূল্য ১৲

৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কবিরাজ মহাশয় রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী চুর্ণী-রঘুনাথপুর গ্রামে বাস করিলেও তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যের খ্যাতি অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। নদীয়া জেলায় প্রায় সর্ব্ব স্থানেই তাঁহার যশের কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি অনেক উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তকখানি কবিতায় রচিত। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া সেই সঙ্গে সেই দ্রব্যঘটিত বহু উৎকৃষ্ট পাচন, মুষ্টিযোগ ও ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্র ও দুর্ব্বোধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ পাঠে অসমর্থ চিকিৎসকেরা দ্রব্যগুণ তত্ত্ব সম্বন্ধে সহজে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ইটালি, উপাসনা প্রেসে মুদ্রিত, পৃঃ ১০৪, মূল্য ৷৷০

প্রায় প্রতি পুরাণের প্রারম্ভেই বিশ্ব-সৃষ্টির একটি ধারাবাহিক বর্ণনা আছে। এই ধারা কিন্তু সর্ব্বত্র ঠিক এক নয়। ইহাতে পাঠক একটু গোলযোগে পড়েন। গীতায়ও সৃষ্টিতত্ত্বের উল্লেখ আছে, তবে তত প্রকট ভাবে নয়। সুপণ্ডিত গ্রন্থকার পুরাণ দর্শনাদি অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা করিয়া সৃষ্টি ধারার সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। পুস্তক-খানিতে গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম গবেষণা ও আলোচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা যে বেশ বিশদ ও পরিস্ফুট হইয়াছে এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। রচনাতে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হইল। বইখানি পড়িলে যে পাঠকের মনে অনেক বিষয়ের কৌতূহল জাগিয়া উঠিবে ও তাঁহাকে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত করিবে এ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার অধিকতর উন্নতির আশা করি। কাগজ, ছাপা চলনসই।

সুখমণী

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত। (শিখ ভক্তিগ্রন্থ—২য় সংস্করণ), কলিকাতা, মিত্র প্রেসে মুদ্রিত, পৃঃ ২১৪, মূল্য ১৲

'সুখমণী' শিখদের পঞ্চমগুরু অর্জ্জুন দাস প্রণীত এবং তাঁহাদের সর্ব্ব-প্রধান পূজ্য 'গ্রন্থ সাহেবের'ই অন্তর্গত। জ্ঞানেন্দ্র বাবু সহজবোধ্য

ভাষায় ও নিপুণতার সহিত এই পরম পবিত্র গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বাড়াইয়াছেন এবং পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। নিত্যপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থখানির স্থান হওয়া উচিত। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ইহা নিত্য পাঠ করিতেন। শিখদের গ্রন্থ বলিয়া ইহা পাঠে হিন্দুর সঙ্কোচের বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। শিখ-ধর্ম্ম একটা নূতন ধর্ম্ম নয়, নানা সাধন প্রণালীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট প্রণালী মাত্র। বৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গে এই গ্রন্থে প্রকাশিত ভাবাবলীর মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। গ্রন্থের শেষ কয় ছত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"যাহার মনে হরিনাম বসিয়া গিয়াছে এবং যে প্রীত মনে হরিনাম শ্রবণ করে,—তাহার হৃদয়ে হরি প্রভুর আবির্ভাব হয়, জন্ম-মরণের দুঃখ তাহার নিবারণ হয়…নানক বলিতেছেন সুখদায়ক (সুখমণী) নামের এমনই গুণ।"—কাগজ, ছাপা মন্দ নয়।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম্ম

শ্রীনাথ ঘোষ, এম্ বি প্রণীত। ১ম ও ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত, পৃঃ ৭২৭ প্রতিভাগের মূল্য ১॥০

গ্রন্থের মুখপৃষ্ঠায় ঘোষিত হইয়াছে "অধ্যাত্মবিজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের মতে হিন্দুধর্ম্মের কালোচিত ব্যাখ্যান।" গ্রন্থকার বিপুল পরিশ্রম করিয়া এই বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত এম্ বি ডাক্তার। তাই তাঁহার কাছে আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার এই অচলায়তনের গুহায় গুহায় অনেক দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু মাটী পাথর ভাঙ্গিয়া সে সব উদ্ধার করা অতীব দুঃসাধ্য। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি প্রশংসার্হ, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা তাঁহাকে যদি অসংযত করে, তবে তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের বিষয়। তিনি অনেক স্থলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে উপহাস করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের জয়েই যদি বিজ্ঞানের পরাজয় সূচনা করে তবে হিন্দুধর্ম্ম 'বৈজ্ঞানিক' কেমন করিয়া হয়? যাহা হউক, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া গ্রন্থকার মহাশয় যদি আর একটু ধীর ও সংযত ভাবে লেখনী চালনা করিতেন তবে গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত ও সুপাঠ্য হইত এবং তাঁহার শ্রমও সার্থক হইত। গ্রন্থে অনেক ভাল ভাল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু বিচার সর্ব্বত্র যুক্তিপূর্ণ ও সুসঙ্গত হয় নাই। এই রকম পুস্তকে উচ্ছ্বাসের স্থান নাই, কিন্তু এই গ্রন্থখানিতে উচ্ছ্বাসের অন্ত নাই। ভাষাও অনেকস্থলে আড়ষ্ট, দুর্ব্বল ও কৃত্রিম। প্রকাশভঙ্গীও সর্ব্বত্র উপযোগী হয় নাই। গ্রন্থকার যে সহৃদয় ব্যক্তি এবং সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই যে তিনি এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, এবং সেই জন্যই এত কথা বলিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে কাট ছাঁট করিয়া ও উদ্দাম ও অবান্তর প্রসঙ্গ বাদ দিয়া একটু মাজিয়া ঘষিয়া লইলে বইখানি উপাদেয় হইবে এবং বঙ্গ-ভাষার গৌরবের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রজাপতির খেলা

লেখিকা শ্রীমতী সুলেখা দেবী। প্রাপ্তিস্থান :—গল্পলহরী সাহিত্য মন্দির, ১৬৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

এই উপন্যাস গ্রন্থে লেখিকা দেখাইতে চান, গরীবের ঘরের মেয়েরাও চেষ্টা করিলে আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে। রচনা সরল ও ও অনাড়ম্বর। আধুনিক যুগে এরূপ উদ্দেশ্যমূলক রচনার উপকারিতা আছে। গ্রন্থের বহিরবয়ব সুন্দর। রচনায় লালিত্য আছে। লেখিকার ভাষাও সুন্দর।

ব্রজ চৌরাশী ক্রোশ বন পরিক্রমা

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৮৫, মূল্য ৷৷০

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার জন্য যাঁহারা যাত্রা করিবেন, এই পুস্তিকা তাহাদের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিবে। হিন্দুর ব্রজপরিক্রমা অবশ্য-করণীয়। ব্রজবিহারী ও তাঁহার সহচরবৃন্দ যে যে স্থলে লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সেই স্থলের সুন্দর বিবরণ আলোচ্য পুস্তিকায় আছে। কালক্রমে সে সকল স্থানের কতকগুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইলে, বাঙ্গালায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্ত শিষ্যরা ব্রজধামের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন; সুতরাং এ সকল স্থল বাঙ্গালীর নিকট অধিকতর চিত্তাকর্ষক। লেখক ভক্তের চক্ষু দিয়া এ সকল নিসর্গসুন্দর স্থান দেখিয়াছেন, আর সহজ সরল ভাষায় সাধারণের জন্য বিবৃত করিয়াছেন। গুরুমুখে শ্রুত ও কিম্বদন্তী অবলম্বনে লেখক যে সকল লোকোত্তর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার উপর অবিশ্বাসীর বিশ্বাস না জন্মিতে পারে; কিন্তু বিশ্বাসীর হৃদয়ে যে সেগুলি অপূর্ব্ব রস সঞ্চার করিবে সে কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারা যায়। এই বনযাত্রা জন্মাষ্টমী তিথির পর দশমী তিথিতে আরম্ভ হইয়া থাকে। মথুরার ভূতেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়, আবার তাঁহাকে দেখিয়া যাত্রা শেষ করিতে হয়। ইহাতে স্বামী রামদাস কাটিয়া বাবাজীর ও ব্রজবিদেহী মোহান্ত সন্তদাস বাবাজী, (সংসারাশ্রমের কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী) মহাশয়ের দুইখানি চিত্র ও পথের একখানি মানচিত্র আছে।

পাঠ সঞ্চয়

সঙ্কলন; গীত-পঞ্চাশিকা; সন্ধ্যা-সঙ্গীত; রাজা ও রাণী; সোণার তরী; হাস্য-কৌতুক; ডাকঘর। প্রণেতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর। মূল্য যথাক্রমে ১৲, ১৸৵০, ২৲, ।০, ১।০, ১৲ প্রাপ্তিস্থান—বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উক্ত গ্রন্থগুলি পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন সংস্করণের কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইল না। মূল্য নিরূপণে প্রকাশক কোনও সরল পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। এ বিষয়ে শুধু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই অপেক্ষাকৃত প্রবল।

'পাঠ সঞ্চয়ে' কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এ সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই।

'সংকলনে' গদ্য গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি রচনা বাছিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। তবে গল্প ও উপন্যাস ইহাতে নাই। ইহারও নির্ব্বাচন প্রণালী কিরূপ তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

'গীত পঞ্চাশিকার' স্বরলিপিকার শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি রচনায় প্রথাটিতে যে নূতনত্ব আছে তাহা সঙ্গীত নায়কগণের বিচার্য্য।

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত নূতন কাব্যগ্রন্থ "মরু শিখা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১।০।

—:০:—

শ্রীমতী তমাললতা বসু প্রণীত ছোট গল্পের বই "অমিয়" দোল পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১।০।

—:০:—

কলিকাতা ২২।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অবস্থিত প্যাট্রিয়টিক লাইব্রেরী, তাঁহাদের বাৎসরিক রচনা প্রতিযোগিতা জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

(১) আধুনিক ছাত্র সমাজ ও তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির উপায়। (২) সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা। (৩) আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও তাহাদের দোষগুণ।

রচনার প্রতি বিষয়ের জন্য এক এক খানি করিয়া সুন্দর রৌপ্যপদক বিজয়ী প্রতিযোগিগণের নাম ধাম সহ উপহার দেওয়া হইবে এবং মনোনীত প্রবন্ধগুলি লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানে যে কোন বাংলা মাসিকে প্রকাশিত হইবে।

যে কেহ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। রচনা বিশুদ্ধ এবং বাংলায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে প্রতি বিষয়েই প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। কিন্তু প্রতিযোগিগণ পৃথক পৃথক খাতার প্রতি পৃষ্ঠার একদিকে লিখিবেন।

অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাইবার জন্য উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প নাম ধাম সহ পাঠাইতে হইবে। সম্পাদকের নামে প্রবন্ধাদি পাঠান আবশ্যক। প্রবন্ধ পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ্চ ১৯২৮।

কলিকাতা ১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে
শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শক্তসিংহ ও দৌলৎ

Engraved and Printed by
King Halftone Press, Calcutta.
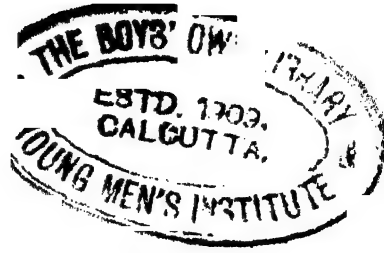
মানসী ও মর্ম্মবাণী

২০শ বর্ষ
১মখণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৫

১ম খণ্ড
৩য় সংখ্যা

বেদ-কথা

অগ্নিষ্টোম

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চদশ অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ, কাযেই এই গ্রন্থে মুখ্যতঃ হোতার কর্ত্তব্যই বিবৃত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিষ্টোমে অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অবলম্বনে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র এবং শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে কাত্যায়ন শ্রৌত-সূত্র রচিত হইয়াছিল। সামবেদী ঋত্বিক্ উদ্গাতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য, লাট্যায়ণ শ্রৌতসূত্রাদিতে বিবৃত হইয়াছে। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ এবং আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র অবলম্বন করিয়া এই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিবরণ সঙ্কলন করা গেল।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রধান কর্ম্ম সোমাহুতি। সোম-নামক পার্ব্বত্য লতা ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া বিবিধ দেবতার উদ্দেশে আহবনীয় অগ্নিতে তর্পণ করা হয়। আহুতির পর যজমান ও ঋত্বিকেরা একত্র সেই হোমশেষ পান করেন।

সোম ছেঁচিয়া রস বাহির করাকে অভিষব বলে। দিনের মধ্যে তিন বার সোমের অভিষব ও সোমের আহুতি হয়। সোমের অভিষব, আহুতি ও ভক্ষণ—ইহাই মুখ্য কর্ম্ম ও ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্ম্মের নাম সবন। আনুষঙ্গিক কর্ম্মসমেত সোমের অভিষব, আহুতি ও ভক্ষণের নামও সবন। দিনের মধ্যে তিনবার সবন হয়—প্রাতে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন-সবন, অপরাহ্ণে তৃতীয় সবন। সোমাহুতির আনুষঙ্গিক কর্ম্ম-মধ্যে পশুযাগ প্রধান। সোমযাগের সঙ্গে সঙ্গে একটি (বা বিকল্পে এগারটি) পশুর যাগ হয়। সবনের অঙ্গীভূত এই পশুযাগের নাম সবনীয় পশুযাগ। পশুযাগ থাকিলেই তৎসহিত পুরোডাশ যাগও থাকিবেই। নিরূঢ় পশুবন্ধ বিবরণে তাহা বলা হইয়াছে। সবনীয় পশুযাগের সঙ্গেও তাহার অঙ্গীভূত পশু পুরোডাশ থাকিবেই। অধিকন্তু সবনীয় পশুযাগে পুরোডাশ ব্যতীত ধানা করম্ভাদি কতিপয় দ্রব্যেরও আহুতি দিতে হয়। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ হইবে।

সোমাহুতির পূর্ব্বে হোতা অথবা তাঁহার সহকারী

কতিপয় ঋক্‌সমূহ পাঠ করিয়া যাজ্যান্তে বষট্‌কার করেন। এই ঋক্‌সমূহের নাম শস্ত্র। শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারীরা সামসমূহ গান করেন। এই সাম সমূহের নাম স্তোত্র। স্তোত্রপাঠের পর শস্ত্রপাঠ; শস্ত্রান্তে যাজ্যা ও বষট্‌কার। বষট্‌কার কালে সোমাহুতি। অধ্বর্য্যু (স্থলবিশেষে তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা) আহবনীয় অগ্নিতে সোমাহুতি দান করেন। ব্রহ্মা এই সকল কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করেন।

ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা, এই চারিজন প্রধান ঋত্বিক্ ও তাঁহাদের বারজন সহকারী, মোটের উপর ষোল জন ঋত্বিক সোমযাগে আবশ্যক হয়।

যেদিন সোমযজ্ঞের সবনের অনুষ্ঠান হয়, সেদিনের নাম সুত্যা দিন। অগ্নিষ্টোমে সুত্যা দিনের পূর্ব্বে অন্ততঃ আর চারিটি দিন সোমযাগের প্রাসঙ্গিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক হয়। সেই সকল প্রাসঙ্গিক কর্ম্ম পূর্ব্বে সম্পাদন না করিলে সোমযজ্ঞে অধিকার জন্মে না। কাযেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ পাঁচ দিনের কমে সম্পন্ন হইতে পারে না। কোন্ দিনের কি কায, নিম্নে দেখান যাইতেছে।

প্রথম দিন—সপত্নীক যজমানের দীক্ষা ও দীক্ষাঙ্গ দীক্ষণীয়েষ্টি যাগ।

দ্বিতীয় দিন—পূর্ব্বাহ্নে সোমযাগের আরম্ভসূচক প্রায়ণীয় ইষ্টিযাগ, সোম ক্রয়, সোমের সৎকারার্থ আতিথ্যেষ্টি যাগ। আতিথ্যের পর প্রবর্গ্য কর্ম্ম ও উপসদিষ্টি যাগ। অপরাহ্নে প্রবর্গ্য কর্ম্ম ও উপসদিষ্টি যাগ।

তৃতীয় দিন—পূর্ব্বাহ্নে প্রবর্গ্য ও উপসদিষ্টি, অপরাহ্নে প্রবর্গ্য ও উপসদিষ্টি। অপিচ ঐ দিন সৌমিক বেদি (মহাবেদি) নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়।

চতুর্থ দিন—(উপবসথ্য দিন) পূর্ব্বাহ্নেই প্রবর্গ্য ও উপসৎ এবং আর একবার প্রবর্গ্য ও উপসৎ। তৎপরে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ। সায়ংকালে পরদিনের সোমাভিষব কর্ম্মের জন্য বসতীবরী নামক জল আনিয়া রাখিতে হয়। শেষ রাত্রিতে ঋত্বিকের সোমযাগের আয়োজন; হোতা প্রাতরনুবাক পাঠ করেন।

পঞ্চম দিন—(সুত্যা দিন) প্রাতে প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, অপরাহ্নে তৃতীয় সবন। তৎপরে অবভৃথস্নান ও যজ্ঞসমাপ্তিসূচক অনূবন্ধ্য পশুযাগ ও সর্ব্বশেষে উদবসানীয় ইষ্টিযাগ।

দেখা যাইতেছে, সোমযজ্ঞের অধিকার-লাভের জন্য এবং উহার সম্পূর্ণতার জন্য কতিপয় ইষ্টিযাগও করিতে হয়। যথা—দীক্ষণীয়েষ্টি, প্রায়ণীয়েষ্টি, আতিথ্যেষ্টি, প্রবর্গ্যসমেত উপসদিষ্টি, উদয়নীয়েষ্টি এবং উদবসানীয়েষ্টি। এই সকল ইষ্টিযাগ পূর্ণ মাসেরই বিকৃতি। ইতঃপূর্ব্বে এই সকল ইষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সোমযাগের পূর্ব্বে বিহিত অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ ও পরে বিহিত অনূবন্ধ্য পশুযাগ, নিরূঢ় পশুযাগের বিকৃতি; উহারও পুনরুল্লেখ আবশ্যক নহে। অন্যান্য কর্ম্মগুলির বিবরণ যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়া অগ্নিষ্টোম যাগের অনুষ্ঠান বুঝান যাইতেছে।

প্রথম দিন

বসন্তকালে দেবপক্ষে অমাবস্থায় বা পূর্ণিমায় অগ্নিষ্টোম অনুষ্ঠেয়। যজমান মাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া ঋত্বিক বরণ করেন। সোমপ্রবাক নামক ব্যক্তি যজমানের পক্ষ হইতে ষোলজন ঋত্বিককে পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। যজমান প্রথমে ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারিজন প্রধান ঋত্বিক বা মহর্ত্বিক বরণ করিয়া পরে তাঁহাদের বারজন সহকারী বা হোত্রাশংসীর বরণ করেন। ঋত্বিকদের নাম যথা—

চতুর্ব্বেদী—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র (নামান্তর অগ্নীৎ), পোতা।

সামবেদী—উদ্গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্য।

ঋগ্বেদী—হোতা, মৈত্রাবরুণ (নামান্তর প্রশাস্তা), অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ।

যজুর্ব্বেদী—অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা।

[এতন্মধ্যে মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক এই তিন জনের উপাধি হোত্রক।]

দেবগণ স্বয়ং যজ্ঞপরায়ণ; অগ্নি তাঁহাদের হোতা, আদিত্য অধ্বর্য্যু, চন্দ্রমা ব্রহ্মা, পর্জ্জন্য উদ্গাতা, অপ্‌সমূহ হোত্রাশংসী। অগ্নিষ্টোমে যজমান প্রথমে এই দেব-

ঋত্বিকগণকে বরণ করিয়া তৎপরে মনুষ্যলোকে তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সোমপ্রবাক কর্ত্তৃক আহূত মানুষ ঋত্বিকদের বরণ করেন। কৌষীতকি মতে আর একজন ঋত্বিকের বিধান আছে—ইঁহার নাম সদস্য। সদস্য থাকিলে ঋত্বিক্-সংখ্যা সতের হন। বরণান্তে মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া যজমান যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দেবযজন ভূমি প্রার্থনা করেন। "অগ্নির্মে হোতা স মে দেবযজনম্ দদাতু" ইত্যাদি ক্রমে প্রথমে দেবঋত্বিক-গণের নিকট দেবযজন প্রার্থনা করিয়া পরে মানুষ ঋত্বিক-দের নিকট প্রার্থনা হয়।

যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ ভূমির নাম দেবযজন ভূমি। দর্শ পূর্ণ মাসাদি ইষ্টিযাগ যজমানের গৃহস্থিত অগ্নিশালাতেই হয়, কিন্তু অগ্নিষ্টোমের মত অনুষ্ঠানবহুল কর্ম্মের জন্য গ্রামের বাহিরে উচ্চ, দৃঢ়, সমতল ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া সেইখানে যাইতে হয়। ঐ দেবযজন ভূমিতে একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। উহা আকারে সমচতুর্ভুজ বা দীর্ঘচতুর্ভুজ। তদনুসারে উহার নাম বিমিত (দীবিত বিনিত) বা শালা। খুঁটির উপরে বাঁশ খাটাইয়া মণ্ডপের আচ্ছাদন হয়। আচ্ছাদনের বাঁশগুলি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হয় বলিয়া এই শালার নাম প্রাগ্‌বংশ বা প্রাচীন বংশশালা। শালার চারিদিকে বেড়া দিয়া দুয়ার রাখিবে।

এই মণ্ডপের ভিতরে যজ্ঞাঙ্গ ইষ্টিযাগগুলির অনুষ্ঠানের জন্য ঐষ্টিক বেদি ও গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি এই তিন অগ্নির স্থান করিতে হয়। যজমানের গৃহস্থিত অগ্ন্যাগারের যেমন তিন অগ্নি ও বেদি থাকে, এখানেও ঠিক তদ্রূপ হইবে। গার্হপত্যের স্থান বৃত্তাকার, আহবনীয়ের চতুরস্রাকার ও দক্ষিণাগ্নি অর্দ্ধবৃত্তাকার হইবে। গার্হপত্যের পূর্ব্বে আহবনীয়, উভয়ের মধ্যে ঐষ্টিক বেদি, তাহার দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি। ২

যজমানের গৃহস্থিত গার্হপত্য দিবারাত্র প্রজ্জলিত থাকে, অগ্নিহোত্র বা দর্শপূর্ণ মাসাদিতে যাগের পূর্ব্বে গার্হপত্য হইতে অগ্নি তুলিয়া আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি জ্বালান হয়। এই কর্ম্মের নাম অগ্নির উদ্ধরণ। দেব-যজন দেশে যে নূতন গার্হপত্য স্থাপিত হয়, উহাতে অরণি-দ্বয় দ্বারা যথাবিধি অগ্নি মন্থন করিয়া অগ্নি স্থাপনা করা হয় এবং সেই গার্হপত্য হইতে অগ্নির উদ্ধরণ করিয়া নূতন আহবনীয় ও দক্ষিণ অগ্নির স্থাপনা হয়। কিন্তু গৃহস্থিত গার্হপত্য ও দেবযজনের গার্হপত্য যে স্বতন্ত্র অগ্নি নহে, উভয় অগ্নিই এক, ইহা বুঝাইবার জন্য গৃহ হইতে গার্হপত্য অরণিদ্বয় তপ্ত করিয়া আনিতে হয়, এবং সেই তপ্ত অরণি মন্থনদ্বারা দেবযজনের জন্য নূতন গার্হপত্যের উৎপাদন হয়। গৃহপতি যজমানের গৃহস্থিত অগ্নিকেই যেন অরণিতে সমারোপিত করিয়া দেবযজনে আনিয়া রাখা হইল এবং সেই গার্হপত্য হইতেই নূতন আহবনীয়ের ও দক্ষিণাগ্নিরও গ্রহণ হইল।

দেবযজনে অগ্নিস্থাপনের পর সপত্নীক যজমানের দীক্ষা।

শালার বাহিরে বসিয়া যজমান ও তাঁহার পত্নী নখ কাটিবেন। যজমান কেশ ও শ্মশ্রু ফেলিয়া মুণ্ডন করিবেন। উভয়ে স্নানান্তে নূতন ক্ষৌম বসন পরিবেন। দর্ভের উপর দাঁড়াইয়া নবনীত (মাখন) দিয়া মস্তক হইতে অধঃক্রমে শরীরের অভ্যঙ্গ করিবেন। চক্ষুতে অঞ্জন পরি-বেন, কুশগুচ্ছ (দর্ভ পিঞ্জূল) দ্বারা শরীর মার্জ্জন করিয়া পূত করিবেন। নাভির উপর সাতগাছি কুশ দিয়া দুইবার, নাভির নিম্নে সাতগাছি কুশ দিয়া একবার, এই একবিংশতি দর্ভ পিঞ্জূলে মার্জ্জন করিবেন। দুই হাতের অঙ্গুলিসঙ্কোচ দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বাগ্‌যত হইয়া শালার মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেখানে দীক্ষণীয়েষ্টি-যাগ-সমাপ্তির পর আহবনীয়ের দক্ষিণে দুইখানি কৃষ্ণাজিন (কৃষ্ণ মৃগের চর্ম্ম) পাতিয়া তাহার উপর বসিবেন। মুঞ্জ তৃণ ও শণে নির্ম্মিত ত্রিগুণ বেণীর আকারে গ্রথিত মেখলা পরিবেন, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিবেন, পরিধান বস্ত্রে কৃষ্ণমৃগের বিষাণ (শৃঙ্গ) বাধিয়া লইবেন। (উহা গাত্র কণ্ডূয়নাদিতে লাগিবে), হস্তে উদুম্বর দণ্ড গ্রহণ করিবেন। যজমানের পত্নী মেখলার স্থলে যোক্ত্র কটিতে পরিবেন, কণ্ডূয়নার্থ উদুম্বর শঙ্কু লইবেন। এইরূপে বেশভূষা করিলে

* (২) পরিশিষ্টে চিত্র দেওয়া হইবে।

একজন ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবেন "দীক্ষিতোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ"—এই ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন।

দীক্ষিতকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। তিনি সত্য কহিবেন, ক্রোধ করিবেন না, মৃদুবাক্য বলিবেন, ব্রাহ্মণকে চনসিত, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে বিচক্ষণ, বিশেষণ দিয়া সম্বোধন করিবেন। সূর্য্যের উদয় বা অস্তগমন কালে শালামধ্যেই থাকিবেন, জলে প্রবেশ করিবেন না, বৃষ্টিতে ভিজিবেন না। শূদ্র সম্ভাষণ, গুরুজনের অভিবাদন, দান, অগ্নিহোত্র পর্য্যন্ত দীক্ষিতের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভোজন সম্বন্ধেও তাঁহাকে নিয়ম পালন করিতে হয়। যে দিন অপরাহ্ণে দীক্ষা হয়, সেইদিন দীক্ষার পূর্ব্বে পায়সমোদকাদি ইচ্ছামত খাইয়া লইবেন; কিন্তু দীক্ষার পর ভোজনের বাঁধাবাঁধি নিয়ম। তখন দুইবেলা দুগ্ধ খাইতে হইবে। এই দুগ্ধের নাম "ব্রত"। দুগ্ধপান "ব্রত পান"। যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করা যায়, তাহার নাম "ব্রতদুঘা" গাভী। সন্ধ্যার পর দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ শেষ রাত্রিতে, ও প্রাতে দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ মধ্যাহ্নের পর পান হয়। দুগ্ধের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হয়। দীক্ষার দিন সন্ধ্যার পর গাভীর চারিটি স্তন (বাঁট) হইতে দোহন হয় এবং সপত্নীক যজমান তাহা শেষ রাত্রিতে পান করেন। পর দিনের দুগ্ধ তিন স্তন হইতে, তৎপর দিন দুই স্তন হইতে, তৎপর দিন এক স্তন হইতে দুগ্ধ লওয়া হয়। পঞ্চম দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ সুত্যা দিনে—যেদিন প্রকৃত সোমযাগ—সেদিন আর দুগ্ধপানও চলে না। সেদিন কেবল হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হয়। ব্রতদুগ্ধ যজমানের জন্য গার্হপত্য অগ্নিতে ও তাঁহার পত্নীর জন্য দক্ষিণাগ্নিতে পাক হয়।

দ্বিতীয় দিন

পরদিন প্রাতে যজ্ঞের আরম্ভসূচক প্রায়ণীয়েষ্টিযাগ। প্রায়ণীয়েষ্টির বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। যে চতুস্থালীতে চরুপাক করিয়া অদিতির উদ্দেশে যাগ হয় তাহা না ফেলিয়া যজ্ঞসমাপ্তিসূচক উদয়নীয়েষ্টির জন্য রাখিতে হইবে। কেহ কেহ বেদির উপর আস্তীর্ণ কুশগুলিও উদয়নীয়ের জন্য রাখিয়া দেন। ইহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

প্রায়ণীয় ইষ্টির পর সোম ক্রয় করিতে হয়। সোম পার্ব্বত্য লতা। এক সময়ে সোম গন্ধর্ব্বদিগের নিকট ছিল, দেবগণ কৌশল করিয়া সেই সোম আনিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৫ম অধ্যায় ১খণ্ডে তাহার আখ্যায়িকা আছে। গন্ধর্ব্বগণ স্ত্রীকামী। দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বাগদেবতাকে গন্ধর্ব্বদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাগ্দেবতা নগ্না কুমারীর রূপ ধরিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে ভুলাইয়া সোম লইয়া আসেন।

এস্থলেও সেই পুরাতন ঘটনার অনুকরণে সোমক্রয়ের অভিনয় হয়। সোমলতা পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত থাকে। দীক্ষার দিন উহা শালামধ্যে রক্ষিত ছিল। পরদিন উহা বাহিরে আনিয়া ক্রয়ের অভিনয় হয়। সোমবিক্রয় নিন্দিত কর্ম্ম। কুৎস্য গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ অথবা কোন শূদ্র সেই সোমকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বিক্রয় করিতে বসেন। গোচর্ম্ম পাতিয়া তাহার উপর সোমখণ্ড রাখা হয়। সোম ক্রয়ের জন্য একটি বৎসতরী শালার বাহিরে থাকে—এই বাছুরটী বাগ্দেবতার স্থানীয়। অধ্বর্য্যু গাভীকে ছাড়িয়া দেন, গাভী ছয় পা চলিয়া সপ্তম পদ ফেলিলে যজমান, অধ্বর্য্যু ও কয়েকজন ঋত্বিক উহাকে ঘেরিয়া বসেন ও সপ্তম পদচিহ্নের উপর একটুকরা সোণা (হিরণ্য) রাখিয়া তাহাতে ঘৃতাহুতি দেন। হিরণ্য অগ্নিস্বরূপ—উহার উপর আহুতি দেওয়া চলে। সেই পদচিহ্নের ধুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়—পরে কাযে লাগিবে।

অধ্বর্য্যু সোম বিক্রয়ীর নিকট আসিয়া সোমের দর করিয়া ক্রয় করিবেন। এই ক্রয়ব্যাপারের অভিনয় একটু কৌতুককর। অধ্বর্য্যু ও সোম বিক্রয়ীর মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইবে।

অধ্বর্য্যু। এই সোম কি বিক্রয়ের জন্য?

বিক্রেতা। হাঁ, বিক্রয়ের জন্য।

অধ্বর্য্যু। আচ্ছা, আমি কিনিব।

বিক্রেতা। কিনুন না।

অধ্বর্য্যু। এই বাছুরটির ষোলভাগ মূল্য দিব।

বিক্রেতা। সেকি মহাশয়, সোম রাজা এত কম মূল্যে কি দিতে পারে?

অধ্বর্য্যু। গরুটা কি সামান্য? ইহার দুধে সর হয়, ক্ষীর হয়, ছানা হয়, ঘোল হয়। আচ্ছা, ইহার আট ভাগ মূল্য দিব।

বিক্রেতা। তা কি হয়, আমার সোম রাজা।

অধ্বর্য্যু। আমার গরুটাই কি কম? আচ্ছা ইহার সিকি মূল্য দিব।

বিক্রেতা। তা কি হয়, আমার সোম রাজা।

অধ্বর্য্যু। গরুই কি কম, আচ্ছা অর্দ্ধমূল্য দিব।

বিক্রেতা। তাও কি হয়, আমার সোম রাজা।

অধ্বর্য্যু। আচ্ছা গরুটাই দিব।

তখন বিক্রেতা সম্মত হইলে অধ্বর্য্যু বাছুরটির বিনিময়ে সোম গ্রহণ করিবেন। পরে বাছুরটিকেও ছাড়াইয়া লইতে হইবে। আরও কতিপয় দ্রব্য—হিরণ্যখণ্ড, বস্ত্র, ছাগল, এক জোড়া গাইবলদ, আর তিনটি গাভী বিক্রেতাকে দেখাইবেন। বিক্রেতা লোভে পড়িয়া চক্‌চকে হিরণ্যখণ্ড গ্রহণ করিবে। অধ্বর্য্যু বাছুরটিকে সরাইয়া লইয়া সহসা বিক্রেতার হাত হইতে স্বর্ণখণ্ড কাড়িয়া লইবেন ও বাঁশের লাঠি উচাইয়া বিক্রেতাকে খেদাইয়া দিবেন। সোমবিক্রেতার সকলই গেল—সে গন্ধর্ব্বের স্থানীয়—দেবতারা গন্ধর্ব্বদিগকে ঠকাইয়া সোম আনিয়াছিলেন।

একখান কাপড়ে সোম জড়াইয়া আর এক টুক্‌রা কাপড়ে বাঁধিয়া যজমান উহা মাথায় করিয়া লন ও নিকটে দুই বলীবর্দ্দবাহিত শকট থাকে, সেই শকটে কৃষ্ণাজিনের উপর রাখিয়া দেন। তারপর সেই শকটে করিয়া সোমকে শালার মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। যজমান গাড়ীর উপরে সোম ছুঁইয়া থাকেন। অধ্বর্য্যু শকটের পিছনে বসেন। সুব্রহ্মণ্য নামা ঋত্বিক্ গাড়ী হাঁকাইয়া দেন। গাড়ী চলিতে থাকিলে হোতা তদনুকূল মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩য় অধ্যায় ২য় খণ্ড)।

শকটখানি শালার ঈশান দিকে লইয়া গিয়া একটি বলদ খুলিয়া আর একটি গাড়ীতে জোড়া থাকিতেই সোম শকট হইতে নামাইতে হইবে এবং উদুম্বর (ডুমুর) আসন্দীর (আসনের) উপর কৃষ্ণাজিন বিছাইয়া তাহার উপর সোম রাখিয়া আপাততঃ আহবনীয়ের দক্ষিণে স্থাপন করিবে।

সোমের উপাধি রাজা। রাজা গৃহে আসিলে তাঁহার যেমন অভ্যর্থনা আবশ্যক, সেইরূপ সোম শালা-প্রবেশ করিলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আতিথ্যেষ্টি করিবে। মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই মথিত অগ্নি আহবনীয়ের অগ্নিতে মিশাইয়া তাহাতেই আতিথ্যেষ্টি ও বিষ্ণুঃ উদ্দিষ্ট পুরোডাশ দান হইবে। আতিথ্যেষ্টি বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

আতিথ্যেষ্টির পুরোডাশ দান ও ইড়াভক্ষণের পর একটি অনুষ্ঠান আছে, তাহার নাম তানূন পত্র। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় দেবগণ ঐক্যদ্বারা বলবৃদ্ধির সম্ভাবনায় একমত হইয়া একসঙ্গে আজ্যস্পর্শ দ্বারা শপথ করিয়াছিলেন। তদনুকরণে সকল ঋত্বিক্ ও যজমান একযোগে ঘৃত স্পর্শ করিয়া শপথ করেন। তাৎপর্য্য যে, এই যজ্ঞে আমরা সকলে একমত হইয়া কর্ম্ম করিব। পরস্পর ক্রোধ করিব না। এই অনুষ্ঠানের নাম তানূন পত্র। তানূন পত্রে ব্যবহৃত আজ্য রাখিয়া দিতে হয়, যজমান ব্রত দুগ্ধ পানের সময় ঐ আজ্য দুগ্ধে মিশাইয়া পান করেন।

ব্রাহ্মণ মতে ঘৃত ভীষণ দ্রব্য। ইন্দ্র ঘৃতকে বজ্রস্বরূপ করিয়া তদ্দ্বারা বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন। রাজা সোমের নিকট ঘৃত আনা ক্রূর কর্ম্ম। রাজা সোম আহবনীয় অগ্নির নিকট আসন্দীতে স্থাপিত আছেন, তাঁহার নিকটেই ঘৃত স্পর্শ দ্বারা ঋত্বিকেরা তানূন পত্র করিয়াছেন, ইহাতে রাজা সোমের প্রতি ক্রূরকর্ম্ম করা হইয়াছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৪র্থ অধ্যায়—৯ম খণ্ড)। এখন সেই ক্রূর কর্ম্মের প্রতিবিধানার্থ রাজা সোমের আপ্যায়ন কর্ত্তব্য। যজমান খানিকটা উষ্ণ জল স্পর্শ করিয়া আপনার হাতের মুষ্টি ও কটিস্থ মেখলা আরও দৃঢ়বদ্ধ করেন। তাঁহার পত্নীও ঐরূপ করেন। ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু, অগ্নীধ্র, ও যজমান এই ছয় জনে

উষ্ণ জল স্পর্শের পর কাপড় খুলিয়া সোম বাহির হইলে সোমে জল ছিটাইয়া তাঁহার আপ্যায়ন বা তৃপ্তিবিধান করেন। আপ্যায়নের মন্ত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৪র্থ অধ্যায় ৯ম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রের জন্য সোমের অংশু (খণ্ড) সকল আপ্যায়িত (বর্দ্ধিত) হউক ; ইন্দ্র ও সোম পরস্পর আপ্যায়িত করুন—সবন-কাল পর্য্যন্ত সোম নির্ব্বিঘ্নে থাকুন। ফল কথা সোমের টুক্‌রাগুলি তিন দিন ধরিয়া কাপড়ে বাঁধা থাকিবে। চতুর্থ দিনে উহা ছেঁচিয়া রস বাহির করিতে হইবে। এ কয় দিনে সোমকে সরস রাখিবার জন্য এই ব্যবস্থা।

ঐষ্টিক বেদির উপর এক গোছা কুশ থাকে, উহার নাম প্রস্তর। ঐ প্রস্তরের বা কুশগুচ্ছের উপরে জুহূ নামক হোমের হাতা রাখিতে হয়। কোন দ্রব্য আহবনীয়ে আহুতি দিবার সময় অধ্বর্য্যু জুহূ প্রস্তরের উপর হইতে তুলিয়া লন এবং জুহূতে হোমদ্রব্য রাখিয়া তদ্দ্বারা আহবনীয় প্রক্ষেপ করেন। সোমের আপ্যায়নের পর ঐ ছয় জন (যজমান ও পাঁচজন ঋত্বিক) সেই প্রস্তরের উপর দুই হাত উত্তান (চিৎ) করিয়া ধরেন, বাম হাত নীচে ও ডানিহাত উপরে থাকে, ঐরূপ প্রস্তরে হাত রাখিয়া নিহ্নব করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আপ্যায়ন মন্ত্রের পরই নিহ্নব মন্ত্র দেওয়া আছে। নিহ্নব অর্থে নমস্কার, পূজা। দ্যাবাপৃথিবীকে ঐ মন্ত্রে প্রণাম করা হয়। ঐতরেয় বলিতেছেন, রাজা সোম দ্যাবাপৃথিবীর অপত্য-স্বরূপ। তাঁহাকে নমস্কার করিলে সোমেরও বর্দ্ধন হয়।

সোমের আপ্যায়ন ও নিহ্নব কর্ম্মের নামান্তর অবান্তর দীক্ষা।

আতিথ্যেষ্টি ও অবান্তর দীক্ষার পর পূর্ব্বাহ্নেই প্রবর্গ্য ও উপসৎ। অপরাহ্ণেও পুনরায় প্রবর্গ্য ও উপসৎ। প্রবর্গ্য ও উপসদের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক উপসদের মাঝে একবার করিয়া সোমের আপ্যায়ন ও নিহ্নব করিতে হয় (কাত্যায়ন)। কেবল এই কথাটি অধিক বলা আবশ্যক যে, সোমকে সরস রাখিতে হয়।

ক্রমশঃ

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

চরণামৃত

(গল্প)

পৌষের রাত্রি। গির্জ্জার ঘড়িতে অনেকক্ষণ আটটা বাজিয়া গিয়াছে। শীতে শিশিরে চারিদিক যেন স্তব্ধ, আড়ষ্ট। পার্শ্বের বাড়ী হইতে নারীকণ্ঠের মিহি আওয়াজ, শিশুর অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি ক্বচিৎ ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

ডিবার আলোটা অজস্র ধূমোদ্গিরণ করিয়া বড় ঘরের মেঝেয় জ্বলিতেছিল। শিবচরণ সেখানে একখানা মাদুর পাতিয়া বসিয়া তাহার দৈনন্দিন জমাখরচের হিসাব মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। কয়েকটি টাকা, কতকগুলি আনি ও পয়সা সে গণিয়া গণিয়া গোছা করিয়া এক পার্শ্বে রাখিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া সেগুলিকে সে আর একবার গণিয়া একটা থলির মধ্যে পুরিল। তারপর একটা বড় কাঠের বাক্সে থলিটা আটকাইয়া শিবচরণ তামাক সাজিয়া খাইতে বসিয়া গেল ; আর মাঝে মাঝে সতৃষ্ণ নয়নে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল। একটু পরে সে হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "নাঃ—পরকে দিয়ে কি কোন কায হয়? আমারই

নেহাত বোকামী হয়েছে। ঐ রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরে এলেও হত।"—তাহার চোখে মুখে বিরক্তির চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে লাগিল।

ধীর পদবিক্ষেপে তাহার স্ত্রী বিমলা আসিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল। শিবচরণ সাগ্রহে সচকিতে সেদিকে একবার চাহিয়া, সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া হতাশভাবে বলিল, "কে, তুমি? আমি বলি—"

বিমলা স্বামীর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সবল পুষ্ট গ্রীবাখানি একটু বাঁকাইয়া বলিল, "আমি বলি কি? বল, থাম্‌লে যে?"

শিবচরণ সে কথায় কাণ না দিয়া আলোটার পানে চাহিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল, "ছেলেপিলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে?"

"কখন হয়ে গেছে। রাত তো কম হয় নি; এখন ওঠো, তুমিও খেয়ে দেয়ে নাও।"

"তা নিলেই হবে—এত তাড়াতাড়ি কি?"

মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলা বলিল, "ওঃ বুঝেছি, তোমার সেই ওষুদটা বুঝি তখন কিনে আন্‌তে ভুলে গেছ, না? কেষ্ট এখন নিয়ে আস্‌বে? আচ্ছা আজ না হয় ওটা খাওয়ার পরেই খেলে। কেমন, তা কি হয় না?"

শিবচরণ হাসি চাপিয়া বলিল, "তাই কি কখনো হয়? যে কাযের যে রীতি।"

"সেই কোন্‌দিন থেকে যে ওষুধ খাচ্ছ—বছর ঘুরে এল; তবু কি তোমার সে ব্যারাম সারেনি?—ওষুদের মাত্রা তো দিন দিন বেড়েই চলেছে।"—বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমলা বলিল, "ওটা কি ওষুদ গা?"

শিবচরণ বিমলার দীর্ঘায়ত মুখখানার দিকে চাহিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওটা এক রকম সালসা।"

বিমলা তাহার ডাগর চক্ষুর সোৎসুক দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "সালসা? সেই যেবার আমার ক্ষেন্তি হলে শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ল্‌ আর তুমি ও পাড়ার গোপাল কব্‌রেজের কাছ থেকে যে সালসা এনেছিলে, সেই সালসা?"

শিবচরণ তেমনিভাবে বলিল, "হুঁ।"

বিমলা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি জানি ছাই! তা হবেও বা! আমরা হলাম পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু সুখ্যু মেয়েমানুষ।"—বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "এক একদিন তুমি যেন কেমন হয়ে যাও, কত কি আবোল তাবোল বক্‌তে থাক। আচ্ছা—সালসা খেলে কি মানুষের কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান থাকে না? ওটা বাদ দিয়ে অন্য ওষুদ ব্যাভার করে দেখ।"

শিবচরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ওরে আমার সোণার চাঁদ! তুমিই ঠিক বলেছ। ভাগ্যিস তুমি ছিলে? কে রে! ওদিকে? খোকাদাদা এসেছিস নাকিরে? এত রাত হল যে?—ও পাড়ার মাখনা ঠাকুরের কাছ দিয়ে আস্‌ছিস্ বুঝি?"

খোকা ছুলে তাহার বগল-মধ্যস্থিত বোতলটা শিবচরণের হাতে দিয়া বলিল, "আরে না। মাখনা দা ঠাকুর তো সকালে সকালেই ঐ রামা ছোঁড়াকে দিয়ে আনিয়ে নেয়। তোমার মতন রাখ্‌ঢাক তো তার নেই।"

"তবে এত রাত হল যে?"

"দোকানে আজ যে কত ভিড়, তা তো তুমি ঘরে বসে জান্‌তে পার্‌ছনা দাদা।"

"তার পর, তুই একটু—"

"আমার আছে, তুমি এখন চালাও।"—বলিয়া খোকা ছুলে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শিবচরণ বোতলটা আলোর সাহায্যে একবার দেখিয়া লইল, তার পর স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "কাচের গেলাসটা কোথায় আছে দাও তো।"

বিমলা একটা কাচের গেলাস আনিয়া স্বামীর হাতে দিতে গিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ওমা! গেলাসটা আন্‌বারও কি তোমার সবুর সইল না? এর মধ্যে বোতল মুদ্ধোই খেতে লেগে গেছ? দেখি, দাও আমি ঢেলে দিই।"

শিবচরণ বোতল হইতে আরও খানিকটা ঢক ঢক

করিয়া খাইয়া ফেলিয়া, মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "নাও—ঢালো।"

বিমলা স্বামীর হস্ত হইতে বোতলটা লইয়া বলিল, "আরও খাবে নাকি? মাগো, কি বিশ্রী গন্ধ।"

"ঢাল ঢাল, আরও ঢাল। তুমি আমার বেশ।"

বোতল নিঃশেষ হইয়া গেল—উৎকট একটা গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল। মত্ততার ঘোরে শিবচরণ খানিকক্ষণ নৃত্য করিয়া বেড়াইয়া শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল। স্বামীর এই কাণ্ড দেখিয়া বিমলা নির্ব্বাক বিস্ময়ে এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। কত কি চিন্তা আসিয়া তাহার মাথার মধ্যে বিছার কামড়ের মতন জ্বালা ধরাইয়া দিতে লাগিল;—এ কি? এ কেমন সালসা? সালসা খেলে কি মানুষ এমনি জ্ঞানহারা পাগলের মতন হয়!'

পূর্ব্বাকাশে চন্দ্র দেখা দিল। প্রকৃতির অধরে মধুর হাসির আভা ফুটিয়া উঠিল। নিশীথিনী যেন দিগন্তের কোল হইতে শেফালী রঙের শাড়ীখানা পরিধান করিয়া জড়িত চরণে তাহার শয়ন-মন্দিরে দেখা দিল।

সংজ্ঞাহীন নিদ্রিত স্বামীর কাছে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিমলার দুই চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিল। সে ডিবার আলোর সাহায্যে স্বামীকে আর একবার দেখিয়া লইয়া, পুত্রকন্যাদের পার্শ্বে গিয়া শয়ন করিল।

বিমলার নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই শিবচরণ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। গত রাত্রির ঘটনা মনে আনিয়া তাহার অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া তাহার পাণের ক্ষেতে চলিয়া গেল। গ্রামের বাহিরে পথের দুই পার্শ্বে শিশির-সিক্ত উন্নতশীর্ষ যবগমের শ্যামায়মান মাঠ—চতুর্দ্দিকের বালারুণ-রঞ্জিত ফুলবাস-স্নিগ্ধ নীরবতা—সর্ব্বোপরি তাহার ঘনবিন্যস্ত পাণগাছের সারি আজ তাহাকে অন্যদিনকার মত আনন্দ দিতে পারিল না। তাহার চিরাভ্যস্ত কর্ম্মপটুতা তাহার সঙ্কুচিত মনটাকে কর্ম্মের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল বটে, কিন্তু কিসে যেন মাঝে মাঝে তাহাকে চঞ্চল বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে লাগিল;—হাতের কায যে কখন বন্ধ হইয়া যায়, তাহা সে জানিতেই পারে না। ছিন্নসূত্র ঘুড়ীর মত তাহার মনটা যেন কেবলই ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতে লাগিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল। শুভ্রোজ্জ্বল রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। আকাশের কোল হইতে নীলিমার স্নিগ্ধ হাসি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিবার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু শিবচরণ আসিল না। বিমলা চিন্তিতমুখে প্রাঙ্গণের এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া বাহিরে প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন সব্জীবাগানে প্রবেশ করিল। একটু পরে সে কয়েকটা বেগুন ও একটা লাউ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তখনও স্বামী আসেন নাই।—তাহার পুত্রকন্যা দুইটি তেমনি রান্নাঘরের সম্মুখস্থ কাঁঠাল গাছটার ছায়ায় বসিয়া খেলা করিতেছে। সে স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

শিবচরণ ক্লান্ত শুষ্ক মুখে পাণের ঝুড়িটা মাথায় করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেমেয়েরা উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। পুত্রকন্যাদের আনন্দ কাকলীতে স্বামীর আগমন জানিতে পারিয়া বিমলা একঘটী জল ও একহাতা আগুন আনিয়া বড় ঘরের বারান্দায় রাখিয়া দিয়া ধূম-সজল চক্ষুদুইটি অঞ্চলপ্রান্তে মুছিয়া বলিল, "আজ এত দেরী হল যে? দেখ দেখি, বেলা কত হয়েছে!"

"হুঁ"—বলিয়া শিবচরণ তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

বিমলা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভ্রূ একটুখানি কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "যাও—এখন শীগ্‌গির চান করে এস। আমার রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেছে।"—বলিয়া সে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

স্নানাহার শেষ করিয়া শিবচরণ একখানা মাদুর পাতিয়া বসিয়া নিবিষ্টমনে তামাক টানিতেছিল। বিমলা আসিয়া মাদুরটার প্রান্তদেশে উপবেশন করিয়া বলিল,

"আগে তুমি মাঝে মাঝে বেশ রামায়ণ পড়ে শোনাতে ; কৈ, এখন আর একদিনও শোনাও না।"

অল্পশিক্ষিত শিবচরণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ত্রীর অনুরোধে ঘাড় দোলাইয়া কঠিন যুক্তাক্ষরগুলির বিকৃত উচ্চারণ করিয়া উচ্চ সুর তুলিয়া রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

"এত সাধু হলে কবে হে ? ঘুঁটি কি আবার কেঁচে বসেছে ?"—বলিতে বলিতে ব্যঙ্গের হাসিতে চোখ মুখ উজ্জ্বল করিয়া নিতাইদাস প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

শিবচরণের রামায়ণ পড়া বন্ধ হইয়া গেল। লজ্জা-ভিভূতা বিমলা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল।

"তুমি তো বড় বেরসিক হে! ওরা দুজনে এখন নিরিবিলিতে বসে একটু আলাপ করছে,—তোমরা এলে কিনা তাতে বাধা দিতে!"—বলিয়া ভজহরি নিতাইএর পার্শ্বে আসিয়া আবির্ভূত হইল।

শিবচরণের পানে পরিহাসের দৃষ্টি হানিয়া নিতাই দাস বলিল, "একবার তামাকটাও খেতে বললে না হে ?"

শিবচরণ রামায়ণখানা বারান্দার চালে ঝোলান একটা মাচার উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, "বাইরের চালাটায় বোস গিয়ে ; এই আমি এলাম বলে।"

শিবচরণ তামাক সাজিয়া আনিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "জান হে, কাল রাত্তিরে গিন্নীর কাছে আর একটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম আর কি!"

নিতাই বলিল, "তাতে হয়েছে কি হে! মদ খাই, তা বৌ জান্‌তে পার্‌লে তো বয়েই গেল। নাও—নাচতে নেমে আর ঘোমটা দিতে হবে না।"

শিবরচণ হুঁকাটা নিতাইএর হাতে দিয়া বলিল, "হবে আর কি, তবে কিনা একটু—"

ভজহরি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বলিহারি দাদা আমার! গিন্নীকে দেখে যদি এত ভয় হয়ে থাকে,—আরে! হেঁটে আয় একটু। বড্ড দেরী করে ফেলেছিস তো।—কৈ শীগ্‌গির বের কর্‌।"

"হেঁঃ—তোমার যেমন কথা ; দেরী আর এত কি হল ? এই তো তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আস্‌ছি।"—বলিতে বলিতে খোকা ছলে একটি মদ্যপূর্ণ বোতল তাহার গায়ের মলিন অর্দ্ধছিন্ন জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া ভজহরির সম্মুখে রাখিয়া দিল।

শিবচরণ অধীর আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "বাঃ! বাঃ! তোমরা তো বড় মজার লোক হে! একেবারে তৈরী হয়েই এসেছ।"

নিতাইদাস শিবচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি মনে ভেবেছ কি হে ? আমরা কি তোমার মত ভীরু ? আচ্ছা, এস এখন ফূর্ত্তি করা যাক্‌।"

"শিবচরণ, বাড়ী আছ হে ? শিবচরণ! ঘরে পাণ আছে ?"—বলিতে বলিতে রামধন ভট্টাচার্য্য চালা ঘরটার সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র অপরিসর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ ভয়ের কারণ ঘটিলে মানুষ যেমন চমকাইয়া উঠে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অতর্কিত আগমনে তাহারা তেমনি চমকাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সরাইয়া রাখিতে গিয়া ভজহরির দক্ষিণ হস্তের ধাক্কায় বোতলটা কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল এবং খানিকটা মদ মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

শিবচরণ একান্ত অপ্রতিভ লজ্জিত মুখে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আছে বৈকি। বসুন, এনে দিচ্ছি।"—বলিয়া সে ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেই, তিনি ব্যস্তভাবে দুই পা পিছাইয়া গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যা বেটা মাতাল, নরাধম! ছুঁস্‌নে।"—বলিয়া ক্ষণকাল ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "অনেকদিন থেকে শুনে আস্‌ছি, কতকগুলো বদলোকের সঙ্গে মিশে শিবও মদ খেতে আরম্ভ করেছে ; কিন্তু বিশ্বাস করিনি। ভাবতাম, শিবুর মতন নিরীহ লোক, তেমন হতেই পারে না।"

শিবচরণ নত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আপনার কাছে মিথ্যে বলে আর পাপ বাড়াতে চাইনে। আপনি যা' শুনে আস্‌ছেন, তার সমস্তই সত্যি—একটুও মিথ্যে নয়। কতদিন মনে করেছি, মদ আর খাব না; এমন কি, ছেড়েও দিয়েছি। কিন্তু সঙ্গদোষে—আর বিশেষতঃ জায়গার দোষে আমি ঠিক থাক্‌তে পারিনি। যখনই ওপাড়ায় গিয়েছি, আর ঐ আবকারীর চালাঘরটা চোখে পড়েছে, আমার সব ভুল হয়ে গিয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার শুভ্রপ্রায় কেশগুলির মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিলেন; তার পর হঠাৎ খোকা দুলের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ঘুরাইয়া বলিলেন, "এই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। এই বেটা এদের সঙ্গে মেশাতেই এরকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়েছে; নইলে এতদূর অধঃপতনের পথে এরা যেতে পারত না।—মেয়ে মরদে যাদের মদ খায়! তোদের দুলে বাগ্‌দী জাতের ধরণই তাই, না?"

খোকা দুলে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আজ্ঞে ঠাকুর-মশায়, আপনার কথা খুবই সত্যি। কিন্তু জান্‌বেন, এও সত্যি যে, দেশের বড় বড় ভদ্দর নোকেরাই আমাদের এই পথ দেখিয়ে দিয়েছে। মাপ করবেন ঠাকুর-মশায়, অবিশ্যি ভাল যে কারুর মধ্যে নেই, সে কথাও কেউ জোর গলায় বল্‌তে পারেনা।"—ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ঠাকুর মশায়, আমরা যদি মদ না খাব, তা হলে যে সব ভদ্দর নোক আশা করে আমাদের দোরের সামনে দোকান খুলে বসেছে, তাদের গতিটা কি হবে বলুন তো? তারা করবে কি তবে? আর তাদের কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে চল্‌বেই বা কিসে?"

"ফের আবার তর্ক করা হচ্ছে আমার সঙ্গে? ওসব কথা আর আমাকে শোনাস্‌নে। তারা আবার মানুষ—তারা আবার ভদ্রলোক, যারা পয়সার জন্যে মানুষের মনুষ্যত্ব এমনি করে রসাতলে দেয়!"—বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখখানা ক্রোধে ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর হইতে অবিরল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। জলের ঝর ঝর শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত, দিনের চাঞ্চল্য বাদল-শীতলতায় সমাচ্ছন্ন। শ্যামা ধরিত্রী যেন তাহার উদার উন্মুক্ত বক্ষ পাতিয়া দিয়া অসীমের সেই অফুরন্ত রসধারা নীরবে গ্রহণ করিতেছিল।

শিবচরণ সেদিনকার মত আর কাযে বাহির হইতে পারিল না; বারান্দার এক কোণে মাদুর পাতিয়া বসিয়া সেই জলদমালাবেষ্টিত ঝাপসা আকাশের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিমলা আসিয়া একটু দূরে পৃথগাসনে উপবেশন করিল। তাহার মনটা যেন আজ কেমন ভারাক্রান্ত, বিষাদমাখা;—তাহার বুকের ভিতর কিসের যে একটা তোলপাড় চলিতেছিল, তাহা তাহার মুখের ভাবেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের উপর তাহার স্থির অপলক দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ক'দিন থেকে একটা কথা বলবো বলবো মনে করেও বলতে পারিনি; কিন্তু আজ আর না বলে পারলাম না।"

শিবচরণ ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "কি সে কথাটা? বলনি কেন এতদিন?"

বিমলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "শুনেছি তুমি নাকি মদ খাও?

শিবচরণের চক্ষু দুইটী ক্ষণকালের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে একটু থতমত খাইয়া বলিল, "অ্যাঁ, মদ? তা—তা, সে কথা কেন? কে বলেছে?"

বিমলা তেমনি ভাবে বলিল, "এতদিন আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, তুমি মদ খাও। কিন্তু কাল পুরুত ঠাকুরের মুখে শুনলাম, ও তোমার সাধসা নয়, মদ। সত্যিই তো, নইলে কি মানুষ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মতন অমন আবোল তাবোল বকে? আমার

কাছে গোপন করে তুমি যে ওষুধ বলে মদ খেতে আরম্ভ করেছিলে, তা আমি আগে বুঝতে পারিনি!"

ক্ষণকালের জন্ত উভয়েই নীরব—কাহারও মুখে কথা নাই। বাহিরে বারিধারা তেমনি ঝরঝর সর-সর শব্দ করিয়া পড়িতে লাগিল, অস্থির চঞ্চল পবন তেমনি নাচিয়া নাচিয়া বহিয়া চলিল।

ক্ষোভে, দুঃখে, ব্যথায়, ঘৃণায় বিমলার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর পানে বিষণ্ণ নয়নে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, "চুপ করে রইলে যে? কথার উত্তর দাও।"

শিবচরণ দৃষ্টি নত করিয়া অনুতপ্তের স্বরে বলিল, "হ্যাঁ বিমলা, তোমার কাছে আর আমি লুকিয়ে রাখতে চাইনে। সত্যি সত্যিই আমি মদ খাই—আমি মাতাল।"

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বিমলার মুখখানা আরও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে অধীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওমা, আমি যাব কোথায় মা! যা খেলে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকেনা—যাতে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সেই বিষ কিনা আমি মানুষকে হাতে করে খাইয়েছি! আগে কেন বলনি যে, তুমি মদ খাও! আমাকেও কেন ঐ সঙ্গে ডোবালে? মতিচ্ছন্ন হলে কি মানুষের এমনিই হয়!"

শিবচরণ ধীর কণ্ঠে বলিল, "তোমার আর দোষ কি বিমলা? যত দোষ সব আমারই। কিন্তু একটা কথা—"

"এর মধ্যে আর কথা কি আছে বল? এতে আমি দোষ দেবো কার?" মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলা বলিল, "আচ্ছা বলতে পার তোমার মত হতভাগাদের ইহকাল পরকালের মাথা খেয়ে এত মদের যোগান দেয় কারা? আর, তারা কি রকমের জীব? আমি তো ভেবে পাইনে কেমন করে যে মানুষ মানুষকে সামান্ত পয়সার জন্তে এমনি করে নরকের পথে টেনে নেয়—কেমন করে মানুষ হয়ে মানুষকে দিন দিন এমনি নষ্ট ক'রে সব ভুলিয়ে দেয়! পয়সাই কি সব? তাই যদি হয়, তবে কি তার আর অন্ত উপায় নেই ঐ এক বিষ দেওয়া ছাড়া? তাহলে মুচি মুদ্দফরাসদের অত নীচ ছোট লোক বলে কেন?"

শিবচরণ বলিল, "যা হবার তা তো হয়েই গেছে; আর আমাকে ও সব কথা বলে লজ্জা দিওনা বিমলা!"

"বল—দিব্যি কর, আর কোন দিন মদ খাবে না! অমন চুপ করে রইলে যে!"

"হ্যাঁ, বলছি!"

"কি বলছো?"

"বলছি যে, আমি আর কোন দিন মদ খাবনা।"

"এই আমার মাথায় হাত রেখে বল যে, তুমি আর কোন দিন মদ খাবে না।"—বলিতে বলিতে বিমলা স্বীয় মস্তকটা স্বামীর সম্মুখে নত করিয়া ধরিল।

"বলছি গো! বলছি!" —বলিয়া শিবচরণ বাম হস্ত দ্বারা স্ত্রীর আধ ঘোমটাবেষ্টিত মস্তকটা স্পর্শ করিল।

বৃষ্টি কমিয়া আসিল, গাঢ় ধূসর মেঘমালা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল, পাখী সকল কল-কাকলীর লহর তুলিয়া দিকে দিকে ছুটিয়া চলিল।

শিবচরণ হতভম্বের মত তথায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

সে দিনের বিকালের আকাশখানা পাংশুবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া বড় বিশ্রী হইয়া উঠিল। শিবচরণ তাড়াতাড়ি হাট শেষ করিয়া বিক্রয়াবশিষ্ট পাণগুলি লইয়া সমব্যবসায়ীদের সহিত গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। পথের ধারে পল্লীর আবকারী চালার মলিন অপরিষ্কৃত লণ্ঠনটার ক্ষীণ অনুজ্জ্বল রশ্মি সম্মুখস্থ বন্ধুর খোলা প্রাঙ্গণের উপর আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে মদ্যপায়ী ও গঞ্জিকা সেবীর খোসগল্প ও হাসির শব্দে স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিল।

আবকারী দোকানের সম্মুখে আসিয়া শিবচরণের সঙ্গীরা দাঁড়াইয়া গেল। শিবচরণ এখন একা চলিয়া যাইবে, কি তাদের জন্ত অপেক্ষা করিবে, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। হতবুদ্ধিপ্রায় নীরব নিস্তব্ধ ভাবে

দাঁড়াইয়া কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল। নিতাইদাস শিবচরণের দ্বিধাগ্রস্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কি হে, ভাবচ কি? এস খানিকটা নেওয়া যাক। আর নতুন মদওয়ালার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়ে যাবে ঐ সাথিলে। অনেক দিন তো এদিকে আসনি।"

শিবচরণের অবসন্ন মন ও শরীর কিসের স্পর্শে যেন সজাগ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কতকাল যেন সে ও-রসে বঞ্চিত! সে তো ছাড়িয়াই দিয়াছে, আর কোন দিন স্পর্শও করিবে না; তবে অন্ধকার মত এত কাছে আসিয়া, একটুখানি—মাত্র ঐ ছোট্ট গেলাসটার এক গেলাস।—তারপর এ জীবনের মত আর নয়। ওঃ কি প্রাণারাম মন মাতানো গন্ধই না আসিতেছে। পর মুহূর্ত্তেই একটা বিপরীত ধাক্কায় তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল; না, না, সে আর হয় না। শিবচরণ কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

ভজহরি শিবচরণের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "আর গড়িমসি ক'রে লাভ কি দাদা? চল, আজকের মত—বেশী না—একটু খানি—"

শিবচরণ থতমত খাইয়া বলিল, "না, না—সে কেমন ক'রে হবে? আমি—আমি তো ছেড়েই—"

নিতাইদাস মুখখানা একটু ভেঙ্গচাইয়া বলিল, "নাও খুব হয়েছে। একেবারে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়েছেন আর কি!"

ভজহরি বলিল, "আচ্ছা, না খাও, একটুখানি বস্‌বে চল।"

শিবচরণ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "তা—তা চল, তোমরা যখন ছাড়বেই না, তখন আজকের মত একটু বসে যাই।"

তাহারা তল্পী তল্পা নিম্নে রাখিয়া বারান্দায় মাচার উপর গিয়া বসিল।

ভজহরি তামাক সাজিয়া আনিয়া জ্বলন্ত কলিকায় গোটা কতক টান দিয়া মদ্যবিক্রেতার পানে চাহিয়া বলিল, "এদিকে চক্কোত্তি মশায়!"—বলিয়া সে শিবচরণের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিল, "আর এই যে দেখছেন আমাদের শিবু দাদাকে, হেঁ-হেঁ ইনি আমাদের দলের একজন প্রধান লোক। এখন সব ছেড়ে দিয়ে একেবারে পাকা বোষ্টম হয়ে পড়েছে;বুঝলেন দা' ঠাকুর! আপনি আসার পর এপথ আর মাড়ায়নি।"

শিবচরণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে একবার ভজহরির মুখের দিকে, একবার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

নিতাই পরিপূর্ণ গেলাস শিবচরণের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "নাও।"

শিবচরণ একদিকে মুখ ফিরাইয়া কতকটা জোর করিয়া বলিল, "না ভাই, মদ আর আমি খাব না।"

ভজহরি শিবচরণের পৃষ্ঠে মৃদু একটা আঘাত করিয়া বলিল, "খাবনা কিহে? ঠাকুর মশায়ের হাতের জিনিষ 'খাব না' কি? জান, অমন কথা মুখে আনাও মহাপাপ।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভজহরির মুখের পানে চাহিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ঘুরাইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ তুমি! ও কথা মুখে আনাই মহাপাপ। যাই হোক ব্রাহ্মণের হাতের জিনিষ তো।"—বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় মদের গেলাসটা নিতাইএর হস্ত হইতে লইয়া শিবচরণের সম্মুখে ধরিলেন।

শিবচরণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গেলাস শেষ করিয়া ফেলিল। আঃ কি মজাদার! গোলাপী নেশায় তাহার মন মসগুল হইয়া উঠিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দিকে নিতাই একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, "আর এক গেলাস ঠাকুর মশায়! ঐ হাতে আর এক গেলাস।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর একটা পূর্ণ গেলাস শিবচরণের সম্মুখে ধরিলেন।

শিবচরণ গেলাসটা দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া লইয়া বাম হস্তে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "একবার এতে পা ঠেকিয়ে দাও ঠাকুর

মশায়, 'চন্নামেত্ত' হয়ে যাক, যাতে পরকালেও সদ্‌গতি হয়।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আনন্দে আত্মহারাপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলিহারি ভাইটি আমার! একেবারে শাস্ত্রের পেটের ভেতরকার কথা টেনে বের করেছ। জল যদি ব্রাহ্মণ-পদস্পর্শে চরণামৃত হয়ে যায়, তবে এ জিনিষটাই বা না হবে কেন?"—বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় মাহাত্ম্যের গৌরবে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া দক্ষিণ পদ দ্বারা আনত শিবচরণের হস্তস্থিত গেলাস স্পর্শ করিলেন।

শিবচরণ অধীর আনন্দে বলিয়া উঠিল, "বেশ বেশ দা'ঠাকুর আমার! ভাল যে তোমরা ছিলে! নইলে জীবের কি গতি হতো? দেখ দেবতা, যখন তোমরা নিজ মহিমার গুণে দয়া করেছ, তখন সব জায়গাতেই তোমাদের এমনি 'চন্নামেত্ত' পেয়ে যেন পবিত্র হই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে কি আর বলতে ভায়া! আমরা যখন হাত দিয়েছি, তখন অন্য কার সাধ্য যে আর কল্‌কে পায়।"

শিবচরণ ভক্তি গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলিল, "এমন দেবতা না হলে কি এমন হয়!"

বলা বাহুল্য, চরণামৃতের মহিমায় সেইদিন হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি শিবচরণের ভক্তির মাত্রা বাড়িয়া গেল।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক।

কাল-বৈশাখী

ঐ তো এসরে এতদিন পরে ঈশান কোণের বন্ধু আমার,
মেঘ গরজন কণ্ঠে রটিল —বক্ষে ঝুলিল বৃষ্টির ধার,
চপলা-চমক-চটুল-চাহনি চকিতে চাহিল বিশ্ব 'পরে,
দুরু-দুরু তাই ধরণীর হিয়া দরদিল কোন্ মিলন তরে।
মধু-যামিনীর পুষ্প-পেলব স্বপ্ন-বাসর কোথা আজি হায়!
মহারুদ্রের ঘন নিঃশ্বাসে উৎসব দীপ আঁধারে মিলায়।
শ্যামা কণ্ঠের যাদুকরী ডাক্ মুগ্ধ করে না কুঞ্জকানন,
বঁধুয়া আমার এল যে রে আজ, কঠোর তাহার কঠিন শাসন।
এস গো আমার পথ চাওয়া বঁধু বরষ অন্তে দিয়েছ গো দেখা,
মায়ার কালিমা মুছায়ে যতনে ললাটে জ্বালাও সত্যের রেখা।
দুঃখনাশন মন্ত্রে তোমার চিত্ত আমার উঠুক জাগি',
ব্যর্থ রোদন নাহি করি যেন হারাণ রতন পাওয়ার লাগি।
তুমি ধ্রুব ওগো নিশ্চিত তুমি, মঙ্গল রাজে হৃদয়ে তোমার।
প্রতিদিনকার দহনের শেষে করুণার ধারা ঝরে অনিবার।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

(৩)

ইষ্ট ক্যানাল রোড,
বেলি লজ, দেরাদুন

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ কল্যাণবরেষু —

কাল আমাদের কুম্ভ স্নান হয়ে গ্যাছে। তোমরা খবরের কাগজে অনেক কিছুরই খবর পেয়ে হয়ত আমাদের জন্যে খুবই ভাববে, তাই তাড়াতাড়ি চিঠি লিখছি। আমাদের কোন রকম কষ্ট বা অসুবিধা হয়নি, বরঞ্চ আশাতিরিক্ত সুযোগ এবং প্রচুর আনন্দই আমরা

পেয়েছিলুম। এমনটা ঘটলো কিসের থেকে জানো? মোটর গাড়ির টায়ার ফেটে। এটা শুনতে অবশ্য একটুখানি আশ্চর্য্য লাগবে। কিন্তু সত্যি তাই! তাও একবার নয়—দুখানা টায়ার দু'বারে যখন সেই বনের মধ্যে ফাটলো, তখন অন্ততঃ শেষবারেও আমাদের মনে হয়েছিল যে, আমাদের ভাগ্যে বুঝি কুম্ভ-স্নান এবং সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা দেখা আর ঘটে উঠলো না। গতিক হয়েছিল তারই বটে! ভোরের বেলা দেরাদুন হ'তে দুখানা মোটরে বার হয়ে আমরা পাহাড়ের পথে ৪৪ মাইল এসে হরিদ্বারে স্নান ক'রে আবার ঐ গাড়ীতেই দেরাদুন ফিরবো, এই আমাদের অভিপ্রায় ছিল! সেই মত কাযও হয়েছিল, কিন্তু মাঝে হতে এই ব্যাপার! যাহোক শেষরক্ষা হল। পঙ্কুদের মোটর হরিদ্বার পৌঁছে যখন দেখলে আমরা আর পৌঁছবার নাম করচি নে, তখন তারা বুঝলে আমরা না হলেও আমাদের বাহনই সম্ভবতঃ বিশম্ভর মূর্ত্তি ধরে অনড় হয়েছেন। বাঁরু তাদের গাড়ী নিয়ে ফিরে এসে আমাদের যথাসম্ভব শীঘ্র উদ্ধার করলে। পথ অবশ্য পাহাড়ের পাথুরে পথ, টায়ার ফাটা কিছুই অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কিন্তু ড্রাইভারের যথেষ্ট দোষ ছিল। সে ৯৬ টাকা ভাড়া নিয়েও পুরাণো টায়ার দিয়ে এনেছিল এবং সঙ্গে একখানির বেশী অতিরিক্ত টায়ার আনেনি।

এদিন আমাদের সহর দেখা বা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করা অসম্ভব হবে মনে করে, পঙ্কুর ব্যবস্থায় আমরা এর আগে আর এক দিন এসে সহর দেখে পরিতোষপূর্ব্বক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে গেছলুম। সেদিন জসিও আমাদের সঙ্গে ছিল। সে এখন ফিরে গ্যাছে। সেদিন বড় চমৎকার লেগে-ছিল। মা গঙ্গার কি অপরূপ রূপ! চারিদিক দিয়ে বেধে ছেঁদেও তাঁর সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে শ্রীহীন করতে পারেনি। ও পারে ঘোর নীল রংয়ের পাহাড়। তার তলায় যে সুনিবিড় বন ছিল এখন কিন্তু তার বদলে কেবল নরমুণ্ড লহরী কলকল শব্দ করছে! শুনলুম বৈরাগী সাধু এবং নাগা সন্ন্যাসীর দলে আবহমান কাল থেকে একটা ভীষণ মারামারির প্রতিযোগিতা চলে আসচে। গত বারের কুম্ভে এই দাঙ্গায় বা যুদ্ধে বৈরাগীদের হার হওয়ায় এবার তারা সযত্নে সুসজ্জিত হয়ে এসেছে এবং বলেওছে নাকি যে, এইবারে কারা জেতে দেখা যাবে। তাই সরকার বাহাদুর এবার তাদের "চকা চকীর" মতন নদীর এ পারে ও পারে বাসা দিয়ে, কড়া বিলাতি পাহা-রায় ঘিরে রেখেছেন, কেউ কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে না পারে।

সেদিন এখানের শ্রীমৎ ভোলাগিরির আশ্রমে গেছলুম। গঙ্গার ঠিক উপরেই প্রকাণ্ড স্থান। সমস্তটা ব্যেপে এখন স্থানে স্থানে ঝুপড়ি বাঁধা, আর চারি-দিকে যেন অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে। আহূত অনাহূত যে কেউ আসচে, প্রসাদ পেয়ে যাচ্চে। ভোক্তাদের মধ্যে বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষই অসংখ্য লোকে যাচ্চে। আমাদের ওরা খাবার জন্ম ডাকছিল, তাতেই বোঝা গেল এর জন্যে জানাশোনার দরকার নেই। দেখবার জিনিষ বৈ কি একটা! মোহান্ত মহারাজদের সোণার ছাতায় মতির ঝালর, আর রূপার হাওদা হেলান দেওয়া ঘৃতপুষ্ট নধর দেহ দেখবার চেয়ে এ দেখায় তৃপ্তিও বেশী, ফলও বেশী! দরিদ্র এবং গৃহস্থ বাঙ্গালীর কুম্ভস্নান কি এমন সুলভ হতে পারতো যদি এই অন্নক্ষেত্রটী তাদের জন্যে এমন করে না খুলে দেওয়া হতো। সে দিন যতটা সম্ভব হরিদ্বার দেখা হয়েছিল তাই এদিনে শুধু কোন মতে স্নানটার জন্যেই আসা।

ইচ্ছা হচ্ছিল তোমরা সবাই যদি আসতে! নাঃ এসব জায়গা একা দেখায় সুখ হয় না। মা বাবা যখন হরিদ্বার আসেন, ফিরে গিয়ে, আমরা সঙ্গে ছিলাম না ব'লে দুঃখ-করতেন। গত বৎসর মা দেরাদুন থেকেও সমানে আমাদের আসতে লিখতেন। এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে, এ রকম সব জায়গা একলা দেখে সুখ হয় না।

গঙ্গার দক্ষিণ তটে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ হরিদ্বার প্রতি-ষ্ঠিত। হরিদ্বার ঠিক সেই স্থলে অবস্থিত, যেখান থেকে ভারতের সমতল ভূমির সমাপ্তি হয়ে হিমালয়ের পার্ব্বত্য ভূমি আরম্ভ হয়েছে। এতে দুই ভাবের দুটী

বিশেষ শোভনীয় দৃশ্যের একত্র সমাবেশে এই স্থানটী বাস্তবিকই একটী অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার হয়ে আছে। এক সুশীতল, সুনির্ম্মল, স্বচ্ছসলিলা দেবী জাহ্নবীর সুপবিত্র জলধারা, আর দ্বিতীয় মনোহর হরিদ্বর্ণ লতাকুঞ্জ পাদপাদি সমাচ্ছাদিত সুবিশাল পর্ব্বতমালা, এতদুভয়ের মধ্যস্থলে সুরম্য সুন্দর চিত্রাঙ্কিতবৎ হরিদ্বার বিরাজিত—দেখে যেন চোখের আশা মেটে না, এমনই সুদৃশ্য।

কুম্ভস্নান উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র হরিদ্বার আজ বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল। এ যেন সেই পার্থ-সারথির সহসা বিশ্বরূপ ধারণ! হরিদ্বার হতে দেরাদুন পর্য্যন্ত প্রায় সারা রেলপথের দু'ধারে যাত্রীর ভিড় লেগে আছে। তিনটা ষ্টেশন অবধি তাঁবু ও ঝুপড়ী বাঁধা। শুনলুম ঐ সব ঝুপড়ীর দশ টাকা করে ভাড়া। হরিদ্বারের গঙ্গার ও-পারে বন জঙ্গল কেটে পাহাড় উড়িয়ে দিয়ে বিস্তর জায়গা জমি বার করা হয়েছে। সেই সকল স্থানে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর আস্তানা হয়েছিল। দু' বৎসর ধরেই নাকি কুম্ভযোগের উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। বিস্তর বাড়ী, ধর্ম্মশালা নূতন নূতন তৈরী হয়েচে। দশ পনের লক্ষ লোক জমলেও স্থানের অকুলান পড়ে নি। ব্যবস্থা বন্দোবস্ত যতদূর সম্ভব ভাল হতে হয়, তা হয়েছে। স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা যথেষ্ট করা হয়েচে দেখলুম। আমরা অবশ্য মেলার কোন খাবার জিনিষই নিইনি। সে সব আমাদের সঙ্গেই ছিল। দোকান পশার হোটেল রেষ্টরাঁ বা সরবতের আড্ডা অনেক দেখলুম। কিন্তু এই সঙ্গে ১২৬০ সনের কুম্ভে "তীর্থ ভ্রমণের" লেখক ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে রকম দোকান পশারের বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় সেই রেলপথ খোলার পূর্ব্বযুগে এদেশে ব্যাবসায়িক উন্নতি এর চাইতে কত বেশী ছিল! অবশ্য এখন যেমন বিদেশী ছিটের বস্তা আর টিনের কাঁচের গটাপার্চ্চার সেলুলয়েডের ফাঁকি জমেছে, তখন সে সব ছিল না। কিন্তু দেশী জিনিষের দোকান তখন কত, আর এখন তার জায়গায় কটাই বা আছে—পাঁচ ছটার বেশী দেখলাম না। ৭০ বছর আগে—

"বাজার সাজাইবার কথা কিপর্য্যন্ত লিখিব? অগণিত দোকান, মনোহারী দোকানে নানাবিধ দ্রব্যাদিতে সুশোভিত, দিল্লীওয়ালাদিগের প্রায় পাঁচ শত দোকান। ইহা ভিন্ন দেশীলোকের মনোহারী দ্রব্যাদির দোকান আছে। শাল, দোশালা, জামিয়ার, রুমাল, যেজাই, চোগা, মোজা, দস্তানা, আলোয়ান ইত্যাদি পশমিনার টুপী, নানাবিধ বস্ত্র, কাশ্মীর, অমৃতসহর, নুরপুর, লুধিয়ানা, রামপুর ইত্যাদি প্রদেশের পশমিনার উত্তম উত্তম বস্ত্র সকলের প্রায় দুইশত দোকান। উলবস্ত্র, লুই, পঙ্খী, একতারি, চশমা ওদা ইত্যাদি। বৃন্দাবনের এবং কাশ্মীর অমৃতসহর, শিয়ালকোট, পেশোয়ার, মূলতান, ছোট রামপুর ইত্যাদি সহরের মহাজন সকল পাহাড় হইতে উলবস্ত্রাদি আনাইয়া চারিশত দোকান লুই-পটিতে হইয়াছিল। নানাজাতীয় কম্বল আসিয়াছিল। পট্টবস্ত্রাদির দোকান এবং সুতার বস্ত্রাদির নানাদেশীয় দোকান পাঁচ শতের কম নহে। আর পিতল, কাঁসা, তামা, দস্তা, লোহার বাসন এবং অন্যান্য তৈজস পত্রের কম-বেশ একশত দোকান ছিল। রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফটিক, পদ্মবীজ, তুলসী বিল্ব পলার দোকান অগণিত। শ্বেত-পাথরের থালা বাটী রেকাব হুঁকা ফরাশ সৈজ চৌকী কৌচ কেদারা ইত্যাদি উত্তম উত্তম দ্রব্যসকল এবং নানাপ্রকার খেলনা দোকানে উত্তমরূপে সাজাইয়া শোভাযুক্ত করিয়াছে।...

"নানাজাতীয় মেওয়া কাবুল, কান্দাহার, কাশ্মীর হইতে মোগল উটের উপর বোঝাই করিয়া আনে।... মসলা নানাজাতীয়। গুজরাট, বোম্বাই ইত্যাদি দক্ষিণ পাটনের দ্রব্যসকল। এলাচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পানফল ইত্যাদি...এই সকল দোকানে স্তূপাকার দ্রব্যাদি পাহাড়ের নিকট পাল তুলিয়া রাখিয়াছিল। এইসকল দ্রব্য অন্যদেশীয় সওদাগরে লইয়া যায়। পাণ তামাকের দোকান (এগুলির অভাব এদিনেও দেখিলাম না) নানাস্থানে আছে। মৃত্তিকার, কাষ্ঠের, পিতলের, কাঁসার, দস্তার, রূপদস্তার এবং নারিকেল ও পাথরের নানারকম হুঁকার দোকান

ছিল।…তরিতরকারি পটল ভিন্ন সকল জিনিস পাওয়া যায়।… আচারের দোকান শত শত ছিল।… এইরূপ মোরব্বাওয়ালাদিগের দোকানেও নানাদ্রব্যের মোরব্বা যে যেমত তাহাকে সেইমত রসে পাক করিয়া নানা রঙ্গের করিয়াছে।…মেঠাইওয়ালাদের দোকান। দোকানদার সকল লাহোর, লুধিয়ানা, অমৃতসহর, অম্বালা জলন্ধর, দিল্লী, সাহারাণপুর, মিরাট, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি সহর এবং গ্রাম হইতে আসিয়া অসংখ্য দোকান খুলিয়াছে।

"হরপিড়ির ঘাটের পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণে পশারী-দিগের দোকান, তাহাতে নানামত বেনিতি দ্রব্যসকল। তিক্ত, কটু, মধুর, অম্ল, কষায় ও ক্ষার সকল রকম রস আছে। নানাজাতি ঔষধির জড়িবুটি ফলমূল ছাল পাতা লতা মিঠ্যা পাণ মূল আরক বীজ ইত্যাদি চিকিৎসার দ্রব্য; তদ্ভিন্ন চামর চুয়া শ্বেতচন্দন রক্তচন্দন ধুপ ধুনা সিন্দুর মৌলি আর নানাজাতীয় মশলাতে দোকান সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে।…ডোমদিগের বাঁশের লাঠি ছড়ি, গঙ্গাজল বহিবার জন্য ছোট সাজির আকার টুকরির দোকান কতস্থানে হইয়াছে গণিয়া শেষ করা যায় না।…টিন ও গালা লইয়া বাজারে পথে ঘাটে মাঠে দোকান করিয়া আছে।…কুকাশিশি ৺গঙ্গাজল লইবার জন্য কত শত দোকান হইতে বিক্রয় হইতেছে সংখ্যা হয় না। আর ফুকা বেল লণ্ঠন গোলক গেলাস ভাঁড় বোতল ইত্যাদি বহুমত দোকান সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে। কাষ্ঠের বাক্স, সিন্ধুক, চৌকি, কেদারা, টুল, ডেস্ক, খঞ্জা ইত্যাদি আর নানামত খেলনা দ্রব্যাদি দোকান সাজাইয়া সুশোভিত করিয়াছে।…"

এই বর্ণনাগুলি থেকে তখনকার দিনের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সংবাদটা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এখনকার তুলনা করতে গেলে দেখা যায়, আমাদের দেশের পশম-শিল্পটা কি নষ্টই না হয়ে গেছে! কোথায় এগার শত শাল দোশালা, লুই কাশ্মীরার দোকান, আর আজ কোথায় বড় জোর দু'তিনখানা মাত্র! সমস্ত সভ্যজগৎকেই তখনও হয়ত এরা এইসব কাপড় জোগাচ্ছিল! ভারতকে তো বটেই!

মহাকুম্ভ ভোরের বেলা আরম্ভ হয়েছে। বৃহস্পতি কুম্ভরাশিস্থ হলে ঐ কুম্ভরাশিস্থ বৃহস্পতিতে মহাবিষুব সংক্রান্তির সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানারম্ভ। ঐসময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও ভীষণ একটা ধাক্কা হয় এবং প্রায় ৮৪ জন লোক নাকি হতাহত হয়েছিল। আমরা যখন ভীম গোড়ার দিক দিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরে পৌছলুম, তখনও অ্যাম্বুলেন্স কারগুলো ছুটোছুটি করচে দেখলুম। ভগবানের দয়ায় আর কোনও ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের দেখতে হয়নি।

ঐ যে প্রথমেই লিখেছিলেম, টায়ার কাটার দৌলতে আমাদের কোন অসুবিধেয় পড়তে হয়নি, এইবার সেই কথাটা বলচি। ঐসব হাঙ্গামায় আমাদের এসে পৌছতে ঠিক সেই সময়টা হয়ে গেছলো, যে সময়ে সাধুদের স্নানের জন্যে সমস্ত সাধারণ লোককে আটকে রেখে জলকে প্রায় জনশূন্য করে ফেলেছে, এবং এর জন্যে অত্যন্ত কড়া পাহারা মোতায়েন হয়েচে। তবু ব্রহ্মকুণ্ডের পথে চলে কার সাধ্য!

আমরা অবশ্য যেতে খুবই ইচ্ছুক ছিলুম এবং মানুষ মরার খবরও কিছু পাইনি। কাশী থেকে একজন কনেষ্টবল এসেছিল, সে পঞ্চুকে চিনে বল্লে, "মহারাজ! এদিকে আর আসবেন না, লোক ছাড়া হচ্চে না; অথচ ভিড়ের মধ্যে পড়লে বেরুনোও দায় হবে।"

তখন পূর্ব্বের মতই বাহাল হল। অর্থাৎ ব্রহ্ম-কুণ্ডে স্নানের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা তার যতটা কাছাকাছি পাওয়া গেল, এক প্রায় জনশূন্য ঘাটে স্নান করতে নেমে পড়লুম।' ব্রহ্মকুণ্ডের জল তখন জনহীন। চারিদিকে কড়া পাহারা। সন্ন্যাসীর দল আসন্নপ্রায়। শুনলুম ব্রহ্মকুণ্ডের উপরের চারতলা বাড়ীর কোন জানালায় ইউ, পির লাটসাহেব নিজে উপস্থিত আছেন। সেই জন্যেই হয়ত জনতার উপর রক্ষীদের ব্যবহার এতটা মোলায়েম! এতক্ষণে সেটা বোঝা গেল।

পঞ্চুর চেষ্টায় আমরা জল দিয়ে গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডেই

স্নান করে এসে মা গঙ্গার বাঁধা চাতালে চাকরদের এনে রাখা কাপড় চোপড় ছেড়ে জল খেয়ে সেইখানেই বসে রইলুম। ঠিক তার পাশেই জোড়াপুল। তারই উপর দিয়ে সাধুরা স্নানে আসবেন। আমাদের দেখা-দেখি আরও অনেকেই এই পথ ধরে নিলে।

অল্প পরেই সাধুর দল দেখা দিলেন। পুলের উপর হাতী ঘোড়া প্রভৃতি তো আর ওঠানো চলে না, কাযেই ছত্রধারীর হাতে বড় সোণার ছাতা মাথায় দিয়ে পায়ে হেঁটেই সর্ব্বপ্রথম যিনি দেখা দিলেন, লোকে বল্লে তিনিই নাকি কেদারের মোহান্ত! ঠিক জানি না তিনি কে, তবে একজন ধনীলোক বটেন! সঙ্গেও লোকলস্কর বিস্তর। তার পর ক্রমে ক্রমে অনেকেই সদলবলে পুল পার হয়ে এসে ব্রহ্মকুণ্ডে নেমে জলস্পর্শ ক'রে উপরে উঠে চলে যেতে লাগলেন। আখড়াধারী মোহান্তদের কারু পাল্কী রূপোয় কারু সোণায় মোড়া, সোণা রূপোর আশাশোটা, চামর, ছাতা, আড়ানি, সঙ্গে কারু দশ হাজার, কারু দু' হাজার, কারু এক হাজার কারু দু'পাঁচ শো চেলা আছে। এঁদের মধ্যে কত সম্প্রদায়ই আছে। রামাৎ নিমাৎ বৈষ্ণব, গিরি পুরী ভারতী সন্ন্যাসী, অবধূত ব্রহ্মচারী দণ্ডী পরমহংস পরি-ব্রাজক গোস্বামী আখড়াধারী নির্ম্মলী নির্ব্বাণী মালাধারী বৈরাগী উদাসীন নাগা—আরও কত কি সব জানিও না! সবচেয়ে বড়দল দেখলুম নাগা এবং উদাসীন বা বৈরাগীদের। নাগারা একেবারেই উলঙ্গ, অনেকেই বেশ শান্তমূর্ত্তি, যথার্থ ত্যাগীর মত বলেই মনে হতে লাগলো। যেন দীর্ঘাকার নির্ম্মল শিশুর দল চলেচে, এর বেশী কিছু মনে হয় না। সহসা মনে হ'ল এইত মানুষ! এত চাইবার মধ্য থেকেও এদের তো একখণ্ড কৌপীনও চাইবার দরকার হচ্চে না! আর আমরা দ্রৌপদীর বস্ত্রস্তূপে আবৃত থেকেও আরও চাই বলে অশান্তিতে অস্থির হচ্চি।

বাস্তবিকই মানুষের অভাব বড়ই কম। কিন্তু অভাবটাকে আমরা নিজেরা ইচ্ছে সাধে তৈরি করে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করতেই ভালবাসি। তাই আমাদের ভাল লাগে। নইলে একপেট খাওয়া আর দু'খানা কাপড় এই সবশুদ্ধ আমাদের দরকার। আবার কেউ কেউ তাও চায় না। না জানি কত মহামহা তপঃসিদ্ধ পুরুষ ভক্ত সাধক সাধুসন্ত এদের মধ্যে আছেন, এই ভেবে তাঁদের উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম করলুম। সংখ্যায় এই নাগার দল অনেক। কেউ কেউ বল্লে এদেরই সংখ্যা প্রায় লাখ খানেকের কাছে। হতেও পারে। তবে এদের চাইতেও বড় দল ছিল বৈরাগীর, তারা সবাই প্রায় সশস্ত্র! মেয়ে সাধুনীদেরও বেশ পুষ্ট রকম একটা দল দেখা দিলে। হাতে গলায় রুদ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষ তুলসী বা পদ্মবীজের মালা, এলো চুল, গেরুয়া পরা যেন মা কালীর সঙ্গের ডাকিনী যোগিনীদের মতন ঊর্দ্ধমুখে সব ছুটে চলেছেন। দেখে বাপু তেমন শ্রদ্ধা হল না। কেন? তা কি করে বলবো যে কেন হল না। আমার মত হয়ত অনেকটাই শঙ্করাচার্য্যের মতন। বুদ্ধদেবের অত বড় ত্যাগের ধর্ম্মটাকেই এই সব শ্রমণ শ্রমণারাই ভৈরবী চক্রের তলায় ফেলে কি কুৎসিত কাণ্ডই না করে তুল্লেন! আবার চৈতন্যদেবের তেমন প্রেমের ধর্ম্মে টেনে আনলে কি না শেষে নেড়ানেড়ী! অবশ্য এর জন্যে এরাই যে শুধু দায়ী নয়, তা জানি। কিন্তু আমি 'অবলা' 'সরলা' 'অসহায়া' এসব শব্দ মেয়েদের পক্ষে ব্যবহার করি না, আমি মনে করি তারাই চণ্ডী, তাদেরই মধ্যে দুর্গতিনাশের মহাশক্তি আছে। তারা তার অপব্যবহার না করতে দিলে, কার সাধ্য তাঁকে নিয়ে হেলফেলা করে!—তোমাদের মেয়েদের তোমরা এই শিক্ষাই গোড়া থেকে দিও যে, নারী অবলা জীব নয়, নারীজন্ম অধম জন্ম নয়। নারীশক্তি জগতের সর্ব্বশক্তির মূলীভূত আদ্যাশক্তি। তারা মা, তারা জীবজননী। ছোট বেলা থেকে নিজেকে মা বলে চিনতে শিখলে সে মেয়ের মধ্যে মাতৃত্বটাই প্রবল হয়ে উঠবে, আর সে নিজেকে সখীভাবে দেখতেই পারবে না। এটা খুব সত্য জেনো।

এই জন্তেই আমাদের দেশে—যেখানে নারীর মাতৃত্ব-কেই সবচেয়ে বড় করে সম্পূজিত হয়েছিল,—সেখানে

মেয়েদের কচি বয়স থেকেই বুড়ো আত্মীয়রা—বাপ কাকা মেসো পিসেরা—সবাই মা বলে ডেকে, নিজেদের তাদের কাছে ছেলে করে তুলে, এই ভাবটাই অতি শৈশব থেকে তাদের মনের মধ্যে মুদ্রিত করে দেয়। এ শিক্ষার মতন বড় শিক্ষা আর একটিও নেই। শৈশবে বড় বড় 'ছেলে' পেলে ছোট মেয়েদের মনে কত গৌরব বোধই যে হয়, সে আমি খুবই জানি! আমাদের ছাপাখানার লোকেরা, বাড়ীর সরকার গোমস্তা এবং দাদাবাবুর প্রতি-পাল্য অনেকেই আমায় ছেলেবেলায় কেউ মা কেউ মাসি বলে ডেকে কত যে পাণ সুপুরি আদায় করেচে তার হিসেব নেই। তাদের অসুখ করলে আমার মনে আর স্বস্তি থাকতো না। তার পর চিরদিনই দেখচো তো আমি ছোট বড় কত লোকেরই মা।

তাই বলে কি মেয়েরা ধর্ম্মের পথে আসবে না? সে কি কথা! আসবে বৈ কি! তবে অত ঘটা ক'রে না এলেও চলে, এই আর কি! এঁরা যদিই বা অমনি চলচেন, তো তাঁরা চলেছেন ছুটে! এ যেন বলা—"আগে চল্ আগে চল্ ভাই"—পিছিয়ে পড়তে এযুগে কোন মেয়েই অবশ্য রাজী নন। তাঁদের ছুটে চলাও হয়ত কারু কারু চোখে ঐ রকমই অশোভন ঠেকে।

আর একটা জিনিষ এইখানে লক্ষ্য করবার আছে।—'তীর্থ ভ্রমণ' পুস্তকের লেখক ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে যে কুম্ভ স্নানে উপস্থিত ছিলেন, তাতে তদানীন্তন এ দেশী রাজা মহারাজাদের কুম্ভস্নান সম্বন্ধে বর্ণনাগুলি তাঁর পুস্তক থেকে পাঠ করলে এ দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচি পরিবর্ত্তনের কি উজ্জ্বল চিত্রই চোখের উপর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! ভারতীয় ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশীয় শিল্পিগণের আশ্রয়দাতা, দেব দ্বিজ ভক্ত, দরিদ্র নারায়ণের সেবাপরায়ণ হিন্দু রাজারা আজ বিলাত প্রবাসী, পোলো-ক্রিকেট বীর, বিলাতী বিবি ঘটিত মোকদ্দমার আসামী, শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহের খাতিরে নিজের দেশভূমি সিংহাসনে জলাঞ্জলিদান-কারী! তাঁদের তীর্থ ধর্ম্ম সমস্তই এখন ইয়োরামেরিকায়! দান ধর্ম্মার্থ না হয়ে অধর্ম্মার্থই বেশী। সাহেব ভোজনেই তাঁদের ব্রাহ্মণ ভোজনের কুটুম্ব ভোজনের ও কাঙ্গালী ভোজনের সমস্ত ফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে! "তীর্থ ভ্রমণ" থেকে একটু তুলে দিচ্ছি, তাতে দেখো রাজারা তখনও রাজার মতই চলতেন। তাতে এদেশের কতগুলি সুকুমার শিল্প পুষ্ট হতে পেতো সেটাও লক্ষ্য করো। এক সোণা রূপোর কারুকার্য্য! দুই মুলতানী বনাত, তাতে কারচোবের কায, রেশমী কাপড়ে সোণার তারের কায (তারকুশীকার চোব) মুলতানী জোড়, শালের জোড়া। পাল্কী তঞ্জারাম চতুর্দ্দোলা এসবও মোটর ব্রুহ্যামের স্থানে এদেশেই তৈরী হতো। তাতে এদেশী কারিগর অন্ন পেত। নিত্য নূতন নব সভ্যতার স্রোত আমাদের দেশকে যে কি ক'রে ধুয়ে মুছে সাবাড় করে দিচ্চে, এইটেই আমার সব কিছু থেকেই চোখে পড়ে যায়, এবং বুকের ভেতর করকর করে ওঠে। নূতনের সকল সৌন্দর্য্য ও উপ-কারিতা এর কাছে অসার ও শ্রীহীন মনে হয়। দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং এই বাক্যটী মনে প'ড়ে যায়। "তীর্থভ্রমণ" গ্রন্থে আছে—

"প্রথমতঃ বিকানীরের রাজা স্নানে যাত্রা করিলেন। রাজার সমভ্যারে ত্রিশ হাজার লোক। প্রথমে ঘোড়ার উপর ডঙ্কা, তাহার পর উটের উপর ডঙ্কা, তাহার পর লাল নিশান দুইশত; তাহার পরে খাস গেলাস, ভাল ভাল মুলতানী বনাতে কারচোবের কর্ম্ম, তাহার পর দুইশত স্বর্ণ রূপার আশাশোটা, পঞ্চাশ রূপার ছড়ের বল্লম, পঁচিশ পঞ্জা, দশ ছত্র, অতি উত্তম রেশমী কাপড়ে সোণার তারে তারকুশী কারচোব, স্বর্ণের দাণ্ডি মুক্তার ঝালর এক ছত্র রাজার মস্তকে, আর তদ্রূপ এক আড়ানি, শ্বেতচামর, দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণদাণ্ডি, মোরছোল, তদ্রূপ ত্রিশ হস্তী সুসজ্জিত, পঁচিশ ঘোড়সওয়ার অস্ত্রধারী মায় বন্দুক রাজার অগ্রপশ্চাৎ আর দুই পার্শ্বে রক্ষার্থে আছে। কাপ্তেন ও ম্যাজিষ্টর সাহেব আপন পদাতিকগণ সমভ্যারে লইয়া অগ্রে অগ্রে লোকের ভিড় ঘুচাইয়া দিতেছে। এইরূপে গমন করিয়া সহরের পশ্চিম দিক হইয়া যে পথ দিয়া আর আর সকলে স্নানার্থে আসিয়াছিল, সেই পথ হইয়া

রাজাকে স্নানজন্য আনিয়া হরপিড়ির ঘাটে স্নান করাইয়া, কুশাবাইর ঘাটে পিণ্ডদান করাইবার জন্য আনয়ন করিল। রাজা ঘাটে পৌছিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলেন। নয় সের সোণার নয় পিণ্ডদান, এক হাতী সায় আসবাব, আর ভাল এক ঘোড়া, সুবর্ণের কড়া, মোতির মালা, হীরার অঙ্গুরী, শালের জোড়া, মুলতানী জোড়, পাগ দুপাট্টা, ৩ হাজার মোহর দক্ষিণা দিয়া আপন পাণ্ডাকে তাবৎ দ্রব্য দান করিয়া তক্তারামার উপর উঠিয়া যাত্রা করিলেন। রাণীগণ চতুর্দ্দোলে উঠিলেন। তক্তারামার যোল দ্বার রূপায় নির্ম্মিত, স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদিতে সুশোভিত। আর চতুর্দ্দোলে মুলতানী বনাতের উপর কারচোবের কাযকরা উত্তম ঘেরাটোপে ঘেরা; বাঁশে সোণার মুখ, উপরে সোণার কলস।...কখল যাইবার চৌরাহে পৌছিয়া তথা হইতে কাঙ্গালীদিগের জন্য সিকি আধুলি টাকা ফেলিতে ফেলিতে কখল পর্য্যন্ত পৌছিল। এইমত ক্রমে রাজাদিগের স্নান দান কর্ম্ম সমাপন করাইতে প্রায় রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত হইল।"

ফেরবার পথে রাইবালা ষ্টেশন পার হয়েই আবার সেই মোটরটারই টায়ার ফাটলো! সে টায়ার ফাটা তো তো নয় যেন একটা কামান দাগা! হৃষীকেশের নূতন লাইন তৈরি হয়ে এই ক'দিন থেকে ট্রেণে চলতে সুরু হয়েচে, কাছেই তারই ইঞ্জিনীয়ারের অফিস ও বাংলো। টায়ার ফাটার ভীষণ শব্দে ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের দুটি ছোট ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এক হিন্দুস্থানী আয়া আমাদের দুর্দ্দশা দেখতে এল। দ্বিতীয় মোটর নিয়ে বীরু পঙ্কু এরা ফের হরিদ্বারে ফিরে গেল। এ গাড়ী এবার অচল হয়েছে, অন্য গাড়ী আনতে হবে। আমরা পথের ধারেই দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু তাতেও কিছু বাধা বোধ হচ্ছিল, পথ সেদিন আর নির্জ্জন নয়। গাড়ী ও লোক যথেষ্ট চলাচল করচে।

হরিদ্বার থেকে দেরাদুন পর্য্যন্ত এই যে পথটা আমরা এসেছিলুম, এর দৃশ্য ভারী চমৎকার! এর কোথাও ঝোপঝাপ, কোথাও বন বন, কোথাও আকাশে মাথাঠেকা দেবদারু বাঁশ এবং অসংখ্য জাতীয় গাছ পালা, কোথাও তাদের জড়িয়ে ধরে ফুলের গুচ্ছে ভরিয়ে দিয়ে গোলাপ লতা, মল্লিকা লতা, আরও কত অজানা লতা বন আলো করে রয়েছে। ঝরণা পাহাড় থেকে ঝ'রে প'ড়ে কোথাও একটু চওড়া কোথাও খুব সরু, কোথাও আঁকা কোথাও বাঁকা ভাবে বয়ে গ্যাছে। বালী ও ছোট বড় নোড়ায় ভর্ত্তি করা নদীর জলহীন গর্ভ মধ্যে মধ্যে আছেই! সেগুলোর কোন কোনটায় একটু একটু জলও ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্চে। দু-একটায় আমাদের নেমে নেমে পাথরের উপর দিয়ে দিয়ে পার হ'তে হলো। একটায় ছোট ছোট মাছ কিলবিল করচে দেখলুম।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাংলার কাছে আমাদের রথ-চক্র যখন অচল হল, তখন আমাদের সঙ্গী সেজদা' (পঙ্কুর সেজ ভগ্নীপতি—তিনি মানুষটী বেশ জোগাড়ে আছেন) চট্ করে গিয়ে মেম সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে ফেল্লেন। মেমটী সব শুনে বল্লে, "তা' ওঁরা আমার এখানে এসে বসুন না—দরকার হয় মস্ত বাড়ী, অফিস বাড়ীতে আমরা ব্যবস্থা করে দেবো, একরাত্রি থেকে যেতেও পারেন।"

শুনে একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, তারপর আলাপ হতেই সেটুকু দূর হয়ে গেল। এঁরা বিলাত থেকে এই কাযের জন্যে তিন বৎসরমাত্র এসেছেন, এসে পর্য্যন্তই এই বিজনবাসী। তাঁদের "ভারতীয় সোসাইটী"তে ভাল করে মেশামেশির সুযোগ ত পাননি, তাই 'নেটিব'দের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, সেটা ঠিক জানেন না আর কি! মানুষের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা সঙ্গত, সেইটেই শুধু জানা আছে।

মেমটী তা ছাড়া মোটের উপর লোকও ভাল। আমাদের সঙ্গে খুবই ভদ্রতা করলেন। কি চাই না চাই, জিজ্ঞাসাটা বারে বারেই করলেন। কোথায় থাকি, কোথা থেকে কোথা যাচ্চি, তাঁর স্বামীর তৈরি রেলে হৃষীকেশ যাব কি না, ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়ে দুটীর মধ্যে একটী বছর পাঁচেকের। তার নাম Joy। মেয়েটী বেশ মিশুক। সে তার ছোট

বোনের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করলে। সে নাকি বলে 'আমি তোমায় কামড়ে দেবো', বলেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি খুব জোরে কামড়ায়। যখন কাঁদে, চোক বুজে চেঁচায়, বাবা এসে ডাকলেই কিন্তু চুপ করে। আমাকে খুব মারে, Joy কিন্তু মারে না। আরও অনেক কথা। মেয়েটী তার মাকেও ঢের প্রশ্ন করছিল। তিন বৎসর তারা এখানে এসেছে, তিন বৎসরে কত হপ্তা, সবশুদ্ধ কত দিন ইত্যাদি। মা বল্লেন, "জয়ের এই সব প্রশ্নোত্তর করতে করতে আমি হায়রাণ হয়ে যাই।"

রুণুকে মনে পড়ছিল। বয়সে তফাৎ থাকলেও রুণু মাথায় প্রায় অত বড়ই। আর কথায়ও বড় কম যায় না।

মেমটীর আর সবই ভাল, শুধু ঐ যে সর্ব্বনেশে হাল-ফ্যাসানে ওদের মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে, ঐতেই মাথা খেয়েছে! আমাদের দেশে একদিন "হাঁটু ঢেকে বস্ত্র" কথাটার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জিনিসটার কিছু কিঞ্চিৎ অভাব ছিল বলেই তো। ওদের দেশের উৎপন্ন বস্ত্রে পৃথিবী শুদ্ধর অভাব যদিচ আজ ঘোচাচ্ছে, তথাপি ভাগ্য ওদের জন্যে হয়ত চক্রান্ত করেই ওদের মনে এমনি রুচিটা এনে দিয়ে ওদের এই বস্ত্রাভাবটা ঘটিয়ে তুলে পৃথিবীর হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। আমাদের দেশে গরীবের মেয়েরা অনেক সময় ঘরের মধ্যে গামছা পরেও খানিকটা কাপড় বাঁচায়, এদেরও সেই গামছা পরার মতই দুর্দ্দশা। * একেই বলে কপাল!

তিনখানা মোটরে একসঙ্গেই আবার বার হওয়া গেল। সমাগতপ্রায় সন্ধ্যায় সেই বিজন অরণ্যপথে লোক অর্থাৎ যাত্রী চলাচল প্রায় শেষ হয়েই গেছলো।

* সম্প্রতি আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে পরশুরাম লিখিত স্বয়ম্বরার দেড় হাতি বাঁন্দিপোতার গামছার সঙ্গে মেমেদের স্কার্টের উপমা দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি!

কচিৎ একখানা লরি বা মোটর তখনও হয়ত হুস হুস ক'রে খানিক ধুলো উড়িয়ে দিয়ে উড়ে গেল। আমরাও চল্লুম। নীরব নির্জ্জন বনপথ, চারিদিকে পাহাড়, বন, ঝরণার ক্ষীণধারা, বেতসবন, অসংখ্য নুড়ির স্তূপ, মৃদু জ্যোৎস্নায় অদূরস্থ ধূসর পর্ব্বতমালা যেন অনির্ব্বচনীয় শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করেছিল। আমাদের গাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে দুটো বড় বড় জানোয়ার ছুটে চলে গেল। কেউ বল্লে হরিণ, কেউ বল্লে বাঘ। হয়ত আর কিছুও হতে পারে, কে জানে। এত জোরে দৌড়ে গেল যে, ভাল করে বোঝাই গেল না। সকালবেলায় এই পথে কত রকম পাখীর গান, বানরের ছুটোছুটি দেখা শোনা গেছলো, এখন তারা সব সুপ্তিমগ্ন। চাঁদের আলোয় ক্রমে ক্রমে সমস্ত বনভূমি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। পাহাড়গুলোর মাথায় যেন রূপালী আভা ছড়িয়ে পড়লো, নদীর বালি ঝরণার জল, সব রৌপ্যময়! মাঝে মাঝে জোর বাতাসে যেন অচেনা ফুলের গন্ধ ভেসে উঠ্‌ছিল।

বাড়ী পৌছতে রাত প্রায় সাড়ে আটটা হল। পর দিন হরিদ্বার ফেরৎ কারু কারু কাছে শোনা গেল, কাল ভিড়ের চাপে ৮৪ জন লোক মরেছে। তাছাড়া একটা পুল ভেঙ্গে পড়ে কয়েক জন লোক মারা গেছে, ১১৯ জনের মৃত দেহ পাওয়া গেছে। কিছু ভেসে যাওয়াও তো অসম্ভব নয়! ঐ অত স্রোত রয়েছে জলে।

ট্রেণেও নাকি ঐ দিনে চাপাচাপিতে দু চার জন মরেচে। তবু ষ্টেসনে খুব সতর্কতা ও সুবন্দোবস্ত শোনা যাচ্ছে। প্রথম দিন আমরা যখন ট্রেনে যাই, তাতে দেখেও ছিলেম।

তুমি কবে মজঃফরপুরে আসচো? চিঠিপত্র শীঘ্র শীঘ্র লিখ।—তোমার মা।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার

সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরাক্রান্ত রাজা রংসান গম্পোর রাজত্বকালে তিব্বতে রাজকীয় ও জাতীয় ধর্ম্ম রূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম বিস্তার লাভ করে। সম্রাট ধর্ম্মাশোকের সময়ে তাঁহার আদেশে তাঁহার দীক্ষাগুরু উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার কথা তিব্বতে প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুবাদ না থাকায়, এবং সর্ব্বসাধারণের বন ধর্ম্মে (ভূতপ্রেত পূজা) অনুরাগ—এই দুইটী কারণে বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম সে দেশে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ আরম্ভ হয়। সে সময়ে কুমারজীব ও তাঁহার সহকারী বিমলাক্ষ তিব্বতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে "খুঃ—সি" (Khu-tsi) পরগণায় কিছু কাল বাস করেন। তখন তাঁহারা সর্ব্বাস্তিবাদী মতে বিনয়শাস্ত্র, এবং অমিতাভ সূত্র প্রভৃতি বহু পুঁথি লিখেন ও অনুবাদ করেন। কুমারজীব ও তাঁহার সহকারিগণ তিন শতেরও ঊর্দ্ধ নানা শ্রেণীর পুথি অনুবাদ করিয়া উভয় দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পথ সুগম করিয়া গিয়াছিলেন। উপগুপ্তের পর প্রচারকগণ সর্ব্বদাই তিব্বতে গিয়া ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে প্রকৃত সফলতার ইতিহাস জানা যায় এবং এই সফলতা দুইটী রমণীর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। ইঁহারা রাজা রংসান গম্পোর মহিষীদ্বয়। সে সময়ে সমগ্র উত্তর ও পূর্ব্ব আসিয়া খণ্ডে অসীম ক্ষমতাশালী এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া রাজা রংসান গম্পো বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ একান্ত আগ্রহের সহিতই তাঁহার সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। চীন সম্রাট তাইসুঙ (Tain-tsnng) তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা রাজকুমারী কিম্ সিং কাঙ্গোকে তিব্বত-রাজের সহিত বিবাহ দিয়া সখ্যতা স্থাপন করেন, এবং নেপালের অধীশ্বর অংশুবর্ম্মাও তাঁহার একটী কন্যা তাঁহাকে অর্পণ করিয়া বৈবাহিক সূত্রে বন্ধুতা স্থাপন করেন। এই দুইটী রাজকুমারীর চেষ্টাতেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম সে দেশের রাজা প্রজা সকল শ্রেণীর লোকেরই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে দুইটী রমণীর চেষ্টায়, ভিন্ন একটী দেশে, নবীন মত ও নব ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এক অভাবনীয় ব্যাপার। জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা আছে বলিয়া জানি না। রাজকুমারীদ্বয়ের ভগবান বুদ্ধদেবে অচলা ভক্তি এবং বৌদ্ধধর্ম্মে অসীম বিশ্বাসই নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের মূল কারণ। এই নেপাল ও চীন রাজকুমারী দ্বয়ের অদম্য আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে রাজা রংসান গম্পো বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর পরম উৎসাহে মহিষীদ্বয় রাজার সহায়তায় মন প্রাণে সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মের বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। এই চেষ্টার ফলে সমগ্র জাতি মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। *

রাজা রংসান গম্পো ৬২৯ খৃঃ হইতে ৬৫০ খৃঃ বাইশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুযায়ী রাজ্যশাসন ও ভগবান বুদ্ধদেবের দশবিধি অনুযায়ী শাসনপ্রণালী বিধিবদ্ধ হয়। সে সময়ে তিব্বতের নাম ছিল হিমবৎ। হিমবতের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া তিনিই রাজকীয় পরিচ্ছদাদি এবং সকল অনুষ্ঠানেই

* "King Srong-tsan-gampo of Tibet ruled from 629 to 650 A. D. He introduced first the art of writing. He and his two wives made Buddhism supreme and state religion. He was first to exchange ambassadors with Gandhar, Nepal, Khotan and other kingdoms."

S. Das (Land of Snow)

গুপ্তবর্ণ প্রচলিত করেন, আজও সেই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। রাজার ক্ষমতা ও সদ্গুণে হিমবতের খ্যাতি বৃদ্ধি হওয়ায় দূর দূর দেশের রাজগণ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁর দরবার হইতে নেপাল গান্ধার খোটান প্রভৃতি স্থানে রাজ-কর্ম্মচারিগণ প্রেরিত হইতেন এবং তাঁহাদের অবস্থানের নিয়মও প্রচলিত হয়। অন্যান্য দরবারের রাজদূতগণও আসিতেন। সে সময় পর্য্যন্ত তিব্বতে লিখিত ভাষা মধ্যে সংস্কৃত প্রচলিত না থাকায় ভিন্ন ভিন্ন রাজদরবারের সহিত আলাপাদি ভাব বিনিময় মৌখিক হওয়া ব্যতীত উপায় ছিল না। এই অসুবিধা এবং ধর্ম্ম প্রচারে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও প্রচার জন্য দেবভাষায় লিখন পঠন শিক্ষায় আব-শ্যকতা উপলব্ধি করিয়া রাজা এই অভাব মোচন জন্য তাঁহার কর্ম্মচারী মধ্যে বুদ্ধিমান সাতটী যুবক কর্ম্মচারীকে বাছিয়া দেবভাষার লিখন পঠন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। শীতপ্রধান দেশের লোক ভারতবর্ষে আসিতে ভয় পাইত। তিব্বতীদের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে ভারতবর্ষ অগ্নিতুল্য স্থান, হিংস্রজন্তু ও বিষধর সর্পে পূর্ণ, জ্বর রোগের আবাসভূমি—ইহা ছাড়া ভূতের ভয় ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় প্রেরিত যুবকগণ হিমালয় হইতেই দেশে ফিরিয়া যায়। ইহারা ফিরিয়া যাওয়ার পর রাজা বহু চেষ্টায় তাঁহার মন্ত্রী অনুর পুত্র বুদ্ধিমান ও সাহসী যুবক "থন্‌-মি"কে লিখনবিদ্যা ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। থন্‌মির সঙ্গে ভারতীয় রাজাদের ও পণ্ডিতদের উপহার দিবার জন্য রাজা প্রচুর পরিমাণ সোণা দিয়াছিলেন। থন্‌মি ভারতবর্ষে পৌছিয়া উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধানে জ্ঞানী পণ্ডিত এবং লিখনবিদ্যা পারদর্শী লিপিদত্তের যশ শুনিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "দেব, আপনি ওঁকারের প্রতিরূপ, ভাষা ও শব্দ দেবতার অংশে পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি দয়ার অবতার স্বরূপ। আমি অতি দীন, হিমবৎবাসী, আমার দেশের লোক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, লিখিতে পড়িতে পর্য্যন্ত জানে না। আমি হিমবতের রাজার মন্ত্রী, তিনি আমাকে এই দূর দেশে আপনাদের চরণপ্রান্তে বসিয়া লিখনপ্রণালী শিখিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। দয়া করিয়া এ অধমকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া লিপিবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে দেবভাষা শিক্ষাদান করিয়া কৃতার্থ করুন এই প্রার্থনা।"

থন্‌মির সুমিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া লিপিদত্ত তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া একান্ত স্নেহের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মেধাবী যুবক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে লিখনবিদ্যা শিক্ষা করণান্তর, সংস্কৃত ভাষায় কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার কাম-নায় শ্রীনলন্দা বিহারে গেলেন। তথায় কালবিলম্ব না করিয়া আচার্য্য দেববিদ্ সিংহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া একাগ্র মনে গুরুর নিকট শাস্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। থন্‌মি যে সময়ে নলন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য দেববিদ্ সিংহের ছাত্র, সেই সময় বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিউন সাং নলন্দায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী * হইতে জানিতে পারি, শ্রীনলন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যীশু খৃষ্টের জন্মের একশত বর্ষ পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত নাগার্জ্জুনের গুরু "সুরাহা"র আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনার ফল। পর পর মগধ রাজগণ ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। হিউন লিখিয়াছেন, সে সময়ে নলন্দা বিহারে দশ হাজার ছাত্র ও শিক্ষক নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় রাজকোষ হইতে দেওয়া হইত। দেশ দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থী এখানে আসিতেন। জগতে অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় শ্রীনলন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন।

থন্‌মি দেশে ফিরিয়া লিখন-কৌশল প্রচলন করেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রংসান গম্পোর মহিষী-দ্বয়ের চেষ্টায় রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু এই লিখনবিদ্যা প্রচলনের পরই শাস্ত্রাদির অনুবাদ ও তৎসাহায্যে ৮ম শতাব্দীতে বিশেষ ভাবে সর্ব্ব শ্রেণীর লোক মধ্যে ইহা গৃহীত হইয়াছিল। প্রচার কার্য্য এই সময় হইতে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। রাজা থাইসং দেন্ সাং

* Rev. S. Beal's translation.

(Thi-srong-den-tsan) ভারতবর্ষ হইতে খ্যাতনামা পণ্ডিতদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহে ও তাঁহার উৎসাহ এবং অজস্র অর্থব্যয়ে শত শত পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও অসংখ্য পুঁথি অনুবাদ করেন।

এই উদ্দেশ্যে তিব্বত-রাজের নিমন্ত্রণে সর্ব্ব প্রথম যিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন তাঁহার নাম "শান্ত রক্ষিত"। তিনি শ্রীনলন্দা বিহারের প্রধান আচার্য্য এবং মগধরাজের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। রাজা থাইরঙ, শান্ত রক্ষিতকে রাজোচিত সম্মানে গ্রহণ করেন ও যথোচিত সম্মান জন্য তাঁহাকে অনতিবিলম্বে তিব্বত রাজ্যের প্রধান আচার্য্য ও জগদ্‌গুরু পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মান্তর্গত ভিক্ষুদিগের মধ্যে "লামা" পদবীর সৃষ্টি করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর সহকারী রূপে বৌদ্ধমত তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তন্ত্র শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত "পদ্ম সম্ভব" গিয়াছিলেন। তিব্বতে ইঁহারা যখন অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহাদের সাহায্য জন্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত "কমলা শীল" তিব্বতে গিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। তিনি বৌদ্ধ দর্শনে মগধের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করায়, দেশময় ইহা বিস্তারলাভ করিতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে তিব্বতের ধর্ম্মাত্মা রাজা "রাল্‌পচান" (Ralphchan) বঙ্গদেশের বহু পণ্ডিতকে * সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ নিচয় তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য সমাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। তাঁহার উৎসাহ, তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও তাঁহার অজস্র অর্থব্যয়ে শত শত পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া অসংখ্য পুঁথি অনুবাদ করিয়া তিব্বতের গ্রন্থাগার পূর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ।

---

* ভারতবর্ষের পণ্ডিত যাঁহারা এই সময় তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার এবং সংস্কৃত পুঁথি সমূহ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন তাঁহাদের নাম শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, ধর্ম্মকীর্ত্তি, বিমলা মিত্র, বুদ্ধগুহ, শান্তিগর্ভ, বিশুদ্ধসিংহ, কমলাশীল, কুমার, শঙ্কর ব্রাহ্মণ, নেপালের শীলামঞ্জু, অনন্তবর্ম্মণ, কল্যাণ মিত্র, জিনা মিত্র, সুরেন্দ্রবোধী, শীলেন্দ্রবোধী, দীনশীল, বোধিমিত্র, মুনি বর্ম্ম, সর্ব্বজ্ঞদেব, বিদ্যাকর প্রভা, শ্রদ্ধাকর বর্ম্ম, মুক্তিমিত্র, বুদ্ধশ্রী, বুদ্ধপাল, ধর্ম্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, সুবাসিত, প্রজ্ঞাবর্ম্ম, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দানশ্রী, স্মৃতিজ্ঞানকীর্ত্তি, সত্য শ্রী, কাশ্মীরের জ্ঞানশ্রী, চন্দ্রবাহুকা, ধীরপাল, অতুল্যদাস, সুমতি কীর্ত্তি, অমরচন্দ্র, বিন্দুকুম্ভ, কুমার কুম্ভ, কনক বর্ম্মা, জয়ন্ত, গয়াধারা, অমোঘ বজ্র, সোমনাথ, জ্ঞানবজ্র, প্রজ্ঞাগুহ, মহাযান বজ্র, বালচন্দ্র, মন্ত্রকালুক, সুগতশ্রী, জামারি, বৈরোচন, মঞ্জুঘোষ, সূর্য্যকীর্ত্তি, প্রজ্ঞা শ্রীজ্ঞান, গঙ্গাধারা, ধনগুপ্ত, সামন্তশ্রী, নিষ্কলঙ্কদেব, মিত্র নন্দী, বুদ্ধশ্রীজ্ঞান, কাশ্মীরের শাক্য শ্রীভদ্র, বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, সত্যশ্রী, সম্ভোগ বজ্র, রত্নশ্রী (নেপালের মহারাজ), নেপালের বজ্রকীর্ত্তি, নেপালের গয়াশ্রী, নেপালের কীর্ত্তি, কুমার, সনাতনশ্রী, সাধুকীর্ত্তি, বিনয়শ্রী, শীলা শ্রী, মণ্ডলশ্রী, বিমলাশ্রী, দর্পণাচার্য্য, জয়দেব, লক্ষ্মীকর, রত্নশ্রী, অনন্তশ্রী, বাহুলশ্রী (তাম্রদ্বীপের একজন গুরু) কীর্ত্তি পণ্ডিত এবং অন্যান্য।

* Rev S. Beal's Buddhist Literature.

বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"After the religious zeal and energies of the Western and North-western India had paralyzed, if not altogether extinct, the superior intellect of the people of Bengal shone pre-eminently in the domain of Philosophy and religion. The Pandits of Bengal became the spiritual teachers of the Buddhist World. The sovereign rulers of E. India, Tibet, Ceylon and Subarnabhumi vied with each other in showing veneration

নব বসন্ত

বৃদ্ধ স্বামীরে কহিল তাহার তরুণী ভার্য্যা আসি
"নব বসন্ত নেমেছে ধরায়, দেখনা কি শোভারাশি !
কোকিলের ডাকে মরি কি মাধুরী ছড়ায়ে পড়েছে আজ !"
স্বামী কহিলেন, "তা বটে, কিন্তু হল কি ঘরের কায ?"

তরুণী কহিল, "শোন শোন ঐ ভ্রমর গাহে কি গান—
ফুর ফুর বহে মলয় পবন দুরু দুরু করে প্রাণ,
হাসিয়া হাসিয়া লুটোপুটি যত কাননে কুসুম ফুল।"
স্বামী কহিলেন "তা, বটে, এখন তোল দেখি পাকাচুল।"

দীর্ঘ নিশাস ছাড়ি' অভিমানে তরুণী কহিল তাই
"বুঝিলাম তুমি অতি অরসিক, রসবোধ কিছু নাই।"
"তাও বটে," স্বামী হাসিয়া এবার কহিলেন মৃদু ভাষে—
"মনে বসন্ত না এলে কভু কি বনে বসন্ত আসে ?"

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।

জাপান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় জাপানকে "নবীন এসিয়ার জন্মদাতা" বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই ইহা আধুনিক জগতের ইতিহাস পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন। প্রাচ্যদেশীয় জাতিসমূহের মধ্যে একমাত্র জাপানীরাই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘে সম্মানের আসন পাইয়াছে। এই জাপানীরাই গাঢ় তিমিরাবৃত প্রাচ্যদেশে নূতন উষার সৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বিস্ময়-চকিত দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে জাপান কি করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে এত দ্রুত উন্নতিলাভ করিল সে রহস্যভেদ করিবার জন্য ঔৎসুক্য একান্ত স্বাভাবিক। প্রতিবেশী জাপানের ইতিহাস হইতে অধঃপতিত ভারতের অনেক শিখিবার আছে। জাপানের এই দ্রুত উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া হয়ত আমরা নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান বিষয়ে অনেক আলোক পাইতে পারিব।

প্রাচীনকালে ভারত ও জাপান নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিল। ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতাই জাপানকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। যেদিন জাপানের অধিবাসিগণ প্রভু বুদ্ধের অপূর্ব্ব ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেদিন হইতে ভারতবর্ষ ভগবান তথাগতের জন্মভূমি রূপে তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। কেবল ধর্ম্ম দ্বারাই নহে—শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারাও ভারতবর্ষ জাপানকে সভ্যতার উন্নতস্তরে আরোহণ করিতে অনেকে সাহায্য করিয়াছে। সুখের বিষয়, জাপান ভারতের নিকট তাহার এ ঋণের কথা কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ জাপানী পণ্ডিত Junjiro Takaksu এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

"Japanese classical music owed its origin chiefly to India. Indian deities are worshipped by the Japanese masses together with Buddha." *

প্রাচীন জাপানী সঙ্গীতের আদর্শ প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ভারতের দেবদেবীগণ বুদ্ধদেবের সহিত জাপানী জনসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন।

জাপানী ভাষায় প্রচলিত অনেক শব্দ ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মিঃ টাকাকুসু (Takaksu) তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

Such words or so numerous that there is practicaly no limit to my invesigation of the subejct."

(এরূপ শব্দের সংখ্যা এত অধিক যে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে গেলে তাহা আর শেষ হইবে না।)

বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির পরে বর্ত্তমানে ভারত ও জাপান আবার মৈত্রী-বন্ধনে বদ্ধ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া Kakujo Okakura আনন্দপ্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"And now in spite of the separation of ages, Japan is drawn closer than ever to the motherland of thought." তাঁহার এই উক্তি সার্থক হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

"জাপান" নামটি বিদেশী প্রদত্ত। জাপানীরা তাহাদের দেশকে Dai Nippon নামে অভিহিত করিয়া থাকে। চৈনিকগণ Nipponকে Chipangu নাম দিয়াছে। এই Chipangu হইতেই জাপান নামটির উৎপত্তি।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন পরিভ্রমণ শেষ করিয়া মার্কো-পোলো (Marcopolo) যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে জাপানের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত করেন। তিনি আসিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, চীনের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রমধ্যে 'চিপানগু' নামক দ্বীপপুঞ্জ আছে। সেখানে শ্বেতবর্ণ এক সভ্য স্বাধীন জাতি বাস করে, তাহারা পৌত্তলিক। ঐ সকল দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর স্বর্ণ পাওয়া যায়।—মার্কোপোলোর এই বর্ণনা পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় আবিষ্কারকদিগকে খুবই প্রভাবিত করিয়াছিল। কলম্বস Toscanelliর অঙ্কিত যে মানচিত্র অবলম্বন করিয়া সমুদ্র যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে চিপানগুর স্থান সন্নিবিষ্ট ছিল। কলম্বস ও তাঁহার পরবর্ত্তী আবিষ্কারকগণের এই সুসমৃদ্ধ প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জে আসিবার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহ কাহার দ্বারা কি ভাবে সফল হইয়াছিল, আমরা সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু জাপানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লইয়াই আলোচনা করিতে চাই।

খ্রীষ্টোত্তর ২৮৪ অব্দে চীন দেশ হইতে জাপানে লিখনপদ্ধতি নীত হয়। ইহার পূর্ব্বে জাপানে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। জাপানের ইতিহাসলেখক মিঃ চেম্বারলেনের মতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানের ইতিহাস সঠিক ভাবে পাওয়া যায়। জাপানের ষোড়শ সম্রাট নিন্‌টোকু (Nintoku) ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সময়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা সমূহের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য জাপানের বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় হইতে আমরা জাপানের ধারাবাহিক ইতিহাস পাইয়া থাকি। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ৬৬০ অব্দে জিম্মু জাপান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীঃ পূঃ ৬৬০ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সহস্র বর্ষ কালকে জাপানের প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে জাপানী পৌরাণিক কাহিনীগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ঐ সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া যে ইতিহাস রচিত হয়, ইতিহাস হিসাবে যে তাহার খুব বেশী মূল্য আছে তাহা নহে। পৌরাণিক কাহিনীগুলি সকল দেশেই অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট এবং অনেক অংশে নিছক কল্পনা-প্রসূত।

জাপানীদের দুইখানি প্রাচীন ইতিহাসও আছে।

একখানির নাম কোজিকি (Kojiki অর্থাৎ প্রাচীন বিবরণ), অপরখানির নাম নিহোন্‌জি (Nihonji অর্থাৎ জাপানের ইতিবৃত্ত)। এই দুইখানা ইতিহাসই অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল। সম্রাট্ তেম্মু (Temmu ৬৭৩—৬৮৬ খৃঃ) ও তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সম্রাজ্ঞী জেম্মোর (Gemmyo) তত্ত্বাবধানে কোজিকি রচিত হইয়াছিল। ৭১১ খৃষ্টাব্দে ইহার রচনা-কার্য্য শেষ হয় এবং ইহার ৯ বৎসর পরে নিহোন্‌জি রচিত হয়। এই দুই গ্রন্থের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও নিহোন্‌জিতে চৈনিক প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। কোজিকি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত জাপানের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। নিহোন্‌জি সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে।

এই দুইখানি ইতিহাস ব্যতীত প্রাচীন শিন্টো ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ ইয়েন্‌জি-সিকি (Yengishiki) হইতে প্রাচীন জাপানী ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়।

কি দেশীয় কি বিদেশীয় কোন ঐতিহাসিকই ইহাদের বর্ণিত ঘটনাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। এই সকল গ্রন্থের ভিতরে নানাস্থানে অতিরঞ্জন দোষ ঢুকিয়াছে। কোজিকি ও নিহোন্‌জিতে বর্ণিত জাপানের আদিম নৃপতিদের আয়ুষ্কাল এত দীর্ঘ যে তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ঐতিহাসিককে খুব সাবধানতা সহকারে ঐ সকল উপকরণ ব্যবহার করিয়া জাপানের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

৪

জাপানের উৎপত্তি সম্বন্ধে জাপানী পুরাণে এইরূপ কাহিনী আছে;—এই মাটির পৃথিবী যখন তৈয়ারী হয় নাই, তখনকার কথা। তখন পাহাড় পর্ব্বত গাছপালা কিছুই ছিল না, চারিদিকে অতল সমুদ্র।* ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ শূন্যে অবস্থিত সেতুতে দণ্ডায়মান হইয়া দেব ইজানাগি (Izanagi) ও তাঁহার ভগিনী দেবী ইজানামি (Izanami) চারিদিক্ দেখিতেছিলেন। নীচে কোথাও মাটি আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মণিমুক্তাখচিত বর্ষাটি সমুদ্রের ভিতরে নিমজ্জিত করিলেন। যখন মাটি না পাইয়া বর্ষাটি তুলিয়া লইলেন, তখন তাহার অগ্রভাগ হইতে যে কয় ফোঁটা জল পড়িল সেগুলি একত্র হইয়া একটি দ্বীপে পরিণত হইল, উহার নাম হইল ওনোগোরো (Onogoro অর্থাৎ নিজে নিজে জমাট বাঁধান দ্বীপ)। তখন ইজানাগি ও ইজানামি ঐ দ্বীপে অবতরণ করিয়া একটি বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। ইজানাগি ও ইজানামির সংযোগে বহু দ্বীপের উৎপত্তি হইল। ঐ দ্বীপ-সমষ্টিই জাপান রাজ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

ইজানাগির ঔরসে ও ইজানামির গর্ভে বহু দেব-দেবীর জন্ম হয়। তাঁহাদের শেষ সন্তান অগ্নিদেবের জন্মের পর দেবী ইজানামির মৃত্যু হয়। দেব ইজানাগি তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যু-পুরীতে তাঁহাকে আনিতে চলিয়া যান। গ্রীক্ পুরাণ বর্ণিত Orpheus ও Eurydiceর কাহিনীর সহিত জাপানী পুরাণের এস্থলে কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুপুরীতে (গ্রীক্ পুরাণের Hades) দেবী ইজানামির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে বহির্দ্বারে কিয়ৎ-কালের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া ইজানামি মৃত্যুর অধিপতির (গ্রীক্ পুরাণের Pluto) সহিত পরামর্শ করিবার জন্য চলিয়া যান। ইজানাগি পত্নীর বিলম্বে অধীর হইয়া নিজের মাথার চিরুণির একটি দাঁত পোড়াইয়া ফেলিলেন। অমনি ইজানামির শবদেহ পচিয়া পূতি-গন্ধময় হইয়া গেল। নৈরাশ্য প্রপীড়িত ইজানাগি মৃত্যু-পুরীর অপবিত্রতা হইতে নিজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকুশি (Tsukushi) নামক দ্বীপস্থিত নদীতে স্নান করিলেন। স্নানকালে তাঁহার পরিত্যক্ত বস্ত্র ও বিভিন্ন অঙ্গ হইতে বহু দেব দেবীর উদ্ভব হইল। ইহাদের মধ্যে তাঁহার বাম চক্ষু হইতে উৎপন্ন সূর্য্যদেবী আমাতে রাসু (Amat-erasu), দক্ষিণ চক্ষু হইতে উৎপন্ন চন্দ্রদেব ও নাসিকা হইতে উৎপন্ন সুসানো-ও (Susa-no-o) সমধিক

প্রসিদ্ধ। আমাতেরাসুকে স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করা হইল। চন্দ্রদেবকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া স্বর্গে পাঠান হইল। সুসানো-ওর (দুর্ব্বিনীত পুরুষ) দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ইজানাগি তাহাকে পাতাল পুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। দীর্ঘকাল সুসানো-ও তাহার সন্তান-সন্ততিগণের সহিত আমাতেরাসুর বিবাদ চলিতে থাকে। অবশেষে তিনিই প্রাধান্য লাভ করেন। সূর্য্যদেবী আমাতেরাসু জাপান শাসনার্থ একজন দেব বালককে স্বর্গ হইতে পাঠাইয়া দেন। ঐ দেববালকের বংশ হইতেই জাপান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জিম্মু টেন্নোর (Jimmu Tenno বা দিব্য সাহসবিশিষ্ট স্বর্গীয় সম্রাট্) উদ্ভব হয়।

৫

জিম্মু সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী উক্ত হইল। ঐতিহাসিকের চক্ষে জিম্মু স্বর্গ হইতে আগত দেবতা নহেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, খুব সম্ভবতঃ জিম্মু চীন দেশ হইতে জাপানে আসেন। তিনি জাপানের আদিম অধিবাসী বর্ব্বর আইনুদিগকে পরাজিত করিয়া উত্তর প্রান্তে তাড়াইয়া দেন এবং জাপানে স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কোজিকী ও নিহোন্‌জির মতে খ্রীঃ পূঃ ৬৬০ অব্দে জিম্মু সম্রাট্-উপাধি গ্রহণ করেন। জাপানী সাল ঐ তারিখ হইতে গণনা হইতে থাকে। জিম্মু ৭৫ বৎসর যাবৎ জাপানে রাজত্ব করিয়া ১৩৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। ঐতিহাসিকগণ জিম্মুকে দেবতা বলিয়া না মানিলেও তিনি যে একজন অদ্ভুতকর্ম্মা মহাশক্তিশালী পুরুষ ছিলেন ইহা তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিদেশ হইতে আসিয়া পূর্ব্বতন অধিবাসিগণকে পরাভূত করিয়া একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। জিম্মু অযথা রক্তপাতের পোষকতা করিতেন না। আইনুদের সহিত সংগ্রাম কালে তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। জিম্মু নির্জ্জিত শত্রুকে পদদলিত করেন নাই, যোগ্যতা অনুসারে তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন।

সম্রাট জিম্মু অদ্যাপি জাপানের সহস্র সহস্র মন্দিরে দেবতারূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। জাপানীরা তাহাদের দেশকে যেমন দেবভূমি বলিয়া ভক্তি করে, তাহাদের সম্রাট্‌কেও তেমনি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এই যুক্তিতর্কের যুগেও জাপানীরা তাহাদের সেই পূর্ব্বতন দেশপ্রীতি ও রাজভক্তি পরিত্যাগ করে নাই।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী।

আকাশ কি বলে?

আকাশ কি বলে? মেঘের কবলে
আলো আজ পড়িয়াছে ধরা,
চির শূন্যতায়, বেদনা কোথায়?
কাঁদিয়া বাড়ায় বাহু ত্রস্ত বসুন্ধরা॥
অযুত কুসুম কাতর নিঝুম
ঝরে জল নয়ন পল্লবে,
তরু গুল্ম লতা, বক্ষে ব্যাকুলতা,
বহু দূরে বন্দী হেরি জীবন বল্লভে॥

আকাশের মুখে, অসীমের বুকে,
নাই মন্ত্র, নাই আরাধনা,
অনল ঝলকে, পলকে পলকে
ত্বরান্বিত তরবারি শক্তির সাধনা॥
ছুটেছে ঝটিকা, বিদ্যুতের টীকা
আঁকা তার ভ্রূকুটীর 'পরে
দুরন্ত আবেগ, পলাতক মেঘ,
অনাহূত আততায়ী দূর দিগন্তরে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পুনর্জ্জন্ম

(উপন্যাস)

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

লাট সাহেবের কাছে দয়া ভিক্ষা করিয়া দেবকুমার যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল, তাহার ফলাফলের জন্ত সে বেশী ব্যস্ত ছিল না। সে ব্যস্ত ছিল, তাহার কার্য্যের তুলনায় সময়ের অভাব দেখিয়া। পূর্ব্বে যখন দেবকুমারের সকল কায শুধু তাহাকেই ঘিরিয়া থাকিত, তখন তাহার সময়ের অভাব ছিলনা—কাযেরই অভাব ছিল। সেই সময় দেবকুমার তাহার মহত্ব ও চরিত্র হারাইয়াছিল। যে দিন হইতে দেবকুমারের কায তাহাকে ছাড়িয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল—পরকে ঘিরিল, সেই দিন হইতেই সে বুঝিতে পারিল যে, মানুষের সময় অপেক্ষা কায অনেক বেশী। আগে সময় কাটাইবার জন্ত যে সকল কাযে সে লিপ্ত রহিত, তাহা দুই দিনেই এমন বিতৃষ্ণা আনিয়া দিত যে দেবকুমার উন্মত্তের মত নূতন কাযের ও নূতন পথের সন্ধানে ছুটিত। দুই দিন পর সেই নূতন পথেও কাঁটার ঘা খাইয়া দেবকুমার আবার ছুটিতে আরম্ভ করিত। লালসা ও ভোগের ইহাই রীতি। এখন দেবকুমার দেখিল, পরের জন্ত দেহপাত করিয়া কত আনন্দ, কত সুখ—পরের জন্ত সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসী যে, তাহার তৃপ্তি কত। এমন দিন ছিল, যখন দেবকুমার মনে করিত, হিন্দুদের শিবার্চ্চনা বর্ব্বরতার নামান্তর মাত্র। এতদিনে সে বুঝিতে পারিল, দেবত্বের শ্রেষ্ঠ কল্পনাই শিবের কল্পনা। যে দেবতা বিশ্বের সকল বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করিয়া শুধু অমৃত বিতরণ করেন—তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নরকল্পনার অতীত।

এবার সাগরিকার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই দেবকুমারের মনটা ছটফট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এত অস্থিরতা যে কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। সে দিন রাত্রিতে নিজের ছোট ঘরটির মধ্যে শুইয়া শুইয়া দেবকুমার প্রহর গণিতে লাগিল। দূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে টং টং করিয়া বারোটা, একটা, দুইটা বাজিয়া গেল। দেবকুমার তখনো তাহার ভবিষ্যৎটাকেই ভাবিতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল—"তাই ত! সাগরের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কি দ্বীপান্তরী হইব? সমস্ত ধনসম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া যদি ফকিরই হইলাম, তবে সংসারের কাযে লাগিব কিরূপে? আন্দামানে যাইয়া যদি থাকিতে না পারি—যদি আবার দেশেই পলাইয়া আসিতে হয়! তখন ত ইহাই মনে হইবে, কেন এখানে আসিয়াছিলাম, অগ্রপশ্চাৎ ভাবি নাই!" কয়দিনই সে মনের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আজও আবার করিল। জেলখানার হাঁসপাতালের ব্যাপারটা আজ একটা অতিগুরু পাথরের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। সে ভাবিতে লাগিল—"এই সাগরিকা, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমি দেশান্তরী হইব!"

এইরূপ ভারাক্রান্ত মন লইয়া দেবকুমারের যে কখন্ তন্দ্রা আসিয়াছিল, তাহা সে জানে না। অতি প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই তাহার মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই সে কোনো অপরাধ করিয়াছে—নহিলে অপরাধীর ভীরুতা ও মর্ম্মবেদনা প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে পীড়া দিতেছে কেন? নিজের মনের কাছেই বা সে এত দোষী হইল কিরূপে? দেবকুমার বাহির হইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনটি বড় দুঃখেই কাটিয়াছিল—ব্যথার কারণটা দেবকুমার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। গত কয়েক দিনের সকল কাযই ত একে একে তাহার মনে পড়িল,—কিন্তু কৈ? ত্রুটি ত কোথাও ছিল না। দারুণ ব্যথায় ও অস্পষ্ট স্বপ্নের ঝড়ে রাত্রিও কাটিয়া গেল।

সত্য সত্যই যে দেবকুমার কোনো কিছু অন্যায় করিয়াছিল, তাহা নয়। তাহার অন্তরে এমন কতকগুলি

চিন্তা আসিয়াছিল, যাহা গর্হিত। সে ভাবিয়াছিল—সাগরিকাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প, আন্দামানে যাইয়া সংসারের বাহিরে বাস করিবার পণ, নিঃস্বত্ব হইয়া সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিবার কল্পনা—এ সকলই অসম্ভব, শুধু স্বপ্নমাত্র, উত্তেজনার বশে নিজের কাছে নিজেকে ছলনা মাত্র। কেবল তাহাই নহে—এ সকলই অনাবশ্যক! গর্হিত কায অপেক্ষা গর্হিত চিন্তার ভার অনেক বেশী গুরু। দেবকুমার ভাবিয়াছিল, যাহা অস্বাভাবিক, তাহাকে অবলম্বন করিতে হইলে নিজের উপর বল প্রয়োগ করিতে হয়। প্রাণবায়ুর মত সহজ ও সরল ভাবে যাহাকে গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে না—সেই আকাশ-কুসুমের পশ্চাতে না ফিরিয়া, যাহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, সেই পথে যাওয়াই কর্ত্তব্য। দেবকুমারের বাল্যবন্ধু হাইকোর্টের উকীল শ্রীনাথবাবুও বার বার এই কথাই বলিয়াছেন। বাহির হইতে এই বল লইয়া দেবকুমারের অন্তর এই কয়দিন বলিতেছিল—"দেবকুমার, অনেক হইয়াছে, আর কেন? যাহা সয়-সয়, সে-ই ভাল।"

দেবকুমারের মন যে মধ্যে মধ্যে এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, তাহা নহে। পাপের অপেক্ষা পাপ-চিন্তার অপরাধই গুরুতর। আগে চিন্তা, তাহার পর তদনুযায়ী কার্য্য। আজ তুমি কুকার্য্য কর, কাল হয়ত তাহা আর করিবে না—হয়ত বা সেই পাপানুষ্ঠানের জন্য লজ্জিত হইবে, অনুতাপ করিবে। সেইখানেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু মনে কুচিন্তা থাকিলে তাহা আবার তোমাকে পাপে রত করিবেই—তোমার সাধ্য নাই যে, তাহার কবল হইতে রক্ষা পাও। তোমার দেবতার আসনে সে কালি না মাখাইয়া ছাড়িবে না।

দেবকুমারের বাড়ীর নিকটেই ছোট একটা পার্ক। তখনো তাহার কোণে কোণে কয়েকটা গ্যাসের আলো মলিন হইয়া জ্বলিতেছিল, দুই একটা দরিদ্রলোক তখনো পার্ক-পুকুরের বাঁধা ঘাটের উপর কাঁথা জড়াইয়া পড়িয়া ছিল। দেবকুমার আর একটা ঘাটে যাইয়া বসিল। প্রভাতের মুক্ত ও শীতল বায়ুর স্পর্শে সে যখন কতকটা শান্ত ও তৃপ্ত হইল, তখন তাহার এই কথাই মনে হইতে লাগিল—'আমি কেমন করিয়া পণভঙ্গের কথা মনে স্থান দিয়াছিলাম?' একদিন যে পথে সে নিজের জীবনকে চালিত করিয়াছিল, সেই পথে আবার ফিরিয়া যাওয়া যে খুবই সহজ, তাহা দেবকুমার ভালই জানিত। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে সে একথাও বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মৃত্যু তাহার অপেক্ষায় সেই পথে দাঁড়াইয়া আছে। গভীর নিদ্রার পর জাগ্রত হইলে মানুষ যেমন তখনই শয্যা ছাড়িতে চায়না—একদিকে জড়তা এবং আরও কিছুক্ষণ নিদ্রার ইচ্ছা এবং অপর দিকে সমাগত দিবসের কাযের তাগিদ তাহাকে লইয়া যেমন টানাটানি করে,—দেবকুমারেরও তখন সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহার পথ যে কোন্‌টী, তাহা সে বাছিয়া লইতে পারিল না।

পার্কের বাহিরে আসিয়াই দেবকুমার দেখিল—একখানি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। কোথায় যে যাইবে, তাহা সে তখনো ভাবে নাই। ট্যাক্সিখানা সোজা চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর একটা চৌরাস্তায় আসিয়া শোফেয়ার যখন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে যাইব?" দেবকুমারের তখন চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল, "ভবানীপুর।"

হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল শ্রীনাথবাবু দেবকুমারের সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। কয়েকদিন পূর্ব্বে সে নিজের উইলখানা শ্রীনাথবাবুকে দেখিতে দিয়াছিল। উইল দেখিয়া শ্রীনাথবাবু মনে করিলেন, দেবকুমারের মাথা খারাপ হইয়াছে, নহিলে নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া কেহ কি এমন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে?

ট্যাক্সি হইতে বন্ধুকে নামিতে দেখিয়াই শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "এস দেবু। তোমার উইল আমি দেখেছি, কিন্তু এখনো ভাবো। রেজেষ্ট্রী হয়েছে, হোক্‌না; বদলাতে কতক্ষণ?"

দেবকুমার বলিল, "অনেক ভেবেছি ভাই, অনেক

ভেবেছি। তুমি সেদিন যা যা বলেছিলে, সবই ভেবে দেখেছি।"

"ভেবে কি স্থির করলে ?"

দৃঢ়কণ্ঠে দেবকুমার কহিল, "সেদিনও যা' বলেছি, আজও বলছি তাই। নিজেকে সকল বাঁধন থেকে মুক্ত করতে না পারলে, পরের দুঃখ দূর করা যায় না।"

শ্রীনাথবাবু অবাক্ হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেবকুমার বলিল, "অমন করে' চেয়ে রইলে যে! ভাব্‌ছ, আমি এখনো নিজের মন জান্‌তে পারিনি ?"

শ্রীনাথবাবু বলিলেন, "না দেবু, আজ আর তা' ভাবছিনে। তোমার চোখ মুখ আজ বলে' দিচ্ছে যে, তোমার পণ ভাঙ্গবার নয়। ওকালতীর জীবনে অনেক মানুষ দেখলাম, তারা পরকেই পথে বসাতে চায়—আর তারই জন্য গাড়ী গাড়ী দলিল জাল করে।"

বাধা দিয়া দেবকুমার কহিল, "ভাই, পৃথিবীতে দুঃখের সীমা নেই, পাপেরও সীমা নেই। আবার এটাও ঠিক যে, সংস্কারের নামে অত্যাচার অবিচারেরও শেষ নেই।"

"সে কথা ঠিক ; কিন্তু দেবু, তোমার আমার সাধ্য কি যে পৃথিবীর দুঃখ দূর করি !"

দেবকুমার একটু হাসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "সাধ্য নেই তা জানি। অন্ধকারটা সম্পূর্ণ দূর করতে পারবনা বলে' কি নিজের দীপটাও জালব না ? হোক্ সে ছোট এতটুকু একটা প্রদীপ—তার শিখাতেও ত কিছু দীপ্তি আছে।"

শ্রীনাথবাবু নিরুত্তর হইলেন। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "সেই যে কয়েকজন কয়েদির আপিল করেছিলে, কি হল তাদের ?"

"কাল হুকুম হবে। বোধ হয় তারা খালাস পাবে।"

"আচ্ছা ভাবো দেখি একবার বেচারাদের কথা! অবস্থার তাড়নায় ওরা না হয় কিছু-একটা করেই ফেলেছে। তোমার আইন, নজির, হাকিম গোড়ার সে কথাটা মোটেই ধরে না, তোমার সমাজ খালি ঘুমুচ্ছে আর নিজের হীনতা ও দুর্ব্বলতার বোঝাটা অনায়াসে অপরের মাথায় তুলে দিচ্চে। ভাবো দেখি একবার, এরা যে জেল খেটে মরছে, সে কি সামাজিক অত্যাচার আর নির্য্যাতনের তাড়নায় নয় ? যাঁর হুকুমে আজ এরা বন্দী, এদের অবস্থায় পড়লে তিনিও কি এই রকমই করতেন না ?"

"তা হয়ত করতেন। কিন্তু দেবু, সমাজ ত একটা এতটুকু জিনিষ নয় যে, তাকে তুমি ভেঙ্গে চুরে তাল পাকাতে পারবে ? সে ত একটা শিশু নয় যে, সূঁচের ঘায়ে কেঁদে উঠবে ?"

"সূঁচ যেখানে ব্যর্থ হয়—ছুরি সেখানে ঘা দিলেই পারে। সমাজ যদি জাগে, তাহলে ঠিক জেনো দণ্ড-নীতির সংস্কার হবেই হবে। এতদিনের পাকা উকীল তুমি—দেখদেখি এক শ্রেণীর লোক এমন কাযের জন্যে জেলখানায় গেছে যে, সেটা সাধারণ মানুষের চোখে অপরাধ বলেই গণ্য হ'তে পারে না। শুধু কি তাই ? মানুষ মাত্রেরই তেমন কায করা একান্ত স্বাভাবিক।"

"তেমন ত রোজ রোজই দেখছি। কিন্তু দেশের যা আইন, সেটা ত মানতে হবে।"

উত্তেজিত কণ্ঠে দেবকুমার বলিল, "আইনের শাসন মানবো বৈ কি—নিশ্চয়ই মানবো। কিন্তু সে আইন ত ভগবানের গড়া নয়—সে হল তোমার আমার মত দশজনের গড়া একটা পেষণ-নীতি। সে হল তোমার আমার দুর্ব্বলতার প্রকাণ্ড একটা স্তূপ! সে আইনের যেখানে ভুল আছে, সে ভুলটাকে কিছুতেই মান্‌বো না—ভুলের সংস্কার করতে সর্ব্বস্ব পণ করবো। দণ্ডই ধর্ম্ম বটে, কিন্তু যেখানে মমতা ও উদারতা সে ধর্ম্মের পথে বিঘ্ন নয়, বরং তাকে মর্য্যাদাই দেয়—সেখানে কেন যে কঠোর হব, তা' আমি বুঝতে পারিনে। একথা আমরা ভুলব কেন যে, মানুষ অবস্থার দাস মাত্র।"

জেলখানা ও দণ্ডনীতির সংস্কার সম্বন্ধে এইরূপ নানা আলোচনা করিয়া দেবকুমার যখন নিজের উইলখানা লইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার মনের ভার অনেক কমিয়াছিল। পরের জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া ফকির হইতে যে

পারে, দেবকুমারের তখনকার আনন্দ শুধু সেই বুঝিতে পারিবে।

বাড়ী আসিয়াই দেবকুমার দেখিল, তাহার ভগিনী লীলা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দেবকুমারের মুখে এমন একটা আনন্দ ফুটিয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া লীলা ভাবিল, সে বুঝি তাহার হারাণো ভাইটীকে আবার ফিরিয়া পাইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবকুমার আর সেদিন বাহিরে গেল না, নিজের মনের সঙ্গেই বোঝা-পাড়া করিতে লাগিল।

ভ্রাতার সহিত নানা কথার পর লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "বালিগঞ্জের অমন খাসা বাড়ীখানা ছেড়ে দিলে যে?"

ঈষৎ হাসিয়া দেবকুমার বলিল, "আমি একলা মানুষ, অত বড় বাড়ী কি করব লীলা? তাই ছেড়ে এসেছি। ও বাড়ী ত আর এখন আমার নয়— তোমার।"

বিস্ময়ের কণ্ঠে লীলা বলিল, "আ—মা—র?"

'হাঁ তোমার। তোমাকেই দিয়েছি। গয়ার সেই ছোট বাড়ীটুকুতে ছেলেপিলে নিয়ে তোমার যে কি কষ্ট, তা'ত আমি জানি।"

লীলা একটু হাসিল। সে হাসি বিষাদে মাখা। সে হাসি ধারালো ছুরির মতো দেবকুমারের হৃদয়ে লাগিল, কারণ সে উহার কারণ জানিত। তাহার ভগিনীপতি শশিকুমার পুলিশকোর্টের একজন বড় উকিল ছিলেন। কিন্তু সুরা ও ঘোড়দৌড়ের বাজি তাঁহাকে এমনি করিল, যে তিনি একেবারে পথে বসিলেন। লীলা সে কথা ভাইকে জানিতে দিল না। লীলার পুত্রের একবার কঠিন পীড়া হইল। চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য লীলা দেহের অলঙ্কার খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। শশীবাবু অলঙ্কারগুলি লইয়া সপ্তাহের মত অন্তর্দ্ধান হইলেন। লীলার পুত্র বিনাচিকিৎসায় মরিয়া গেল। ভাগিনেয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দেবকুমার লীলাকে দেখিতে গেল এবং প্রতিবেশীর মুখে সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে এমন অন্ধ হইল যে, শশিকুমারকে গুলি করিবার জন্য বন্দুক তুলিল। আজ দেবকুমারের সেই কথা মনে পড়িতে লাগিল, যে দিন পুত্রশোকাতুরা লীলা দেবকুমারের পায়ের উপর আছাড় দিয়া পড়িয়া মাতাল স্বামীর প্রাণটী ভিক্ষা চাহিয়াছিল।

দেবকুমারের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

এই ঘটনার পর তিন চারি বৎসর চলিয়া গেল, শশী ও দেবকুমারে আর সাক্ষাৎ হইল না। একবার দেবকুমার শুনিতে পাইল যে, শশী গয়ায় যাইয়া বাস করিতেছে। দেবকুমার তখন নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবন লইয়া এতই ব্যস্ত ছিল যে, পৃথিবীর অপর কাহারও সংবাদ লইবার অবসর ছিলনা। লীলা মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিত বটে, কিন্তু আজকাল করিয়া দেবকুমারের উত্তর দেওয়া ঘটিত না। ভগিনীর প্রতি মমতার অভাবে যে দেবকুমার এমন করিত তাহা নহে। দেবকুমারের তখন কাযও ছিল না, অবসরও ছিল না।

দেবকুমারের দাইমা যেদিন শুনিল যে, দেবকুমার অন্দামানে যাইবে এবং সাগরিকাকে বিবাহ করিবে, সে দেবকুমারকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। যখন সে দেখিল, দেবকুমার কিছুতেই পণ ভাঙ্গিবে না, তখন নিরুপায় হইয়া একটী প্রতিবেশিনীকে ধরিল এবং লীলার কাছে সকল কথা লিখিয়া পাঠাইল। দাইমার চিঠি পাইয়া লীলা আর স্থির থাকিতে পারিল না, স্বামীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

লীলার মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "শশী কৈ?"

"আমাদের রেখেই বেরিয়ে গেছেন। বাদুড়বাগানে তাঁর কে বন্ধু আছেন, সেইখানে যাবেন বলেছেন।"

মুহূর্ত্তের জন্য দেবকুমারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি?"

"না। বোধ হয় আজই গয়ায় ফিরে যাবেন। ছোট একখানা দোকানই ত এখন সম্বল। উনি না গেলে দেখবে কে?"

দেবকুমার বসিয়া ছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। বলিল, "সে বাড়ী খুব দূর নয়। হাতে ধরে' হোক্, পায়ে ধরে' হোক্, আমি এখনি শশীকে নিয়ে আস্‌ছি। সে না খেলে কি আমার মুখে ভাত ওঠে?"

দেবকুমার চলিয়া গেল।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে লীলা আপন মনে বলিল, "আমার এমন ভাই, আর তারই জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল!"

শশিকুমার আর তখন সে শশিকুমার ছিল না। কোন্ মুখে দেবকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে এই লজ্জাতেই সে লীলাকে রাখিয়া বাদুড়বাগানে পলায়ন করিয়াছিল। দেবকুমার তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং পরম সমাদরে বাড়ীতে লইয়া আসিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দেবকুমার যখন লীলা ও শশীর সহিত গল্প করিতেছিল, তখন ডাকপিয়ন একখানি চিঠি দিয়া গেল। খাম দেখিয়াই দেবকুমার বুঝিল, উহা সরকারি চিঠি। দেবকুমারের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। সেই স্বল্পাক্ষর পত্রখানা কিছুক্ষণের জন্য দেবকুমারকে বজ্রাহতের মত করিল। তাহার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল।

দেবকুমারের মুষ্টির ভিতর হইতে পত্রখানি লইয়া শশিকুমার পড়িল এবং করুণকণ্ঠে কহিল, "লাটসাহেবের দয়া হল না—সাগরকে তবে আন্দামানে যেতেই হলো!"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দেবকুমার বলিল, "মানুষ মানুষকে ক্ষমা করতে জানে না ভাই। সে শুধু ওজন করতে জানে তার নিজের গড়া দণ্ডবিধির মানদণ্ডে!"

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই নীরব হইয়া রহিল।

দেবকুমার বলিল, "এমন যে হ'বে, আমার মনটা মাঝে মাঝে তা' বল্‌ছিল। তা' ভালই হয়েছে। এই সময়টা তোমরাও এসে পড়েছ। যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা হল।"

বিস্ফারিত-নেত্রে দেবকুমারের দিকে চাহিয়া শশিকুমার বলিল, "যাবার আগে মানে কি?"

"আমিও যে আন্দামানে যাব?"

দেবকুমারের কণ্ঠস্বর এমন একটা দৃঢ়তা জানাইল যে, লীলা চমকিয়া উঠিল।

দেবকুমার তখন একে একে তাহার সকল সঙ্কল্প প্রকাশ করিল এবং উইলখানা শশীর হাতে দিয়া বলিল, "যা কিছু আমার ছিল, আজ থেকে সে সব তোমাদের।"

শশিকুমার সে কথার উত্তর না দিয়া কাগজখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বলিল, "দেবু, তুমি কি পাগল হয়েছ?"

দেবকুমার একটু হাসিল। বর্ষার ম্লান জ্যোৎস্নার মত সামান্য একটু হাসি—অশ্রুতে সিক্ত। তাহার পরই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "শশী, ছিঁড়লেই কি উইলখানা নষ্ট হয়? ও-যে রেজেষ্ট্রী করা। আমি পাগল হইনি শশী, পাগল হইনি। ভাবছ, একটা বারবনিতার জন্যে আমি কেন এতদূর গেছি? তার অপরাধ কি? আমিই ত তাকে সে পথে বসিয়ে ছিলাম! সে চলেছে আন্দামানে আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে, আর আমি থাকবো মস্ত একটা জমীদার—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশের একজন সংস্কারক সেজে! সেসন জজের বিচার-বুদ্ধি যে সীমা পার হ'তে পারেনি—ভগবানের দণ্ড যে তাকে অনেক দিন ছাড়িয়ে গিয়ে আমার মাথায় পড়বে বলে' উদ্যত হয়েই আছে শশী! শোনো আগে সব কথা, তার পর যা বল্‌তে হয় বোলো।"

দেবকুমার যখন একে একে তাঁহার জীবনকথা বিবৃত করিল, তখন শশী বিস্মিত হইয়া আপন মনে কহিল, "সামান্য একটা ভুলের জন্যে মানুষ কি এত কঠোর প্রায়শ্চিত্তও করতে পারে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে দেবকুমার বলিল, "সামান্য নয় ভাই, সামান্য নয়। যে নারী-মর্য্যাদার মাপ প্রাণের বিনিময়েও হয় না, টাকার দিয়ে যে তা' মেপে দেখতে চায়, মানুষের সমাজ আজও তার যোগ্য দণ্ড আবিষ্কার করতে পারে নি! ব্যভিচারের স্রোত তাই সকল দিক দিয়ে

আমাদের আক্রমণ করছে—সাহিত্যের ভিতর দিয়েও সে তার পথ খুঁজে নিয়েছে।"

ধীরে ধীরে লীলা বলিল, "আচ্ছা দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব কি ?"

"একটা কেন বোন, তোমার দাদা আজ লক্ষ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছে। পৃথিবীর কাছে সে তার নিজের পাপকে প্রচার করে', প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।"

লীলা কহিল, "এত কাণ্ডের পর জেলখানার হাঁসপাতালেও যে নারী নিজেকে সামলাতে পারে নি, তুমি তাকে কেমন করে' শোধরাবে ?"

দেবকুমার বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল, "তুমি ঠিক বুঝলে না লীলা। আমি যে আন্দামানে যেতে চাই, সে আমার নিজের জন্যে—সাগরের জন্যে নয়। মানুষের বিচার যে দণ্ডটা আমায় দিতে পারে নি, আমি ত জানি সেইটেই হচ্ছে আমার প্রাপ্য।"

কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া লীলা বলিল, "তবে তাকে আবার বিয়ে করতে চাচ্ছ যে ? আর কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই ?"

"হয়ত থাকতে পারে—কিন্তু এমন নিশ্চিত আর কিছু নেই। তাকে বিয়ে করলে আমি সমাজের এমন একটা স্থানে গিয়ে পড়বো, যেখানে হয় ত অনেকের উপকারে আসতে পারবো। সেখানে ত অন্য কেউ যেতে চায় না লীলা।"

"সে তুমি জান দাদা। কিন্তু আমি ঠিক বলছি, সাগরকে বিয়ে করলে তুমি কিছুতেই সুখী হতে পারবে না।"

"সু-খ ? আমি ত আর সুখ চাইনে লীলা। আমি যে এখন কেবল দুঃখকেই চাই, লাঞ্ছনাকেই চাই। আমার এই নিদ্রিত সমাজ দেখবে না যে, যে লাঞ্ছনা—যে নিগ্রহ সে শুধু নারীর জন্যেই নির্দেশ করেছে—সেটার সব চাইতে বড় অংশ পুরুষের ! আমি যখন দেখেছি, তখন আমার ভাগটা আমায় যে নিতেই হবে বোন।"

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "জীবনটা এমনি করে' নষ্ট করবে দাদা ?"

"নষ্ট ! নষ্ট নয় লীলা। নষ্ট জীবনকে উদ্ধার করতে চাচ্ছি। মানুষ হয়ে জন্মেছি। আবার মানুষই হ'তে চাই। ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুগত না হ'লে ত তা হয় না বোন। যে কখনও আঘাত পায়নি, জেনো ভগবানের দয়া তার উপর নেই।"

* * *

পরদিন প্রভাতে সাগরিকার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেবকুমার শুনিল, দ্বীপান্তরের কয়েদীরা জাহাজে উঠিবার জন্য আধ ঘণ্টা আগেই ডায়মণ্ড হার্ব্বারে গিয়াছে। সেদিন বেলা বারোটায় জোয়ার। জোয়ার আসিলেই জাহাজ ছাড়িবে।

দেবকুমার কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময় একটা গির্জ্জার ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজিল। ডায়মণ্ড হার্ব্বারে যাইবার জন্য তখন কোনো ট্রেণ পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা দেখিয়া, একখানা ট্যাক্সি লইয়া দেবকুমার নক্ষত্র বেগে ছুটিল। সে যখন জেটিতে যাইয়া পৌঁছিল তখন দেখিল জেটির মুখে সঙ্গীন-চড়ানো পুলিসের পাহারা। দেবকুমার, জেটির উপর যাইতে পারিল না। নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল, আন্দামান যাত্রীরা ঢালু সিঁড়ি বাহিয়া সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। প্রথমে পুরুষের সারি—তাহার পর প্রহরীর দল—তার পর দল স্ত্রীলোক। দূরে প্রকাণ্ড একখানা জাহাজ ধূম ছাড়িয়া আকাশ কালো করিতেছে। অপেক্ষাকৃত ছোট একখানা ষ্টীমার জেটির গায়ে ভিড়িয়া আছে।

সম্মুখে কি একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল দেখিয়া কয়েদীরা দাঁড়াইল। সেই সময় সাগরিকা একবার পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেবকুমার তাহাকে দেখিতে পাইল। সঙ্গিনী কয়েদীদের সঙ্গে সে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছিল।

তখনো সাগরিকার মুখে হাসি দেখিয়া দেবকুমার স্তম্ভিত হইল।

সাগরিকার দৃষ্টি দেবকুমারের উপর পড়িতেই,

সাগরের মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। দেবকুমারের মনে হইল, সাগরের চক্ষু দুইটী যেন চক্ চক্ করিতেছে। কয়েদীরা যে সময় টুকু দাঁড়াইয়া ছিল সাগরিকা ততক্ষণ একদৃষ্টে দেবকুমারের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবকুমার ভাবিল, চীৎকার করিয়া বলিবে—"যাও তুমি—আমিও আস্‌ছি।" কিন্তু বুকের কথা মুখে আসিবার পূর্ব্বেই প্রহরী-সর্দ্দারের হুইসেল বাজিল এবং কয়েদীরা আবার ধীরে ধীরে ষ্টীমারের দিকে অগ্রসর হইল। দেবকুমার দেখিতে পাইল, সাগরিকার সঙ্গিনী তাহাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সাগরিকা তখন বিবশা।

দেবকুমার যদিও সম্মুখের সেই বিস্তৃত জল রাশির দিকেই চাহিয়া ছিল, কিন্তু কোন্ সময়ে যে ষ্টীমারখানা চলিয়া গেল, বড় জাহাজও ছাড়িল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। জাহাজের চাকার আঘাতে জোয়ারের জল আরও ফুলিয়া উঠিয়া যখন জেটির গায়ে আছাড় দিয়া পড়িল, দেবকুমার তখন দেখিল সাগরিকাকে লইয়া জাহাজখানা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে।

দেবকুমার করুণ নয়নে আকাশের দিকে তাকাইল, তাহার পর সেই দ্রুতগামী জাহাজের দিকেই চাহিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

আছে গৃহ নাই গৃহবাসী

আছে গৃহ, নাই গৃহবাসী,
দর্পণ ও কঙ্কতিকা, নির্ব্বাপিত দীপশিখা
আলেখ্য, লেখনী গ্রন্থ প'ড়ে রাশি রাশি!
আসন, শয়ন পানাধার,
পড়ে আছে শূন্য বুকে, প্রতীক্ষায় মৌনমুখে,
কার লাগি অহরহ চায় চারিধার!
বায়ু আসে বাতায়ন বাহি,
আধ খোলা পেটিকায়, স্পর্শ সুরভিত কায়,
কাঁপে চেলাঞ্চল, বলে, সেতো আর নাহি!

অঞ্জন শলাকা মর্ম্মভেদী,
ছড়ান কনকটীপ ভালের আরতি দীপ,
সিন্দুরের বিন্দু আঁকা প্রসাধন বেদী!
নিরুপায় দূরে গৃহ কোণে,
পাদুকা পড়িয়া দুখে, অলক্তক স্মৃতি বুকে,
প্রতি দণ্ড পল কাটে পদশব্দ গণে'!
অঙ্গুরী কঙ্কণ কণ্ঠমালা,
সে তনু নন্দন চ্যুত মর্ত্ত্যে পড়ে' পরাভূত,
নাই ধূপ দীপ, গৃহে চিতানল জ্বালা!

সত্যধাম
রাঁচী ৩।১০।২৭

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

প্রাচীন কালে সহরের জল-নিকাশের ব্যবস্থা

মালদহ জেলার ইংরেজবাজার সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে। ধ্বংসাবশিষ্ট স্থান-গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, প্রাচীন সহর নির্ম্মাতাগণ জলনিকাশের ব্যবস্থা সম্যক অবগত ছিলেন। ইংরেজবাজার হইতে পাঁচ মাইল দূরে
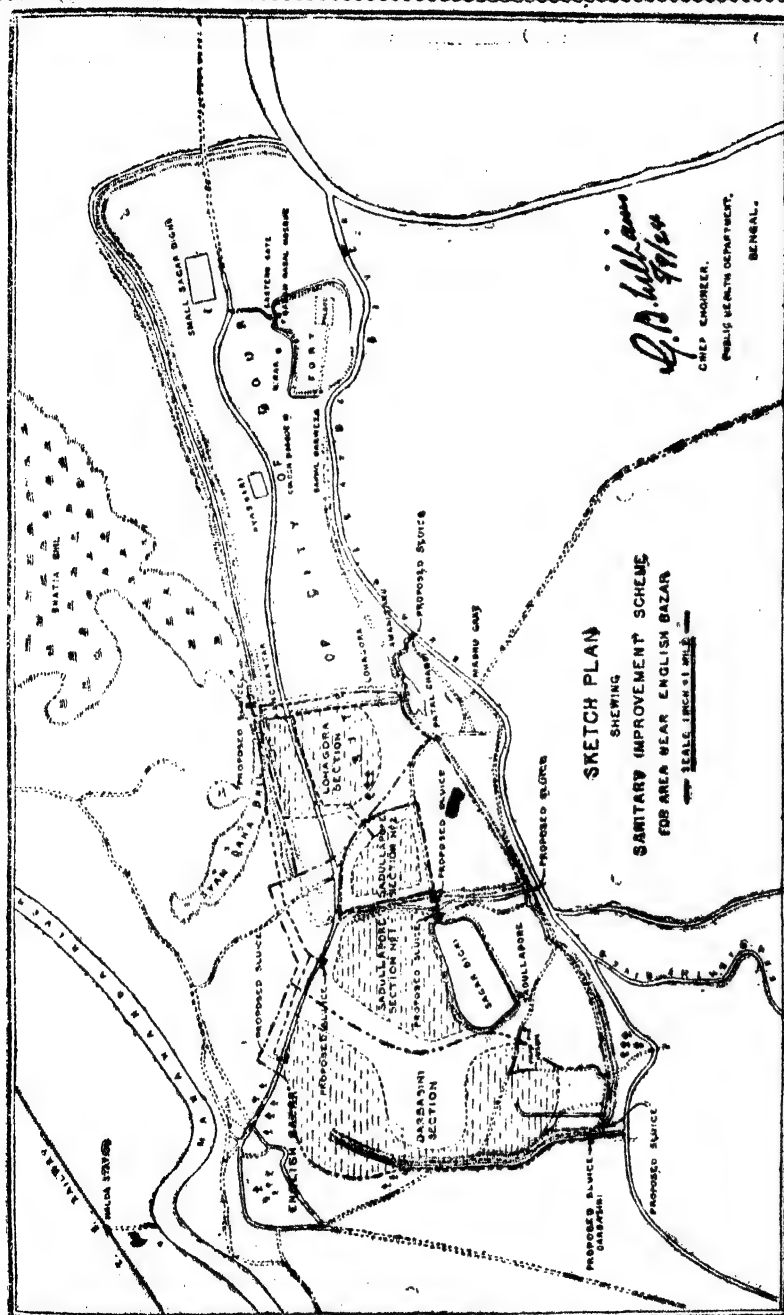
নিমাসরাই নামক স্থানটিও গৌড়ের ন্যায় প্রাচীন—ঐ স্থানে জলনিকাশের ব্যবস্থা আজিও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ইংরাজ বাজারের নিকট প্রায় ৬০ বর্গ মাইল ব্যাপী অতি অস্বাস্থ্যকর একটি স্থানের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে, জলনিকাশের প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির প্রতি বর্ত্তমান লেখকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রাচীন গৌড় এই স্থানের অন্তর্ভুক্ত। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, গৌড় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে খালের (artificial canal) বন্দোবস্ত রহিয়াছে। এই খালের জল হইতে সমস্ত গৌড়ের পয়ঃপ্রণালীগুলি ধৌত হইত, কৃষিকার্য্যের জন্য জল সরবরাহ হইত এবং পুষ্করিণী ও দীঘিগুলির সহিত এই খালের যোগ থাকাতে বোঝা যায় যে প্রয়োজন হইলে খালের জলদ্বারা পুষ্করিণীতে জল আনা হইত। কৃষিকার্য্যের জল সরবরাহের জন্য অতি প্রশস্ত স্থান ব্যাপিয়া বড় বড় বাঁধ ছিল। বন্যার জল এই বাঁধে ধরিয়া রাখা হইত ও প্রয়োজনানুসারে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই সকল খালের (sluice gates) স্থানে এখনও গাঁথুনির কায দেখা যায়, এবং ইহার মাঝে মাঝে লোহের দরজা, ও জলের স্রোতের পরিমাণ বাড়াইবার কমাইবার জন্য (sluice gate;) বন্দোবস্ত দেখা যায়।

আমি পরে জানিলাম যে, বহুকাল পূর্ব্বে র‍্যাভেন্সা নামক মালদহ জেলার একজন ভূতপূর্ব্ব কলেক্টার সাহেব এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। খাল ও বাঁধগুলি তখন অবশ্য এখন অপেক্ষা অনেক ভাল অবস্থাতেই ছিল। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে আমার চেষ্টায় বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে প্রধান ইঞ্জিনীয়ার উইলিয়াম সাহেব ঐ স্থানগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটি নক্সা অঙ্কিত করেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ নক্সাটি আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। নক্সা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, উত্তরে মহানন্দা ও দক্ষিণে ভাগীরথী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থলই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই স্থানে কয়েকটি বাঁধ আছে, তাহা মানচিত্রে পাহাড়ের স্তায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই বাঁধগুলি দ্বারা ঐ স্থানটি কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ জলপাত্রের স্তায় বিভক্ত হইয়াছে। যে যে স্থান দিয়া নদীর জল বর্ষাকালে এই স্থানগুলিতে প্রবেশ করিত ও বাহির হইয়া যাইত, তাহাও অঙ্কিত করা হইয়াছে। স্থানগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিবার জন্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঐ ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন জলনিকাশের ব্যবস্থাই বজায় রাখিয়া উহাকে সংস্কৃত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ডাক্তার সুর এই স্থানের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

"আলোচ্য স্থানটি উচ্চ প্রাকার বেষ্টিত এবং এই প্রাকারের চারিদিকে খাল আছে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে এই প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই বিস্তীর্ণ খালগুলি দিয়া ভাগীরথী ও অন্তান্ত নদী হইতে বর্ষাকালে জল আসিয়া সমস্ত স্থানটিকে ধৌত করিয়া দিত এবং তজ্জন্ত প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত, স্বাস্থ্যও ভাল থাকিত। ২৫।৩০ বৎসর পুর্ব্বে লোহাগড়া ও দ্বারবাসিনীর নিকট এই খালগুলিতে বাঁধ দিয়া জল আসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বোধ হয় উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর অত্যধিক জল আসার দরুন ফসলের ক্ষতি হওয়ায় এই বাঁধগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বাঁধ নির্ম্মাণের ফলে দেখা যায় যে তখন হইতে ঐ স্থানটি অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ফসলও কমিয়া আসিয়াছে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ঘটিয়াছে। ম্যালেরিয়া গ্রস্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়াছে, জন্মসংখ্যা কমিয়াছে, কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পুষ্করিণী গুলি প্রায় শুষ্ক, শুধু বৃষ্টির জল জমিয়া যেটুকু যতদিন থাকে। খালগুলিতেও সামান্ত সামান্ত জল আছে, স্রোত না থাকাতে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের উৎপত্তি স্থান হইয়াছে।"

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে যদি এই খালগুলি আবার বর্ষাকালে নদীর জল দ্বারা পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে গ্রামগুলির উন্নতি সম্ভব।

স্থানীয় জমীদারদের এই বাঁধগুলি ভাঙ্গিতে ঘোর আপত্তি আছে। তাহার কারণ এই যে, বৎসরের পর বৎসর এই জমিগুলিতে ধানের অজন্মা হওয়াতে ঐ জমিগুলিতে আমের বাগান করা হইয়াছে এবং তাহাতে তাঁহাদের প্রচুর অর্থাগম হইতেছে। ইঁহারা অর্থশালী ও শক্তিশালী, শুধু নিজেদের সুবিধার জন্ত যে সহস্র সহস্র লোক উপযুক্ত খাদ্যাভাবে ও রোগে মারা পড়িতেছে—ইহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। আবার এ দিকে বাঁধ অপেক্ষা নিম্ন স্থানগুলি যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের ধারণা এই যে, বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে ঐ নিম্ন স্থানগুলিতে অধিক পরিমাণে জল প্রবেশ করিয়া শস্তের ক্ষতি করিবে।

১৯২২ সালে ঐ স্থানের কয়েকজন বাসিন্দা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় একদিন রাত্রিতে লোহাগড়ার বাঁধটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহার পর হইতেই ঐ স্থানের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। পরে জমীদারগণ তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় নাই বুঝিতে পারিয়া এবং প্রবল লোকমতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পারিয়া নূতন বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। আমার অনুরোধক্রমে স্বাস্থ্যবিভাগ এই স্থানের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করিয়া, খালগুলিতে জলপূর্ণ করিবার পর পুনরায় স্বাস্থ্য পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থাটি ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রধান উপায়।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

রঙ্গলাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন (১৮২৭-১৮৪৩)

উপক্রমণিকা। উষা চিরদিনই আমাদের নিকট আনন্দদায়িনী। প্রভাতের বিমল আলোক সুন্দর, মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি মোহনাশিনী ও তেজঃ সঞ্চারিণী, সন্ধ্যায় অস্তাচলগামী রবির কিরণমালা মাধুর্য্যময়ী, রজনীর গাঢ় নিস্তব্ধতা শান্তিপ্রদায়িনী, কিন্তু আমাদের নিকট উষাই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্ত-হারিণী। রজনীর গাঢ় তমিস্রা অপসারিত করিয়া উষা যখন ধীরে ধীরে শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হয়, তখন আমাদের প্রাণে কি এক অভূতপূর্ব্ব আশা ও আনন্দের উদ্রেক হয়। জানি, উষায় প্রভাতের সে উজ্জ্বলতা নাই, মধ্যাহ্নের সে প্রখর দীপ্তি নাই, সন্ধ্যার সে কমনীয় মাধুর্য্য নাই, রজনীর সে সর্ব্বসন্তাপহারিণী শক্তি নাই, তথাপি আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিদায়িনী। উষা অন্ধকারের পর আলোকের কিরণরশ্মি লইয়া আসে, সুপ্তির মধ্যে প্রথম চেতনা লইয়া আসে, অবসাদের পর উৎসাহ লইয়া আসে, নিরাশার মধ্যে আশার বাণী লইয়া আসে। উষাই তাহার মোহন স্পর্শে আমাদের আলস্য বিদূরিত করিয়া কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিতে উদ্বোধিত করে। উষাই দিবসের ভবিষ্যৎ গৌরব-দীপ্তির আভাস প্রদান করে।

যখন 'অমৃতভাষী' ভারতচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণ-কারিগণের অসার ও অশ্লীল কাব্যাদিতে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য পরিপ্লাবিত—কলুষিত, সেই অন্ধকার যুগের শেষে রঙ্গলালের আবির্ভাব। বঙ্গীয় কাব্যজগতে তমিস্রাময়ী রজনীর অবসানে রঙ্গলাল উষার ন্যায় পবিত্রতা, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য আনিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি-আশার প্রথম আলোকরশ্মি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে নূতন আদর্শ আনিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রতিভাপ্রদীপ্ত কাব্যাবলী মনোমোহিনী ও চিরানন্দদায়িনী, হেমচন্দ্রের জ্বালাময়ী ও ওজস্বিনী রচনা সঞ্জীবনী ও প্রদা-হিনী শক্তিবিশিষ্টা, রবীন্দ্রের মধুর কান্ত পদাবলী সন্তাপ-হারিণী ও চিত্তবিনোদিনী। রঙ্গলালে মধুসূদনের সে প্রতিভার দীপ্তি, হেমচন্দ্রের সে জ্বালাময়ী উদ্দীপনা, রবীন্দ্র-নাথের সে শান্ত মাধুর্য্য নাই। তথাপি আজি বাঙ্গালা-কাব্যসাহিত্যের একটী গৌরবময় যুগের অবসান সময়ে যুগপ্রবর্ত্তক রঙ্গলালের জীবনের সাহিত্য সাধনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদিগের নিকট অতীব প্রীতিকরী।

জন্ম ও বংশবিবরণ। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাল্না নগরীর সন্নিকটে বাকুলিয়া নামক একটী গ্রাম আছে। ১২৩৪ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে) বৃহস্পতিবারে এই গ্রামে মাতুলালয়ে রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন। রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, সম্প্রতি পরলোকগতা নিত্যকালী দেবীর নিকট শুনিয়াছি যে তিনি কবিবরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পৌষ মাসে উক্ত তিথিতে নববস্ত্র আনাইয়া পরিধান করাইতেন।

যে রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটীবংশে যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জাতীয় কবি হেমচন্দ্র, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পুণ্যশ্লোক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশেই কবিবর রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন। * রঙ্গলালের পূর্ব্বপুরুষগণ রামেশ্বরপুরে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র, শুনা যায়, অন্যূন দুইশত বিবাহ করিয়াছিলেন। রঙ্গলালের পিতা রামনারায়ণও তৎ-

* বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থের ২৯৭-৮ পৃষ্ঠায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক গণ বিস্তারিত বংশলতা দেখিতে পাইবেন।

কালীন প্রথানুসারে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন—তাঁহার ষোলটি পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন। রামনারায়ণ মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ছোট দেওয়ান ছিলেন এবং নবাবদরবারে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহার সর্ব্ব সমেত সাতটী পুত্র হয়, যথা—যজ্ঞেশ্বর, তারাচাঁদ, গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন ও হরিমোহন। ইঁহাদের মধ্যে গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল ও হরিমোহন সহোদর ছিলেন। ইঁহাদিগের জননীর নাম হরসুন্দরী দেবী।

মাতৃকুল। পিতার বহু বিবাহ এবং রঙ্গলালের আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ, এই দুই কারণে রঙ্গলাল ও তাঁহার সহোদরগণ বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়েই শৈশবে লালিত পালিত হন এবং তাঁহার চরিত্রের উপর তাঁহার জননী ও মাতুলগণের প্রভাবই বেশী লক্ষিত হইয়াছিল।

রঙ্গলালের মাতামহ রামনিধি মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাকুলিয়ায় তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারা সেকালে তিনি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন।

রামনিধির পাঁচ পুত্র—রামকমল, রামকুমার মধুসূদন, দীননাথ ও চন্দ্রমোহন।

রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ মাতুল অধ্যবসায়ের বলে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও তৎকালীন সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বাল্যকালে গুপ্তিপাড়ায় ইঁহার বিবাহের পর ইঁহার শ্বশুরমহাশয় জামাতাকে গৃহে রাখিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য অত্যন্ত তাড়না করায় একদিন রামকমল বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বহু দেশ ভ্রমণান্তে অবশেষে তিনি পূর্ণিয়া নগরে উপস্থিত হন। এই স্থানে ঘটনাচক্রে তত্রত্য য়ুরোপীয় এঞ্জিনীয়ারের দৃষ্টিপথে তিনি পতিত হন। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক রামকমলের নিরাশ্রয় অবস্থা অবলোকন করিয়া, এবং তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর প্রভৃতির পরীক্ষা লইয়া এঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হন এবং তাঁহার অধীনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও সততার পরিচয় পাইয়া উক্ত সাহেব তাঁহাকে উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রদান করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে রামকমল বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। এই সময়ে একবার দেশে আগমন করিয়া মহাসমারোহে ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করেন। কয়েক বৎসর পরে উক্ত এঞ্জিনিয়ার কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়মে বদলি হইলে, রামকমলও তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় আগমন করেন এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে খিদিরপুরে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানেই ক্রমে ক্রমে তিনি দশ বিঘা পরিমিত জমির উপর প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম আবাস-ভবন নির্ম্মিত করেন এবং অনেক ভূমিসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করেন। এখনও খিদিরপুরে (ইঁহার নামানুসারে কথিত) রামকমল ষ্ট্রীটে ইঁহার আবাস-ভবন জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে (বাং ১৮ই শ্রাবণ ১২৫২ সালে) ইনি পরলোক গমন করেন। শুনা যায়, ইনি মৃত্যুকালে সাত আট লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। উহার অধিকাংশই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রী গোপাল জীউর নামে উৎসৃষ্ট করেন, কারণ রামকমলের কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই। পুত্রলাভের জন্য রামকমল প্রথমা পত্নী বরদাসুন্দরীর জীবিতকালে ৺মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি-আই-ই মহোদয়ের ভগিনী দুর্গামণিকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পরে সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ৺ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পিতৃস্বসা কৈলাসবাসিনীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামকমলের পুত্রলাভাশা সফল হয় নাই।

রামকমলের সংসারে রঙ্গলাল জননী হরসুন্দরী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। বধূগণ সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, হরসুন্দরী বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং প্রকাণ্ড মুখোপাধ্যায়-পরিবারের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। রামকমলের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বরদাসুন্দরীই কিন্তু রঙ্গলাল ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের অধিকতর তত্ত্বাবধান করিতেন,

এবং বাল্যকালেই সকলে মাতৃহীন হইলে তিনিই তাঁহাদিগের জননীর অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ইনি সেকালের কবিদিগের অনেক রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং স্বয়ং রন্ধন করিতে করিতে বা অন্য কোনও গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে অনর্গল পয়ার রচনা করিতে পারিতেন। গণেশচন্দ্র ও রঙ্গলালের কাব্যানুরাগ কতদূর ইঁহার নিকট হইতে লব্ধ, তাহা বলিতে পারা যায় না।

রামকমল কতদূর ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায় না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ১৫বৎসর গত হইল মেজর কলনেট আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়কে কতকগুলি পুস্তক প্রদান করেন। ঐ সকল পুস্তক মধ্যে ষ্টলিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণ নামক গ্রন্থ ছিল। আমার তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। আমি গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করি, ইত্যাদি।" এতদ্বারা প্রতীত হয় যে, তিনি ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস পাঠ করিতেন, নতুবা মেজর কলনেট রামকমলকে ঐ সকল পুস্তক কখনও উপহার দিতেন না। ভাগিনেয়দিগের ইংরাজীশিক্ষার ব্যবস্থা করায় ইহাও বোধ হয় যে, তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

অপুত্রক রামকমল ভাগিনেয়দিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে বাস করিবার জন্য উপযুক্ত বাটী দিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরমপত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, তাঁহার ভাগিনেয়গণ যত দিন ইচ্ছা তাঁহার নিজ বাটীতে বাস ও আহারাদি করিতে এবং তাঁহার গাড়ীঘোড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন। রামকমল-প্রদত্ত বাটীটির সংস্কার ও কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া রঙ্গলাল উহাতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন এবং এই 'কবি রঙ্গলাল কুটীরেই' তাঁহার বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন।

রঙ্গলালের সহোদরগণ। রঙ্গলালের সহোদরগণের বিষয়ে এই স্থলে সংক্ষেপে কিছু বলা কর্ত্তব্য। রঙ্গলালের অগ্রজ গণেশচন্দ্র কাব্যানুরাগী ছিলেন। ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণের কনিষ্ঠা কন্যা বরাঙ্গী দেবীকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার সেরিফের আফিসে কর্ম্ম করিতেন। ইনি এককালে সুকবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১২৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ইঁহার "চিত্ত সন্তোষিণী" নামক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্যসন্দর্ভ' বলিয়াছিলেন, "তাঁহার রচনায় প্রোজ্জ্বল সদ্ভাবপূর্ণ বর্ণনা আছে; তাঁহার রচনায় লালিত্য মনোহর হইয়াছে এবং বাক্‌চাতুর্য্য অবশ্য প্রশংসনীয় মানিতে হইবে।" উক্ত বৎসরেই প্রকাশিত উঁহার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ "ঋতুদর্পণও" রহস্য-"সন্দর্ভের" সমালোচকের প্রশংসালাভ করিয়াছিল।

রঙ্গলালের কনিষ্ঠ সহোদর হরিমোহন রেশমের ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনিই ইঁহাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের খিদিরপুরস্থ বাটী ক্রয় করেন। রঙ্গলালের ন্যায় হরিমোহনও মাইকেলকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার জননী জাহ্নবী দাসীকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। মধুসূদনের বাটী ক্রয় করিবার পর একবার উক্ত বাটীতে হরিমোহন জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে মাইকেলকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি আসিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার স্বর্গগতা জননীর উদ্দেশে বলেন "মা! তুমি কোথায়? আজ আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র তোমার বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখ! তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি।" হরিমোহনের সুযোগ্য পুত্র রায় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক সৎ কীর্ত্তির কথা খিদিরপুরবাসিগণের স্মৃতিপটে এখনও জাগরূক আছে।

পিতৃবিয়োগ—প্রাথমিক শিক্ষা। পাঁচ বৎসর বয়সে রঙ্গলাল বাকুলিয়ার পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন এবং কিছুদিন পরে স্থানীয় মিসনারী স্কুলে প্রবেশলাভ করেন। কিন্তু গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তখন সামান্য শিক্ষাই প্রদত্ত হইত। তাঁহার দূরদর্শী মাতুল রামকমল ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ

ভ্রাতৃগণ ও ভাগিনেয়দিগকে হুগলীতে (চুঁচুড়ায়) আনাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রামকমলের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার শ্যালক সদর আমীন গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অন্যান্য বালকগণের সহিত রঙ্গলালেরও থাকিবার ব্যবস্থা হইল। ইতঃপূর্ব্বেই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলালের পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং রামকমল ফোর্ট উইলিয়মে কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

হুগলী কলেজের ইতিহাস। এই দেশের রাজনীতিক ইতিহাসে, এইদেশের বাণিজ্যের ইতিহাসে, হুগলীর নাম চিরস্মরণীয়। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক ও পাঠকগণের নিকট হুগলী একটি পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। যে বাঙ্গালা সাহিত্য আজি য়ুরোপীয় মনীষিগণেরও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতেছে, যে বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গলায় ও বৃহত্তর বাঙ্গালায় সভ্যতা ও মানসিক উন্নতির বীজ রোপণ করিয়াছে, সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচারকার্য্যে হুগলীই সর্ব্ব প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। হুগলীতেই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্থানেই মিষ্টার (পরে স্যর চার্লস) উইলকিন্সের উপদেশানুসারে পঞ্চানন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কাঠের বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক হলহড প্রণীত ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই হুগলী নগরীতে রঙ্গলাল যে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাহা এক্ষণে হুগলী কলেজ নামে পরিচিত এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে পরিচালিত। কিন্তু যেমন কলিকাতায় হিন্দুকলেজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নহে, দেশবাসীর দ্বারা এবং দেশবাসীর অর্থে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইরূপ বর্ত্তমান হুগলী কলেজও একজন প্রাতস্মরণীয় দেশবাসীর অর্থে তাঁহারই চরমপত্রের নির্দ্দেশানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে বিদ্যালয়ে হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী বিচারপতি উদার ও ন্যায়পরায়ণ দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা হরচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা-হীনতায় মর্ম্মাহত কবি রঙ্গলাল বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে সুকবি গঙ্গাচরণ সরকার ও তাঁহার প্রসিদ্ধতর পুত্র সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, যে বিদ্যালয়ে 'ভারতউদ্ধারের' পরিহাসরসিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, সেই বিদ্যালয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় মহম্মদ মহসিনের কলেজ নামেই পরিচিত ছিল এবং তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইত।

পুণ্যশ্লোক হাজি মহম্মদ মহসীনের বিচিত্র জীবনকাহিনী প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং এস্থলে তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে স্বাক্ষরিত দানপত্রে পুণ্যাত্মা মহম্মদ মহসীন তাঁহার ৪৫০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের বিষয় সম্পত্তি ঈশ্বরের সেবার জন্য উৎসৃষ্ট করেন। মুসলমান ট্রষ্টিগণের আমলে কিছু অর্থ অপহৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ট্রষ্টীর কার্য্য গ্রহণ করেন এবং এই ব্যাপার লইয়া পুরাতন ট্রষ্টীগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমা প্রিভি কৌন্সিলে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বহুবৎসর ব্যাপী মোকদ্দমায় একটী সুফল এই হইল যে, বার্ষিক আয় ক্রমাগত জমিয়া ৮৬১১০ টাকা সঞ্চিত হইল। এই অর্থে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ মহসীনের কলেজ বা হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে প্রতি বৎসরের উদ্বৃত্ত অর্থ জমিয়া বার্ষিক আয় ৫১০০০৲ টাকায় দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান একটি আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন মহম্মদ মহসীন শিক্ষার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধার্ম্মিক মুসলমানগণ সেই শিক্ষাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করেন যে শিক্ষাদ্বারা মুসলমান শাস্ত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্বধর্ম্মে ভক্তি জন্মে। পক্ষান্তরে যে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, যে শিক্ষায় হিন্দুগণই প্রধানতঃ শিক্ষালাভ করিয়া সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের পবিত্র ধর্ম্মের নিন্দা করিবে, সে শিক্ষা কোনও ধার্ম্মিক মুসলমানের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৭৩

১। গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভূকৈলাস রাজবাটীতে রক্ষিত হস্তিদন্তোপরি নানাবর্ণে রঞ্জিত পুরাতন চিত্র দৃষ্টে ডি রতন কর্ত্তৃক অঙ্কিত পেন্সিল স্কেচ হইতে। (কুমার সত্যমোহন ঘোষাল—যাঁহার সৌজন্যে মূল চিত্রখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—বলেন যে এই চিত্রখানি রঙ্গলালের বলিয়াই তিনি আবাল্য শুনিয়া আসিয়াছেন। রঙ্গলালের পৌত্র শ্রীযুক্ত চিকণলালের মতে উহা রাজবাটীর জামাতা রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর গণেশচন্দ্রের প্রতিকৃতি হওয়াই সম্ভব, কারণ রঙ্গলাল এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে বিবৃত ঘটনাটীর জন্য কখনও গোঁফ রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে রঙ্গলালকে যাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছেন এইরূপ প্রবীণ পাঠকগণের অভিপ্রায় জানিতে আমরা সমুৎসুক।

খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট মহসীন প্রদত্ত অর্থ সমস্তই মুসলমান দিগের জন্য তাঁহাদিগের উপযোগী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে হুগলী কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০০০০৲ বার্ষিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন।

হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার টমাস আলেকজাণ্ডার ওয়াইজ, এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেম্‌স্ সদারল্যাণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।* ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীর সিভিলসার্জ্জন জেমস্

* ইনি নাবিক রূপে কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা জার্ণালের সহযোগী সম্পাদক হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বেঙ্গল ক্রনিকেল (বেঙ্গল হরকরা) 'কলিকাতা ক্রনিকেল' ও বেঙ্গল হেরাল্ডের সম্পাদকীয় চক্রে যোগদান করেন। ১৮৩৭

ইসডেইল কচুকাল ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডের স্থানে অস্থায়ী ভাবে অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ক্লিণ্ট সাহেব যখন অধ্যক্ষ হন, তখন রঙ্গলাল কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল (২৮শে চৈত্র ১২৫৩ সাল) দিবসের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে হুগলী কলেজের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। উহার রচনা "একজন উক্ত পাঠ-

২। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—

(অতি পুরাতন বিবর্ণ-আলোকচিত্র দৃষ্টে রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নির্দ্দেশানুসারে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি হইতে)

শালার পূর্ব্বতন ছাত্রস্য।" রঙ্গলাল এই সময়ে সংবাদ প্রভাকরে প্রায় লিখিতেন, এবং এই রচনাটিও তাঁহার হওয়া সম্ভব। উহাতে রঙ্গলালের পাঠদশার সময়ের ইতিহাস বর্ণিত আছে বলিয়া আমরা উহা এস্থলে উদ্ধার করিতেছি :—

"হুগলী কলেজের সমুদয় বিবরণ।

"ইংরাজী ১৮৩৬ শকে ১লা জুলাই দিবসে চুঁচুড়া নগরস্থিত মৃত হাজি মহম্মদ মহসীনের কলেজ সংস্থাপিত হয়। এই প্রধান বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওনের পূর্ব্বে চুঁচুড়া চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি নগরে রাজপুরুষদের ভাষা কিম্বা দেশ ভাষায় সুচারুরূপে শিক্ষা হয় এমত কোন বিদ্যালয় বিরাজিত ছিল না, চুঁচুড়ানগরে লণ্ডন মিশনরীদের স্থাপিত যৎসামান্য এক অবৈতনিক পাঠশালা ছিল, তথায় যীশু খ্রীষ্টের গুণসংকীর্ত্তন যে সকল গ্রন্থে বর্ণনা আছে, ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের প্রাচুর্য্য থাকাতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা কেহ বিদ্যাভ্যাস করিত না, হুগলি এমামবাটীর অধীনস্থ মাদরসা সংক্রান্ত দাতব্য এক ইংরাজী পাঠশালা ছিল; এই পাঠশালার কার্য্য কেবল একজন শিক্ষক দ্বারা নির্ব্বাহ হইত এবং তত্ত্বাবধারণের অভাবে ও কোন বিশেষ নিয়মবদ্ধ না থাকাতে সুশৃঙ্খলারূপে পঠনাকার্য্য নিষ্পাদন হইত না, সুতরাং তৎকালে পূর্ব্বোক্ত নগরত্রয়ে ও তন্নিকটস্থ গ্রামের বালকবৃন্দের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় ছিল না, উল্লেখিত মাদরসা ও তৎসংক্রান্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় পূণ্যাত্মা মহম্মদ মহসীনের ধন হইতে চলিত, ঐ মহল্লোকের উত্তরাধিকারী না থাকাতে উইলে অর্থাৎ মুমূর্ষু-কালীনের দানপত্রে অন্যান্য সৎ ও পুণ্যজনক কর্ম্মের মধ্যে সধন ও নির্ধন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের বালকগণের বিদ্যাভ্যাস জন্য এক উপযুক্ত পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি লিখিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকেরা পূর্ব্বোক্ত ঐ সামান্য মাদরসা ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ পাঠশালাদ্বয়ের ব্যয় অত্যল্প ছিল, মহম্মদ মহসীনের বার্ষিক আয় ষষ্টি সহস্র মুদ্রার অধিক, কিন্তু এসমস্ত টাকা কেবল অপব্যয়ে শেষ হইত, কিয়ৎ কাল পরে দেশহিতৈষী শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলীস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ দ্বারা এমামবাটীর সমস্ত ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করাইতে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট হুগলীর লোকেদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহম্মদ মহসীনের দানপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে উক্ত স্থানে এক উপযুক্ত কলেজ সংস্থাপিত করিতে বিদ্যাধ্যাপক সমাজের প্রতি অনুমতি করিলেন, উক্ত সভা উল্লেখিত শুভসময়ে বিদ্যার আলোক

খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক হন এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উহার অধ্যক্ষ হন। ইনি ডাঃ ইসডেইলের এক শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়।

করেন নাই, বরং নিজাধীন শিক্ষাদাতাদের যাহাতে পদোন্নতি হয় এমত নিরন্তর চেষ্টা করিতেন অনন্তর তিনি বিদ্যাধ্যাপনা সভার সম্পাদকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শ্রীযুক্ত জেম্‌স সদরলণ্ড সাহেব মহাশয় তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পাঠশালাস্থ সমুদয় ব্যক্তিরা আনন্দে পুলকিত হইল, ঐ মহাশয়ের সুশৃঙ্খলতা ও পারিপাট্য ও বাক্যের মিষ্টতা ও স্বভাবের সরলতা ও দয়া এবং পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি যে গুণ তাহা বর্ণে বর্ণনা করা যায় না, তিনি অধীনস্থ ছাত্রগণকে স্বীয় প্রিয় সন্ততির ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতেন, অলৌকিক কথা বা অপ্রিয় বাক্য তিনি জানিতেন না, ছাত্রদের যাহাতে মঙ্গল হয় এমত বিষয়ে অশেষ বিশেষরূপে মনোযোগ করিতেন, শিক্ষকবর্গের প্রতিও তাঁহার তদ্রূপ দৃষ্টি ছিল, তিনি অনেককে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছেন, কোন শিক্ষক বা পণ্ডিত বা মৌলবি কোন কর্ম্মানুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ভবনে গমন করিলে তিনি তাহাদের সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট করাইতেন পরে সদালাপ ও মধুর বচনে তাহাদের পরিতোষ জন্মাইয়া বিদায় করিতেন, অপিচ হিন্দু ধর্ম্মের কোন অংশে হানি না হয় তাঁহার এমত বিশেষ মনোযোগ ছিল, তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখুন, যৎকালীন চুচুড়ার একজন ধর্ম্মোপদেশক সাহেব হুগলী কলেজের উচ্চ-

৩। হাজি মহম্মদ মহসীন—)
(বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে

বিকীর্ণ করণার্থে ঐ প্রধান পাঠশালা স্থাপন করিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদনের ভার ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, পরে কথিত মহাশয়ের কায়িক পরিশ্রমে ও মানসিক যত্নে বিদ্যালয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অধ্যক্ষতাতে ও নিয়মাদিতে শিক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মকারকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কখন কাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ

শ্রেণীতে বাইবেল পাঠ করাইবার আশায় কয়েকখানা ঐ গ্রন্থ ও এক অনুরোধলিপি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি যে কি পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহার সবিশেষ তাঁহার অধীনস্থ পাঠার্থিরা কেবল বলিতে পারেন, পরে তিনি পত্রের প্রত্যুত্তর সম্বলিষ্ট উক্ত কতিপয় ধর্ম্মপুস্তক প্রতিপ্রেরণ করিলে ধর্ম্মোপদেষ্টা সাহেবের সহিত সংবাদ লিপিতে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তত্তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলে পত্রবাহুল্য হয়, এ জন্য এই মাত্র লিখিলাম যে ঐ ঈশু ধর্ম্মশিক্ষকের পরাজয় হইয়াছিল, অপরন্তু গৌড়ীয় ভাষার উন্নতির নিমিত্তে তিনি পণ্ডিত ও ছাত্র বর্গকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন, এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে বালকদিগকে উত্থিতকরণের সময় যে বালক ইংরাজী ও দেশভাষায় তুল্য পরীক্ষা দিতেন তিনিই উত্থিত হইতেন, যিনি দুই ভাষায় তুল্য ব্যুৎপন্ন না হইতেন তিনি কদাচ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিতেন না, এবং এদেশের পর্ব্বোপলক্ষে পাঠশালার অবকাশ দেওনের পূর্ব্বে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের অভিমতানুসারে বিদ্যালয়ের পাঠনাকার্য্য স্থগিত করিতেন, ফলতঃ তিনি বিদ্যামন্দিরস্থ সমস্ত লোকের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সকল কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিতেন, ইতিমধ্যে সদরলেণ্ড সাহেব পীড়িত হইয়া যখন জন্মভূমিতে প্রস্থান করেন তখন সুবিজ্ঞ শ্রীযুত ডাক্তার ইস্‌ডেইল সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনায় সকলে সন্তোষিত চিত ছিল, এবং তিনিও অনেক শিক্ষকের ও ছাত্রের উপকার করিয়াছিলেন, পরে সদরলণ্ড সাহেব স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ডাক্তার সাহেব অনেক প্রশংসাপত্র প্রাপণানন্তর অধ্যক্ষতা পদ হইতে অবসর হইলেন, তদনন্তর সদরলণ্ড সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া

৪। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—
(প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষ ভাবে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে)

অতি অল্প দিবস পরে মেরিণের সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হইলে কলেজাধ্যক্ষতা ভার শ্রীযুত এল ক্লিণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, সদরলণ্ড সাহেব যখন পাঠশালার শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবী ও ছাত্রগণ ও নগরবাসি মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে এড্রেস অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্র পাইয়া বিদায় হয়েন তখন অনেকেই শোকাকুলিত হইয়া নয়ননীর নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শ্রীযুত ক্লিণ্ট সাহেব মহাশয় হুগলি কালেজাধ্যক্ষ হইয়া কিঞ্চিৎকাল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অনন্তর কালেজের অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও মনোহর কুসুমোদ্যান ও পুস্তকালয় এবং তৎসংক্রান্ত পাঠার্থি সন্দোহ ও শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্ম্মকারক প্রভৃতি লোক তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন এবম্প্রকার বিবেচনা করতঃ আপনাকে ধন্য

৫। ৺রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর।

মানিয়া এককালে মদমত্ত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় এই মহাপুরুষ কালেজের অধ্যক্ষের আসনে উপবিষ্ট হইয়া জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারপতির ন্যায় (খোদাবন্দ গিরী) ও কথায় কথায় পাঠশালাস্থ ভৃত্যদিগের নাম ও বেতন কর্ত্তন এবং ছাত্রেরা অনুপস্থিত হইলে তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করিতেন, অপর শিক্ষকদিগের পদ ও মান বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ যাহাতে তাঁহারা অপ্রতিভ ও অপমানিত হয়েন এমত পথানুসন্ধানে নিয়ত থাকিতেন, যদি কোন শিক্ষক ও পণ্ডিত প্রভৃতিরা তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তবে তিনি তাহাদিগকে সম্মান না করিয়া কুবাক্য-বাণ নিক্ষেপণ দ্বারা তাহাদিগের মর্ম্মভেদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করাইতে বাধ্য করিতেন, এবম্প্রকার ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি কালেজস্থ সমস্ত লোককে যেরূপ জর্জ্জরীভূত করিয়াছিলেন তাহা লিখনে লেখনী কম্পমানা হয়, আহা, এমত মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ও দয়াবান্ সদরলণ্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে যে এক কটুভাষী ও নির্দ্দয় ও পর-পীড়াদায়ক ক্লিণ্ট সাহেব নিযুক্ত হইবেন ইহা আমাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। মহম্মদ মহসীনের কালেজ সংস্থাপনের মুখ্যোদ্দেশ্য এই যে দীন দরিদ্র সন্তানদিগকে বিনাবেতনে বিদ্যাদান করা কিন্তু এই পুণ্যাত্মা সাহেবের দ্বারা এই পাঠশালা সম্পূর্ণ বৈতনিক হইয়াছে, অপিচ তিনি যে হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী তাহার অন্য প্রমাণ দর্শাইবার আবশ্যক নাই এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে ঐ কালেজের ছুটি বিষয়ে কৌন্সেল অব এডুকেশনে অনুরোধ করিয়া যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই বিশেষ জানা যাইতেছে, যাহা হউক অধুনা তিনি যে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন ইহা উক্ত পাঠশালায় ছাত্র ও শিক্ষক প্রভৃতির সৌভাগ্যের বিষয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তিনি যেরূপ পুণ্যাত্মা ও যশস্বী তাহা তাঁহার বিদ্যাদান কালীন ব্যক্ত হইয়াছে। শুনিতেছি, যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব অন্য

দিনের মধ্যে উক্ত কালেজের সর্ব্বস ধরণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন. পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি যে এই বিজ্ঞবর মহাশয় সদরলেণ্ড সাহেবের ন্যায় যশস্বী হইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপকারে নিয়ত রত হউন।

হুগলী কলেজে প্রবেশ ও শিক্ষা। হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই রঙ্গলাল ও তাঁহার সহোদরগণ হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। হুগলী কলেজের উপরিযুক্ত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে যে, রঙ্গলালের ছাত্রাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ প্রদত্ত হইত এবং খ্রীষ্টীয় প্রভাব হইতে হিন্দু ছাত্রদিগকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখা হইত। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন রঙ্গলাল বিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। রঙ্গলালের কনিষ্ঠ সহোদর হরিমোহন, গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং কলেজের বার্ষিক বিবরণী হইতে প্রতীত হয় যে, ১৮৪০-১ খৃষ্টাব্দে উভয়েই উচ্চবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস ও ইংরাজী কাব্যের প্রতি রঙ্গলালের বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময়ে হুগলী কলেজে একজন সুপণ্ডিত বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহার নাম ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু-কলেজে ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ এবং গ্রীক ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে ইনিই প্রথম প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ অধিকার করেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী শিক্ষা-বিভাগে এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। ইনি হুগলী কলেজ-সংস্থাপকগণের অন্যতম। ইঁহার ইংরাজী অধ্যাপনা প্রণালী অতি সুন্দর ছিল এবং ছাত্রগণ ইঁহার নিকট পাঠ করিয়া ইংরাজী কাব্যাদির রস যথার্থ উপভোগ করিতেন। ইনি ইংরাজীতে সুলেখকও ছিলেন এবং Zarian ছদ্মনামে ইংরাজী সংবাদ পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তেত্রিশ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি অবসর গ্রহণ

৬। অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(দুষ্প্রাপ্য লিথো চিত্র হইতে)

৭। কবি রঙ্গলালের আবাসভবন—এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে।
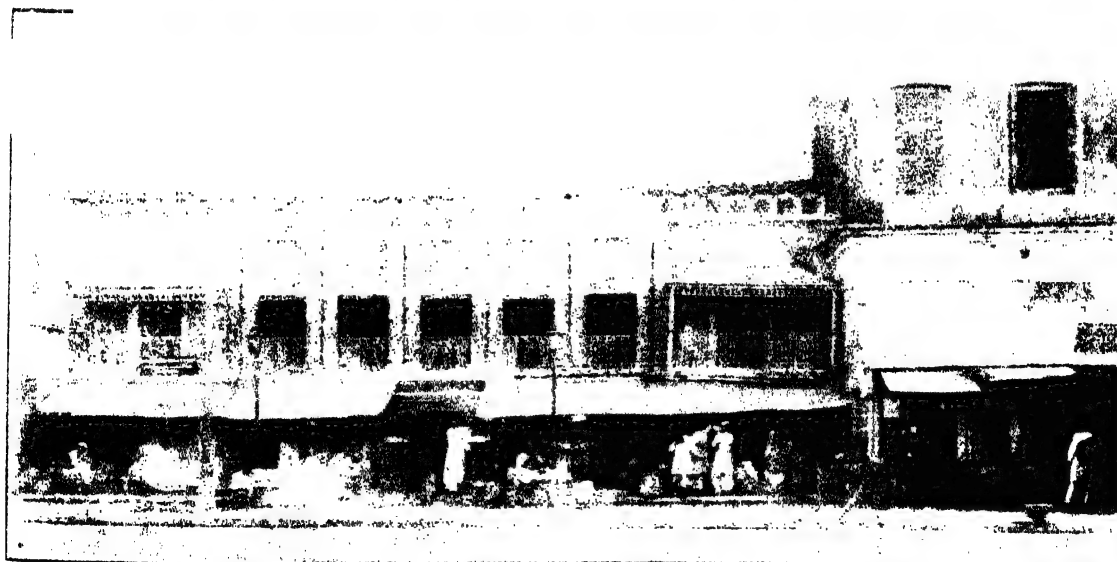
৮। মাইকেল মধুসূদন দত্তের খিদিরপুরস্থ আবাসভবন—পরে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্রীত। এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত আলোকচিত্র হইতে।

৯। প্রাচীন চুঁচুড়া নগর—ফোর্বস ওয়ার্দি গ্রাণ্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে।

১০। হুগলীর ইমাম বাড়ী ফোর্বস ওয়ার্দি গ্রাণ্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে।

করেন এবং অশীতি বৎসর বয়সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন দিবসে ইনি পরলোক গমন করেন।

বিবাহ ও মাতৃবিয়োগ। রঙ্গলালের পঠদ্দশাতেই, অনুমান ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে, মালিপোতার সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামে ৺দেবীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্তা রাখালদাসী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাখালদাসী সুশিক্ষিতা না হইলেও বুদ্ধিমতী ও গৃহকর্ম্মে নিপুণা ছিলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে রঙ্গলাল-জননী হরসুন্দরী দেহরক্ষা করেন। এই ঘটনার পর রঙ্গলাল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং সহোদরগণ সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকমলের খিদিরপুরস্থ বাটীতে বাস করিতে থাকেন।

কাব্যানুরাগ ও সাধনা। বাল্যকালে রঙ্গলাল যাত্রা-গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেকালের কথকতা ও যাত্রা লোকশিক্ষার একটি প্রধান যন্ত্রস্বরূপ ছিল। নিরক্ষর আবালবৃদ্ধবনিতা এই কথকতা ও যাত্রা শুনিয়া যে সন্নীতিশিক্ষা লাভ করিতেন, বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তদপেক্ষা অধিক নৈতিক শিক্ষা লাভ হয় কি না সন্দেহ। কবিবর হেমচন্দ্র বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার বাল্যস্মৃতিতে লিখিয়াছিলেন :—

"সে কালের প্রথা রামায়ণ-গান,
অপরাহ্নে শুনি, মোহিত হয়ে,
সমুদ্র-লঙ্ঘন, পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে, বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা-গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি যে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখি।

যাট বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজও সেদিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজও আছে।"

রঙ্গলালও বাল্যকালে এইরূপ যাত্রা-গান শুনিতে আনন্দ বোধ করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তন্ময় হইয়া যাত্রাগান শুনিতেন। তিনি পরে অনেক যাত্রার পালা ও গান স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তিনি বাল্যকালেও এরূপ তন্ময় হইয়া যাত্রাগান শুনিতেন যে, কথিত আছে একবার চক্ষু মুদিয়া একাগ্রচিত্তে গান শুনিবার সময়ে প্রজ্বলিত বাতি পড়িয়া তাঁহার ওষ্ঠের উপরিভাগ পুড়িয়া গিয়াছিল। সেই স্থানে গোঁফ না উঠায় তিনি বরাবর গোঁফ কামাইতেন। তাঁহার Service Bookএ (সরকারী কার্য্যের বিবরণপুস্তকে) এই চিহ্ন তাঁহাকে সনাক্ত করিবার চিহ্ন বলিয়া (mark of identification) লিখিত আছে।

বাল্যকাল হইতে এইরূপ সঙ্গীতাদি শ্রবণ ও অভিনয়াদি সন্দর্শন, কলেজে ইংরাজী অমূল্য কাব্য সম্পদের পরিচয় লাভ, 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি তাৎকালীন সংবাদপত্রের স্তম্ভেও কবিতাদি পাঠ, রঙ্গলালের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে। তিনি কৈশোর হইতেই নির্জ্জনে বসিয়া কবিতাদেবীর আরাধনা করিতেন। পুণ্যসলিলা গঙ্গার তটে উপবেশন করিয়া, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়ী শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, ভাবপ্রবণ বালক কবি একাগ্রচিত্তে কল্পনাদেবীর অর্চ্চনা করিতেন। পরিণত বয়সে রচিত তাঁহার কোনও কাব্যের মঙ্গলাচরণে তাঁহার এই নীরব সাধনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কবিতাশক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট তদ্বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তাঁহার কৈশোরের সাধনার যে চিত্র অঙ্কিত আছে, আমাদের অক্ষম তুলিকায় সে চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নহে :—

তুমি মম কিশোর কালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী॥
বিজনে তটিনীতটে শষ্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শ্রমহরি॥
তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি।
দেখাইতে নিসর্গের যত রূপরাশি॥

স্থলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাধুরী।
বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী ॥
তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন।
অতি পুরাতন বস্তু হইত নূতন ॥
দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি।
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্যলহরী ॥
এই যেন নব জবা কুসুম-সঙ্কাশ।
এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভা প্রকাশ ॥
সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব্ব রসান।
নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান ॥
প্রদোষে পশ্চিম দিগে সিন্দুরের রাগ।
যেন সোম করে তথা অগ্নিষ্টোম যাগ ॥
বিন্দু বিন্দু হিম-পাতে স্নিগ্ধ দিক্ দশ।
সোম-মুখ হতে কিবা চ্যুত সোমরস ॥
উদয়ে তারকাবলী, তব সহোদরা।
শিয়রেতে বসি প্রজ্ঞা, দেবীরূপ ধরা ॥
কহিতেন কত কথা সীমা নাহি তার।
ভ্রান্তি অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার ॥
স্তম্ভিত হইত তনু অভিভূত মন।
সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখন ॥
শেখর সাগর শোভা প্রথমে যখন।
নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন ॥
দর দর প্রবাহিত পুলকাশ্রুবারি।
সে ভাবের কণামাত্র বর্ণিতে কি পারি ॥
ফিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন।
নিরমল নীল নিভা-নিমজ্জিত মন ॥
বেলাকূলে অপরূপ শোভার সঞ্চার।
উপজিল অগণিত হীরকের হার ॥
ইন্দ্রনীল হিল্লোলেতে বিবদ মেলকে।
অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে ॥
তমোময় মানুষের মানসে যেমন।
বিজ্ঞান বিমল বিভা দেয় দরশন ॥

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

পথ ভুলে

এসেছিলে পথ ভুলে
জীবনের শুষ্ক মূলে
বারি বরষিয়া,
পরশ মাণিক ছুঁয়ে
দুঃখ দৈন্য গেল ধুয়ে
রতন লভিয়া,
বুকের মাঝারে তোরে
গাঁথিবারে কণ্ঠ ডোরে
আকুল মায়ায়,
শূন্য দুগ্ধ স্তনদ্বয়
অমৃতের ধারা বয়
পরিপূর্ণতায়।

সঞ্জীবনী সুধা-নীর
দুগ্ধ স্রোতে বহে ক্ষীর
প্রাণ ভরি দিয়া,
তোমারে অমর করে
রাখিবারে বিশ্বে ধরে'
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া,
অবারিত দেহ মন,
তব প্রেমে নিমগন,
দুগ্ধ মন্দাকিনী
মাতৃ বক্ষে উথলিয়া,
শত ধারে প্রবাহিয়া
সঞ্চারে জীবনী,

শৈশব যৌবন দোঁহে
একাকার প্রীতি মোহে
অভেদ আত্মায়,
চিত্ত আবরণ খুলি
হৃদয় আসনে তুলি
শিশু দেবতায়
পূজিবারে আকিঞ্চন,
সর্ব্ব অঙ্গে আয়োজন,
পানীয় সুধায়!
মায়ের জীবন সরে,
সন্তানের ভোগ করে,
মিটায় ক্ষুধায়,
সেই সে অমিয় পিয়া,
জননীকে আশ্বাসিয়া,
আশা ইন্দ্রধনু,
আঁকিয়া নয়নে তার
বিশ্ব করি চমৎকার
অতনুর তনু,
সুকুমার নবনীত
মাতৃ অঙ্ক আলোকিত
নগ্নশিশু রূপে,
মাতা পুত্রে এক প্রাণ
নাহি ছিল ব্যবধান
অস্তিত্ব স্বরূপে,
কোন পথে কোথা দিয়া
এত বর্ণ ছটা নিয়া
শিশু রাজ্যেশ্বর
এসেছিলে ধরাতলে
বাড়ি উঠি পলে পলে
ভরিয়া অন্তর,
অবনীরে পায়ে ঠেলি,
কৌতুকে বর্ত্তুল খেলি,
চলে গেলে হেসে,
ফেলি রাখি হাহাকারে
মায়ের লোচনাসারে
রাখি গেলে শেষে!
আসি হেথা পথ ভুলে
জীবনের কূলে কূলে
তরঙ্গ তুলিয়া,
যে জীবন স্পর্শে গড়ি
সৃজিলে নবীন করি,
আবার ভুলিয়া
ফেলে তারে গেলে চলি
কোন রাজ্যে, নাহি বলি
পথ খুঁজি তায়,
শুধু হেরি কল্পনায়
দীপ্তিমতী তারকায়
প্রতিবিম্ব ভায়
জীর্ণ শীর্ণ বক্ষে আর
নাহি দুগ্ধ সুধা ধার
ফিরাতে তোমায়।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা পরীক্ষা

বর্ষে বর্ষেই এই বিষয় লিখিয়া থাকি, কিন্তু পঠন-পাঠনের কিছুই উন্নতি দেখি না। গত বারে বি-এর বাঙ্গালা কাগজ পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা ও ইংরাজি শিক্ষা এবং মনের গঠন প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন বি-এ পাশ করিয়া হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালী যুবকেরা কি হইয়া বাহির হইতেছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ "শ্রীশবাবু" প্রথমে বাহির করেন, এই

কথা যে পরীক্ষার্থী লিখিতে পারে—সে কি? তাহাকে যে বোঝাই ভার। শ্রীশবাবু কে? তিনি অমিত্রাক্ষরে কোন্ পুস্তক লিখিয়াছিলেন? সুখের বিষয় এই যে, একটিমাত্র পরীক্ষার্থী এইরূপ লিখিয়াছিল। অন্তেরা মাইকেল মধুসূদনের নামই করিয়াছে। কিন্তু ঐ নামটি বানান করিতে শিখে নাই। কেহ বা মধূসুধন, কেহ না মধুসুধন, কেহ বা মধুসুধন বাবু লিখিয়াছে। ইহারা বাঙ্গালী এবং সকলেই হিন্দু। হঠাৎ একবার ভুলক্রমে লিখিয়াছে তাহা নহে; কোন কোন পরীক্ষার্থী দুইবার তিনবার এইরূপ লিখিয়াছে।

"অমিত্রাক্ষর" বানান করা অনেকের পক্ষেই বড় কঠিন হইয়াছিল। সেই বিখ্যাত উকিলের মুহুরীর পক্ষে "মৃত্যুঞ্জয়" নাম বানান করা যত কঠিন হইয়াছিল, অমিত্রাক্ষর শব্দের বানান তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই কম কঠিন হয় নাই। কেহ লিখিয়াছে অমৃতাক্ষর, কেহ অমিতাক্ষর, কেহ ইংরাজীতে লিখিয়া সকল আপদ বালাই এড়াইয়াছে। কিন্তু হা আমার পোড়া কপাল! বি-এ পরীক্ষার্থিগণ ইংরাজীই কি শিখিয়াছে? "Black verse" কথার মানে কি? অমিত্রাক্ষরের ইংরাজী কি Black verse?

একটি পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে "তিনি (মাইকেল) অনুপ্রাশ ছন্দে কাব্য লিখিয়াছিলেন।" অমিত্রাক্ষরের এও কি একটা নাম নাকি? "অনুপ্রাশ" কি একটা ছন্দ? বি, এ পরীক্ষায় এরূপ উত্তর পাইলে সে পরীক্ষার্থীকে কি করিতে ইচ্ছা হয়? ইহারা কিন্তু অনেকেই পাস হইয়া গিয়াছে।

তারপর আর এক কথা। অর্থশূন্য গালভরা শব্দ ব্যবহার করা একটা রোগের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয়, ইহা কোন কোন বিখ্যাত লেখকের অনুকরণের কুফল। ইহাতে মস্তিষ্কের জড়তা বুঝা যায়। কথাগুলির অর্থ থাক আর নাই থাক, বড় বড় হওয়া চাই এবং শুনিতে মধুর হওয়া চাই। আমি বিবেচনা করি যে, ইহা ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়বিলাস সূচিত করে। "তিনি অনুপ্রাশ ছন্দে কাব্য লিখিয়াছেন। ...এই ছন্দে বাঙ্গালা কাব্য জগতে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে।" দেখিবেন শব্দবিন্যাস কেমন মধুর, জগতে যুগান্তর কেমন অনুপ্রাস, এবং জগতে যুগান্তর কি প্রকাণ্ড ব্যাপার! সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষর রচনা করিয়া জগতে যুগান্তর আনার কোন অর্থ হউক বা না হউক, এতবড় সুযোগ ছাড়া যাইতে পারে না। সে কালের এক গুরু-মহাশয় তাঁহার বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখিতে বলিয়াছিলেন। বন্ধু চিঠি লিখিয়া আনিলে তিনি বলিলেন "ভাই, 'সুতরাং' কথাটা কোন জায়গায় লেখ নি? কথাটা ভাল; একটা জায়গায় বসিয়ে দাও।" অগত্যা বন্ধু তাহাই করিলেন। পরীক্ষার্থীরাও ভাল কথা ব্যবহার করার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই, তাহাতে অর্থ হউক আর না হউক।

ছন্দটা অমিত্রাক্ষর হউক আর অমৃতাক্ষরই হউক অথবা অমিতাক্ষরই হউক, কিংবা 'অনুপ্রাশ' ছন্দই হউক, যাহাই কেন না হউক, এ ছন্দের লক্ষণ বাবাজীরা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাইতে হয়। এই ছন্দে নাকি "১৪টি করিয়া লাইন থাকে।" এই ছন্দের "বিশেষত্ব এই যে, ছন্দের মধ্যে পরস্পরের মিল নাই এবং এই ছন্দের মধ্যে যে ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহা সেই ছন্দে শেষ লাভ হইতে পারে।" কেহ যদি এই বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন, তবে তিনি ধন্য পুরুষ।

যাহা হউক "মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথমে বাঙ্গালায় মিতাক্ষর ছন্দে লিখেন। তাহার পুর্ব্বে বাঙ্গালায় মিতাক্ষর ছন্দে লিখা কোন পুস্তক ছিল না।" একথা একটি পরীক্ষার্থী নিশ্চয় বুঝিয়াছিল। মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতার উল্লেখ করিতে গিয়া একজন লিখিয়াছে, "মধুসুদন বাবু চতুর্দ্দশ পদাবলী কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় হইতে পারে এই পরীক্ষা প্রথম তিলোত্তমা প্রথম পরীক্ষা করেন।" বাঃ—কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব?

মাইকেল দত্তের যথাবিধি সৎকার করিয়া, "রবিন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে একটি পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে, "কবিসম্রাট রবিন্দ্র-

নাথ শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে"। মাথা মুণ্ডু কি লিখে তাহা পড়িয়াও দেখে না!

বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ষে বর্ষেই অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হন। গত বারে একটি পরীক্ষার্থী তাঁহাকে "একটি ধুতি ও একটি চাদর পরিধান" করাইয়া "পায়ে একটি কাষ্ঠ-পাদুকা ধারণ" করাইয়া "বড় বড় লোকের সহিত দেখা" করাইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় প্রতিভা এবং অধ্যবসায় বলে অনেক দুঃসাধ্য দেশহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক পায়ে একটি কাষ্ঠ-পাদুকা ধারণ করিয়া কেমন করিয়া তিনি চলাফেরা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিতে আমার হৃৎকম্প হয়।

তৃতীয় সনে কয়েকজন পরীক্ষার্থী বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "বঙ্গভাষার জননী" বানাইয়াছিল। এবার একটি পরীক্ষার্থী বঙ্কিমচন্দ্রের "অপূর্ব্ব সতীত্বের পরিচয়" পাইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার নামটি শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে নাই। এই পরীক্ষার্থীর হাতে পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্কিক চন্দ্র" হইয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনন্যসাধারণ দানশীলতার পরিচয় দিতে গিয়া একজন লিখিয়াছে—"যখন ৭৬ মনন্তার ঘটে তখন তিনি অবারিত দান করিয়াছিলেন"। ৭৬ মনন্তার কি, তাহা কোনরূপে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন কোথায় ছিলেন? সে ত তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা। এ পরীক্ষার্থী তাহা জানিল কোন্ যোগ বলে?

একজন পরীক্ষার্থী একটি নূতন ছন্দের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার নাম "ত্রিপদ" ছন্দ।

আর একজন পরীক্ষার্থী অমিত্রাক্ষর ছন্দে "কার্ব্য" রচনা করার কথা লিখিয়াছে। অপর একজন পরীক্ষার্থী "ভাঙ্গালা ভাষায়" রচনার কথা লিখিয়া ধন্য হইয়াছে।

একটি পরীক্ষার্থী র-ফলা উঠাইয়া দিয়াছে। সে "কবিন্দ রবিন্দ নাথের" কথা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছে। কোন কোন পরীক্ষার্থী "মনুষ্যরস" আবিষ্কার করিয়া বিশেষ রসিকতার পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু এ রসটি কি? রচনার ভঙ্গিতেও একটি পরীক্ষার্থী অনুকরণপ্রিয়তার পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছে। সে লিখিয়াছে "নক্ষত্রপুষ্পহীন গগনোদ্যান অন্ধকারময়ী।" ইহাই নাকি হাল ফ্যাসন। অপূর্ণ পদ, ক্রিয়াহীন বিশেষ্য, বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গভেদ, এ সকল না ব্যবহার করিলে আজকাল জাতি থাকে না। কেহ কেহ বলেন, হাতের জলই শুদ্ধ হয় না।

"অমানিশা রজনী" কাহাকে বলে? আজিকালি যেমন 'অশ্রুজল' চলতি হইয়াছে, তেমনি 'অমানিশা রজনী'ও একটি পরীক্ষার্থী চালাইতে চাহিয়াছে।

"রাজ্য", "জগৎ" ও "বিশ্ব" এই তিনটি কথা আজকাল বড়ই বিপদগ্রস্ত। যেখানে সেখানে ইহাদিগকে টানিয়া লইয়া লোকে ইহাদিগকে বড়ই বিব্রত করিতেছে। কেহ লিখে "বস্তু জগৎ," কেহ লিখে "সাহিত্য জগৎ," কেহ লিখে "পশু রাজ্য," কেহ লিখে "মানব রাজ্য," কেহ লিখে "বিশ্ব কবি", কেহ লিখে "বিশ্ব জগৎ"। আমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে জগৎ, বিশ্ব এবং রাজ্য শব্দের অর্থ কি কোন অভিধানে পাওয়া যায় না? কোন কোন বিখ্যাত গ্রন্থকার এ তিনটি শব্দের অপব্যবহার করেন বলিয়া পরীক্ষার্থিগণের তদ্রূপ করা উচিত নহে। "বিশ্বের সর্ব্বত্র দেশাত্ম বোধ জাগিয়াছে;" "বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবুক"; "কি মানব রাজ্যে কি পশুরাজ্যে সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই যে সাধনা ব্যতীত কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।" আমি বলি রাজ্য যা' হয় তা' হউক, পশুরাও কি সাধনা করে নাকি? সাধনা কথাটার মানেই বা কি? সকল চেষ্টাকে কি সাধনা বলে?—একটু হিসাব করিয়া লিখিতে হয়।

ঝঙ্কারময় শ্রুতিমধুর অর্থহীন রচনা লিখিতে নাই। বিখ্যাত ব্যক্তিগণ লিখিলে পাঠক গলদঘর্ম্ম হইয়াও কোন রকমে অর্থ করে। যেখানে অর্থ করিতে মোটেই পারে না সেখানে অত্যন্ত প্রশংসা করে। কিন্তু যদি পরীক্ষার্থী লিখে যে, অন্ধকারময়ী রজনী নক্ষত্র পুষ্পশোভিত গগনোদ্যান চন্দ্রকিরণে আলোকিত করিতেছে," তাহা হইলে পরীক্ষক বড়ই বিপদগ্রস্ত হয়; কষ্টকল্পনা করিয়া অর্থ বুঝিতে সকল সময় প্রবৃত্তি হয় না।

মেঘনাদবধ কাব্যের কথা কোন্ শিক্ষিত বাঙ্গালী

না শুনিয়াছে? কালিদাসের মেঘদূতের কথাই বা কে না জানে? কিন্তু একটি পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে "তিলোত্তমার জন্যই মেঘদূত ইত্যাদি রচনা সম্ভব হইয়াছিল।" পরীক্ষার্থীর উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় মেঘনাদবধ কাব্য, কিন্তু লিখিয়া ফেলিয়াছে মেঘদূত!

বর্ণ-বিন্যাস অনেকেই অদ্ভুত রকম করিয়াছে। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিতেছি;—উপস্তিত, বিরোদ, ক্রমতা, ক্ষুতাতুর, সত্তকথায়, অস্ত, স্বদেশহিতৌষিতা, সুসম্পন্ন, সত্বা, কবী, যগতে, ভারতবর্ষ্য।—ক্রমতার অর্থ বোধ হয় ক্ষমতা; সত্ব এবং সত্ত বোধ হয় সত্য; অস্ত অর্থ বোধ হয় অন্ন। আর কয়েকটির অর্থ সহজেই বোধগম্য হইবে।

বানান করিতে শিখে নাই; অর্থ করিতে শিখে নাই; বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের এবং সুপরিচিত ছন্দের নাম জানে না; ব্যাকরণের জ্ঞান নাই; অনেকের হস্তাক্ষর শিশুর অক্ষরের মত; তবে বাঙ্গালা পরীক্ষা দেওয়া কেন? বাঙ্গালা পরীক্ষা করাই বা কেন?

বাঙ্গলা রীতিমত পড়াইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অধ্যাপক নিয়োগ করা উচিত। বিনা খাতিরে পাঠ্যগ্রন্থ নির্ণয় করিয়া দেওয়া উচিত। যে বিষয় শিখাইতে হইবে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। এ সকল কথা পূর্ব্ব বৎসরেও বলিয়াছি। কিন্তু কাহাকে বলি? শুনেই বা কে?

বিএ পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালার বিদ্যা ত দেখিলাম। এখন ইংরাজী বিদ্যার কিছু পরিচয় লই। একটি পরীক্ষার্থী লিখিয়াছেন,, "Penny wise pound foolish অর্থাত একেবারে অধিক জমাইবার আশা অপেক্ষা প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া সঞ্চয় করা ভাল।" অপর একটি পরিক্ষার্থী লিখিয়াছে "ইংরাজীতে এইরূপ প্রবাদ বাক্য আছে যে A man whe speaks much must tell a lie।" অপর একজন পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে "Tennyson এর paradise Lost and Regained হইতে কোন অংশে খাট বলিয়া মনে হয়না।" যে বিএ পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইয়াছে হয় সে কি মিল্টনের নামও শুনে নাই? এ কেমন বি-এ পড়া?

আর একটি পরীক্ষার্থী লিখিয়াছে, "ইংরাজীতে একটা কথা আছে কথায় কথা বাড়ে"। এই ছাত্রটি কি বাঙ্গালী নয়? বাঙ্গালীর মধ্যেই ত এই কথাটি প্রচলিত আছে। সে তাহা জানে না কেন?

একটি পরীক্ষার্থী ডারউইনের নাম শুনিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দার্শনিক বলিয়া জানে। সে লিখিয়াছে "যদি আমরা বিখ্যাত দার্শনিক ডারউইনের উক্তি সমালোচনা করি" ইত্যাদি।

ইহাদিগের ইংরাজী বিদ্যার পরিচয় বর্ষে বর্ষে যেমন পাই, আলোচ্য বর্ষেও তেমনি পাইয়াছি। তবে বিশ্ব-বিদ্যালয় করে কি? যে সকল ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছে তাহারা এতদিন করিল কি? সহস্র সহস্রের মধ্যে দু'দশ জন সভ্যসমাজের সর্ব্বত্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রণম্য। কিন্তু আর সকলের কলঙ্ক কেমন করিয়া ঢাকিব? শিক্ষা হইল না, চরিত্রগঠন হইল না, উচ্চভাবে হৃদয় মণ্ডিত হইল না, বাহুবল, ধর্ম্মবল কিছুই হইল না। তবে কি হইল? এ দুঃখ রাখিব কোথায়?

যখন ভাবি ইহাদিগেরই উপর আমার মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে, তখন হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়া যাইতে চায়, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল অবসন্নবৎ হয়, এবং কণ্ঠরোধ হইয়া আসে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

শ্রীশশধর রায়।

সধবার আদর্শচ্যুতি

সধবা নারীর পরপুরুষাসক্তিকে ভিত্তি করিয়া এ পর্য্যন্ত যতগুলি উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর "চন্দ্রশেখর", শরৎবাবুর "গৃহদাহ" ও "দেবদাস", রবীন্দ্রবাবুর "ঘরে-বাইরে" এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবুর "অধঃপতন" উপন্যাস কয়খানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রবাবুর "নষ্টনীড়"কে যদিও ঠিক উপন্যাস বা ছোট গল্প বলা চলে না, তথাপি ইহার ভিত্তিও ঐ সধবা নারীর পরপুরুষাসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিধবার প্রেম এবং কুমারীর প্রেম লইয়া বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক ললিতবাবু, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস এবং প্রেমতত্ত্ব লইয়া এত অধিক আলোচনা করিয়াছেন যে, ঐ সম্বন্ধে পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি সধবা-নারীর আদর্শচ্যুতি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আমার মনে উদয় হইয়াছে, সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই, অধ্যাপক চন্দ্রশেখরের পত্নী শৈবলিনী, বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই, প্রতাপের অনুরাগিণী। জ্ঞাতিপুত্র বলিয়া প্রতাপের সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই। শৈবলিনী মনে মনে যাহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল, তাহার সহিত তাহার বিবাহ হইল না—তাহার বিবাহ হইল, দরিদ্র শাস্ত্রাধ্যায়ী চন্দ্রশেখরের সহিত। ফলে—শৈবলিনী প্রতাপের গুরুপত্নী হইয়াও, মুহূর্ত্তের জন্য প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না।

শৈবলিনী সধবা পরস্ত্রী হইয়াও বাল্যপ্রণয়ীকে ভুলিতে পারিল না। তাহার ফলে তাহার জীবন বিষময় হইয়া উঠিল। বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছের সহায়তায় সে কুলত্যাগিনী হইয়া প্রণয়ীর সন্ধানে বাহির হইল। যে প্রতাপের স্মৃতি তাহাকে স্বামিগৃহে তিষ্টিতে দেয় নাই, ঘটনাচক্রে সেই প্রতাপের বাসায় গিয়া সে উঠিল।

কিন্তু অসাধারণ ইন্দ্রিয়জয়ী প্রতাপ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন কি না, সে কথা তাঁহার মৃত্যুকালের উক্তি হইতে বুঝা যায়। যখন রামানন্দ স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ান মরণোন্মুখ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?" প্রতাপ বলিলেন, "কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে, যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে? কে বুঝিবে—এই ষোড়শ বৎসর ধরিয়া আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা।"

প্রতাপের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয় কিরূপ মহৎ এবং উন্নত ছিল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে কখনো না কখনো শৈবালনীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিতে পারে—ইহাই মনে করিয়া যুদ্ধে তিনি জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন। এরূপ আত্মত্যাগের চিত্র সাহিত্যজগতে অতুলনীয়।

শৈবলিনী স্বামী বর্ত্তমানে পরপুরুষকে ভালবাসিয়া মনের মধ্যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিল, এবং আত্মদমন করিবার চেষ্টা না করিয়া বাসনার স্রোতে ভাসিয়াছিল বলিয়া, তাহার জন্য যে গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রন্থকার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, হালের লেখকগণের রুচির সহিত তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি কতদূর উন্নত এবং মার্জ্জিত ছিল।

অপরিতৃপ্ত-বাসনা যুবতী-বাল-বিধবার পদস্খলনের চিত্রে হৃদয়ে করুণা ও সমবেদনার সঞ্চার হয়—ইহার কারণ এই যে—উহার পক্ষে extenuating circumstances আছে। উহার হৃদয়ের ক্ষুধা তো মিটে

নাই! কিন্তু ভ্রষ্টচরিত্রা সধবা নারীর পরপুরুষাসক্তির চিত্র হৃদয়ে গভীর ঘৃণার উদ্রেক করে। সধবা নারীর এই উৎকট কামকাতরতা, জঘন্য মনোভাব এবং অবৈধ প্রেমোন্মাদনার চিত্র অত্যন্ত ঘৃণাজনক।

শরৎবাবুর 'দেবদাস' গ্রন্থের নায়িকা পার্ব্বতী চিরকাল মনে মনে কাহার নাম জপ করিয়া আসিয়াছে? প্রতিবেশী, জমিদার-নন্দন, শৈশবসঙ্গী দেবদাসের। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই—দেবদাসের চরণে এবং তাহার পরাণে প্রেমের ফাঁদ লাগিয়াছিল; তথাপি পার্ব্বতীর বিবাহ হইল অন্য এক ব্যক্তির সহিত—তিনি জমিদার এবং বড় লোক এবং বয়সও কম নয়! তাঁহার বৃদ্ধ বয়স এবং সটাক্ মস্তক, যুবতী পত্নীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিল না। বৃদ্ধ স্বামীর কেশবিরল মস্তকে মৃণাল হস্ত বুলাইবার সময় পার্ব্বতীর হৃদয়ে কিরূপ ভাবের ঝড় বহিল, তাহা পার্ব্বতীই জানে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, পার্ব্বতী বাহিরে একজনের পত্নী হইয়া অন্তরে আর একজনের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিল। তাহার মনের এই দ্বৈতভাব প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎবাবুর বর্ণনায় সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পার্ব্বতীর এই যে মনোভাব, ইহা বৈধ নহে—ইহাতে তাহার মানস-ব্যভিচার ঘটিয়াছে—এই জন্যই গ্রন্থের সর্ব্বত্র সে আমাদের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে পারে না।

এই ভয়াবহ প্রণয়স্রোতে পড়িয়া দেবদাসের চরিত্র ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং শোচনীয়ভাবে অকালমৃত্যুতে তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহার এই পদস্খলন এবং অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী কে? আমাদের বিবেচনায় পরোক্ষভাবে দেখিতে গেলে, পার্ব্বতীই এই জন্য দায়ী। বিবাহের পর পার্ব্বতী যদি তাহাকে জানাইয়া দিত, সে চিত্তসংযম করিয়াছে, সে আর তাহাকে ভালবাসে না—তাহা হইলে দেবদাসের পরিণাম এমন শোচনীয় হইত না। কিন্তু পার্ব্বতী তাহা করে নাই; বরং সে দেবদাসের প্রণয়াবেগ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া—জলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া—তাহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। এই অনির্ব্বাণ-বহ্নিতে দেবদাস পতঙ্গ পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল।

পার্ব্বতী এবং দেবদাসের ভালবাসার মূলেও সেই বাল্যপ্রণয়। এক বৃন্তে দু'টী ফুলের মত তাহারা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু ফুটিবার অগ্রেই পৃথক হইয়া গেল।

পৃথক হইয়া গেল বলিয়াই তাহাদের পরিণাম এমন শোচনীয় হইল। তথাপি ইহা সত্য যে, পার্ব্বতী বিবাহের পর অন্যের অঙ্কশায়িনী হইয়াও, পরপুরুষ দেবদাসের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারে নাই—তাহার স্মৃতি অহরহঃ তাহাকে তুষানলে দগ্ধ করিয়াছে। পার্ব্বতীর এই যে মনোভাব, কাব্য হিসাবে ইহা অতিশয় করুণ-রসোদ্দীপক হইলেও, নিন্দনীয়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবুর 'অধঃপতন' গ্রন্থখানিও ঐ সধবা-নারীর আদর্শচ্যুতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুন্দরী, সুশীলা, সুধাময়ীকে বিবাহ করিয়া অতুলচন্দ্র মনে করিলেন, তিনি খুব জিতিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোথায় যে একটা চুরি চলিতেছিল, সে খবর তখন জানিতে পারেন নাই। যখন সেই চুরি ধরা পড়িল, তখন সমস্ত জগৎসংসার অতুলচন্দ্রের চক্ষে একটা শূন্য মরীচিকা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

ভবেশচন্দ্রের বাক্সের তলায় লুকানো সুধাময়ীর লিখিত চিঠির তাড়া কৌশলে হস্তগত করিয়া অতুলচন্দ্র বুঝিলেন, এতকাল তিনি সর্পীর সহবাসে জীবন যাপন করিয়াছেন। উপরে চাকচিক্য, ভিতরে অন্ধকার।

ভবেশচন্দ্র অতুলচন্দ্রের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সুধাময়ীর মৃত জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহপাঠী। সেই ভ্রাতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ভবেশের সহিত সুধাময়ীর প্রথম হৃদয়বিনিময় হয়; সেই তাহাদের প্রথম প্রণয়ের সূত্রপাত। তার পর ঘটনাচক্র পরস্পরকে বিভিন্ন পথে লইয়া গেল। পরিশেষে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানে, সুধাময়ীর

ওমর খৈয়াম

(শিল্পী—Roland Balfour)

আজ ফাগুনের আগুন-জ্বালে হুতাশ-বোনা শীতের বাস
পুড়িয়ে সে সব ছাই করে দাও—দাও আহুতি দুখের শ্বাস
আয়ু-বিহগ—খোঁজ রাখ কি মেলিয়ে ডানা উড়্‌ল হায়
পেয়ালাটুকু শেষ করে নাও—এক চুমুকেই ফাগুন যায়।

(শ্রীযুক্ত কান্তি ঘোষের অনুবাদ)

সহিত ভবেশের জ্ঞাতিখুল্লতাত অতুলচন্দ্রের বিবাহ হইল।

শ্বশুরালয়ে আবার বাল্যপ্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ পাইয়া, সুধাময়ীর সুপ্ত প্রণয় জাগিয়া উঠিল। সে পরস্ত্রী হইয়াও বাল্য প্রণয়ী ভবেশের আলিঙ্গনে ধরা দিল এবং তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া তাহাকে চুম্বন দান করিল। এই প্রবল প্রেমাবেগ, সম্পর্কবিচার পর্যন্ত লোপ পাইয়া গেল। সম্বন্ধে খুল্লতাত-পত্নী হইয়াও, ভাসুরপোকে প্রেমদান করিল।

সধবা নারী সুধাময়ীর এই শোচনীয় মানসিক অধঃপতনের চিত্র পাঠকের অন্তরে গভীর ঘৃণার উদ্রেক করে। সে অবৈধ প্রেমে মজিয়াছিল বলিয়া ইহজীবনের মত স্বামীর স্নেহ ভালবাসা হারাইল এবং পরিণামে বিষপান করিয়া তাহাকে সকল জ্বালা জুড়াইতে হইল। এই ক্ষেত্রে ভবেশের চিত্তসংযম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

স্বামী বর্ত্তমানে যে নারী মনে মনে পরপুরুষকে কামনা করে, তাহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। সুতরাং অতুলচন্দ্র যে অপরাধিনী পত্নীকে ক্ষমা করিতে পারে নাই, ইহার জন্য তাহাকে দোষ দিতে পারা যায় না। অতুলচন্দ্রের ঘোরতর অধঃপতনের জন্য দায়ী কে? অসচ্চরিত্রা পত্নী সুধাময়ী নহে কি? কাহার জন্য ভবেশচন্দ্রকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল? সুধাময়ীর জন্যই নহে কি?

আর যাহাই হোক, স্বামী কখনো পত্নীর অনাসক্তি সহ্য করিতে পারে না, এইজন্য অতুলচন্দ্রের সহস্র দোষ মার্জ্জনীয়।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের প্রধানা নায়িকা চারুলতা। বাহিরে স্বামী ভূপতিনাথ খবরের কাগজ এবং আফিস লইয়া মসগুল হইয়া থাকিতেন, অন্দরে চারুলতা পিসতুত দেবর অমলকে লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিতে করিতে কখন যে প্রেমের চর্চ্চাও আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, ইহা সে নিজেও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সুশীল, সচ্চরিত্র অমল যখন টের পাইল চারুলতা কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিয়াছে, তখন সে তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া শ্বশুরের অর্থে বিলাত পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

অমলের এই আকস্মিক অন্তর্ধানে চারুকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিল। অমলের বিরহে অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিয়া চারু বলিত—"অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই! একদিনও না, একদণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থগুলি তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমায় পূজা করিব।"

নিজের অন্তরের তলদেশে একটী গোপন শোকের মন্দির চারু নির্ম্মাণ করিল, সে মন্দিরের দেবতা অমল—তাহার স্বামী ভূপতিনাথ সেখানে পরিত্যক্ত—এই মন্দিরে ভূপতিনাথের প্রবেশ নিষেধ—সে এখানে অনাবশ্যক।

তারপর সেই টেলিগ্রামের ব্যাপারে ভূপতির অন্ধ নয়ন খুলিয়া গেল—সে চারুর হৃদয় বেদনার ইতিহাস জানিতে পারিল। "সংসার একেবারে তাহার কাছে রূক্ষ, শুষ্ক, জীর্ণ হইয়া গেল। মাঝে যে কয়দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়া ছিল, সেই কয় দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল।"

বাড়ীঘর ছাড়িয়া মৈশুরে পলাইবার সময় "ভূপতি চারুকে কহিল, তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো, আমি চলে আসবো।"

চারু বলিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও! আমাকে একলা ফেলে যেও না।"

ভূপতি বুঝিল "অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়ীকে বেষ্টন করিয়া দাবানলের মত জ্বলিতেছে—চারু দাবানল-ত্রস্ত হরিণীর মত সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে চায়। কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না—আমি কোথায় পলাইব? যে স্ত্রী নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জ্জন, বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব, তখন নিস্তব্ধ, শোকপরায়ণা

নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কি ভয়ানক হইয়া উঠিবে! যাহার অন্তরের মধ্যে মৃত ভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা—সে আমি কতকাল পারিব? যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ভাঙ্গা ইটকাঠগুলো ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বেড়াইতেই হইবে?"

এই পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণুতার অবতার, স্থিরধীর শান্ত প্রকৃতি ভূপতির জন্য আমাদের কষ্ট হয়। চারুলতার হৃদয় বেদনার জন্য আমাদের মনে অণুমাত্র করুণার সঞ্চার হয় না। সে কেন জানিয়া শুনিয়া সমবয়স্ক দেবর অমলের সহিত অত মাখামাখি করিতে গেল? ইহা কি তাহার পক্ষে উচিত হইয়াছে? তাহার এই মানসিক অধঃপতনের জন্য পরমসহিষ্ণু ভূপতি যে মর্ম্মান্তিক বেদনা ভোগ করিতেছে, ইহার জন্য দায়ী কে? চারুলতাই নহে কি?

শরৎবাবুর 'গৃহদাহ' গ্রন্থের নায়িকা অচলা, মহিমের পত্নী হইয়া, মহিমের বন্ধু সুরেশের সহিত অবৈধ প্রেমে আসক্ত হইল এবং সুরেশের কৌশলে তাহাকে গৃহত্যাগ সঙ্গে সঙ্গে কুলত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইল। পরিশেষে প্লেগরোগে সুরেশের স্বেচ্ছামৃত্যু এবং জন্মের মত অচলার জীবন কলঙ্কিত হইয়া গেল।

রবিবাবুর 'ঘরে বাইরে' গ্রন্থের সন্দীপ, নিখিলেশ এবং বিমলার হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের চিত্র অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী।

বিমলা নিখিলেশের পত্নী হইয়াও প্রথমটা সন্দীপের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই মোহ তাহার স্থায়ী হয় নাই—পরে নিজের ভুল বুঝিয়া জীবনের সহজ ধারায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঘটনা সামান্ত—কিন্তু মনোবিশ্লেষণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই গ্রন্থ অতুলনীয় কবিত্বশ্রী-মণ্ডিত।

শরৎবাবুর 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থের অভয়া এবং প্রভাতবাবুর 'সিন্দুরকৌটা' গ্রন্থের সুশীলা,—এই দুই নারীও ঐ দোষে দোষী—যদিও গ্রন্থকারদ্বয় ঐ দুই নারীর প্রণয়-পাত্রের সহিত মিলন ঘটাইয়া শেষরক্ষা করিয়াছেন।

প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে আমরা বলিতে চাই—'Art for art's sake' ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। ঔপন্যাসিক যদি উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন এবং 'কাব্য কহিবার ভানে—কাণে কাণে নীতি কথা' কহেন, তাহা হইলে উপন্যাসের রসবিপর্য্যয় ঘটে এবং উহার মাধুর্য্য গুণ নষ্ট হয়।

ঔপন্যাসিকের কায রস-সৃষ্টি করা; কিন্তু দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া নহে—ইহাই আমাদের মনে হয়। যে সমস্ত গ্রন্থকার সধবা নারীর পরপুরুষাসক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহারা artএর খাতিরে কেহই উহার সমর্থন করেন নাই—ইহাই আমাদের মনে হয়। সধবা স্ত্রীলোকের ঐ অবৈধ প্রণয়-লালসার পরিণাম যে শুভ নহে, কলা-কৌশলী লেখকগণ ইঙ্গিতে তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি সধবা নারীর আদর্শচ্যুতির কথা আমরা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে পরিণামে কাহারও মঙ্গল হইয়াছে কি? উহাদের মধ্যে অবৈধ প্রেমে মজিয়া কেহ সুখী হইতে পারিয়াছে কি?

শৈবলিনী, পার্ব্বতী, সুধাময়ী, অচলা, চারুলতা—ইহাদের কথাই আমরা আলোচনা করিয়াছি। স্বামী বর্ত্তমানে ইহারা পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছিল এবং একমাত্র অচলা ছাড়া আর সবারই দেহ পবিত্র ছিল।

কিন্তু দেহের পবিত্রতাই কি সব? মানসিক পবিত্রতা কি কিছুই নহে? পবিত্র আত্মা কি অপবিত্র দেহে বাস করে না? এবং অপবিত্র আত্মা কি পবিত্র দেহে বাস করে না? দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক ধর্ষিতা সতী স্ত্রীলোকের দেহ অপবিত্র হইলেও তাহার মন পবিত্র থাকে। সেই রমণীকে গ্রহণ করিলে পাপ হয় না। মনই হইল আসল বস্তু, দেহ নহে। পরপুরুষের প্রতি যদি কোন নারী মনে মনে আসক্ত হয়, তবে তাহাকে সে দেহ দান নাই-বা করিল, তাহার মন ত কলুষিত হইয়াছে!

নিঃসম্পর্কীয় পুরুষ এবং রমণীগণ 'যৌবন-বেদনা-রসে-উচ্ছল' বসন্ত দিনে যত দূরে দূরে থাকে, ততই জগতের মঙ্গল। যুবক যুবতী কাছাকাছি হইলেই হৃদয় বৃত্তি

উত্তেজিত হয়, উহাতেই সংসারে অবৈধ প্রেমের প্রসার বৃদ্ধি হয়। বাহ্যিক শুচিতার কোনো মূল্য নাই, অন্তরে যথার্থ শুচি হওয়া চাই। দেহ এবং মনে যাহারা পবিত্র নহে, তাহারাই ভ্রষ্ট, এই কথাই অগ্রে মনে রাখিতে হইবে।

ঐ শৈবলিনী, পার্ব্বতী, অচলা, চারুলতা, সুধাময়ী উহারা স্বামী বর্ত্তমানে সধবা অবস্থায় মনের মধ্যে কলুষিত বাসনাকে স্থান দিয়াছিল বলিয়া, পরিণামে কেহই সুখী হইতে পারে নাই। উহারা যদি চিত্ত-সংযম করিত, তাহা হইলে উহাদের পরিণাম এমন ভয়াবহ হইত না।

উহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে, অবৈধ প্রণয়ের পরিণাম মনোহর নহে, বৈধ প্রণয়ই জগতে নন্দন-গন্ধ বহন করিয়া আনে।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পথিক-বধূ

আমি ত' চলেছিনু
জীবন পথে একা,
ফুরায়ে আসে দিন,
মিলেনি কারো দেখা ;
চলিয়া যেতেছিনু
আপন মনে আমি,
ছিল না কেহ মোর
পথের অনুগামী !
অবেলা কোথা হ'তে
কেমনে তুমি এসে
ধরিলে হাতখানি
চাহিলে মৃদু হেসে !
ডাকিলে সখা ব'লে
কে তুমি পথে মোরে,
বাঁধিলে স্নেহ-প্রীতি
মমতা মায়াডোরে !
কি জানি কি যে বাণী
শুনালে কাণে কাণে,
নূতন অনুভূতি
আনিয়া দিলে প্রাণে,
অকূলে যেন মোর
মিলিয়া গেল কূল,

নীরস তরুশাখে
ফুটিল আজি ফুল !
আকাশে আলো ছায়া
আঁকিল নব ছবি,
উষারে তুমি এল'
তরুণ রাঙা রবি !
বাতাসে আশে পাশে
লাগিল যেন দোল,
কানন কলগানে
পরাণ উতরোল !
ছিল যে নিশিদিন
স্বপন মাঝে মোর,
হ'য়েছে দিবা নিশি
যাহারি ধ্যানে ভোর,
যাহারে চেয়েছিল
কিশোর মোর মন,
রঙীণ কল্পনা
তরুণ যৌবন
গড়িয়াছিল যারে
হিয়ার প্রিয়তমা,
কবে সে আসিবে গো
হাসিবে নিরুপমা।

হয়ত' এই পথে
মিলিব দুই জনে,
ছিল না কোনো দিন
এ আশা মোর মনে !
সহসা সাথী হ'লে
কে তুমি কাছে আসি—
কহিলে অনুরাগে
'তোমারে ভালবাসি !'
যে কথা আজো কেহ
ডাকিয়া বলে নাই

আমারে পথে যেতে,
শোনালে তুমি তাই ?
মনের মানসী গো,
এসেছো রূপ ধরি,
চিনেছি অচেনারে
নিয়েছি প্রেমে বরি,
যেটুকু বাকী পথ
চলিব ধরি হাতে,
নামিব তীরে গিয়া
দু'জনে এক সাথে !
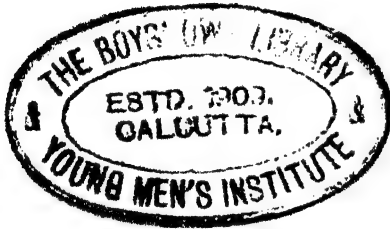
শ্রীনরেন্দ্র দেব ।

কৌটার কড়ি

(গল্প)

কোজাগরী পূর্ণিমা। শুভ্র আলিম্পনে হিন্দুর গৃহ অলিন্দ অঙ্গন সুচিত্রিত। ঘরে ঘরে ষোড়শোপচারে সৌভাগ্য-দেবী কমলার আরাধনার আয়োজন। ঘন শঙ্খ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। ধূপ-গুগ্‌গুলের ধূমে বাতাস সুরভিত।

জমীদার-ভবনে তখন পূজা অন্তে ঘটের সম্মুখে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর 'কথা' হইতেছিল। শ্রীপাদপদ্মাঙ্কিত পীঠোপরি কড়িগাঁথা ঝাঁপিতে ধান্য-দূর্ব্বা ও সিন্দুরপুট, তৎপার্শ্বে কয়েকটি ছোট বড় কৌটায় কাঞ্চন ও রজত মুদ্রা। কিয়দ্দূরে নিবেদিত ফল মূল মিষ্টান্নাদি স্তূপাকারে সজ্জিত।

গৃহিণী "কথা" কহিতেছিলেন, কন্যা ও পুত্রবধূগণ নিবিষ্ট মনে তাহা শ্রবণ করিতেছিল। একটি একটি করিয়া চারিটি 'কথা' শেষ হইলে ঘটে কুসুমাঞ্জলি দিয়া সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

"সইদের খবর জান মা ?"

হঠাৎ কন্যার এই প্রশ্নে গৃহিণী একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তোর শুধু ঐ কথা, বিভা। পূজো-আচ্চায় মোটেই মন নেই। তাদের আবার খবর কি ?"

কন্যা বিভাবতী ব্যগ্রতাভরে নিবেদন করিল, "বিকেলে তাদের বাড়ী গিয়েছিলুম। স'য়ের চার ডিগ্রী জ্বর। কাকাবাবুর হাতে ডাক্তার আনবার খরচটি পর্য্যন্ত নেই। তা ছাড়া—"

মাতা বাধা দিয়া কহিলেন, "আমায় কি করতে বলিস্ ?"

বিভাবতী আবদারের সুরে কহিল, "দাওনা মা দশটি টাকা ; কত উপকার হবে—তাঁরা দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবেন।"

"আগে বল্লে হতো, এখন আর সে যো নেই।"

"কেন মা ?"

"বছরের দিন আমায় বকাস্‌নে বিভা। মা লক্ষ্মীর

কাঠা বসেচে, আড়াই দিন বাদে উঠবে। এর মধ্যে ও-সব বন্ধ।"

"দানের আবার দিন-অদিন কি মা? যখন দরকার হবে তখনি—"

এইবার কথা শেষ না হইতেই গৃহিণী রাগত স্বরে কহিলেন, "ফের তর্ক! রীত না মান্‌লে অহিত হয়, তা যেন মনে থাকে।"

মাতার সহিত তর্ক করা নিষ্ফল ভাবিয়া বিভা ক্ষুণ্ণ মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "কি আশ্চর্য্য! অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় এক জনের জীবন যেতে বসেচে অথচ কি একটা রীতির বশে আজ তাকে সাহায্য করা হবে না—পাছে অমঙ্গল হয়। এও কি শাস্ত্রের বিধান, না মা-লক্ষ্মীর অভিপ্রায়? কখনো তা হতে পারে না। এ শুধু একটা কুসংস্কার। দানের পক্ষে হয় তো এই আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনই প্রশস্ত।"

কন্যাকে বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গৃহিণী স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তোর সইয়ের বাড়ী মায়ের প্রসাদ দিয়ে আয়—বছরের দিন মন ভারী করতে নেই।"

বিভা মনে মনে আনন্দিত হইয়া কহিল, "যাই, কিন্তু দাদার খাবারটা আগে দিয়ে এসো মা।"

"তোমার বাক্সটি ভাল করে দেখ—দুটো টাকা পেলেও ওষুধ বরফ আসতে পারে।"

স্বামীর কথায় স্ত্রী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া হতাশা-জড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "কপর্দ্দকও নেই। কৌটার টাকা-ক'টিও সপ্তমীর দিন ধরে দিয়েচি।"

"দুরদৃষ্ট! এমনি দিনেই মেয়েটার রোগের বাড়াবাড়ি যে, কোথাও কর্জ্জ পাবার উপায়ও নেই।" এই বলিয়া মনোহর বাবু পীড়িতা কন্যার উত্তপ্ত ললাটে ধীরে ধীরে জলসেক করিতে লাগিলেন। মনোহর বাবুর আর্থিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাহার উপর পূজা উপলক্ষে দীর্ঘ সময়ের জন্য আফিস বন্ধ থাকায় অনটনের অবধি নাই। প্রাতঃকাল হইতে কন্যার জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সন্ধ্যার সময় একজন ডাক্তার কি না লইয়া ঔষধের ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু নগদ মূল্যের অভাবে ঔষধ আসিতেছে না। কোন উপায় নাই দেখিয়া মনোহর বাবু ভগবানে ভরসা করিলেন। পত্নী মনোরমা কোনমতে মা লক্ষ্মীর চরণ-পূজা সারিয়া লইবার জন্য পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

৩

"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ মা, যে অবস্থায় রেখেছ, তাতেই সুখী; শুধু মেয়েটাকে ভাল করে দাও।" প্রণামান্তে মনোরমা উঠিয়া দেখিলেন, নানাপ্রকার ফল-মিষ্টান্নপূর্ণ একখানি থালা হাতে দরজায় দাঁড়াইয়া

"প্রসাদটুকু নিন কাকীমা। সই এখন কেমন?"

"একভাবেই আছে; তুমি একাই এসেচ?"

"হাঁ কাকীমা, এমন চাঁদনী রেতে ভয় কি?"

অতঃপর মনোরমা থালা হইতে প্রসাদ উঠাইতে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির হইল। তিনি যারপর নাই বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "একি বিভা! এটা কি ক'রে এলো?"

বিভাবতী মুচকি হাসিয়া কহিল, "কেন কাকীমা, ওতো আমিই এনেচি। কাটাকুটি নাড়ু সন্দেশের মত ওটাকেও প্রসাদ মনে করে উঠিয়ে নিন।"

"এ যে মোহর, পাগলি!"

"ক্ষতি কি?"

"কে দিয়েচে?"

"আমার জিনিষ, আমি দিতে এনেচি।"

মনোরমা তৎক্ষণাৎ মোহরসহ থালাটি ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, "ওটা নিয়ে যাও মা, ভবিষ্যতে ও নিয়ে কথা হবে।"

এমন সময়ে মনোহর বাবু তথায় উপস্থিত হইলে মনোরমাকে কিছুমাত্র বলিবার অবসর না দিয়াই বিভাবতী স্থির কণ্ঠে কহিল, "দেখুন কাকাবাবু, সইয়ের

চিকিৎসার জন্যে আমার সাইতের কোটা থেকে এই মোহরটি বের করে এনেচি। সেখানে মিছেমিছি চিরদিন যকের ধনের মত আট্‌কে থাকার চাইতে কাযে লাগা শতগুণে ভাল। যদি সইকে ভালবাসেন, তবে এটা অবাধে নিয়ে নিন।"

মনোহর বাবু বিস্ময়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল বিভাবতীর পানে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার কৈশোর-সুলভ হাসি হাসি মুখখানি সহসা বিচারকের মুখের মত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মোহরটী ফিরাইয়া দিতে কিংবা তৎসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার যেন সাহস হইল না। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, "এর পর আর ওটা না নিয়ে পারিনে। ওগো! শিশি আর প্রেস্‌ক্রিপস্যান্‌টা তাড়াতাড়ি দাও। হ্যাঁ, বিভা, আশীর্ব্বাদ করি—"

মনোহর বাবুর কথায় বাধা দিয়া বিভাবতী কহিল, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন কারু জন্যে, আবশ্যক হ'লে, আমার শেষ পুঁজিটি পর্য্যন্ত খরচ কর্ত্তে পারি।"

অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া মনোহর বাবু বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদই করছি মা।"

শ্রীবাসুদেব সুকুল।

শিউলি গাছ

(গাছটী একটী বাড়ীর আঙিনায় ছিল, অজয়ের ভাঙনে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। শারদীয়া পূজার জন্য উহার ফুল ব্যবহৃত হইত এবং সন্ধ্যার পর উহার ফুলের গন্ধে আমাদের পল্লীটী আমোদিত থাকিত।)

ভাঙিয়া গিয়াছে কত শত ঘর বাড়ী,
কতই বনস্পতি,
শেফালি গাছটী ভেঙেছে সঙ্গে তারি,
হয়েছে বড়ই ক্ষতি।
টাকা কড়ি সাথে প্রসাদী সে মৃগনাভি,
হারায়ে গিয়াছে তাহারি কথাই ভাবি,
মোর টান তার প্রতি।

২

ভেঙ্গে গেছে দল, ভেঙেছে যন্ত্রপাতি
সকলি গিয়াছে চুকে,
সাধের বাঁশরী হয়েছে তাহারি সাথী,
ব্যথা বড় বাজে বুকে।
দলিল চিঠার সাথে ভেসে গেছে চলি'
রামপ্রসাদের হাতে লেখা পদাবলী,
অভিভূত তারি দুখে।

৩

রাজা মহারাজা ছিলনা সে, তাহা জানি,
তালিকায় নাহি নাম,
অমর না হোক, অমৃতের আমদানী
করেছে সে অবিরাম।
সে যে ছিল এই আঙিনার সভাকবি,
মৌনী শিল্পী আঁকিত স্বরগছবি,
কে কবে তাহার দাম?

৪

মেঠো এ গ্রামের কই সে গায়ক মিঠা,
সে নীলকণ্ঠ কই?
ভবন ভেঙেছে, ভুবন ত আছে গোটা
সাজেনা যে তারে বই!
কোথা গেল সেই পুণ্যের দাশরথি,
এমন শরৎ, কে রচে মাতার স্তুতি,
জলে আঁখি থই থই।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
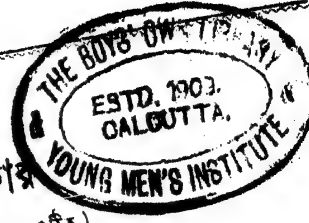
তিব্বতে মৃতের সৎকার

(গৌহাটী বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনে পঠিত)

সমাজ অন্যান্য নানা প্রকার ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর পরে দেহসংকারের জন্যও একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার নির্দ্দেশ হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতে একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিভিন্ন দেশে মানব-সমাজে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তিব্বতে একই দেশে একই জাতি এবং ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সেই সকল প্রকার ব্যবস্থারই প্রচলন আছে।

নাড়ীর স্পন্দনে বিরতি অথবা নিশ্বাস বন্ধ হওয়াকেই ইহারা মৃত্যুর নিশ্চিত বা পূর্ণ লক্ষণ বলিয়া মনে করে না। তাহাদের বিশ্বাস, ইহার পরেও অন্ততঃ তিন দিন পর্য্যন্ত আত্মা দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করে। যাহারা পুণ্য ও পবিত্রতার হিসাবে খুবই উন্নত, তাহাদের আত্মা শেষ নিশ্বাসের সহিতই দেহ ছাড়িয়া স্বর্গধামে চলিয়া যায়—কিন্তু এরূপ পুণ্যাত্মার সংখ্যা অতি বিরল। কাযেই মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহসংকার করা ইহাদের মতে অতি গর্হিত কার্য্য। সমস্ত তিব্বতে এবং মঙ্গোলিয়াতেও সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই মৃত্যুর পরে দেহ অন্ততঃ তিন দিন পর্য্যন্ত ঘরেই রক্ষা করা হয়। এই সময়ে মৃত ব্যক্তির বন্ধুবান্ধবেরা নিকটে বসিয়া তাহার আত্মার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে। মৃত্যুর পরে একজন পুরোহিত আসিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করেন। তিনিই পাঁজি-পুথি দেখিয়া দিন ক্ষণ স্থির করেন—কোন্ দিন কোন্ সময় এবং কোন্ প্রথানুসারে মৃতের দেহসংকার করা হইবে।

ইহাদের মধ্যে দেহসংকারের বিষয়ে চারিপ্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত। এরূপ বিভিন্ন প্রকারে মৃতদেহের ব্যবস্থার মূল যুক্তি ইহারা হিন্দুশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। হিন্দুদের শাস্ত্র অনুসারে মানুষের দেহ পাঁচটি মূল পদার্থ হইতে গঠিত, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। তিব্বতীয়েরা মনে করে যে, মৃত্যুর পরেও দেহাবশেষ এই সব মূল পদার্থের যে কোন একটিতে মিশাইয়া দেওয়া দরকার। সেই অনুসারে ব্যক্তিবিশেষে চারি প্রকার দেহসংকারের প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, যথা (১) দেহ সমাহিত করা (ক্ষিতি), (২) জলে বিসর্জ্জন দেওয়া (অপ্), (৩) অগ্নিতে সংস্কৃত করা (তেজ,) এবং (৪) শকুনী পাখীর নিকট ভোগ দেওয়া (মরুৎ, ব্যোম) এই শেষোক্ত প্রথাই সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত।

চতুর্থ দিবস প্রাতে যিনি সর্ব্ব প্রথম শবদেহ স্পর্শ করিবেন, তাঁহার এবং মৃতব্যক্তির কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখা হয়। তার পরে একজন লামা কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহার উদ্দেশ্য যাহাতে মৃতব্যক্তির মাথার খুলির কোনও বিশেষ একটা ছিদ্রপথে তাহার আত্মা (প্রাণবায়ু ?) বহির্গত হইতে পারে। এই অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে আত্মা অন্য কোনও পথেও বাহির হইয়া যাইতে পারে—তাহাতে আত্মার অধোগতি অনিবার্য্য। এই অনুষ্ঠানের জন্য সেই লামাকে শবদেহ লইয়া একটা ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একাকী থাকিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঘোষণা না করেন যে, কোন্ পথে মৃতব্যক্তির আত্মা বাহির হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ সেই ঘরে প্রবেশ করিতে পায় না। এই কার্য্যের জন্য মৃতব্যক্তির অবস্থা অনুসারে সেই লামাকে একটা গাভী, চমরী গাই (yak), ভেড়া, ছাগল, অথবা অর্থ দান করিতে হয়।

শব বহন করিবার পূর্ব্বে একজন জ্যোতিষী আসিয়া উপস্থিত সকলের জন্মতারিখ ইত্যাদি তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। যদি

দেখা যায় যে, মৃতব্যক্তির সহিত কাহারও জন্মের রাশিচক্র ঠিক মিলিয়া যাইতেছে, তবে সেই ব্যক্তিকে শবের অনুগমন করিতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহাতে আশঙ্কা আছে যে, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা তাহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিতে পারে। এই কার্য্যের জন্ত জ্যোতিষীকেও অর্থপ্রদান অথবা অন্ত প্রকারে দক্ষিণা দেওয়া হয়। তার পরে মৃতদেহ কাপড়ে চোপড়ে খুব করিয়া জড়াইয়া একটা শবাধারে স্থাপন করিয়া গৃহের এক কোণে রাখা হয়—শবাধারের (শবের ?) মুখ কোন্ দিকে থাকিবে, তাহা জ্যোতিষীই স্থির করিয়া দেন। শবের মাথার নিকটে পাঁচটি মাখনের (এ দেশে ঘৃতের প্রচলন নাই) বাতি জালান হয় এবং দেহটাকে ঘিরিয়া একটা পর্দ্দা খাটাইয়া তাহার ভিতরে নিত্যকার খাদ্য, পানীয় এবং একটা বাতি দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে অতি প্রত্যূষে শবাধারে দেহটিকে নিকটবর্ত্তী সৎকার-ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। শবাধার বহন করিবার পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনেরা উহার নিকট প্রণতি করে। শবের অনুগমন-কারী দুই জনে একথালা যবের ছাতু, কিছু মদ এবং চা লইয়া যায়। পারিবারিক পুরোহিত—একজন লামা—শবাধারের উপরে একখানা চাদর বিছাইয়া আর একখানা চাদর ঐ চাদরের সঙ্গে বাঁধিয়া সেই চাদরের এক কোণ ধরিয়া ধীরে ধীরে শবের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে থাকেন। চলিতে চলিতে তিনি মন্ত্র আওড়াইতে থাকেন এবং ডান হাতে এক প্রকার ডমরু আর বাঁ-হাতে ঘণ্টা বাজাইতে থাকেন। সৎকারভূমিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথে শবাধারকে ভূমিতে নামান অতি অমঙ্গলের লক্ষণ। যদি কোন গতিকে নামান হইয়া যায়, তবে ঐ স্থানেই শবদেহের সৎকার করিতে হইবে ; সৎকার ভূমি পর্য্যন্ত আর লইয়া যাওয়া চলিবে না।

প্রত্যেক সৎকারভূমিতে এক খানা করিয়া বড় প্রস্তর পাতিত থাকে। শবাধার হইতে শবদেহ নামাইয়া উহার কাপড় চোপড় ছাড়াইয়া ঐ প্রস্তরশয্যার উপরে, মুখ নীচের দিকে করিয়া, শোয়ান হয়। পুরোহিত আসিয়া শবের উপরে রেখাকারে কতকগুলি দাগ চিহ্নিত করেন এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে টুকরা টুকরা করিয়া শবদেহটা কাটিয়া ফেলেন। (১) এই সব করিতে করিতেই শকুনীর দল আসিয়া পড়ে। সৎকারভূমি এই শকুনীদের এতই পরিচিত যে, মনুষ্য-সমাগমে তাহাদের ভোজের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, বরং পুরোহিতের আহ্বানে তাহারা একে একে আসিয়া হাজির হয়। এই শকুনীর দলের মধ্যে যে সকলের চেয়ে বড় এবং বয়োবৃদ্ধ, তাহাকেই প্রথম মাংস খাইতে দেওয়া হয়। পরে আর আর সকলে ভাগ পায়। শকুনীদের ভোজের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইলে ভুক্তাবশিষ্ট শরীরের অস্থিগুলি পাথরে গুঁড়া করিয়া, মস্তিষ্ক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া শকুনীদের ভোজে দেওয়া হয়। কাওয়াগুচি বলেন, ইহার সঙ্গে কিছু ছাতুও মিশাইয়া দেওয়া হয়। ভোজের পালা সমাধা হইলে একটা নূতন মৃৎপাত্রে ঘুঁটের আগুনে কিছু মাখন এবং যবের ছাতু ধূনারূপে জালান হয়। মৃতব্যক্তির আত্মা যে দিকে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে বিশ্বাস, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ধূনাসহ ঐ মৃৎপাত্র সেই দিকেই উৎসৃষ্ট হয়। তার পরে শ্মশান-বান্ধবেরা সকলে হাত ধুইয়া সৎকারভূমির অনতিদূরে বসিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করে এবং তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

Hedin-এর বিবরণে (২) আছে যে, লাগবারা শবদেহের মাংস কাটিয়া কাটিয়া শকুনিদের দেয় ; যতক্ষণ শকুনিরা ঐ মাংস আহার করিতে থাকে, সেই অবসরে লাগবারা চা অথবা খাবার খাইয়া লয়। সৎকারভূমিতে বসিয়া পানীয় ও আহার্য্যের সদ্ব্যবহার করিতে তাহাদের একটুকুও সঙ্কোচ

(১) পুরোহিত শবদেহ নিজ হাতে কাটেন, ইহা খুবই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ Dr. Hedin-এর বিবরণে আছে যে, এদেশে লাগ্‌বা নামে এক সম্প্রদায় আছে, তাহারাই সৎকারের যত কিছু কায করে, এমন কি আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা সৎকার ভূমি পর্য্যন্ত শবের অনুগমন করাও প্রয়োজন মনে করে না—লাগবা-দের জিম্মায় শবদেহ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসে। দাস মহাশয় যখন অন্যরূপ লিখিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কোন কোন স্থানে এরূপ ব্যবস্থাও দেখিয়া থাকিবেন। কাওয়াগুচি বলেন যে, এই কার্য্যে পুরোহিতরা আবশ্যক মত লাগবাদের সাহায্য করেন।

(২) প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৮।

বোধ হয় না এবং সেজন্য তাহারা হাত মুখ ধুইয়া লওয়াও আবশ্যক মনে করে না। কাওয়াগুচির বিবরণে আছে, তিনি এরূপ এক সংকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলেন যে, নিশ্চয়ই তিব্বতীয়েরা কোন রাক্ষসবংশজাত—নরমাংস-ভোজন নিশ্চয়ই কোন কালে ইহাদের অভ্যাস ছিল। শবদেহের অস্থি গুড়া করিবার সময় পুরোহিতেরা লাগবাদের সাহায্য করেন। তার পরে যখন উভয় দল চা অথবা খাবার তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা হাত ধোওয়াও প্রয়োজন মনে করে না—বড় জোর হাতে হাতে বাজাইয়া হাত ঝাড়িয়া ফেলে। তাহাদের হাতে রক্ত এবং মেদমাংসের অংশ যে লাগিয়া থাকে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সেই হাতেই তাহারা ছাতু মাখিয়া খায় এবং চা পান করে। কাওয়াগুচি যখন হাত ধুইয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন তাহারা অবাক হইয়া গেল। তাহারা হাত ধোয়ার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল, বরং বলিল যে, হাত না ধোওয়াতেই ত খাওয়াটা আরও উপভোগ্য হয়; "আর মৃতব্যক্তির আত্মাও এই মনে করিয়া ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিবে যে, তাহার বন্ধুবান্ধবেরা নির্ব্বিকারচিত্তে তাহার দেহাবশেষের অণু-পরমাণু খাদ্যদ্রব্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছে।"

ইহাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরে আর পুনর্জ্জন্ম না হওয়া পর্য্যন্ত মৃতের আত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অবকাশ কালটা যাহাতে তাহাদের দুঃখে না কাটে সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান আছে। মৃত্যুর পরে সপ্তম দিবসে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে খাবার চা, সোণা, রূপা অথবা টাকা পয়সা বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান প্রতি সপ্তম দিবসে পুনরনুষ্ঠিত হয়। মৃত ব্যক্তির শেষ নিশ্বাস গ্রহণের পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই তাহার উদ্দেশে থালায় করিয়া খাদ্য পানীয় দেওয়া হয় এবং মাখন ও ছাতু Juniper কাষ্ঠ সংযোগে ধুনা রূপে জ্বালান হয়। উনপঞ্চাশৎ দিবসে সমস্ত লামাদিগকে এক বিরাট ভোজ দেওয়া হয় এবং মৃত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ টাকা পয়সা ইত্যাদি জলে ধৌত করিয়া এবং জাফরানের জলে শোধিত করিয়া কোন লামাকে প্রদান করিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ লাভ করা হয়। শেষ অনুষ্ঠান হয় এক তান্ত্রিক লামা দ্বারা, তাহার উদ্দেশ্য ভূত-প্রেতের উপদ্রব হইতে ঐ গৃহকে মুক্তি দেওয়া।

ইহাদের মধ্যে দানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য। সেই হিসাবেই মৃত্যুর পরে ঐরূপে দেহের সংকারের ব্যবস্থা হয়। যাঁহার দেহ-সংকারের সময় যত অধিকসংখ্যক শকুনি আসিয়া পড়ে তিনি তত পুণ্যবান। যাহার সংকারের সময় দেখা যায় যে কুকুরেও তাহার মৃতদেহ স্পর্শ করিতে চায় না এবং শকুনিও আসে অল্পসংখ্যক তখন মনে করিতে হইবে যে লোকটার জীবনে পাপের অন্ত ছিল না।

অন্তঃস্বত্তা এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের দেহ সংকারের ব্যবস্থা অন্যরূপ। এখানে বন্ধ্যা শব্দের অর্থটা একটু বেশী ব্যাপক। যে স্ত্রীলোকের পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিল কিন্তু পরে সেই পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—তাহাকে বলা হয় শ্বেত বন্ধ্যা (white barren)—তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষটা বোধ হয় অতি লঘু। যাহার কন্যা সন্তান জন্মিয়া পরে মৃত্যু হইয়াছে সে আংশিক বন্ধ্যা—আর যাহার সন্তানাদি হয় নাই সে কালো বন্ধ্যা (black barren) ইহাদের সমাজে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের অবস্থা খুবই হীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ দেখা যায় যে মৃত্যুর পরে সংকারের ব্যাপারে ইহাদিগকে কুষ্ঠরোগাক্রান্তের সহিত এক শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে।

অন্তঃসত্তা, বন্ধ্যা এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত—মৃত্যুর পরে ইহাদের শবদেহ বিশেষ ভাবে অশুচি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং সেই জন্য দেশের সীমানার বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বলা হয় সাত সাগরের পার অথবা সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে। উহাদের দেশে সমুদ্র হয়ত অভিধানেই নাই এবং নদীও প্রায়ই অতি প্রাথমিক অবস্থায়, কাযেই নদীর ওপারে কথাটা তেমন দূরত্বজ্ঞাপক হইতে পারে না। কাযেই এই সব শ্রেণীর মৃত দেহ উহারা নয়টি পাহাড় এবং উপত্যকা ছাড়াইয়া কোন স্থানে ফেলিয়া আসে, অথবা অশ্বচর্ম্ম কিংবা বৃষ চর্ম্মের থলিতে বন্ধ করিয়া জলে বিসর্জ্জন দেয়।

Palti হ্রদের তীরে যাহাদের নিবাস, তাহারা

অবস্থা বা শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলের মৃত দেহই হ্রদের জলে বিসর্জ্জন দেয়। এইরূপ ব্যতিক্রমের অবশ্য একটা যুক্তিও আছে। উহাদের বিশ্বাস, এই হ্রদে কতকগুলি লু (Lu) বা সর্পের বাস—ইহারা দেবতাবিশেষ, ইহাদের নিকট স্বর্গদ্বারের চাবি আছে। অতি গভীর জলে এক কাচের প্রাসাদে উহাদের (লু-দের) রাজা বাস করেন। এই হ্রদে মৃতদেহ বিসর্জ্জন দিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিবার অবকাশে লু-রাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাহাদের স্বর্গ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

কাওয়াগুচি বলেন, যেখানে বড় নদী আছে সাধারণতঃ সেখানেই মৃতদেহ জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। এসব স্থলে তাহারা মৃতদেহ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া জলে ফেলিয়া দেয়—উদ্দেশ্য, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শব দেহটা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায়।

বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ ভূমিতে সমাহিত হয়। বসন্ত রোগের প্রভাব এদেশে বড় কম নয়, আর এই ব্যাধিটাকে উহারা অত্যন্ত ভয়ও করে। যখন এই ব্যাধি সংক্রামক ভাবে দেখা দেয়, তখন উহারা অজ্ঞাতকুলশীল কাহাকেও অতিথিরূপে নিজ গৃহে স্থান দেয় না। এই সব মৃত দেহ জলে ফেলিয়া দিলে অথবা শকুনিদের ভোগে দিলে হয়ত এই ব্যাধি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে, এই ভয়েই উহারা এই মৃতদেহ সমাহিত করে। কাওয়াগুচি বলেন যে জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক এদেশের লোকেরা এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করে।

মৃতদেহ অগ্নি-সংস্কৃত করাটা ইহারাও খুব উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়াই মনে করে, কিন্তু এদেশে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে সেটা কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। বিশিষ্ট লামাদের মৃতদেহ কোন কোন সময় অগ্নিসংস্কৃত করা হয়, সৎকারের পরে অস্থি এবং ভস্মাবশেষ কোন চৈত্যে রক্ষিত হয়।

লামাদের মধ্যে যাহারা অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ যাহারা নিজকে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের অংশ বলিয়া মনে করে এবং প্রচার করে, তাহাদের দেহ নানাপ্রকার ঔষধের সাহায্যে মিসর দেশের মমির ন্যায় রক্ষিত হয়। ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের যেরূপ মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখা যায়, সেইরূপ আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় স্বর্ণ রৌপ্য অথবা তাম্র নির্ম্মিত চৈত্যের ভিতরে রক্ষিত হয়। *

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

* জাপানী ভ্রমণকারী কাওয়াগুচি এবং বাঙ্গালী পর্য্যটক রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের বৃত্তান্ত হইতে গৃহীত।

পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি

গত ১লা ফাল্গুন বহরমপুরে পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ৮১ বৎসরের পার্থিব দেহ পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর তীরে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

ফরিদপুর জেলার প্রাণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক-শিরোমণি মধুসূদন সরস্বতী এই বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

সেকালে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশজাত বালকের শিক্ষা যেরূপ হইত, চূড়ামণি মহাশয়ও বাল্যে সেইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া পরে ন্যায়শাস্ত্র এবং তৎপরে অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র ও উপনিষদাদি হিন্দুধর্ম্মের সার গ্রন্থ সকল সম্বন্ধে ইনি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার গভীর শাস্ত্র-জ্ঞানের প্রশংসা শুনিয়া কাশিম-বাজারের সুপ্রসিদ্ধ রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর তাঁহাকে নিজের সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন। পরে অন্নদাপ্রসাদের পুত্র রাজা আশুতোষনাথ যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক, তখনও চূড়ামণি মহাশয় ঐ রাজ-সভার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহার পর তিনি ৺কাশীধামে থাকিয়া দর্শনাদি শাস্ত্র আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন, এমন

সময়ে ভগবান্ তাঁহাকে এক মহত্তর কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে বঙ্গে দুইটি ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছে—প্রথমটী ব্রাহ্ম-ধর্ম্মান্দোলন এবং দ্বিতীয়টী উহার প্রতিক্রিয়া। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বধর্ম্মের প্রতি বাঙ্গালীর ঘৃণা জন্মিতে লাগিল, তখন অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী সহজেই খৃষ্ট-ধর্ম্ম-সম্মত উপাসনা-প্রণালীতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত প্রণালীর গূঢ় মর্ম্ম আছে বা থাকিতে পারে, এ কথা ভাবিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও তখনকার ইংরাজী-শিক্ষিতদের ছিল না। পাদরী সাহেবের মুখে শুনিয়াই হউক বা অতি বাহ্যভাবে হিন্দুর প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান দেখিয়াই হউক, তাঁহারা স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ঐ সব নিরবচ্ছিন্ন কুসংস্কার মাত্র, অর্থলোভী ব্রাহ্মণগণের স্বার্থ-সাধনের একটা প্রকাণ্ড কৌশল। সুতরাং তখনকার সেই টাট্‌কা তৈয়ারী নক্সেন্স বিরোধী কন্‌সন্সের আমলে এরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস করা বা হিন্দু প্রণালীতে ভগবদুপাসনা করা অসভ্যতারই নামান্তর মাত্র। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর মনোভাব এইরূপই হইয়াছিল, একথা অত্যুক্তি নয়। এরূপ ক্ষেত্রে যখন বাগ্মীবর কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব হইল, তখন দলে দলে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সকলেই যে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন, তাহা নহে। কিন্তু অনেকেই তদ্‌ভাবাপন্ন হইতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবাপন্নের দলই না-এদিক, না-ওদিক, না-ব্রাহ্ম, না-হিন্দু, এইভাবে কাটাইতে কাটাইতে ক্রমে উঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক্যবাদী বা অজ্ঞানাস্তিক (Agnostic) হইয়া পড়িলেন। এমন কি, সে কালে এইরূপ হওয়াই যেন উচ্চশিক্ষার আনুষঙ্গিক নিদর্শন ও গর্ব্বের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

বাঙ্গালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যখন এইরূপ ভাব চলিতেছে, এমন সময়ে, অকস্মাৎ অসাধারণ বাগ্মীবর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, (যিনি পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে খ্যাত) বাঙ্গালায় নানাস্থানে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তিনি পুরাণ অবলম্বন করিয়া হিন্দুর মহাভাব সকল অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন। কলিকাতায় ও বাঙ্গালার নানাস্থানে লোকে অতি আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, উহা কিরূপ মনোমুগ্ধকর ছিল। বাঙ্গালায় যে তেমন সুন্দর বক্তৃতা হইতে পারে, সেকালে ইহা আমাদের ধারণাই ছিল না। আমার মনে হইতেছে—কলিকাতায় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতা শুনিয়া ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মহানন্দে সেই মঞ্চোপরি সর্ব্বসমক্ষে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। লোকে ঐ সব বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইতে লাগিল,—এমন কি, ভাবপ্রবণ লোককে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেও দেখিয়াছি। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালা দেশটিকে যখন একটী প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময়ে ৺কাশীধাম হইতে, শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গদেশে আসিলেন। ৺কাশীধাম হইতে প্রথমে তিনি বর্দ্ধমানে আসেন। সেখানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করিয়া, তাৎকালিক চিন্তাশীল লেখক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুঝিলেন যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দ্বারাই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সম্ভব। সে সময়ে ইন্দ্রনাথই ছিলেন তাৎকালিক 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের পরমহিতৈষী বন্ধু, সহায় ও উপদেষ্টা—ইংরাজীতে যাহাকে বলে "Friend, philosopher and guide"। তিনি স্থির করিলেন যে, বঙ্গবাসীকে মুখপত্র করিয়া এবং চূড়ামণি মহাশয়কে বক্তা করিয়া কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মবাণী ধারাবাহিকরূপে লোককে শুনাইতে পারিলে, উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত লোকের মন হিন্দুধর্ম্মের দিকে ফিরান যাইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন; এবং তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, প্রভৃতি তাৎকালিক মনীষিগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন।

ইহার পরেই বঙ্কিমবাবু তাঁহার সানকীভাঙ্গার বাসায়

একদিন একটি বান্ধবসম্মিলনীর উদ্যোগ করেন। সেখানে তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিলে, চূড়ামণি মহাশয়ের কথায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সকলেই সবিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। পরে বঙ্কিমবাবুর অনুমোদনে ও "বঙ্গবাসীর" উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতিসপ্তাহে চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে লাগিল এবং সেই সব বক্তৃতার সারাংশ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ও দেশময় প্রচারিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল।

সেই সব বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাৎকালিক শিক্ষিত যুবকবৃন্দের কি প্রবল আগ্রহ এবং বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের কি চমৎকার আনন্দ! প্রথম বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন এবং তৎপরে আরও কয়েকটী বক্তৃতায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহে লোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সকলেই তখন বুঝিয়াছিল যে, ধর্ম্মবিষয়ে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিক্রিয়ামাত্রই যেমন একস্থান বা একব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, এ প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখনকার চিন্তাশীল লেখকগণ হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন; বঙ্কিমবাবু তাঁহার নবপ্রকাশিত "প্রচারে" ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার নবপ্রকাশিত "নবজীবনে" ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাদির প্রাধান্য দিতে থাকিলেন; বঙ্গবাসী ত এ বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়ের ও হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র স্বরূপই হইল। চূড়ামণি মহাশয়ের সহকারী যুবক ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় "বেদব্যাস" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন—তাহার প্রধান লেখক ছিলেন স্বয়ং চূড়ামণি মহাশয়।

এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই ক্রমে বঙ্গবাসী হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি—হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন বক্তৃতা করিবার পরে চূড়ামণি মহাশয় "ধর্ম্ম ব্যাখ্যা" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য, হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বিষয়ে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে মৌলিক। ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য তিনি যে রীতি ও তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই যুগপ্রবর্ত্তক। বলিতে গেলে, ঐ গ্রন্থখানিই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ, যাহা দ্বারা তিনি সহজেই আগন্তুক ও উপধর্ম্মের ধ্বংসসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সে সময়কার বক্তৃতাগুলি এই ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রন্থেরই বিস্তার মাত্র।

তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া, তাঁহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া ইহাই এক নূতনত্ব লক্ষ্য হইত যে, তাঁহার বক্তব্যের আগাগোড়াই তত্ত্বকথা, বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রথিত। ভাষার ঝঙ্কার, ভাবের উচ্ছ্বাস, তাঁহার বক্তৃতা বা গ্রন্থে কোথাও পাওয়া যায় না। শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রোতা বা পাঠকের মনকে একটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করিয়া তিনি আত্মতৃপ্তির চেষ্টা করিতেন না। তাঁহার বিশেষত্বই এই ছিল যে, তিনি স্বতঃসিদ্ধটী মাত্র ধরিয়া লইয়া, ক্রমে ধাপে-ধাপে উচ্চস্তরে উঠিতেন এবং শ্রোতাও তাঁহার সহিত অবলীলাক্রমে উঠিতে পারিত। শাস্ত্র হইতে শ্লোকের বোঝা আওড়াইয়া তিনি শ্রোতা বা পাঠককে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন না। কেবলমাত্র তর্ক ও যুক্তি দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মের সারমর্ম্ম ও তত্ত্ব বুঝানই ছিল তাঁহার বিশিষ্ট প্রণালী, এবং এই বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

যাহা হউক, কলিকাতায় চূড়ামণি মহাশয় যে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন, এবং "বঙ্গবাসী" কর্ত্তৃক যে আন্দোলন সমস্ত বঙ্গদেশকে বিষম তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল, তাহা যে তাৎকালিক অহিন্দু ভাব ও আচরণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকিল না। বঙ্কিম প্রমুখ তাৎকালিক লেখকগণ সকল বিষয়েই যে চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে, এবং চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বা পড়িয়া দেশশুদ্ধ লোক যে হঠাৎ

নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও নহে। প্রতিক্রিয়ায় যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় সাধন করিতে পারে না, উহা মনোভাবকে পরিবর্ত্তিত করে মাত্র। চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আন্দোলনে ফল হইল এই যে, তখনকার ইংরেজীশিক্ষিত লোকে হিন্দু ধর্ম্মকে যেরূপ অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের যোগ্য বলিয়া ভাবিত, এই প্রতিক্রিয়ায় লোকে বুঝিল যে হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে গূঢ়ভাব নিহিত আছে এবং হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি পরম সনাতন দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পুষিবার একটা কৌশলমাত্র নহে। ইংরেজী শিক্ষিত লোকের মনোভাবের এই যে পরিবর্ত্তন, ইহাই প্রতিক্রিয়ার মহাফল। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে, ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, জাতীয় মনোভাব সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব", "কৃষ্ণ চরিত্র", গীতার ব্যাখ্যা ইত্যাদি, এমন কি তাঁহার ঐ সময়ের কয়েকখানি উপন্যাসে পর্য্যন্ত এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই ৺চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার "নব-জীবনে" নানা লেখকের ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া এই প্রতিক্রিয়ায় যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, ইংরেজী শিক্ষিত লোকের চক্ষে হিন্দুধর্ম্ম আর অশ্রদ্ধার বিষয় রহিল না, এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সকলই যে কুসংস্কার মাত্র, এরূপ ভ্রান্ত-ধারণা দূরীভূত হইল। ইহাই এই প্রতিক্রিয়ার মোট ফল।

সেই সময়ে, যখন ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল এবং উহাকে "কৃষকের গান" বলিয়া, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রবন্ধাদি লিখিলেন, তখন চূড়ামণি মহাশয়ই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে ঐ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে, ঋগ্‌বেদ ভারতীয় আর্য্যদিগের অসামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। ভারতীয় আর্য্যসভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান যে কতদূর উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, ঋগ্‌বেদে তাহারই নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এখন যে সকল গবেষণা হইতেছে, তাহা চূড়ামণি মহাশয়ের উক্তিরই সমর্থন করে। পাশ্চাত্যজগতে উহা কৃষকের গান বলিয়া ব্যাখ্যাত হইত এবং ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদক সেই পাশ্চাত্য ধারণার প্রতিধ্বনিই করিয়াছিলেন মাত্র।

যাহা হউক চূড়ামণি মহাশয় কয়েক বৎসর সতেজে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া, লোকের মনোভাব কি পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই মনোভাব কি পরিমাণে স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী কবি ডি, এল, রায়ের একটী বিদ্রূপাত্মক কবিতায় বেশ ব্যক্ত হইয়াছে। চূড়ামণি মহাশয়ের প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকের মনোভাব যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কবি তাহাদের নামকরণ করিয়াছিলেন "Reformed Hindoos" এবং তাহাদের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া তিনি পাইয়াছিলেন তিনটী বস্তু—"শশধর Huxley and goose"। এই বিদ্রূপটুকুর মধ্যেই চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিতদিগের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা নিহিত আছে। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-মুগ্ধ হিন্দুর মনে হক্সলীর পাশে একজন শিখাধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের স্থান পাওয়া বড় কম কথা নহে! বস্তুতঃ ঘটিয়াছিল তাহাই এবং উহাই এই প্রতিক্রিয়ায় চূড়ামণি মহাশয়ের কৃতিত্ব।

কয়েক বৎসর তিনি এইরূপ বক্তৃতাদি করিয়া, প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও পুস্তক পুস্তিকাদি রচনা করিয়া, তৎপরে প্রচার কার্য্য হইতে ঠিক অবসর গ্রহণ না করিলেও, বিশেষ আমন্ত্রণ ভিন্ন কোথাও বক্তৃতা করিতে যাইতেন না। "বেদব্যাস" যত দিন ছিল, ততদিন তিনি উহাতে লিখিতেন এবং আন্দোলনের আরম্ভ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত "বঙ্গবাসী"তে সময়ে সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতে অবহেলা করিতেন না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার "ধর্ম্মব্যাখ্যা" গ্রন্থখানি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। যেমন তাঁহার বক্তৃতায় ও কথাবার্ত্তায়, তেমনি তাঁহার লেখাতেও, সর্ব্বত্র সুন্দর একটা আরোহ প্রণালী লক্ষিত হয়; অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ মাত্র স্বীকার

করিয়া ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর প্রতিজ্ঞার সমাধান।

শাস্ত্রে তিন প্রকার বাক্যের উল্লেখ আছে—গুরু বাক্য, মিত্রবাক্য ও কান্তাবাক্য। গুরুবাক্য আদেশ, মিত্রবাক্য উপদেশ এবং কান্তাবাক্য রমণীসুলভ উপাহৃত। এই প্রতিক্রিয়ার প্রাক্কালে ৺শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-সুলভ মনোহর কান্তাবাক্যের দ্বারা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে ধর্ম্মের রসে সিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা স্থায়ী হইত না, যদি না চূড়ামণি মহাশয় উহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার অনুপম প্রণালীতে মিত্রের ন্যায় যুক্তির সহিত বুঝাইয়া উপদেশ না করিতেন। বলা বাহুল্য যুগধর্ম্মের গুণে এখন আর গুরুবাক্যে অর্থাৎ আদেশ-বাক্যে ফল হইবার দিন নাই।

প্রচার কার্য্য একপ্রকার শেষ করিয়া তিনি বহরমপুরে বাস করিতেছিলেন। এরূপ মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত লোকে কখনই নিরবচ্ছিন্ন অলসভাবে সময় কাটাইতে পারে না। এই নিভৃতবাসকালে চূড়ামণি মহাশয় অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বিষয়ে সংস্কৃতে একখানি পুস্তক লিখিতেছিলেন। এ কথা, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিলাম।

ঐরূপ পুস্তক সংস্কৃতে লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে ঐরূপ গ্রন্থের আদর হইবার সম্ভাবনা কম; কিন্তু জার্ম্মাণীতে ঐরূপ পুস্তকের আদর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি উহা সংস্কৃতে লিখিতেছেন। শুনিয়াছি না কি এ পুস্তকখানি তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ইংরাজী যুগে বাঙ্গালার ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস যদি অপক্ষপাতে রচিত হয়, তবে তাহাতে চূড়ামণি মহাশয়ের নাম ও কার্য্য উজ্জ্বলভাবে লিখিত হইবে, সন্দেহ নাই। দেশ, কাল ও পাত্র এবং তাঁহার কার্য্য একত্রে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে, এই প্রতিক্রিয়া সাধনের জন্যই ঐ মহাপুরুষের জন্ম এবং তাহা করিয়াই তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র আত্মা ভব-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ তাঁহার কাছে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ রহিল।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

...তত্ত্ব।
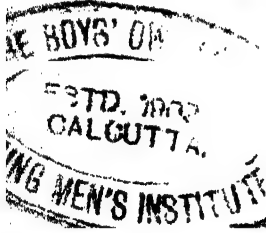
আয়ুর্বিজ্ঞান—চৈত্র

'আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব' (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন। লেখক আয়ুর্ব্বেদমতে পথ্য, স্ত্রীচিকিৎসা, নাড়ীবিজ্ঞান, রসায়ন চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মধ্যে এখনো যে সকল প্রকরণ রহিয়াছে—কেবলমাত্র তদ্দ্বারাই মানবকে চির-স্বাস্থ্য প্রদান করা যাইতে পারে—সেই চিকিৎসার প্রতি ঔদাসীন্যই আজি দেশের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ, একথা সহস্র বার বলিব।" আশা করি, লেখক এই সমস্ত প্রকরণের পুনঃ প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের উপকার সাধন করিবেন।

'সংস্কার না সংহার'—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন। শল্য, শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারবিদ্যা, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, ও বাজীকরণতন্ত্র,—এই আটটি অঙ্গ লইয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ। ইহার মধ্যে শল্যতন্ত্র অধুনা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদ-সংস্কারার্থিগণ এই অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা দিবেন বলিয়া স্কুল কলেজ খুলিয়া ছাত্রদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থগুলি স্থানে স্থানে এরূপ দার্শনিক ভাষায় লিখিত যে, মোটামুটি দর্শনশাস্ত্র না জানিলে সকল স্থান বোধগম্য হয় না। সংস্কৃতে পারদর্শিতা ত থাকা চাই-ই। এরূপ ক্ষেত্রে এই সব স্কুল

কলেজগুলিতে নিম্নপ্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাট্রিক পাশ করা বা ফেল করা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে গেলে তাহা কি ফলপ্রদ হইবে? যদি বলেন, তাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষা দিবেন, তবে মূল আয়ুর্ব্বেদ কালে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কারণ, ভবিষ্যতে এইরূপে বাঙ্গালায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষিত লোকদের নিকট যদি কেহ মূল আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা শিক্ষা দিতে পারিবেন না। সুতরাং লেখক মনে করেন যে, "এই অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষার ব্যপদেশে কলেজ খুলিয়া আয়ুর্ব্বেদের মূল ধ্বংস করিয়া সঙ্গে সঙ্গে একাল পর্য্যন্ত যে পথ অবলম্বনে আয়ুর্ব্বেদ জীবিত থাকিয়া নানা বিষয়েই প্রচলিত যাবতীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন, সেই পথকে কণ্টকিত করা ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা যায় না।" আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকামিগণকে আমরা এ কথাগুলি প্রণিধান করিতে বলি।

'মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য'—শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় চৌধুরী। খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল।

'প্রতীচ্যে হিন্দুচিকিৎসার আলোককণা'—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি একজন বৃদ্ধ ইউরোপীয় চিকিৎসক ভৌতিকবিদ্যার সাহায্যে উন্মাদরোগের চিকিৎসা করিতেছেন। আমাদের তন্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদাদিতে যে কথা আছে, পাশ্চাত্য চিকিৎকসগণ ইউরোপে তাহারই সামান্য কিছু জাহির করিতেছেন—সুতরাং প্রাচ্যের কিঞ্চিৎ আলোক ঐরূপ উপায়ে ইউরোপে পড়িতেছে।

'আয়ুর্ব্বেদের বিরেচন দ্রব্য'—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বনমালী রায়। ত্রিবৃৎ বা তেউড়ী বিরেচনার্থ বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত উদ্ভিজ্জের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাগুণ বর্ণিত হইয়াছে।

'মিষ্টান্নের দোকান'—ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য। লেখক কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য। মিষ্টান্নের দোকানে রাস্তার ধারে খাবার সাজাইয়া রাখা স্বাস্থ্যহিসাবে বিশেষ দূষ্য। কর্পোরেশনের কঠোর নিয়ম সত্ত্বেও দোকানীরা খাবার অনাবৃত রাখে। বিশেষতঃ পূজাদি উপলক্ষ্যে এবং "লগনসা"র সময় ত কথাই নাই। ফুটপাথের উপর চৌকী পাতিয়া রাশীকৃত খাবার সাজাইয়া রাখে। রাস্তার জীবাণু পরিপূর্ণ ধূলা ও মাটি খাবারের উপর পড়িয়া যে কত সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে, তাহার ঠিক নাই। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে একজন করিয়া খাদ্য-পরীক্ষক বা ফুড ইনস্পেক্টার আছেন। তাঁহার একলার সাধ্য কি যে এতগুলি দোকানের উপর দৃষ্টি রাখেন। সুতরাং কলিকাতা সহরে খাদ্যপরীক্ষা ব্যাপারটি প্রহসনে দাঁড়াইয়াছে। লেখক কর্পোরেশনের সদস্য। তিনিও কর্পোরেশনের তরফ হইতে প্রতীকারসাধন সম্বন্ধে "হাল ছাড়িয়া দিয়া" বলিতেছেন—"শুধু মিউনিসিপ্যালিটীর খাদ্যপরীক্ষকের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে এ বিপদ হইতে কখনই উদ্ধার পাওয়া যাইবে না। নিজেদের কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া লাগিতে হইবে।" এ প্রস্তাবের সারবত্তা সম্বন্ধে অবশ্য কাহারও সন্দেহ নাই, তবে দুর্ভাগ্য এই যে, কলিকাতাবাসীদের এত ট্যাক্স দিয়াও অবস্থা হইয়াছে—"নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার।"

'কয়েকটি তৈলের পরিচয়'—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র দত্ত। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাদের বংশগত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও যোগের কথার পরিচয় দিতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটিও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত। ইহাতে তিনি "বৃহৎ পটোলাদ্য তৈল", "এলাচাদি তৈল" ও "বৃহচ্চন্দ্র গুড়ূচি তৈল"—এই তিনটির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন।

'পেটের অসুখের চিকিৎসা'—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন। অবস্থাভেদে পেটের অসুখের চিকিৎসাপ্রণালী। প্রবন্ধটি অতি সারবান হইয়াছে। চিকিৎসক ও ছাত্র উভয়েরই উপকারে আসিবে। আশা করি, লেখক ক্রমশঃ অন্যান্য রোগের চিকিৎসাপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন।

কবি রাজশেখর—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। এবারে রাজশেখর কাব্যরচনায় প্রতিবন্ধক কি, এবং কাব্য লোকসমাজে আদৃত হয় না কেন, তাহার কারণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেকালে রাজধানীতে কবিসমাজ কি ভাবে গঠিত হইত, তাহার বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান নগরীতে এইরূপ সভা থাকিত, তাহাদের নাম ছিল 'ব্রহ্মসভা'।

দোলযাত্রা—শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুলিখিত প্রবন্ধ। বসন্ত-সমাগমে এই উৎসব কেন অনুষ্ঠিত হইত, তাহার কারণ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বেদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কালে যে ভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত তাহার বিবরণ ইহাতে আছে। জগতের অন্যান্য দেশেও এই উৎসবের অনুরূপ উৎসবের কাহিনী ও অল্পবিস্তর বিবৃতি আলোচ্য প্রবন্ধকে অধিকতর উপাদেয় করিয়াছে। কেমন করিয়া হোলি, দোলযাত্রা ও ফাগুয়া অশ্লীলতার উৎসবে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথাও লেখক বলিতে ছাড়েন নাই। পরিশেষে তিনি মধ্যযুগের সাধক সাধিকারা যে উৎসের ভিতর দিয়া 'পরম আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য ও আনন্দ উপলব্ধি' করিয়াছিলেন, সেই কবীর ও মীরার দোঁহা সকল উদ্ধৃত করিয়াও তাহার বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। লেখকের গবেষণা প্রশংসার্হ।

সংস্কৃত-সহিত্য—রামায়ণ-কথা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এবারে কৈকেয়ীর চরিত্র বিশ্লেষণে লেখক বড় একটা কৃতিত্ব দেখাইতে

পারেন নাই। তাঁহার দেবীত্ব প্রমাণ করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া মানবীয় দোষগুণের আলোচনা তীক্ষ্ণধী সমালোচকের মত করেন নাই।

জ্ঞানতপস্বী ওমর খৈয়াম—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী। আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কবি ওমার খৈয়ামের অলৌকিক প্রতিভা, সাধনা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তৃপ্ত হইলাম।

প্রাচীন ভারতে বিচার-বিভাগ—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রাচীন ভারতে বিচারকার্য্য কি ভাবে চলিত তাহা লেখক মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের অনুশাসন বাক্য উদ্ধার করিয়া বেশ একখানি মনোজ্ঞ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন।

দাদা মশাই—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। এবারে লেখিকা কয়েকখানি চিঠির ভিতর দিয়া 'দাদামশাই'এর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মধ্য এসিয়া—শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ। সচিত্র সুন্দর সংকলন। বহুজ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ।

অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু। ধলা বীণাপাণি সাহিত্য-সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক উৎসবের সভাপতির অভিভাষণ। মামুলি ধরণের ; জানিবার বিশেষ কিছুই নাই।

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

রাস ও দীপালী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি। ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে রাস ও দীপালী নববর্ষের উৎসব ছিল। সে সময়ের কৃত্যের আলোচনা লেখক মহাশয় সুন্দর ভাবে করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকের পাণ্ডিত্য ও গবেষণার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্বের মতই বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। এবারে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কি করিয়াছেন, লেখক তাহা অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে লিখিয়াছেন।

দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী। এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। যাঁহারা সামান্য বা বিনা কারণে, বিশেষতঃ ভাষার পরিবর্ত্তনে চণ্ডীদাসের চণ্ডীদাসত্বে সন্দিহান হন, তাঁহাদের এ প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে পাঠ করা উচিত। পরিশেষে লেখক বলিয়াছেন— "চণ্ডীদাসের নামে কি কিছু মাত্র ভেজাল চলে নাই? সম্ভবতঃ কিছু কিছু চলিয়াছে, কিন্তু সে সমস্ত পদই উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া ধরিতে হইবে। প্রয়োজনের অনুরোধে যেমন রূপ সনাতন ইত্যাদির। মহামহোপাধ্যায়-গণের নামেও জাল গ্রন্থ চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চণ্ডীদাসের নামেও সে রকম হওয়া সম্ভব। চণ্ডীদাসের কবিত্ব-খ্যাতি বজায় রাখিবার জন্ম বড় বড় কবিগণ তাঁহার নামে পদ রচনা করিয়া চালাইয়াছেন—অথবা ক্ষুদ্রতর কবিগণ স্বরচিত কবিতা সুপ্রচলিত করিবার জন্ম তাহাতে চণ্ডীদাসের ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন—এই উভয় অনুমানই অশ্রদ্ধেয়।" অদ্যাবধি প্রকাশিত চণ্ডীদাসের সমুদয় পুঁথির সাহায্যে তাঁহার পদাবলীর একটী নূতন সংস্করণ প্রচারিত হওয়া উচিত বলিয়া লেখক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সুখের বিষয় সেই কার্য্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ভারতীয় চিত্রশিল্প—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন। লেখক আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রূপকে অতিক্রম করিয়া ভাবের প্রাধান্য দেওয়াই হইতেছে ভারতীয় শিল্পের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। লেখক তাঁহার কথা এই ভাবে বলিয়াছেন,—যদি ভাবের প্রাধান্য থাকে তবে চিত্রে প্রাণিদেহের আকৃতিগঠনে প্রকৃতির সহিত অসামঞ্জস্য থাকিলে, অথবা পরিপ্রেক্ষণার (perspective) অসঙ্গতি দোষ থাকিলেও তাহাতে চিত্রের উৎকৃষ্টতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে অল্পপরিসরের মধ্যে শিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার জিজ্ঞাস্য দুইটী প্রশ্ন এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

(১) চিত্রে anatomyকে লঙ্ঘন করার দরুণ লোকের আকৃতি যদি অলৌকিক হইয়া ওঠে, অথবা perspectiveকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য পার্থিব চিত্র যদি অপার্থিব হইয়া ওঠে, তাহাতে চিত্রের উৎকৃষ্টতা সামান্য মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় কি না? (২) কোনও ক্ষেত্রে চিত্রে আদর্শ সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য anatomy এবং perspectiveএর অশুদ্ধতা প্রয়োজনীয় হইতে পারে কি না?—কারণ, লেখকের মতে, চিত্রের আদর্শই হইবে রূপের মধ্য দিয়া ভাবের প্রকাশ। ভাবটাই মুখ্য, রূপটা গৌণ; কিন্তু তাই বলিয়া তো রূপকে বাদ দিলে বা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না; কারণ রূপকে ভিত্তি করিয়াই চিত্র; নতুবা চিত্রের কোন অর্থই থাকে না। লেখক গ্রীক ও ইটালীয় শিল্পীদের সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব সুবিন্যস্ত ও সুসমঞ্জস (symmetrical) ও ভাবসম্পদেও তাহারা কাঙ্গাল নয় বলিয়াছেন। অজন্তাগুহার ভারতীয় চিত্রাবলীতেও 'দৈহিক আদর্শ-সঙ্গত প্রাকৃতিক মূর্ত্তিই' যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি করিয়া বলিতে পারা যায় যে প্রাচীন শিল্পীরা anatomy ও perspectiveএর দাবী লঙ্ঘন করিয়াছেন?

অন্যত্র আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমাদের শিল্প বলে, বিদ্যাসাগরের জরাজীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর মাটির দেহের ছাঁচ লইয়া কি লাভ? এই লও আমি তোমাকে সেই মুক্ত আত্মার অজর মূর্ত্তি দিতেছি—যে মূর্ত্তিতে তিনি দেবলোকে বাস করিতেছেন এবং যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মানসলোকে বিরাজ করিতে চাহেন।" লেখক এখানে আর

একটী সমস্যা তুলিয়াছেন—তিনি প্রথমে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের দুইটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—"বোধ হয়, চোখে আমরা নিখিল পদার্থের মায়াচ্ছন্ন ছদ্ম মূর্ত্তিটি দেখি, আর মনে সত্য মূর্ত্তিটি দেখি। শাস্ত্রেও তো বলে, সত্যটা চোখে দেখা যায় না, মনে ধরা দেয়।" তাহার পরে তিনি লিখিয়াছেন—"যাঁহারা পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস পড়িয়া বিদ্যাসাগরকে চিনিবেন, তাঁহাদের নিকট এরূপ মানসমূর্ত্তি এক হিসাবে সত্য হইতে পারে বটে; কিন্তু যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত ছিলেন, অথবা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মানস মূর্ত্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? প্রাকৃতিক ব্যক্তির চিত্র বা মূর্ত্তি শিল্পবিচারের পক্ষে, প্রাকৃতিক সত্য ও বিচারের একটী মানদণ্ড নয় কি?

বাস্তবিকই শিল্পরসবোধ সাধারণের মনে জাগাইয়া তুলিবার জন্য এই সকল সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। এবিষয়ে আমরা অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী ও চিত্রসকলের আলোচনা কালেও বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। আমাদের মনে হয় শিল্পেও আমাদের ভাবপ্রবণতা আমাদিগকে এতদূর লইয়া গিয়াছে যে, বাস্তব anatomy ও perspectiveকে আমরা পদদলিত করিতে বসিয়াছি।

'ঝিচক্রে ক্যালকাটা হুইলাস'—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সচিত্র ভ্রমণকাহিনী। পূর্ব্বের মতই চিত্তাকর্ষক হইতেছে।

'কবিওয়ালা'—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। এবারে কবিওয়ালা রঘুনাথ দাস ও রামজী দাসের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আপ্যান বস্তুর অল্পতা জন্য প্রবন্ধটী তেমন উপাদেয় হয় নাই।

'পৌরাণিকী'—শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী। ক্রমশঃ প্রকাশ্য আত্মজীবনচরিত। সচিত্র প্রবন্ধ। এবারে বংশপরিচয় আছে।

'ক্যামবোডিয়া'—শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। সচিত্র সুন্দর সংকলন।

'দক্ষিণে'—শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এবারে চিদাম্বরমের মন্দিরের কথা বিবৃত হইয়াছে। লেখক ঠাকুরের প্রাতঃকালীন আহার ও স্নানের সময় তোপ দাগায় মর্ম্মাহত হইয়াছেন ও লিখিয়াছেন,—"যুগের পর যুগ আমরা এইভাবে নিজেদের বুদ্ধিকে অপমান কোরে বিদেশীদের নানা রকম মন্তব্যের কারণ হয়ে রয়েছি। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তার বিশেষ কোনো রূপ বা তাঁর কোনো প্রতীক মনের মধ্যে ধারণ করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই; কিন্তু সেই বিশেষ রূপ বা চিহ্নটীকে যখন স্নান ও আহার করান হয়, তাকে গামছায় মুড়ে, তার বিবাহ দিয়ে বাসর শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়, তখনি সেটা পুতুলখেলায় দাঁড়ায়। এর দ্বারা স্রষ্টার মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করা তো হয়ই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে শ্রেষ্ঠদান বুদ্ধি—সেই বুদ্ধির প্রতি অবহেলা কোরে দাতা ও দানের অপমান করা হয় এবং এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করায় বিপদ আছে।" বিপদ থাকিবার কারণ কিছু আছে কি না তাহা জানি না, তবে একথার উত্তরে মাঝে মাঝে প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্রের স্থলবিশেষের উত্তরে আমরা যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই সম্পূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য—'ঠাকুরকে খাওয়ান পরান বা তাঁহার বিবাহ দেওয়ায় ধর্ম্মের দিক্ হইতে ভক্তি, ভাব এবং অনুভূতির দিক হইতে হিন্দুদিগের কোনরূপ আপত্তি নাই, এবং এ কার্য্য প্রত্যেক হিন্দুগৃহস্থই করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ধারণার সহিত এ সকল কার্য্যের বিরোধিতা নাই।'

'ভ্রাম্যমানের জল্পনা'—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। এবারও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কথা বিবৃত হইয়াছে।

'ব্রাইটন'—কুমার শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় লিখিত সচিত্র ভ্রমণকাহিনী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সমুদ্রোপকূলস্থ ব্রাইটন নগরের সুন্দর বর্ণনা।

'বিশ্বসাহিত্য'—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এবার টমাস হার্ডি'র জীবনের কথা ও রচনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আলোচনার কোনও বৈশিষ্ট্য নাই।

বিচিত্রা—চৈত্র।

জাভা-যাত্রীর পত্র—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাহিরের খবর খুবই কম, অধিকাংশই লেখকের আত্মগত ভাব—নূতনত্ব নাই বলিলেই হয়।

ভানুসিংহের পত্রাবলী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রচনা পূর্ব্ববৎ সরস ও উপাদেয়।

শিল্পী শ্রীমতী সুনয়নী দেবী—শ্রীমতী নোরা পুরসার উইডেনব্রাক। গত ১লা অক্টোবর ১৯২৭ সালে লণ্ডন সহরে Women's International Art Clubএর উদ্যোগে এক শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়। তথায় শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর কতকগুলি ছবি দেখান হইয়াছিল। সেই ছবি গুলির উদ্দেশে লেখিকা জার্ম্মান ভাষায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহারই অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধে যিনি চিত্রকর তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য অল্প কথায় বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সূক্ষ্মানুভূতির পরিচায়ক।

আধুনিকতম সাহিত্য—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। আধুনিকতম অশ্লীল সাহিত্যকে উদ্দেশ করিয়া লেখক বলিতে চান্, সারা জগতে আজ বোল্‌শেভিক সাহিত্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের সাহিত্যে তাহারই বীজ অঙ্কুরিত। এ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক বলেন, "তাহাতে আলো অপেক্ষা উত্তাপ বেশী, উত্তাপ অপেক্ষা দাহ বেশী—আনন্দ অপেক্ষা ব্যথা বেশী; ব্যথা অপেক্ষা জ্বালা বেশী; প্রসারতা অপেক্ষা তীব্রতা বেশী; তীব্রতা অপেক্ষা কুটিলতা বেশী; স্থৈর্য্য

অপেক্ষা গতি বেশী ; গতি অপেক্ষা ঘূর্ণী বেশী।" রচনা সাময়িক, সারগর্ভ ও উপভোগ্য।

চিত্রাঙ্গদা—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লেখক এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা সুধীগণের বিবেচ্য। সমালোচনার প্রকৃতি সম্বন্ধেও তিনি অনেক সারবান্ কথা বলিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি এবং যাঁহারা কাব্যরসপিপাসু তাঁহাদের দৃষ্টিও এ দিকে আকর্ষণ করি। একজন ভারতীয় কাব্য-রসিকের সমালোচনা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পথে প্রবাসে—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। রোমা রোলার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কথা সাময়িক ব্যাপারকে উদ্দেশ করিয়া কথিত। কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইল—

১। নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে অপর নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই।

২। আর্টিষ্ট শুধু চিরকালের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি নিয়েই থাক্‌বে না; স্বকালের সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করবে।

৩। টাকার জন্য আর যাই করুন, বই লিখবেন না।

৪। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কিছু করে manual labour করা, আর্টিষ্টও যখন ব্যক্তি তখন আর্টিষ্টেরও এই কায করা উচিত।

৫। এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? এ যুগের লোকের সুখ-দুঃখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না বলে। Victor Hugoর মত জন-সাধারণের কবি থাক্‌লে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বৈকি।

৬। আর্টের অভীষ্ট সমজদার, চরম (ultimate) সমজদার জন-সাধারণ। জন-সাধারণের জন্যই আর্ট।

৭। সাহিত্যিক যদি সুস্থমনা হয়ে থাকে, তবে সমাজের সত্যিকার আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শের বিরোধ হবে না; আর যদি সুস্থমনা না হ'য়ে থাকে তবে আর রচনাকে সাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যকে সাজা দেওয়া চলে না।

কথাগুলি বিশেষ ভাবে আলোচ্য সন্দেহ নাই।

রূপ-কলার বিশ্বরূপ—শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন। সুন্দর রচনা—প্রতিপদে লেখকের ভাবুকতা ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা ও রচনাভঙ্গী পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে। লেখক বলেন, "পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে ভারতবর্ষের আর্টটি জগতের কাছে দুর্ব্বোধ্য। এ আর্ট বুঝ্‌তে গেলে সকল আর্টের ভিত্তি এবং আর্টের সমস্ত ভিত্তি আলোচনা করা দরকার, কারণ আর্ট জাতির মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের চিন্তাধারা, সাধনা এবং গতিবেগ সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার ধারণা না হোলে এ আর্ট বোঝা যাবে না। অথচ যাঁরা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করেছেন, তাঁরা কেউ এ অধিকারের দাবী করতে পারেন না। এ জন্য কেউ বলছেন এ আর্ট animistic, কেউ বলেন sensual, কেউ বলছেন spiritual, কেউ বা বলছেন symbolic, কেউ বা বলছেন obscene ইত্যাদি—এঁদের সকলের পক্ষে ভারতবর্ষের ভিতর যে বিচিত্র বহুর একতা হয়েছে সে তত্ত্ব খোঁজ করা দরকার।

লেখকের যুক্তি ও বিচার যে জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা শুধু বিদেশ হইতে ধার করা নয়। দেশের কথা তিনি দেশীয় যুক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন অথচ বিদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার নিকট রুদ্ধ এ কথা ইহা বলা চলে না।

দোলের ছুটি—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত। ভ্রমণ-কাহিনী ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যাত্রার বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। কোন বিশিষ্টতা লক্ষিত হইল না।

চীনে হিন্দু-সাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী। প্রবন্ধে বিস্তর জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

ভিসগু ব্লাস্কো ইবানেজ—শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য। স্পেনের বিখ্যাত সাহিত্যিক Ibanezএর পরিচয় সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর।

প্রবাসী—চৈত্র।

বাউল গান—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি এই ছোট প্রবন্ধে বাউল গান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁহাদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতার গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিষ হিন্দু মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করে নি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস।" কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কয়েকখানি পত্র—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কতকগুলি সাময়িক ও সাধারণের বিবেচ্য উক্তি উদ্ধৃত হইল—

১। আমি ছেলেদেরকে বই দেখে শেখাইনে। মুখে বলে বলিয়ে নিয়ে এবং লিখে লিখিয়ে তাদের গ্রহণ করবার এবং প্রকাশ করবার শক্তিকে জাগিয়ে তুলি। সে প্রণালী অত্যন্ত সহজ বলেই শক্ত।

২। দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূল পত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয়, সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই সমাজের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—

তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন এবং বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়।

সাদৃশ্য—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়। লেখক এখানে আর্টে সাদৃশ্যের (likeness) আবশ্যকতা কি তাহা নিজের বিশিষ্ট ভাব ও ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষাটি চলিত কথায় হইলেও ভাবটি জটিল। তবে অনেক স্থলে সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে।

চণ্ডীদাস—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে লেখক যে কয়টি কথা বলিয়াছেন তাহা এই:— (১) চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক ছিলেন, এ প্রবাদ অবিশ্বাস না করাই যুক্তিযুক্ত। (২) খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সময় ধরিয়া লওয়া উচিত।—ইহার পর চণ্ডীদাসের সময় দেশের অবস্থা কিরূপ তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। রচনা সংক্ষিপ্ত, সব কথা সম্পূর্ণ ভাবে আলোচিত হয় নাই।

সাহিত্যে সেকাল ও একাল—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। লেখক বলেন, একালের দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে সোভিয়েট-সাহিত্যের মিল আছে। এই আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য হইতে কতটা ভিন্ন তাহা দেখাইয়া লেখক বলিতেছেন—"একালের শিল্পী জীবনকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে চান্; কিন্তু জীবনের ছন্দ এক, এবং শিল্পের ছন্দ আর। জীবনকে শিল্পের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে হইলেই তাহাতে দরকার একটা রূপান্তর—পাশ্চাত্যে ইহারই নাম Stylisation—এই রূপান্তরের অর্থই শিল্পগত সৌন্দর্য্য।" সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে "সকল শিল্পের সত্য হইতেছে আত্মা, রস হইতেছে প্রাণ, আর রূপ হইতেছে শরীর।"

এই তুলনামূলক সুপাঠ্য আলোচনাটির দিকে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রামায়ণের রাজ্য-বিজয়—শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়। যবদ্বীপে যে রামায়ণের কথা প্রচলিত তাহারই বিবরণ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে লেখক অনেক ঐতিহাসিক তথ্যেরও অবতারণা করিয়াছেন। বিষয় চিত্তাকর্ষক।

যবদ্বীপের পথে—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবার সিঙ্গাপুরের চীনা পাড়া ও চীনা মন্দিরের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা পূর্ব্ববৎ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

গ্রীস ও রোমের শিল্পে শরীর চর্চ্চার আদর্শ—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। লেখকগণ এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, প্রাচীন কালে গ্রীস ও রোমের শিল্পে দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যকে একটা প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছিল। প্রবন্ধে বিশেষ কিছু আলাচ্য বিষয় নাই, তবে ছবিগুলি পরিচিত হইলেও মূল্যবান্।

সত্তর বৎসর—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

কবিতা।

বসুমতী—ফাল্গুন।

'প্রেম'—(কবিশেখর) শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। প্রেম আছে বলিয়াই জীবনের ভার বহনীয় হইয়াছে, দুর্গম পথ সুগম হইয়াছে, দুঃখের কাঁটার মাঝে সুখের গোলাপ ফুটিয়াছে, এইরকম অতি সাধারণ ভাবেই প্রেমের মহিমা গান করা হইয়াছে। 'আখর' দেওয়ার কৌশল আছে বটে, কিন্তু কবিশেখরের কাছে আমরা আরও উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন আশা করি।

'নিয়তি'—মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী (ত্রিপুরা)। কাব্য না থাকিলেও সান্ত্বনা আছে।

'বসন্ত-প্রভাতে'—৺মুনীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। বসন্ত-প্রভাতে বনের শোভা বর্ণনা। সুললিত রচনা।

'শেষ-প্রশ্ন'—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার রায় চৌধুরী। ভাব পবিত্র, তবে অভিব্যক্তি সর্ব্বত্র সুষ্ঠু হয় নাই।

'দূরের মিলন'—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায়। প্রেয়সী এত দূরে যে মিলন অসম্ভব জানিয়াই উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে—এক রকম মরিয়া হইয়াই—কবি কলম ধরিয়াছেন। আমরা সব যায়গার মানে বুঝিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু কবি ভাবিতেছেন—"যারে বলি সেই তা শোনে,
আর সকলে হাসে।"

প্রকৃত সাধক—শ্রীমতী সুরবালা বিশ্বাস। ছয় লাইনে প্রকৃত সাধকের স্বরূপ-নির্ণয়! কাব্যে সবই চলে।

খিড়্‌কী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। ধনবানের বাটীর সদর দরজার রাস্তার সঙ্গে অন্দরে ঢুকিবার খিড়্‌কীর পথের তুলনায় সমালোচনা করিয়া কবি ব্যঞ্জনা দ্বারা কেতাদুরস্ত কঠোর-হৃদয় ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত পুরুষদের পৌরুষ-চিত্র ও অন্তঃপুরবাসিনী কোমল-হৃদয়া মা-জননীদের স্নেহ-করুণা বিগলিত পবিত্র চিত্র বেশ কৌশলের সহিত কয়েকটি ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু মিলন সুলভ অনুপ্রাসের লোভ যে যতীন্দ্র বাবুর মতন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবিকেও লুব্ধ করিয়া রচনায় অনবহিত করিতে পারে, তাহা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম।

পতিহীনা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্গের বিধবার প্রতি মামুলি সমবেদনা জ্ঞাপন, অধিকন্তু সমাজ ছাড়িয়া বনে বাস করিবার উপদেশ—সমাজের উপর কষাঘাতও বাদ যায় নাই,—

"নিষ্ঠুর সমাজে তোমার দেখি না মা স্থান,
দেবী-ভাবেও কেউ তোমারে করে না সম্মান।"

এ অতিরঞ্জিত চিত্র আঁকিয়া লাভ কি? ইহাতে মিস্ মেওর পুস্তকের নূতন সংস্করণের খোরাক জুটিল। এইরকম তিল তিল যোগাড় করিয়াই ত মিস্ মেও তিলোত্তমা গড়িয়াছেন।

পেয়েছি—শ্রীযুক্ত বিভুতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন। কবি কি পেয়েছেন তিনিই জানেন, আমরা ত বিশেষ কিছুই পাইলাম না।

দোলের আমন্ত্রণ (গজল গান)—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। ("কবি-শেখর" নাই কেন?) ঠিক করিয়া পড়িতে না পারিলে পাঠক ইহার সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবেন না। এটী কবিতা নয়—একটি গান, এইটি মনে রাখিতে হইবে। কবি খুব শব্দ-কুশলী ও রচনা-দক্ষ, তাই এত বাহাড়ম্বরের ভিতরও মানেটা ঢাকা পড়ে নাই।

বসন্ত—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। কবির হাত মিষ্ট, কিন্তু মামুলী বসন্ত বর্ণনায় এমন মিষ্টান্ন অপাত্রেই পরিবেষণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

দৃষ্টি স্মৃতি—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী। কবিতাটিতে কাব্যে প্রচলিত কতকগুলি বেশ চটকদার কথা আছে, প্রথমটায় ধাঁধা লাগে। এই ধাঁধা কাটাইয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেই পাঠক দেখিবেন, সবই ফাঁকা।

তাজের স্বপ্ন—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত। করুণ মধুর রচনা। এ স্বপ্নে জড়তা নাই, স্নিগ্ধতা আছে। তাজ সৌধ যে কত কবিকে কত চিত্রকরকে অনুপ্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আলোচ্য কবিতাটির কিন্তু মূল উৎস আসল তাজ নয়, একখানি ছবি। কথায় বলে "সাত নকলে আসল খাস্তা", ছবিখানি ঠিক মনে পড়িতেছে না, সেদিন দেখিলাম এরই মধ্যে ভুলিয়াছি, কিন্তু তাজ দেখিয়াছি অনেক বছর আগে আজও ভুলি নাই। এ কবিতাটির স্মৃতিও যে বেশী দিন স্থায়ী হইবে, এরূপ ভরসা নাই। তাজের যে অপরূপ শিল্প-সৌন্দর্য্য, যে অপার্থিব কলা-কৌশল, যে মনোমুগ্ধকর মাধুর্য্য, তাহার তুলনা নাই বটে, কিন্তু উপযুক্ত হাতে পড়িলে তাজ-কাব্যও যে অমরত্ব লাভ করিতে পারে, তাহারই পরিচয় বিশ্ব-কবি রচিত 'তাজ-মহলে' পাইয়াছি। আলোচ্য কবিতাটিতে সংযমের অভাব দৃষ্ট হইল, আর রচনার বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

মাতৃ-স্তোত্র—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ। মাতৃ-স্নেহ যেমন চিরদিনই সন্তানের অপার্থিব ঐশ্বর্য্য, মাতৃ-ভক্ত সন্তানের হাতে গঠিত মাতৃ-প্রতিমাও তেমনি জগদ্বরেণ্য। মাতৃভক্ত সন্তান নানা দিক্ হইতে মাকে দেখিয়া মাকেই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান জানিয়া জন্ম-সার্থক জ্ঞান করে। মা কখনও সন্তানের জন্য ভিখারিণী, কখন 'শবরী', কখন বা 'পক্ষিণী', কভু 'চণ্ডী' কভু 'বাঘিনী', কভু 'ডাকিনী', কিন্তু সন্তানের কাছে মা চিরদিনই 'মা'। সন্তানের প্রাণের একান্ত অভিলাষ—

"জনম জনম মা হয়েছ,
জনম জনম হবেও মা;
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার,
তোমার কাজল, তোমার চুমা।

কবির হৃদয়-মাধুর্য্যে কবিতাটি মধুর হইয়াছে।

বর্ষ-অবসানে—বাণীকুমার। বর্ষ-বিদায়ে দেখিতেছি কবি-হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁর বাণী মাঝে মাঝে প্রলাপের মত শুনাইতেছে। ইহাতে উচ্চাঙ্গের কবিতার অনেক মাল-মসলার সংগ্রহ আছে, যথা—'শাশ্বতী-মায়া' 'চিরন্তনী' 'সীধুপান' 'চারু-জাগানিয়া' 'বিস্মরণের দিন' (বিস্মরণী নয়), 'জয়ন্ত হার' 'আকাঙ্ক্ষা-প্রিয়া' ইত্যাদি; কিন্তু গাঁথুনি মজবুত হয় নাই।

প্রবাসী—চৈত্র।

আম্রবন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুচিক্কণ নবকিশলয় শোভা-সমন্বিত নয়নাভিরাম মঞ্জরীসংযুক্ত আম্রবনের গোপন-বারতা কবি-হৃদয়ের গোপন-ব্যথার সহিত এক তানে এক সুরেই বাজিতেছে। আম্রবনের মর্ম্মর-ধ্বনিতে কবি পূর্ব্ব-জন্মের অনেক বিস্মৃত সুখ-স্মৃতির সন্ধান পাইয়াছেন। আম্রবনের বিচিত্র গন্ধে, অপূর্ব্ব রসে কবি নিজ হৃদয়ের রস-মাধুর্য্য ও গন্ধ-সম্ভারেরই ছায়া দেখিয়া আম্রবনকে নিজ জন বুঝিয়া পুলকিত হইয়াছেন। আম্র-ফলের সঙ্গে এই অপরূপ মাধুর্য্য বা ঐশ্বর্য্যের কোন সম্পর্ক নাই, আম্রবন মাত্রেরই যাহা সাধারণ সম্পত্তি, সেই মর্ম্মর-ধ্বনি, নবকিশলয়, নবীন মঞ্জরী লইয়া কবির এই রসোল্লাস। এবারে আমের বড়ই দুর্ব্বৎসর, ল্যাংড়া, বোম্বাইএর ত কথা নাই, সাধারণ আমও দুষ্প্রাপ্য ও বিস্বাদ হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। ফল-নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিলেই পাঠক এই সরস-মধুর ব্যঞ্জনাপূর্ণ কবিতাটির প্রকৃত রস উপভোগ করিয়া ধন্য হইবেন।

রুদ্র যত্তে......পাহি নিত্যম্—শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় চৌধুরী। কবিতাটির নামটি যেমন বিরাট, বপুটি তত বিশাল না হইলেও দমে যথেষ্ট ভারি। তবে দেহটি জীবনময় নয় এই যা দুঃখ। মাঝে মাঝে ভাল ভাল বাক্যাংশ আছে, শব্দ-যোজনারও ঘটা আছে, কিন্তু মোটের উপর কবিতাটিতে রস-সঞ্চার বা প্রাণ-সঞ্চার হয় নাই। কবিতাটি পড়িয়া বহুদিন পরে বোধোদয়ের সেই 'পুত্তলিকার' কথা মনে পড়িল।

সিন্ধু-বিরহ—শ্রীমতী শিবানী দেবী। এ ক্ষীণ সান্ত্বনার বাণী বিরহোন্মত্ত সিন্ধুর কাণেই পশিবে না—'মরমে' ত দূরের কথা।

বিচিত্রা—চৈত্র।

গান—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বসন্ত সমাগমে বনভূমি 'মদির'

মলয় প্রবাহে অধীর হয়, 'কিংশুকে শিমূলে' লাল হয়, সংযমহারা কোকিলের গানে অহর্নিশি মুখরিত হয়, অজস্র ঝরা বকুলে পেলব হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে কাননের এই মোহিনী মূর্ত্তিই ধরা পড়ে। কিন্তু কাননের মেরুদণ্ড স্বরূপ যে অভ্রভেদী উন্নত-শির স্থির-গম্ভীর 'ধ্যান-মগ্ন' 'তপস্বী' শালতরু তাহার উপর কি বসন্তের কোন প্রভাবই নাই? স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় বটে শাল স্বতন্ত্র, সে তার নিজস্ব গৌরবে ও মহিমায় বসন্তের যাদু-শক্তি এড়াইয়া বাঁচিয়া গেছে; কিন্তু মহাকবির অন্তর্ভেদী-সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে শাল এবার ধরা পড়িয়াছে। বসন্তকে সফল করিবার জন্য এই 'বিশাল' শালের সাধনা যেমন গভীর, যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের এই অপরূপ রস-রচনাকে আমরা 'অনবদ্য সুন্দর' ইত্যাদি বলিয়া certificate দিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। হয়ত ইহাতে স্থানে স্থানে 'অতি-বিস্তৃতি' দোষ আছে, মাঝে মাঝে ইহা 'ব্যাখ্যা মূলক'ও হইয়াছে, কিন্তু যে অভিনব দৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ শাল তরু দেখিয়াছেন তাহা কাব্যামোদী পাঠককে আনন্দ দিবে ও কবিগণকে মামুলি বসন্তবর্ণনার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া একটি নূতন পন্থা দেখাইয়া দিবে।

বুদ্ধ—শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার। বুদ্ধদেবের, বুদ্ধ-মূর্ত্তির, বুদ্ধ-ধর্ম্মের ছন্দে appreciation সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতার দৈর্ঘ্য দোষের হয় না, যদি তাহা সাবলীল গতি দ্বারা পাঠককে অগ্রসর করিয়া দেয়। এখানে সেই গতি মাঝে মাঝে উপল-ব্যথিত, কোথাও বা মরু-প্রবাহিনী নদীর মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ভাবের গাম্ভীর্য্য ভাষার ঐশ্বর্য্য মাঝে মাঝে মরুদ্যানের মত পাঠককে পথ-ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিলেও, মরু পার হইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে "জয়োল্লাস—জগতের মহা-বৈরী-নিধন-উৎসবে" দেখা সমীচীন নয়।

প্রশ্ন—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ। বরযাত্রী ঠকানো-প্রশ্ন পুস্তকের নব সংস্করণে এ প্রশ্নটির স্থান হওয়া উচিত। আমরা এ দিকে বটতলার প্রকাশকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খেয়ালিয়া—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। খ্যাতির বিড়ম্বনায় বিব্রতের বিলাপ। রচনা বেশ কোমল ও করুণ। কবিত্ব রসে গাঢ় না হইলেও 'খেয়ালিয়া' যে 'হেঁয়ালিয়া' হয় নাই এই আমাদের পরম লাভ।

প্রভাতী—শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কবি বোধ হয় প্রভাত বর্ণনায় 'একটা নূতন কিছু করিবার' চেষ্টা করিয়াছেন। 'ফুলের গীতা,' 'মন্দির দুয়ারী' প্রভৃতির হদিশ পাইলাম না।

রজনীগন্ধা—হুমায়ুন কবির। স্বরচিত সনেট, তবে একটু গুরুভার।

বসন্তের দূত—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুটনোটে আছে "পারস্য কবি 'সারের'এর একটি কবিতা অবলম্বনে। আমরা এ দৌত্য কার্য্যের ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

পরিণয়-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঋতু পরিবর্ত্তন নয় পরিণয়। শীতের তিরোধানে বসন্তের আবির্ভাব—বসন্তের সাফল্যের জন্য হেমন্তই গোপনে গোপনে আয়োজন করিয়াছিল—বসন্ত গলায় ফুলের মালা দুলাইয়া বরবেশে আসিল, কিন্তু হেমন্তেরই বুকের ভিতর সেই ফুলের বীজ নিহিত ছিল ও পুষ্ট হইতেছিল। বিবাহ-সভায় বিশ্ব-কবির এই 'পরিণয়-মঙ্গল' বিলাইলে কেমন হয়?

কথা-সাহিত্য

প্রবাসী—চৈত্র।

কিশা গোতমীর অভিশাপ (ছোট গল্প)—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গল্পের মূলাংশ—সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগের পর যখন সাত বৎসর পরে কপিলাবস্তু নগরের পথে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। একদিন এক রম্য অট্টালিকার আঙ্গিনায় গিয়ে তিনি গোতমীকে দেখে চমকে উঠলেন। নারী সোজা হয়ে উঠে বল্লে—"সিদ্ধার্থ তুমি বুদ্ধ। মানুষকে বাসনার হাত থেকে মুক্ত করতে চাও। কিন্তু বাসনায় আমার আনন্দ, নির্ব্বাণ আমার মৃত্যু। তুমি আমার ইহজন্মে বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়েছ—অভিশাপ দিচ্ছি তোমার ব্রত কখন সফল হবে না। আমি জন্মে জন্মে এসে মানুষের মনে অনন্ত প্রেম, অফুরন্ত বাসনা জাগিয়ে তুলব, মানুষকে মানুষ করে বাঁচিয়ে রাখব।...ইহাই সংক্ষেপে গল্পের সারাংশ। এই অভিশাপের অবতারণা করিয়া লেখক বলিতে চাহিয়াছেন, "প্রাণের মাঝে প্রেমের আগুন জ্বেলে—নিজেকে প্রতারিত করলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জীবনকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে। নিজেকে নিগৃহীত করে মোক্ষলাভ ক'রতে ভগবান বুদ্ধও পারেন নি।" মানব জীবনের সার্থকতা সংসারে। আর মুক্তি? "শ্রাবস্তির আম্রকুঞ্জে ভগবান্ তথাগত যে বৃক্ষটির তলে বসে সমাধিস্থ হ'তেন, অসংখ্য মঞ্জরী দিয়ে প্রকৃতি সেটিকে কতবারই না সাজিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সকল মঞ্জরীকেই তিনি পরিপক্ক ফলে পরিণত করেন নি। প্রকৃতির মত মুক্তিও যথাসময়ে আপনার মানুষটিকে বেছে নিয়ে থাকেন। জোর করে তুমি তাকে দখল করতে পারবে না।"—গল্পটি মোটের উপর আমাদের মন্দ লাগে নাই—যদিও এই ছোট্ট আখ্যায়িকাটিকে কেনাইয়া লেখক অনর্থক খানিকটা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। লেখার ভঙ্গিমাটি ভাল।

দাঙ্গার জের—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার পাল রচিত। আখ্যায়িকার সারাংশ অত্যন্ত মামুলি। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গার সময় ধনীর কন্যা বীণাকে মুসলমান গুণ্ডার হাতে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া হিরণ তাহাকে উদ্ধার করে। প্রথম দর্শনেই হিরণের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বীণা সেই অপরিচিত যুবককে ভালবাসে। হিরণ কিন্তু বীণাকে বাড়ী পৌছিয়া দিয়া আত্মগোপন করে—অনেক চেষ্টাতেও তাহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। কিছুদিন পরে হঠাৎ পুরীর সমুদ্রতীরে

ঘটনাচক্রে তাহাদের মিলন ও বিবাহ।—প্লটের বিশেষত্ব কিছুই নাই। ছোট গল্প লিখিবার কৌশল এখনও লেখক আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—তবে স্থানে স্থানে লেখার ধারাটি মন্দ নয়।

হারামণি—ছোট গল্প। শ্রীযুক্ত বিমলাংশুপ্রকাশ রায়। গল্পের মূলাংশের সহিত নামের কোন সার্থকতা দেখিলাম না। স্বামী স্ত্রীর খুঁটি-নাটি মান-অভিমানের কাহিনী। গল্পের প্লটের কোন বিশেষত্ব নাই—বর্ণনা-ভঙ্গীরও কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না। স্বামীর উৎসাহে স্ত্রী যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে নামিলেন—প্রকাশকের অনুরোধে স্ত্রী তাঁর "তপোভঙ্গ" শেষ করিতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ব্যস্ত—যদিও স্ত্রীর দিক্ হইতে স্বামীর প্রতি অবহেলার সাড়াটি পর্য্যন্ত নাই। সে ক্ষেত্রে স্বামীর অভিমান হয়ত স্বাভাবিক—কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষিত স্বামী "কুম্ভের মত মুখখানা করে জবাব দিল—"তোমার গঙ্গেশ দেখলেই হবে—আমায় আর কেন?" এটা যেন অভিমানের মাত্রাকে ছাড়াইয়া বড় বেশীদূর গিয়া পড়িয়াছে। লেখকের কথায় 'নিষ্ঠুরতা'কেও ছাপাইয়া গিয়াছে। নিষ্ঠুর পরিহাসেরও একটা সীমা আছে।

মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন।

একটা রাত—ছোট গল্প। শ্রীমতী শৈলজা সেন গুপ্তা। খেয়ালী ও কবিতাবাপন্ন স্বামীর নির্ম্মম কাহিনী। মরণাপন্ন পুত্রের চিকিৎসা ও স্ত্রীর বুকফাটা করুণ অনুনয় এক দিকে, অন্য দিকে নিজের থিয়েটারের খেয়াল ও বন্ধু-বান্ধবের অনুনয়। 'কাল ভাল ডাক্তার দেখাইব' বলিয়া স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়া স্বামী থিয়েটারে রাত্রিযাপন করিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন মৃতপুত্র ক্রোড়ে স্ত্রী আর্ত্তনাদ করিতেছে। পুত্রহারার করুণ আর্ত্তনাদ পাষাণ গলাইয়া দেয়, পাঠক পাঠিকা ত মানুষ!—এই করুণাংশটুকু বাদ দিলে আর গল্পটির কিছুই বিশেষত্ব থাকে না।

বিচিত্রা—চৈত্র।

রঙ্গনা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রচিত গল্প—ঠিক ছোট গল্প বলা চলে না। গল্পটি আমাদের বেশ লাগিয়াছে—বিচিত্রার এ মাসের গল্পের মধ্যে রঙ্গনাই ভাল হইয়াছে। বেশ ঝর্‌ঝরে ভাষা—লেখার মধ্যে প্রাণ আছে।

"রঙ্গনা নর্ত্তকী—মগধের রাজা মহানন্দের প্রধানা নর্ত্তকী। রঙ্গনা পরিপূর্ণযৌবনা, রঙ্গনা উর্ব্বশীর মতই রূপসী ও শিল্পী। যৌবন যৌবনকেই চায়। হঠাৎ একদিন নৃত্যরতা রঙ্গনার অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে আর দুটি চক্ষুর নিবিড় গভীর যেন মর্ম্মনিষ্পেষিত একটি দৃষ্টি তার আঁখির তারা দুটিকে আকর্ষণ করে নিল। সেই দিন—সেই দৃষ্টির তলে নর্ত্তকী রঙ্গনার মৃত্যু হ'ল।...রঙ্গনার মধ্যে নটরাজের বাণীর যে স্পর্শ ছিল, সে স্পর্শকে অন্য দেবতা সেই দিন হরণ করলে। শিল্পী রঙ্গনার প্রাণ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিশে গেল শ্রেষ্ঠীপুত্র রূপবান্ যুবক সুমন্তের প্রাণের মাঝে। রঙ্গনার মনে হ'ল অর্থ, মান, যশ, লিপ্সা, আকাঙ্ক্ষা যা কিছু জীবনের অভিপ্রেত সকলই কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ এর কাছে—যার চিত্তলোকের স্পর্শ তার নিষ্ফল জীবনকে একটা বিপুল অনির্ব্বচনীয়তায় পূর্ণ করেছে।...এম্‌নি যখন সুমন্তের প্রেমে রঙ্গনা একেবারে মগ্ন, একদিন রঙ্গনা শুনলে যে সে-ই সুমন্তের জীবনের প্রথম প্রণয়িনী নয়,—তার প্রথম প্রণয়িনী নটীকুলেশ্বরী বসন্তশ্রী। রঙ্গনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল,—'পুলক হিল্লোলে পুলকিত জীবন-প্রতিমা রঙ্গনার দুই চোখে ঈর্ষার বহ্নি ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌ল।' কঠোর কণ্ঠে সুমন্তকে আদেশ করলে,—'এই শেষ—আর এখানে এসো না—এসো,—যদি বসন্তশ্রীর সেই বিখ্যাত ময়ূরকণ্ঠী মণিহার নিয়ে আস্‌তে পার।—যে মণিহারের জুড়ি মগধেশ্বরের রত্নাগারে নাই—যে মণিহার বসন্তশ্রীর শেষ জীবনের সম্বল—যে মণিহার এক মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতিতে মহারাজের রাজমুকুট হতে বসন্ত-শ্রীর কণ্ঠে এসে পড়েছিল—রঙ্গনা জান্‌ত সে মণিহার কেউ কাউকে দেয় না। বহুদিন পরে সুমন্ত বসন্ত-শ্রীর দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে। সুমন্তকে দেখে আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বসন্তশ্রী বলে উঠ্‌ল—'জানি তুমি আস্‌বে—একদিন ফিরে আস্‌বেই।' সুমন্ত ধীরে ধীরে রঙ্গনার কথা, আপনার প্রণয়কাহিনী ব্যক্ত করে বসন্তশ্রীর কাছে মণিহার ভিক্ষা চাইলে।......সুমন্ত যখন মণিহার হাতে নিয়ে রঙ্গনার কাছে ফিরে এল—সে তখন ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগল—আপনার এক রঙ্গনীর আশাহীন অশ্রুহীন নিষ্ঠুর মৃত্যুকাহিনী,—তারপর সে মৃত্যু কি ক'রে উষার আলোকে বসন্তশ্রীর দানের স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন রঙ্গনার চোখে এক অপূর্ব্ব আলোকরেখা ফুটে উঠ্‌ল'।...পরদিন প্রভাতে সুমন্ত রঙ্গনাকে খুঁজে পেলে না—পরিবর্ত্তে উপাধানের পাশে দেখলে—একখানি লিপি তারই নামে ও বসন্তশ্রীর সেই মণিহার। রঙ্গনা লিখেছে—'বসন্তশ্রীর কাছে ফিরে যাও।...... যে সম্পদে বসন্ত-শ্রী ঐশ্বর্য্যময়ী, সেই সম্পদের সন্ধান যদি কোন দিন পাই, তবেই দেখা হবে, নইলে এই শেষ। বিদায়!"

আমার দেশ—শ্রীযুক্ত বিমল সেন। ছোট গল্প। লেখক গল্পের মধ্য দিয়া unemployment problem solve করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দেশের যুবকের সম্মুখে আদর্শ খাড়া করিয়া দিয়াছেন আনন্দকে। এম, এ পাশ আনন্দ রাস্তায় রাস্তায় পেনি ফ্রক ফেরি করে ও রিকস্ টানে। এত জিনিষ থাকিতে লেখকের 'রিকস' টানার প্রতি ঝোঁক কেন বুঝিলাম না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সে স্বাস্থ্য ক'জনের আছে লেখক মহাশয় তার খবর রাখেন কি? মোট কথা ছোট গল্পের মধ্যে ঐ রকম একটা বিরাট সমস্যার অবতারণা করা শুধুই বিড়ম্বনা। আনন্দের ডায়রির বিবাহ পর্ব্বটুকু মন্দ নয়।

বাগানে—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহাকে গল্প যে কেন বলা হইয়াছে তাহা বুঝিলাম না। গল্পও নয়, কবিতাও নয়—গদ্যকাব্য বরং বলা চলে। এক একখানা ছবি দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে ভাবের অপেক্ষা রংএর বাহারটাই বেশী। এতেও

ঠিক তাই বাছাই করা মেয়েলি কথার ছড়াছড়ি। যথা—'জড়াজড়ি' 'হিলিমিলি,' 'ঝিলিমিলি', 'গলাগলি,' 'লুটোপুটি' 'ফুলে লেফু ফুলন্ত' "ঘুমে-ঘুমে ঘুমন্ত"—আরও কত। কথাগুলা ত মন্দ নয়!

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

অভিশাপ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ। একটা উদ্দেশ্য লইয়া গল্পটি লেখা হইয়াছে। কাব্যবিনোদ মহাশয় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে একটু বক্তৃতা দিবার মানসেই গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন। ফলে উদ্দেশ্যমূলক ছোট গল্প লিখিতে গেলে যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। নীতির দিক্ দিয়া গল্পটির মূল্য হয়ত কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু গল্প হিসাবে কাব্যবিনোদ মহাশয়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। তবে লেখার ধারাটি মন্দ নয়।

দর্শন

মাসিক বসুমতী—ফাল্গুন

[illegible]—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। মানবের স্বীয় কর্ম্মানু সারে জন্মান্তর নিয়ন্ত্রিত হয়—ইহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। আমরা দেখিতে পাই—কেহ এজন্মে রাজা, কে বা ভিখারী, কেহবা সুখী, এবং কেহ বা বিকলাঙ্গ ; এ সকলের জন্য কে দায়ী? যদি বলা যায়, ঈশ্বর—তবে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী ও খামখেয়ালী বলিতে হয়। কিন্তু কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে এই সমস্যার সহজেই সমাধান হয় ; মানব পূর্ব্বজন্মে কৃত পাপ পুণ্য অনুসারে এ জন্মে কেহ বা ধনী কেহবা নির্ধন হইতেছে। ইহাই লেখক বুঝাইয়াছেন।

এই সকল পুরাতন প্রচলিত কথা ভিন্ন লেখক মহাশয় আর কিছু নূতন কথা অথবা সমস্যা উত্তোলন করেন নাই ; দার্শনিক প্রবন্ধ হিসাবে এই প্রবন্ধের বিশেষ কোনও মূল্য নাই—কারণ বিষয়টী সেরূপভাবে লিখিত হয় নাই। জন্মান্তর বাদ ও কর্ম্ম মানিলে মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তি থাকে কি না, নূতন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকে কি না, এ সকল আলোচনা করা হয় নাই।

বিজ্ঞান

প্রকৃতি—শীত সংখ্যা।

'পরী গোলাপের কথা' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মিহিজামস্থ স্বীয় বাগানে পরীক্ষিত কতিপয় পরী গোলাপের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় ৪০ রকমের পরী গোলাপ অধ্যাপক মহাশয়ের বাগানে পরীক্ষিত হইয়াছে।

'উদ্ভিদগণ কি প্রকারে, পর্য্যায়ক্রমে একে অন্যের অনুগমনশীল হইয়া থাকে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ জলবায়ু ও মৃত্তিকা অনুযায়ী পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে বর্দ্ধিত হয়, বা একে অন্যের ক্ষমতায় পরাজিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং পরিশেষে সবল উদ্ভিদ শ্রেণী (urival of the fittest) উত্থিত হইয়া থাকে তাহা ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমার মিত্র কর্ত্তৃক উদ্ভিদের ক্রম পর্য্যায় নামক প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় ভাষার দোষে পরিস্ফুট হয় নাই। লেখক মহাশয় উদ্ভিদের muscle শব্দের পরিবর্ত্তে 'মাংসপেশী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কি বলিতে চান যে muscle এবং tissue একই জিনিস? কারণ আমরা জানি যে মাংসপেশী muscle লেখক মহাশয়ের মতে দেখা যাইতেছে যে উদ্ভিদের মাংস আছে। সমালোচনা অনাবশ্যক।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র' নামক প্রবন্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পাঠ করা উচিত। আচার্য্য রায় কি ভাবে জীবনে দৈনন্দিন কার্য্য ব্যতীত নীরবে জাতির ও দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহা আমাদের জানা বিশেষভাবে উচিত। প্রবন্ধের শেষভাগে অধ্যাপক রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে স্থানলাভ করিতে হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। এই স্থলে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ আমরা মনে করি যে, যদি আমাদের জ্ঞান-বৃদ্ধি না হয়, তবে জগতের জাতি-সঙ্ঘে আমাদের আমাদের কোনও স্থান হইবে না। তবে একথা ঠিক যে ধন না থাকিলে জ্ঞানার্জ্জন সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং বাস্তবিক কাম্য বস্তু জ্ঞান, ধন উপায় মাত্র ; তদতিরিক্ত কিছুই নহে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের 'নকুল ও সর্প' সুপাঠ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধের শেষে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, 'দুরদৃষ্ট বশতঃই হউক, বা নকুল যে সর্পাঘাতের ঔষধ জানে ও ব্যবহার করে এবং তাহা মনুষ্যও যে কখনও কখনও পাইয়াছে, উহা মিথ্যাই হউক—আমি কিছুই পাই নাই বরং……ইহা কখনও কখনও মনে হয় যে, ঐরূপে সর্পাঘাতের ঔষধ প্রাপ্তি বাক্যটী কল্পি মাত্র। Fauna of British Indiaতে নকুল (Herpestes) সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের 'প্রবাল' নামক প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণদাস বর্ম্মণ মহাশয়ের 'মৃত্তিকা' নামক প্রবন্ধে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ক্ষেত্রের উৎপাদন, সার ও উৎকর্ষ-সাধন বিষয়ে আলোচনা করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিলে কৃষকের লাভ ব্যতীত আরও উপকার আছে। জমিতে অনেক সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু বাস করে। যে সব জমি স্যাতস্তেতে, আলোক-বাতাস-রৌদ্র পায় না, সেই সব স্থানে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতির জীবাণুবৃদ্ধি হয়। সুতরাং উক্ত জমিতে মানবের শত্রু এই জীবাণুগুলি ধ্বংস পায়। প্রবন্ধের ভাষা দোষশূন্য নহে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আয়ুর্ব্বেদীয় পরিভাষা' এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল' ও 'বৈদিক ব্যাপার' ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রবাসী—চৈত্র।

'পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ'—লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়। দুঃখের বিষয় যে প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

চিত্র

জলতোলা, কাঠ কাটা, বাসন মাজা হইতে আরম্ভ করিয়া গান শোনা, ছবি দেখা, বই পড়া, এমন কি রসগোল্লা খাওয়া পর্য্যন্ত—যে কোন কাযই হউক না কেন, উহা যে অল্পবিস্তর আয়াসসাধ্য তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমাদের নবকুমার খুড়ো বলিতেন, "বাপুহে, নিতে হলে কিঞ্চিৎ দিতে হবেই।" আমরা যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিতাম, "আচ্ছা বল দেখি, খুড়ো, তোমাকে গঙ্গাযাত্রা করবার সময় তুমি যখন আমাদের কাঁধে বইয়ে খাটিয়ে নেবে, তখন তুমি কি দিয়ে যাবে?" খুড়ো বলিতেন, "তোদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, ফাটা মলচে, ফুটো হুকো আর পুঁথি কখানা বাদে, একটা জবর মুখভ্যাংচানি আর কাঁধের ব্যাথাটাও নিদেন দিয়ে যাব।" খুড়োর ও পুরাতন কথাটার মধ্যে একটা চিরনবীন সত্য আছে। তবে সত্য পদার্থটা এতই হালকা যে তার অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া থাকি। ধরুন না কেন, ছবি দেখার বিষয়টা। ওটা একটা কায বটে এবং কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য। ওটা হইতে কিছু লইতে হইলে কিছু দিতে হইবে। অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, অঞ্জলিবদ্ধ না হয়ে কাব্য-রস পান করা যায় না। কথাটা সত্য, কারণ অঞ্জলিবদ্ধ হওয়াটা অনেকেরই পক্ষে কষ্টকর। আমরা দেখিয়াছি কাব্যরস দূরের কথা দারুণ কষ্ট না করিলে কুইনিনও খাওয়া চলে না। এমন কি নিভৃতে নিশীথে মালিকের অজ্ঞাতসারে খেজুর রস পান করিতে হইলেও অন্ততঃ হাঁড়িটা ছেঁদা করিবার পরিশ্রম, অথবা কণ্টকদীর্ণ হইবার কষ্টটা, স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ আমার বক্তৃতার অর্থ এই যে, যাহা হইতে রসগ্রহণ করিতে চাই না কেন, নিজেকে তাহাতে নিয়োগ না করিলে ফললাভ অসম্ভব। এবং যে পরিমাণে আমরা নিজেকে সেই বিষয়টার মধ্যে নিয়োগ করিতে পারিব, তৃপ্তিলাভও সেই পরিমাণেই হইবে। কেতাব পড়া, ছবি দেখা প্রভৃতি কাযে যতটা তাহার মধ্যে দিতে পারি, জ্ঞানলাভ এবং উপলব্ধি ততটা সার্থক। একজন "ক" দেখিয়া কৃষ্ণস্মরণে ভাবে বিভোর হইতে পারেন, আমার পক্ষে অক্ষরটা কালীপণ্ডিতের কটা চোখের কঠোরতা নির্দ্দেশক। ভক্তের সঙ্গে আমার প্রভেদ এই যে ভক্ত "ক"এর মধ্যে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছেন, আর আমি করি নাই।

শুনিয়াছি সম্প্রতি চিত্রদর্শনে রসলাভ সম্পর্কে সাময়িক পত্রে কিঞ্চিৎ মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। মতামতের প্রতিপাদ্য অথবা যুক্তিতর্ক কিছুই অবগত নই। সুতরাং আমার মতের পরিবর্ত্তন অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, রং জিনিসটা আসল নয়, একটা বস্তু আলোকের বহু অংশ হজম করিয়া যে অংশটা বিলাইয়া দেয়, উহাতে আমরা সেই অংশের অর্থাৎ সেই রংএর অস্তিত্ব আরোপ করি। তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল, এ তর্কের সমাধান আমি কেন, বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরাও করিতে পারেন নাই। আমরা এই মাত্র জানি, একটা আধার এবং একটা আধেয় আছে। অন্ততঃ আমাদের মনে তাদের একটা উপলব্ধি আছে। ছবি জিনিসটা এবং আমাদের মন—এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটা আধার এবং আধেয়। কে আগে কে পরে তার বিচার অসম্ভব। সুতরাং এতদুভয়ের সমান পরিণতি অথবা স্ফুরণ আবশ্যক। আমরা, সাময়িকপত্ররসিকেরা যে পরিণত, সে কথাটা ধরিয়া না লইলে ছবির আলোচনা চলে না। অন্ততঃ এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ছবি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিবার আবশ্যকতা দেখা যায়।

মাসীক বসুমতী—ফাল্গুন।

একখানি তিনবর্ণের ছবি, শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে। বিষয় এই:—

"কে তুমি পড়িছ (তারা) আমার কবিতাখানি
কৌতুহল ভরে
আজি হ'তে শতবর্ষ পরে।"—রবীন্দ্রনাথ।

আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নেও চিত্রগতা মহিলার ন্যায় পাঠিকার কল্পনা করিয়া উক্ত ছত্রগুলি লেখেন নাই। "আজি হতে" (অর্থাৎ প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে) "শতবর্ষ পরে" (অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৮৩) উক্ত পাঠিকা যে ঘণ্টায় দেড় পাই হিসাবে খরচান্তে refrigorated ঘরে বসিয়া কবিতার কেতাব পড়িতেন না, তাহা কে বলিল? উক্ত ঘরের প্রাচীরে আইয়োনিয়ান (Ionian) থামের, এবং "কুইন এ্যান" নমুনার নক্সা আঁকা না থাকিয়া এলোরার, অন্ততঃ সারনাথের, নক্সা থাকিবে না শিল্পী তাহা কেমন করিয়া বুঝিলেন? বৈদ্যুতিক ঘূর্ণ্যমান টেবিলের উপর কেতাব না রাখিয়া মহিলাটি লাল গদীর উপর রাখিলেন কেন? তাঁহার আঁচলে এয়ারোপ্লেনের গারাজের চাবিটা দেখিতেছি না। হাতে, কণ্ঠে, কাণে সোণার ও জড়োয়ার গহনা দেখিতেছি, ভালে ও সীমন্তে সিন্দুরশোভা; যুবতী সৌভাগ্যবতী হইলেও (১৮৮৩ সালের) সেকেলে অন্তঃপুরচারিণী, ১৯৮৩ সালের "আধুনিকা" নহেন। অর্থাৎ সাদা কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভবিষ্যৎ কল্পনার সহিত বিলাতী পটের অনুকারী এই ছবির কিছুমাত্র

সামঞ্জস্য নাই। আর্ট সৃষ্টির গোড়া কল্পনায়, উহার পরিণতি নৈপুণ্যে। সে হিসাবেও ইহা শ্রেণী-বহির্ভূত।

"চুয়াচন্দন পিচকারী। শ্যাম নাগর অঙ্গে দেওত ডারি"—ইতি জ্ঞানদাস। "পূজারী"। এই দুইখানি তিনবর্ণের ছবির শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক। ভৌমিক মহাশয়কে বাস্তবের সহিত পরিচিত হইতে অনুরোধ করি। মক্স বহুদিন ধরিয়া করিতে হইবে। কষ্ট না করিলে কেষ্ট মেলে না। এক গড়িতে আর হইয়াছে।

প্রবাসী—চৈত্র।

রামচন্দ্র ও গুহক (তিনবর্ণের)—শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। কল্পনা আছে, নৈপুণ্য (technique) নাই। জলের রংয়ের একটা মোলায়েম স্বচ্ছতা রাখা দরকার। তুলি ঘষিলে তাহা থাকে না, বুলাইতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের ছবি দ্রষ্টব্য।

'হরিণ'—জাপানী চিত্রকর গংফু অঙ্কিত (একবর্ণের)। কল্পনায়, ভাবে, নৈপুণ্যে সুন্দর।

'অন্তঃপুরিকা' (তিনবর্ণের)—শিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। এখনও বহুদূরে এবং বিলম্ব আছে।

ভারতবর্ষ—চৈত্র।

'ধূর্জ্জটী' (তিনবর্ণের)—শিল্পী শ্রীযুক্ত গুরুরাম সনাইয়া। কল্পনায়, নৈপুণ্যে রেখাবর্ণে ছবিখানি সুন্দর। আমি শিল্পীকে প্রশংসা করি।

'নিমন্ত্রণ' (ত্রিবর্ণের)—শিল্পী শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র রায়। বহু অভাব। মডেল ড্রয়িং করিতে হইবে।

'ঠাকুরদাদা' (তিনবর্ণের)—শিল্পী শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অচল।

বিচিত্রা—চৈত্র।

'বিজয়িনী' (তিনবর্ণের)—বিদেশী-চিত্র। "বাস্তব"-পন্থীদের অনুধাবনযোগ্য।

"'নিরালয়' (ত্রিবর্ণ)—শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখপত্র।" কথাগুলি সূচীতে পড়িলাম, কেতাবে ছবি দেখিলাম না। হয়ত দপ্তরীর ভুল।

"'চিন্তা (একবর্ণ)—ই, এন, ওয়েনফুস্।" ইহাও সূচীতে আছে, কেতাবে নাই।

বৈদেশিকী

সঙ্কলন
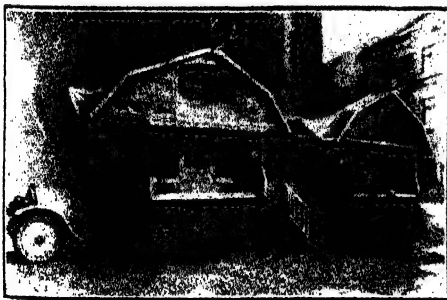
১। একত্রে সচল বাসগৃহ ও দোকান ঘর:—

মহাযুদ্ধের সময় বহু ভদ্র-পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে অষ্ট্রীয়া দেশীয় একজন ভদ্রলোক এই সচল দোকান-ঘর উদ্ভাবন করিয়া হৃতভাগ্যদের উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

২। পিচ্ছিল পথে মোটর চালাইবার সুবিধা:—

মোটরের সম্মুখের চাকার নিম্নে বালুকা ছড়াইয়া দিলে পিচ্ছিল পথে মোটর চালান নিরাপদ হয়, তজ্জন্যই এই নূতন যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

৩। ধূলিচটকের ন্যায় আফ্রিকা দেশীয় একজাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষী :—

ডাঃ মরিসন্ বলেন যে এই পক্ষী কেবল গান করিয়া দিন কাটায় না, তাহাদের নিজ ভাষায় কথোপকথন করে। সে ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইলেও কথাগুলির বিভিন্নতা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ডাঃ মরিসন এইরূপ ৩০০ কথা শুনিয়াছেন।
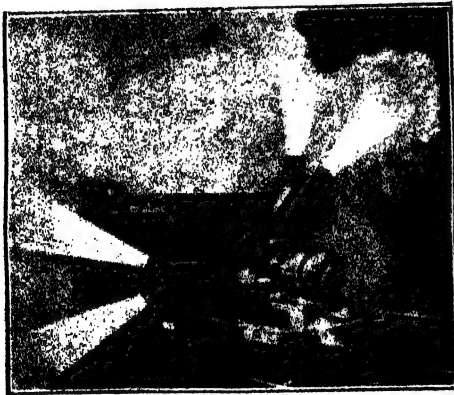
৪। সুড়ঙ্গ ও খনির মধ্যে বিপজ্জনক বাষ্পস্ফোটন নিবারণ জন্যে এইরূপে খনিজধূলি প্রক্ষেপ করা হইতেছে।

৫। নূতন ধরণের বিজ্ঞাপন :—

মোটরের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী যন্ত্র সংলগ্ন থাকে, যদ্দারা গতিশীল গাড়ির সহিত অক্ষরগুলির পরিবর্ত্তন হয় এবং বিজ্ঞাপন রূপে দেখা দেয়।

৫। কর্ফু দেশীয় গোয়ালা দ্বারে দ্বারে ছাগীদুগ্ধ বিক্রয় করে।
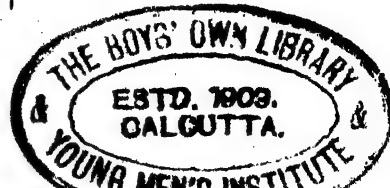
৭। মরীচিকাময় প্রাসাদ—

প্যারিসের গ্রেভিটো যাদুঘরের এই কক্ষে কতকগুলি দর্পণ এমনভাবে সজ্জিত যে, তাহাতে মনে হয় যেন পর পর একইরূপ অনেকগুলি কক্ষ বর্ত্তমান। কক্ষের মধ্যস্থলে স্থিত একটি চক্রাকার চলন্ত দর্পণে দৃশ্যের অবস্থান্তরও ঘটে।
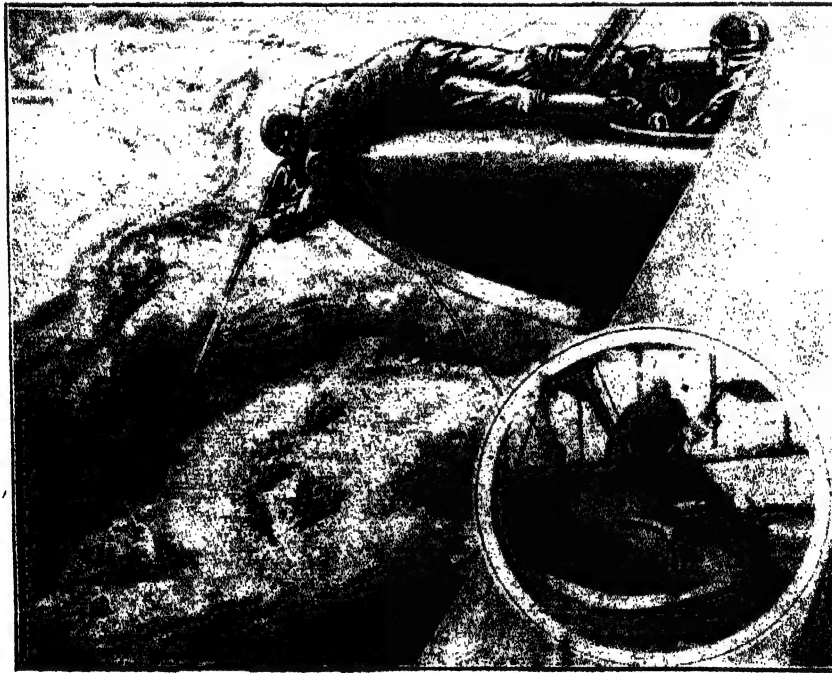
৮। সান্টা কাটালিনায় নূতন 'কৌতুকের ব্যবস্থা :—ইহাতে আকাশযান হইতে বন্যছাগ শিকার করা হয়।

৯। পৃথিবীর মধ্যে শতকরা ৯০টি বায়ুবন্দুক মিচিগানের নির্ম্মিত হয়। একজন কারিগর বন্দুক পরীক্ষা করিতেছে। লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত এই কারিগর ৩৩ বৎসর যাবৎ প্রত্যহ উদয়াস্ত এইরূপে বন্দুক পরীক্ষা করিয়া আসিতেছে।

১০। মিচিগানের অন্তর্গত সৈকত শৈলে ক্রীড়া কৌতুক—এক মাইল উচ্চ হইতে নিম্নে পতনেও অঙ্গে আঘাত লাগে না।
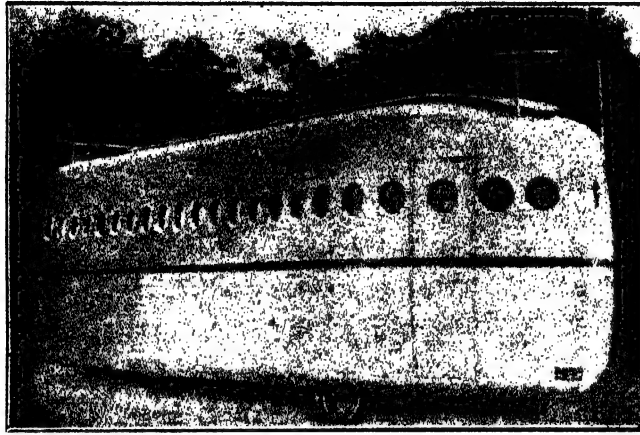
১১। চলন্ত দুর্গ—সীমান্ত প্রদেশের পরীক্ষণ কার্য্যে বহু বিপদের সম্ভাবনা, সে জন্য এই বর্ম্মাচ্ছাদিত যানই নিরাপদ।

১২। মিচিগানের অন্তর্গত করাত কলগুলিতে আহারের সময় ঘোষণা করিবার জন্য এই শিঙা ব্যবহৃত হয়।

১৩। এক প্রান্তে গদিমোড়া লাঠি লইয়া জলক্রীড়া—দুই দলের দুইটি লোক পরস্পরকে জলে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।
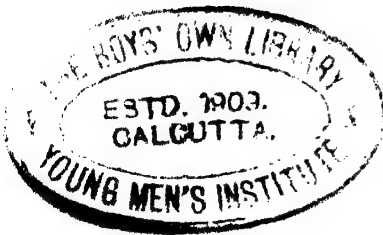
১৪। এক ব্যক্তি জলে পড়িয়া যাইতেছে। ইহাতেই খেলার শেষ হইল এবং ইহার দলের পরাজয় হইল।

১৫। মেসনস্থিত পশুশালায় সান্ধ্য আহারের সময় মৃগশাবকদিগের ভীড় লাগিয়াছে।

সাহিত্য

চীনের-পুরাণ—জগন্মাতা প্রসঙ্গ

তিব্বতে কুনলুনপর্ব্বতস্থিত "নন্দনকাননে" দেবভোগ্য পিচ ফল জন্মিয়া থাকে এবং প্রায় ৩০০০ বৎসরে পরিপক্ক হয়। উক্ত উদ্যান পরমরূপলাবণ্যময়ী অমরলোকপূজ্যা "জগন্মাতা" সি ওয়াংমুর লীলাভূমি। জাপানদেশে তিনি সীবো নামে অভিহিত এবং "মুক্তা পর্ব্বতে" তাঁহার "পূত প্রাসাদের" প্রবেশদ্বার স্বর্ণনির্ম্মিত। তাঁহার রূপবর্ণনায় কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার রূপ ও গঠন উল্লেখযোগ্য নহে, বরং তাঁহার আলুলায়িত কেশ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় নখ ও লাঙ্গুল দর্শনে তাঁহাকে রাক্ষসী বলিয়াই ভ্রম হয়। তাঁহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ। তিনিই রোগাদির উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ। তিনটী নীলবর্ণ পক্ষী তাঁহার জন্য নিত্য আহার সংগ্রহ করে। উক্ত উদ্যান হইতে পিচ ফল সংগ্রহ করিতে পারিলেই চীন সম্রাট্‌গণ নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন।

এক সময়ে চীনদেশে টুংফ্যাংসো নামক একজন বিখ্যাত যাদুকর বাস করিতেন। জাপানি গ্রন্থাদিতে তিনি সদানন্দচিত্ত ও নিত্যপ্রিয় বৃদ্ধ টোবাসাকু নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন এই ধ্যানশীল বৃদ্ধ দীর্ঘজীবন-নিদর্শনাত্মক মৃগবাহনে ইতস্তত ভ্রমণ করেন এবং ইহাও শুনা যায় যে,

তিনিই "জগন্মাতার" দুলাল ও পুরাণোল্লিখিত টাস্মুজের অধীশ্বর।

এক সময়ে তিনি হানবংশাবতংশ সম্রাট্ উটির সভাসদ্ ছিলেন। সম্রাট উটি অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া ৮৭ খৃষ্টপূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি আয়ুবৃদ্ধিকর বহু উপায় অবলম্বনে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে ১০০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার চূড়ায় এক দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। সেই মূর্ত্তির হস্তস্থিত স্বর্ণপাত্রে তারকাবিগলিত 'শশিরকণা' গুলি সঞ্চিত হইত। পুনর্যৌবন প্রাপ্তির আশায় সম্রাট উহা নিত্য পান করিতেন।

একদিন সম্রাট প্রাসাদে অঘটন সূচক একটী নীলবর্ণ পক্ষীর আবির্ভাব হইল। সম্রাট চিন্তিত হইয়া টুংফ্যাং সোকে ইহার রহস্যভেদ করিতে বলেন। সে বলিল যে, ইহাতে অমর লোকের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর শুভাগমন বুঝাইতেছে। অল্পদিন পরেই "জগন্মাতা" সি ওয়াংমু স্বর্ণবাস পরিধান করিয়া শ্বেত ড্রেগন বাহনে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার সহিত এক বামন অনুচর একটী পাত্রে সাতটী অমর পিচ ফল বহন করিয়া আনিল। যখন তিনি সম্রাটের প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন তখন পাত্রে মাত্র ৪টী ফল ছিল। তাহা হইতে তিনি একটী লইয়া খাইতে লাগিলেন। গবাক্ষপথে টুংফ্যাংসো তাহা দেখিতেছিল। দেবী তাহার সহাস্য বদন লক্ষ্য করিয়া সম্রাটকে বলিলেন যে যাদুকর তাঁহার তিনটী ফল চুরি করিয়াছে। হাস্যমুখে দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সম্রাট অমর হইলেন।

সবুজমণি পর্ব্বতের শিখরদেশে জগন্মাতা তাঁহার ভগিনীর সহিত বাস করিতেন এবং তাও সম্প্রদায়ভুক্ত নিত্যমুক্ত আত্মাদিগকে লইয়া মেঘবক্ষে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেন। তাঁহার অসংখ্য বাহনদিগের মধ্যে সারস পক্ষী, শ্বেত ব্যাঘ্র, মৃগ এবং কূর্ম্ম ইহারাই অমরত্বের নিদর্শনস্বরূপ।

টুং ফ্যাংসো একবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার ভ্রাতা তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। টুং ফ্যাংসো বলেন যে সমুদ্রের ধূম্রল জলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি অপর সমুদ্রে তাহা ধৌত করিতে গিয়াছিলেন,—কিন্তু তিনি অপ্সরী রাজ্যে গমন করায় একটী বৎসর যে এত শীঘ্র অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

চীনের উপপুরাণে দারুচিনি বৃক্ষেরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা আধুনিক ধারণা বলিয়াই মনে হয়।

ঋষি চ্যাংকিয়েন।

টুং ফ্যাংসোর ন্যায় চ্যাংকিয়েনও সম্রাট উটির একজন প্রধান সভাসদ ছিলেন। তিনি চীনের পুরাণ-বর্ণিত পুষ্প-নদীর তীর অবলম্বনপূর্ব্বক বহুদূর অগ্রসর হইয়া একস্থানে একটী দারুচিনির বৃক্ষ দেখিতে পান। সেই বৃক্ষতলে জগন্মাতার অমর বাহনগুলি নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতেছিল। তথায় তিনি চন্দ্রলোকবাসী শস্যাধিপ শশকের দর্শন পান। তিনি লিখিয়াছেন যে, শশকের সহিত একটী ভেকও চন্দ্রলোকে বাস করে। পূর্ব্বে ভেকটী এক প্রসিদ্ধ ধনুর্দ্ধরের স্ত্রী ছিল। এক সময়ে ধনুর্দ্ধর ঘনকৃষ্ণ মেঘের কবল হইতে চন্দ্রকে উদ্ধার করে এবং এই সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ জগন্মাতা তাহাকে অমরত্ব দান জন্য একটী মণিপাত্র পূর্ণ করিয়া স্বর্গীয় শিশির প্রদান করেন। ধনুর্দ্ধরের স্ত্রী উহা গোপনে পান করে, তজ্জন্য জগন্মাতা তাহাকে ভেকে রূপান্তরিত করিয়া সেই অবধি চন্দ্রলোকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

ঋষি চ্যাংকিয়েন পীতনদীর তীরে চন্দ্রলোকবাসী সেই চিরপরিচিত বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বৃদ্ধ অদৃশ্য রেশমি সূত্রদ্বারা প্রেমিকযুগলের পদবন্ধন করে। বৃদ্ধ দারুচিনি বৃক্ষের শাখা ছেদনে নিযুক্ত, কিন্তু সেই ছিন্ন মুখে এত শীঘ্র নূতন শাখা উদ্গত হয় যে বৃদ্ধের পরিশ্রমের বিরাম থাকে না। ঋষি চ্যাংকিয়েন ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ছায়াপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তারার বসন-শোভিত চরকা-কুমারীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। চরকা-কুমারীর এক প্রণয়ী আছে, তাহার নাম সেব, কিন্তু উল্কার ন্যায় সারা সৌরজগৎ ঘুরিয়া বৎসরে একবার মাত্র তাহারা মিলিত হইতে পায়।

চীনের পুরাণে নক্ষত্রগুলির বিভিন্ন নামকরণ আছে,—কোনটী "স্বর্গদ্বার", কোনটী বা "স্বর্গমণ্ডপ"। তাও ঋষিগণ

দেহমুক্ত হইয়া নক্ষত্রগুলিতে বাস করেন এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নসম্প্রদায়ভুক্ত মহাত্মগণ জগন্মাতার উদ্যানে স্থান পাইয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন ঋষি চ্যাংকিয়েন মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। একদিন এক দেবদূত চ্যাংকিয়েনের নৌকার দাঁড়টী সম্রাটের প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে রাখিয়া যায়।

একটী অদ্ভুত গল্প শুনা যায় যে, এক ধীবর পীত নদীতে মৎস্য ধরিতেছিল। হঠাৎ ভীষণ ঝড়ে তাহার নৌকা উল্টাইয়া যায় এবং সে কোনরূপে ভাসিয়া পিচ বৃক্ষ-শোভিত তীরে উপনীত হয়। সেই উপকূলবাসীরা তাহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বলে যে তাহারা সম্রাটের অত্যাচার-প্রপীড়িত হইয়া চীন পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিয়া ধীবর প্রশ্ন করিয়া অবগত হইল, উহারা যে সম্রাটের কথা বলিতেছে, তিনি তাহার জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ধীবর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "এই স্থানটীর নাম কি?"

কেহই সে প্রশ্নের উত্তর দিল না, কেবলমাত্র বলিল "যেমন তুমি আসিয়াছ সেইরূপে আমরাও আসিয়াছি।"

দেশে ফিরিয়া ধীবর প্রধান পুরোহিতের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া করযোড়ে রহস্যভেদ প্রার্থনা করিল। পুরোহিত বলিলেন, "তোর ভাগ্য ভাল, সেটী স্বর্গরাজ্য।"

চীনাদের ভাগ্যে স্বর্গ দর্শন এইরূপ সুলভ হইলেও, কেহ কেহ ড্রেগনের সাহায্যও গ্রহণ করিতেন।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

স্থানান্তরিতা

সেদিন প্রভাতকালে সুধা ঢালে
জননী ধরণী—
নরনারী ঘরে ঘরে কলস্বরে
গাহিল অমনি
তব আগমনী।
বিবাহের বিপুল উৎসব,
কি আলোক, কত লোক,
প্রীতিভরা কত কলরব,
আনন্দের অনন্ত বৈভব চৌদিকে বিরাজে—
তুমি তারি মাঝে
রক্তাম্বর পরিহিতা নব বধূ সাজে
সরম জড়িত পদে, লাজনম্র শিরে—
লক্ষ্মীর উদয় যেন ক্ষীরাব্ধির তীরে—
অতি ধীরে ধীরে
পশেছিলে গৃহে মম গৃহলক্ষ্মী সম,
ধরেছিলে আর্ত্তসেবা ব্রত মহোত্তম,
অতি অনুপম!

তাই দুখী তাপী কত অগণন,
মাতৃহারা কত অভাজন,
তোমার চরণ প্রান্তে মা বলিয়া
লইল শরণ,
মুক্ত দ্বার তোমার ভাণ্ডারে
কাঙাল অতিথি তাই দাঁড়াইত
কাতারে কাতারে
শূন্যহাতে ফিরে যেত না রে!
দাসদাসী, আত্মীয় স্বজন
সবে আপনার করি নিজ হাতে করিতে পালন
মায়েরই মতন।
তাই অনুমানি,
সেদিন প্রভাতে বিশ্ব জেনেছিল ভবিষ্যৎ বাণী
কেমনে কি জানি!
সাদরে সকল প্রাণী, নিকটে কি দূরে,
তোমারে আনিল ডাকি আনন্দের সুরে
মোর অন্তঃপুরে!

মধুর সানাই সনে শুভ শঙ্খধ্বনি
গেয়েছিল ভরিয়া অবনী
তব আগমনী!

আজ তুমি করিলে প্রয়াণ!
করুণ ক্রন্দনে হায়, সবে গায়
বিজয়ার বিদায়ের গান
হয়ে ম্রিয়মাণ।
তোমারি স্বহস্তে গড়া এ ঘর সংসার
অতি গুরুভার
তোমার বিরহে হায়
বেদনায় করে হাহাকার।
তুমি ত চলিলে—
মনে হয় যত সুখ ছিল এ নিখিলে
সাথে করে নিলে!
আলো হাতে এসেছিলে, আলো লয়ে'
করিলে প্রস্থান;
ঘরে ঘরে দীপ যত চিরতরে লভিল নির্ব্বাণ।
গৃহ মোর হইল শ্মশান,
শুধু শোক শুধু অশ্রুজল,
মর্ম্মস্থল আলোড়িয়া নিশ্বাস কেবল
অভাগার রহিল সম্বল!

সবই পড়ে মনে,
উৎসব ব্যসন যত এ দীন ভবনে
গাঁথা আছে তব স্মৃতিসনে।

আনন্দের আদি উৎস
ছিলে তুমি মঙ্গলের মূল প্রস্রবণ;
তোমার নয়ন
সতত সবার পরে করিত যে
স্নেহ বিতরণ!
হুঙ্কারি আসিত যবে বিপদের রুদ্র ঝঞ্ঝাবাত
নিদারুণ অশনি সম্পাৎ—
দেখেছি সাক্ষাৎ,
তখন তোমার মুখে কি অপূর্ব্ব অপরূপ জ্যোতি
মূর্ত্তিমতী যেন ভগবতী!

অয়ি সতি!
আজ তুমি করিলে প্রয়াণ—
নিঙাড়িয়া ধরিত্রীর গূঢ় মর্ম্ম স্থান
ওঠে তাই বিজয়ার গান।
করুণ কাতর কণ্ঠে বিলাপের বাণী
ওগো রাণি,
শুনি এই পারে।
ও পারের সমাচার বার বার
মর্ম্মের গহনে
মর্ম্মরিয়া উঠিছে সঘনে
"কালের বাঁশরী রন্ধ্রে ছন্দে বাজে অনাহত ধ্বনি
তোমরা 'বিজয়া' বল, মোরা বলি শুভ আগমনী!

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

টগর

(গল্প)

হেমন্তের সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু সে গ্রামের চাষী-মহলে তখনো বিশ্রামের অবসর হয় নাই। জলের অভাবে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তাই সমস্ত দিন এবং রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাঠের পুকুরে ছিঁচের কাষ চলিতেছিল।

শ্রান্ত এবং অবসন্ন দেহে নিবারণ কৈবর্ত্ত বাড়ী ফিরিল। তাহার বাড়ীখানা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার প্রায় প্রান্তভাগে অবস্থিত। খড়ে-ছাওয়া সামান্ত দু'খানি ঘর, আর তাহার সংলগ্ন খানিকটা পড়া জায়গা। এই পড়া জায়গার চারিদিকে হয়ত কোনকালে মাটীর প্রাচীরের

অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই ফাঁকা উঠানের একপাশে বড় ঘরখানার গা ঘেঁসিয়া একটা বড় টোপাকুলের গাছ। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাকে ঝাপ্‌সা চাঁদনী ফুটিয়াছিল; কুলগাছের ছায়াটা রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নিবারণ রাস্তা হইতে বাটীর প্রাঙ্গণে পা দিয়াই চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "কে ?"

সে স্পষ্ট দেখিল, একটা লোক সেই গাছের তলা হইতে রাস্তায় নামিয়া গেল, তাহার ডাকের কোন উত্তর দিল না। নিবারণ আবার ডাকিল, "কে গো ?"

তথাপি উত্তর নাই। নিবারণ খুব দ্রুত লোকটার পিছু লইল এবং যাইতে যাইতে বলিল, "কে যাও গো ? জবাব দাও না কেন ?"

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কি হয়েছে রে ? ইস্, আজকাল তোদেরও সব কথার জবাব দিতে হবে নাকি ? ভারী সব ইয়ে হ'য়ে উঠ্‌লি যে !"

নিবারণ চিনিল, নায়েববাবু। মাথা হেঁট করিয়া সে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পূর্ব্বদিকের ঘরখানার চাতালে বসিয়া আঠারো উনিশ বছরের একটী স্ত্রীলোক রান্নার কায করিতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র নিবারণের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত জ্বালা করিয়া উঠিল। সে কঠোর স্বরে কহিল, "আবার আজ নায়েববাবু এসেছিল ?"

তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কে এসেছিল ?"

"জানো না কে ? নায়েববাবু—"

মন্দা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা—হা—রোজ রোজ এক ঢং !"

নিবারণ আগুন হইয়া বলিল, "ঢং আমার ? কতদিন বলে'-বলে'ও তোকে একটু শোধরাতে পার্‌লাম না। আবার ওকে এখানে আস্‌তে দিয়েছিলি ?"

মন্দা উনানে জ্বাল দিতেছিল। হাতের জ্বলন্ত কাঠখানা লইয়াই সে সতেজে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ দ্যাখ, খবর্দ্দার বলচি, রোজ রোজ অমন করে মুখ নেড়ো না। আমি রাস্তার লোককে এখেনে আস্‌তে দিই ? যতবড় মুখ নয়, ততবড় কথা !"

"না, তুমি ভারি সতী ! পাড়া-ময় গাঁ-ময় তোমার খোসনামের চোটে কাণ পাতা যায় না !"

কথায় কথা বাড়িয়া, দেখিতে দেখিতে একটা ভীষণ গোলযোগ হইয়া পড়িল। পাশের বাড়ীর দুইতিন জন লোক ছুটিয়া আসিল। তাহারা দেখিল, নিবারণ রক্তনেত্রে তাহার স্ত্রীকে প্রায় প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং মুখে বলিতেছে, "কপালে যা থাকে তাই হবে ! তোকে খুন ক'রে ফাঁসী হলেও আমার দুঃখু নেই।"

মন্দা যদিও ইতিপূর্ব্বে আস্ফালন করিতেছিল, এক্ষণে কিন্তু ভয়ে জড়সড় হইয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাড়ার পুরুষেরা নিবারণকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। স্ত্রীলোকদের নিকট মন্দা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা ছিলে ব'লেই, নইলে আজ আমাকে নিশ্চয় মেরে ফেল্‌তো ! কি ক'রে আমি থাক্‌ব দিদি ? ওই আমাকে একদিন খুন করবে।"

স্ত্রীলোকেরা মুখে সান্ত্বনা দিল এবং মনে মনে বলিল, "খুন কি আর সাধে করে ? তোমার রীতের গুণে করে।"

নিতাই মোড়ল নিবারণের বন্ধু। সে নিবারণকে বলিল, "আজ আর বাড়ী গিয়ে কায নেই, এই খেনেই খেয়ে দেয়ে আমার কাছে শুয়ে থাক্‌বি চল্।"

নিবারণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল, হাঁ কিংবা না, কোন কথাই বলিল না। আহারাদি করিয়া সে নিতাইয়ের কাছে শয়ন করিল। কিন্তু তাহার চোখে নিদ্রা আসিল না। যে সমস্যাটা ইহার পূর্ব্বেও অনেকদিন তাহার মনে উঠিয়া কেবল তাহাকে ব্যথা দিয়াই চলিয়া গিয়াছে, আজ সেটা এমন ভারী হইয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল যে, কোনরূপে তাহার একটা মীমাংসা না করিতে পারিলে বুঝি বা তাহার বাঁচিবার পর্য্যন্ত উপায় ছিল না। জমিদারের বাড়ীতে কৃষাণগিরি করে সে; আর, সেই জমিদারের নায়েব বাবু......

অথচ একথা গ্রামের কে না জানে? ছেলে বুড়া সকলেই 'নিব্‌রের বউ' সম্বন্ধে কতদিন কত কথাই না বলিয়াছে। এমন করিয়া সে বাঁচিবে কিরূপে? মনিব নায়েব বাবুকে শাসন করিবার ক্ষমতা তাহার নাই,—যদিও সময়ে সময়ে ইচ্ছা করে, এক লাঠির ঘায়ে একদিন ঐ বদ্‌মায়েসের টেকো-মাথার খুলিটা উড়াইয়া দেয়, তার পর যা থাকে অদৃষ্টে! কিন্তু সেটা শুধু মুহূর্ত্তেরই আস্ফালন! আর সত্য সত্যই, নিজের ঘর না সামলাইয়া পরের দিকে চোখ রাঙাইয়াও তো ফল নাই! নায়েব বাবুকে পাকে-প্রকারে একদিন সে কথাটা বলিতে গিয়াছিল, তাহাতে নায়েববাবু খিচাইয়া বলিয়াছিলেন, "যা বেটা যা! আগে নিজের ঘরের আগল শক্ত কর্‌গে!" কথাটা তো আর হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়!

আর একটা কিনারা হইতে পারে, যদি এখানকার বাস তুলিয়া অপর কোথাও যাওয়া যায়।

ক্রোশ তিনেক দূরে একখানা গ্রামে তার এক দিদি থাকে, সেখানে দিদির কাছে মন্দাকে রাখিয়া আসিলে কেমন হয়? মন্দা হয়'ত—হয়ত' কেন, নিশ্চয়ই—যাইতে চাহিবে না। না—চাহিলে কি হয়, জোর করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। শুইয়া শুইয়া এই কথাটা লইয়া নিবারণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর সে মনে মনে পাকা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল যে, ভোর থাকিতে থাকিতেই উঠিয়া সে দিদির বাটী রওনা হইবে এবং যেমন করিয়া হউক, ইহার একটা ব্যবস্থা করিয়া তবে এখানে ফিরিবে।

২

সকালে উঠিয়া কিন্তু পাড়ার লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তাহারা দেখিল, নিবারণের বাড়ী জনশূন্য, নিবারণ বা তাহার স্ত্রী, কাহারও দেখা নাই।

হঠাৎ ইহাদের অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে কেহ কোন কিছু বলিতে পারিল না। নিতাই শুধু এইটুকু স্মরণ করিতে পারিল যে, নিবারণকে লইয়া সে একত্র শয়ন করিয়াছিল, কিন্তু সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া সে আর তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

কথাটা খুব শীঘ্র নায়েব গোবর্দ্ধন বাবুর কাণে উঠিল। গতরাত্রির কলহের বিবরণটাও তিনি আদ্যোপান্ত শুনিলেন। সব শুনিয়া তিনি খুব জোরে হুঁকায় গোটা-কয়েক টান্ দিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওরে, কে আছিস, শীগ্‌গির গাড়ী ঠিক করতে বল, শীগ্‌গির!"

বৃদ্ধ মনাই জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন কর্ত্তা বাবু?"

নিরতিশয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্নভাবে নায়েব বাবু বলিলেন, "আর কোথায়? ছুঁড়িটে যে খুন হ'ল, তার একটা খবর তো জানিয়ে রাখতে হবে থানায়?"

উপস্থিত সকলে শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! তবে কি নিবারণ সত্য সত্যই বউটাকে খুন করিল?

নিতাই কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "হ্যাঁ দা'ঠাকুর, সত্যি?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "সত্যি-মিথ্যে দারোগাবাবু এলেই সব টের পাবি! এ বাবা ইংরেজের রাজত্ব, পালিয়ে গিয়ে যমের বাড়ীতে থাক্‌লেও সেখান থেকে টেনে এনে ফাঁসীতে লট্‌কে দিয়ে ফের সেই যমের বাড়ীতেই পাঠিয়ে দেবে।"

ইংরাজ রাজত্বের মহিমার বিবরণে শ্রোতৃবর্গের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। শুষ্কমুখে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল।

এই গ্রাম হইতে ক্রোশখানেক দূর দিয়াই খ'ড়ো নদী বহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের একদিন পরে গোবর্দ্ধন তাহার পৈতৃক ছাতাটি মাথায় দিয়া নদীর তীরে তীরে গ্রামে ফিরিতেছিল। খানিকদূর হইতে তার নজর পড়িল, নদীর তীরে বালির উপর এক জায়গায় অনেকগুলা লোক জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া। সেইদিক হইতে একটা লোককে আসিতে দেখিয়া গোবর্দ্ধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানে কি হচ্ছে হে?"

লোকটা বলিল, "কোত্থেকে একটা মড়া ভেসে এসেছে বাবু, তাই সবাই দেখচে।"

গোবর্দ্ধন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে দলবদ্ধ লোকগুলা সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

গোবর্দ্ধন দেখিল, মৃতদেহটা একটা স্ত্রীলোকের, দেহের অধিকাংশ জলে এবং মাথাটা পাড়ে পড়িয়া রহিয়াছে। মুখ খানা খুব বিকৃত এবং কালো হইয়া উঠিয়াছে। মুখে এবং দেহের স্থানে স্থানে কীটদংশনের মত ক্ষত।

গোবর্দ্ধন বলিল, "কোত্থেকে এল বল্ দেখি এটা?"

জটলার ভিতরের একজন বলিল, "কি জানি বাবু! আমি সেই সকালে খবর পেয়েই এসে এই ধন্না দিয়ে বসে আছি। ওঠবার তো যো নেই আমার!"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে ব্যক্তি এই গ্রামের একজন চৌকিদার। গোবর্দ্ধন বলিল, "তাহলে তো তোমাকে আবার থানায় খবর দিতে হবে?"

"সে কি আর আমি না দিয়েছি বাবু? লাস দেখেই আমি ও পাড়ার চৌকিদারকে পাঠিয়েছি থানায়।"

গোবর্দ্ধন অনেকটা পথ হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল; স্নানাহারের বেলাও উত্তীর্ণপ্রায়, সে আর অপেক্ষা না করিয়া গ্রামের দিকে ফিরিল।

আহারাদি সারিয়া গোবর্দ্ধন নিজের বাড়ীতে বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় বাহির হইতে জোর তলব আসিল "কৈ হে, নায়েববাবু কৈ?"

গোবর্দ্ধন বাহিরে আসিয়াই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ, আপনি?"

থানার দারোগাবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আপনারা আমাকে আর স্থির থাকিতে দিলেন কৈ?...পরশু আপনি গিয়ে খুনের কথা জানিয়ে এলেন, আর আজ শুনছি, নদীতে একটা ছুঁড়ির লাসও পাওয়া গেছে।"

গোবর্দ্ধন প্রথমটা একটু বিস্মিত হইয়া, পরে যেন হঠাৎ ভারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আরে বাঃ, একথাটা তো আমার একদম্ মনেই পড়ে নি! ঠিক ধরেছেন তো আপনি!"

"কেমন, ঠিক সেই মেয়েটার লাস নয় কি? হেঁ হেঁ বাবা, এসব কথা এত চট্ করে মাথায় না খেল্‌লে কি আর এত দায়িত্বের চাকুরী রাখা যায়? এখন চলুন, লাসটা দেখে আসি, আপনাকে আবার সনাক্ত কর্‌তে হবে ত?...আর হ্যাঁ, রাত্তিরে আমায় এইখানেই থাক্‌তে হবে। তা, খাবার ব্যবস্থা বেশী কিছু করবেন না যেন! খাসীর মাংসে তো অরুচি ধ'রে গেল! বরং গোটাদুই 'রামপাখী' যদি জোগাড় কর্‌তে পারেন--"

"আজ্ঞে, বিলক্ষণ! এর আবার 'যদি' আছে নাকি? তাহলে আমি একবার শুধু হুকুমটা দিয়েই, চাদর খানা কাঁধে ফেলে আসি"

নদীর তীরে আসিয়া গোবর্দ্ধন নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সকালে যে লাসটাকে দেখিয়া তাহার মনে কোন অনুভূতিই জাগে নাই, এবেলায় পুনরায় সেটা দেখিবা-মাত্র তাহার মনে হইল, বাঃ এ তো নিশ্চয় সেই মল্লা ছুঁড়ির লাস! ঐ তো হাতে তার সেই কাচের চুড়ি, মাথায় সেই লম্বা লম্বা চুল! উঃ পাষণ্ড নিবারণ বউটাকে কিনা খুন করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া ফেরার হইয়াছে!

দারোগার আগমন সংবাদ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। গোবর্দ্ধনের গ্রামের বহুলোকও ব্যাপার কি দেখিতে নদীর তীরে আসিয়া জমা হইয়াছিল।

দারোগা গোবর্দ্ধনকে বলিল, "কিহে, আর কেউ সনাক্ত কর্‌তে পারবে?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "নিশ্চয় পারবে। এই যে এরা সবাই এসেছে।" বলিয়া একবার চারিদিকে চাহিতে গিয়াই তার নজরে পড়িল, স্বয়ং নিবারণ পর্য্যন্ত হাজির!

কথাটা সে তৎক্ষণাৎ দারোগার কাণে কাণে বলিয়া দিল। দারোগা বলিলেন, "চুপ্।"

গোবর্দ্ধন নিতাই মোড়লকে বলিল, "কি রে নিতাই, তোর কি মনে হয়? এটা নিবরের বউয়ের লাস কি না?"

নিতাই বলিল, "তা কি করে' জান্‌ব দা' ঠাকুর? লাস তো একদম্ পচে উঠেছে।"

দারোগাবাবু মুখ কুঞ্চিত করিলেন। হঠাৎ তিনি নিবারণের সামনে আসিয়া বলিলেন, "তুমিই নিবারণ? দেখ দেখি এই তোমার স্ত্রীর লাস?"

নিবারণ থতমত খাইয়া গেল। কোন কথা তার মুখ দিয়া বাহির হইল না। দারোগার ইঙ্গিতে একজন কন্‌ষ্টেবল আসিয়া নিবারণের হাত ধরিল।

পরের দিন সকালে দারোগাবাবু পুনরায় নদীর ধারে আসিলেন। সেদিন নিবারণের পাড়ার দুইটা স্ত্রীলোক আসিয়া সনাক্ত করিল যে, লাসটা নিবারণের স্ত্রীরই বটে। এমন কি, যে কাদামাখা ছিন্ন কাপড়খানা লাসের গায়ে জড়ানো ছিল, সেখানা যে মৃতা মন্দাকিনীর শাড়ী এবং সেই শাড়ীখানিই যে মন্দা সেদিন রাত্রে তাহার স্বামীর সহিত কলহের সময় পরিয়া ছিল, এতটা পর্য্যন্ত সনাক্ত হইতে বাকী রহিল না। দারোগাবাবু লাস ও আসামী লইয়া বিজয়-গর্ব্বে সদরে চলিলেন।

দীর্ঘ দুই বৎসর অতীত হইয়াছে।

ফাল্গুন মাসে ফাগের লীলা কলিকাতায় এবং বিশেষ করিয়া সহরতলীর বহু বাগানবাড়ীতে রীতিমত সজীব হইয়া উঠিয়াছিল।

বালীর গঙ্গাতীরে এমনি একখানা বাগানের প্রকাণ্ড হলঘরে সেদিন নায়েব গোবর্দ্ধন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এটি তাহারই জমিদার বাবুদের বাগান-বাড়ী। সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া বাবুর এবং বাবুর বন্ধুবর্গের আমোদের প্রচুর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, গোবর্দ্ধন কেবলই একটু ফাঁক খুঁজিতেছিল, যাহাতে গাছের আড়ালে অন্ধকারে বসিয়া নিজের গায়ের ব্যথাটা একটু ভাল করিয়া সারিয়া লইতে পারে। অনেকক্ষণের পর সে কোন রকমে সে অবকাশ করিয়া লইল।

ফাল্গুনের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না বাধাবন্ধহীন আনন্দের স্রোতের মতই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একটা বড় গন্ধরাজ গাছের ছায়ায় গোবর্দ্ধন একটা বেঁটে বোতল ও একটা মাটীর গেলাস লইয়া আসিয়া বসিল।

গেলাসের পর গেলাস ঢালিয়া গোবর্দ্ধন প্রায় সমস্ত বোতলটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, তবু যেন তাহার গায়ের ব্যথাটা মরিতে চাহিল না; বিরক্ত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "ঝাঁটা মারো এ বাবু-নেশার মাথায়! দেশের সেই খাসের তৈরী মালের কাছে কি আর এ! হ্যাঃ, কিসে আর কিসে, ধানে আর তুষে!"

উপরের ঘরে অফুরন্ত গানের সঙ্গে সঙ্গে বেতালা করতালি এবং বেসুরো বাহবা ও হাসির একটা বীভৎস ব্যাপার চলিয়াছিল। গোবর্দ্ধনের মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইলেও ওদিকে যাইতে পারিতেছিল না, পাছে বাবুদের মর্য্যাদার হানি হয়।

সে সেইখানেই আড় হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে আস্তে আস্তে তার চক্ষু মুদিয়া আসিল।

অনেকক্ষণের পর হঠাৎ একটা সর্ সর্ শব্দে সে চোখ চাহিয়া দেখিল, একটা স্ত্রীলোক এইদিক দিয়া গঙ্গার দিকে যাইতেছে।

গোবর্দ্ধন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে যথাসম্ভব নিঃশব্দে স্ত্রীলোকটার পিছু লইল। এ যে "রঙ্গিণী"দের দলের ভিতরই একজন, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না।

খানিকটা আসিতেই স্ত্রীলোকটা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কে রে?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "চমকাবার কারণ নেই বাবা, আমি মানুষ। তা তুমি চাঁদ, হঠাৎ ওপরের গগন থেকে নেমে এলে যে?"

রমণী বলিল, "আমার ভাই ওসব ভাল লাগল না।"

"তা বেশ, বেশ; তবে এইখেনেই একটু বস্‌তে আজ্ঞে হোক্ না!"

রমণী আপত্তি করিল না; সেই ঘাসের উপর গোবর্দ্ধনের নিকটে বসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া

রহিল। সেই পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় গোবর্দ্ধনের মনে হইল, মুখখানা যেন পরিচিত। কিন্তু তাহার আর কোনও কথা স্মরণ হইল না।

হঠাৎ স্ত্রীলোকটা চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "ওমা এ যে তুমি গো! তাইতো বলি, এ ত চেনা মুখ! আমায় তুমি চিন্‌তে পারচ না!"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তা ওর-নাম-কি, বল্লে না বিশ্বাস কর্‌বে, আমারও ঐ চাঁদমুখখানি চেনা-চেনা ঠেক্‌চে বটে!"

"বটে, ঠেকচে নাকি?" বলিয়া স্ত্রীলোকটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এবং পরে দু'খানা হাত গোবর্দ্ধনের মুখের কাছে নাড়িয়া দিয়া বলিল, "আহা, নেকু রে আমার! তোমার জন্যেই, মিন্সের মারের ভয়ে আমি ঘর ছাড়লাম, আর তুমিই আমায় চিন্‌তে পারচো না মায়েব মোশাই?"

গোবর্দ্ধনের মুখখানা অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি ম—মন্দার ভূত?"

আবার একটা হাসির লহর তুলিয়া স্ত্রীলোকটা বলিল, "সবাই মরে' ভূত হয়, কিন্তু আমি মরে ফুল হয়েছি, আমি এখন 'টগর'।" পরে একটু সরিয়া আসিয়া গোবর্দ্ধনের একখানা হাত টানিয়া নিজের অনাবৃত বাহুর উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "কি রকম ঠেকচে? ভূত বলেই মনে হয় না কি?"

গোবর্দ্ধন মাতালের হাসি হাসিয়া উঠিল—"বারে বাঃ! এ তো ভারি মজা! জলজ্যান্ত তুমি রইলে বেঁচে, আর তোমাকে খুন করার জন্যে নিবরে শালার হল সাত বচ্ছর জেল!"

টগর শিহরিয়া উঠিল।—"অ্যাঁ! সে জেলে গেছে? আমায় খুন করে সে জেলে গেছে?"

"আরে হাঁ, তবে আর মজা বলচি কেন? তোমাকে খুন করে' সে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সে লাস পর্য্যন্ত পাওয়া গেল বাবা—হাঃ হাঃ হাঃ—কী মজা!"

বারবিলাসিনীর সমস্ত দেহ খানা কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গার অপর প্রান্ত হইতে প্রতিধ্বনি যেন ব্যঙ্গস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল কি মজা!

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

পদচিহ্ন

(গান)

অলখিতে এসেছিল,—অলখিতে সে
চলে গেছে বুঝিলাম এক নিমেষে।
প্রাতে উঠে হেরি হায়
পা'র দাগ আঙিনায়।
যায় আঁখিজলে তায় এ বুক ভেসে॥

কি ঘুম ঘুমানু হায় পালঙ পরে,
সকল দুয়ার রুধি চোরের ডরে।
কত সঙ্কেতে ছলি
হতাশে সে গেছে চলি
বজ্রাঙ্কুশ বুকে হানিয়া শেষে॥

তার ছাড়া ঐ দাগ কাহারো নহে,
সকলেরি চেনা ধ্বজচিহ্ন বহে।
অই দাগ বনপথে
টানে মোর মনোরথে,
সাধ যায় অই দাগ মুছাই কেশে॥

কেমনে ঘুচাই, যেন কেউ না জানে,
ও দাগে ছোয়াব ঝাঁটা কোন্ পরাণে।
সুগৃহিণী হয়ে তাই
উঠান লেপিতে যাই
অপটু হাতে যে ওই দাগ না মেশে!

মুছিতেও ব্যথা বাজে, ও দাগ ছুঁয়ে
এ মুখ চুমিতে তা যে পড়িছে নুয়ে।
অবিরল আঁখিনীরে
দাগ তো ঘুচিবে ধীরে
কেমনে ঘুচাই দাগা সর্ব্বনেশে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

গ্রামের কথা

প্রণেতা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র, প্রাপ্তিস্থান—১০নং এম রোড, জামশেদপুর, মূল্য ১৷৽

গ্রন্থখানি উপন্যাসের আকারে রচিত। ইহার মধ্য দিয়া লেখক গ্রাম ও সমাজের অনেক কথাই প্রস্তাব করিয়াছেন। কিরূপে গ্রামের উন্নতি-সাধন সম্ভব তাহাই বর্ণনা করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। সুতরাং গ্রামের কথা বলিতে গিয়া তিনি উপন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইবার অবকাশ পান নাই। তবে ভাবুকতার পরিচয় অনেক স্থলেই আছে। লেখক শ্রমিক সঙ্ঘের কথা ও শক্তি-সংগঠন, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রভৃতি সাময়িক সমস্যার আলোচনা করিয়া পাঠককে ভাবাইয়া তুলিবার যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছেন।

লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ। আশা করি গ্রন্থখানি সাময়িক আলোচনার জন্য অনেকের মনোরঞ্জন করিবে।

বঙ্গ গৌরব

প্রণেতা রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন, প্রকাশক—ম্যাকমিলান্ এণ্ড কোং লিমিটেড, ২৯৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ৷৷৵৽

লেখক এই গ্রন্থে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি ১৮ জন মনস্বীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলন করিয়াছেন। ভাষা প্রাঞ্জল, রচনাভঙ্গী সুন্দর, লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে ছাত্র-সমাজের উপযোগী। আশা করি বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে ইহার সমাদর হইবে।

দেবীর সহস্রাধিক নাম

গ্রন্থকার শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। কলকবাটী, দোয়াড়াপাড়া, নবদ্বীপ।

গ্রন্থে দেবীর সহস্রাধিক নাম সংগৃহীত হইয়াছে। কয়েকটি স্তোত্র সংস্কৃত ভাষায় ও কয়েকটি বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। রচনায় বিশেষত্ব নাই। ব্যক্তিগত আক্ষেপের কথাই অধিক। সাধারণের নিকট তাহা অপ্রকাশ থাকাই ভাল ছিল।

সঙ্গীত সুধা

লেখিকা শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী, প্রকাশক—এন মুখার্জি, আর্ট প্রেস, ৩১নং সেণ্ট্রাল এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য ৩৲

প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় অভিজ্ঞানপত্রে জানাইয়াছেন, লেখিকা উচ্চাঙ্গের গান শিক্ষা করিয়াছেন। সদারঙ্গ, শোরী প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়কগণের গান বিস্তৃত স্বর লিপির সহিত প্রকাশ করাই লেখিকার উদ্দেশ্য। খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন, হোরি, গজল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গানের পদ্ধতি গ্রন্থে সুন্দর ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শেষে কয়েকটি বাঙ্গালা গানও সংযুক্ত আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের অভাব ছিল। লেখিকা সে অভাব কিয়ৎ পরিমাণে ঘুচাইয়াছেন। যাঁহারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পক্ষপাতী তাঁহাদের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

ঘুমের নেশা

শ্রীটিকটিকি লিখিত; প্রাপ্তিস্থান :—বাণী সাহিত্য মন্দির, ১৯৯সি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মূল্য ১৲

এখানি একটি ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস। এ শ্রেণীর রচনার দোষগুণ সবই ইহাতে আছে। বিষয় চিত্তাকর্ষক, খুনী ও চোরের কৌশল সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রহস্যময় লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কথা অনেকের মনোরঞ্জন করিবে সন্দেহ নাই। তবে উচ্চ অঙ্গের কলা-নৈপুণ্য বা লালিত্যের আভাস এ শ্রেণীর রচনায় বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূজো বাড়ী

(সামাজিক নক্সা)—শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সুলভ প্রেস, পৃঃ ৩৯, মূল্য ।০

এই ছোট বইখানির ভিতর যে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ আছে, তাহা যেমন সরল তেমনি স্বচ্ছ। আমরা ছেলেবেলায় প্রাচীনদের মুখে যে রকম রঙ্গ রস শুনিতাম তাহারই কতকটা আভাস এই বইখানিতে পাওয়া যায়। নক্সাটি হয়ত একটু মোটা তুলিতে অঙ্কিত. ইহাতে ততটা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বা শিল্পানুভূতি হয়ত নাই,কিন্তু ইহার সরলতা ও স্থূলতাই এক্ষেত্রে দোষ না হইয়া গুণ হইয়াছে। সাধারণ লোকে এই চিত্রে যথেষ্ট আমোদ ও সেই সঙ্গে শিক্ষা পাইবে। এই ব্যঙ্গ চিত্রের অন্তরালে গ্রন্থকারের দেশভক্তি ও সমাজ প্রীতি উঁকি মারিতেছে। শ্রীদুর্গা প্রতিমার সকল অংশের উপরই—সাপ হইতে চালচিত্র পর্য্যন্ত—কবি গান বাঁধিয়াছেন। সরস্বতী মাতার বন্দনা গান হইতে একটু তুলিয়া দিলাম—

ঐ সরস্বতীর দুটি পায় কোটি কোটি নমস্কার।
যে বিদ্যা শিখাচ্ছ মা গো সকলি কি ফক্কিকার॥
আজকাল মা তোমার বিদ্যে,
কেবল জয়ী হওয়া ফাঁকির যুদ্ধে,
ভাল সেধেছেন সে বিদ্যে (এটর্নী)
উকীল, কাউন্সিল, ব্যারিষ্টার॥

ছবিও আছে—বোধ হয় সাবেক কালের শ্রীরামপুরের 'নূতন পঞ্জিকা'র ব্লকগুলির সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে।

"সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা"

(স্বাস্থ্য-রক্ষকের স্বাস্থ্যহানি)—শ্রীযুক্ত হরিপদ গুহ। কৌমুদী প্রেস, পৃঃ ১২, মূল্য ৵০। ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ মাসের "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর লিখিত 'আমিনা বিবির আত্মকথা' নামক গল্পের 'আলোচনা' 'প্রতিবাদ' ও 'প্রতিবাদের প্রতিবাদ' একত্র সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রতিবাদে' রায় বাহাদুর যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, আমাদের তাহা মনঃপূত হইল না। যতীন্দ্র বাবু সগর্ত্ত পথে আলো হাতে করিয়া অন্ধকে সাবধান করিতে গিয়া নিজেই খানায় পড়িয়াছেন।—কাগজ, ছাপা ভাল।

বিদায়ের গান

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু। নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস, পৃঃ ১৭৬, মূল্য নাই। প্রেয়সী ও গৃহলক্ষ্মী হারাইয়া স্বামীর বুকফাটা ক্রন্দন। আন্তরিকতায় হৃদয় স্পর্শ করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে, অলক্ষ্যে দীর্ঘশ্বাস বয়। এ বস্তু সমালোচনার নহে। অন্তরের কথা অন্তরে থাকিলেই ভাল হইত। হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিয়া ব্যথিত কবি যদি একটু সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন, তাঁহার মর্ম্মন্তুদ বেদনা যদি একটুও প্রশমিত হইয়া থাকে,তাহাতে আমরা সুখীই হইব, কিন্তু সমালোচনায় যে তাঁহার হৃদয়ে ক্ষত কমিবে, এ আশা আমরা করি না। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সবই ভাল।

শ্রীরাজমালা

(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত) প্রথম লহর, সটীক ও সচিত্র। পণ্ডিতপ্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বিরচিত ও শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। ত্রিপুররাজ্যের রাজধানী আগরতলা হইতে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই, বোধ হয় বিক্রয়ের জন্য নহে। রয়েল সাইজ। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইচমৎকার। সম্পাদকীয় নিবেদন ৬ পৃষ্ঠা, প্রমাণপঞ্জী ৪ পৃষ্ঠা, পূর্ব্বভাষ ৯৪পৃষ্ঠা, সূচী ৬পৃষ্ঠা, মূল গ্রন্থ ৭১পৃষ্ঠা। তাহার পরে বিস্তৃত টীকা ২৯৬ পৃষ্ঠা। সর্ব্বশেষে ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী অনুক্রমণিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। বিরাট রাজসিক ব্যাপার।

ত্রিপুররাজ্য এবং ত্রিপুর-রাজবংশ বাঙ্গালার বড় দরদের জিনিষ। বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোরের মত মহৎপ্রাণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস জানিতে বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রাণে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাস জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসুর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াসিক সোটাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাদ্রি লং সাহেব কৃত রাজমালার সার সঙ্কলন এবং পরলোকগত ঐতিহাসিক ৺ কৈলাসচন্দ্র সিংহ কৃত তাহারই বিবৃতি "রাজমালা" ছাড়া আর গতি ছিল না। ৺ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত সম্পূর্ণ রাজমালার যে কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার দুই এক খণ্ড কচিৎ কোনও ভাগ্যবানের হস্তে দেখিতে পাওয়া যাইত। বহুবার রাজমালার ভাল একটি সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টা ত্রিপুরা রাজসরকার হইতে হইয়াছে ; কিন্তু প্রত্যেক বারই নানা বাধা বিঘ্ন আসিয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে খুব সোরগোল সহকারে শুনা গেল যে, কলিকাতার মস্তবড় একজন অধ্যাপকের হস্তে রাজমালা সম্পাদনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।

কালীপ্রসন্নবাবু রাজমালার প্রথম খণ্ড বড় চমৎকার করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় ত্রিপুর রাজগণের ইতিবৃত্তের আদিতেই দশাশ্ববাহিত শ্বেত রথে ভগবান চন্দ্রমার অদ্ভুত চিত্র প্রদানের হস্ত হইতে কালীপ্রসন্ন বাবু রক্ষা পান নাই। আনুষঙ্গিক অনেক অদ্ভুতের বড় বড় বড়ীও তাঁহাকে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে। দেশীয় রাজগণের জাতিতত্ত্ববোধ ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের উন্মেষ কোন্ সুদিনে হইবে, কত যুগে হইবে, ভগবানই বলিতে পারেন। ততদিন পর্য্যন্ত রাজমালা সম্পাদককে অপেক্ষা করিতে হইলে চলে না। কাযেই এই গুলি অপরিহার্য্য আবর্জ্জনা বলিয়া আপাততঃ সহ্য করিয়া যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু ইতিহাসের মর্য্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য আগর-

তলায় বসিয়া যতদূর পারা যায় কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। মুসলমান যুগের ইতিহাসের সহিত ত্রিপুরার ইতিহাস যেখানে জড়াইয়া গিয়াছে, সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া কালীপ্রসন্ন বাবুকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে, লবণের খাতিরে যেন তিনি ইহা না ভোলেন। যশোধরের ইতিহাসের অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম ঘটনার বিবরণ মির্জ্জা নথনের বাহার-ই স্তানে আছে, রাজমালায় উহার বিন্দু বিসর্গও নাই। যশোধরের ইতিহাস লিখিবার আগে বাহার-ই স্তান বাদ দিলে চলিবে না।

কালীপ্রসন্ন বাবু যেটুকু করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু ছয় লহর রাজমালার মোটে এক লহর বাহির হইল। বাকী লহর গুলির জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে রাজমালার এক খানা খাঁটি পুরাতন পুথি পাওয়া যায় নাই। যে পুথি দেখিয়া রাজমালা সম্পাদিত হইয়াছে, ভাষা দেখিয়া তাহাকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। ১৫শ শতাব্দীতে রচিত পুস্তকের অন্ততঃ পক্ষে ৩০০ বছরের পুরাণো পুস্তক পাওয়া গেলে মনটা খুসী হইতে পারিত। অবলম্বিত পুথিমালার বিবরণ কালীপ্রসন্ন বাবু কোথাও দেন নাই—পুথি খানার বয়স কত, তাহারও উল্লেখ করেন নাই। ৺চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের মুদ্রিত পাঠই ফিরিয়া অবিকল মুদ্রিত করিতেছেন না তো?

প্রথম দিকের রাজগণের রাজ্যারোহণ বৎসরগুলি তাঁহাদের মুদ্রা হইতে নির্ণীত হইতে পারে, কাযেই তাঁহাদের মুদ্রা যতগুলি কালীপ্রসন্ন বাবু হস্তগত করিতে পারেন সবগুলির Collotype ছবি দিতে পারিলে ভাল হয়। রাজমালায় প্রদত্ত রাজ্যারোহণ বৎসর সর্ব্বস্থানে নির্ভরযোগ্য নহে।

বাঙ্গালীর খাদ্য

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন প্রণীত। ১১।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১১১ পৃষ্ঠা মূল্য ৷৷০ প্রাপ্তিস্থান—বুক ডিপো লিঃ, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে খাদ্য ও শরীর, আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্য—আমিষখাদ্য, তরকারী, ফল, ভাইটামিন, ঋতুচর্য্যা, দিনচর্য্যা, আহার সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম ও পথ্য, এই কয়টি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এ পুস্তক পাঠে গৃহস্থ ও চিকিৎসক উভয়েরই উপকার হইবে। খাদ্য সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত ও সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত লিপিবদ্ধ করিয়া লেখক পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। অনবধানতা বশতঃ কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিকটু ছাপার ভুল আছে, আশা করি লেখক মহাশয় আগামী বারে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হিতকথা

ডাক্তার শ্রীআশুতোষ পাল, এল, এম, পি প্রণীত। বোলপুর মোহিনী কুটীর হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল, এম, এস, সি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯৫পৃঃ, মূল্য ৷৵০

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার রোগ প্রতিকার সমস্যা, তামাক, চা, সুরা প্রভৃতি মাদকের অপকারিতা, বর্ত্তমান কালে অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যুর কারণ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যায়ে সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা মার্জ্জিত ও উচ্ছ্বাসবিহীন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা এইরূপ হওয়াই উচিত। তাঁহার প্রণীত "ম্যালেরিয়া" পাঠে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম—"হিতকথা" পাঠে আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহার চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অভাব নাই, আশা করি তিনি এইরূপ হিতকথা মধ্যে মধ্যে প্রচার করিয়া জনসাধারণের হিতসাধন করিবেন।

বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস

ব্রাহ্মণ তত্ত্ব—প্রথম খণ্ড ; প্রধান গৌড় ব্রাহ্মণ (পশ্চিমবঙ্গের বোঢ় ব্যাস ব্রাহ্মণ)—বোঢ় শ্রীযুক্ত নীরদবরণ মিশ্র চক্রবর্ত্তী সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। মিত্র প্রেস, পৃঃ ৫৪, মূল্য ।০

নামের আগে সম্পাদক মহাশয়ের বিশিষ্ট গুণপণার ৭লাইন ব্যাপী পরিচয় তালিকা আছে। বইখানি খুলিতেই চোখে পড়ে পাশাপাশি দুই খানি ফটো—প্রকাশক মহাশয়ের ও সম্পাদক মহাশয়ের ফটোর শিরোদেশে লেখা "পশ্চিম বঙ্গের বোঢ় ব্যাস ব্রাহ্মণ।" "ব্যাস ব্রাহ্মণের" চিত্রে কিন্তু টিকী, নামাবলী, পৈতা, থান, খড়ম, এ কয়টার একটাও চোখে ঠেকিল না—ঠেকিল আধুনিক ষ্টাইলের দিব্য ধোপদস্ত সার্ট ও খোলা বুক কোট। হাঁ, কলার টাই বা চশমা নাই বটে।

বই খানির বহিরঙ্গ দেখিয়া যে রকম মনটা দমিয়া যাইতেছিল, ভিতরটা দেখিয়া কিন্তু বুঝিলাম অত নৈরাশ্যের কারণ নাই। সম্পাদক মহাশয় বাস্তবিকই পরিশ্রম করিয়া, অনেক শাস্ত্র ইতিহাস গবেষণা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুস্তকখানি শেষ করিতে পারিলে বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী সম্পদই পাওয়া যাইবে। অবশ্য সমস্ত সিদ্ধান্তেই যে সকলে একমত হইবেন এরকম আশা করা যায় না, তবুও সঙ্কলয়িতার চেষ্টা যে অতীব প্রসংশনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তকে অনেক স্থানে মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সে গুলির অন্ততঃ মর্ম্মানুবাদ দিলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে মনে হয় সম্পাদক মহাশয় একটু অনাবশ্যক দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সাধারণ পাঠক যাহাতে অনুসরণ করিতে পারে এরূপ গতিই বাঞ্ছনীয়। কাগজ ছাপা আরও ভাল হওয়া দরকার।

সাধনার গৃহে

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ষ্টার প্রেস, ঢাকা। ১০৫ মূল্য ৷০ আমরা এই সদ্গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইলাম।

গ্রন্থকার একজন প্রকৃষ্ট সাধক, তিনি আপনার অভিজ্ঞতা-প্রসূত জ্ঞানই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। সাধন পথের বহু বাধা তাঁহার প্রদর্শিত উপায়ে অন্তর্হিত হইবে ইহা আশা করা অসঙ্গত নয়। সাধারণ পাঠকও এই পুস্তক পাঠে অনেক উপকার পাইবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। কাগজ ছাপা চলনসই।

বুদ্ধ বাণী

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। সিদ্ধেশ্বর প্রেস। মূল্য ।০

দেখিতেছি অল্প দিনের ভিতরই বিষ্ণুবাবু তাঁহার স্থাপিত চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন বজবজ হইতে অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। সমালোচ্য পুস্তক খানিও একখানি সদ্‌গ্রন্থ। বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বাণীর কতগুলি এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও স্বচ্ছ। বৌদ্ধধর্ম্ম নীতিমূলক বা নীতিপ্রধান। সেই নীতির সহিত কোন ধর্ম্মেরই বিরোধ থাকিতে পারে না। এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকাখানি সেই সব অমূল্য নীতি প্রচারে সহায়তা করিবে, সেই জন্য ইহার আদর হওয়া উচিত। কাগজ ছাপা ভাল।

একা।

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক :—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

কয়েকটি ছোট গল্প এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। 'একা'য় বৃদ্ধ রামলোচনের যৌবনস্বপ্ন ও বিধবা প্রতিমার পরিহাসকৌতুক লেখক বর্ণনা করিয়াছেন—বর্ণনা অনেক স্থলে হৃদয়গ্রাহী। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বা রসের উদ্বোধনে লেখকের কৃতিত্ব লক্ষিত হয়। 'বহিষ্কারের' প্লটে নূতনত্ব আছে। লেনা ও ভূপতির চিত্র বিশেষ উপভোগ্য। ঘটনার পরম্পরা ও লেখকের বর্ণনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। 'বিশ্বনাথ' ও 'ভিখারিণী'র করুণ কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী। 'বিয়ে বিষক্ষয়ে' সুন্দর হাস্যরস আছে। 'সাহিত্যে প্রগতি' ও 'পিপাসায় বারি' বিশেষ কৌতুকপ্রদ। 'পুরাণ কথা' 'নষ্টনিধি' ও 'সাগরিকা ও নাগরিকা' অনেকটা রূপকের মত। ভাবগ্রাহী পাঠক ইহাদের অন্তর্নিহিত গভীর সত্য উপলব্ধি করিবেন। এ শ্রেণীর রচনাতেও লেখক সিদ্ধহস্ত।

লেখক শক্তিশালী। গল্পগুলি পাঠকের নিকট অনেক চিন্তার বিষয় উপস্থাপিত করে। বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব রচনাগুলিকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছে।

নীহারিকা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷০

কয়েকটি ছোট কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। লেখক সুকবি ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই লক্ষিত হয় ভাবের গভীরতা ও ছন্দের মাধুর্য্য। এই গভীরতা ও মাধুর্য্য ধার করা নয়, কবিহৃদয়ের অন্তরতম গুহায় ইহাদের সৃষ্টি। 'অন্ধকার' 'নীহারিকা' 'একটি দোল' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা একাধারে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।

আন্তরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি যাহা চিরকালের আদর্শকে জীবন্ত করিয়া তোলে—যাহা পুরাতনকেও চিরনূতন করিয়া রাখে, তাহারও আস্বাদ আমরা অনেক স্থলে লাভ করিয়াছি। 'বাণী বন্দনা', 'দেশবন্ধু' 'একটি উপমা' 'হৈমন্তী' 'তপস্বিনী' 'ভারত' 'হিমালয়' প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাণের আবেগ সামান্য একটি জিনিস যা সামান্য একটি ভাবকে অনেকস্থলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির দৃষ্টান্ত অনেক স্থলে লক্ষিত হয়।

কবির কবিত্ব আধুনিক যুগের নব নব ভাবের তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার কবিত্বের ভিত্তি বাঙ্গালীর চিরপুরাতন হৃদয়াবেগ—কখনও ভক্তি, কখনও কারুণ্য, কখনও বা প্রেমের আলোকে তাহার সরস অভিব্যক্তি। শুধু বৈচিত্র্যের দ্বারা, নব নব তর্ক যুক্তির দ্বারা, তিনি একটা মতবাদের সৃষ্টি করিতে গিয়া কবিত্বের অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহার ভাব সরল, প্রসন্ন ও সরস। তিনি পুরাতনকে যেন নূতনের এবং নূতনকে পুরাতনের আলোকে রঞ্জিত করিয়াছেন। প্রাচীন উন্নত সাহিত্যের পবিত্রতা ও আধুনিক সাহিত্যের অভিনবত্ব তাঁহার রচনায় সুন্দর ভাবেই সমন্বিত হইয়াছে।

কবির ভাবমাধুর্য্যের কয়েকটি নমুনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। 'বৌদিদি'কে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন :—

> দাদা আমার দৈবাগত, বৌদি তুমি নূতন পাওয়া,
> হাস্‌নাহানার কুঞ্জবনে ফুল ফুটাল দখিন হাওয়া॥

অল্প কথায় এমন হৃদয়গ্রাহী চিত্র কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

যতীন্দ্রমোহন স্বভাবের কবি হইলেও আলোচ্য কাব্যে মনুষ্য চরিত্রের যেটুকু তাঁহার নিপুণ তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও প্রকৃতিজাত—সরল ভাবে অতুলনীয়—আধুনিক মানব সমাজের, অন্ততঃ নাগরিকদের, জটিল কৃত্রিম যন্ত্রচালিত জীবনের ঘর্ঘর তাহাতে প্রতিধ্বনিত হয় নাই।

কবির প্রাণের আকুতি বোধ হয় দুটি ছোট কবিতায় ধরা পড়িয়াছে। আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

> তুমি ধরা কোনো দিন দিবেনাক সে ত জানি
> তবু ধরিতে তোমারে ধরে রাখি এ জীবন ;

তাই বাতাসে বাড়ায়ে কামনার বাহু খানি
আমি মেলে বসে থাকি মরমের দুনয়ন।
ওগো চিরচাওয়া ওগো অপাওয়া আমার প্রিয়া
জানি তোমায় আমার মিলন বন্ধু মরণের পথ দিয়া।
(অধরা)

যত দিন ছিনু আমি ততদিন চাহিনি ও মুখে
আমি হারা অন্ধকারে আজি তুমি হাসিছ সম্মুখে।

—দর্শন ও কাব্যের মধুর সংমিশ্রণ।

গ্রন্থখানির ছাপা, কাগজ ও বহিরবয়ব সুন্দর।

অমিয়

গল্প গ্রন্থ। শ্রীমতী তমাললতা বসু প্রণীত। প্রকাশক—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। সিল্কে বাঁধাই, মূল্য ১।০

এই বইখানি আমরা ভয়ে ভয়েই পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। একে ত স্ত্রীলোকের লেখা, তারপর নামটিও সুপরিচিত নয়। কিন্তু গল্প গুলি, একটির পর একটি পড়িয়া, বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। আজকালকার অধিকাংশ ছোট গল্পের মত, সেই মামুলি থোড় বড়ি খাড়া এবং খাড়া বড়ি থোড় ইহা নহে। প্রায় প্রত্যেক গল্পেই একটা তৃপ্তিজনক নূতনত্ব (freshness) আছে। অনর্থক উচ্ছাস, বৃথা হা হুতাশ, জ্যাঠামি পূর্ণ বক্তৃতা কোথাও নাই। সর্ব্বোপরি আমাদের ভাল লাগিয়াছে, লেখিকার প্লট রচনার সুকৌশল। কোন কোন গল্পে, গোড়ার দিকটায় মনে হইয়াছে বটে,—এটা ত অমুক প্রসিদ্ধ লেখকের একটা গল্পের ছায়া,—তার পর দেখি, লেখিকা এমন কৌশলে মোড় ঘুরাইয়া লইয়াছেন যে, শেষ করিয়া বলিতে হইয়াছে,—বাঃ, বেশ ত!

এই খানিই বোধ হয় লেখিকা মহাশয়ার প্রথম গ্রন্থ। তাঁর প্রতি আমাদের অনুরোধ, চর্চ্চাটুকু ছাড়িবেন না। অভ্যাসে, তাঁহার হাত আরও মিঠা হইবে,—বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে অনেক আনন্দ তিনি দিতে পারিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র নববর্ষ ফাল্গুন মাসে আরম্ভ হইলেও, হিন্দুর নববর্ষ বৈশাখ মাসেই আরম্ভ হয়। তাই এই নববর্ষের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমরা দেশের নরনারীকে আমাদের শুভ কামনা জানাইতেছি। যাঁহারা আমাদের কোনও প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, যে সকল সাহিত্যরথীর সাহায্য আমরা লাভ করিয়াছি, আজ এই নববর্ষের দিনে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতেছি। যাঁহারা আমাদিগের সমালোচনা করিয়াছেন, ন্যায় হউক আর অন্যায় হউক আমাদের দোষ ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা ছোট বড়র বিচার করি না, যাঁহারা বঙ্গবাণীর পূজার জন্য যথাসাধ্য সম্ভার লইয়া উপস্থিত হন, আমরা তাঁহাদিগকেই সাদরে বরণ করিয়া লইয়া থাকি; সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসনাকেই আমরা সাহিত্য-সেবার প্রধান সাধনা বলিয়া মনে করি। এই সাধন পথে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন, আজ এই নববর্ষে ভগবানের নিকট তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করি।

—:—

আজকাল চারিদিকে শিক্ষায়তনে ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষের ভিতর গুরুতর গোলযোগের কথা শোনা যাইতেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে যে উৎপাত হইয়া গিয়াছে, তার পর সিটি কলেজ ও স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে হুলুস্থুলু কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। এ সব ব্যাপারের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া উভয় পক্ষের কার কোথায় দোষ তাহা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ আমাদের বিবেচনায় ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর গোলযোগ তাঁদের নিজেদের ভিতর মিটাইয়া লওয়াই উচিত। এ সম্বন্ধে বাহিরের লোক হস্তার্পণ করিয়া কেবল মাত্র বিবাদ বৃদ্ধি করিয়া মোটের উপর ছাত্রদেরই ক্ষতি করিয়া থাকেন।

সাধারণ ভাবে এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা গোটাকয়েক কথা বলিতে চাই। আমাদের এ বিষয়ে

যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় যে ছাত্র ও শিক্ষক বা কর্ত্তৃপক্ষের ভিতর এই সব বিরোধ হওয়া সম্ভব হয় কেবলমাত্র পরস্পরের ভিতর ভাবের স্বচ্ছন্দ আদান প্রদান ও প্রকৃত আত্মীয়তার অভাবে। যেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রকৃত আত্মীয়তা থাকে, সেখানে পরস্পরের মনোভাব সম্বন্ধে অযথা সন্দেহ জন্মিতে পারে না, পরস্পরের কার্য্যের কদর্থ করা সহজ হয় না—কাযেই মতভেদ যতই অধিক হউক, প্রকৃত বিরোধ হইতে পারে না। সুতরাং এমন স্থলে ঝগড়াঝাঁটি সহজেই আপোসে মিটিয়া যায়। কলিকাতায় কলেজে ও ছাত্রাবাসে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিতর এই স্বচ্ছন্দ আদান প্রদান নাই বলিলেও চলে। ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনা ছাড়া বেশীর ভাগ ছেলের অধ্যাপকের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নাই। তা ছাড়া খেলার মাঠে, তর্ক সভায় বা অন্যান্য প্রকারে শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতার অবসর ঘটা সহজ হইয়া ওঠে না। তাঁদের পরিচয়টা যদি একটু নিবিড় হইত, তবে ছাত্রগণের যৌবনোচ্ছ্বাসে অযথা দুরভিসন্ধি আরোপ করিয়া শিক্ষকগণ ক্ষিপ্ত হইতেন না, এবং শিক্ষকদের সহজ শাসন চেষ্টার ভিতর গভীরতর দুষ্টাভিসন্ধি আরোপ করিয়া ছাত্রগণ অস্থির হইয়া উঠিত না। আর এই পরস্পর সন্দেহের সুযোগ লইয়া দুষ্টলোক মিথ্যা গুজবের সৃষ্টি করিয়া বিরোধ বাড়াইয়া তুলিতে পারিত না।

যেখানে যে গোলযোগ হইয়াছে, সেখানে তার কি প্রতিকার করিতে হইবে সে কথাটা খুব বড় কথা নয়। সে সমস্যার সমাধান দুই চারি দিনের মধ্যে—যখন বিরোধের তাপ কমিয়া আসিবে—তখন আপনি ঘটিয়া যাইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তার চেয়ে গুরুতর সমস্যা এই যে, কিরূপে এই সব বিরোধের বীজটা নির্ম্মূল করা যায়। আর, সে সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের উদাসীন হইয়া থাকিবার সময় নাই। কেন না ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে সহজ সহানুভূতি না থাকিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে না। শিক্ষাটাই যদি বিদ্যামন্দিরের চরম লক্ষ্য হয় তবে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এই স্বচ্ছন্দ আদান প্রদানের অন্তরায় দূর করিয়া পরিপূর্ণ আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা সর্ব্বথা করা উচিত।

আমাদের দেশে, কি গভর্ণমেণ্ট কি দেশের নেতৃগণ, সবাই আমাদের ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়কে ঘুঁটি করিয়া তাঁদের রাজনৈতিক খেলা খেলিতে ভালবাসেন। তাতে খেলায় রং ধরে বটে, কিন্তু ঘুঁটির উপকার হয় না। ভাতে চিন্তার কথা এই যে, এ ঘুঁটিগুলি শুধু ঘুঁটি নয়, এরা আমাদের ভবিষ্যৎ। যাদের পরিপূর্ণ পরিণতি লাভটা জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাদের জীবন ও অদৃষ্ট লইয়া এ খেলার পক্ষপাতী আমরা নই। সুতরাং যাতে তাদের এই সর্ব্বনাশকর খেলা হইতে রক্ষা করা যায় সেটা খুব বেশী ভাবিবার কথা।

আমাদের শিক্ষা মন্দিরে যুবকবৃন্দের জীবন ও চরিত্র যাতে ঠিক সুন্দর ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে—এবং যাতে তারা দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিলাভের জন্য তাদের সমুদয় শক্তি খুব কার্য্যকরী ভাবে নিযুক্ত করিতে পারে, সেইটাই আমাদের ভাবিবার কথা। এই সব ক্ষুদ্র বিপ্লব তাদের সেই পরিণতি লাভের অন্তরায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষায়তনের কর্ত্তৃপক্ষদের এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি। শিষ্য ও গুরুর ভিতর নিবিড়তর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই সব অযথা শক্তিক্ষয়কর বিপ্লব নিবারিত হইতে পারে, ছাত্রগণের প্রকৃত চরিত্র-গঠন ও কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধিও হইতে পারে।

এটা অনেকটা ব্যক্তিগত গুণের উপর নির্ভর করে। শিক্ষক মাত্রেই ইচ্ছা করিলেই শিক্ষিতদের প্রকৃত গুরু—Guide, philosopher and friend—হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁদের ভিতর এ স্বভাবদত্ত শক্তি আছে, তাঁদেরও বর্ত্তমান অবস্থায় সেই সহজ শক্তির দ্বারা শিষ্যের জীবন গঠন করা সহজ হয় না। কেন না কলিকাতা বিস্তীর্ণ পরিসর। ছাত্রদের একত্র সম্মিলনের অবসর সঙ্কীর্ণ, চিত্ত বিক্ষেপের এত প্রচুর আয়োজনের মধ্যে ছাত্রগণের সঙ্গে শিক্ষকদের প্রকৃত পরিচয় প্রতিষ্ঠা

খুব বেশী কঠিন হইয়া পড়ে। কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায় এ দিকে সামান্য একটু সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু ছাত্রাবাসের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্কের অভাব তাদের উপকারিতার অন্তরায় হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের হষ্টেলে ছাত্রদের ভারপ্রাপ্ত Warden আছেন—এ অবস্থায় তাঁদের সম্পর্ক নিবিড় হইবার কথা নয়। যদি সত্য সত্য শিষ্য ও গুরুর ভিতর নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় হয়, তবে আমাদের মনে হয় যে, ছাত্রাবাসের সঙ্গে সঙ্গে তার আশে পাশে শিক্ষকদের আবাসগৃহ* প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, শিক্ষকের গৃহ ছাত্রদের পক্ষে সমধিগম্য হওয়া দরকার, আর ছাত্রদিগকে সর্ব্ববিধ সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়া তাদের সহজ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁদের শিক্ষায়তনের দ্বারা প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। শিক্ষক ও ছাত্রদের পাশাপাশি বাসের আয়োজন না করিলে ইহার কোনওটিই সম্ভব নয়। আশা করি আমাদের শিক্ষা-মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করিবেন।

যে সব কলেজে গোলযোগ ঘটিয়াছে সেগুলির সম্বন্ধে একটা কথা আমরা বিশেষ করিয়া না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে যদি কোনও গোলোযোগ হয়, তবে সবারই চেষ্টা হওয়া উচিত কিসে বিরোধ মিটিয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি কলেজঘটিত বিরোধেই দেখিতে পাই যে, যেই কলেজে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে, অমনি সে কলেজের বহির্ভূত কতকগুলি লোক জুটিয়া স্ফুলিঙ্গটাকে ফুঁ দিয়া অগ্নি জ্বালিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এ অপকার্য্যে যাঁরা উৎসাহী, তার মধ্যে অন্য কলেজের দুই একটি অধ্যাপকও আছেন। এক কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে অপর কলেজের বিরোধে হাত দিয়া সেই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন চেষ্টায় মঙ্গলের কথা কিছুই নাই—পক্ষান্তরে বিষয়টা বড় দৃষ্টিকটু।

সম্প্রতি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে একটা ইস্তাহার জারী হইয়াছে যে, পাটের আবাদ কমাইতে হইবে। কংগ্রেস কমিটি যে এতবড় একটা গুরুতর অর্থ-নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে হঠাৎ একটা দ্রুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়াছি। একথা খুবই সম্ভব যে বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষকদের হিতার্থে পাটের আবাদ কমান দরকার। কিন্তু এ কথা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া—অন্ততঃ গত বিশবৎসরের সমুদয় অর্থনৈতিক অবস্থা গভীর ভাবে আলোচনা না করিয়া—সিদ্ধান্ত করা একেবারেই অসম্ভব। সেরূপ আলোচনা কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই, করিয়া থাকিলেও সে আলোচনার ফল সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। বিষয়টা অর্থনীতিশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আলোচনা না হওয়া পর্য্যন্ত, অনভিজ্ঞদের এ সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করাও আমাদের কাছে গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কারণ পাটের কথাটা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর যেটুকু সম্পদ আছে, তার খুব বেশীর ভাগটা আসে পাট হইতে। পাটের বাজারের তেজী মন্দায় বাঙ্গালার দীন গৃহস্থ হইতে প্রাসাদবাসী ধনী পর্য্যন্ত সকলের অবস্থায় গুরুতর বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। সুতরাং বাঙ্গলার ভাত কাপড়ের প্রধান সম্বল এই পাট লইয়া এত হালকা ভাবে আলোচনাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। একটা সামান্য হিসাবের ভুলে হয়ত সমগ্র জাতির গুরুতর অমঙ্গল হইতে পারে।

পাটের স্বার্থ আছে প্রজার, সে পাট উৎপাদন করে; স্বার্থ আছে জমীদারের, তিনি তাহা হইতে খাজনা পান; স্বার্থ আছে ঋণদাতার, কৃষকের ঋণ শোধের সম্বল পাট; স্বার্থ আছে ফড়িয়া হইতে baler পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে ব্যবসাদারের, স্বার্থ আছে মিল ওয়ালার—ডাণ্ডীর ও বাঙ্গলার—আর সমগ্র জগৎজোড়া চটের খরিদ্দারের। এ সব স্বার্থ পরস্পরের সম্পূর্ণ অনুকূল নয়, অনেক স্থলেই এ স্বার্থের বিরোধ গুরুতর। যাতে একের উপকার হয় তাতে অপরের অনিষ্ট। পাটের আবাদ যদি হঠাৎ কমিয়া যায়, তাতে লাভ হইবে ব্যবসায়ীর যারা মন্দার বাজারে বহু পরিমাণে পাট কিনিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু

তাতে প্রজার কি ক্ষতিবৃদ্ধি সেটা গুরুতর বিচার সাপেক্ষ। সে বিচার যখন হয় নাই, তখন এ বিষয়ে ফট্ করিয়া এমনি একটা ইস্তাহার জারী করিয়া কংগ্রেস কমিটি ভাল করেন নাই। এটা পলিটিক্সের ব্যাপার নয়—ব্যাপার ইকনমিক্সের, বাঙ্গলার আর্থিক ও সামাজিক বহু সমস্যা ইহার সহিত বিজড়িত।

পাটের আবাদ ও ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিবার ও করিবার কায আছে। এক কায এই ব্যবসাটার অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিশদ আলোচনা—এটা প্রকাণ্ড কায। সমস্ত বাঙ্গালা দেশের পাটের চাষীদের সংঘবদ্ধ করিয়া ক্রমে দেশব্যাপী পাটের এক বিরাট সমবায় প্রতিষ্ঠা—যাহা সমস্ত জগতের সঙ্গে চাষীর হইয়া পাটের কারবার চালাইবে। এ সম্বন্ধে সামান্য কিছু চেষ্টা হইতেছে কোনও কোনও স্থানে কো-অপারেটিভ সোসাইটির দ্বারা। এই অনুষ্ঠানের উপকারিতা সম্বন্ধে বিচারের অবসর না-, ইহার পূর্ণ পরিণতি লাভ হইলে ইহার দ্বারা বাঙ্গলা দেশের সার্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধি সাধিত হইবে তাতেও সন্দেহ নাই। অথচ সমগ্র বাঙ্গলার মুখপত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পাটের কথা ভাবিতে গিয়া এ দুই কাযের একটিতেও হাত দিবার কথা ভাবিলেন না। করিলেন এমন একটা কায যেটা অত্যন্ত সহজ—কেন না ইহাতে করিতে হয় সুধু একটা রেজল্যুসন—অথচ করা অত্যন্ত কঠিন—এবং হয়তো দেশের প্রকৃত মঙ্গলের পক্ষে অনুকূল নাও হইতে পারে। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে এমন হঠকারিতা হয়তো চলিতে পারে, কিংবা হয়তো ইহাই একমাত্র সমীচীন পন্থা হইতে পারে। কিন্তু দেশের ভাত কাপড়ের কথা লইয়া এমন খেলা দেখিয়া আমাদের মনে আতঙ্ক হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলিকাতা বাদুড় বাগানের বাসগৃহখানি সত্য সত্যই এতদিন পরে লোপ পাইল। একজন ধনী মাড়োয়ারী ঐ বাড়ীখানি সম্প্রতি ৭৫ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। তিনি ঐ পুরাতন গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কয়েকখানি নূতন বাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়া দিবেন। বাঙ্গালা দেশে এত ধনী থাকিতে, এত দেশনেতা থাকিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীখানি রক্ষা করা গেল না, ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাড়ী খানি ক্রয় করিয়া বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার কথা উঠিয়াছিল এবং সে জন্য সামান্য চেষ্টাও হইয়াছিল; কিন্তু কেহই এই ব্যাপারে তেমন ভাবে অগ্রসর হইলেন না; চেষ্টাও বিফল হইল। আমাদের মনে হয়, এখনও যদি দেশের লোক অগ্রসর হন, তাহা হইলে উক্ত মাড়োয়ারী মহাশয় ৭৫ হাজার টাকা পাইলে বাড়ীখানি ছাড়িয়া দিতে পারেন এবং আমাদের কলঙ্ক-মোচন হয়। আর যদি তাহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে আমরা বলি, একদিন একটা শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া গোলদীঘিতে স্থাপিত প্রস্তর মূর্ত্তি ও বিদ্যাসাগরের গৃহের প্রাচীর সংলগ্ন প্রস্তর ফলক গঙ্গায় বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করা হউক। তাহা হইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইবে!

প্রসিদ্ধ শিক্ষক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে-দিন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে কিছু দিন ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনরি সোসাইটীর কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তাহার পর ইং ১৮৮৫ সালে তিনি কলিকাতায় 'নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল' নামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে তাহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন; পরে উপযুক্ত শিক্ষকদিগের হস্তে বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার 'কম্পোজিসন' ও 'ট্রান্স্লেশন' নামক পুস্তকদ্বয় পড়েন নাই, ইংরাজী শিক্ষিত এমন লোক নাই বলিলেই চলে। গঙ্গাধর বাবু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে ছিলেন; ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াও তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই, সুদীর্ঘ জীবনকাল তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়ই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যে "নববিভাকর" পত্রিকা এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের

সংবাদ পত্র মহলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, গঙ্গাধর বাবু তাহার পরিচালকবর্গের অন্যতম ছিলেন। এই পত্রিকা পরিচালনের জন্যই তিনি 'নববিভাকর' প্রেস স্থাপিত করেন। এখনও সে প্রেস চলিতেছে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল'ও এখনও কলিকাতার বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে। গঙ্গাধর বাবুর অনেক ছাত্র এখনও তাঁহাকে ভক্তিভরে স্মরণ করিয়া থাকে। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালা দেশের একজন সেকেলে আদর্শ শিক্ষকের স্থান শূন্য হইল।

আরও একটী বিয়োগ সংবাদ আমাদের লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও পণ্ডিত, কলিকাতা 'সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণ স্বরূপ গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয় অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। যখন বাঙ্গালা দেশে স্বদেশীর বন্যা আসিয়াছিল, তখন দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশী পতাকা-তলে যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, গীষ্পতি বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির বান ডাকিয়া উঠিত। গীষ্পতি বাবুর প্রশান্ত পাণ্ডিত্য, তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার দেশ-হিতৈষণা তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। যতদিন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন গীষ্পতি বাবুর নাম পণ্ডিত সমাজে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির অকালে পরলোক গমনে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভগবান্ তাঁহার শোক সন্তপ্ত আত্মীয়গণের এই গভীর শোকে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

কলিকাতায় এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দুইটী—দুইটাই বা বলি কেন, তিনটী স্মৃতি-সভা হইয়া গেল; তবে, তাহার মধ্যে একটীকে স্মৃতিসভা না বলিয়া শোক-সভা বলাই সঙ্গত। মাননীয় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পরলোকগমনে সেদিন শোক-সভার অধিবেশন হইয়া গেল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। অপর দুইটী স্মৃতি-সভার মধ্যে একটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ব্যোমকেশ মুস্তোফি মহাশয়ের, অপরটি সাহিত্য-সম্রাট্, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের দিনের স্মৃতি-সভা। দুইটী সভাই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক আহূত হইয়াছিল। ব্যোমকেশ স্মৃতি-সভার সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, আর বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি-সভার সম্পাদক হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। এই কয়েকটী সভাতেই বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল। পরলোকগত মহাত্মদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জাতীয় মহত্বই প্রকটিত হয়। এই ভাবে এক মৃত কবির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন উপলক্ষে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন, "আর বাঙ্গালীর ভয় নাই, বাঙ্গালী কবি, এখন মৃত বাঙ্গালী কবির জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছে।"

এতদিন পরে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্তৃত্বভার স্বরাজিদিগের অধিকারচ্যুত হইল। নূতন মিউনিসিপাল আইন প্রবর্ত্তনের সময় হইতে এই কয়েক বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কার্য্য স্বরাজি দলই পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন; স্বরাজ দলের নেতা পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রথম মেয়র নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার পরলোক গমনের পর ঐ দলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় মেয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবারও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে উক্ত দল মেয়র পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন; তাঁহারা এজন্য চেষ্টারও ত্রুটী করেন নাই, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে নরম দলের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় মেয়র পদ লাভ করিয়াছেন এবং

তাঁহার দলের অধিকাংশ ব্যক্তিই বিভিন্ন বিভাগের পরিচালন সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্বরাজ দলের এই পরাজয়ে অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন, আবার অনেকে খুসীও হইয়াছেন। ভোটে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত; যাঁহারা অধিক জোগাড় করিতে পারেন, অধিক হাঁটাহাঁটি, তোষামোদ করিতে পারেন, তাঁহাদেরই জয় হয়। স্বরাজ দল এতদিন বেশ সঙ্ঘবদ্ধ ছিলেন; তাই তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছিলেন; এখন অপর দল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদেরই জয় হইল। কিন্তু এই ব্যাপারে যাঁহারা অত্যন্ত উগ্র হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না। এ সকল ভোটের খেলা। এ খেলাকে খেলোয়াড়ের মনোভাব লইয়া,অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে sportsman spirit বলে, সেই ভাবে গ্রহণ করাই বিধেয়; গালাগালি, ছিদ্রান্বেষণ, কুৎসাপ্রচার দ্বারা প্রকৃত কাযের ক্ষতিই হয়। আর, এক দলই যে দীর্ঘকাল কর্তৃত্ব করিবেন, ইহা ঠিকও নহে, অন্য দলের কার্য্যকরী শক্তিরও পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। আমরা আশা করি নব-নির্ব্বাচিত মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

(বালিকার রচনা)

সাংখ্য দর্শনে চতুর্ব্বিংশতি দৃশ্য তত্ত্ব এবং পুরুষ বা দ্রষ্টা এই মোট পঁচিশটি তত্ত্ব গণিত হইয়াছে। এইরূপ সংখ্যা করা হয় বলিয়া এবং সম্যক্ ব্যাখ্যাত হয় বলিয়া ইহার নাম সাংখ্য।

পরমর্ষি কপিলদেব মনুষ্য সমাজের দুঃখ দেখিয়া তাহা হইতে তাহাদের চিরকালের জন্য পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে এই সাংখ্যদর্শনের উপদেশ করিয়াছেন।

দ্রষ্টা ছাড়া আর ২৪টী তত্ত্ব দৃশ্যপদার্থ। প্রথমে দৃশ্যের গুণ কি এবং কি উপাদানে তাহারা নির্ম্মিত, তাহা বলা আবশ্যক। দৃশ্য—জ্ঞেয় পদার্থ অচেতন ও বিকারী এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ নির্ম্মিত। প্রাণী মাত্রেই (এবং অপ্রাণীরাও) এই পঁচিশ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। তত্ত্বগুলি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

পঞ্চভূত। (১) ক্ষিতি, (২) অপ্ (৩) তেজ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ।

পঞ্চতন্মাত্র। (৬) শব্দ তন্মাত্র, (৭) স্পর্শ তন্মাত্র, (৮) গন্ধ তন্মাত্র, (৯) রূপ তন্মাত্র, (১০) রস তন্মাত্র।—তন্মাত্র অর্থে তৎ-মাত্র খুব সূক্ষ্ম অণু বাহ্যজ্ঞান মাত্র। এই সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টিই স্থূল পঞ্চভূতের শব্দজ্ঞান স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদির উপাদান।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। (১১) কর্ণ, (১২) চক্ষু, (১৩) জিহ্বা, (১৪) নাসিকা (১৫) ত্বক।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়। (১৬) বাক্, (১৭) পাণি (১৮) পাদ, (১৯) পায়ু, (২০) উপস্থ। (২১) মন, (২২) অহঙ্কার, (২৩) বুদ্ধি (২৪) প্রকৃতি। সর্ব্বশেষে—(২৫) দ্রষ্টা।

মন। মন বা অন্তঃকরণ সকল রূপ জ্ঞান চেষ্টা ও সংস্কারের আধার। যে কোন বস্তু দর্শন করিয়া বা কাহারও বাক্য শ্রবণ করিয়া মনেই তাহার ছাপ পড়ে, সেই ছাপকে সংস্কার বলে এবং

মনেই তাহা সঞ্চিত হয় বলিয়া ইহা সকল রূপ সংস্কারের আধার। পঞ্চ বাহ্য ইন্দ্রিয় ছাড়া এই মন অন্তর-ইন্দ্রিয়। ইহা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ইহার দ্বারা আমরা সকল বিষয় জানি, কল্পনা করি ও চিন্তা করি। অন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয় গণের দ্বারা যে সব বিষয় অনুভূত হয়, সেই পূর্ব্ব-অনুভূত বিষয় গুলির ছাপ পড়িয়া থাকে ও সেই ছাপ স্মৃতি জ্ঞান রূপে উদিত হইয়া (সংস্কারের জাত ভাব স্মৃতি) মনের কল্পনীয় ও চিন্তনীয় বিষয় হয়। এইরূপে মন সমস্ত জ্ঞানের, ইচ্ছা কল্পনাদি চেষ্টায় এবং সংস্কার ধারণের শক্তি। উহার মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কারের অংশের নাম চিত্ত এবং চেষ্টা অংশের নাম সঙ্কল্পক মন।

অহঙ্কার। অহঙ্কারের গুণ অভিমান বা অস্মিতা। এই অস্মিতা দুইপ্রকার, "অহন্তা", "মমতা"। অহন্তা= 'আমি এরূপ', 'আমি ওরূপ' ভাব। অর্থাৎ "আমি ধনী" "আমি দরিদ্র" ইত্যাদি। মমতা='আমার' 'আমার' ভাব। "আমার শরীর" "আমার বাড়ী ঘর" ইত্যাদি।

অস্মিতার এই ভাবই দৃশ্যমিশ্রিত। অতএব বিবেক জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি হইবার পূর্ব্বে আমাদের অবি-শুদ্ধ বুদ্ধি বিষয়জ্ঞানে পূর্ণ থাকে এবং পৃথক্ দ্রষ্টাকে ও দৃশ্যকে মিশাইয়া এক পদার্থ মনে করায়। তাহাই সাধারণ আমিত্বজ্ঞান। দ্রষ্টা-দৃশ্যের পৃথক্ জ্ঞানকে বিবেকজ্ঞান বলে।

বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। সকল সুখ দুঃখ ভাল মন্দ—এই সবের জ্ঞান চিত্তরূপে পরিণত বুদ্ধির দ্বারা হয়। এইসকল বিষয়জ্ঞান যখন হইতেছে তখন বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। কিন্তু ধ্যানের দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি হইয়া যে "অস্মিতা মাত্র" বা "আমি মাত্র" জ্ঞানে স্থিতি হয়, তাহা শুদ্ধ আমিত্ব বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। উহাতে উপনীত হইলেই মহতের উপলব্ধি হয়। তৎপরে বিবেকদ্বারা দ্রষ্টা দৃশ্যের পৃথক্‌জ্ঞান-সম্পন্ন বুদ্ধি পুরুষজ্ঞানে পূর্ণ বা "আমি আমাকে জানি" এই মাত্র ভাবে পূর্ণ থাকে বলিয়া বুদ্ধি তখন পুরুষাকারা। এই বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিলে সকল মোহ ও অবিদ্যার নাশ হয়। এবং 'সত্য' সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান হয়। এই বুদ্ধি সর্ব্ব জ্ঞানের আধার বলিয়া ইহা সত্ত্বপ্রধান, সেইজন্য ইহাতে অবস্থিতি করিলে চিত্ত সত্ত্বপ্রধান হইয়া তাহার অন্য দুই গুণের বৃত্তির তখন নাশ হয়।

এই বুদ্ধি পর্য্যন্ত ১৩টী দৃশ্যকে আবার তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—গ্রাহ্য=যাহা গ্রহণ করা যায়। পঞ্চভূত ও তন্মাত্র আদি। গ্রহণ=সমস্ত করণ বর্গ, যাহার দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তগ্রাহ্য বিষয় সকল গ্রহণ করা যায়। মন হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল 'গ্রহণ'। গ্রহীতা=যিনি গ্রহণ করেন। এই গ্রহীতার অস্মিতামাত্রের জ্ঞানই মহত্তত্ত্বে উপলব্ধি হয়। "আমি জানিয়াছি", "আমি গ্রহণ করিয়াছি", "এই বাহ্য বস্তুসকল আমা হইতে পৃথক্"—এই সকল জ্ঞানের কেন্দ্র গ্রহীতা। ধ্যানে ইহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়।

প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী, কারণ ইহাও দৃশ্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সমান এই তিনগুণ প্রকৃতি। সকল দৃশ্য বস্তু এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রকৃতির দুই প্রকার অবস্থা—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। যখন এই তিনগুণ প্রকৃতির কোন কার্য্যের মধ্যে কম বেশী থাকে, বা সাম্যাবস্থা থাকে না, তখন প্রকৃতি ব্যক্ত। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইলে বা এই ত্রিগুণের সমভাব হইলে প্রকৃতির তখন কোনরূপ চাঞ্চল্য থাকে না এবং এই দৃশ্য প্রকৃতির সহিত দ্রষ্টার সংযোগ-জনিত এই গ্রহীতারূপ ভ্রান্তিজ্ঞান দূরীভূত হইয়া দ্রষ্টার স্বরূপে স্থিতি হয়। অর্থাৎ এই সকল দৃশ্য হইতে তখন সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হইয়া দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হইলে প্রকৃতি অব্যক্ত হয়। এই দৃশ্য সকল হইতে সম্পূর্ণ অমুক্ত ও বিবেকজ্ঞান হইতেও (কেন না উহাও দৃশ্য) মুক্ত না হইলে প্রকৃতি তখনও ব্যক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ এই বিবেক-জ্ঞানকে পরবৈরাগ্যের দ্বারা ত্যাগ করিলে দ্রষ্টায় স্থিতি হয় এবং প্রকৃতিও অব্যক্ত হইয়া যায়। এই বিবেক-জ্ঞানকে যে রুদ্ধ করিবে তাহার নিকট প্রকৃতি অব্যক্ত। অতএব প্রকৃতি কাহারও নিকট ব্যক্ত এবং কাহারও নিকট অব্যক্ত।

এই ২৪টি দৃশ্য হইল।

দ্রষ্টা। এই সকলের উপরে দ্রষ্টা আছেন। দ্রষ্টা অর্থে যিনি জানেন। তিনি সকল বস্তুরই জ্ঞাতা বা বেত্তা। জ্ঞেয় বস্তু বেদ্য বা জড়। এই বেত্তা হইতে সকল বেদ্য বস্তু চেতনা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বে যে "অস্মিতা মাত্র" জ্ঞান—এই দ্রষ্টার জন্যই সেই জ্ঞান হয়, কারণ দ্রষ্টা বুদ্ধিকেও জানেন। দ্রষ্টা নিজেকেও নিজে জানেন সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহাকে জানাইবার আর কিছুর সাহায্যের প্রয়োজন করে না, কারণ তিনি চিৎ, অচেতন দৃশ্য নন।

তিনি নিরুপাধি, অধিকারী, অখণ্ড্য ও ত্রিগুণাতীত। এই সকলের বিপরীত গুণ দৃশ্যের আছে। এই দ্রষ্টাতে স্থিতিলাভ করিতে হইবে, তবেই শাশ্বতী শান্তির লাভ হইবে।

শ্রীবীণাপাণি দেবী।

*

পলাশ　তুলসী

সরোষে পলাশ কহে তুলসীরে ডাকি,
'বৃথা তুই আবর্জ্জনা এ জগতে থাকি।
মাঝে মাঝে হেরি তোর দুর্দ্দশা প্রচুর,
অপমান করে তোরে প্রভুর কুকুর!'

তুলসী হাসিয়া কহে, "যা বলিলে ঠিক,
নারায়ণ তুষ্ট কিন্তু আমাতে অধিক।
নারায়ণ বক্ষে, আর নারায়ণ পদে
স্থান মম, তুচ্ছ মানি রূপের সম্পদে!"

শ্রীসুরবালা বিশ্বাস।

গরীব স্বামী

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শঙ্কার বিষয়।

দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে পত্র আসিয়াছে, সহর হইতে বাহিরে, প্রায় "ঘুম" ষ্টেশনের কাছাকাছি, দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার মনের মত একটি বাড়ী পাইয়া, তাহা ভাড়া লইয়াছেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন, এবং অনুমান এক পক্ষ কাল পরেই দার্জ্জিলিঙ্গ যাত্রার জন্য ঊষাকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

মধুবাবু এই পত্রখানি লইয়া গিয়া স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া গৃহিণীর মনটি বিমর্ষ হইয়া গেল। কন্যাকে যে ছাড়িতে হইবে, উহা ত জানা কথাই। তবে, কবে ছাড়িতে হইবে, সেটা এতদিন অনির্দ্দিষ্ট ছিল,—এখন সেই সময়টা নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়াতে, আসন্ন কন্যা-বিরহে মাতৃহৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার হইল।

লীলা এ কয়দিন প্রত্যহই অপরাহ্নে দেবেন্দ্রবাবুর মোটরে এ বাড়ীতে আসিয়াছে। তাহার শিক্ষামত ঊষা তাহাকে লীলাদি' বলিয়া ডাকে। লীলার যাহা উদ্দেশ্য

ছিল তাহাও সফল হইয়াছে,—তাহার সহিত উষার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। গৃহিণীরও এখন লীলাকে আর ভয় করে না—তাহার জুতা মোজা, তাহার সাধুভাষা-বহুল সুমার্জ্জিত কথাবার্ত্তা সত্ত্বেও, তাহাকে এখন ঘরের মেয়েটির মতই তাঁর মনে হয়। কিছু খাইতে দিলে লীলা বিনা ওজরে—বরং একটু আগ্রহের সহিতই আহার করে। কেবল, গৃহিণীর অনুরোধ-সত্ত্বেও, পাণ ও চা সে খাইতে চাহে নাই। এই গতকল্য মাত্র, লীলা উষাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, সাহেব বাড়ী হইতে তাহার জন্য সুন্দর সুন্দর দুটি ফ্রক কিনিয়া দিয়াছে। এবং গৃহিণীর বিস্তর অনুনয় সত্ত্বেও, সে গুলির মূল্য লইতে সম্মত হয় নাই। আজ লীলা তিনটার সময় আসিয়া, গৃহিণী ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে লইয়া যাইবে স্থির আছে।

বেলা ১২টার মধ্যেই গৃহিণীর আহার শেষ হইয়া গেল। মধু বাবু তখন পালঙ্কের উপর শয্যায় হেলান দিয়া, দিবানিদ্রার আয়োজনে ধূমপান করিতেছেন। খোকা বিমল তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রিত। মাথার উপর বন্ বন্ করিয়া পাখা ঘুরিতেছে। পাণের ডিবা হাতে গৃহিণী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এখনও ঘুমোও নি ?"

"না, শুয়ে ছিলাম, ঘুম এল না, তাই উঠে আবার তামাক খাচ্চি।"

"কেন, রোজ ত ঘুমোও—আমি প্রায়ই খেয়ে এসে দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।"

মধুবাবু বলিলেন, "ঝি-চাকরদের খাওয়া হয়েছে ?"

"হাঁ, তাদের ভাত বেড়ে দিয়ে এসেছি।"

"সরি, উষা কোথায় ?"

"তারা যেখানে থাকে। তোমার খাওয়া হতে যে দেরী—তুমিও খেয়ে উপরে উঠলে, তারাও পাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে চলে গেল।"

"সকালে সকালে আসতে বলেছ ত ? চারটের সময় লীলা যে তোমাদের শিবপুরের বাগান দেখতে নিয়ে যাবে কথা আছে। ছেলে মেয়েদের সাজাতে গোজাতে হবে ত !"

"হাঁ, তিনটে বাজলেই বাড়ী আসতে তাদের বলে দিয়েছি। না আসে ত ঝিকে পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনাব এখন। তুমি এখন শোও দিকিন, আমিও ও ঘরে গিয়ে ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই। পাণ নেবে আর ?"

"দাও না হয় একটা"—বলিয়া মধুবাবু স্ত্রীর ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া মুখে দিলেন। গৃহিণী বসিয়া রহিলেন।

মধুবাবু বলিলেন, "তুমি আর দেরী করছ কেন ? শোওগে—আবার তিনটে বাজতেই উঠতে হবে ত ?"

"শোব এখন। তুমি ঘুমোও না। আজ খুব গরম, তাই বোধ হয় তোমার ঘুম আসছে না। পাখাটা একটু বাড়িয়ে দিই।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া, পাখার রেগুলেটর কিঞ্চিৎ সরাইয়া দিলেন। পাখা দ্রুততর বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণী আবার খাটে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই এস—তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

মধুবাবু বলিলেন, "পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে চাও, দাও। কিন্তু ঘুম বোধ হয় আজ আমার সহজে আসবে না। মনটা ত ভাল নেই। মেয়েটাকে ত নিয়ে চল্ল, শেষ ফল যে কি হবে, তা তো বুঝতে পারছি নে!"

গৃহিণী বলিলেন, "সে আর ভেবে কি করবে বল ? অদৃষ্টে যা আছে তাই তো হবে!"

মধুবাবু বলিলেন, "সে তো ঠিক। অদৃষ্ট ছাড়া যে পথ নেই, সে ত সকলেই জানে, কিন্তু মন বোঝে কৈ বল!"

গৃহিণী নীরবে স্বামীর পদযুগল সংবাহন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মধুবাবু বলিলেন, "ঐ লীলা মেয়েটি, তুমি ত এ ক'দিন ওর সঙ্গে মিশছ, ওর স্বভাব চরিত্র তোমার কেমন ব'লে বোধ হয় ?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন ?"

"বিশ বাইশ বছরের মেয়ে, এখনও বিয়ে হয় নি, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "মিশছি বটে, কিন্তু ওর ভিতরের খবর কি ক'রে জান্‌বো বল? সে, ওই জানে আর নারায়ণই জানেন। কথায়-বার্ত্তায় চাল-চলনে কিন্তু ওকে ত নষ্ট দুষ্ট মনে হয় না।"

মধুবাবু বলিলেন, "সেইটেই ত আরও ভাবনার বিষয় হয়েছে।"

গৃহিণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? কি ভাবে তুমি কথাটা বল্লে আমি বুঝলাম না।"

মধুবাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "স্বভাব চরিত্র ভাল, দেখতে শুনতেও মন্দটি নয়, খাসা লেখাপড়া জানে, বিশ বাইশ বছর বয়স, তার পাশে আমার মেয়েটি —বয়সকালে উষা বোধ হয় ঐ লীলার চেয়েও দেখতে শুন্‌তে ভালই হবে আচ্ছা, উষার রঙ কি লীলার চেয়ে ফর্সা নয়?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ ফর্সা বৈকি! ও বয়সে লীলার চেয়েও নিশ্চয়ই সুন্দরী হবে। লীলা ত শ্যামবর্ণ বল্লেই হয়, পাউডার ফাউডার মাখে বলেই যা হোক্ একটু দেখায়।"

মধুবাবু বলিলেন, "তা হলেও—বয়সের অনেকখানি তফাৎ কি না! কোথা তিরিশ, কোথা দশ!—আচ্ছা, এ কথাটা তোমার কি কোনও দিন মনে হয় নি যে, মেশামিশি করতে করতে, দেবেনের হয়ত ঐ লীলাকেই পছন্দ হয়ে যেতে পারে?—ও ত তখন লীলাকেই বিয়ে করতে চাইবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কথাটা যে একবারে আমার মনে হয় নি তা নয়। হয়েছে। সে রকম ঘটনাই যদি হয়, তা হলেও ত তার ব্যবস্থা দেবেন ক'রে রেখেছে। উষার বিয়ের জন্যে বিশ হাজার টাকা ত ওকে দিতে হবে। ভাল ঘর বর দেখে মেয়ের তখন বিয়ে দেওয়া যাবে।"

মধুবাবু বলিলেন, "তা তো জানি। কিন্তু সে ঘর-বর কি এ রকমটি হবে? দেবেন, ধর, একজন রাজা তুল্য ব্যক্তি। ভাল ঘর-বর হতে পারবে বটে, কিন্তু অত সুখ ঐশ্বর্য্য কি আর হবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "জানিনে, নারায়ণের মনে কি আছে! এখন থেকে সে সব কথা ভেবে কি হবে বল? আমার ঘুম পাচ্ছে—আমি যাই, একটু গড়াইগে। তুমিও একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। হ্যাঁ, একটা কথা। কাচ্ছা বাচ্ছা গুলিকে নিয়ে, সেই কোন্ নকায় যাব—তুমি শুদ্ধ গেলে হত না?"

মধুবাবু হাসিয়া বলিলেন, "লীলা তোমাদেরই নিয়ে যেতে চেয়েছে—আমাকে ত নিয়ে যাবে বলেনি! দেবেনের একজন দরোয়ান না হয় সঙ্গে যাক্। লীলাকে নিয়ে গাড়ী এলে, লীলাকে নামিয়ে, আমি শোফারকে ব'লে দেবো এখন, বাড়ী গিয়ে একজন দরোয়ানকে তুলে নিয়ে আস্‌বে।"

"যা হয় কোরো—আমি শুতে চল্লাম।"—বলিয়া গৃহিণী পালঙ্ক হইতে নামিয়া, পাশের ঘরে গিয়া, পাখা খুলিয়া শয়ন করিলেন।

লীলা যথা সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবেন বাবুর দরোয়ানকে আর আনিতে পাঠাইবার দরকার হইল না; সে নিজের বাড়ী হইতেই এক গালপাট্টাওয়ালা ভোজপুরী দ্বারবান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। চারিটা বাজিবার পূর্ব্বেই ইঁহাদের লইয়া শিবপুর যাত্রা করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার আয়োজন।

দেবেন্দ্রবাবু দার্জ্জিলিঙ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যাত্রার দিনস্থির হইয়াছে—২৭শে শ্রাবণ। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রবাবু, আসবাব-পত্র কিনিয়া, সে সব প্যাক করাইয়া দার্জ্জিলিঙে পাঠাইয়া দিতেছেন। একজন সরকার এবং একজন দ্বারবানকেও তিনি দার্জ্জিলিঙে পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা জিনিষ-পত্র গুলির ডিলিভারি লইয়া, যথা-সম্ভব সেগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবে।

দেবেন্দ্রবাবু একদিন শ্রীমতী হেমাঙ্গিনাকে সঙ্গে করিয়া মধুবাবুর গৃহে লইয়া আসিলেন।

গৃহিণী তাঁহাকে নিজ সমবয়স্কা—অথবা বয়োধিকা দেখিয়াই, মন খুলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে

লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনারা ত জাত টাত কিছুই মানেন না?"

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যে ব্রাহ্ম, মিসেস্ চাটার্জ্জি। আমরা বিশ্বাস করি, সকল মানুষই এক ঈশ্বরের সন্তান—তারা সকলেই এক জাত—ছোট বড় কেউ নেই।"

গৃহিণী বলিলেন, "না, সে কথা আমি জানি। আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, কোনও জাতের হাতের রান্না খেতেই ত আপনাদের আপত্তি নেই? মোছলমান টোছলমানের হাতেও আপনারা খান ত?—লীলাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বল্লে তাদের বাড়ীতে মোছলমান বাবুর্চ্চিতে রাঁধে।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "লীলারা অবশ্য দীক্ষিত ব্রাহ্ম নন্—তবু তাঁরাও জাতিভেদ মানেন না। আপনি কি জন্যে আমায় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি মিসেস্ চাটার্জ্জি। দার্জ্জিলিঙে আমাদের গৃহস্থালীতে হয়ত মুসলমান বাবুর্চ্চি খানসামা রাখা হবে, এই আপনার আশঙ্কা ত?—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।—আপনি কোনও কথা বলবার আগেই, দেবেন্দ্র-বাবু নিজেই ব্যবস্থা করেছেন যে, পাকের জন্যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকবে—সে ব্রাহ্মণ তিনি এইখান থেকেই পাঠাবেন—আর, কোনও রকম অহিন্দু খাদ্য—অর্থাৎ হিন্দুর পক্ষে যা অখাদ্য—তা সে বাড়ীতে ব্যবহার হবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ সেইটিই আমার ভয় ছিল বটে। কিন্তু দেবেন ত নিজেও ও-সব মানে টানে না। তার নিজের বাড়ীতে ব্রাহ্মণও আছে, বাবুর্চ্চিও আছে। যাক্—উষার জন্যে যে এ ব্যবস্থা সে করেছে, ভালই হয়েছে।"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "মিষ্টার বানার্জ্জি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি—এটুকু বিবেচনা কি আর তাঁর নেই?"

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী উষার সহিত আলাপ জমাইতেও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চশমা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া উষার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল—লীলাদি'র নিকট যত সহজে সে নিজেকে ধরা দিয়াছিল, ইঁহার নিকট সেরূপ পারিল না।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে, মধুবাবু বৈঠকখানা হইতে উপরে আসিলেন। আসিয়াই হাসিয়া তিনি বলিলেন, "কি গো মিসিস্ চাটুয্যে, কি সব কথাবার্ত্তা হল তোমাদের?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁগা, ও মাগী আমায় মিশি চাটুয্যে মিশি চাটুয্যে বলতে লাগলো কেন গা? আমার দাঁতে মিশি আছে, তাই দেখে?—আ মর!—মাগীর দেমাক ত কম নয়! আর তুমিই বা সে কথা শুনলে কি ক'রে?"

মধু বাবু বলিলেন, "উনি চলে গেলে উষা আমায় বল্লে, বাবা—তোমাকে যা বলে ও—তাঁর নতুন নাম হয়েছে কি জান? মিশি চাটুয্যে। আমি বল্লাম, না রে বেটি! মিশি নয় মিশি নয়—মিসিস্—বোধ হয় মিসিস্ চাটুয্যে ব'লে থাকবেন।"

"তা, ওর মানে কি?

"ওর মানে, বিবি চাটুয্যে। অর্থাৎ চাটুয্যে সায়েবের স্ত্রী—বিবি চাটুয্যে। ওঁরা বিবাহিতা স্ত্রীলোক মাত্রকেই ঐরকম নামেই ডাকেন কি না। সায়েবী ফ্যাশান!—বুঝলে না?"

গৃহিণী গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ও আমার কপাল! তুমিই চাটুয্যে সায়েব নাকি?—আ মরি! সায়েবের বালাই নিয়ে মরি।" বলিয়া গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "কিন্তু লীলা ত আমায় কোনও দিন ওরকম নামে ডাকে নি।"

"ডাকে নি, তার কারণ, এঁর চেয়ে লীলার কাণ্ড-জ্ঞান একটু বেশী আছে। দাঁতে মিশি উল্কিপরা নথ নাকে একজন গিন্নীবান্নীকে মিসিস চাটুয্যে বলতে লীলার বেধেছে আর কি!—কিন্তু দেবেন যে আজ আবার এক নতুন কথা ব'লে গেল।"

"কি নতুন কথা?"

"ও যখন প্রথমে দার্জ্জিলিঙে বাড়ী খুঁজতে যায়, তখন আমাকেও কোট পেণ্টুল পরিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়ে-

ছিল, তোমায় মনে আছে ত ? আবার সেই বায়না ধরেছে ! বলছিল, দেখুন, যাবার দিন উষা হয়ত খুবই কাঁদাকাটা করবে, তার চেয়ে, ঐ সঙ্গে আপনারাও কেন চলুন না ? সেখানে বরঞ্চ আপনাদের জন্তে আমি আলাদা—কোথায় বা বল্লে—ব্যবস্থা করে দেবো; হপ্তাখানেক থেকে, আমার সঙ্গেই আপনারা ফিরে আসবেন। সেখানে ততদিন উষার মনটাও বসে যাবে।"

"তুমি কি বল্লে ?"

"আমি বল্লাম, ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি উনি কি বলেন।"

গৃহিণী নতমুখে আঁচল খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন, "দেবেন যে কথা বলেছে, সে ত ঠিকই বটে। আসতে যাবার দিনে উষা যে কি কাণ্ড করবে তা আমি বুঝতে পারছিনে। এখনই ত সুর ধরেছে ও !"

"কেন, কি বলছে ?"

"বলছে, না 'মা, আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না, আমি এই খানেই থাকবো। চাইনে আমি লেখাপড়া শিখতে, এ সব ফেরাক্ জুতো মোজা কিচ্ছুই আমার দরকার নেই—চল আমরা দেশে ফিরে যাই। বেশ ছিলাম সেখানে—কেন মরতে এখানে এলাম !'—মেয়ের চোখ দুটি ছল ছল করতে লাগলো গো !"

এ কথা শুনিয়া মধু বাবু কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, "দেখ, দেবেন যা বলছে তাই করা যাক এস। আমরাও ঐ সঙ্গে যাই। হপ্তা খানেক বলেছে—ও নিজে না হয় হপ্তা খানেক পরে ফিরে আসবে,—আমরা সেখানে মাস খানেকই যদি থাকি—তাহাতেই বা আপত্তি কি ? মেয়েটারও ভাল ক'রে মন বসুক, আমরাও নিজের চক্ষে দেখে আসি যে সে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে কোন রকম অনাচার হচ্চে না। আমরাও তা হলে কতকটা নিশ্চিন্দি হয়েই ফিরতে পারবো বোধ হয়। তা হলে মত দিই, কি বল ?"

গৃহিণী এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার ধার্য্য দিন আসিয়া পড়িল। মধুবাবুর জন্ম গরম "কোট পেণ্টুলন" তৈয়ারি হইয়াছে। ইহা তিনি শিলিগুড়িতে গিয়া, দার্জ্জিলিঙ-গামী গাড়ীতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে পরিধান করিবেন। গৃহিণীর জন্ম ফ্লানেলের শেমিজ, গরম 'বডি' ও নূতন শাল, বালক বালিকাদের জন্ম উপযুক্ত শীতবস্ত্র, সমস্তই আসিয়া বাক্সবন্দি হইয়াছে। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দুই কামরাই রিজার্ভ হইয়াছেন এক খানিতে শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী, লীলা, এবং নিজ পরিচারিকাসহ গৃহিণী থাকিবেন; অপর খানিতে মধুবাবু ও দেবেন্দ্রবাবু আরোহণ করিবেন। জিনিষ-পত্র লগেজ করাইয়া, ভৃত্যাদিকে সঙ্গে লইয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবেন্দ্রবাবু দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিলেন। মধু বাবুর ভৃত্য ও দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীর একজন দ্বারবান মধু বাবুর বাড়ী আগলাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মধুমাস

গুন্ গুন্ গান গাহি, ওই বনপথ বাহি
মধুকর ফিরিয়া আসিল।
কোরক মেলিল আঁখি, ফুলভরে নত শাখী
মলয়ায় হেলিল দুলিল।

ঘাটে বাটে থাকি থাকি, কোকিলা উঠিছে ডাকি
সবুজে সবুজে ধরা ছায়।
নব কিশলয় জাগে, বাঁধুলী জাগিছে রাগে
আকাশে নূতন আলো ভায়।

তুমি মন মনোহরা, সাজিল কি ঠামে ধরা
সারা বিশ্ব উদাস চঞ্চল।
বাতায়নে বসে থাকি মেলিয়া আকুল আঁখি,
আনমনে চোখে আসে জল।

কোথা হতে এলে সখা এমন মাধুরী মাখা!
বিমোহিলে সকল হৃদয়।
দুদিনের লাগি এলে, আবার যাইবে ফেলে
স্মৃতিখানি হৃদে রয়ে যায়।

মাহ্‌মুদা খাতুন ছিদ্দিকা।

সাহিত্য-সমাচার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্ত নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কারগুলি দেওয়া হইবে। প্রবন্ধ পাঠান সম্বন্ধেও সময় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১। হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক—নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র।

২। হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক—হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।

৩। তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।

৪। রামগোপাল রৌপ্যপদক—'এষা' কাব্য সমালোচনা।

৫। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক—(ক) 'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।

৬। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক- (খ) অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র।

৭। জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক—মাইকেলের ছন্দ।

৮। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক—মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

২। গগনচন্দ্র পুরস্কার (৫০৲)—স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশুক। কেবল ৬ষ্ঠ বিষয় মহিলাগণের জন্ত নির্দ্দিষ্ট। অন্তান্ত প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৫ (১৮শে এপ্রিল, ১৯ ৮) তারিখের মধ্যে ২৪৩।১,আপার সাকুর্লার রোড, ঠিকানায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা ১৬৷১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে
শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

২০শ বর্ষ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

১ম খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা

বেদ-কথা

তৃতীয় দিন

এদিনও পূর্ব্বাহ্নে প্রবর্গ্যান্তে উপসৎ ও অপরাহ্নে: প্রবর্গ্য ও উপসৎ। উপসতের মধ্যে সোমের আপ্যায়ন ও নিহ্নব।

পূর্ব্বাহ্নের প্রবর্গ্য ও উপসৎ সমাপ্ত করিয়া এই দিন সোমযাগের উপযোগী সৌমিক বেদি বা মহাবেদি নির্ম্মাণ করিতে হয়। পূর্ব্বে দেবযজন-ভূমিতে দীক্ষণীয়াদি ইষ্টিযাগের জন্য ঐষ্টিক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তিন অগ্নির স্থাপনা হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বেদি ও অগ্নি সোমযাগের বা তদন্তর্গত পশুযাগের উপযোগী নহে। ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বে আহবনীয় অগ্নি, তাহারও পূর্ব্বে এই মহাবেদি নির্ম্মিত হইবে। নিম্নে যে চিত্র দেওয়া হইল, তাহাতে এই মহাবেদির আকার আয়তন বুঝা যাইবে।

পূ
উ
দ
প
যূপ
উত্তরাংস
১২
উত্তর বেদি
১২
দক্ষিণাংস
চাত্বাল
উৎকর
৩৬
অন্তঃপাৰ্শ্ব
উত্তর শ্রোণি
১৫
১৫
দক্ষিণ শ্রোণি
শালা দ্বার
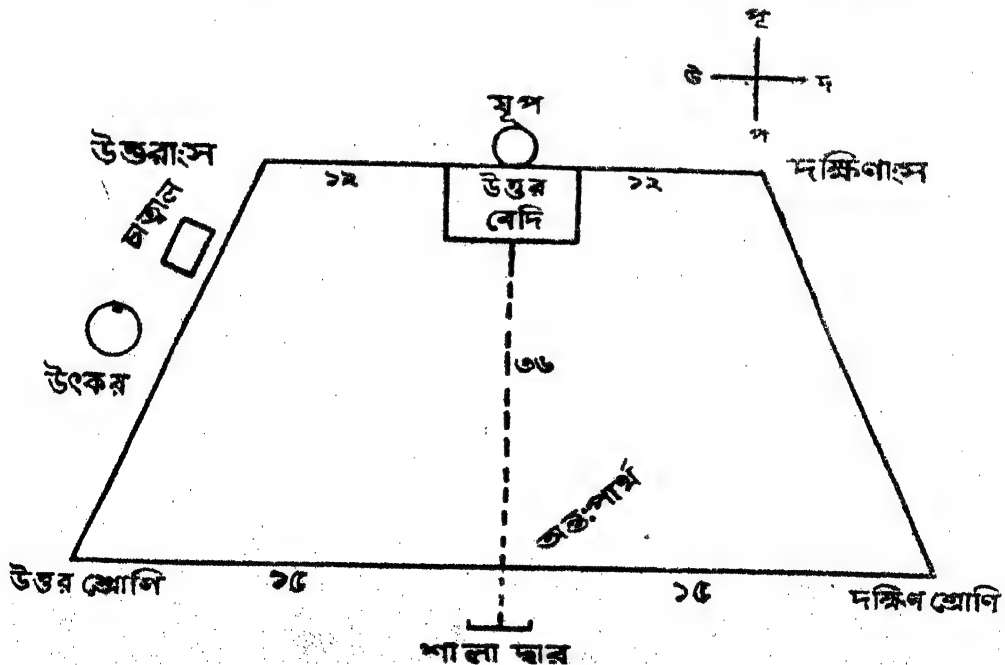
এই মহাবেদি ঐষ্টিক বেদি অপেক্ষা বৃহত্তর। আকারে উহা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। পশ্চিম ও পূর্ব্বের ভুজ সমান্তরাল, কিন্তু পশ্চিমের ভুজ বড় ও পূর্ব্বের ভুজ ছোট। উত্তর ও দক্ষিণের ভুজ সমান্তরাল নহে, কিন্তু সমান। ১৫ অঙ্গুলিতে এক পদ, আর ৩ পদে এক প্রক্রম। মহাবেদির পশ্চিমভুজ (১৫+১৫=)৩০ প্রক্রম, পূর্ব্বভুজ (১২+১২=)২৪ প্রক্রম; উভয় ভুজের দূরত্ব ৩৬ প্রক্রম।

বেদির চারি কোণের নাম—অংস ও শ্রোণি। পশ্চিম ভুজের দুই প্রান্তে শ্রোণি, আর পূর্ব্বভুজের দুই প্রান্তে অংস। এই মহাবেদির পূর্ব্বাংশের উপর সমচতুর্ভুজ উত্তর বেদি একটু উঁচু করিয়া তুলিতে হয়। যে গর্ত্তের মাটি তুলিয়া উত্তরবেদি গাঁথিতে হয়, উহার নাম চাত্বাল। উহা মহাবেদির উত্তরে থাকে। বেদির ধূলি আবর্জ্জনা যেখানে স্তূপীকৃত করা হয়, তাহা উৎকর। উহাও চাত্বালের নিকট, একটু পশ্চিমে। পশুযাগ প্রসঙ্গে যে পশুক বেদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এই সৌমিক-বেদিও তাহারই মত। কেননা, ইহা সোমযাগ ও পশুযাগ উভয়েরই উপযোগী। উত্তর বেদির উপর প্লক্ষশাখা বিছাইতে হয়। তদুপরি মেষলোম, গুগ্‌গুল, পীতুদারু (দেবদারু) কাঠ রাখিয়া তদুপরি অগ্নি আনিয়া রাখিতে হইবে। মহাবেদি নির্ম্মাণের দিন অগ্নি আনা হয় না, পরদিন হইবে।

চতুর্থ দিন

এই দিনের নাম উপবসথ্য দিন। দিনের বেলা ব্রতদুগ্ধ পানের পর যজমানকে উপবাস করিতে হয়। রাত্রিতে আর ব্রতপান করিতে পান না। এ দিন পূর্ব্বাহ্ণেই দুইবার প্রবর্গ্য ও উপসৎ সারিয়া লইতে হইবে। দুই উপসৎ শেষ করিয়া প্রবর্গ্যের সম্ভার (জিনিষপত্র—সরঞ্জাম)গুলি অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ (উৎসাদন) করিবে।

তৎপরে অনেকগুলি অনুষ্ঠান আছে—

প্রথম অনুষ্ঠান :—অগ্নি প্রণয়ন—ঐষ্টিক বেদির পূর্ব্বস্থিত আহবনীয় অগ্নি হইতে অগ্নি আনিয়া উত্তর বেদিতে রাখিতে হইবে। অগ্নিকে পশ্চিম হইতে প্রাঙ্‌মুখে বা পূর্ব্বমুখে আনিতে হয়—এই জন্ম এই কর্ম্মের নাম প্রণয়ন। বরুণপ্রধান যাগে ও পশুযাগেও এইরূপে অগ্নিপ্রণয়ন হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অতঃপর উত্তর বেদিস্থিত এই প্রণীত অগ্নিই আহবনীয়রূপে গণ্য হইবে, ইহাতেই পশুযাগ ও সোমযাগ সম্পন্ন হইবে। পুরাতন আহবনীয়ের আর আহবনীয়ত্ব থাকে না, উহার নাম হয়—শালাদ্বার্য্য বা শালামুখীয় অগ্নি—প্রাগ্বংশশালার পূর্ব্বদ্বারের প্রবেশমুখে অবস্থিত বলিয়া ঐ নাম। শালাদ্বার্য্য অগ্নিতে এখন গার্হপত্যের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান :—হবির্ধান প্রবর্ত্তন। সোমযাগে আহুতির জন্ম নিষ্কাশিত সোমরস যে শকটে রক্ষিত হয়, তাহার নাম হবির্ধান। হবির অর্থাৎ হোমদ্রব্যের আধান বলিয়া ঐ নাম। দুইখানি শকটে গরু জুড়িয়া প্রাচীন বংশশালার পূর্ব্বদ্বারের নিকট আনিয়া রক্ষিত হয়। একখানি শকট অধ্বর্য্যুর, একখানি প্রতিপ্রস্থাতার। অধ্বর্য্যুর খানি একটু বড়। দুই শকটের উপর তৃণময় ছাদ (টপ্পর) বাঁধা হয়। শকট দুইখানি প্রাচীন বংশশালার পূর্ব্ব দুয়ারের দুই পার্শ্বে রাখিয়া অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা আপন আপন শকটের চাকার নীচে হিরণ্যখণ্ড রাখিয়া তদুপরি ঘৃতাহুতি দেন। সোমক্রয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে হিরণ্য অগ্নিস্বরূপ, উহাতে আহুতি হইতে পারে। যজমানের পত্নী শকটদ্বয়ের অক্ষধুরে ঘি মাখাইয়া দেন। তৎপরে ঋত্বিক্‌দ্বয় আপন আপন শকট মহাবেদি অভিমুখে চালাইবেন। শকট-চক্র ঘর ঘর শব্দ করিতে থাকিলে হোতা হবির্ধান প্রবর্ত্তনের (অর্থাৎ প্রাঙ্‌মুখে পরিচালনের) অনুকূলে মন্ত্র-পাঠ করিতে থাকিবেন। যজমানও যথাবিধি মন্ত্র পড়িবেন। মহাবেদির ভিতর আসিলে গরু খুলিয়া লইয়া উত্তর বেদির পশ্চিমদিকে শকট দুইখানি রাখিতে হইবে। শকটের যুগ (জোয়াল) ঠেকা দিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। দুই শকটের উপর মণ্ডপ গড়িতে হইবে। চাটাই বা দরমা দিয়া ঘিরিয়া মণ্ডপের দেওয়াল

হইবে। উপরে তদ্বিধ আচ্ছাদন (ছদি) থাকিবে। মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে দুয়ার থাকিবে—ঋত্বিকেরা মণ্ডপের মধ্য হইতে সেই দুয়ার দিয়া বাহিরে আসিয়া সম্মুখেই উত্তরবেদি দেখিতে পাইবেন। সেই দুয়ারের উপর বাঁশ চিরিয়া খিলানের মত করিয়া দিবেন—উহার নাম ররাটী। এই ররাটীকে অলঙ্কৃত করা হইবে। এইরূপে হবির্ধান শকট রক্ষার জন্য মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়, সেই মণ্ডপের নামও হবির্ধান মণ্ডপ।

তৃতীয় অনুষ্ঠান:—উপরব খনন।

দুইখানি হবির্ধান শকট মণ্ডপমধ্যে পাশাপাশি থাকে—একখানি থাকে উত্তরে, একখানি থাকে দক্ষিণে। দক্ষিণের শকটের নিম্নে ভূমিতে চারিটি গর্ত্ত পাশাপাশি খুঁড়িতে হয়। গর্ত্তের গভীরতা বাহুপরিমাণ। নীচে চারিটি গর্ত্তে পরস্পর যোগ থাকে। এই গর্ত্তের উপর একখানা কাষ্ঠফলক পাতিয়া তাহার উপর গোচর্ম্ম বিছাইয়া তদুপরি সোমের টুকরা ছেঁচিতে হয়। পরদিন সোমাহুতির পূর্ব্বে এইরূপ সোম ছেঁচিয়া রস নিষ্কাশন করিতে হইবে। পূর্ব্বদিন তজ্জন্য গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিতে হয়। এই গর্ত্ত চারিটির নাম উপরব—উপরে কাঠের উপর যখন পাষাণের আঘাতে সোম ছেঁচা হয়, তখন এই গর্ত্তে ঢোলের মত শব্দ বা রব বাহির হয়—তজ্জন্য নাম উপরব। উপরবের নিকট বালি দিয়া একটা ঢিপি তুলিতে হয়—উহার নাম খর।

চতুর্থ অনুষ্ঠান:—সদোগৃহ নির্ম্মাণ।

মহাবেদির পশ্চিমাংশে হবির্ধান মণ্ডপের পশ্চিমে আর একটি মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে—ইহার নাম সদঃশালা বা সদোগৃহ। মণ্ডপের দেওয়াল বেড়া দিয়া বাঁধিয়া পূর্ব্বে পশ্চিমে দ্বার রাখা হয়। উপরে বাঁশের মাচার উপর ছদি (আচ্ছাদন বা ছই) থাকে। এই মণ্ডপের দৈর্ঘ্য ১৮ হাত, বিস্তার ৯ হাত। এই মণ্ডপের মধ্যে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি একসারি অগ্নিস্থান প্রস্তুত করিতে হয়—উহার নাম ধিষ্ণ্য। চাত্বাল হইতে মাটি তুলিয়া আনিয়া মাটি ও বালি দিয়া এই ধিষ্ণ্যগুলি গঠিত হইবে। এক এক ধিষ্ণ্য ছোট চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, দীর্ঘে বিস্তারে ১৮ অঙ্গুলি পরিমিত। ধিষ্ণ্যের সংখ্যা ছয়টি।

মহাবেদির উত্তর সীমায় ও দক্ষিণ সীমায় দুইখানি ছোট ঘর তুলিয়া তাহার মধ্যে দুইটি ধিষ্ণ্য বা অগ্নিস্থান গড়িতে হয়। উত্তরের ধিষ্ণ্যের নাম আগ্নীধ্রীয়; ইহার নিকট আগ্নীধ্র নামা ঋত্বিক্‌কে বসিতে হইবে। দক্ষিণের ধিষ্ণ্যের নাম মার্জ্জানীয়। সদঃশালার মধ্যে যে ছয়টি ধিষ্ণ্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা উত্তর দিক হইতে যথাক্রমে অচ্ছাবাক্‌, নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, হোতা ও মৈত্রাবরুণের ব্যবহার্য্য। (চিত্র নং ২)

নং ২
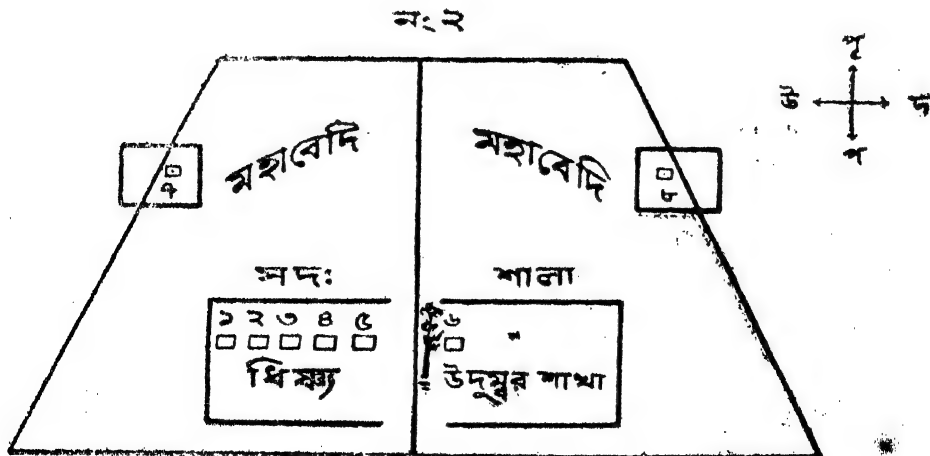
১ অচ্ছাবাক্, ২ নেষ্টা, ৩ পোতা, ৪ ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, ৫ হোতা, ৬ মৈত্রাবরুণ, ৭ আগ্নীধ্রীয়, ৮ মার্জ্জানীয়

হোতা ও মৈত্রাবরুণের ধিষ্ণ্যের মাঝে একটি উডুম্বর বৃক্ষের শাখা পুঁতিতে হয়, ইহা স্পর্শ করিয়া উদ্গাতা সামগান করেন।

পঞ্চম অনুষ্ঠান :—অগ্নির ও সোমের প্রণয়ন।

আহবনীয় অগ্নি ইতঃপূর্ব্বেই উত্তর বেদির নাভিতে স্থাপিত হইয়াছে, ঐ অগ্নি আহুতির জন্য। ধিষ্ণ্যগুলিতে স্থাপনের জন্য অগ্নির প্রয়োজন। শালাদ্বার্য্য (পুরাতন আহবনীয়) অগ্নি হইতে গ্রহণ করিয়া ধিষ্ণ্যের জন্য অপর অগ্নি লইতে হইবে। এই ক্রিয়া অপরাহ্নে অনুষ্ঠেয়। শালাদ্বার্য্য অগ্নি লইয়া আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে রাখিয়া দিতে হয়। তৎপশ্চাৎ সোমেরও প্রণয়ন কর্ত্তব্য। সোম এতক্ষণ প্রাচীন-বংশশালায় ছিলেন। তাঁহাকেও লইয়া সদঃশালায় যাইতে হয় ও অন্যতর হবির্ধান শকটে রাখিয়া দিতে হয়। অগ্নি ও সোমের প্রণয়নের সময় হোতা তদনুকূল ঋক্ পাঠ করেন। এই সময়েই ঋত্বিকেরা পশুযাগের ও সোমযাগের সরঞ্জামগুলিও মহাবেদির দিকে লইয়া যান।

ষষ্ঠ অনুষ্ঠান :—অগ্নি এবং সোম মহাবেদিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার্থ পশুযাগ বিধেয়। অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট পশু ছাগপশু—উহার বিশেষণ অগ্নীষোমীয় পশু। পশুযাগের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যূপ ছেদন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কার্য্যই করিতে হইবে। পশুর বপা, পশ্বঙ্গ, পশু পুরোডাশ, পৃষতাজ্য প্রভৃতি হোমদ্রব্য যথাবিধানে দিতে হইবে। ইহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

সপ্তম অনুষ্ঠান :—আগ্নীষোমীয় পশুযাগের সহিতই সোমযাগের পূর্ব্বে বিধেয় প্রাসঙ্গিক কর্ম্মগুলি শেষ হইল। এখন প্রকৃত সোমযাগের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পরদিন অর্থাৎ পঞ্চম দিন প্রাতেই সোমযাগ আরম্ভ হইবে। সেই সোম ছেঁচিবার জন্য জল পূর্ব্ব দিনই সায়ংকালে আনিয়া রাখিতে হয়—এই জলের নাম বসতীবরী। সংস্কৃত অপ্ শব্দ বলিয়া উহার বিশেষণ বসতীবরীও স্ত্রীলিঙ্গ। নদীর স্রোতের জল হইলেই ভাল হয়। বাদ্য বাজাইয়া সমারোহে বসতীবরী আনিতে হয় এবং রাত্রির মত আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যের নিকট রাখিতে হয়, সোমকেও হবির্ধান হইতে নামাইয়া রাত্রির মত সেইখানেই রাখিতে হয়। যজমান সারারাত্রি জাগিয়া সেইখানে পাহারা দেন।

পঞ্চম দিন।

পঞ্চম দিনে সোমযাগ। এই দিনের নাম সুত্যা দিন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যজমান ঋত্বিক্‌দিগকে জাগাইয়া দেন। ঋত্বিকেরা উঠিয়া যাগের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রগুলি সাজাইয়া লন। সোম রাত্রিকালে আগ্নীধ্রীয়ে রক্ষিত ছিল, সেখান হইতে বাহির করিয়া কাপড় খুলিয়া হবির্দ্ধানে রাখা হয়। কেন না, এই খানেই উপরবের উপর উহা ছেঁচিতে হইবে। হোতা অধ্বর্য্যুর অনুজ্ঞাক্রমে প্রাতরনুবাক নামক ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। প্রাতঃকালে পাখা ডাকা পর্য্যন্ত এই প্রাতরনুবাক পাঠ করিতে হয়, কাযেই মন্ত্র সংখ্যা অনেকগুলি। পাখী ডাকিতে বিলম্ব হইলে মন্ত্রসংখ্যা আবশ্যক মত বাড়াইয়া লইতে হইবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ডে এই প্রাতরনুবাক মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য ও নিয়ম বিবৃত হইয়াছে।

এ দিন সোমযাগের সঙ্গে সঙ্গে পশুযাগেরও বিধান আছে। একটি অথবা বিকল্পে এগারটি পশুর দ্বারা যাগ হয়। এক পশু হইলে উহা ঋত্বিক্ উদ্দিষ্ট হয়। একাদশ পশু স্থলে অগ্নি ব্যতীত সরস্বতী, পুষ্ণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে এগার পশু এগার যূপে অথবা এগার পশু একই যূপে বাঁধিতে হয়। সবন কর্ম্মের আনুষঙ্গিক এই পশুর নাম সবনীয় পশু। পশুযাগ প্রকরণে দেখা হইয়াছে, পশুযাগ মাত্রেই পুরোডাশ আহুতির বিধান আছে। সবনীয় পশুযাগে কেবল পুরোডাশ নহে, ধানা, করম্ভ, পরিবাপ ও পয়স্যা এই কয় দ্রব্যেরও আহুতি

দিতে হয়। ধানা অর্থে ভাজা যব, করম্ভ অর্থে ঘৃতপক ছাতু, পরিবাপ অর্থে ঘৃতপক চালভাজা এবং পয়স্যা অর্থে দুগ্ধ-মিশ্রিত দধি। হোতা যখন প্রাতরনুবাক মন্ত্র পড়িতে থাকেন, সেই অবসরে আগ্নীধ্রনামা ঋত্বিক্ এই গুলি যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া ফেলেন। ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ একাদশ কপালে প্রস্তুত হয়।

প্রাতরনুবাক পাঠ শেষ হইলে অর্থাৎ প্রত্যুষে, অধ্বর্য্যু আর কয়েকজন ঋত্বিক্ ও পরিকর্ম্মী (পরিচারক) সঙ্গে লইয়া তড়াগাদি হইতে জল আনিতে যান। তিনটি বা পাঁচটি কলশে জল তুলিতে হয়। এই কলশের নাম একধন কলশ—জলের নাম একধনা। যজমানের পত্নীও ঐ সঙ্গে দুইটি পৃথক কলশে জল তুলিয়া আনেন; ঐ জলের নাম পান্নে জল। ইহার ব্যবহার পরে দেখা যাইবে। পরিকর্ম্মীরা একধন কলশে জল তুলিয়া আনেন। অধ্বর্য্যু পৃথক একটা ছোট পাত্রে জল আনেন। ঐ জলের সহিত পূর্ব্বদিনের সায়ংকালে আনীত বসতীবরী জল স্পর্শ করাইয়া, বসতীবরীর কিয়দংশ একধনায় মিশাইয়া পৃথক পাত্রে রাখা হয়। এই জলের নাম হয় নিগ্রাভ্য। সোম ছেঁচিবার সময় বসতীবরী, একধনা, ও নিগ্রাভ্য এই তিন জলই আবশ্যক হইবে। হোতা ইহাঁদের সঙ্গে জল আনিতে যান নাই। তিনি হবির্দ্ধান মণ্ডপের দ্বারে বসিয়া ছিলেন এবং অপোনপ্ত্রীয় নামক সূক্ত পড়িতেছিলেন। ইঁহারা জল লইয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সূক্তপাঠ শেষ হয় এবং হোতা প্রশ্ন করেন "অবেরপাঃ"—জল পাইয়াছ কি? অধ্বর্য্যু উত্তর দেন "উতেমনন্নমুঃ"—উহা ঠিক পাইয়াছি। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮ অধ্যায়, ২খণ্ড)।

জল লইয়া হবির্দ্ধানে প্রবেশান্তর সোম ছেঁচিবার আয়োজন। প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন, তৃতীয় সবন তিন সবনেই সোমাহুতির জন্য সোমরস পৃথক ভাবে বাহির করিতে হয়। এই সোমরস নিষ্কাশন কর্ম্মের নাম সোমের অভিষব।

হবির্দ্ধান-মণ্ডপ-মধ্যে উপরব নামক গর্ত্তের চারিদিকে অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা এই চারিজন ঋত্বিক ঘিরিয়া বসেন। উপরবের উপর কাষ্ঠফলক (অধিষবণ ফলক) চাপাইয়া তদুপরি গো-চর্ম্ম (অধিষবণ চর্ম্ম) বিছাইয়া তাহার উপরে সোমের টুক্রা রাখিতে হয় এবং পাষাণের (নুড়ির) আঘাতে সোম থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। এই পাষাণের নাম গ্রাব। চারিজন ঋত্বিক্ চারিখানি পাষাণ হাতে লইয়া সোমকে চারিভাগে লইয়া ছেঁচিতে থাকেন। প্রাতঃ সবনে সোমের প্রায় অর্দ্ধাংশ ছেঁচিয়া ফেলা হয়, মাধ্যন্দিন সবনে বাকী অর্দ্ধেক ছেঁচিতে হয়; কোন একখানা বড় টুক্রা পৃথক থাকে—উহা হইতে তৃতীয় সবনে রস নিষ্কাশন হয়। তৃতীয় সবনে অধিক রসের প্রয়োজন নাই। ছেঁচিবার সময় মাঝে মাঝে নিগ্রাভ্য জলের ছিটা দিতে হয় ও সোমখণ্ড নিগ্রাভ্য জলে ডুবাইয়া সরস করিয়া লইতে হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া ও থেতলাইয়া যতক্ষণ সোমখণ্ড ঋজীষ অর্থাৎ নীরস ছিবড়ায় পরিণত না হয়, ততক্ষণ পাষাণের আঘাত দিয়া রস বাহির করিতে হয়। এইরূপে প্রাতঃ সবনের ও মাধ্যন্দিন সবনের জন্য প্রচুর রস পাওয়া যায়। প্রাতঃ সবনের ও মাধ্যন্দিন সবনের ঋজীষ (সোমের ছিবড়া) গুলি ফেলিতে নাই। তৃতীয় সবনে ঐ ঋজীষ নিংড়াইয়া কিঞ্চিৎ রস পাওয়া যায়। তৃতীয় সবনে অল্প রসের প্রয়োজন—ইহাতে সোম ছেঁচিবার সময় নিগ্রাভ্য জলে ভিজানও দরকার হয় না। এইরূপে সোমনিষ্কাশনের নাম মহাভিষব। আর এক রকম অভিষব আছে, তাহাকে ছোট অভিষব বলে, উহা প্রাতঃ সবনের আরম্ভে প্রযোজ্য। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ হইবে।

নিষ্কাশিত সোমরস রাখিবার জন্য কয়েকটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র (জালা) আবশ্যক। এইটির নাম আধবনীয়। এই আধবনীয় পাত্রে বসতীবরী ও একধনা উভয় জল ঢালিয়া মিশাইতে হয়। প্রত্যেক সবনে উভয় জলের তৃতীয়াংশ লইতে হইবে। আধবনীয় এই রূপে জলপূর্ণ করিয়া সেই জলে অভিষবে নিষ্কাশিত সোমরস ঢালিবে। এইরূপে আহুতির উপযোগী সোমরস প্রস্তুত হইবে। আধবনীয়ে সোমরস সঞ্চিত থাকে

বটে, কিন্তু আহুতির জন্য সোমরস আধবনীয় হইতে তুলিয়া লওয়া হয় না। যতটুকু সোমরস একেবারে আহুতির জন্য গৃহীত হয়, তাহার নাম গ্রহ। গৃহীত বলিয়া গ্রহ। অনেক দেবতার উদ্দেশে আহুতির জন্য অনেকবার সোমরস অর্থাৎ গ্রহ লইতে হয়। এই গ্রহ আধবনীয় হইতে তুলিয়া লওয়া হয় না। দ্রোণ কলশ আর পূতভৃৎ নামে আর দুইটি বৃহৎ কাষ্ঠময় পাত্র থাকে। দ্রোণ কলশের মুখে মেষলোমের ছোট কম্বলের ছাঁকনি দিয়া আধবনীয়ের সোমরস উহাতে ঢালিতে হয়। ছাঁকা সোম দ্রোণ-কলশে প্রবেশ করে। ছাঁকিলে উহা পূত অর্থাৎ বিশুদ্ধ হয়। যদ্দ্বারা সোমকে পূত করা যায়, সেই ছাঁকনির নাম পবিত্র —পবিত্রের প্রান্তে মেষলোমের সূতা (দশা) বাহির হইয়া থাকে, এই জন্য উহার নাম দশা পবিত্র। সোম যখন ছাঁকা হয়, তখন উহার নাম হয় পবমান সোম। আধবনীয়ের সোমরস এইরূপে দ্রোণ কলশে ঢালিবার সময় সোমরসের যে ধারা অধোমুখে পতিত হয়, সেই ধারা হইতে কতিপয় গ্রহ গৃহীত হয়—এই গ্রহগুলির নাম ধারাগ্রহ। সোম রসের অর্দ্ধেক দ্রোণ কলশে ঢালিয়া অপরার্দ্ধ পূতভৃৎ নামক অপর পাত্রে রাখা হয়; আহুতির জন্য অন্য গ্রহগুলি এই দ্রোণ-কলশস্থ সোমরস হইতে অথবা পূতভৃতের সোমরস হইতে গৃহীত হইয়া থাকে।

আহুতি কালে সোমরস গ্রহণের জন্য কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের পাত্র থাকে। আকার-ভেদে এই পাত্র গুলি তিন শ্রেণীর; কতকগুলির নাম "পাত্র", কতক গুলির নাম "স্থালী", কতকগুলির নাম "চমস"। পাত্রের সংখ্যা ১১, স্থালীর সংখ্যা ৪, চমসের সংখ্যা ১০। নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল।

পাত্র—

উপাংশু পাত্র ১, অন্তর্যাম পাত্র ১, দ্বিদেবত্য পাত্র ৩, শুক্র পাত্র ১, মন্থি পাত্র ১, আদিত্য পাত্র ১, উকথ্য, পাত্র ১, ঋতু পাত্র ২—সমষ্টি—১১

স্থালী—

আদিত্য স্থালী ১, উকথ্য স্থালী ১, আগ্রয়ণ স্থালী ১ ধ্রুব স্থালী ১—সমষ্টি—৪

চমস—

যজমান, ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও হোতা এই চারি জনের ব্যবহার্য্য—৪, মৈত্রাবরুণ, নেষ্টা, পোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও অচ্ছাবাক এই ছয়জনের ব্যবহার্য্য—৬। সমষ্টি—১০

প্রাতঃ সবন

এখন প্রাতঃসবনে সোমাহুতির ক্রমানুসারে বিবরণ দেওয়া যাইবে—

১। উপাংশু গ্রহ—সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এই আহুতি। [চারিজন ঋত্বিক চারি পাষাণের আঘাতে সোমরস নিষ্কাশন করিয়া আধবনীয়ে ঢালেন; ইহাই অভিষবের সাধারণ নিয়ম এবং এই অভিষবের নাম মহাভিষব। আর একরকম অভিষব আছে; তাহার নাম ক্ষুল্লকাভিষব বা ছোট অভিষব; ইহাতে কেবল অধ্বর্য্যু পঞ্চম ও স্বতন্ত্র একখানি পাষাণের আঘাতে কিঞ্চিৎ সোমরস বাহির করেন। এই রস আধবনীয়ে না ঢালিয়া একেবারে উপাংশুপাত্র নামক পাত্রে গ্রহণ করা হয়। এই উপাংশুপাত্রে গৃহীত রসের নাম উপাংশু গ্রহ। অধ্বর্য্যু-বহির্দ্ধানের বাহিরে আসিয়া ঐ উপাংশুগ্রহ উত্তর বেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে ঢালিয়া দেন।] এই সোমাহুতির পূর্ব্বে হোতাকে অনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র পড়িতে হয় না; অধ্বর্য্যু স্বয়ং উপাংশু (অনুচ্চ) স্বরে একটি যজুর্মন্ত্র পড়িয়া সূর্য্যের উদ্দেশে সোম ঢালিয়া দেন।

উপাংশুগ্রহ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় গ্রহ মহাভিষবে নিষ্কাশিত সোমরস হইতে গৃহীত হয়।

২। অন্তর্যাম গ্রহ—সূর্য্যের উদ্দিষ্ট। ইহা ধারাগ্রহ অর্থাৎ মহাভিষবে নিষ্কাশিত ও আধবনীয়ে সঞ্চিত সোমরসের ধারা দ্রোণ-কলশে ঢালিবার সময় এই প্রবস্ত ধারা হইতে অন্তর্যামপাত্র নামা পাত্রে গৃহীত। সূর্য্যোদয়ের পরে অধ্বর্য্যু এই গ্রহ লইয়া আহুতি দেন। আহুতির রীতি উপাংশুগ্রহের মতই। এখানেও অনুবাক্যা যাজ্যা নাই; হোমশেষ ভক্ষণও নাই। [অন্তর্যাম গ্রহ আহুতির পর আরও কতিপয় ধারাগ্রহ গ্রহণ করিয়া

গ্রহপাত্রগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হয়। পরে অধ্বর্য্যু প্রতিপ্রস্থাতা ও যজমান সামগায়ী ঋত্বিকদের সহিত হবির্দ্ধানের বাহিরে আসিয়া মহাবেদির উত্তরে চাত্বালের নিকটে আসিয়া বসেন। তখন উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা এই তিন জন সামগায়ী ঋত্বিক সামমন্ত্রে পবমান স্তোত্র নামক স্তোত্র গান করেন। ধারাগ্রহ গ্রহণকালেই আধবনীয়ের সোমের অর্দ্ধাংশ দ্রোণ-কলশে গৃহীত হইয়াছিল। অপর অর্দ্ধাংশ এই সময়ে অর্থাৎ স্তোত্রগান কালে পূতভৃৎ নামক অপর পাত্রে ঢালা হয়। পূতভৃতের মুখে ছাঁকনি দিয়া সোম ছাঁকিয়া ঢালা হয়। উন্নেতা নামক ঋত্বিক্ সোম ঢালিতে থাকেন। যে সোম এইরূপে ছাঁকা বা পূত করা হইতেছে, তাহার নাম পবমান সোম।

পবমান সোম ঢালিবার সময় গীত স্তোত্রের নাম পবমান স্তোত্র। মহাবেদির বাহিরে চাত্বালের নিকট গীত হয় হয় বলিয়া এই স্তোত্রের নাম বহিষ্পবমান স্তোত্র। পূর্ব্বদিন অগ্নি আনিয়া আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যে রাখা হইয়াছিল। এ ধিষ্ণ্য আগ্নীধ্র নামা ঋত্বিকের আন্ত স্তোত্রান্তে আগ্নীধ্র আপন ধিষ্ণ্য হইতে অগ্নি তুলিয়া সদোগৃহ হইতে অন্য ধিষ্ণ্য গুলিতে রাখেন। সোমাহুতির কালে ঋত্বিকের আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ধিষ্ণ্যের নিকট বসিয়া থাকেন। এই সময় সবনীয় পশু যাগের আয়োজন হয়। পশু যাগের বিধান ক্রমে পশুর আলম্ভন ও পশুর বপা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট পুরোডাশ এবং হরি (ইন্দ্রের অশ্ব) পূষ্ণ, সরস্বতী ও মিত্রাবরুণের উদ্দেশে ধানা করম্ভ দধি ও পায়স্যা দেওয়া হয়। পুরোডাশাদি আহুতি ও তাহার আনুষঙ্গিক স্বিষ্টকৃৎ যাগ সমাপ্ত করিয়া পুরোডাশাদি হইতে ভক্ষণার্থ ইড়া কাটিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়—ইড়া ভক্ষণ এখন স্থগিত থাকে।]

৩—৫। দ্বিদেবত্য গ্রহত্রয়—সোমাহুতির পাত্র মধ্যে তিনটি দ্বিদেবত্য পাত্রের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিদেবত্য পাত্রে আহুতির জন্য গৃহীত সোমরসের নাম দ্বিদেবত্য গ্রহ। প্রত্যেক গ্রহ দুই দুই দেবতার উদ্দিষ্ট—এই জন্য নাম দ্বিদেবত্য। প্রথম ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ—ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দিষ্ট; দ্বিতীয় মৈত্রাবরুণ গ্রহ। প্রথম দুই গ্রহ ইতঃপূর্ব্বে গৃহীত ধারা গ্রহ, তৃতীয় গ্রহ দ্রোণ-কলশস্থিত অথবা পূতভৃৎস্থিত রস হইতে গৃহীত।

অধ্বর্য্যু ক্রমান্বয়ে ঐ তিন গ্রহ আহবনীয়ে আহুতি দিবেন। আহুতির পূর্ব্বে মৈত্রাবরুণ অনুবাক্যা ও হোতা যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন—যাজ্যান্তে বষট্‌কার কালে আহুতি দেন। প্রত্যেক আহুতির সময় অধ্বর্য্যুর সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা দ্রোণকলশস্থিত সোমরস আদিত্যপাত্রে গ্রহণ করিয়া আহবনীয়ে ঢালিয়া দেন ও সোমাবশেষ আদিত্যস্থালীতে রাখেন।

তিন দ্বিদেবত্য গ্রহের হোমশেষ হোমকর্ত্তা (অধ্বর্য্যু) ও বষট্‌কর্ত্তা (হোতা) একযোগে ভক্ষণ করেন। ঘ্রাণমাত্রে ভক্ষণ অথবা ঠোঁট ভিজাইলেই চলে, পান অনাবশ্যক।

৬।৭। শুক্রগ্রহ ও মন্থিগ্রহ—ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। উভয়ই ধারাগ্রহ। অধ্বর্য্যু শুক্রগ্রহ ও তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা মন্থিগ্রহ মন্থিপাত্রে গ্রহণ করিয়া উত্তর বেদির পূর্ব্বদিকে যূপের নিকটে গিয়া পাশাপাশি দাঁড়ান এবং অনুবাক্যা ও যাজ্যান্তে বষট্‌কারকালে আহবনীয়ে আহুতি দেন। এখানে গ্রহশেষ হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা মিলিয়া উভয়কে পান করিতে হয়। কেবল ঘ্রাণে চলে না।

শুক্র ও মন্থি গ্রহের আহুতির সমকালে চমস-হোম হয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সোমাহুতির জন্য দশটি চমশ থাকে। যজমান, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা এই চারিজন চমসীর চারি চমস এবং মৈত্রাবরুণ, পোতা, নেষ্টা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র ও অচ্ছাবাক এই ছয় জন চমসীর জন্য ছয় চমস। চমসে সোম গ্রহণ করিবার জন্য দশজন লোক নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাঁহাদের নাম চমসাধ্বর্য্যু। এক এক চমসীর নির্দ্দিষ্ট এক এক চমসাধ্বর্য্যু। অচ্ছাবাকের নির্দ্দিষ্ট চমসাধ্বর্য্যুকে বর্জ্জন করিয়া আর নয় জন চমসাধ্বর্য্যুর চমস সোমে পূর্ণ করিতে হয়। উন্নেতা নামক ঋত্বিক পূতভৃতের সোমে চমসগুলি পূর্ণ করিয়া দেন। অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা যখন শুক্রগ্রহ ও মন্থিগ্রহ আহুতি দেন, সেই সময়ে এই নয়জন চমসাধ্বর্য্যু

আপন চমসের সোম আহবনীয়ে ঢালিয়া দেন। ঢালিয়া যজমান, ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও হোতা এই চারিজনের চমসাধ্বর্য্যু সেখান হইতে সরিয়া যান। অবশিষ্ট পাঁচ জন পুনরায় দ্রোণকলশ হইতে সোমরস লইয়া একে একে অধ্বর্য্যুর হাতে দেন। যে চমস যে ঋত্বিকের, তিনি আপন ধিষ্ণ্যে উপবিষ্ট হইয়া অনুবাক্যা ও যাজ্যা পাঠ করেন। যাজ্যান্তে বষট্কার কালে অধ্বর্য্যু একবার আহুতি দেন। "সোমস্য অগ্নে বীহি" বলিয়া অনুবষট্কার কালে অধ্বর্য্যু আবার আহুতি দেন। হোমশেষ পানের জন্য রক্ষিত হয়।

এই চমসাহুতির পর যজমান ও ঋত্বিকেরা আসিয়া সদোগৃহে উপবিষ্ট হন ও সমারোহে সোমরসের হুতাবশেষ পান করেন। দ্বিদেবত্য গ্রহের ও শুক্রমন্থিগ্রহের শেষও এতক্ষণ পান করা হয় নাই—পানার্থ রক্ষিত ছিল মাত্র। কোন্ ব্যক্তি কোন্ গ্রহের শেষ পান করিবেন, এ বিষয়ে খুঁটিনাটি আছে। মোটামুটি এই বলা যায় যে, গ্রহশেষ পক্ষে হোমকর্ত্তা ও বষট্কর্ত্তা এই উভয়ে একযোগে পান করেন। আর চমসশেষ-পক্ষে যাঁহার চমস, যিনি সেই চমসে হোম করেন, আর যিনি যাজ্যাপাঠান্তে বষট্কার করেন, ইঁহারা একযোগে পান করেন। দ্বিদেবত্য গ্রহ পানের মন্ত্র সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৯ অধ্যায় ৩ খণ্ড দ্রষ্টব্য। দ্বিদেবত্যগ্রহ ঘ্রাণমাত্রে পান করিয়া শুক্র ও মন্থি গ্রহের শেষ পীত হয়, তৎপরে চমসগুলির শেষ পীত হয়।

চমসাহুতির কালে অচ্ছাবাক বর্জ্জিত হইয়াছিল। এইবার তাঁহার ডাক পড়ে। তিনি স্বয়ং পূতভৃৎ সোম তুলিয়া নিজের চমসে লইয়া উহা অধ্বর্য্যুর হাতে দেন। অচ্ছাবাক আপন ধিষ্ণ্যে বসিয়া যাজ্যান্তে বষট্কার ও অনুবষট্কার করেন। অধ্বর্য্যু বষট্কার কালে ও অনুবষট্কার কালে সোমাহুতি দেন। পরে অধ্বর্য্যু ও অচ্ছাবাক উভয়ে মিলিয়া চমসশেষ পান করেন। [পশুযাগের পুরোডাশাহুতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইড়া ভক্ষণ স্থগিত ছিল ; এই সময়ে যজমান ও ঋত্বিকেরা ইড়া ভক্ষণ করেন ও পুরোডাশ যাগের অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ।]

৮—১৯। দ্বাদশ ঋতুগ্রহ—সোমাহুতির পাত্রমধ্যে দুইটি ঋতুপাত্রের উল্লেখ হইয়াছে—একটি অধ্বর্য্যুর জন্য, একটি প্রতিপ্রস্থাতার জন্য। দ্রোণকলশ হইতে সোমরস আপন ঋতুপাত্রে গ্রহণ করিয়া অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা আহবনীয়ে ঢালিয়া দেন—ইহার নাম ঋতুগ্রহ হোম। অধ্বর্য্যু আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন, পরে প্রতিপ্রস্থাতা আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন। আবার অধ্বর্য্যু আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন, আবার প্রতিপ্রস্থাতা আপন পাত্র পূর্ণ করিয়া হোম করেন। এইরূপে ইনি ছয় বার, উনি ছয় বার, মোটের উপর বার বারে বার-ঋতুগ্রহের আহুতি হয়। প্রত্যেক আহুতির দেবতা পৃথক্। আহুতি কালে যাজ্যাপাঠক অর্থাৎ বষট্কর্ত্তাও পৃথক্। ঋতুগ্রহে বষট্কার হয়, অনুবষট্কার হয় না। নিম্নে যথাক্রমে তাঁহাদের নাম দেওয়া গেল।

ঋতুগ্রহ	হোতা	বষট্কর্ত্তা	দেবতা
১	অধ্বর্য্যু	১ হোতা	ইন্দ্র
২	প্রতিপ্রস্থাতা	৫ পোতা	মরুদ্গণ
৩	অধ্বর্য্যু	৬ নেষ্টা	ত্বষ্টা
৪	প্রতিপ্রস্থাতা	৭ আগ্নীধ্র	অগ্নি
৫	অধ্বর্য্যু	৩ ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	ইন্দ্র
৬	প্রতিপ্রস্থাতা	২ মৈত্রাবরুণ	মিত্রাবরুণ
৭	অধ্বর্য্যু	১ হোতা	দেবদ্রবিণোদাঃ
৮	প্রতিপ্রাস্থতা	৫ পোতা	ঐ
৯	অধ্বর্য্যু	৬ নেষ্টা	ঐ
১০	প্রতিপ্রস্থাতা	৪ অচ্ছাবাক	ঐ
১১	অধ্বর্য্যু	১ হোতা	অশ্বিদ্বয়
১২	প্রতিপ্রস্থাতা	১ হোতা	অগ্নিগৃহপতি

প্রত্যেক গ্রহের হোতা ও বষট্কর্ত্তা সেই গ্রহের সোমশেষ পান করেন।

২০—২২। ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ—বৈশ্বদেব গ্রহ—উক্থ্যগ্রহ,এই তিন গ্রহ আহুতিতে কিছু বিশেষ আড়ম্বর আছে। ফলে প্রাতঃসবনের সোমাহুতির মধ্যে এই তিন আহুতিই প্রধান ; ইহার পূর্ব্বে যে সকল আহুতি হইয়াছে, তাহা প্রাসঙ্গিকমাত্র। অন্য আহুতির পূর্ব্বে হোতা যাজ্যা

পাঠ করেন, কিন্তু এই তিন আহুতিতে কেবল যাজ্যাপাঠে হয় না। যাজ্যার পূর্ব্বে আরও অনেকগুলি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইবে, ঐ মন্ত্রে সেই দেবতার শংসন (প্রশংসা বা স্তুতি) হয়, এই জন্য এই মন্ত্রসমূহের নাম শস্ত্র। যদ্দ্বারা শংসন হয়, তাহা শস্ত্র। শস্ত্রপাঠের নানা খুঁটিনাটী নিয়ম আছে, স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ হইবে। যে সকল গ্রহের আহুতির পূর্ব্বে শস্ত্রপাঠ হয়, তাহাদের নাম সশস্ত্র গ্রহ। ঐন্দ্রাগ্ন, বৈশ্বদেব ও উক্‌থ্য এই তিনটি সশস্ত্র গ্রহ। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা এই তিন সামগায়ী ঋত্বিক্‌ কতিপয় সামমন্ত্রও গান করেন —ইহার নাম স্তোত্র গান। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্র গীত হয়। অতএব যত শস্ত্র, তত স্তোত্র। স্তোত্রগানের নিয়মও যথাস্থানে বলা যাইবে। বহিষ্পবমানস্তোত্র ভিন্ন অন্য সমুদয় স্তোত্র সদোমধ্যে গীত হয়। সদোমধ্যে যে উদুম্বর-শাখা প্রোথিত হইয়াছে, সেই উদুম্বরী স্পর্শ করিয়া উদ্গাতারা স্তোত্রগান করেন। বহিষ্পবমান স্তোত্র বেদির বাহিরে চাত্বালের নিকট গীত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

এখন এই তিন সশস্ত্রগ্রহের আহুতির নিয়ম বলা যাইতেছে।

(১) ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ—ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু দ্রোণ কলশের বা পূতভৃতের সোম অন্যতর ঋতুপাত্রে গ্রহণ করিয়া আহুতি দেন। আহুতির পূর্ব্বে হোতা শস্ত্র পাঠ করিয়া যাজ্যান্তে বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। এই শস্ত্রের নাম আজ্য শস্ত্র। এই শস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তোত্র—বহিষ্পবমান স্তোত্র—ইতঃপূর্ব্বেই (অন্তর্যাম গ্রহাহুতির পর) চাত্বালের নিকটেই গীত হইয়াছে।

গ্রহাহুতির সময় দশজন চমসাধ্বর্য্যু পূতভৃতের সোমে পূর্ণ স্ব স্ব চমস হাতে করিয়া নাড়িয়া দেন—আহুতি দেন না, কাঁপাইয়া দেন মাত্র—ইহার নাম চমস কম্পন।

হোম কর্ত্তা (অধ্বর্য্যু) ও বষট্‌কর্ত্তা (হোতা) উভয়ে গ্রহশেষ এবং চমসীরা স্ব স্ব চমসের সোম পান করেন।

(২) বৈশ্বদেব গ্রহ—বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট অধ্বর্য্যু দ্রোণ-কলশের সোমরসে শুক্রপাত্র (যাহা হইতে শুক্র-গ্রহের আহুতি হইয়াছিল) পূর্ণ করিয়া আহুতি দেন। হোতা তৎপূর্ব্বে বৈশ্বদেব শস্ত্র (বা প্রউগ শস্ত্র) পাঠ করিয়া, যাজ্যান্তে বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। শস্ত্রের পূর্ব্বে উদ্গাতারা উদুম্বরী স্পর্শ করিয়া আজ্যস্তোত্র গান করেন। গ্রহাহুতির সঙ্গে পূর্ব্ববৎ চমস কম্পন। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা উভয়ে গ্রহশেষ ও চমসীরা স্ব স্ব চমসের সোম পান করেন।

(৩) উক্‌থ্য গ্রহ—উক্‌থ্য স্থালীতে ধারাগ্রহ পূর্ব্বেই লওয়া হইয়াছে, উহা তিন ভাগ করিয়া তিন বারে উক্‌থ্য পাত্রে লইয়া হোম করা হয়। ফলে তিনবারে তিনগ্রহের হোম হয়। প্রথমবারে হোমকর্ত্তা অধ্বর্য্যু, বষট্‌কর্ত্তা হোতা নহেন—হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ—তিনিই শস্ত্রপাঠান্তে বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। আহুতি মিত্র ও বরুণের উদ্দিষ্ট। দ্বিতীয় বারের আহুতি ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট—হোমকর্ত্তা অধ্বর্য্যু নহেন, তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা বষট্‌কর্ত্তা (শস্ত্রপাঠক) ব্রাহ্মণাচ্ছংসী। তৃতীয় আহুতি ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দিষ্ট; হোমকর্ত্তা প্রতি-প্রস্থাতা, শস্ত্রপাঠক ও বষট্‌কর্ত্তা অচ্ছাবাক। তিন শস্ত্রেরই নাম আজ্য শস্ত্র এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন স্তোত্রেরই নাম আজ্য স্তোত্র।

তিন আহুতির সঙ্গে সঙ্গে চমস হোম বিহিত। দশ-জন চমসাধ্বর্য্যু আপন আপন চমস পূতভৃতের সোমরসে পূর্ণ করিয়া আহবনীয়ে আহুতি দেন—এস্থলে কম্পন মাত্র নহে, প্রকৃতই আহুতি দিতে হয়।

তিন বারেই হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা একযোগে গ্রহ-শেষ পান করেন এবং চমসীরা স্ব স্ব চমসের সোম পান করেন।

এই খানে প্রাতঃসবনের সমাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

(গল্প)

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। দুই দিকে বাঁশের ঝাড়, এক দিকে বেতস-কুঞ্জ। ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরের ভিতর সন্ধ্যা-দীপ জ্বালাইয়া এক বর্ষীয়সী নতমুখে কি একটা কায করিতেছিলেন। দশ বার বছরের একটী ছেলে—পরণে অতি পুরাতন, ময়লা একখণ্ড ছেঁড়া কাপড়, বগলে সদ্যোধৃত হৃষ্ট- পুষ্টাঙ্গ এক বানর-শিশু—ধীরে ধীরে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কে, শিবে না কি রে?"

"হ্যাঁ পিসীমা, আমি।"

"তা, আমি আগে থাক্‌তেই বুঝ্‌তে পেরেছি। শিবে না হ'লে এমন পা-টিপি-টিপি চোরের মত আর কে আস্‌বে? যেন সিঁদেল চোর চুরি কর্‌তে এসেছে! কোন্ চুলোয় ছিলি এতক্ষণ? রাত্রি দু'দণ্ড না হ'লে আর বাবু ঘরমুখো হবেন না!"

এই কথা বলিয়া পিসীমা বাহিরের দিকে তাকাইলেন। এতক্ষণে বারান্দায় উপনীত শিবপ্রসাদের ক্রোড়ে বানরের বাচ্চা দেখিয়া পিসীমা ভয়ে যেন আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওমা, ওটা কি জানোয়ার নিয়ে এসেছে রে? এখনি সব কামড়ে ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড কর্‌বে, লঙ্কা ছারখার করে দেবে যে।"

শিবপ্রসাদ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "জানোয়ার নয় পিসীমা, বাঁদরের বাচ্চা। আমরা ধরেছি—আমি, কেলে, গদাই, হাবা আর ভুতু।"

"খুব দিগ্বিজয় করেছিস্, রাজা হয়েছি আর কি! আর কোন ভাবনা চিন্তে নেই! রাজপুত্তুর এখন দু'টি দু'টি খাবেন আর সিংহাসনে বসে হাজ নাড়বেন। তা' ও আপদকে তা'রা কেউ নিতে পারলে না?"

"আমি পুষ্‌বো, পিসীমা।"

পিসীমা কিছুকাল বিস্ময়ের আতিশয্যে অবাক্ হইয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন,—মানুষ মানুষের ছেলে মেয়ে প্রতিপালন করিয়া থাকে, গো-জাতীয় জীব গো-পালন করে, আর বানরেই বানর পুষিয়া থাকে। শিবপ্রসাদের প্রস্তাবে যদিও পৃথিবীর এই চিরন্তন প্রথার কোন ব্যত্যয় হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে নাই, তথাপি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার নহে; কারণ পিসীমা ত আর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বানর হয়েন নাই। তাঁহার শরীরে একবিন্দু মনুষ্যরক্ত থাকিতে তিনি বানর ঘরে আনিতে দিবেন না। এ যুক্তি খণ্ডন করিতে যাইবার সাহস শিবপ্রসাদের ছিল না। নরম সুরে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি, পিসীমা, বাচ্চাটীকে আমায় পুষ্‌তে দাও। ভারি সুন্দর, কেমন নাদুস্ নুদুস্ দেখ্‌তে!"

"বলি রাজপুত্তুর, রাত পোয়ালে নিজে কি খাবেন ত'র খোঁজ আছে? আমি বাঁদীগিরি ক'রে কিছু জোটাতে পারি ত গেলা হবে, নইলে একাদশী। নিজের শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে!"

"ওকে তোমায় কিছু খেতে দিতে হবে না। ফল-পাকুড় এনে আমিই খাওয়াব এখন।"—বলিয়া শিবপ্রসাদ ঘরের দিকে এক পা অগ্রসর হইল।

"ছাখ্ শিবে, তুই ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকবি ত আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

শিবপ্রসাদ থামিয়া গেল।

"এই ছাখো, কেমন চোখ দু'টী মেলে মিট্ মিট্ ক'রে তোমার পানে চেয়ে দেখ্‌ছে।"

পিসীমা একহাতে প্রদীপটী তুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে কিছুকাল বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন তারপর, ঘরের কোণে একখানা বাঁশের লাঠি ছিল, সেখানা হাতে করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

বালক বারান্দা হইতে লাফাইয়া পড়িল। তার পর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"মর্ গিয়ে যেথায় খুসী সেথায়। দেখি কোন্ পিরায়ের কুটুম আজ তোকে খেতে দ্যায়। যতক্ষণে তুই বাঁদর না ফেলে দিবি, ততক্ষণে কিন্তু আমার ঘরে তোর জায়গা নেই, এ তুই ঠিক জেনে রাখিস্।"—বলিয়া পিসীমা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সে রাত্রে বালক আর ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একা বিড়্ বিড়্ করিয়া, অবশেষে বৃদ্ধা প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন রান্না শেষ করিয়া পিসীমা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। শিবপ্রসাদ পূর্ব্বদিনেরই মত বানরটাকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া আসিয়া বলিল, "রান্না হয়েছে, পিসীমা? রাত্রে কিছু খাইনি, ভারি খিদে পেয়েছে।"

পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রের কোলের দিকে চাহিয়াই বলিলেন, "হয়েছে না? মাংস-পোলাও তৈরি ক'রে রেখেছি ঐ জানোয়ারটাকে খাওয়াবার জন্যে, আর তোর পেট ভরাবার জন্যে।"

বালক আবার প্রশ্ন করিল, "ভাত হয়নি?"

"হোক আর না হোক। ঐ জন্তুটাকে ফেলে না দিলে তুই আমার ঘরে উঠ্‌তে পাবিনে, তোকে আমি খেতেও দিচ্ছিনে।"

"ওকে না ছাড়লে তুমি আমায় খেতে দেবে না?"

পিসীমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না।"

বালক ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর পিসীমা প্রতিদিনের মত ঘরের ভিতর খুঁটিনাটি করিতেছিলেন, এমন সময় আবার শিবপ্রসাদ আসিয়া বারান্দায় উপস্থিত।

"হ্যাঁরে শিবে, হাঁড়ির ভাত কে চুরি ক'রে খেয়েছে রে?"

"আমি পিসীমা। তুমি ত আমারই জন্যে রেখে দিয়েছিলে।"

"হাঁ, ব'সে ব'সে আমার কি কায? তোর জন্যে আর রাজ্যের জীবজন্তুর জন্যে ভাত রাঁধি!

শিবপ্রসাদ কিছুকাল চুপ্ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, "ও পাড়ার বৃন্দাবনরা একটা বাঁদর পুষছে।"

পিসীমা ঝাঁঝিয়া বলিলেন, "তা' পুষুকগে বৃন্দাবনরা। বাঁদর পুষলে চোদ্দ-পুরুষ নরকে বাস হয়। সে কথা তোকে আর আমি কতবার বল্‌বো? এখন খাঁটী কথা বল্, তুই ওকে ছেড়ে দিবি কি না?"

"আমি পুষ্‌বো।"

"বেরো তবে আমার বাড়ী থেকে. কাল রাত্রে যেখানে ছিলি, আজও সেখানে যা। বাঁদর ফেলে না দিলে আমি তোকে ঘরে জায়গা দেবো না।"

অতঃপর আর বাক্যব্যয় নিষ্ফল জানিয়া শিবপ্রসাদ পূর্ব্বরাত্রের ন্যায় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

আরও দুই এক দিন শিবপ্রসাদের অনাহার, একাহারে কাটিয়া গেল। তার পর একদিন নিম্নলিখিত সর্ত্তে ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত পিসীমার রফা হইল,—আপাততঃ শিবপ্রসাদ বানর লইয়া থাকিবে। কিন্তু পনর দিনের মধ্যে তাহাকে কাহারও নিকট বিদায় করিয়া দেওয়া চাই। কেহ না নিলে, অগত্যা জঙ্গলে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

প্রায় একমাস চলিয়া গিয়াছে।

পিসীমা একদিন বলিলেন, "শিবে, তুই না বলেছিলি বাঁদরটাকে কাউকে দিয়ে দিবি? কেউ নিয়ে গেল না? হাঁ, রাজ্যের লোক সব তোর মত বজ্জাত কি না, ঐ আপদ ঘাড়ে করে নিতে আসবে!"

শিবপ্রসাদ উত্তর করিল না। পিসীমাও আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নিজের কাযে চলিয়া গেলেন।

আরও দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। বাচ্চাটী এখন

বেশ বড় সড় হইয়াছে, বেশ মোটাসোটা—দেখিতে সুশ্রী হইয়াছে।

একদিন সকালবেলা শিবপ্রসাদ উচ্ছিষ্টমুখে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

"ও শিবে, ভাতগুলি কি তুই সব নিজেই খেয়ে গেলি, না বাঁদটার জন্যে কিছু রেখেছিস্?"

"না পিসীমা, আমি সব খাইনি; ওর জন্যে রেখে দিয়েছি।"

পিসীমা রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন—ভাত কমই রহিয়াছে। তখন অম্বুকার একাদশীর সম্বল পূর্ব্বদিনের সংগৃহীত দুইটী পাকা কলা আনিয়া সেই ভাতের সঙ্গে মাখিয়া বানরের সম্মুখে ধরিলেন। বানর আহার-কালে বুড়ীর সমস্ত গায়ে ভাত ছিটাইয়া দিল। বৃদ্ধা বিরক্তির চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া শিবপ্রসাদ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল!

শিবপ্রসাদ বলিয়াছিল—ফল মূল খাওয়াইয়াই সে বানরকে বাঁচাইয়া রাখিবে, পিসীমাকে সে জন্য কিছুই করিতে হইবে না। ফল সংগ্রহ সে করে সত্য, কিন্তু তাহার অধিকাংশই তাহার নিজের পেটে যায়। সুতরাং পিসীমাকেই এখন বানরের ষোল আনা আহার সংস্থান করিতে হয় এবং দুষ্ট ছেলে কখন কোথায় থাকে তাহার ঠিকানা নাই, কাযেই বাধ্য হইয়া পিসীমাকেই প্রায় সকল সময় তাহার আহার দিতে হয়। সে জন্য শিবপ্রসাদকে মাঝে মাঝে বকুনি খাইতে হয় সত্য, কিন্তু বানরের ভোজনের সময় কখনও উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে দেখা যায় না।

পূর্ব্বে কখনও বানরের উল্লেখ করিতে হইলে পিসীমা বলিতেন "শিবের বাঁদর।" বেশীদিন আর এ বন্দোবস্ত মনঃপূত রহিল না। একটা নামকরণ আবশ্যক হইয়া পড়িল।

তখন পিসী-ভাইপোয় পরামর্শ-বৈঠক বসিল। অনেকদিন পরামর্শ চলিল। অনেক আলোচনা, তর্ক বিতর্ক হইল; দুইজনের এক মত হয় না। শিবপ্রসাদ কয়েকটা নব্যগোছের নামোল্লেখ করিল, পিসীমা তাহার একটাও মঞ্জুর করিলেন না। অবশেষে পিসীমা নামকরণ করিলেন. 'লক্ষ্মীচন্দ্র' ওরফে লক্ষ্মীচন্দর। শিবপ্রসাদকে সায় দিয়া যাইতে হইল।

একবছর বয়সেই লক্ষ্মীচন্দ্রের শরীরখানি এরূপ সুপুষ্ট ও বলশালী হইল যে, মনে হইত জঙ্গলে ছাড়িয়া দিলে সে অনায়াসে দিগ্বিজয় করিতে পারে। কপিবরের এই পরাক্রম একদিকে পিসীমার মস্ত কাযে লাগিয়া গেল। পিসীমা দুপুরবেলা ঘরে থাকিতে পারিতেন না পাড়ায় এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার ভাঙ্গা ঘর, জিনিষপত্র চুরি হইয়া যাইতে পারে। শিবপ্রসাদ একদণ্ড বাড়ী থাকে না, পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে খেলিয়া বেড়ায়। কে সেই ভাঙ্গা ঘর আগ্‌লাইয়া বসে? দুই দিন পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে লম্বা শিকল দিয়া লক্ষ্মীচন্দরকে ঘরের মাঝখানে বাঁধিয়া রাখিলে সেই বিশ্রামহীন সদা-সতর্ক প্রহরীর অগোচরে ঘরের ভিতর ইঁদুরটীর পর্য্যন্ত নড়াচড়া করিবার সাধ্য নাই, মনুষ্য, পশু, পক্ষী কোন্ ছার। পরদিন হইতে পিসীমা ভাঙ্গাঘরের যথাসর্ব্বস্বের ভার পরম নিশ্চিন্তমনে সেই বীরের উপর স্থাপিত করিয়া বাহিরে যাইতে লাগিলেন।

এক এক দিন বিকালবেলা পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া পিসীমা উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেন, "লক্ষ্মীচন্দর কেমন আছ?"

লক্ষ্মীচন্দ্র ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করিত, "হুঁম্।"

"চোর-টোর ত কেউ আসে নি?"

"হুম্।"

একদিন শিবপ্রসাদ প্রাতর্ভোজন করিতে বসিয়া বলিল, "এ তরকারী আমি খেতে পারবো না, পচা।"

"একটু না হয় টকই হ'য়েছে। আর কিছু ত নেই, ওই দিয়েই খেয়ে যা।"

"না, পিসীমা, এ খেতে পারা যায় না।"

পিসীমা রাগিয়া বলিলেন, "না হয় বাপু তুই খাস্‌নে, আমার লক্ষ্মীচন্দর খাবে এখন। সে খুব খেতে পারবে।"

পিসীমা আবার বলিলেন, "মানুষের যত নাক সিট্‌কানি! এটা খারাপ, সেটায় হবে না। তা'র চেয়ে বনের জীব জন্তু পোষা ঢের ভাল, যা দাও, তাতেই খুসী; কিছু চাইতেও আসবে না, কোন কিছুর জন্যে হাঙ্গামাও বাধাবে না।"

শিবপ্রসাদ হাসিয়া বলিল, "তুমি না ওকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে? আমায় শুদ্ধ ঘরে জায়গা দেবে না বলেছিলে? এখন দেখ দেখি, তুমি আমার চেয়েও ওকে ভালবাস।"

"বাসি কি আর সাধে? বাবু ত দু'টো খেয়ে এখনই বেরিয়ে যাবেন; ফিরবেন আবার সেই দুপুরবেলা খাবার সময়। তার পর আবার সারা দিন বাইরে টো টো। আর দেখ্ দেখি, আমার লক্ষ্মীচন্দর কেমন সমস্তদিন ঘরে ব'সে বাড়ী ঘর পাহারা দিচ্ছে!"

সংসারে পরিজন বাড়িলেই খরচ বাড়ে, সে যত আদরের পরিজনই হউক কেন। পিসীমারও খরচ বাড়িল। কিন্তু আয় বাড়ে নাই। পূর্ব্বেই কষ্টে দিন-পাত হইত; এখন আরও কষ্ট হইল। মাসের ভিতর দুই দিন ছাড়া আরও অনেক দিন পিসীমার একাদশী চলিতে লাগিল।

একদিন দুপুরবেলা শিবপ্রসাদ ভোজনান্তে আচমন করিয়া আসিয়া বলিল, "আজ মহানন্দকে বলে এসেছি পিসীমা, বিকেলবেলা আসবে।"

"মহানন্দটা আবার কে?"

"বাঃ রে! মহানন্দকে তুমি চেননা? রোজ সকাল-বেলা সে এখান দিয়ে বাজারে যায়। কতদিন তুমি তার সঙ্গে কথা বলেছ! সেদিন না তুমি বল্লে,—মহানন্দ একদিন বাঁদর নিতে চেয়েছিল; যদি নেয় তো তাকে দিয়ে দেই, বলিস্ তো তাকে একদিন আসতে।"

"কৈ, না। কবে আমি এমন কথা বল্লুম?"

"ঐ যে সেদিন, বিষ্যুদবার; হাটের দিন।"

"না; এমন কথা আমি কখ্‌খনো বলিনি। কেন আমি লক্ষ্মীচন্দরকে বিলিয়ে দিতে যাব? সে কি আমার পাকা ধানে মই দিয়েছে, না আমার মুলোক্ষেতে আগুন ধরিয়েছে, শুনি?"

"তবে তোমার বাঁদর দিতে ইচ্ছে নেই?"

পিসীমা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না।"

শিবপ্রসাদ তখন একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি বাঁদর কাউকে দেবে না, তাই বল। সে জন্যে মহানন্দকে চিন্‌তে পারছো না বলবার তো কোন দরকার নেই।"

পিসীমা সে কথার উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর রুক্ষস্বরে বলিলেন, "কেন, ওকে দূর করবার জন্যে তোর যে এত মাথাব্যথা? তোর কামাই চাচ্ছে, না তোর বাপের কেনা সম্পত্তি লুটে নিয়ে যাচ্ছে? আমার গায়ে একবিন্দু রক্ত থাকতে লক্ষ্মীচন্দরকে এখান থেকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না, এ তুই ঠিক জেনে রাখিস্।"

লক্ষ্মীচন্দ্রের প্রতি বৃদ্ধার সমাদরটা লোকের চক্ষে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি বলিয়াই ঠেকিল এবং সেটা পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ মহলে অনেক দিন ধরিয়া কৌতুক আলোচনার খোরাক জোগাইতে লাগিল।

একদিন বিকালবেলা ঘরের দাবায় পা ছড়াইয়া বসিয়া এক বর্ষীয়সী বলিলেন, "আ-মর, এই বুড়ো বয়সে একটা বাঁদর কোলে ক'রে নাচানো, দেখে গা জলে! হাঁ, মন গিয়ে থাকে, গো-সেবা কর্—যা'র গায়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা। এক এক লোমকূপে এক একজন ক'রে দেবতা রয়েছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দক্ষযজ্ঞ, অরুণ, বরুণ, মহাভারত, লঙ্কাকাণ্ড আরও কত সব দেবতা। তা'তে ইহকালেরও উপকার হবে, পরকালের পথও পরিষ্কার হ'য়ে থাকবে।"

পাশে এক তরুণী বসিয়া ছিল। সে মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "মাসীমা বেশ কথা বলেছেন। গো-সেবা করলে ইহকালে দুধ, দই, ক্ষীর পেট ভরে খাওয়া যায়, আবার সেই পুণ্যের বলে মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়েও ননী, মাখন, ছানা খাওয়ার সুযোগ [illegible]।"

বর্ষীয়সী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আজ-কালকার মেয়েদের সবতাতেই জ্যাঠামো! আমি কি অন্যায় কথা বলেছি? ঘাট হ'য়ে থাকে, করযোড়ে মাপ চাইছি, ক্ষমা কর্ বাপু! আর তোর সখ হ'য়ে থাকে, জঙ্গল থেকে একটা ধাড়ি বাঁদর ধ'রে পুষ গে যা। বুড়োমানুষের কথায় কোন দিন ঠাট্টা কর্‌তে আসিস্ নে।"

মোহনপুরের ছেলেদের একটানা জীবন-স্রোতের উপর দিয়া হঠাৎ সেদিন এমন একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল, যাহার স্মৃতি অনেক দিন তাহারা ভুলিতে পারে নাই।

সেদিন রবিবার। স্কুল-পাঠশালার বালাই ছিল না। রমানাথ ছিপ হাতে করিয়া শিস দিতে দিতে চলিয়াছিল। পথের ধারে বরদাসুন্দরীর কুটীর। খোলা জানালার মুখে লক্ষ্মীচন্দ্র নেহাৎ 'ভালমানুষ' ভাবে গুটি-সুটি মারিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছে, দেখা গেল। দ্বিতীয় প্রাণী কাছে কোথাও আছে বলিয়া মনে হইল না। রমানাথ ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইল। বারান্দায় উঠিয়া দেখিল, গৃহের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অতিরিক্ত একখানা বাঁশের থাম; সেই থামের সহিত দীর্ঘ লোহার শিকলে কপিবর আবদ্ধ। বাস্তবিকই কেহ কোথাও নাই। প্রথম সম্ভাষণ স্বরূপ রমানাথ হস্তস্থিত ছিপের সরু অগ্রভাগ দ্বারা লক্ষ্মীচন্দ্রের মস্তক স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিল। মস্তক স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই বানর বিদ্যুদ্বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া গৃহের অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেখান হইতে খ্যাঁক খ্যাঁক, ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ শব্দ করিয়া পশুরাজ সিংহের মত শরীরের সম্মুখভাগ স্ফীত করিয়া এরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিল যে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বালকেরা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

গ্রামের আরও চারি পাঁচটী ছেলে পথ হইতে এই কৌতুককর দৃশ্য দেখিতে পাইয়া কোলাহল করিতে করিতে আসিয়া জুটিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আরও একদল বালক আসিয়া হাজির হইল। সকলে মিলিয়া সংখ্যায় দশ বার জন হইল।

তখন সেই বালক বাহিনী বাঁশের কঞ্চি, মাটীর ঢেলা, কেহ কেহ বা ধূলা-মাটী, খড়-কুটা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং এই সকল হাতিয়ার লইয়া বাহির হইতে সকলে মিলিয়া কুটীরস্বরূপ দুর্গমধ্যস্থ বানরবীরকে আক্রমণ করিল। এক সঙ্গে এতগুলি শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মীচন্দ্র ক্রোধে, ক্ষোভে, লম্ফঝম্ফ করিয়া উল্কাবেগে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং স্বভাবজাত সমর-নির্ঘোষে ঘর কাঁপাইয়া তুলিল; চারি হস্তের নখের আঁচড়ে মেঝে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। বালক দলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কেহ কেহ হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল, কেহবা স্ফূর্ত্তির আতিশয্যে রাগ-রাগিণী সুরু করিয়া দিল। সেদিন আর অন্য কোন খেলার কথা কাহারও মনে পড়িল না; রমানাথ ছিপ ফেলিবার কথা ভুলিয়া গেল। এমন নিখুঁত আনন্দ আর কোন্ খেলায় লাভ হইয়া থাকে? সমস্ত দুপুর বেলাটা বালকেরা যেন আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া হঠাৎ এক সময়ে লক্ষ্মীচন্দ্রের গলার শিকল খুলিয়া গেল। বানর তখন এক লাফে বালক-সৈন্য পার হইয়া উঠানে গিয়া পড়িল এবং সেখান হইতে চোখের নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে এক গাছের মাথায় গিয়া উঠিল। তারপর এ গাছ হইতে সে গাছ এইরূপ করিয়া লাফাইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

বানর অদৃশ্য হইয়া গেলে বালকেরা কিছুকাল ধরিয়া সকৌতুকে তাহারই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বরদাসুন্দরী বাড়ী ফিরিয়া যখন দেখিবেন যে লক্ষ্মীচন্দ্র নাই, ঘরের মেঝে ক্ষত-বিক্ষত, ধূলা-মাটি খড়-কুটায় নরককুণ্ড হইয়া আছে, তখন তাঁহার মুখভঙ্গি কিরূপ হইবে, তাঁহার শোক-সাগর উথলিয়া উঠিবে, অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে অপার তৃপ্তির সহিত ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া অবশেষে তাহারা যে যাহার চলিয়া গেল।

দণ্ড দুই বেলা থাকিতে বরদাসুন্দরী পাড়া হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, রাশিকৃত ধুলা-মাটি খড়কুটা প্রভৃতি নানা রকম আবর্জ্জনায় ঘরখানা আস্তাকুঁড়ের মত হইয়া আছে, কতক জিনিষ-পত্র এদিক ওদিক ওলট-পালট হইয়া রহিয়াছে, লক্ষ্মীচন্দ্র নাই। তাঁহার হৃৎপিণ্ড ধপাস্ করিয়া উঠিল। তবে কি তাঁহার ঘরে রাহাজানি হইয়া গিয়াছে? তাঁহার লক্ষ্মীচন্দ্রকে কেহ জোর পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে? এ জীবনে আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না? ভাবিতে গিয়াই যেন তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন। ঐ ত ভাঙ্গা শিকল পড়িয়া রহিয়াছে; সে যে সহজে ধরা দেয় নাই, ডাকাতির সময়ে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল, নানা জায়গায় তাহারই নখের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু মূঢ় প্রাণ এবিশ্বাসটাকে তাঁহার মনে স্থান দিতে চাহিল না। এও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? সে নাই, তাহাকে আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না; সংসার-যাত্রার এই শেষ এবং ঘনিষ্ঠতম সঙ্গীকে এমন সময়ে হারাইয়া আবার তাঁহাকে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, বিধাতার কি এমন ইচ্ছাও হইতে পারে? না, তাহাকে কেহ ধরিয়া লইয়া যায় নাই; সে নিশ্চয়ই কোথাও লুকাইয়া আছে, এখনই তাহাকে পাওয়া যাইবে। এই ভাবিয়া বরদাসুন্দরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যেক গোপন স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন; কিন্তু তাঁহার হারা-নিধির দর্শন পাওয়া গেল না। তখন বরদাসুন্দরী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও শিবে, ও হতভাগা, কোথায় গিয়ে ম'রে ব'সে আছিস্? আথ এসে তোর লক্ষ্মীচন্দরকে কে ধ'রে নিয়ে গ্যাছে।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে আকুল বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শিবপ্রসাদ কোন্ পাড়ায় খেলা করিয়া বেড়াইতেছে; তাহার ঘরে ফিরিবার সময় হইতে এখনও ঢের দেরী। মিছামিছি তাহাকে ডাকিয়া কোন লাভ নাই দেখিয়া আবার বৃদ্ধা বানরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘরের পিছন দিকের বাঁশ ঝোপ, বেত-বনের মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন; উঠানের তিন দিক ঘিরিয়া যে সকল আম-কাঁঠাল-জামরুল প্রভৃতি গাছ ছিল, তাহাদের শাখা-প্রশাখার মধ্যে ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, বানর নাই।

সহসা তাঁহার মনে হইল মহানন্দ নামে এক ছোক্‌রা কিছু দিন আগে তাঁহার বানর নিতে চাহিয়াছিল; এ বোধ হয় তাহারই কায। ভাবিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে মহানন্দের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন। বলিলেন, মহানন্দই তাঁহার লক্ষ্মীচন্দ্রকে চুরি করিয়াছে; এ কায সে ছাড়া অন্য কেহ করে নাই। মহানন্দ মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। সে কিছুতেই বৃদ্ধাকে বিশ্বাস করাইতে পারে না যে, সে চুরি করে নাই। নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য যতই সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, বরদাসুন্দরী ততই জোরের সহিত তাহাকে আক্রমণ করেন। অবশেষে বৃদ্ধা তাহার ঘরে উঠিয়া সকল স্থান ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন। তারপর নিরাশ হইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বরদাসুন্দরী দেখিলেন, শিব-প্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া শূন্যঘরের দিকে চাহিয়া হাঁ করিয়া আছে। তখন আবার তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও সর্ব্বনেশে! কোথায় ছিলি তুই সারাটা দিন? লক্ষ্মীচন্দর যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গ্যাছে।"

দুই জনে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল। সেদিন শুক্লা অষ্টমী। সন্ধ্যার পর জোৎস্না-স্নাত হইয়া প্রকৃতি হাসিতেছিল। কিছুদূর সন্ধানের পর শিবপ্রসাদ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। যে পাখী অনন্ত আকাশে উড়িয়া গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া কি লাভ?

নিকটে যে সকল ছোট বড় গাছ, লতা গুল্ম, কাঁটাবন-ছিল বরদাসুন্দরী তাহার ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া অনু-সন্ধান করিলেন। লোকালয়ে ঘরের চাল, প্রাচীরের

উপর চাহিয়া দেখিলেন এবং মাঝে মাঝে বানরের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কোথাও লক্ষ্মীচন্দ্রের সাড়া পাওয়া গেল না।

তার পর ছোট একখানা মাঠের ধারে আসিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন, কোন প্রাণীর চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। মাঠ পার হইবার কালে বোধ হইল ছোট একটা কি যেন প্রাণী মাঠের একপ্রান্ত দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। বানর মনে করিয়া বৃদ্ধা তাহার পশ্চাতে ছুটিলেন। প্রাণী দ্রুততর বেগে ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধা আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মাঠ পার হইয়া একটা গাছের মাথায় সর্ সর্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বরদাসুন্দরী মনে করিলেন, এই বোধ হয় তাঁহার হারাধন। নাম ধরিয়া ডাকিলেন; কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুকাল সেই গাছের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পাখীর ডানার শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, উপরে একটা পাখীর বাসা; এখানে তাঁহার লক্ষ্মীচন্দ্র নাই। তখন সেই বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

রাত্রি অধিক হইল; চরাচর নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। গ্রামের লোক নিদ্রা যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শুনিল—মাঝে মাঝে বৃদ্ধার করুণ সম্বোধন কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইবার পর বৃদ্ধার মনে হইল—সম্মুখে খ্যাঁক করিয়া কিসের যেন একটা শব্দ হইল; সে শব্দটা কতকটা লক্ষ্মীচন্দ্রের গলার শব্দের মত। কিন্তু চোখে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অষ্টমীর চন্দ্র তখন অস্তাচলে গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকার। শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া বুঝিলেন, সেখানে নিবিড় জঙ্গল। বৃদ্ধা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাঁটায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল; পদতল হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তথাপি তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বানরের সাক্ষাৎ মিলিল না।

গভীর নিশাকালে পাড়ার লোক ঘুম হইতে জাগিয়া শুনিল, তখনও বৃদ্ধার আর্ত্তস্বর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া বেড়াইতেছে। আরও বহুক্ষণ ধরিয়া অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু বানরের সন্ধান হইল না।

যখন বৃদ্ধা দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে, পদযুগল যেন তাঁহার শরীরের ভার আর ধারণ করিতে পারিতেছে না, তখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলে আবার একটা আর্ত্তনাদ তাঁহার কণ্ঠভেদ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অচৈতন্য দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল।

* *

রাত্রি শেষ হইলে ভোরের শীতল বাতাস গায়ে লাগিয়া বোধ হয় বৃদ্ধার চৈতন্য হইল। চোখ মেলিয়া দেখিলেন, দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার চোখ বুজিলেন। তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার শিয়রে বসিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, লক্ষ্মীচন্দ্র। তখন বৃদ্ধা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দুই হাতে তাহাকে আঁকড়াইয়া, বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিলেন। আবার একটা ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস তাঁহার বক্ষঃ ভেদ করিয়া উঠিল।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইণ্ডলজিষ্ট

যে কয়টি মননের বস্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর মনকে নাড়া দিচ্ছে ও বাঙ্গালীর মনের সাড়া পাচ্ছে, তার মধ্যে একটি প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও ইতিহাস। এই ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহের উপায় ও তা দিয়ে ইতিহাস গড়ার কৌশল আমরা পশ্চিমের পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা করেছি। ইউরোপীয়েরা তাঁদের এই পণ্ডিতদের বলেন 'ইণ্ডলজিষ্ট'—ভারত-তত্ত্বজ্ঞ। নানা দেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এ রকম 'তত্ত্বজ্ঞ' পণ্ডিতের অনেক দল ইউরোপে আছে। বর্ত্তমান ইউরোপের অজস্র প্রাণ-শক্তি জ্ঞানের প্রতি বিষয়ে যে সচেষ্ট মানসিক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, এই সব পণ্ডিতের দল সেই কৌতূহলের ফল। পৃথিবীর যে-কোনও দেশে হোক, ইতিহাসের যে-কোনও কালে হোক, মানুষের কর্ম্ম-চেষ্টা যা কোনও কিছু গড়ে' তুলেছে, তার কাহিনী জানতে আধুনিক ইউরোপ উৎসুক। সুতরাং এসি-রিওলজিষ্ট, ইজিপ্টলজিষ্ট, সিনলজিষ্ট, ইণ্ডলজিষ্ট ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। কেবল যে দুইটি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ, সুতরাং তার ঔৎসুক্য সব চেয়ে প্রবল—সেই দুইটি সভ্যতা সম্বন্ধে এ রকম 'তত্ত্বজ্ঞ' পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় নি। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পরিচয় দাতা 'গ্রীক-লজিষ্ট' ও 'রোমানলজিষ্ট' নামে দুই দল পণ্ডিত নেই। 'রোমানিষ্ট' নামে একদল পণ্ডিত আছেন বটে, কিন্তু তাঁদের কারবার শুধু রোমান রাষ্ট্র ও ব্যবহার অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র নিয়ে।

এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। 'লজিষ্ট'-আখ্য যে পণ্ডিতের দল, তারা হচ্ছেন নিখিল পণ্ডিত। অর্থাৎ যিনি যে সভ্যতার 'তত্ত্বজ্ঞ', তিনি তার অশন, বসন, গৃহ-নির্ম্মাণ, সমাজবন্ধন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিল্প, ভাস্কর্য্য, ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম—সব জিনিষেরই তত্ত্বজ্ঞ, এবং এ সবারই পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক ঘটনার সন তারিখ নির্ণয় থেকে আরম্ভ করে' নিখিল মানবের সভ্যতার দরবারে তাদের স্থান নির্দ্দেশ করে' দেন। সভ্যতার সমস্ত রকম সৃষ্টির যথার্থ মূল্য পরখ্ করে' নিতে পারে, এ রকম উদার ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টির লোক ভগবান কদাচিৎ সৃষ্টি করেন এবং সে লোক দূর-দেশী প্রাচীন সভ্যতার তথ্যনির্ণয়ে নিজের প্রতিভা ও সময় ব্যয় করে না। প্রাচীন কালে আরিষ্টটল্, এবং আধুনিক যুগে গেটে, হেগেল ও আর দুই একজন ছাড়া এ রকম লোক ইউরোপের দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে দেখা যায় নি। আরিষ্টটলকে এসিরিওলজিষ্ট ও গেটেকে ইণ্ডলজিষ্ট রূপে কল্পনা করা যায় না, অর্থাৎ তাঁদের প্রতিভা তাঁদের ও পথে চলতে দিত না, এবং ঐ রকম কোনও 'লজিষ্ট' হ'তে চেষ্টা করলে আরিষ্টটলও আরিষ্টল হতেন না, গেটেও গেটে থাকতেন না। সুতরাং প্রাচীন সভ্যতার 'তত্ত্বজ্ঞ' ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ঐ সব সভ্যতার যে পরিচয় দেন, স্বভাবতই তা অগভীর-দৃষ্টি লোকের পল্লবগ্রাহী পরিচয়। সেই পরিচয়ে যে ইউরোপ সন্তুষ্ট থাকে, তার কারণ ঐ সব সভ্যতার সঙ্গে তার নিজের সভ্যতার যোগ ঘনিষ্ঠ নয়, সুতরাং তাদের সম্বন্ধে তার কৌতূহলও গভীর নয়। স্বল্প পরিচয়েই তার নিবৃত্তি হয়। আর অনেক ইউরোপীয়ের মনেই এ ধারণা বদ্ধমূল যে, ও সব সভ্যতার প্রকৃত মূল্য খুব বেশী নয়; মানুষের সভ্যতার আদিম বা অপরিণত বা বিকৃত অবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবেই ওদের দেখা উচিত। কিন্তু গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঐ সভ্যতার মধ্যেই ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা জন্ম নিয়েছে। এর রসেই সে পুষ্ট। সুতরাং ঐ দুই সভ্যতা সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপের তীব্র মমত্ববোধ রয়েছে। এবং ঐ দুই সভ্যতার মূল্য যে অমূল্য, সে সম্বন্ধে তার মন বিন্দুমাত্র

দ্বিধাহীন। কাজেই ও দুই সভ্যতার সম্বন্ধে সকল-তত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতামত শুন্‌তে সে একেবারেই নারাজ। সভ্যতার প্রত্যেক সৃষ্টির বিশেষজ্ঞের কাছে সে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সৃষ্টিগুলির পরিচয় পেতে চায়। গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মূল্য জানতে ইউরোপ গ্রীসের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের কাছে যায় না, যায় শিল্প-রসিকের কাছে; প্রাচীন গ্রীক ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণবেত্তা লোকমাত্রই যে গ্রীক নাটকের বিচারদক্ষ, এ কথা কখনও ইউরোপের মনে হয় না; রোমান ইতিহাসের সন-তারিখ নির্ণয়ে নিপুণ পণ্ডিতের কাছে সে রোমান ব্যবহার-শাস্ত্রের পরিচয় চায় না, চায় ব্যবহার-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে। 'ইণ্ডলজিষ্টের' কথা ইউরোপ শোনে, কিন্তু সে ধরণের 'গ্রীকলজিষ্ট'কে সে একদিনও বরদাস্ত করবে না। বিশ্বের পরিচয় ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ মারফৎ নেওয়া চলে, ঘরের লোকের পরিচয় প্রতিজনে স্বতন্ত্র।

(২)

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ভারত-বাসীর যোগ, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয়ের যোগের চেয়ে কম ঘনিষ্ঠ নয়, বরং বেশী। ক্লাসিকাল যুগের আচার, ব্যবহার, সমাজনীতি, ধর্ম্মমত কিছুই প্রায় আধুনিক ইউরোপে টিকে নেই। সামান্য যা কিছু আছে, তা এমন রূপান্তর হয়ে আছে যে, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের চোখ ছাড়া সাদা চোখে দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আধুনিক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা চলে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার অনেক রীতি, নীতি, মতামতের ধারা সহস্র রকম পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। এই প্রাচীন সভ্যতার কেবল ইতিহাস ও তার সন তারিখ নয়, তার সৃষ্টিগুলির "কাল্‌চারল" বিচার ও মূল্য সম্বন্ধেও যখন আমরা "ইণ্ডলজিষ্ট"দের কথা কাণ দিয়ে শুনি তখন আমরা ইউরোপকে ভুল নকল করি। এ ব্যাপারে ইউরোপের যথার্থ অনুকরণ ইউরোপ তার ক্লাসিকাল সভ্যতা সম্বন্ধে যা করে, তারি অনুসরণ, অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বিচারে মানুষের সভ্যতার সৃষ্টিগুলির মর্ম্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ লোক ছাড়া অন্য লোকের কথায় কাণ না দেওয়া। এ বিষয়ে ইণ্ডলজিষ্ট-দের বিচার ও মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে,—তাঁরা বিদেশী ব'লে নন, এ বিচার-কাযে যোগ্যতাহীন ব'লে। যে ইউরোপীয় ইণ্ডলজিষ্ট ইউরোপের প্রাচীন বা নবীন শিল্প বা সাহিত্য বা কাব্য বা দর্শন, বা ধর্ম্ম বা সমাজ বা রাষ্ট্র কোনও কিছু সম্বন্ধে আলোচনায় কোনও রকম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি, তিনি ভারতীয় সভ্যতার শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সব কিছুর একাধারে বিচার ও মূল্যনির্ণয় করেন! ভারতীয় সভ্যতা যে ইউরোপের সভ্যতার চেয়ে তাঁদের মনকে বেশী মুগ্ধ করেছে তা নয়। তা যে নয়, তাঁদের লেখার প্রতি পাতায় তার প্রমাণ ছড়ান থাকে। সুতরাং ইণ্ডলজিষ্টদের জ্ঞানতৃষ্ণা, কর্ম্মশক্তি, অধ্যবসায় যতই প্রশংসার হোক না কেন, তাঁদের সেই অসুলভ তত্ত্বদৃষ্টি নেই, যা সভ্যতার সৃষ্টিগুলির মর্ম্মস্থান দেখ্‌তে পায়। কারণ, সে দৃষ্টি ভগবান কম লোককেই দেন, এবং যাকে দেন না, কোনও সভ্যতার কোনও সৃষ্টি সম্বন্ধে তার মতামতের মূল্য এক কাণা কড়িও নয়।

ইউরোপের ইণ্ডলজিষ্ট ও অন্য লজিষ্ট পণ্ডিতেরা ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টিগুলি সম্বন্ধে ইউরোপের তত্ত্বজ্ঞ ও গুণজ্ঞদের মতামত আর পাঁচজন সাধারণ শিক্ষিত ইউরোপীয়ের মতই মুখস্থ করেন। কিন্তু সেই মুখস্থ বিদ্যা সভ্যতার কোনও নূতন সৃষ্টির গুণগ্রহণে বা মূল্য-নির্ণয়ে প্রয়োগ করা চলে না, বিশেষতঃ বিদেশী ও অল্প-বিস্তর ভিন্ন চেহারার সভ্যতার সৃষ্টি সম্বন্ধে। কারণ, নিজের দেশের সভ্যতার সৃষ্টিগুলি সম্বন্ধেও শিক্ষিত জন-সাধারণের বেশীর ভাগ লোকের গুণজ্ঞতা ও রসজ্ঞতা নিজেদের ঠিক অন্তরলব্ধ অভিজ্ঞতা নয়, অনেকটাই গতানুগতিক অভ্যাসের ফল। এই গতানুগতিকতার গণ্ডীর বাইরে কোনও কিছুর মর্ম্ম ও গুণগ্রহণে তাদের যে অনভ্যস্ত মন আন্‌তে হয়, সে হচ্ছে চল্‌তি ফ্যাশানে চালিত হাল্‌কা মন। ইউরোপের লজিষ্ট নামধারী

পণ্ডিতেরা এই মন দিয়েই অন্-ইউরোপীয় সব প্রাচীন সভ্যতার বিচার করেন।

(৩)

ইণ্ডলজিষ্ট পণ্ডিতের কাব্য-বিচারের একটা নমুনা দেখা যাক্।

শ্রীযুক্ত বেরীডেল কীথ্ ইংরেজ ইণ্ডলজিষ্টদের মধ্যে একজন সব্যসাচী লেখক। ইনি বৈদিক সময় ও সাহিত্যের আলোচনা করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্র-সমূহের বিচার করেন, সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি, পরিণতি ও উৎকর্ষ অপকর্ষ নিয়ে কলম চালান, এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সন তারিখ, আগ পর নিয়ে বিচার বিতর্ক ত অবশ্যই করেন। 'হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া সিরিজ' নামক গ্রন্থাবলীতে শ্রীযুক্ত কীথ্ সাহেব নাটক বাদ ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে একখানা ছোট পুঁথি লিখেছেন। তার মুখবন্ধে সাহেব লিখ্ছেন,—

"The literary judgments expressed are based on the assumption that classical Sanskrit literature is entitled to rank among the great literatures of the world, and that therefore it must be subjected to the same standards as are applied to them."—অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে তিনি যে সব সাহিত্যিক রায় দিয়েছেন, তার বিচারের মাপকাঠির পরিমাণ হচ্ছে ঠিক যা দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির বিচার হয়, কারণ তিনি ধরে নিয়েছেন যে, ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য ঐ সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্যতম।' সব দেশের ও সব যুগের সাহিত্যের বিচারে যে এক মাপকাঠিই চালাতে হবে, এ সম্বন্ধে কোনও কথাই উঠ্তে পারে না। সাহিত্য বস্তু যখন এক, তখন তার পরিমাপ-দণ্ডও এক। এবং কীথ সাহেবের মতে যখন ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির মধ্যেই আসন নেবার যোগ্য, তখন স্বভাবতই মনে হয়—ঐ সব সাহিত্য তাঁর মনে যে রসের সঞ্চার করে, সেই রস তিনি ঐ সংস্কৃত সাহিত্য থেকেও পান। সাহেব আরও বলেছেন যে, মধ্যযুগের ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা নিশ্চয়ই ঐ এক মাপকাঠি দিয়েই কাব্যবিচার করতেন, কারণ তাঁরাও যে কালিদাসকে সংস্কৃত ক্লাসিকাল কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দিয়েছেন, পাশ্চাত্য সমালোচকেরাও বিনাদ্বিধায় তাঁকে সেই আসন দেন। "Analogous standards in effect must have influenced the judges of poetry in mediæval India, for they accord in acclaiming as the first of Sanskrit poets Kalidasa, to whom Western critics without hesitation assign the same rank."

এর পর স্বভাবতই জান্তে ঔৎসুক্য হয়, কালিদাসের কবিতা শ্রীযুক্ত কীথ সাহেবকে কতটা কাব্যানন্দ দিয়েছে, এবং কালিদাসের কাব্য-সমালোচনায় তিনি সে আনন্দ ও রসের কেমন ব্যাখ্যা ও বিচার করেছেন। সাহেব তাঁহার ১৩৮ পৃষ্ঠার পুঁথির ১৮ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায়ে কালিদাসের মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যগুলির আলোচনা করেছেন। ঐ অধ্যায়ের প্রায় প্রথমেই কালিদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে এক লাইনে তিনি তাঁর রায় জারি করেছেন।—

"Tennyson is precisely a parallel to Kalidasa; both are poets not so much of inspiration and genius as of perfect accomplishment based on a high degree of talent." অর্থাৎ ইংরেজ কবি টেনিসন হচ্ছেন কালিদাসের ঠিক সমান চালের কবি। ও দুই কবির কাব্যেই প্রতিভার প্রেরণা ততটা নেই, যত রয়েছে উঁচু ধরণের গুণপনার নিখুঁত কারিকুরি।

যে কাব্যপাঠকের কাছে টেনিসন ও কালিদাস তুল্য মূল্যের কবি, তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। কারণ ও মতের জন্ম পাঠক নিজে দায়ী নয়, ভগবান্ তাকে কাব্য-রস আস্বাদের যে শক্তি দিয়েছেন, সেই

শক্তি দায়ী। কিন্তু একটা বিষয়ে ধোঁকা লাগে; যে সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কাব্যেও প্রতিভার প্রেরণা নেই, সে সাহিত্য কখনই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্য নয়। সুতরাং কীথ্ সাহেব তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা তাঁর যথার্থ মনের কথা হতে পারে না। হয় ওটা স্তোকবাক্য, নয় শোনা কথার গতানুগতিক আবৃত্তি। এ দুয়ের যেটাই সত্য হোক, কোনটাই কীথ্ সাহেবের প্রশংসার কথা নয়।

কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে সাহেবের মতের মূল কোথায়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। কীথ্ সাহেবের বিশ্বাস—genius এর inspiration—প্রতিভার প্রেরণা জিনিষটি কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত। যার উপর দিয়ে যায়, তাকে ওলট-পালট না করে' যায় না। ঐ inspiration থেকে যে কাব্য বের হয়, তা বের হয় ঝড়ের মুখে গাছের পাতার মত—ঘুরপাক খেতে খেতে। সে কাব্যের গতি ও প্রকৃতিতে অসামাল রকমের কিছু কিঞ্চিৎ থাকবেই থাকবে। পা যদি না টলে, তবে পেটে যে প্রতিভার মদ নেই তাহা বোঝাই যায়। সুতরাং কালিদাসের কাব্যের যে বৈদর্ভী রীতি,—তার প্রসাদগুণ, তার মাধুর্য্য, তার মসৃণত্ব, সকল রকম আতিশয্য ও অনৌচিত্যের বর্জ্জন আমাদের দেশের কাব্য-রসিকদের মুগ্ধ করেছে, কীথ সাহেবের কাছে তাই কালিদাসের প্রতিভাহীনতার বড় প্রমাণ। ভিতরে যদি প্রতিভার ঝড় বয়, তবে কি তার বাইরের প্রকাশ অমন অনবদ্য সুন্দর, অমন balanced হতে পারে? কাযেই ধরতে হবে—ও কাব্য কবি-প্রতিভা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়, বাইরে থেকে ঘসে-মেজে পালিশ করা জিনিষ। শরতের নির্ম্মল ঊষার সূর্য্যোদয়ে স্রষ্টার সৃষ্টি-প্রতিভা ঋদ্ধ নেই, বোড়ো হাওয়ার এলোমেলো গতিতেই সে প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনে বেশী সন্দেহ না রেখেই বলা যায় যে কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কীথ সাহেবের এই ধারণাটি জন্মেছে যে কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ পরিচয়, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের কাব্য থেকে। ও যুগের কাব্য ইংরেজী সাহিত্যের একটা বড় সৃষ্টি। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হইবে যে ও কাব্য-সাহিত্যের বেশীর ভাগ ভাবের আবেগে অল্পবিস্তর বেসামাল। যে সব কথা ও ভাব এই কবিরা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা তাঁদের কাব্যে রেখা ও রঙে পরিপূর্ণ ফুটে ওঠে নি। কাব্যের আত্মা যেন প্রকাশের আবেগে কাব্যের দেহকে পীড়া দিচ্ছে, কাব্যের দেহ যেন তার আত্মার প্রকাশের পথে অন্তরায়। কীথ সাহেবের বিশ্বাস, এই হচ্ছে genius এর inspiration এর লক্ষণ। প্রতিভার প্রেরণায় এ সব কবিদের ভিতরকার ভাবের বেগ এত প্রবল যে, তা বাইরে আসতে কাব্যের দেহটাকে একটু বেঁকেচুরে দেবেই দেবে, আর সে সব ভাব এত গভীর যে, ভাষায় তাহার সবটা প্রকাশ হতেই পারে না। এ ধারণার মধ্যে কীথ্ সাহেবের মৌলিকত্ব কিছু নেই। Genius বস্তুটা যে unbalanced, প্রতিভা যে পাগ্লামিরই জ্ঞাতি-ভাই, এ মনস্তত্ত্ব বেশ প্রাচীন। আর এঞ্জিনের ভিতরে যে ষ্টিমের জোর কতটা, তা বয়েলার না ফাটলে অনেকেই বুঝতে পারে না।

যারা যথার্থ কাব্য-রসিক তাদের অবশ্য বুঝতে দেরী হয় না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের এটা গুণ নয়—দোষ। ইংরেজ সমালোচকদের কেহ কেহ বলেছেন যে, ও যুগের কবিদের প্রতিভা যত বড়, তাঁদের কাব্যসৃষ্টি তত বড় নয়। তাঁদের কাব্য থেকে ধারণা হয়—যেন তাঁদের প্রতিভা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে নি। (১)। প্রতিভা ও তার প্রকাশের মধ্যে এই ব্যবধান-

(১) "........the poetry does not fully correspond in greatness with the genius of the poets"......"impression of genius which fails to reach full accomplishment." Bradley—The Long Poem in Wordsworth's Age. (Oxford Lectures on Peetry পৃঃ ১৮০-১৮১।)

কল্পনা কল্পনা মাত্র। কবি-প্রতিভা ভাব ও 'আইডিয়ার তীব্র অনুভবের ক্ষমতা নয়; ভাব ও 'আইডিয়াকে' রসমূর্ত্তিতে রূপান্তরের ক্ষমতা। কাব্যে যদি সে রূপান্তর সম্পূর্ণ না হয়, তবে কবির প্রতিভার লাঘবতাই তাঁর কারণ। উনবিংশ শতাব্দীর আকাশে বাতাসে সাম্য, স্বাধীনতা, বিশ্বমানব, বিশ্বপ্রেম, প্রকৃতি, মানবাত্মা, অনন্ত উন্নতি প্রভৃতি যে সব বড় বড় ভাবের বড় বড় কথা ভেসে বেড়াচ্ছিল, ও যুগের অনেক ইংরেজ কবির মনকেই তা মুগ্ধ ও আবিষ্ট করেছিল এবং ঐ সব ভাব তাঁরা তাঁদের কাব্যের বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাব্যের অনেক স্থানেই ও সব ভাব কবি-প্রতিভার জারক রসে কাব্যে পরিণত না হয়ে ছন্দে বদ্ধ ভাব বা আইডিয়া রূপেই প্রকাশ হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের কবিতার ও সব জায়গা কাব্য হয় নি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর

Our birth is but a sleep and a forgetting
The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar;
Not in entire fogetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God, who is our home.

—কাব্যরসে মনকে সিক্ত করে না, কারণ, এখানে তত্ত্ব কথা প্রায় তত্ত্বকথার আকারেই প্রকাশ হয়েছে। আর কেবল তত্ত্বরূপে ওটি তাদের চিন্তাকেই নাড়া দিতে পারে, পৃথিবীর তত্ত্বদর্শীদের চিন্তার সঙ্গে যাদের কোনও পরিচয় নেই। অথচ জীবনের যে সব তথ্য তত্ত্বান্বেষীদের চিন্তার খোরাক, কবি-প্রতিভার মোহিনী মায়া তাকে কাব্যের অপরূপ রূপে প্রকাশ করতে পারে।

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

হঠাৎ হ'ল দ্বিগুণ আঁধার
ঝড়ের মেঘে।
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল কখন
দ্বিগুণ বেগে!
ঘোলা জলের স্রোতের ধারা
ছুটে এল পাগল পারা,
পাতার ভেলা ডুবল নালার
তুফান লেগে,
হঠাৎ বৃষ্টি নাম্‌ল যখন
দ্বিগুণ বেগে!

সেদিন আমি ভেবেছিলেম
মনে মনে
হতবিধির যত বিবাদ
আমার সনে!
ঝড় যে এল আচম্বিতে
পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিতে,
আর কিছু তার ছিলনা কা[illegible]
ত্রিভুবনে
হতবিধির যত বি[illegible]
আমার স[illegible]

আজ আষাঢ়ে এক[illegible]
কাট্‌ল বেলা।
ভাবতেছিলেম এতদিনের
নানান্ খেলা!
ভাগ্য পরে করিয়া রোষ
দিতেছিলেম বিধিরে দোষ!
পড়ল মনে নালার জলে
পাতার ভেলা!
ভাবতেছিলেম এতদিনের
নানান্ খেলা!

—জীবনের সুখদুঃখের যে রহস্য, তা এখানে রসমূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে, কেবল তত্ত্বরূপে প্রকাশ হয় নি। শেলী
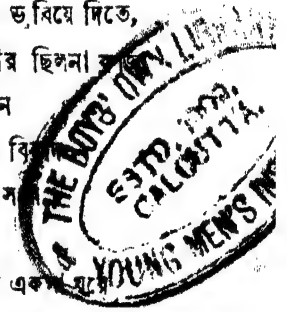
যে কটি লাইন দিয়ে Prometheus Unbound শেষ করেছেন,—

To defy power, which seems omnipotent ;
To love and bear , to hope till
Hope creates
From its own wreck the thing it contemplates ;
Neither to change, nor falter, nor repent,
This, like thy glory, Titan, is to be
Good, great and joyous, beautiful and free ;
This is alone Life, Joy, Empire and Victory.

—হাতে তাঁর মানুষ সম্বন্ধে উঁচু আদর্শটি বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এও বেশ বোঝা যায় যে, ও আদর্শ অমন ভাবে প্রকাশ করতে কবির প্রয়োজন হয় না, কবি ছাড়া অন্য লোকেও পারে। টেনিসনের—

Till the war drum throbb'd no longer, and the battle flags were furl'd
In the Parliament of man, the Federation of the world.

উড্রো উইলসনের মুখ দিয়ে বছর কয়েক পূর্ব্বে প্রথম বেরুলে কেউ আশ্চর্য্য হত না, এবং ওকে কাব্য বলেও কারু সন্দেহ হত না।

পৃথিবীর মহাকবিদের কাব্য প্রবন্ধে মনন-সর্ব্বস্ব ভাব বা আইডিয়ার এই আবিলতা নেই। সাময়িক ভাব বা আইডিয়া তাঁদের লৌকিক মনকে যতই দোলা দিক, মহাকবিদের রস-সমাহিত চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারে না। বড় জোর ও রকম দু একটা ভাব তাঁদের কাব্যের চিরন্তন রসের নূতন উপাদানের কাজ করে। গেটের সঙ্গে এসব ইংরেজ কবিদের তুলনা করলেই প্রভেদ বোঝা যায়। যে সব 'আইডিয়া' ইংরেজ কবিদের কবিচিত্তকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের সঙ্গে নিকট ও নিবিড় পরিচয়ে গেটের তুলনায় তাঁরা সব ছিলেন শিশু। কিন্তু গেটের কাব্যে এদের সাক্ষাৎ প্রভাব অতি সামান্য। কবি-প্রতিভার আগুনে গলে' রস-মূর্ত্তি না ধরে' কোনও ভাব কেবল আইডিয়ারূপে তাঁর কাব্যে প্রকাশ হতে পায়নি। কবির শেষ বয়সের রচনায় যেখানে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, যেমন দ্বিতীয় খণ্ড 'ফষ্ট', সেখানে কাব্যের কাব্য-গৌরবও লাঘব হয়ে এসেছে।

কালিদাসের কাব্যের রসে-অপরিণত-ভাবের আবিলতায় অনাবিল স্বচ্ছ রসকে কীথ সাহেবের অপটু চোখে অগভীর সাদা জল বলে' মনে হয়েছে। ওর অমৃতের আস্বাদ উগ্র স্বাদগন্ধের অভাবে সাহেবের মনের রসনাকে তৃপ্তি দেয় নি। কাব্য যে 'রোষ্ট মীট' নয়, অন্য জিনিষ, তা বুঝ্‌বার মত রসজ্ঞতা সাহেবের নেই। কালিদাসের যে কাব্য অন্তরের সুষমার পরিপূর্ণ মূর্ত্তি নিয়ে প্রভাতের পদ্মের মত ফুটে উঠেছে, কীথ সাহেব তাকে ভেবেছেন কাগজের ফুল।

সাহেব লিখেছেন, "We need not seek in Kalidasa for any solution or suggested solution of the mysteries of life"; যেন কাব্যের একটা কাজ জীবন রহস্যের সমাধান! সাহেবের ভেবে দেখার অবসর হয় নি যে, জীবনের রহস্যের সমাধান চেষ্টা যদি কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের একটা মাপ কাঠি হত, তবে শেলী হতেন সেক্‌স্‌পীয়রের চেয়ে অনেক বড় কবি। কথায় কথায় যারা mysteries of lifeএর solutionএর কথা বলে, জীবন যে 'মিষ্ট্রী' সেটা তাদের অন্তরের ধারণার কথা নয়, কাণের শোনা কথা। যার সমাধান জানা আছে সেটা মোটেই 'মিষ্ট্রি' নয়। কবি পাঠকের হাতে জীবন-রহস্যের চাবী তুলে দেন না, ঐ রহস্যের বিস্ময়রসে তার মনকে ভরে তোলেন। কালিদাসের কাব্য থেকে কীথ সাহেবের মনে সে রস আসা অসম্ভব, কারণ, বক্তৃতা করে' ও রহস্যের কথা কালিদাস তাঁর কাব্যে কোথাও বলেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের মত কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রচলিত সমাজ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

প্রচার না করায় কীথ্ সাহেব ক্ষুণ্ণ হয়েছেন; "with the orthodox views of his time he seems to have been fully content." অন্যত্র তিনি তাঁর কাব্যে প্রচলিত ব্যবস্থায় অবিক্ষুব্ধ সন্তোষের চিহ্নের কথা বলেছেন,—"The calm contentment with the established order which marks all his works." এ চিহ্ন অবশ্য আর কিছু নয়—বিদ্রোহ চিহ্নের অভাব। কারণ, কালিদাসের কাব্য থেকে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর সন্তোষের চিহ্ন দূরে থাকুক, সে ব্যবস্থাটা কেমন ছিল, তার চিহ্ন খুঁজে বের করা ইণ্ডলজিষ্টেরও অসাধ্য। Established order যুগে যুগে বিভিন্ন, সুতরাং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধরণও ভিন্ন। ঐ বিদ্রোহ যদি কাব্যের প্রধান বিষয় হত, তবে এক যুগের কবির কাব্য ঐতিহাসিক ভিন্ন অন্য যুগের লোকের অপাঠ্য হত। ইংরেজ কবিদের বিদ্রোহ বার্ত্তা তাঁহাদের কাব্যের রস যে কত কমিয়েছে তা কাব্যরসিকদের অবিদিত নেই। ওগুলি তাঁদের কাব্যের বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়।

(৪)

শ্রীযুক্ত কীথ সাহেবের কাব্য-বিচার আর বেশী বিচারের উপযুক্ত নয়। কিন্তু তাঁর রসগ্রাহিতার একটা নমুনা দেবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

'মেঘদূত' নিয়ে সাহেব একটু গোলে পড়েছেন। ঐ ছোট কাব্যটির খুব বড় প্রশংসা তিনি শুনে এসেছেন, অথচ তাঁর চোখে ও কাব্যের জবর রকম সব খুঁত ধরা পড়েছে। প্রথম ও কাব্যে বাস্তবতার অনেকটা অভাব, কারণ বিরহী যক্ষ ও তার প্রিয়া মানব মানবী নয়, আর তাদের বিরহটা চিরস্থায়ী না হ'য়ে মাত্র বর্ষস্থায়ী। "We miss......in this poem a certain measure of reality through the divine character of the Yaksa and his bride; their severance is but temporary, their reunion certain." বোধ হয় বিরহী যক্ষের 'টাই কলারের' দুরবস্থা বর্ণনা না থাকাতেও কীথ সাহেবের রস-বোধের বাধা হয়েছে। আর বিরহ ব্যাপারে সাহেব ত একবারে চরমপন্থী; যম যে বিচ্ছেদ ঘটায়নি, সাহেবের তা মনেই ধরে না। কিন্তু এগুলি ছোট দোষ। কারণ সাহেবের 'আধুনিক চিত্তে' যক্ষের বিরহ দুঃখটাই একেবারে অপুরুষোচিত ব'লে মনে হয়েছে,—এক বছরের বিরহ তার আবার দুঃখ! ওতে দুঃখ করতে নেই, যে হেতু গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডেস্ বলে গেছেন দেবতারা যে সব দুঃখ দেন তা বীরের মত সহ্য করাই মানুষের কর্ত্তব্য—"The grief of the hero seems thus to modern feeling less than manly, for to us, as to the greatest of Greek historians, courage to endure what is sent by heaven appears the duty of man."! কালিদাসের মত বেচারী সেক্সপীয়রেরও থুকিডিডেস্ পড়া ছিল না, কারণ তাঁর ক্ল্যাসিক্স্-এ বিদ্যা ছিল নর্থের অনুবাদে প্লুটার্ক পর্যন্ত। নইলে Romeo and Juliet কি Othelloর মত নাটক কখনই লিখতেন না! আর কালিদাসের কর্ত্তব্য ছিল হয় যক্ষকে একবারে নীরব রাখা, নয় তার মুখে কেবল বীররসের শ্লোক দেওয়া। এবং যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও প্লেগে ভীত এথেন্সের নাগরিকদের ক্রোধ-শান্তির ও দুঃখ উপশমের জন্য যে সব যুক্তি থুকিডিডেস্ পেরিক্লিসের মুখ দিয়ে বের করেছেন (১), তার সঙ্গে যে মেঘদূতের বিরহ দুঃখের এত ঘনিষ্ঠ যোগ এ আবিষ্কার একবারে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার কাজ।

তাই ব'লে কীথ সাহেব মেঘদূতের উপর একান্ত নিকরুণ নন। "But this artistic defect must

---

(১) "Such were the arguments by which Pericles tried to cure the Athenians of their anger against him, and to divert their thoughts from their immediate afflictions. (Thucydides, Book II, chap. VII.)

not be exaggerated ;...........the poem, stripped of its setting, speaks to us in tones of unmistakable earnestness of the sorrows of parted lovers, the melancholy delight in remembrance and the joyful hope of reunion।" তিনি এ সব আর্টিষ্টিক দোষ গুলিকে খুব বাড়িয়ে দেখতে নিষেধ করেন। কারণ ও কবিতাকে তার আবেষ্টন থেকে সরিয়ে নিয়ে অর্থাৎ রামগিরির আশ্রম থেকে অলকাপুরী পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে, আর কনক-বলয় ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠ যক্ষ ও তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা তার কান্তাটিকে মন থেকে দূর ক'রে, সাহেব মেঘদূতের বিরহ-দুঃখ ও মিলনের স্মৃতি ও আশার আনন্দের মধ্যে বেশ আন্তরিকতা দেখতে পান। কীথ সাহেবের ঐতিহাসিক মনে চট করে প্রশ্ন উঠেছে মেঘদূতের বিরহ দুঃখ কালিদাসের জীবন চরিতের একটা অধ্যায় কিনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকতার অনুরোধে স্বীকার করতে হয়েছে যে প্রশ্নটার উত্তরের উপায় নেই, "the question is insoluble।" যা হোক সে জন্ত কীথ সাহেবের দুঃখ নেই, কারণ—"it is enough that the poem is a mastrpiece of the description of the deepest, yet most tender affection, in which passion is purified and ennobled"—এই যথেষ্ট যে এ কবিতা গভীরতম অথচ সুকুমারতম হৃদয়-বৃত্তির বর্ণনার পরাকাষ্ঠা, যা চিত্তের ভাবাবেগকে বিশুদ্ধ ও মহীয়ান করে। কীথ সাহেবের 'আধুনিক চিত্তের' বাহাদুরী আছে। যা তাঁর কাছে "less than manly," পুরুষোচিতই নয়, তাই আবার তাকে পূত ও উন্নত করে! কিন্তু এরও একটা কারণ আছে। কীথ সাহেব 'মেঘদূতের' 'মরাল'টা ধরে' ফেলেছেন। যেমন কুমারসম্ভবে দেব দেবীর প্রেম তেমনি মেঘদূতে যক্ষ-যক্ষিণীর প্রেম—দু-ই হচ্ছে মানব-প্রেমের আদর্শ, অর্থাৎ মানুষের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমনি ভালবাসাই থাকা উচিত। "The affection of the divine pair is symbolic of the love which ought to be reproduced on earth between husband and wife. Suggestion is the soul of poetry ; in the description in Kumarsambhava as in the Meghaduta of superhuman love we have the examplar for love on earth. Viewed thus, the poem gains greatly in attractiveness, and premits us to enjoy the marvellous feeling for nature and power of depicting human emotion which Kalidasa displays।" এই 'মরাল'টি আবিষ্কার করে' তবে কীথ সাহেবের কালিদাসের কাব্যের রস গ্রহণের বাধা দূর হয়েছে। আর ধ্বনি যে কাব্যের আত্মা এ তত্ত্ব কীথ সাহেব কি গভীর ভাবেই বুঝেছেন! ধ্বনি হচ্ছে 'মরাল'; যেমন "কথামালার" 'বক ও নেকড়ে বাঘ' গল্পটির ধ্বনি হচ্ছে—'শঠের কথায় বিশ্বাস করিলে বিপদ ঘটে'। কীথ সাহেবের এ পুঁথি খানির শেষ অধ্যায়ের নাম 'Theories of Poetry'—কাব্য-তত্ত্বের মতামত। এতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কথা আছে। যে কোনও দিন কীথ সাহেবের হাত থেকে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঁথি বের হ'তে পারে!

(৫)

শ্রীযুক্ত কীথ সাহেবকে ইউরোপের 'আধুনিক চিত্তের' আদর্শ মনে করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তিনি 'ইণ্ডলজিষ্ট'দের খাঁটি নমুনা। এঁদের ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজ, সভ্যতা সকল কিছুর বিচার কীথ সাহেবের কাব্যবিচারের মত,—হাস্য রসের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

পুনর্জ্জন্ম

(উপন্যাস)

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবকুমার যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন আন্দামানে যাইবার পণ তাহার আরও দৃঢ় হইয়াছে।

আজ সে সাগরিকাকে যে চোখে দেখিয়াছিল, আর ত কখনো তেমন দেখে নাই। দেওঘরের সেই দেবনিবাসে যেদিন সে তাহাকে দেখিয়াছিল, দেখিয়া ভালবাসিয়াছিল—আন্দামানযাত্রী সাগরকে সে আজ সে-চক্ষে দেখিতে পাইল না। সাগরের সঙ্গসুখের উন্মাদনা দেওঘরে তাহাকে যেমন পাগল করিয়াছিল, আজিকার দেখায় সে মত্ততার লেশমাত্রও ছিল না। দায়রার বিচারের পর বন্দিনী সাগরিকাকে দেখিয়া দেবকুমার যখন পণ করিয়াছিল যে, তাহাকে বিবাহ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আজ সে আর তাহাকে সে চক্ষেও দেখিতে পাইল না। কর্ত্তব্যপালন করিয়াছে বলিয়া যখন কোনও মানুষের হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ জাগ্রত হয়, জেটির উপর সাগরকে দেখিয়া আজ আর দেবকুমারের হৃদয়ে সে ভাবও আসিল না। তাহার সমস্ত অন্তর আজ সাগরের প্রতি করুণায় ও মমতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেবকুমার যেদিন সাগরকে প্রথমবার জেলখানায় দেখিয়াছিল, সেইদিনও তাহার হৃদয়ে এই ভাবই ফুটিয়াছিল। জেল হাঁসপাতালে সাগরের অভিসার-কাহিনী শুনিয়া প্রথমে দেবকুমারের মনে দারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে সে যখন তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, সেদিন দেবকুমারের মনে যে ভাব হইয়াছিল, —সাগরিকাকে আজ সত্যসত্যই আন্দামানে যাইতে দেখিয়া দেবকুমারের হৃদয়ে সেই ভাব হইল। আজ আর উহা জলতরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া বুদ্বুদের মত বিলুপ্ত হইল না—আজ উচা পাথরের গায়ে ধারালো কুড়ুলের দাগের মত বসিয়া গেল।

সেইদিন হইতে দেবকুমারের সকল কার্য্যে ও সকল চিন্তায় সেই মমতা ও করুণা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। দিনে দিনে উহা সাগরিকাকে ছাড়িয়া বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এতদিন যে প্রেমধারা দেবকুমারের হৃদয়-কন্দরে আবদ্ধ ছিল, ছুটিয়া বাহিরে আসিতে পথ পায় নাই, এখন তাহা বাঁধনহারা বানের নদীর মত ধাইয়া চলিল। সেই অপার্থিব প্রেমের স্পর্শে শেষে লীলা ও শশিকুমার পর্য্যন্ত দেবকুমারের সহায় হইয়া উঠিল। উকীল শ্রীনাথ বাবু পর্য্যন্ত আসিয়া দেবকুমারের সহকর্ম্মী হইলেন। ত্যাগ এমনি করিয়াই জয়লাভ করে।

এক বৎসরের মধ্যেই শশী ও লীলা যখন দেবকুমারের বালিগঞ্জের বাড়ীতে মাতৃমঙ্গল-মন্দির স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালার পরিত্যক্ত শিশু ও লাঞ্ছিত নারীর কল্যাণে নিযুক্ত হইল, দেবকুমার তখন সেবার জন্য তাহার সর্ব্বস্ব উহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া কোথায় যে লুকাইল, কেহ জানিল না।

* * *

পোর্ট ব্লেয়ারের মেয়ে-ফাটকে ও কলিকাতার জেলখানায় সাগরের কাছে কোনো প্রভেদ বোধ হইত না; কারণ, সে জানিত যে, তাহার বহু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। ওয়ার্ডার ও জেলকর্ম্মচারীদের চক্ষু এড়াইয়া সাগরিকা এতদিনও দেবনিবাসের সেই অস্পষ্ট ফটোগ্রাফ-খানা কাছে কাছে রাখিয়াছিল। রাত্রিতে সকলে যখন ঘুমাইত, সাগরিকা তখন যক্ষের ধনের মত উহা বাহির করিয়া মাথায় রাখিত, চোখের জল মুছিতে মুছিতে

উহার দিকে চাহিয়া রহিত, ফটোগ্রাফের দেবকুমারের কাছে করযোড়ে কত ক্ষমা চাহিত।

দেবকুমার যে আন্দামানে আসে নাই, সে জন্ত সাগর সুখীও হইয়াছিল, আবার কাঁদিয়াওছিল। সে সুখী হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, তাহাকে ভুলিতে না পারিলে দেবকুমারের জীবন যে অতিবড় দুঃখে কাটিবে! দেবকুমার দুঃখ পাইবে, এই কথা মনে হইলেই সাগরের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সে যে তখন দেবকুমারকে ক্ষমা করিয়াছিল—জননী যেমন সকল অন্তরের সঙ্গে অপরাধী পুত্রকেও ক্ষমা করেন, সেই রূপ! আর যে সে দেবকুমারকে দেখিতে পাইবে না, এইজন্ত তাহার নয়নে ধারা বহিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। সে বুঝিল যে, নিজের তৃপ্তি ও সুখের বাসনা—সে ত হীন স্বার্থপরতা।

ত্যাগের ভিতর দিয়াই যে মানুষ তাহার সার্থকতা লাভ করে, এই সত্য হৃদয়ে ধরিবার জন্ত যে সাধনার প্রয়োজন, কলিকাতার কারাজীবনের শেষভাগ এবং আন্দামান-বাস সাগরিকাকে সেই সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিল। সাগরিকা আন্দামানে আসিবার কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে, কয়েদীদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জন পীড়িত হইয়া মরিতেছে। পোর্টব্লেয়ারের সেলুলার জেলে সে বার অর্দ্ধেকের বেশী কয়েদীকে পীড়াগ্রস্ত দেখিয়া জেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ও ডাক্তার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কয়েদীদের মধ্যে যাহারা সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত ছিল, রোগীর সেবার জন্ত তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইল। কেহ বা সেই জন্য ভাইপার আইল্যাণ্ড, কেহ বা মিডল্‌পইন্ট জেলহাঁসপাতালে প্রেরিত হইল।

মানুষ ভাবপ্রবণ জীব। ভাব-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতেই সে তাহার কার্য্যজীবনকে গড়িয়া লয়। শুধু তাহার নিজের হৃদয়ই যে তাহার কর্ম্মনিয়ন্তা হয়, তাহা নহে, পরের হৃদয়ও তাহার কর্ম্মকে নির্দ্দিষ্ট করে। সাগরিকা ছিল সেই শ্রেণীর নারী, যাহারা শুধু নিজের মনের ইঙ্গিতকে মানিয়াই চলিত না, পরের উপরও অনেকটা নির্ভর করিত। মেয়ে-কাটকের যে ওয়ার্ডে সাগরিকা স্থান পাইয়াছিল, সেই ওয়ার্ডের একটী বৃদ্ধা কয়েদী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। পোর্টব্লেয়ারে তাহার নাম ছিল 'বুড়ী-মা'। বুড়ী-মা এবং সাগর এক প্রকোষ্ঠেই থাকিত। সাগরে ও অন্তান্ত মেয়ে-কয়েদীতে যে অনেকটা প্রভেদ, বুড়ী-মা অল্পদিনেই তাহা বুঝিতে পারিল। সে দেখিতে লাগিল, সাগরিকা স্বল্পভাষিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও দয়াময়ী। প্রত্যহ কয়েদীদের জন্ত যে কঠোর ও শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইত, সাগরিকা অম্লানবদনে তাহা ত করিতই, সুবিধা পাইলেই অপরকেও সাহায্য করিত। নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি পাকাইতে পাকাইতে যদিও সাগরিকার দুই হাতে ঘা হইয়াছিল, কিন্তু পাছে আর একজন তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দড়ী পাকাইতে না পারিয়া নির্য্যাতিত হয়, সাগরিকা সেই জন্ত তাহার দড়ীও নিজেই পাকাইয়া দিত।

বুড়ী-মার কায ছিল রোগীপরিচর্য্যা। একদিন ডাক্তার বাবুকে বলিয়া সে সাগরিকাকে সঙ্গে লইল। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে দেখিতে পাইল যে, খুনী-আসামী হইলেও সাগরিকার অন্তর মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ—ব্যথিতের বেদনায় সে কাঁদে, রোগীর যন্ত্রণা দেখিলে সে ব্যাকুল হয়। হাঁসপাতালে তাহার কর্ত্তব্য যতটা, সে স্বেচ্ছায় তাহার অনেক বেশী করে।

আন্দামানের জেল এবং কয়েদী-গ্রাম দুর্নীতি ও দুরাচারে পরিপূর্ণ। অনেক মানুষ সেখানে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। সাগরিকার অন্তরে তখন পবিত্রতার যে তেজ প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার দীপ্তি দেখিয়া কোনো রূপ-মুগ্ধ নর-পশুই সাগরের সম্মুখে আসিতে সাহস করিত না। একদিন সাগরিকা ভগবানে যে বিশ্বাস হারাইয়াছিল, বুড়ী-মার স্নেহে ও উপদেশে সে আবার সেই হারাণো মাণিক ফিরিয়া পাইল। সে মাণিক শেষে এমনি করিয়াই সাগরের হৃদয়টী জুড়িয়া বসিল যে, দেবকুমারের স্মৃতি পর্য্যন্ত আর সেখানে রহিল না। যে ফটোগ্রাফখানা এতদিন সাগরের নিদ্রার স্বপ্ন ও জাগরণের

ধ্যান ছিল, এখন তাহা ধূলায় পড়িয়া রহিল। সকলের সকল অপরাধকে ক্ষমা করিয়া, সকলের ব্যথাকে দূর করিবার জন্ম সাগর তখন ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহের মত বহিয়া চলিল। এতদিন সে মনে করিত, তাহার নারী-জন্ম শুধু পরের ভোগের ক্ষুধাকে মিটাইবার জন্তই —নিষ্কৃতি নাই, পলায়নের উপায় নাই, আত্মরক্ষার বল নাই। কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারিল, তাহার দীপ্ত তেজের কাছে আসে কাহার সাধ্য? বহুবলধারিণী সে। জেলখানার নারী-কয়েদীরা সেই তেজের কণামাত্র পাইয়া ধন্ত হইতে লাগিল। তখন সেলুলার জেল-হাঁসপাতালে রোগীর শিয়রে 'কয়েদী-মা' আসিয়া বসিলেই রোগী মনে করিত, তাহার ব্যথা অনেকটা দূর হইল। পারুল তখন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল—সেলুলার জেলে সঞ্চারিণী দীপশিখা হইয়া রহিল 'কয়েদী-মা'।

দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। মড়ক লাগিলে কয়েদী-মা যে কতবার নিজেকে বিপদাপন্ন করিয়াও পরম আগ্রহে রোগী-পরিচর্য্যা করিয়াছিল, তাহা জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইতে চীফ-কমিসনার পর্য্যন্ত কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। সাগরিকা যাহাতে জেলখানার বাহিরে কয়েদী-গ্রামে স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সে জন্ত চীফ-কমিশনারকে বিশেষ করিয়া বলিলেন।

চীফকমিশনার বলিলেন, "এই কয়েদীর প্রশংসা আমার স্ত্রীর মুখেও অনেকবার শুনেছি। তিনি যখনই জেলখানা দেখ্‌তে আসেন, তখনই একবার একে দেখে' যান।"

সাগরিকাকে ডাকিয়া আনাইয়া চীফকমিশনার বলিলেন, "তুমি কি জেলের বাইরে আস্‌তে চাও?"

সাগরিকা ভূলগ্নদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেই ভাবেই বলিল, "কোথায়?"

"জেলখানার বাইরে, কয়েদীদের গ্রাম আছে। তারা সেখানে থাকে। আপন ইচ্ছামত কাযকর্ম্ম করে, জীবিকা নির্ব্বাহ করে।"

সাগরিকা বলিল, "সাহেব, আমার কাছে জেলখানাও যা', কয়েদীদের গ্রামও তাই। আপনার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে আমায় রাখ্‌তে পারেন।"

চীফকমিশনার বলিলেন, "জেলখানার নিয়ম যে, দশ বৎসর জেলে না থাক্‌লে, কেউ গ্রামে গিয়ে স্বাধীন ভাবে বাস কর্‌তে পায় না। তোমার চরিত্র ও কাযের এত সুখ্যাতি শুনেছি যে, তারই পুরস্কার স্বরূপ তোমায় গ্রামে থাক্‌বার পাস দিচ্ছি।"

সাহেবকে ধন্তবাদ জানাইয়া সাগরিকা বলিল, "আমি একা এ অনুগ্রহ চাই না।"

চীফকমিশনার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "চাও না?"

"আন্দামানে এসে আমি এক দেবীর দেখা পেয়েছি। তিনি বৃদ্ধা। যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। তাঁর আশীর্ব্বাদেই আমি ভগবানকে ডাক্‌তে শিখেছি। তাঁকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাইনে—কয়েদীগ্রাম ত দূরের কথা। তাঁকে ছেড়ে আমি দেশেও যাব না।"

সাহেব বলিলেন, "তুমি বুঝি বুড়ী-মার কথা বলছ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তাকে ত একবার পাস দিয়েছিলাম। সে বাইরে যেতে চাইলে না। বল্লে, এখানকার হাঁসপাতালে রোগীর সেবা করে' দিন কাটাবে।"

সাগরিকা নম্র কণ্ঠে কহিল, "যদি হুকুম হয়, আমি তাঁকে সঙ্গে নিতে পারি।"

চীফকমিশনার সন্তুষ্টচিত্তে সেইরূপ আদেশ দিলেন। সাগরিকা বলিল, "শুনেছি জেলখানার বাইরে কয়েকটা হাঁসপাতাল আছে। আমরা সেখানে গিয়ে কায কর্‌তে পারি কি?"

"যদি ইচ্ছা হয় সে সব হাঁসপাতালে গিয়ে কায করতে পার, আমি সে আদেশও দিচ্ছি।"

সাগরিকা হৃষ্টচিত্তে কহিল, "সাহেব, তোমার জয় হোক। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

সেইদিন রাত্রিতে সাগরিকা ও বুড়ী-মা তাহাদের নূতন জীবন সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিল এবং পরদিন প্রভাতে ভগবানকে স্মরণ করিয়া যখন তাহারা সেলুলার

জেলের বাহিরে আসিল, তখন অনেক কয়েদীর চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া ধারা বহিল।

চারি বৎসর পরে মুক্ত প্রকৃতিকে সম্মুখে পাইয়া সাগরিকার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে তখন দেখিতে লাগিল, প্রতি-বৃক্ষপত্রে তাহার নারায়ণের আসন—সে তখন উপলব্ধি করিল, বায়ুর প্রতি শ্বাসে তাহার ভগবানের অমৃত পরশ—সে তখন শুনিতে পাইল, প্রতি-বিহগের কণ্ঠে তাহার পরমদেবতার বন্দনাগীতি।

নয়নজলে ভিজিতে ভিজিতে সাগরিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মাতৃ-মঙ্গল-মন্দির প্রতিষ্ঠা শেষ হইলে পর সেবার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দেবকুমার গঙ্গার ঘাটে আসিল এবং পোর্টব্লেয়ারগামী জাহাজের অন্বেষণ করিতে লাগিল। জেটির পর জেটি ঘুরিয়া সে শুনিল যে, কলিকাতা হইতে কোনো জাহাজই পোর্টব্লেয়ারে যাইবে না, তবে তাড়াতাড়ি রেঙ্গুনে যাইতে পারিলে দুই-একখানা যাত্রী-জাহাজ বা মাল-জাহাজ মিলিতে পারে।

রেঙ্গুনগামী বড় একখানা জাহাজ তখন হাইকোর্টের ঘাটে লঙ্গর করিয়াছিল। তাহার নাম আরান্‌কোলা। দেবকুমার শুনিল যে, আরানকোলা ছাড়িতে আর আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। সে অমনি জাহাজে উঠিয়া বসিল। লীলা এবং শশিকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আর ঘটিল না।

রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া দেবকুমার জেটিতেই শুনিতে পাইল যে, কতকগুলি কুলি লইয়া ছোট একখানা জাহাজ সেই রাত্রিতে মধ্য-আন্দামানে যাইবে। কালবিলম্ব না করিয়া দেবকুমার কুলি হইবার জন্য জাহাজের সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল। সাহেব মধ্য-আন্দামানের বন-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী, কুলি সংগ্রহ করিবার জন্য রেঙ্গুনে আসিয়াছিলেন। দেবকুমারকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "তোমার দ্বারা হবে না। দেখ্‌চি তুমি ভদ্র-ঘরের ছেলে, তাতে আবার অলস বাঙ্গালী। তুমি কি আর বনে গিয়ে কাঠ কাট্‌তে পারবে? তোমার মত লোক নিয়ে যাওয়া মানে অনর্থক গবর্ণমেণ্টের খরচ।"

নানা অনুরোধ করিয়াও যখন দেবকুমার সাহেবকে সম্মত করাইতে পারিল না; তখন সে জাহাজের বড় সারেংএর শরণ লইল। সারেংএর বাড়ী চট্টগ্রামে। সে যখন দেবকুমারের মুখে শুনিল যে, বাঙ্গালী বলিয়া বনের সাহেব তাহাকে লইতে চাহে না, তখন সে বিনা-বাক্যব্যয়ে দেবকুমারকে নিজের ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিল। এরূপ করিবার একটি কারণ ছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই সারেংএর সহিত সাহেবের বিবাদ হইয়াছিল। আন্দামানের নিবিড় বনভূমি ব্যারাটাং হইতে অনেক দিন পরে লোকালয়ে আসিয়া সাহেব সে রাত্রিটা, একজন বন্ধুর বাড়ীতে বল-নাচের নিমন্ত্রণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে নিমন্ত্রণের সংবাদটা পাইয়াই সাহেব কহিলেন, "আজকার মত জাহাজখানা ঘাটেই থাক্।" সারেং মানিল না—তাহার তখন ষ্টীম প্রস্তুত। বিনা-কারণে জাহাজ বাঁধিয়া রাখিলে কয়লার দাম দিবে কে? কোম্পানী ত ক্ষতি সহিবে না, সারেংএর নিকট হইতে কয়লার দাম আদায় করিবে। সাহেব কয়লার দাম দিতে প্রস্তুত হইলেন না। বলিলেন তাঁহার হুকুম, জাহাজ ঘাটে থাকিবেই। সারেংও রাত্রি দশটার পর জাহাজ রাখিতে চাহিল না। সারেংএর উপর বিরূপ হইয়া সাহেব বাঙ্গালী জাতিটার উপরই চটিয়া গেলেন। দেবকুমার তাই রূঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইল। সারেং যে সে জাহাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহাই দেখাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত দেবকুমারকে আশ্রয় দিল।

পথে আসিতে আসিতে জাহাজের সারেং দেবকুমারের জীবন-কাহিনী শুনিয়াছিল। রেঙ্গুনে ফিরিয়া যাইবার জন্য সে বার বার দেবকুমারকে অনুরোধ করিতে লাগিল। দেবকুমার সে কথা শুনিল না। বন্দরে জাহাজ লাগিবার পরদিন কুলিরা ব্যারাটাং অভিমুখে চলিয়া গেল। সেখানে তখন একখানি সরকারি ষ্টীমারে কাঠ বোঝাই হইতেছিল। সে ষ্টীমারের ওখানি সারেংএর

গ্রামের লোক। সারেং-এর অনুরোধে সে দেবকুমারকে চ্যাথামে লইয়া যাইতে সম্মত হইল।

দক্ষিণ-আন্দামানের চ্যাথাম দ্বীপে কাঠের সরকারি কারখানা ও একটী বন্দীনিবাস আছে। চ্যাথামে নামিয়া দেবকুমার সাগরিকার অনেক সন্ধান করিল, কিন্তু কেহই তাহার কথা বলিতে পারিল না।

দক্ষিণ-আন্দামানের পূর্ব্বতীরে পোর্টব্লেয়ার। তাহাও আবার চারিটী জেলায় বিভক্ত। পোর্টব্লেয়ারের নানা স্থানে তখন অনেক বন্দী-নিবাস ছিল। সে সময়ে বারো হাজার কয়েদী পোর্টব্লেয়ারে বাস করিত। সেই নর-সমুদ্রে সাগরিকা-বুদ্বুদকে খুঁজিয়া বাহির করা দেবকুমারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার পথ অতি দুর্গম কোথাও বা সুবিস্তীর্ণ খাঁড়ি পার হইতে হয়। গাছের পাতা পড়িয়া পচিয়া পচিয়া খাঁড়ির জল ভীষণ ম্যালেরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ। খাঁড়ির তীরে তীরে ছোট বড় বন। বনে অসংখ্য মক্ষিকা এবং মাকড়সার মত বৃহৎ আকারের লক্ষ লক্ষ মশক। বৃক্ষের শাখায় ও পত্রে—এমন কি ঘাসে পর্য্যন্ত ছোট ছোট অগণিত জলৌকা। মানুষের গন্ধ পাইলেই উহারা ছুটিয়া আসে। কোন কোন স্থানে ভাইপার-সর্প বাস করে। তাহাদের বিষ অত্যন্ত উগ্র। সেই সকল বনপথে বৃক্ষের শাখায় শাখায় একহস্ত-পরিমিত দীর্ঘ এক একটী তেঁতুলে বিছে পথিকের গায়ে পড়িবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। একটী বৃহৎ বনের সামান্য একটু পরিষ্কৃত অংশের নাম পোর্ট ব্লেয়ার।

সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া দেবকুমার সেই ভীষণ বন-পথে অগ্রসর হইল। মশক-দংশন, বৃশ্চিকের জ্বালা, জলৌকার আক্রমণ কিছুই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। দেবকুমার নানা বন্দী-নিবাসে অনুসন্ধান করিল বটে, কিন্তু সাগরিকার দেখা পাইল না। এইরূপে বহু দিন কাটিয়া গেল। মশক ও জলৌকার দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসিত দেবকুমার একদিন কর্ণওয়ালিশ বন্দরের বন্দী-নিবাসে আসিয়া বহু চেষ্টার পর জানিতে পাইল যে, সাগরিকা আর জেলখানায় থাকে না— বন্দীদের গ্রামে বাস করিবার অনুমতি পাইয়াছে। যেখানে ব্যাধি, যেখানে ব্যথা—আন্দামানের কয়েদী-মাকে লোকে সেই খানেই দেখিতে পায়।

এই সংবাদ শুনিয়া দেবকুমারের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। সে করযোড়ে কহিল, 'জয় ভগবান, সাগরিকার পুনর্জ্জন্ম সার্থক কর দেব।' তাহার সহিত সাক্ষাতের যে প্রয়োজন ছিল, দেবকুমার দেখিল, তাহা দূর হইয়াছে। সে তখন নিশ্চিন্ত হইয়া বন্দীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তাহাদের দুঃখের ভাগ লইতে লাগিল—তাহাদের পাষাণে-পরিণত হৃদয়ে শ্রীভগবানের করুণার অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রাণবন্ত মানুষ যে এমন ভাবে পলে পলে মরিতে পারে—পাপ পুণ্য, স্বর্গ-নরক এমন কি ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে—বন্দীদের গ্রামে তাহার পরিচয় পাইয়া দেবকুমার মর্ম্মাহত হইল। সে দেখিল, একটী নবীন কর্ম্ম-জীবন তাহার সম্মুখে সহসা উপস্থিত হইয়াছে। ত্যাগ, সেবা ও প্রেমকে সহায় করিয়া দেবকুমার সেই কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইল।

অতীত জীবনের কাহিনী যখনই দেবকুমারের হৃদয়ে উদিত হইত, তখনই সে মর্ম্মব্যথায় আকুল হইত এবং লোকালয় ছাড়িয়া স্যাডল পর্ব্বতের একটী জনহীন গুহায় যাইয়া কয়েকদিন বাস করিত। সেই নির্জ্জন বাসের সময় একান্ত মনে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে দেবকুমার অন্তরে নব বল পাইত।

একদিন সন্ধ্যার সময় স্যাডল্ পর্ব্বত হইতে ফিরিবার পথে কতকগুলি আন্দামানবাসী জঙ্গলী দেবকুমারকে আক্রমণ করিল। উহারা আন্দামানের আদিম অধিবাসী। সকলেরই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, রক্ত ও শ্বেত মৃত্তিকায় সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা ছিল একেবারেই নগ্ন, এবং সকলেই ছিল ধনুর্দ্ধর। দেবকুমার পলায়নের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু পারিল না। জঙ্গলীদের বাণে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত দেবকুমার ভূ-লুণ্ঠিত হইল। জঙ্গলীরা দেবকুমারকে স্কন্ধে তুলিয়া বহু দূরে লইয়া গেল এবং তাহার যাহা-কিছু ছিল, সে সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া বনান্তরালে প্রস্থান করিল।

গভীর রজনীতে দেবকুমারের যখন চৈতন্য হইল, তখন সে অতি কষ্টে উঠিয়া দূর গ্রামের একটী দীপশিখা লক্ষ্য করিয়া ধীর পদে চলিতে লাগিল। তখনো তাহার দেহ বিদ্ধ হইয়া দুইটী তীক্ষ্ণ বাণ আবদ্ধ ছিল। শক্তিশূন্য দেবকুমার গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না। তাহার ক্ষতের মুখে বেগে রুধির ঝরিতে লাগিল। তাহার তখন মনে হইল, আকাশের উজ্জ্বল শুক-তারাটী বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে।

দেবকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

সপ্তাহ পরে দেবকুমার যখন হরদুর্ বন্দী-হাঁসপাতালে চক্ষু মেলিল, তখন আর তাহার জ্বর বা বিকার কিছুই ছিল না। দেবকুমার দেখিল, বাল্যবন্ধু অমর ডাক্তার তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে এবং অমরের পার্শ্বে পথ্য হস্তে সাগরিকা দাঁড়াইয়া আছে। দেবকুমার তাহার নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে চক্ষু মুদিল এবং অল্পক্ষণ পরে আবার চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে অমর ডাক্তার ও সাগরিকা।

অমর বলিল, "দেবু এখন কেমন আছ?"

ক্ষীণকণ্ঠে দেবকুমার বলিল, "ভাল আছি। এখানে আমায় কে আন্‌লে?"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি যে গ্রামের কাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়' সেখানে মড়ক লেগেছে। বুড়ী-মা ও কয়েদী-মা রোগীদের সেবা করে ফিরে আস্‌বার সময় তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে গ্রামের লোকের সাহায্যে হাঁসপাতালে এনেছিল। আমি এই হাঁসপাতালের ডাক্তার।"

দেবকুমার একদৃষ্টে সাগরিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিল—সে যেন এক অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি—স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল। দেবকুমারের বুকের ক্ষতমুখে তখন হু হু করিয়া রক্ত ছুটিল। তাহার নয়ন দুইটী মুদিয়া গেল।

তিনমাস চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর দেবকুমার আবার সুস্থ ও সবল হইল।

সে আর সাগরের পথ চাহিয়া রহিল না, সাগরও আর রহিল না দেবকুমারের জন্য।

তাহারা উভয়েই রহিল বিশ্বের জন্য। দেবকুমার ও সাগরিকার নবজীবনের ঊষা পূর্ব্বগগনে দেখা দিল।

সমাপ্ত

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

সমাপ্তি

এ বিচিত্র বিশ্ব-বুকে রহিব অনন্তকাল এমনি বাঁচিয়া
জীবনের গ্রন্থ কত মিলনের বিচ্ছেদের ভাগে বিরচিয়া,
অসীমের মর্ম্মে মোর উদ্বেগে আবেগে হ'বে
কত অভিসার,
কত বার দেখা হ'বে,কত বার ফিরিব যে রুদ্ধ হেরি দ্বার;
পথের প্রদীপ জ্বালি' আশা আশঙ্কায় ভরা
চিত্তের আলোকে
প্রাণের তাড়না নিয়ে অন্ধকারে বাহিরিব
বিপুল পুলকে;
অনন্ত বরষ ভরি' বেঁচে র'বো, লইব বিশ্বের আশীর্ব্বাদ;
সম্মুখে চলার গানে পিইব অমৃত করি দুঃখের প্রসাদ।—
এই সব তীব্র সাধ হতে আমি একদিন মুক্তি পাই যবে,
সহসা সমাপ্তি আসি' এ-জীবন ভরি ভায় মৃত্যুর গৌরবে,
কৃতজ্ঞ-অন্তরে আমি তাঁহার কল্যাণ-পীঠে করি নমস্কার—
যে-দেবতা দিলা নিজে মুক্ত করি' অন্তহীন
জীবনের ভার।
তখন জানি যে আমি—জীব-যাত্রা নয় কভু
চিরকাল নয়,
একদা নিশ্চিত শেষ—অজানার ভয়ে তা'র বেদনা সংশয়;
অদৃশ্য দেশের খোঁজে জীবনের এত চাওয়া সংগ্রাম সংঘাত
সার্থক হইয়া যায় যেতে যেতে মৃত্যুতে একদা অকস্মাৎ;
যে প্রাণ বিচ্ছুরি' ওঠে অসীম উচ্চের দিকে তুলিয়া গর্জ্জন
আপনারে বিসর্জ্জিয়া মরণে সে করে তা'রে
স্বরায় অর্জ্জন॥

আব্‌দুল কাদের।

লক্ষ্মণ সেন

গত পৌষ মাসের "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় "বাঙ্গালীর অতীত" শীর্ষক যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর দিতে গিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাঘের "বঙ্গবাণী"তে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণ সেনের কথার অবতারণা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ সেনের কথা অবতারণা করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন; লক্ষ্মণ সেনের সম্বন্ধে অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করেন এবং সেন মহাশয়ও একটা ভুল ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। আমরা আজ সেই কথাই একটু আলোচনা করিব। আর আশা করি, সুধিগণ এদিকে নজর দিয়া লক্ষ্মণ সেনের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন এবং দেশের লোকের মন হইতে একটা ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।

আলোচনাটী "বঙ্গ-বাণীতে" পাঠানই ন্যায়সঙ্গত ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গবাণী অকালে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। 'বঙ্গবাণী' ভাল প্রবন্ধের জন্য বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল; কিন্তু এমন করিয়া যে, সে বিদায় গ্রহণ করিবে, তাহা আমরা জানিতাম না।

লক্ষ্মণ সেন সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ আছে। কেহ বলেন,—তিনি পলায়ন করিয়া পুরীতে গমন করেন, কেহ বলেন পূর্ব্ববঙ্গে সোণার গাঁও নামক রাজধানীতে পলায়ন করেন। লক্ষ্মণ সেন যে পুরীতে যান নাই, ইহা ঠিক; কেন না উড়িষ্যার কোন ইতিহাসে তাঁহার পুরীগমনের কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গ তখন মুসলমানগণ অধিকার করিতেছে; সুতরাং বৃদ্ধ বয়সে যে জীবন লইয়া তিনি পলায়ন করিলেন, সে জীবনকে আরও বিপন্ন করিবার জন্য তিনি পুরীতে যাইবেন ইহা সম্ভব নহে। আর পূর্ব্ববঙ্গে ছিল তাঁহারই অন্য একটি রাজধানী; সুতরাং সেখানে যাওয়াই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি জানিতেন—পূর্ব্ববঙ্গ তখনও মুসলমানের অধিকারে আসে নাই, আর তাহা মুসলমানের অধিকারে আসিতেও অনেক সময়ও লাগিবে।

সেন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং খুলনা গমন করেন। সেনহাটির নিকট তাঁহার স্থাপিত সেনের হাট এখনও আছে। প্রতাপাদিত্যের সভায় কবিরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন—সেনহাটি গ্রাম লক্ষ্মণ সেন স্থাপন করিয়াছিলেন।"

সেন-মহাশয়ের এই উক্তির কোনও ভিত্তি আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করিয়া বিক্রমপুরে সোনারগাঁও নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সোণারগাঁও আজও বিক্রমপুরে অবস্থিত। বিক্রমপুরের অন্যতম প্রধান স্থান রামপাল, উহা রামপাল নামক রাজার নামানুসারে হইয়াছিল এবং বহুদিন উহা পাল রাজাদের রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণ সেন সেই পালরাজাদের সিংহাসনেই আরোহণ করেন, এবং অনুমান হয়, তিনি সোনারগাঁও হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া রামপালে স্থাপনা করিয়াছিলেন।

সেন-মহাশয়ের কথা যদি ঠিক হয়, তবে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণ সেন খুলনা জিলায় সেনের হাটি নামক স্থানে বাস করেন। একথার কোন ভিত্তি নাই। প্রথমতঃ খুলনা জিলা পশ্চিম বঙ্গের খুব নিকটে, সেখানে মুসলমানগণ সহজেই গিয়া আক্রমণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদি তিনি সিংহাসন ও রাজ্য পুত্রের হস্তে দিয়া শান্তিতে বাস করিবার জন্য সেনের হাটি নামক স্থানে গিয়া থাকেন; তাহা হইলে ঐ সেনের হাটি খুলনা জিলায় নহে। উহা বিক্রমপুরের সেনের হাটি। বিক্রমপুরে সেনের হাটি

নামে একটি গ্রাম আছে। প্রতাপাদিত্যের সভাসদ যে সেনের হাটির উল্লেখ করিয়াছেন, উহা খুলনা জেলার সেনের হাটি নহে, বিক্রমপুরের সেনের হাটি। তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বৃদ্ধ, তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত খুব ভালবাসিতেন, এবং শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। যে সময় লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গে আসেন, তখন বিক্রমপুর ছিল বহু পণ্ডিতের আড্ডা। এত পণ্ডিত-লোকের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া যে তিনি খুলনা যাইবেন, তাহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিক্রমপুর-বাসী ৬০০ ছয় শত অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতেন, সেই বিক্রমপুর যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রধান স্থান হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা জানি, লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুর আসিয়া রামপাল নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। "সেক শুভোদয়া" গ্রন্থে লিখিত আছে, যখন লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী বল্লভা দেবীর ভ্রাতা কোনও বণিক-সীমন্তিনীকে অপমান করায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন, তখন রাণী স্বয়ং রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্রোধস্ফুরিতাধরে বলিলেন—"আমার ভ্রাতাকে কোন্ বিচারক বিচার করিবে? এক কুলটার কথায় প্রত্যয় করিয়া কে আমার ভ্রাতার কেশস্পর্শ করিবে? এরূপ স্পর্দ্ধা কোন্ বিচারকের আছে আমি জানিতে চাই।" তখন ভয়ে হলায়ুধ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের মুখ শুকাইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে অজিনাসন কৌপীনদণ্ডধারী অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য্য গোবর্দ্ধন, দণ্ড লইয়া রাণীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার চক্ষু সজল, ওষ্ঠাধর বিকম্পিত, তিনি মূর্ত্তিমান্ বিচারবেশে লক্ষ্মণ সেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি না সেই সিংহাসনে বসিয়াছ, যে সিংহাসনে মহারাজ রামপাল একদিন উপবেশন করিয়া এইরূপ অপরাধে স্বীয় একমাত্র পুত্রকে শূলে দেওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন?" এই বলিয়া তিনি হাতের দণ্ড ফেলিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া আচার্য্যের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন।" এই অংশ হইতে দেখা যায়—লক্ষ্মণ সেন রামপালের সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন।

লক্ষ্মণ সেন যে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। বাবা আদম একজন বিখ্যাত ফকির ছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। রাজার আদেশ ছিল যে, তাঁহার রাজ্যে কেহ গো-বধ করিতে পারিবে না; কিন্তু ঘটনাক্রমে কোন একটী মুসলমান পুত্র-কামনায় একটী গো-বধ করেন এবং সেই গরুর এক টুক্‌রা মাংস, একটা চিল রাজবাড়ীতে আনিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল। রাজা তাহা দেখিয়া ক্রোধান্বিত হন এবং কে গো বধ করিল, তাহা জানিবার জন্য চারিদিকে চর প্রেরণ করেন। চরেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, ফকিরের আদেশে একটী মুসলমান পুত্র-কামনায় এই গোবধ করিয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া রাজার সহিত ফকিরের এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর ফকির হারিয়া যান, কিন্তু রাজা ফকিরকে নিহত করিতে পারেন না। অবশেষে বহুসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া ফকিরকে আক্রমণ করেন এবং তরবারি দ্বারা ফকিরের শিরে আঘাত করেন; তাহাতে ফকিরের একগাছি চুলও স্থানচ্যুত হইল না। অবশেষে ফকির বলিলেন, "আপনার তরবারির আঘাতে আমার দেহের কোন ক্ষতি হইবে না। যদি আমাকে হত্যা করিতে চান, তবে আমার তরবারি দ্বারা আমাকে আঘাত করুন।" এই বলিয়া ফকির রাজার হাতে তরবারী তুলিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন যে,—তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, ফকিরের তরবারি দ্বারা ফকিরকে আঘাত করিলেন, ফকিরের দেহ দুই খণ্ড হইয়া গেল।

পূর্ব্বকালে রাজারা যুদ্ধে যাইবার সময় সঙ্গে শিক্ষিত কবুতর লইয়া যাইতেন। কখন কখন ইহারা দূতের কায করিত। যুদ্ধে পরাজিত হইলে রাজা এই সকল কবুতর ছাড়িয়া দিতেন। তাহারা

আসিয়া খবর দিত এবং তদনুযায়ী রাজবাড়ীর মহিলাগণ নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। লক্ষ্মণ সেনও যুদ্ধে যাইবার সময় তাঁহার বক্ষের মধ্যে একটী কবুতর লুকাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ফকিরকে হত্যা করিয়া যখন তিনি তরবারি ধৌত করিতেছিলেন; তখন হঠাৎ কবুতরটী উড়িয়া রাজবাড়ীতে আসে। রাজ-মহিলারা মনে করিলেন, রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এইজন্ম তাঁহারা প্রকাণ্ড চিতা জ্বালাইয়া, প্রাণত্যাগ করিলেন। কবুতর উড়িয়া যাওয়ায় রাজা দ্রুতগতিতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,— সব শেষ। সবাই জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাজা সে দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না। তিনিও চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ফকিরের অভিশাপ ফলিল। এখনও সেই চিতা রামপালের রাজবাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহিলাগণ সেখানে গিয়া আজিও যোড়করে প্রণাম করেন।

সকলে প্রাণত্যাগ করিলেও রাজার পুত্র বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি তখন অন্যত্র ছিলেন। তিনি রাজা হইলে, সকলে তাঁহাকে পোড়া রাজা বলিত।

লক্ষ্মণ সেন হিন্দু ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে খুব সম্মান করিতেন। নিজে কোন্ জাতীয় ছিলেন, তাহা আজিও মীমাংসিত হয় নাই। কেহ বলেন, সেনবংশ কায়স্থ ছিলেন। কেহ বলেন, তাঁহারা বৈদ্য ছিলেন। অবশ্য বৈদ্যগণই সেনবংশকে বৈদ্য বলিয়া দাবী করেন। আবার কেহ বলেন, সেনবংশীয় নরপতিগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐতিহাসিক ভি, এ, স্মিথ সাহেবও বলেন যে, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁহার Oxford History of Indiaতে লিখিয়াছেন, "Vallala Sen……… introduced the practice of Kulinism among Brahmans, Vaidyas, and Kayasthas. The Senas originally were Brahmans from the Deccan………"

লক্ষ্মণ সেন যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, একথা স্মিথ সাহেব স্বীকার না করিলেও আর সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আজকাল কোন ব্রাহ্মণই দেখা যায় না, যাঁহারা সেন-উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণেরা কোন কালেই রাজত্ব করেন নাই। সুতরাং লক্ষ্মণ সেন যে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বৈদ্যরা বলেন যে, সেনরাজারা বৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা কয়েকটী কারণও দেখাইয়া থাকেন অবশ্য, কিন্তু তাঁহাদের সে কারণগুলি মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। তাঁহারা প্রধান কারণ দেখান যে বৈদ্যদের মধ্যে অনেকেই সেন-উপাধি ধারণ করেন, সুতরাং লক্ষ্মণ সেনও বৈদ্য ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক ও কায়স্থগণ বলেন যে, সেনরাজারা কায়স্থ ছিলেন। তাঁহাদের যুক্তিও অনেক আছে এবং সেনরাজগণ যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা না মানিয়া লইবার কোন কারণ নাই। কায়স্থগণ মসিজীবী ক্ষত্রিয় এবং নানাস্থানে কায়স্থ রাজাও দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রধান কারণ—বিক্রমপুরে অনেক সেন-উপাধিধারী কায়স্থ আছেন, যাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা সেনরাজাদের বংশধর। বিক্রমপুরের কায়স্থ সেনদের এ কথা উপেক্ষা করিবার নহে। তবে এ বিষয়টী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া ইহার মীমাংসা করিলে বড় একটা জটিল সমস্যা বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে দূর হয়। যদি সকলে বর্ণগত স্বার্থশূন্য হইয়া, ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়া সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত হন, তবে সমস্যার সমাধান হইবে; নচেৎ বিষয়টী আরও জটিল হইয়া উঠিবে।

দীনেশবাবুর লেখায় একটা সন্দেহের বিষয় আছে। যদিও আমরা বর্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি "লক্ষ্মণ সেন", তবু বাধ্য হইয়া অন্য একটী বিষয় সম্বন্ধে একটী কথা লিখিতে হইল। সেন-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন, ইহা বাঙ্গালার গৌরবের কথা। অনেকেই জানেন বিজয়সিংহ বাঙ্গালী বীর ছিলেন; কিন্তু একদল ঐতিহাসিক বলেন যে, বিজয় সিংহ বাঙ্গালী ছিলেন না,—তিনি সিন্ধুদেশ হইতে গিয়া লঙ্কা জয় করেন। এই সমস্যারও মীমাংসা সুধিগণের কর্তব্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল।

উপন্যাসের ধারা

লোকশিক্ষার সহায়তা-কল্পে, মানুষকে চরিত্রবান্ করিবার উদ্দেশ্যে বাস্তব বা অবাস্তব চরিত্র রচনা করিয়া গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়। যে গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র-কল্পনায় শিক্ষণীয় বিষয় থাকে না, তাহা নিন্দনীয় ও পঠনোপযোগী নহে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে পৌরাণিক কাহিনী লইয়া গল্প বা উপন্যাস লেখা হইত, তাহাতে ধর্ম্মের কাহিনী থাকিত, সমাজকলঙ্ক দৃষ্ট হইত না। তাহাতে থাকিত উপদেশ—শিখিবার অনেক কথা। নায়ক থাকিত দেবতা, দেবী হইত নায়িকা। সামাজিক ও ধর্ম্মের কথায় তর্কবিতর্ক, মীমাংসা, উপদেশ উপ-কথাকে জড়াইয়া রাখিত। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি আমাদের হৃদয়ে স্বচ্ছ ফোয়ারা আনিয়া উহাকে স্নিগ্ধ সুবাসিত করিত।

রামায়ণ, মহাভারতের গল্প এ যুগে আর আমাদিগকে তৃপ্তিদান করিতে পারে না, উপপুরাণের গল্প আমাদের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। আমরা চাই রস, মধু, অবৈধ প্রেম ও ভালবাসার উদ্দাম উলঙ্গ নৃত্য!

অনেকে বলেন, লেখকেরাই বিকৃতরুচি হইয়াছেন, তাহা খাঁটী কথা নহে। উপন্যাস-পাঠকেরা বিকৃতরুচি হইয়াছেন বলিয়াই লেখকেরা বাজারের রুচি অনুসারে তদ্রূপ লিখিয়া থাকেন। পুস্তক লিখিয়া পুস্তক ছাপানই লেখকের উদ্দেশ্য। ক্রেতার প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে—চাহিদা অনুসারে—যেমন মাল বাজারে চলিবে, বাজারে তেমন মালই উঠিবে,—বিকৃত-রুচি গল্প লেখকদের ইহাই একমাত্র সাফাই। লেখকেরাও জানেন, তাঁহাদের গল্প পড়িয়া শিক্ষা হয় না—হয় কুশিক্ষা। অধুনা রীতি হইয়াছে যাহা ক্ষুদ্র গল্প তাহা গল্প, আর যাহা বৃহৎ গল্প তাহা উপন্যাস। আধুনিক গল্পলেখকেরা ইহাও বুঝেন যে, তাঁহাদের গল্পে সারবত্তা বা শিক্ষার বিষয় অতি অল্পই আছে, তাহা হইলেও তাঁহারা তদনুরূপ লোক চরিত্রের কল্পনা করিয়া, পাঠকের রুচির দোহাই দিয়া উহাকে সাজাইয়া তোলেন।

একা রামে রক্ষা নাই—সুগ্রীব দোসর। আগে পুরুষেরাই লিখিতেন, এখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীরাও লিখিতে সুরু করিয়াছেন; তাঁহাদের লেখাগুলিও যে সুরুচিসঙ্গত, এমন কয়টী দেখিতে পাই? মেয়েদের লেখনী হইতে এমন লেখাও দেখিতে পাই যাহা নিরাপত্তে স্ত্রী সমাজে, ভগিনী, দুহিতাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাই আমাদিগকে তদনু-করণে গড়িয়া তুলিয়াছে; তজ্জন্য আমরা প্রাচ্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছি না। প্রাচ্য নারীর জীবন পর-সেবায়, উহাতেই তাহার মহিমা বাড়িয়া উঠে। পাশ্চাত্য নারীজীবন ভোগ-বিলাসের ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হয়। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়া খাড়া হইতে হইবে বলিয়া লেখকগণ পাশ্চাত্যভাবাবলম্বী হইয়া আমাদের প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যটুকু নাশ করিয়া দিতেছেন।

মাসিক কাগজগুলি আর একটা জঞ্জাল-বিশেষ। অন্ততঃপক্ষে দুইচারিটা করিয়া গল্প যে মাসিকে না থাকিল, আধুনিক রুচিবিকারগ্রস্ত পাঠকেরা তাহার সূচীপত্র পাঠ করিয়াই খতম করেন। মাসিক-ওয়ালারাও সূচীপত্রে গল্পগুলির নামকরণে বন্ধনী দিয়া 'গল্প' শব্দটা লিখিয়া দেন। অর্থাৎ পাঠকেরা যেন সহজে গল্পগুলিকে বাছিয়া লইতে পারেন। মাসিকে যত গল্প বাহির হয়, তাহার ভাষা, ভাব, চরিত্র, প্রেমচিত্র প্রভৃতির কথা লইয়াই পাঠকসমাজে সমালোচনা হয়। প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি প্রবন্ধ লইয়া কয়জন আলোচনা করেন? মাসিকে গল্পবহুলতা দেখিয়া মনে হইতে পারে, গল্প বাহুল্যের অপরাধটা মাসিক-ওয়ালাদেরই। কিন্তু তাহা খাঁটী কথা নহে। মাসিক পত্রিকা ছাপাইয়া আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেও চলিবে

না, বাজারে উহাকে চালাইতে হইলে গল্প উপন্যাস দিতেই হইবে। নতুবা পাঠকের মন উঠিবে না; সে মাসিক অচল হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও অনেকেই এরূপ গল্প উপন্যাসের পক্ষপাতী। সেইরূপ তাঁহারা লেখেন, পাঠও করেন। এই বিকৃত রুচির হাওয়াটাকে কেমন করিয়া রহিত করা বা বদলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা লইয়া মাঝে মাঝে যে আলোচনা না হইতেছে এমন নহে; কিন্তু আমাদের শিক্ষা ও রুচি উভয়ই বিকৃত!

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমের যুগে গল্প ছিল না - উপন্যাসই হইত। সে উপন্যাসগুলি দুষ্টক্ষতের ন্যায় বিপজ্জনক ছিল না। তাহাতে শিখিবার জিনিষ ছিল, পবিত্র প্রেম ছিল, গার্হস্থ্য চিত্র ছিল, স্থূলকথা তাহারা প্রাচ্যভাবাপন্ন ছিল। লেখকেরা রমণীগণের চরিত্র আমাদের গৃহস্থালীর ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতেন। পুরুষদের চরিত্রও তাঁহারা গড়িয়া তুলিতেন আমাদের বাঙ্গালী সংসারের আদর্শ অবলম্বন করিয়া। যে গৃহে দেবতা বা দেবভাব নাই, সেরূপ গৃহ তাঁহারা কল্পনায়ও অঙ্কিত করিতেন না। তাই অনেকের নিকট আজিও বঙ্কিম বা তৎসমসাময়িক লেখকগণের আদর রহিয়াছে। বাস্তব ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া যাঁহারা তুলিকা দ্বারা চরিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ লেখক। রমণীরা যখন লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মনে করিলাম, তাঁহারা রমণী চরিত্রটাকে আদর্শস্থানীয় করিয়া তুলিবেন; কিন্তু ও হরি, তাঁহাদের হাতে পড়িয়া আরও গোল বাধিল। পুরুষ লেখক রমণী-চরিত্র কল্পনা করিয়াই তাহার গুণবিশ্লেষণ করিতে [illegible] কিন্তু রমণী নিজের চরিত্র দিয়া নিজ পরিবারের ও নিজের মেলামেশার চরিত্র দিয়া চরিত্র খাড়া করিয়া থাকেন। সে চরিত্র আদর্শস্থানীয় হইবে আশা করা অসঙ্গত নহে। ঐ সকল লেখিকাও কি পাঠকের রুচি-অনুসারেই লেখেন?

পাশ্চাত্যদেশে অশ্লীল উপন্যাস যে নাই তাহা নহে। এই প্রকার উপন্যাস ফরাসী লেখকেরা লিখিয়া ওস্তাদ হইয়াছেন। এই অশ্লীলতা দমন করিবার জন্য ফরাসীরাজ্যে ভাষাগত ও সামাজগত বিপ্লব উপস্থিত হয়। তজ্জন্য সরকার হইতে আইন করিয়া তাহা দমন করিবার চেষ্টা হয়। উপন্যাসে উলঙ্গ, অশ্লীল চিত্রাঙ্কনে ফরাসীরা সিদ্ধহস্ত। পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই ধনী, বিলাসী। বিলাসীরা যত মন্দ কার্য্য করিতে পারেন, মন্দকার্য্যকে যত ভালবাসেন, সেরূপ অপরেরা করিতে পারেন না। আমাদের দেশেও বিলাসীরা দেহের উপর দিয়া অনেক মন্দ কার্য্য ঘটাইয়া থাকেন। তাই বিলাসীদিগকে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায় না। আমাদের দেশের বিলাসীরা ইংরাজী নাটক নবেল পড়িয়া বিলাসিতার নূতন নূতন পন্থা বাহির করিয়া তাহা উপভোগ করেন। ইহা কল্পিত কথা নহে, আমার নিজেরই জানা আছে। আমাদের দেশের ইংরাজীজানা মেয়েদের কাছে এই সকল ইংরাজী নাটক নবেল দিয়া কেহই নিরাপদে থাকিতে পারেন না। হইলে কি হয়, মেয়েরা বাজারে ইংরাজী দোকান হইতে ইংরাজী নবেল কিনিয়া পড়িবার সুবিধার পথ পাইয়াছে। নির্লজ্জ, বিলাসী, কামুক স্বামীরা এইরূপ গ্রন্থ স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে [illegible] সাজাইয়া আমোদ উপভোগের চেষ্টা করেন! হা, ধিক্! আধুনিক সভ্যতা, কলিকাতার ন্যায় গ্রাম্য সমাজেও কীট ধরাইয়াছে। গ্রামে কলিকাতা হইতে আমদানী করা সামাজিকতাটুকু আমাদের গ্রাম্য সমাজের হাড় ভাঙ্গিবা দেওয়ার আয়োজন করিয়াছে। কলিকাতায় যেমন সমাজ বা সামাজিকতা নাই, গ্রামেও এখন কেহ কাহাকেও মোড়ল বলিয়া মানিতে চায় না। দেবতার কথা নাই তুলিলাম,—ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরা আর তথা-কথিত উপন্যাস পড়ুয়া মেয়েরা প্রত্যক্ষ দেব মাতার আসনকেও স্থানচ্যুত করিয়া দিয়াছে সত্যকথা এই যে, তুমি আজ তোমার পি[illegible] প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, তোমার পুত্রেরাও তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে। ইহা ঈশ্বরকৃত বিধি। কোন স্থানে এক দুর্ব্বৃত্ত বাস করিত। সে প্রত্যহ কারণে অকারণে তাহার মাতাকে প্রহার করিত। ইতিমধ্যে সেই

দুর্বৃত্তের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তখন মার খাইলেই মাতা কহিতেন, "আশীর্ব্বাদ করি, এ ছেলে বাঁচিয়া থাকুক।" সকলে ভাবিত, মার খাওয়ার পরই ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করেন কেন? মাতা বলিতেন "এই পুত্র কি তাহার পিতামাতাকে এই প্রকারেই সম্মান করিবে না?" ইহার পর সে ছেলে যখন সাবালক হইল, সেও নিজ পিতাকে প্রহার না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। এই পুত্রের মার খাইয়া পিতা আর তাহার নিজ মাতাকে প্রহার করিবার সুবিধা পাইত না। যে দিন সেই পুত্র পিতাকে প্রহার করিত, সে দিন তাহার পিতামহী তাহাকে আদর করিয়া খাওয়াইয়া উৎসাহ দিয়া কহিতেন, "দাদা, তুই আমার মনের দুঃখের লাঘব করিয়া দিতেছিস্। তোর বাবা এখন বুঝিতে পারিতেছে, কুকর্ম্মের কি ফল হয়।"

থিয়েটারগুলি আমাদের সমাজের কম অপকার করিতেছে না। এই সকল থিয়েটারে অশ্লীল চিত্র ও বারাঙ্গনার হাব ভাব অশ্লীলতা দেখিয়া, নিতান্ত যোগী-পুরুষ ছাড়া, স্কুল কলেজের ছোকরা, ঘরের মেয়েরা কি আত্মসংযম করিয়া থাকিতে পারে? থিয়েটারগুলি সহর মজাইতে পারে, মজাইয়াছেও। থিয়েটারগুলি যত অপরাধী, তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক অপরাধী—গল্প ও উপন্যাসের কেতাবগুলি। থিয়েটারের সহর ছাড়িয়া বেশীদূর পাল্লা নাই, কিন্তু উপন্যাসের পাল্লা বাবুদের বৈঠকখানা, গিন্নীদের শয়নাগার, রন্ধনশালা—কোথায়ই বা তাহার সঞ্চার নাই? মেয়েরা থিয়েটার দেখিয়া থিয়েটারী ঢংয়ে সাজিতে চায়, যুবকেরাও অন্ততঃ মেয়ে মহলে তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করে। আমাদের [illegible] সমাজের মেয়েদের কাপড় পরিবার ধরণটা কোথা হইতে আসিল? তাহার কতকটা আসিয়াছে [illegible] হইতে, আর কতকটা আসিয়াছে থিয়েটারের ষ্টেজ হইতে। আমাদের মাতা মাতা-মহীরা যেরূপ ছাঁদে কাপড় পরিতেন, তাহার নির্ব্বাসন-দণ্ড হইয়াছে—থিয়েটারী আমল হইতে। মেয়েরা মেম-সাহেবের গাউন পরেন না সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে আমাদের দেশে সবদিক দিয়াই একটা নূতন ঢং বন্যার স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিতেছে। এ স্রোতকে কেহ ফিরাইতে পারিবে না; বরং ইহাতে উত্তরোত্তর কালের প্রভাব-বলে বিকৃত শ্রীর পুষ্টিপুষ্টি হইবে।

এখন ভাষার দিক্ দিয়া আলোচনা করা যাউক। অনেক লেখকের নিকট ভাষা স্বাধীন ভাব ধরিয়াছে। কেহ বলেন, বিদ্যাসাগরী ভাষা পছন্দ করি না; কেহ বলেন, বঙ্কিমী ভাষায় তেজ নাই। রবীন্দ্রবাবুকেও তাঁহারা হটাইয়া দেন! কোন্‌টা যে তাঁহাদের পছন্দ, তাহা তাঁহারা বলেন না। অথচ নিজে নিজেই একটা ভাষা খাড়া করিয়া তোলেন। ভাষার মারপেঁচে অনেক আধুনিক গ্রন্থের ভাষা ও ভাব দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। হইলে কি হয়, আধুনিক গ্রন্থকারেরা সে কথা বুঝেন কৈ? কাহার অনুকরণ তাঁহারা করেন, তাহাও বুঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষাকেও তাঁহারা ডিঙাইয়া চলিয়াছেন।

আর একটা দোষ লেখকদের হইয়াছে, পাঠকদের হইয়াছে বলিয়াই লেখকদের হইয়াছে। উপন্যাস ও গল্পের নায়ক নায়িকা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা, কলিকাতা বা তদঞ্চলের হওয়া চাই। নায়ক, নায়িকাদের বাড়ী পূর্ব্ব বা উত্তর বাঙ্গালায় হইলে চলিবে না। পদ্মা তিস্তার কথা, বা ঢাকা কি রাজসাহী সহরের কথা বলিলে তাহা অচল হইবে—পাঠক পাঠিকারা নাক সিটকাইবেন, লেখকেরাও নিন্দাপূর্ণ সমালোচনা করিবেন। এ সকল রুচি কোথা হইতে আসিল? আর একটা দোষ আছে, সেটা যদিও [illegible] অপরিহার্য্য—কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-[illegible] আক্রমণ করা। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর ও খৃষ্টানদের প্রতিও সঙ্গত বা অসঙ্গত ভাবে আক্রমণ হয়। বগুড়া জেলায় হিলি বন্দরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল, তথায় উপস্থিত মাহিষ্যগণ বাঙ্গালা উপন্যাস ও গল্প লেখকদিগের উপর এই বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, তাঁহারা পুস্তকগুলিতে যত ঝি'র চিত্র দেন, তাহারা সবাই মাহিষ্য জাতীয়।

মাহিষ্য ছাড়া আর ঝি কি মিলে না? সুতরাং গ্রন্থকারদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হউক। আমি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে কহিলাম, কলিকাতায় যত ঝি অধিকাংশই মাহিষ্য; সুতরাং যাহাতে মাহিষ্য জাতীয় বিপন্ন দরিদ্র রমণীগণকে কলিকাতায় গিয়া ঝিগিরি না করিতে হয়—উহাদিগকে যদি মাহিষ্য সমাজ প্রতিপালন করেন, তবেই ত সব গোল মিটে। এই কথায় মাহিষ্য সমাজ দরিদ্র রমণীদিগকে প্রতিপালনের ভার লইতে সম্মত হন নাই, সুতরাং প্রস্তাবটি উঠিয়া গেল।

কলিকাতায় ব্রাহ্মণেরাই পাচক ও পূজক, সর্ব্বত্রই তাই। এখন যদি সম্পৎশালী ব্রাহ্মণেরা গ্রন্থে পাচকের চিত্র দেখিয়া চটিয়া যান, তবে গ্রন্থকারেরা দাঁড়ায় কোথায়? কাহার চিত্র চরিত্র লইয়া গল্প উপন্যাস লিখিবে? এস্থলে গ্রন্থকারদের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু অন্যায়, অযথা, অতিরিক্ত আক্রমণও কেহ সহ্য করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবে না।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী।
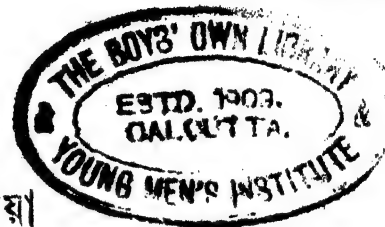
প্রিয়া

তোমারে পাই জ্যোৎস্না রাতে
আলস ঘুম মাঝে,
আমার বাঁশী তোমার হাতে
গভীর সুরে বাজে।
নিখিল ব্যাপি চাহিয়া থাকে
কাজল তব আঁখি,
নিজেরে খুঁজি হারাই দিশা
মনেরে হানি ফাঁকি;—
উবশী তব সিঁদুর 'পরে,
বলাকা সারি মালিকা গড়ে,
তোমারে যাই ছুঁইতে চাই
অমনি পাই না যে।

তোমারে দেখি শরৎ প্রাতে
শিশির ছেঁচা ফুলে,
নৃত্য তব উছলি উঠে
নদীর কূলে কূলে।
কখনো দেখি বাহিয়া যাও
মেঘের তরিখানি,
পাতায় ফুলে দেখেছি কভু
লিখিত তব বাণী—
সাগর তালে বাজাও বীণা,
মনেতে জানি এ-সুর চিনা,
কখনো তাহা গুঞ্জরেছি,
কখনো গেছি ভুলে।

ফাগুন দিনে মাধবী রাতে
যে ছবি তব জাগে,
চমকি দেখে—শিহরি উঠি,
পুলক বুকে লাগে,
অশোক শাখে মুছেছে তব
চরণ রাঙা লেখা,
আমের নব মঞ্জরীতে
কখনো দেছ দেখা,
শিমুল ফাগে আবির খেলি,
অঙ্গে ধরি পলাশ চেলি,
বধূর বেশে কভু বা আস
জীবন পুরোভাগে।

ঝড়ের সাথে এলায়ে কেশ
এসেছ বিরহিণী,
তোমারে দেখে জেগেছে মনে—
চিনি গো যেন চিনি !
বরষা রাতে চোখের জলে
হেসেছ পলাতকা,
চখীরে দেখে যেমন করি
হেসেছে ভীরু চখা।
পেয়েছি তোমা জীবন ভ'রে
নানান্ রূপে পলক তরে ;
কখনো হারি খেলার ছলে,
কখনো যেন জিনি।

বন্দে আলী মিয়া।

আপেক্ষিকতা-বাদের স্থূলকথা

উপক্রমণিকা

অনেকে হয়ত অবগত আছেন, কিছুদিন হইল জর্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টাইন্ আপেক্ষিকতাবাদ (Theory of Relativity) নামে একটা মতবাদ প্রচার দ্বারা বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। কেবল জর্ম্মান নহে, ইংরাজী এবং অপরাপর ভাষাতেও এই মতবাদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ইহার বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে করা চলে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উক্ত আপেক্ষিকতাবাদের একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

আপেক্ষিকতাবাদের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলি উচ্চ গণিতের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু উহার মূল কথা-গুলি বুঝিবার জন্য উচ্চ গণিতের প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, স্থলবিশেষে বীজগণিতের গোটা কয়েক সাধারণ সূত্রের প্রয়োগ ভিন্ন, গণিতের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের দুইটা স্পষ্ট বিভাগ রহিয়াছে। প্রথম অংশটা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (Special theory of Relativity) নামে পরিচিত, ইহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় অংশটা, যাহা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General theory of Relativity) নামে পরিচিত,প্রথমোক্ত অংশের প্রায় দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। প্রথম অংশটা দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত, কিন্তু বুঝিবার পক্ষে সহজ হয় বলিয়া এ যাবৎ উহারা পৃথক্ ভাবেই আলোচিত হইয়া আসিয়াছে। এস্থলেও আমরা সেই প্রথাই অবলম্বন করিব।

১।— বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ

পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ।

শূন্যদেশে গ্রহ নক্ষত্র সমূহ ছুটাছুটি করিতেছে, প্রত্যেক জগতের অধিবাসী নিজেকে এবং নিজের জগৎকে স্থির বিবেচনা করিতেছে এবং অন্যান্য জগৎকে বেগসম্পন্ন দেখিতেছে। বাস্তবিক কোন্ জগৎ স্থির, কোন্ জগৎ বেগসম্পন্ন তাহা নিরূপণ করা সম্ভব কি ? "মহাশূন্যে আমি স্থির না চঞ্চল, অথবা, আমি কোন্ দিকে কত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছি ?" প্রত্যেক জগতের অধিবাসীর মনে এইরূপ একটা প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক মিকুল্‌সন (এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মিকুল্‌সন্ ও মরলী একসঙ্গে) একটা পরীক্ষা করেন ; উহার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নির্ণয় করা। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেল—ঐ বেগ নিরূপণ সম্ভবপর ব্যাপার নহে। মিকুল-

সনের পরীক্ষার এই নিষ্ফলতার উপরেই আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

নিরপেক্ষ বেগ বলিতে কি বুঝায়, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বেগের কথা (বা স্থিতি বা গতির কথা) তুলিলেই "বেগটা কাহার সম্পর্কে?" এই প্রশ্ন আপনি আসিয়া পড়ে। সাধারণতঃ জড় দ্রব্যের বেগ বলিতে অপর একটা জড়দ্রব্য সম্পর্কে উহার বেগ বুঝায়; তথাপি অপর কোন জড়ের কথা না তুলিয়াও কেবল দেশ-সম্পর্কে (বা নিছক শূন্যের মধ্যে) প্রত্যেক জড় দ্রব্যের একটা বেগ কল্পনা করা যাইতে পারে—অন্ততঃ এতদিন বৈজ্ঞানিকগণ এই রূপই বুঝিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপ বেগকে ঐ জড় দ্রব্যের খাঁটী বেগ বা নিরপেক্ষ বেগ বলা যায়।

মহাশূন্য রূপ সমুদ্রবক্ষে বসুন্ধরা একটা অচল দ্বীপের মত স্থির হইয়া রহিয়াছেন, অথবা একখানা পাল-তোলা নৌকা বা জাহাজের মত একটা নির্দিষ্ট বেগে কোনও দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন, ইহা নিরূপণই ছিল মিকল্‌সনের পরীক্ষার উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে সাহেবদ্বয় আলোকের বেগকে তাঁহাদের পরীক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেন। আলোকরশ্মি শূন্যপথে যত বেগে ছুটিয়া চলে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। আলোকের বেগ প্রথমে রোমার, তৎপরে ফিজো, ফুকো প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে শূন্যদেশে আলোকের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষক্রোশ এবং বিভিন্ন স্বচ্ছ পদার্থের অভ্যন্তরে ঐ বেগটা অপেক্ষাকৃত অল্পবিস্তর কম হইয়া থাকে। শূন্যদেশে আলোকের বেগটাই—অর্থাৎ পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপে যাহা সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষক্রোশ হইয়া দাঁড়ায়—আমাদের বিশেষ প্রয়োজন; উহাকে আমরা 'ভ' চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিব।

প্রশ্ন হইতে পারে—পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নির্ণয়ের পরীক্ষায় আলোকের বেগের সাহায্য গ্রহণ করা কেন? ঐ ব্যাপারের সহিত আলোকের বেগের সম্বন্ধ কি? অন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভবপর ছিল না কি? ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগটা সমবেগ হইতে পারে, অর্থাৎ শূন্যের ভিতর দিয়া পৃথিবী বরাবর একই দিকে ও সমান সমান কালে সমান সমান পথ অগ্রসর হইতে পারে এবং এইরূপ হওয়াই সম্ভব। কারণ, আমরা জানি, পৃথিবী বৎসরে একবার করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে এবং এই ব্যাপারে উহা উহার বৃহৎ কক্ষপথে প্রতিদিন প্রায় একডিগ্রি মাত্র অগ্রসর হইতেছে; ফলে ২৪ ঘণ্টায় বা ২।১ দিনেও পৃথিবীর এই বেগটা দিকে বা পরিমাণে বিশেষ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে করা চলে না। যদিও এই বেগটা পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নহে, সূর্য্য সম্পর্কীয় বেগমাত্র, তথাপি উহার নিরপেক্ষ বেগটাও এই জাতীয় অর্থাৎ প্রায় সমবেগ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এখন গ্যালিলিও ও নিউটনের গতিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীই হউক, অথবা অপর যে কোন জগৎই হউক, উহার বেগটা যদি সমবেগ হয়, তবে উহার অধিবাসীর পক্ষে কেবল জড়ের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অথবা কেবল জড়দ্রব্য সম্পর্কীয় কোন রূপ পরীক্ষা দ্বারা ঐ বেগ নিরূপণ কখনও সম্ভব হইবে না।

নিউটনীয় যুগের আপেক্ষিকতাবাদ।

কেন সম্ভব হইবে না, প্রথমে তাহাই আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে চেষ্টা করিব। ফুটবল খেলা হইতেছে; একদলের 'গোল-পোষ্ট' উত্তরের দিকে, অপর দলের দক্ষিণের দিকে। মাঠটা সমতল, বায়ুতে প্রবাহ নাই এবং উভয় দলের খেলোয়াড়দের বিশ্বাস—তাহারা সর্ব্বাংশে পরস্পরের সমান। এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ দল জিতিবে? সকলেই বলিবে যে, কোন দলই 'গোল' করিতে পারিবে না, অথবা উত্তরের দল যতটা গোল করিবে, দক্ষিণের দলও ততটা গোল করিবে। কিন্তু খেলাতে বাস্তবিক যদি দেখা যায় যে, দক্ষিণ দিক্‌কার দলটাই বারে বারে হারিয়া যাইতেছে, তবে ঐ দলের খেলোয়াড়দের মনে এইরূপ একটা সন্দেহ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে যে "পৃথিবী উত্তরের দিকে [illegible]য়া চলে নাই ত? এবং ইহারই ফলে ফুটবলটার পক্ষে

উত্তরের গোলপোষ্টের কাছাকাছি হওয়া অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার এবং দক্ষিণ গোলপোষ্টের কাছাকাছি হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় নাই ত ?" খেলোয়াড়দের মধ্যে এইরূপ ধরণের আপত্তি কোনদিন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই এবং হার হওয়াটা যে দলবিশেষের দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক, এ যাবৎ তাহাই সাব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য ফুটবল খেলায় জমি বদলাইয়া লওয়ার প্রথা আছে, কিন্তু তাহা ভিন্ন কারণবশতঃ—পৃথিবী স্থির না চঞ্চল, এইরূপ প্রশ্নের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

গ্যালিলিওই প্রথমে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, পৃথিবী স্থিরই থাকুক বা সমবেগে যে কোন দিকে ছুটিয়াই চলুক, প্রকৃতির বিধানই এইরূপ যে, খেলায় হার-জিত তাহার উপরে নির্ভর করিবে না; এবং ইহার কিছু দিন পরেই নিউটন বলিলেন যে, ঐ বিধান আর কিছুই নহে, উহার মূলে রহিয়াছে—জড়ের জড়ত্বধর্ম্ম বা 'নিশ্চেষ্টতা'। জড়দ্রব্য নিজে নিজের বেগের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না, ইহাই প্রকৃতির বিধান এবং ইহাতেই জড়ের জড়ত্ব। ফুটবল জড়-পদার্থ; উহার বেগ বড় হউক বা ছোট হউক বা একেবারে শূন্য-পরিমিতই হউক, ঐ বেগটা বজায় রাখিয়া চলাই উহার স্বভাব। প্রত্যেক জড়-পদার্থ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের জড়ত্বের বা নিশ্চেষ্টতার ছাপ লইয়া ছুটাছুটি করিয়া থাকে এবং ঐ জড়ত্বের পরিমাণ সকল অবস্থাতেই এবং সকল দ্রষ্টার কাছেই সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। নিউটনের এই জড়ত্বের সংজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে, পৃথিবী যদি বেগসম্পন্ন হয় এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠে অবস্থানের ফলে ফুটবলটাও ঐ বেগের অধিকারী হয়, তবে শূন্য-পথে 'গোল' করিতে যাইয়াও ফুটবলকে ঐ বেগটা সঙ্গে লইয়াই এদিকে ওদিকে ছুটিতে হইবে; সুতরাং পৃথিবী স্থিরই হউক বা সমবেগসম্পন্নই হউক, ফুটবলের পক্ষে কোনও দলের প্রতি পক্ষপাতিতা-প্রদর্শন সম্ভব হইবে না; এবং জড়দ্রব্য ফুটবলের ব্যবহার দেখিয়া পৃথিবী স্থির না চঞ্চল, তাহা নিরূপণ করাও পার্থিব দ্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ পরস্পর সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন হইতে পারিত। এরূপ স্থলে পার্থিব দ্রষ্টার মনে হইত যে, ঐ বেগটা মঙ্গলগ্রহের বেগ, পৃথিবী স্থির; এবং মঙ্গলের অধিবাসীর মনে হইত—আমিই স্থির, ঐ বেগটা পৃথিবীরই বেগ। বাস্তবিক, কাহার দেখা ঠিক দেখা, কাহার দেখা ভুল, তাহার কি মীমাংসা হইতে পারে না? গ্যালিলিও ও নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, যে জগৎটাকেই স্থির অথবা যেটাকেই বেগ-সম্পন্ন বিবেচনা করা যাক্ না কেন, জড়দ্রব্যের ব্যবহার, প্রত্যেক জগতের দ্রষ্টার কাছে একই আকারে ফুটিয়া উঠিবে; সুতরাং কেবল জড়ের গতি-বিধি দেখিয়া কোন্ জগৎ স্থির, কোন্ জগৎ চঞ্চল, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। এইরূপে নিউটনীয় যুগের গতি-বিজ্ঞানে নিম্নোক্ত মতবাদ স্থান লাভ করিল :—

"পরস্পর সম্পর্কে সমবেগসম্পন্ন এইরূপ বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাদের কাছে জড়ের গতিসম্পর্কীয় নিয়মগুলি একই আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে।"

এই মতবাদটাকে নিউটনীয় যুগের আপেক্ষিকতা-বাদ বা জড়ের গতিসম্পর্কীয় আপেক্ষিকতা-বাদ (Mechanical Principle of Relativity) বলা যাইতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া কোনও ব্যক্তি যদি একটা কামান হইতে একই বেগে ('ভ' বেগে) কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে কতকগুলি গোলা ছুঁড়িতে থাকে, তবে, যদিও দেশের সম্পর্কে ঐ সকল গোলার বেগ, পৃথিবী বেগহীন হইলে সকল দিকেই 'ভ' পরিমিত এবং পৃথিবী বেগসম্পন্ন হইলে এক এক দিকের পক্ষে এক এক পরিমাণের হইবে, কিন্তু (মাধ্যাকর্ষণ বাদ দিলে) ঐ ব্যক্তির পরিমাপে, সকল দিক্‌কার সকল গোলার বেগই সমান সমান হইয়া দাঁড়াইবে—পৃথিবীর বেগের ফলে, পার্থিব দ্রষ্টার দৃষ্টিতে, ঐ সকল গোলার বেগে কোনরূপ আপেক্ষিকতা আসিয়া উপস্থিত

হইবে না; আর, তাহার কারণ হইতেছে এই যে, কামানের গোলাগুলি জড়পদার্থ এবং কামান হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার সময়, প্রত্যেকেই উহারা, কামানের বেগটাকেও সাথের সাথী করিয়া লইয়াই উহা হইতে নির্গত হইয়াছে।

মিকল্‌সনের পরীক্ষার নিষ্ফলতা।

কিন্তু আলোক-তরঙ্গের পক্ষে ভিন্ন কথা। কেন না, আলোক-তরঙ্গকে ফুটবল বা কামানের গোলার মত জড়পদার্থ বলিয়া মনে করা চলে না। পরীক্ষার ফলে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আলোকের উৎপত্তিস্থল যাহাই হউক না কেন এবং উৎপত্তিস্থল স্থিরই হউক বা চঞ্চলই হউক, আলোক-রশ্মি আপন বেগেই শূন্যপথে ছুটিয়া চলে—উৎপন্ন হইবার পর উহা উহার জন্মস্থানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধই স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং ফুটবল খেলার হার-জিত দেখিয়া পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নির্ণয় সম্ভবপর না হইলেও আলোক-তরঙ্গের 'গোল' করিবার প্রণালী দেখিয়া ঐ বেগ নিরূপণ সম্ভব হইতে পারে।

এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মিকল্‌সন সাহেবদ্বয় যে পরীক্ষা করিলেন, উহার বিস্তৃত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই। ঐ পরীক্ষার যুক্তিপ্রণালী এইরূপ। ধরাপৃষ্ঠের কোনও স্থলে কেহ একটা আলো জ্বালিল; আলোক-রশ্মিগুলি ঐ দ্রষ্টার নিকট হইতে শূন্যপথে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সকল দিকেই অগ্রসর হইবে একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে—'ভ' বেগে। সুতরাং পৃথিবী যদি বেগহীন হয়, তবে ঐ দ্রষ্টার পরিমাপেও, আলোক-রশ্মির বেগ সকল দিকে সমান ('ভ' পরিমিত) বলিয়া ধরা পড়িবে; আর পৃথিবী যদি বেগবিশিষ্ট হয়—যদি মনে করা যায় যে, দ্রষ্টাকে লইয়া পৃথিবী শূন্যপথে 'ব' বেগে উত্তরের দিকে (অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে) ছুটিয়া চলিয়াছে, তবে আর আলোকের বেগ ঐ দ্রষ্টার পরিমাপে সকল দিক সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। এরূপ স্থলে পার্থিব দ্রষ্টা দেখিবেন যে, আলোকের বেগটা উত্তর দিকে (ভ—ব) পরিমিত, দক্ষিণ দিকে (ভ+ব) পরিমিত এবং পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে উহাদের Geometric mean বা মাঝামাঝি পরিমাণের; অর্থাৎ তাহা হইলে, পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপে, বিভিন্ন দিকের আলোক-রশ্মির বেগে একটা আপেক্ষিকতা আসিয়া পড়িবে। বেগহীন পৃথিবীর দ্রষ্টার পরিমাপে আলোকের বেগ সকল দিকে সমান বলিয়া অনুভূত হইবে; কিন্তু বেগবিশিষ্ট পৃথিবীর দ্রষ্টার মাপে উহা এক এক দিকে এক এক পরিমাণের বলিয়া ধরা পড়িবে। ফলে যে কোন দুই দিক্‌কার আলোকরশ্মির বেগের তুলনা করিয়া পার্থিব দ্রষ্টা তাঁহার জগতের নিরপেক্ষ বেগ বা 'ব'এর পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারিবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে আলোকরশ্মিটা উত্তর দিকে যাইতেছে, পরিমাপে উহার বেগটা যদি 'উ' পরিমিত এবং যেটা দক্ষিণ দিকে যাইতেছে উহার বেগটা 'দ' পরিমিত হইয়া দাঁড়ায়, তবে ঐ দ্রষ্টা বলিবেন, উ = (ভ—ব) এবং দ = (ভ + ব); সুতরাং $\frac{\text{উ}}{\text{দ}} = \frac{\text{ভ} - \text{ব}}{\text{ভ} + \text{ব}}$ অর্থাৎ $\text{ব} = \frac{\text{দ} - \text{উ}}{\text{দ} + \text{উ}} \times \text{ভ}$; এবং এইরূপে 'উ' 'দ' এবং 'ভ'এর মূল্য জানিয়া 'ব' এর মূল্যও নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

উপরি-উক্ত সম্বন্ধ হইতে দেখা যায় যে, 'দ' এবং 'উ' প্রায় সমান সমান হইলে, 'ব'কে 'ভ'এর একটা সামান্য ভগ্নাংশরূপে, এবং উহারা পূর্ণমাত্রায় সমান হইলে 'ব'কে শূন্য পরিমিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মিকল্‌সনের পরীক্ষায় এরূপ সূক্ষ্ম মাপজোখের ব্যবস্থা ছিল যে, পৃথিবীর ঐ নিরপেক্ষ বেগ (বা 'ব') যদি আলোকের বেগের ('ভ'এর) অতি সামান্য একটা ভগ্নাংশও হইত, তবে ঐ কল্পিত বেগটা তাহাদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না; কিন্তু পার্থিব দ্রষ্টা মিকল্‌সনের পরিমাপে 'দ' ও 'উ'র মধ্যে কোন পার্থক্য ধরা পড়িল না—পরিমাপে আলোকের বেগ সকল দিকেই সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং ঐ পরীক্ষা হইতে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে—

(১) হয় 'ব'এর পরিমাণ শূন্য—মহাশূন্যে পৃথিবী স্থির হইয়া রহিয়াছে;

(২) অথবা পৃথিবী বেগবিশিষ্ট, কিন্তু আলোকের বেগকে ভিত্তি করিয়া ঐ বেগ নিরূপণ সম্ভব হইবে না।

কিন্তু পৃথিবীকে একেবারে বেগহীন বলিয়া গ্রহণ করিতে বৈজ্ঞানিকগণ নারাজ হইলেন। পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে এবং ছয়মাস অন্তর, সূর্য্যসম্পর্কে, উহার গতির দিকটা সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া দাঁড়াইতেছে; সুতরাং দেশসম্পর্কে পৃথিবীকে সময়বিশেষে স্থির বলিয়া কল্পনা করিলেও সারা বৎসর ধরিয়া উহাকে অচল বলিয়া মনে করা চলে না। মিকল্‌সন্ সাহেবদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে শীতগ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে আলোকের বেগ সকল দিকেই সমান হইয়া দাঁড়ায়—কোন ঋতুতেই বিভিন্ন দিগ্‌গামী আলোক রশ্মির বেগে একটা আপেক্ষিকতা আসিয়া পড়ে না। সুতরাং তাঁহারা দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন—পৃথিবীর একটা নিরপেক্ষ বেগ বা খাঁটি বেগ রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আলোকের বেগকে ভিত্তি করিয়া ঐ বেগ নিরূপণ সম্ভব হইবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অন্ধকারে

সন্ধ্যাবেলা আকাশ পানে আজকে আছি চেয়ে,
মন ভেসে যায়, প্রাণ ভেসে যায়, সুপ্তি আসে ধেয়ে,
জীবন যেন লুপ্ত আমার; বিপুল স্রোতে ভাসি,
অন্ধকার আর আলোর স্রোতে যাই রে ভাসি' হাসি'।
খণ্ড মেঘের ঢেউএ ভরা আকাশ সিন্ধু হেন
আঁধার-আলোর জোয়ার-ভাঁটায় নিত্য দোলে যেন।
অনন্ত কাল এ স্রোত বহে অনন্ত প্রাণ বহি',
অনন্ত জীব ডুব্‌ছে, আবার ভাস্‌ছে রহি রহি
আমার মতন,—নেইক বিরাম শ্রান্তি কোনো ক্ষণে,
বৃক্ষ ভাসে, মানুষ ভাসে, পৃথ্বী, জীবগণে।

নেইক সাড়া ধরায় কোন, এক নারিকেল-গাছ
মৃদুল হাওয়ায় দোলায় পাতা শূন্যহারি মাঝ,
একটি দু'টি কাকের আওয়াজ, নেইক রে আর কিছু,
ব্যাধের মত আঁধার এসে শব্দ পিছু পিছু
করলে তারে শায়ক-হত; স্তব্ধ দিশি দিশি,
কেবল আমি জ্যান্ত যেন, তাও যে রে যাই মিশি' !—
কে আনে রে মৃত্যু-পরশ—চিত্তে আমার লাগে;
স্পন্দিত প্রাণ স্তম্ভিত হয় এ কার অনুরাগে!

শান্তি এ কি? এ কি গভীর মৃত্যুরি বন্ধন?
এ কি বিপুল প্রাণের সাথে প্রাণের আলিঙ্গন?

অবোধ উদাস বুঝ্‌তে নারি এ কারি আহ্বান;
টান্‌ছে আমায় উধাও খালি অন্ধকারের বান।
আকাশ-বুকে আঁধার-স্রোতে আজকে ভেসে যাই,
যাই রে ভেসে গভীর দেশে, বন্ধ বাধা নাই।
হে অন্ধকার, হে পারাবার, জীবন-কাণ্ডারী,
নাও টেনে নাও, নাও গো বুকে; সইতে নাহি পারি
এই ধরণীর কঠোর মরুর দুঃখ-পেষণ-কারা,
ক্ষতের 'পরে দাও গো প্রলেপ শান্তি-সুধার ধারা।
সে শান্তি দাও, মৃত্যু যদি হয় গো তাহার রূপ,
তবুও তায় করব বরণ, হে মোর জীবন-ভূপ।
দিনের আলোয় দুঃখ আনে, দগ্ধ তাহে আঁখি,
এস আঁধার স্নিগ্ধ কোমল, চক্ষে বুকে রাখি।
জুড়াও জীবন, হে অন্ধকার, নিবাও ব্যথার শিখা,
শান্তিরি দাও স্নিগ্ধ চুমা, মৃত্যুরি দাও টীকা।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

ঠাকুর্দ্দা

(গল্প)

ঠাকুর্দ্দা বসিয়া আছেন। ঠাকুর্দ্দার শরীর হইতে যৌবন অগস্ত্যযাত্রা করিলেও স্বাস্থ্যের দিব্যকান্তি অঙ্গের উপর লীলায়িত। রৌপ্যশলাকার গুচ্ছ বা বরফ ঢাকা গৌরীশৃঙ্গের মত মাথার সব চুল শাদা। হাতে হুঁকা, মুখে অকপট হাসি, চোখে স্নেহমণ্ডিত দৃষ্টি। ঠাকুর্দ্দাকে ঘিরিয়া নাতি নাতিনীরা উপবিষ্ট—যেন টাকার চারিপাশে আধুলি, সিকি, দুয়ানী—বা থালার পাশে বাটিগুলি।

এক নাতি বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, একটা গল্প বল—সেই বেঙ্গমা বেঙ্গমীর কথা।" তখনই আর এক নাতিনী বলিল, "না ঠাকুর্দ্দা, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প নয়, দুয়োরাণী সুয়োরাণীর গল্প—ডালিমকুমারের কথা বল।"

ঠাকুর্দ্দার সব চেয়ে ছোট নাতি মণ্টু আধ আধ স্বরে বলিল, "দাদু, ন—তে—গাৎতী মুলোলো।"

ঠাকুর্দ্দা গভীর স্নেহে প্রাণখোলা হাস্যে ছোট নাতিকে কোলে করিয়া আদর করিয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "নটে গাছটী মুড়লো, আমার গল্প ফুরলো।"

নাতি-নাতিনীর বহুবিধ ফরমাইস শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "দাদা দিদিরা ত রোজ 'রাক্কস' রাক্কসী, পাতালপুরীর রাজকন্যা, সোণার কাঠি রূপার কাঠি, গল্প শুনেছ, আজ আমার নিজের ছেলেবেলাকার সব গল্প বলি, তাই শোন।"

এই কথা শুনিয়া কনককুমার বলিয়া উঠিল, "দাদা, যখন তোমার বয়স ১০ বচ্ছর ছিল? তখন তোমার দাড়ী কত বড় ছিল? আঁা দাদা, চুল কি সব শাদা ছিল?"

ছোট নাতনী হাতে তালি দিয়া বলিতে লাগিল "টিয়া পাখীর ঠোঁটটী লাল, ঠাকুর-দাদার শুক্‌নো গাল।"

ঠাকুর্দ্দা হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর্দ্দার গাল চিরকালই শুক্‌নো ছিল না রে, ঠাকুর্দ্দা হবার আগে আমার গালও টিয়াপাখীর ঠোঁটটীর মত লাল ছিল। সেই দিনকার গল্পই শোন্!"

ঠাকুর্দ্দা যে একদিন ছেলেমানুষ ছিলেন, এই তাজ্জব ঘটনার কথা শুনিয়া নাতি-নাতিনীরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঠাকুর্দ্দার মুখের উপর মনোযোগের সঙ্গে চক্ষু নিবিষ্ট করিল।

ঠাকুর্দ্দা বলিতে লাগিলেন—

"যখন আমার বয়স ৮ বৎসর তখন আমি বগলে তালপাতার পাতাতাড়ি নিয়ে গুরুমশায়ের পাঠশালায় গেলাম। আমি ছিলাম পড়ুয়ার সর্দ্দার। আমের কালে কাঁচা আম পাড়তে, পেয়ারার সময়ে পেয়ারা চুরি করতে, আর বর্ষাকালে নদীতে সাঁতার দিতে আমার সমান কেউ ছিল না। আমাদের স্নানের ঘাটের ধারে একটা বড় আমগাছ ছিল, বর্ষাকালে আমি ঐ গাছের খুব উঁচু ডাল হতে লাফ দিয়ে নদীতে পড়তাম, নদীর জল তোলপাড় করে' আমাকে ডুবিয়ে নিত—আমি কিছুক্ষণ পরে দূরে ভেসে উঠ্‌তাম। তোমাদের মত আমরা তখন শিষ্ট শান্ত সুবোধ ছিলাম না। আমরা ছিলাম দুষ্টু লক্ষ্মীছাড়া অশান্ত।

"বৈকালে খেলবার সময় হাঁকডাকে পাড়া চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত। ফুটবল, ক্রিকেটের তখন চলন ছিল না। আমরা পল্লীবাসী, পল্লীমায়ের স্নেহনীড়ে লালিত পালিত। আমাদের খেলাধুলা ছিল—হাডুডু, কাণামাছি। খেলার পর ক্লান্ত দেহে নদীর তীরে গিয়ে বসতাম। সূর্য্য তখন পশ্চিমে চলে' পড়ে' মিলিয়ে গেছে। কৃষকেরা মেঠো সুরে গান গাইতে গাইতে গরু নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্র মাঠ হতে ফিরে আসছে। ন্যাজ দুলিয়ে গরুর দল হাম্বারবে ঘরে ফেরবার জন্যে দ্রুত বেগে চলেছে। পল্লীরমণীরা সারাদিনের কাযের

পর নদীতে গা ধুয়ে জলভরা কলসী কাঁখে করে' দলে দলে সাংসারিক কথা বলতে বলতে বাড়ী ফিরছেন। আকাশে যেমন দুই একটি তারা ফুটে বাহির হচ্ছে, তেমনই নদীর বুকের উপর নৌকো হতে দুই একটি আলো দেখা যাচ্চে। নদীর ঢেউয়ে দোল খেয়ে আলোগুলি ঈষৎ কাঁপছে। আমরাও প্রফুল্লমনে যাত্রার শোনা গানের মনে থাকা পদগুলি সমস্বরে গেয়ে সঙ্গীত-বিস্তার পরিচয় দিতাম। এই রকমে কিছুক্ষণ কাটুলে পর যখন আশে পাশের জঙ্গল হতে শৃগালরা ঐক্যতান আরম্ভ করত, তখন আমরা যে যার বাড়ী ফিরতাম।

"পূজার সময় জমীদার-বাড়াতে আমরা রঙিণ কোট গায় দিয়ে, লাল জুতা পরে' ঠাকুর দেখতে যেতাম। বিসর্জ্জনের দিন মেলায় কেনবার জন্তে পয়সা নিয়ে এক দল বেঁধে নদীর ঘাটে যেতাম। বিসর্জ্জন দেখে ঠাকুর সাজের রাংতা নিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে কোঁচড়ে ভুট্টার খই আর ছাঁচ নিয়ে বাড়ী ফিরতাম। কোজাগর পুর্ণিমার পূর্ব্বে মা আমার কত লাড়ু, মুড়কী, ক্ষীর ছাঁচ বাঁধতেন। দলে দলে লোক আমাদের বাড়ীতে খেতে আসত, আমরাও সব জাতির বাড়ীতে লাড়ু, মুড়কীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গৃহস্থের স্নেহ সরল প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহার আস্বাদন করতাম।

"আমার সেই আনন্দময় ছেলেবেলাকার বন্ধুসকল এখন আর সব নাই। কেউ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তেপান্তরের মাঠে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সুদূরে চলে' গেছে। কেউ বা তোদের মত নাতি নাতিনী নিয়ে আমার মত ঠাকুর্দ্দা হয়ে মাথার পাকাচুল তোলাচ্চে।"

ঠাকুর্দ্দার গলা ধরিয়া আসিল। তিনি তখন ছোট নাতিকে কোলে লইয়া "দাদু আমার" "দাদু আমার" বলিয়া আদর করিতে লাগিলেন। সত্তোবিবাহিতা প্রভা-রাণী সহাস্তে ঠাকুর্দ্দাকে বলিল, "দাদা, ঠাকুরমার কথা বলো, আম জাম পাড়া, নদীতে ঝাঁপ দেওয়া শুনতে ভাল লাগে না।" কলেজে পড়া নাতি এই সময় আসিয়া প্রভার কথা সমর্থন করিল। তখন ঠাকুর্দ্দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন—

"তোদের ঠাকুরমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়—যখন আমার বয়স কুড়ি বৎসর। তখন আমি কলকাতায় কলেজে পড়ি। বিবাহের পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে তার একটু আধটু ভাব ছিল। আমাদের বাড়ী ছিল এক পাড়ায়। বিবাহের আগে তাকে আমি অনেক উপহার দিয়েছি। সে উপহার তোদের মত সুগন্ধি তেল, ফিতে, চিরুণী বা সাবান নয়। কোন দিন দু'টো চুরিকরা শশা, এক কোঁচড় পেয়ারা বা দু'টো কাঁচা আম। বদলে পেয়েছি—তোদের আজকালকার মত 'চু—মো' নয়—একটু লঙ্কার গুঁড়ো, লবণ বা বড় জোর লতায় গাঁথা একটা বৈঁচি বা বকুল ফুলের মালা।

"শুভদৃষ্টির সময় যখন তোর ঠাকুরমা আমার দিকে ঈষৎ হেসে সলজ্জ চোখে তাকালে—তখন তাকে অতি সুন্দর দেখাল। সুবিন্যস্ত কেশরাশি, কপালের টিপ, মুখের উপর চন্দনের রেখা, আলতার মত লালটুকটুকে ঠোট—ঠিক যেন আমার এই প্রভা পদ্মরাণী।"

প্রভা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল, "যাও, দাদু বড্ড ফাজিল।"

দাদু সহাস্তে বলিলেন, "ওরে ছুঁড়ী, চটিস্ কেন? তখন তোর ঠাকুর্দ্দার মুখে বিশাল গুম্ফ ছিল না বা মাথার উপরে কাশের বন ছিল না—তখন তোর ঠাকুর্দ্দা তোর বরটীরই মত কলেজে পড়া কুড়ি বছরের ছোঁড়াই ছিল।"

সাজা হুঁকাটী মুখে তুলিয়া দুই একটা টান দিয়া ঠাকুর্দ্দা বলিতে লাগিলেন, "ফুলশয্যার রাত্রে পার্শ্বে শায়িতা শয্যাসঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'কুসু, কলকাতায় যাব, তোমার কি চাই?' তোর ঠাকুরমা কি উত্তর দিয়েছিল জানিস্? বলেছিল 'এক কোঁচড় বোষপাড়ার কুল।' আমি হেসে বল্লাম 'না খামে ভরা চিঠি?' কিন্তু প্রভারাণী আর বড় নাতি, কেমন

তোদের সঙ্গে মেলে ত? এ সব শুধু তোদেরই একচেটিয়া না—ভগবানের করুণ শব্দ শোনবার জন্তে উৎকর্ণ ভক্তের মত তোরা এখন 'চিঠ্‌টি' হাঁক শোনবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে থাকিস্।"

বড়নাতি সকৌতুকে বলিল, "কৈ দাদু, আমায় কোনদিন ওরকম করতে দেখেছ?"

ঠাকুর্দ্দা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই ত বয়সের দস্তুর, গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা। আরে নাত-বৌ যখন এখানে না থাকে, তখন যে তোমায় পিয়নের জন্তে 'ঘর করেছি বাহির, বাহির করেছি ঘর' দেখে কি বুঝ্‌তে পারি না? বরটী আসবার পূর্ব্বে প্রভাদিদির আলতাপরা সাজগোজ কি বুড়ো ঠাকুর্দ্দার চোখ এড়ায়? আমি বুঝি রে, বুঝি। তোরা ভাবিস্‌ সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত—

"শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালবাসা,
এরে দেখি হেসে ভাবিত এ লোক জানেনা
চোখের ভাষা,
নলিনী যখন খুলিত পরাণ চাহি তপনের পানে
ভাবিত এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে,
ভাবিত এ ক্ষ্যাপা কেমনে বুঝিবে কি আছে
অগ্নি বেগে।
সহকার শাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্ম্মর কথা!"—

কিন্তু তা নয়—বুড়োকে বোকা মনে করো না। সাবধান
'মুখর এখনি নাজানি আরো কি রটাবে কথা।'

"তোদের ঠাকুরমা বেশী লেখাপড়া জানত না। তবুও আমার চিঠির উত্তর দিত—আঁকাবাঁকা লেখা, কালী ধ্যাবড়ানো, সাতটা কেটে একটি অক্ষর। এই দেখেই আমার যে কি আনন্দ হ'তো, তা এখন তোরা বুঝিস্। তোরা ত এমন কত কবিতা লিখিস্—'প্রিয়ার চিঠি' 'প্রিয়ার লিপি'। তখন তোদের ঠাকুরমার 'হাতের লেখা নেহাৎ কাঁচা' 'লাইন হরফ নয়ক সোজা' 'বানান-ভুলে—নানান্ ভুলে—ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করা' চিঠি পড়ে আমারও তোদের মতই মনে হত—

"তবু এ মোর মনের মতন, হিয়ার রতন, প্রিয়ার চিঠি,
তাহার কালো তরুণ আঁখির এ যে হাজার করুণ দিঠি।'

—কি বল দাদা, যা বলেছি ঠিক্ কি না, হুবহু মিল হচ্চে ত?

"তোদের ঠাকুরমার সঙ্গে আমার দিনগুলি কেমন মধুর ভাবেই না গিয়েছে! সে সাধ্বী শুধু আমার কাছে এই আশীর্ব্বাদ চাইত যে, তার শাঁখা যেন অক্ষয় ও সিঁথির সিন্দুর যেন চিরউজ্জ্বল হয়। আমিও তাকে প্রাণ ভরে' এই আশীর্ব্বাদ করিতাম। ত্রিশ বৎসর তার সঙ্গে কাটিয়েছি। সে কাহিনী প্রেমে মধুর, ভক্তিতে পবিত্র, স্মৃতিতে অমর, গৌরবে চির-অম্লান।"

ঠাকুর্দ্দার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "এখন তোর ঠাকুরমার শেষের দিনের কথা শোন্। তোর ঠাকুরমা আমার বুকে রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে সমস্ত আনন্দ হরণ করে' মায়া কাটিয়ে চলে গেল। শুভদৃষ্টির সময় তাকে খুব সুন্দর দেখেছিলাম—আর আজ দেখলাম আরও সুন্দর। সিঁথিভরা সিন্দুর, গলায় শাদালাল ফুলের মালা, পরণে রাঙাপেড়ে শাড়ী, হাতে অক্ষয় শাঁখা আর নোয়া। আলতা রাঙানো পা দুখানি যেন দুটি রক্তজবা। তাকে নিজের হাতে চিতায় তুলে দিলাম।......কিরে প্রভা যে চোখ মুছছিস্? বুড়ো বুড়ির মরণের কথা শুনে বুঝি কেউ আবার কাঁদে! এখন যা দেখি খুব ভাল করে একটু পাণ ছেঁচে নিয়ে আয়।""

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস।

রঙ্গলাল

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ

(১৮৪৩—১৮৪৭)

সাধনা। খিদিরপুরে মাতুল রামকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আলয়ে আগমন করিবার সঙ্গেই রঙ্গলালের বিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষা রহিত হইয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি স্বকীয় চেষ্টায় নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রামকমলের বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু রাজনারায়ণের পুত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁহার পরম অনুগত বন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয়ের সহিত রঙ্গলালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হওয়ায় রঙ্গলাল সাহিত্যালোচনায় উপযুক্ত সহযোগী লাভ করেন। তিনি রামকমলের পুস্তকাগারে রক্ষিত গ্রন্থসমূহ এবং অগ্রজ গণেশচন্দ্রের শ্বশুরালয় ভূকৈলাস রাজবাটীর প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নানাবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতসাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিদ্যার্জ্জনে ও বিদ্যাবিস্তারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। দরিদ্র বালকদিগকে শিক্ষাদানের কোনও ব্যবস্থা নাই দেখিয়া কৈশোরেই রঙ্গলাল তাঁহার অগ্রজ গণেশচন্দ্রের সহযোগিতায় রামকমলের ভবনের একটি কক্ষে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং স্বয়ং অধ্যাপনার ভার লন। সুপণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও তদীয় ভ্রাতা (পরে ধন্বন্তরীকল্প চিকিৎসক রায় বাহাদুর) সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়গণও কৈশোরে খিদিরপুরে বাস করিতেন এবং রঙ্গলালের সহিত সৌহার্দ্দ্যবশতঃ তাঁহারাও প্রায়ই রামকমলের গৃহে আগমন করিয়া রঙ্গলালের এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতেন। রঙ্গলালের বাল্যবন্ধুগণ সকলেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তিনি যে কৈশোরেই বাণীর প্রসাদলাভের জন্য একাগ্র সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু তাঁহার সাহিত্যসাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ভূকৈলাসের বিদ্যোৎসাহী রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর ও তাঁহার অনুজ ও পুত্র রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ও রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর। রঙ্গলালের কৈশোরে ইঁহারা তাঁহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। সেই জন্য ইঁহাদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা উচিত।

ভূকৈলাসের রাজবংশ। ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পিতামহ কন্দর্প ঘোষাল প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কান্যকুব্জাগত যদুনাথ পাঠক নামক কুলীন ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন। গোবিন্দপুর গ্রামটী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য অধিকার করিলে ইনি খিদিরপুরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কন্দর্পের দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্রের মধ্যে গোকুলচন্দ্র সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। গোকুলচন্দ্র বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মিষ্টার ভেরেলষ্টের দেওয়ান ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র) মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। রঙ্গলাল যখন খিদিরপুরে আগমন করেন তখন গোকুলচন্দ্রের প্রাসাদোপম অট্টালিকা অতি জীর্ণদশায়। ১২৫৫ সালের ২৫শে চৈত্র (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল) দিবসে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' নিম্নোদ্ধৃত পত্র রঙ্গলালের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়—

"সম্পাদক মহাশয়, কীর্ত্তিমান পুরুষদিগের বংশলোপ অথবা তৎসন্তানদিগের প্রতি কমলার কোপ নিরীক্ষণ করিলে মনোমধ্যে এক অব্যক্ত খেদমিশ্রিত ভাবের উদয়

হইয়া থাকে। ঐ ভাব প্রকাশ করা কবি ব্যতীত আর কাহারও সুসাধ্য নহে, তথাপি সামান্য পদ্যে উক্ত বিষয়ক এক কবিতা প্রেরণ করি পত্রস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক। খিদিরপুর গ্রাম যে মহাশয়দিগের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই ঘোষাল মহোদয় দিগের পুরাতন বাটী অর্থাৎ যে অট্টালিকায় দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বিরাজমান ছিলেন সেই প্রাচীন নিকেতনে কোন কার্য্যবশতঃ গমন করত তাহার ভগ্নাবস্থা বিলোকনে হঠাৎ মন্নয়নে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিম্ন লিখিত পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, যদিও তন্মধ্যে যথার্থ কাব্য অথবা তচ্ছক্তির চিহ্ন কিছুই নাই তথাপি পাঠ মাত্রে মহাশয়ের কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ পুনরুল্লেখ হইতে পারে—

কোথা সে পুরুষ অদ্য,   নামে যাঁর সদ্য সদ্য,
সম্ভ্রমে লোমাঞ্চ হয় দেহ।
ভগ্ন সব গৃহগণ,   বন সম উপবন,
তত্ত্ব তাঁর নাহি লয় কেহ॥
অশোক কুসুম ফুটে,   শোক শেল হৃদে ফুটে,
কে বলে অশোক তার নাম!
রুধিরে লোহিত কায়,   তরুপরে শোভা পায়,
নীরস বিরস অভিরাম।
কোথা সে ভাবুক কবি, *   কবিতা কমল রবি,
উদয় নহেন কেন তিনি।
কবিতা রচনা ছলে,   প্রকাশিলা ধরাতলে,
তরঙ্গিণী ভক্তি তরঙ্গিণী॥
হরিপ্রিয়া প্রিয়া যাঁর,   হরিপ্রিয়া সম তাঁর,
আবির্ভাব ছিল এককালে।
কোথায় গো হরিপ্রিয়া,   এই কি তোমার ক্রিয়া,
তব পুরী [illegible] করে কালে।
সিন্ধু সম পিতা তব,   ঘোষিত গৌরব রব,
ঘোষাল ঘোষণ দিক্ দশে।
গৃহপাল অবসান,   গৃহপাল মূর্ত্তিমান,
ফেরুপাল সহ গৃহে বসে।

এক কালে ছিল যথা,   আমোদ প্রমোদ কথা,
বিষাদ প্রসাদ সে প্রাসাদ।
হর্ম্ম্যতল নহে রম্য,   মনুষ্যের নহে গম্য,
মন সহ চক্ষের বিবাদ॥
দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ,   মূর্ত্তিমন্ত বেদপ্রজ্ঞ,
যেখানেতে ছিলেন সতত।
সেখানেতে এ কি ভাব,   অচলা সচলা ভাব,
অভাব সুভাগা মতি যত॥
বিদ্যাদেবী অন্তর্দ্ধান,   অবিদ্যার অধিষ্ঠান,
রোদন গীতের অনুকল্প।
মনোহর কীর্ত্তিচয়,   কাল দন্তে সমুদয়,
ক্রমে ক্ষয় হয় অল্প অল্প॥
দেখি ভগ্ন ঘর দ্বারে,   মনে হয় কমলারে,
কাল বুঝি উপহাস করে।
অতএব ধন জন,   হেরি সব অকারণ,
নিত্য নহে সংসার ভিতরে॥
সকলে প্রধান কাল,   বলবান অধিপাল,
প্রতি পলে পাড়িছে প্রলয়।
নমঃ কাল মহেশ্বর,   সংহার ত্রিশূলধর,
নমো নমো ভুবন বিজয়॥

দর্শকস্য।

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল ১১৫৯ সালে ৩রা আশ্বিন (১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্পবয়সেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন এবং কিছুকাল বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব বাহাদুর এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। কথিত আছে যে কতকগুলি জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সন্তোষভাজন হন এবং তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে মহারাজ বাহাদুর উপাধি ও ৩৫০০ ঘোড় সওয়ার রাখিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। অতঃপর বাণিজ্য দ্বারাও জয়নারায়ণ প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন এবং খিদিরপুর ও অন্যান্য স্থানে বহু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। কিন্তু তিনি নানাবিধ সৎকার্য্যে অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথমে খিদিরপুরের নিকটস্থ

* গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী রচয়িতা ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই মহাত্মা দেওয়ানজীর জামাতা ছিলেন।

ভূকৈলাসে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়া মর্ম্মর খচিত দেবায়তনে স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামক দুইটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। ইঁহার সময়েই রাজবাটীর চতুর্দ্দিক পরিখা দ্বারা বেষ্টন করা হয়। তিনি ভূকৈলাসে কমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও রাজেশ্বর নামক তিনটি শিবলিঙ্গ, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, রামসীতা, সূর্য্য, হনুমান যোগভৈরব প্রভৃতির মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করেন। শিব-রাত্রির সময় এখনও ভূকৈলাসে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। জয়নারায়ণ কালীঘাটের কালীমাতারও চারিটি রৌপ্য নির্ম্মিত হস্ত করাইয়া দেন। কাশীধামে জয়নারায়ণের অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন বিরাজিত আছে। বিনাব্যয়ে বিভিন্ন জাতীয় বালকগণের মধ্যে বিদ্যাবিতরণের জন্ত তিনি বহু অর্থব্যয়ে ১২২৪ সালে বারাণসীধামে চুণার-প্রস্তর-নির্ম্মিত চারিতলবিশিষ্ট জয়নারায়ণ কলেজ স্থাপিত করেন ও উহার পরিচালনের জন্ত প্রচুর অর্থদান করেন। তিনি বারাণসীতে গুরুধাম নামে একটি ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া করুণানিধান মহাদেবের নামে উৎসর্গ করেন।

জয়নারায়ণ পরম সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি উপযুক্ত পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া স্কন্দপুরাণান্তর্গত সংস্কৃত কাশীখণ্ডের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ‘কাশীপরিক্রমা’ নামক অধ্যায়ে তিনি কাশার তাৎকালীন অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। ‘করুণানিধান বিলাস’ গ্রন্থে (১২২১ সাল) তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্ত গ্রন্থ যথা—‘শঙ্করী সঙ্গীত’, ‘ব্রাহ্মণার্চ্চন চন্দ্রিকা’ ও ‘জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম’ এক কালে হিন্দু পাঠকগণের প্রিয় গ্রন্থ ছিল। ১২২৮ সালে ২৫শে কার্ত্তিক (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) রাজকবি জয়নারায়ণ দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে তিনি স্বর্গারোহণের সাত দিন পূর্ব্বে বন্ধুগণকে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণের পুত্র কালীশঙ্কর পিতার ন্তায় বিদ্যোৎ-সাহী ও দাতা ছিলেন। তিনি বারাণসী কলেজ কমিটির প্রথম ও প্রধান সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কাশার কুইন্স কলেজের প্রথম নক্সা তাঁহারই তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং প্রচুর অর্থদান করিয়াছিলেন। কাশীধামে তিনি একটি অন্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড এলেনবরা ইঁহার অপূর্ব্ব বদান্ততায় মুগ্ধ হইয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহাকে ‘রাজাবাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজা কালীশঙ্করের সাত পুত্র—কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ পিতার লোকান্তরগমনের পূর্ব্বেই কালকবলে পতিত হওয়ায় সত্যচরণই পিতার পর রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ইনি সকল সৎকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক তাৎকালীন প্রসিদ্ধ রাজনীতিক সভার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি সাহিত্যসেবীদিগের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং রঙ্গলাল কৈশোরে ইঁহার উৎসাহ না পাইলে কাব্যরচনায় উন্মুখ হইতেন কি না সন্দেহ। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুতে রঙ্গলাল মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য অনুজ রাজা সত্যশরণের স্নেহ ও উৎসাহ তাঁহাকে তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষকের অভাব কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সত্যশরণের মৃত্যু হইলে সত্যচরণের পুত্র সত্যানন্দ রাজা উপাধি লাভ করেন।

আমরা রঙ্গলালের বিষয় লিখিতে গিয়া ভূকৈলাস রাজবংশের কিছু দীর্ঘ বিবরণ দিয়া হয়ত পাঠকগণের বিরক্তিভাজন হইলাম। কিন্তু যদি রঙ্গলাল স্বয়ং তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেন তাহা হইলে, বোধ হয়, তাহার অধিকাংশ ভূকৈলাস রাজবাটীর কথায় পরিপূর্ণ থাকিত। কারণ, ভূকৈলাসের রাজাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সময়ে, যে সময়ের ভূকৈলাস রাজবাটীর বর্ণনা করিতে গিয়া দীনবন্ধু লিখিয়াছেন—

ভুবনে কৈলাস-শোভা ভূকৈলাস ধাম
সত্যের আলয় শুদ্ধ সত্য সব নাম,
চারিদিকে কাটাগড় কেমন সুন্দর
খিলানে নির্ম্মিত সেতু, বন্ধ পরিসর,
পথের দুকূলে শোভে বকুলের ফুল,
তপন তাপেতে তারা অতি অনুকূল ;
বিরাজে ঠাকুরঘরে হেম-দশভুজা,
পট্টবাসাবৃত বিপ্র করিতেছে পূজা।—

সেই সময়ে রঙ্গলাল অধিকাংশ সময় ভূকৈলাস রাজবাটীতেই অতিবাহিত করিতেন, রাজপ্রাসাদস্থ সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে বাণীর সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন, দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতেন, এবং সাহিত্যানুরাগী বয়োজ্যেষ্ঠগণের নিকট সাহিত্যসেবার প্রেরণা লাভ করিতেন।

গৌরদাস বসাক

ঈশ্বরগুপ্ত ও বঙ্গসাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা। এই সময়ে রঙ্গলাল 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হন এবং তাঁহার পত্রের অন্যতম লেখক হন। তাঁহার রচনার সহিত পরিচয়, বোধ হয়, পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন —

"বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কতদূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এখনকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব' বিচার করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে "আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা হইলেও কিরূপে দেশ কালের প্রভাব, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার দুঃখময় পারিবারিক জীবনের ছায়াপাতে তাঁহার প্রতিভা-প্রভাকর অনেক

স্থলে ম্লানভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা এবং মাতা ও সহধর্ম্মিণীর পবিত্র সংসর্গের অভাব তাঁহার প্রতিভা-সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু "মাতৃসম মাতৃভাষার" প্রতি তাঁহার অনুরাগ—যে অনুরাগের অগ্নিশিখা তিনি গভীর তাঁহার শিষ্যগণের হৃদয়ে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন—সেই অনুরাগ তাঁহাকে এতদূর উদারতা দান করিয়াছিল যে তিনি একদিকে অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বগামী বিভিন্ন-পথাবলম্বী কবিদিগের পদাবলী ও জীবনচরিত সঙ্কলনের আয়াসসাধ্য কার্য্য শ্রদ্ধা ও আনন্দ-সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং অপর-দিকে প্রতীচ্য কাব্যসাহিত্যপাঠে বিভোর নবীন কবিগণের নূতন আদর্শে রচিত কবিতা-বলী সানন্দে স্বীয় পত্রে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে মাতৃভাষার গৌরববর্দ্ধনের জন্য উৎসাহদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য, ভবিষ্যৎ সমালোচকগণ ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যকে যে স্থানই প্রদান করুন না কেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারগণকে একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে ঈশ্বর চন্দ্র তাঁহার সময়ে সাহিত্যের একটি মহোপকার সাধিত করিয়াছিলেন। তিনি কেবল কবিতার সৃষ্টি করেন নাই, তিনি উৎসাহ-বারি সেচন দ্বারা বহু সাহিত্যানুরাগী কবির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি বহুবৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য গগনে প্রভাকরের ন্যায় অবস্থান করত কত তরুণ কবির ভাবরস আকর্ষণ করিয়া সহস্রধারায় তাহা বর্ষণ করিয়া বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্র অপূর্ব্ব রসধারায় সিঞ্চিত করিয়াছিলেন। প্রভাকরের উৎসাহ-কিরণ না পতিত হইলে নবীন কবিগণের প্রতিভা-পদ্ম অকালে অপ্রস্ফুটিত অবস্থাতেই শুকাইয়া যাইত কি না কে বলিতে পারে? দীনবন্ধু লিখিয়াছেন :—

ওই দেখ 'প্রভাকর' পত্র যন্ত্রালয়,
এক বিনা একেবারে অন্ধকার ময়,

কাশীপ্রসাদ ঘোষ
(মিস্ ড্রামণ্ড অঙ্কিত চিত্র হইতে)

মরেছে ঈশ্বর গুপ্ত রবি সম্পাদক,
লেখনীতে বিকাসিত কবিতা-চম্পক,
অনায়াসে বিরচিত সুধার পয়ার,
কবির দলের গীত বসন্ত বাহার,
সমাদর করিত কোরক কবিগণে,
সকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্ব্বজনে,
রসিকের শিরোমণি, কৌতুক-রতন
ভেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা-বরিষণ।

গুপ্ত কবি যে সকল কোরক কবিকে সমাদর করিতেন তন্মধ্যে রঙ্গলাল, 'সুধীরঞ্জন' প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন ও মনোমোহন বসু প্রধান। ইঁহাদের প্রায় সকলেরই রচনামধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব-চিহ্ন,—তাঁহার দোষ ও গুণ, পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, রঙ্গলালের রচনা মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। দীনবন্ধু ব্যতীত প্রায় সকলেই পরিণত বয়সে গুপ্ত কবি-প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্

পথে গমন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির বাল্য রচনার সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন গুপ্ত কবি তাঁহাদের উপর কোনও প্রভাবই সঞ্চারিত করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা ইঁহাদিগের রচনা পদ্ধতির ক্রমবিকাশ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে, ঈশ্বর গুপ্ত এককালে তাঁহার শিষ্যদিগের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, অনেক স্থলেই শব্দ কৌশলী ঈশ্বরচন্দ্রের "বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন

রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর

খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় 'কেলাকা ফুল' নাই।"

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর

এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় লেখকের রচনার অনুকরণ করা তরুণ কবিগণের পক্ষে স্বাভাবিক এবং প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু পর্য্যন্ত যাঁহার প্রভাবে এককালে প্রভাবিত ছিলেন, সাহিত্যের সেই একাধিপতির প্রভাব; তরুণ বয়সেই রঙ্গলাল কিরূপে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দীনবন্ধুর রচনা অনেক স্থলেই (তাঁহার গুরু গুপ্ত কবির ন্যায়) সুরুচি সঙ্গত নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোরের অনেক রচনাও অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট। কিন্তু রঙ্গলাল ইঁহাদিগের পূর্ব্বগামী এবং অপেক্ষাকৃত দূষিত সমাজে অবস্থান করিয়াও এমন একটি পংক্তিও

রচনা করেন নাই যাহার জন্য লজ্জিত হইতে হয়।

ইহার কারণ এই যে রঙ্গলালের কবি-জীবনের উপর ঈশ্বর গুপ্ত নহেন, অনেকেই তাঁহাদিগের কম্যাম প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রঙ্গলাল ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আশক্তি, সুতরাং নানা ভাষায় কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সংবরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতায় সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহু দিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্র পুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার

দীনবন্ধু মিত্র

পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি।" তাঁহার কবিতায় সেক্সপীয়র, বায়রণ, স্কট, মুর প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় কবিদিগের প্রভাব অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমচন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, ঈশ্বরচন্দ্র কখনও বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধিপতি হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও সাধক রামপ্রসাদের প্রভাব তখনও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, লোকান্তরপ্রস্থিত হইলেও তাঁহারাই অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারক অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের অনুকারকের সংখ্যাই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদের অনুকরণে ভক্তিগীতিও অনেকে রচনা করিয়াছিলেন। রঙ্গলালকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য না বলিয়া ভারতচন্দ্রের শিষ্য বলাই অধিকতর সঙ্গত। অবশ্য ইংরাজী কবিগণের প্রভাবে ভারতচন্দ্রের কুরুচি তিনি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ তখন বাঙ্গালী সমাজে কবিওয়ালাদিগের প্রভাব বড় সামান্য ছিল না। ইঁহারা প্রাণ দিয়া হৃদয়ের সত্য অনুভূতিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যাত্রা-গান-প্রিয় রঙ্গলালের উপর এই কবিওয়ালাদিগের প্রভাব অল্প ছিল না। গুপ্ত কবি কবিওয়ালাদিগের জীবনী ও পদাবলী সঙ্কলন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি স্বয়ং অনেক সুন্দর কবির গান রচনা করিয়াছিলেন। রঙ্গলালও অসংখ্য কবির গান রচনা করিয়াছিলেন এবং সে গানগুলি বহু সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাহার রচিত গীতগুলির অধিকাংশই এক্ষণে আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাঁহার কতকগুলি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রকাশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গীত রচনা শক্তির পরিচয় দিব।

রঙ্গলালের বাল্য রচনা।—রঙ্গলাল কিশোর বয়সে বাঙ্গালা সমাচার পত্র পুঞ্জে যে সকল কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারও অধিকাংশই কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নে স্বাক্ষর না থাকায় সেগুলি তাঁহার রচিত বলিয়া সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তবে ইংরাজী কবিতা হইতে অনূদিত অধিকাংশ পদ্যরচনা রচনাপদ্ধতিদৃষ্টে তাঁহারই রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ অনুমানের

আরও বিশেষ কারণ এই যে, 'প্রভাকরে'র নিয়মিত লেখকগণের মধ্যে রঙ্গলালই ইংরাজী কবিতার ভাবাকর্ষণ করিয়া বাঙ্গালা পদ্যরচনা আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডীয় কবিদিগের কবিতার অনুবাদ আজিকার ইংরাজী-শিক্ষিত পাঠকগণের নিকট হয়ত ভাল লাগিবে না বলিয়া আমরা 'Shair' ও 'গীতাবলী'র কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে প্রকাশিত একটি ইংরাজী কবিতার রঙ্গলালকৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বাল্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিব। অনুবাদটি ১২৫৪ সালে ১৫ই বৈশাখ তারিখের (ইং ২৭শে এপ্রেল, ১৮৪৭) 'প্রভাকরে' মুদ্রিত হইয়াছিল :—

রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

শুক্রতারা

একি হে প্রেয়সী বল, আকাশেতে সুনির্ম্মল,
তারা ওই চারু শোভা ধরে।
নিকর কিরণ ধর, বটে তার কলেবর,
কিন্তু নহে দীপ্ত প্রেমকরে॥
কেবল রূপেতে মন, গলেনাকো কদাচন,
সুখদ প্রণয়-রস্মি বিনে।
চক্ষুমাত্র দগ্ধ হয়, মন কিন্তু মুগ্ধ নয়,
হৃদয়ের বিনোদ বিপিনে॥
আছে অতি মনোহর, যুগল নক্ষত্রবর,
বিরাজিত বিমল কিরণে।
প্রোজ্জ্বল হীরকচয়, সরমে মলিন হয়,
খরতর কর দরশনে॥
শূন্যে নাহি শোভে তারা, তবে কোথা আছে তারা,
তুমি কি জান না সবিশেষ।
এই দেখ তারাদ্বয়, শোভা করে অতিশয়,
তব যুগ্ম নয়নের দেশ॥
সে নয়ন আকর্ষণে, টেনে আনে দেবগণে,
দেবলোক পরিক্রম করি।
মর্ত্ত্যে তারা এসে কয়, নয়ন মনোজালয়,
নন্দন কানন পরিহরি॥
স্বর্গের উজ্জ্বল তারা, আর নাহি স্মরে তারা,
ভুলে গেল কামিনী নয়নে।
শূন্যের তারকাচয়, সামান্য আলোক রয়,
নহে দীপ্ত প্রণয় কিরণে॥

রঙ্গলালের বাঙ্গালা ভাষার উপর এরূপ অসামান্য অধিকার ছিল যে ইংরাজী বা সংস্কৃত বা হিন্দী বা উৎকল দেশীয় ভাষা হইতে তিনি যে সকল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম হয়, অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না।

ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ কবি রঙ্গলালের অত্যন্ত গুণ-পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার রচনাগুলি সাদরে পত্রস্থ করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলালের রচনার কতদূর সমাদর করিতেন, তাহা ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহাতে তিনি 'প্রভাকরে'র অন্যান্য লেখকগণের নামোল্লেখ করিয়া রঙ্গলাল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইঁহার সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে

প্রসন্নসর্ব্বাধিকারী

গুপ্তকবির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রঙ্গলাল 'প্রভাকরে' 'সং- যোজিত' লেখক ছিলেন। তাঁহার কোনও কোনও রচনার নিম্নে তাঁহার নামের আদ্যক্ষর 'র,ল,ব' মুদ্রিত হইত। আমরা এইরূপ আদ্যক্ষর সম্বলিত একটি মধুর শান্তরসাশ্রিত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া 'প্রভাকরের' সহিত রঙ্গলালের সম্পর্কের প্রসঙ্গ শেষ করিব। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন উহাতে গুপ্তকবির কোনও প্রভাবই বর্ত্তমান নাই এবং কবিতাটি পাঠ করিলে মন কিরূপ পবিত্র শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়া যায়। যদিও কবিতাটি সংবাদ প্রভাকরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৩০ অক্টোবর তারিখে (বাং ১৫ই কার্ত্তিক ১২৬৩) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং রঙ্গলালের জীবনের যে সময়ের কথা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাইতেছে তাহার কিছু পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা হইতে 'প্রভাকরে' প্রকাশিত রঙ্গলালের কৈশোরের কবিতানিচয়ের বিশিষ্টতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, কারণ তাঁহার এই সময়ের সকল রচনাই এইরূপ লালিত্য ও সদ্ভাবে পরিপূর্ণ।

ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্টি হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইঁহার মানসরূপ নাট্য-শালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

উনবিংশ বর্ষীয় তরুণ কবির পক্ষে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হইতে এরূপ উচ্চপ্রশংসা লাভ তাঁহার অল্প গৌরবের পরিচায়ক নহে।

পরে রঙ্গলাল স্বয়ং অন্যান্য পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন, তথাপি গুপ্তকবির সহিত স্নেহসম্বন্ধ বশতঃ 'প্রভাকরে' রচনা প্রদান করিতে কখনও বিরত হন নাই।

রূপক

প্রভাত—

মৃণালাভা ম্লান হয়, হেরি দিবাকরোদয়,
নিশাকর চলে অস্তগিরি।
যামিনী হইল সারা, সমুদিত শুক-তারা,
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি॥
কিবা তরুলতাচয়, ঢলঢল রসময়,
নীহারের হার শোভে গায়।
ভানুসহ সমলতা, করি সরোরুহলতা,
অন্তরের অমল বিবায়॥

কুমুদ মুদিল আঁখি, জাগিল যতেক পাখী,
মুক্তকণ্ঠে আরম্ভিল গান।
মোহন মধুর স্বরে, শ্রবণ মোহিত করে,
সুশীতল করিল পরাণ॥

প্রকৃতির শোভাকর, বিমল অরুণ কর,
নিনাদ নীরদ করে শোভা।
কালিন্দী প্রবাহে যেন, কোকনদবৃন্দ হেন,
মধুকর মত্ত মনোলোভা॥

কাননে ডাকে পাপিয়া, করি পিয়া পিয়া পিয়া,
প্রিয়া প্রিয়গণেরে জাগায়।
বিধু আর নাহি রবে, নিধুবনে জাগে সবে,
অনুভব, এই রব গায়॥

সুষমার উষার কাল, বালরূপে ভানু ভাল,
সাজিয়াছে কোলেতে তাহার।
তাহে জ্যোতি দূতী হয়ে, সমাচার সঙ্গে লয়ে
ধরণীতে করিছে প্রচার॥

বিভা গতে বিভাবরী, শ্রীহরি স্মরণ করি,
চলেছেন অতি দ্রুতগতি।
বিকাশে কুসুম কলি, সৌরভ গৌরবে অলি,
মাতিয়াছে সচঞ্চল মতি॥

দিবাকর করে ভাতি, যেন প্রবালের পাঁতি;
বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে।
অথবা সুবর্ণশরে, যামিনীরে বিদ্ধ করে,
কার্য্যসিদ্ধ করণ আশয়ে॥

অরণ্যে অরুণ আস্য, দেখিয়া বিলাসে লাস্য
আমোদে মাতিল মৃগকুল।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, নাচিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
কত খায় তৃণাদির মূল॥

যামিনী দেখিয়া শেষ, বিবরে লুকায় শেষ'
আর চোর পেচক প্রভৃতি।
কুণ্ঠিত কুটিল জন, প্রফুল্ল সরল মন,
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি॥

শিশিরে করিয়া স্নান, শস্যক্ষেত্র হাস্যবান,
যেন তপ্ত কাঞ্চন কিরণ।
আসিয়া কৃষাণগণ, করে কত আয়োজন,
অঙ্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ॥

কেহ সেচে বারিধারা, কেহ রোপিতেছে চারা,
কেহ হল করিছে ধারণ।

ঈশ্বর গুপ্ত

গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত,
মাঠে মাঠে করে গোচারণ॥

ঝিল্লি হয়ে পরিশ্রান্ত, স্বীয় রব করে ক্ষান্ত,
শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে।
বকুল শাখায় বসি, অস্তাচলে হেরি শশী
পিকবর ললিত কুহরে॥

হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নিবিল বাতি,
সারারাত্রি ছিল দীপ্তিমান্।
যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে বিদায় মাগে,
অনুরাগে মোহিত পরাণ॥

নয়নে নয়নে বাঁধা, স্বতন্ত্র তনুর আধা,
পরস্পর করে হেন জ্ঞান।
কেমনে বিরহ সবে, আকুল দম্পতী সবে,
মনে তাই করয়ে ধ্যায়ান॥

হেরি প্রকাশিত দিন, সরোবরে যত মীন,
তরঙ্গে সুরঙ্গে কেলি করে।
মরাল করাল স্বরে, কিবা সন্তরণ করে,
হৃদয় প্রসন্ন ভাব ভরে॥

ডাহক ডাহুকী ডাকে, কুক্কুট কর্কশ হাঁকে,
মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ।
কিন্তু কি মধুর কাল, নীরস কর্কশ জাল,
কর্ণপুরে দেয় রসভোগ॥

হেরিয়া বালার্ক মুখ, অন্তর্দ্ধান হোলো দুখ,
সুখ আসি আবির্ভাব কত।
ব্রহ্ম আরাধনে রত, ব্রহ্ম উপাসক যত,
হেরি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত আগত॥

মোহন প্রণব শব্দ কান্তেরে করয়ে স্তব্ধ,
মানস ভাসায় ভক্তিরসে।
ধন্য ধন্য নিরঞ্জন, গর্ব্ব পর্ব্বত ভঞ্জন,
পৃথিবী পূরিল ভাববশে॥

র, ল, ব,

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

স্বর্গীয় রমণীমোহন ঘোষ

যৌবনে রমণীমোহন
(১৯০২ সালে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার বক্জুরী গ্রামে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ৺রমণীমোহন ঘোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺প্যারীমোহন ঘোষ কালেক্টরীর সেরেস্তাদার ছিলেন এবং ৩২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তখন রমণীমোহনের বয়স মাত্র দুই বৎসর। রমণীবাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ৺হরিমোহন ঘোষের দ্বারা প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ৺হরিমোহন ঘোষ পুলিশ বিভাগে ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিতেন। রমণী বাবু তাঁহাকে স্বীয় পিতা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

রমণী বাবু ডাক বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কিছু দিবস পূর্ব্বে তিনি ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হইয়া দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। গত ১লা ডিসেম্বর বেলা সাড়ে নয়টার সময় স্নান করিবার জন্য স্নানের ঘরে প্রবেশ করিবার পরই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা সকলেই নিকটে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কাহাকেও তিনি কোনো কথা বলিতে পারেন নাই বা বলেন নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাহারা বলেন যে, তাঁহার মুখের আকৃতি দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে তিনি বেশ তৃপ্তি ও শান্তির সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার আহারান্তে একটু বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলাম—বেশ একটু তন্দ্রাও আসিয়াছিল এমন সময় হঠাৎ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ঘরে ঢুকিয়া একখানি ইংরাজী দৈনিক আমার হাতে দিয়া বিস্ময় ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"দেখুন কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমাদের রমণী

বাবু জ্যেঠামহাশয় মারা গেছেন।"......রমণী বাবুকে চিরদিনই আমি জ্যেষ্ঠ সহোদরতুল্য জ্ঞান করিতাম বলিয়া আমার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তাঁহাকে জ্যেঠামহাশয় বলিয়াই ডাকিত। কথাটা শুনিবামাত্র নিদ্রা ত' সেই মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল-ই, উপরন্তু একটা দুর্ব্বিষহ বেদনায় আমার হৃৎপিণ্ডের দ্রুত কম্পন সুরু হইল। বোধ করি, আমার হৃৎপিণ্ডটা স্বভাবতঃ একটু দুর্ব্বল বলিয়াই ঐ আকস্মিক নিদারুণ সংবাদটা আমার পক্ষে ঐরূপ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উপরের বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও চোখের জলকে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিলাম না। জনৈক বন্ধু রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি একেবারে বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলাম। দুঃখে বেদনায় চেতনাহীনের মত পুনরায় শয্যাকেই আশ্রয় করিলাম। অতীতের সমস্ত স্মৃতি একটি একটি করিয়া মানস পটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

গত ইংরাজী ১৯০১ সালে রমণী বাবু বহরমপুর ডিভিসনের পোষ্ট আফিসের সুপারিন্টেনডেন্ট হইয়া আগমন করেন। কাব্য-ভূত তখন আমার স্কন্ধে বেশ ভাল করিয়াই চাপিয়া বসিয়াছে। কবিতা লেখার নেশায় সর্ব্বদাই মশগুল হইয়া থাকি বটে, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অভাবে লেখার মধ্যে তেমন প্রেরণা বা উৎসাহ পাই না। রমণী বাবু বহরমপুরে আসিয়াছেন শোনা অবধি তাঁহাকে একবার দেখিবার এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। তিনি সরকার বাহাদুরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। আমার ন্যায় সামান্য একজন কলেজের ছাত্র কেমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ করিবে? মনের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখি। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন তাহার নিকটস্থ বাড়ীর লোকদের কাছে রমণী বাবুর কথা শুনি, আর মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে।

প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও রমণী বাবুর সহিত পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। হঠাৎ একদিন (সেদিন রবিবার বলিয়াই মনে পড়ে) আমার বিশেষ পরিচিত জনৈক ভদ্রলোক আমার সন্ধানে আসিলেন। তার পর আমাকে নিকটে ডাকিয়া ঠিক এই কয়টি কথা বলিলেন—"তোমাদের রবি বাবুর একজন ভক্ত শিষ্য রমণীমোহন ঘোষ এখানে পোষ্ট অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এসেছেন। এখানকার কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন না। তিনি বলছেন যে এরকম নীরস গন্ডময় জায়গায় বেশিদিন থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আর কিছুদিন দেখে তিনি অন্যত্র যাবার চেষ্টা করবেন। তাঁর কথা শুনে হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ায়, তাঁকে চিন্তিত হতে মানা করলাম। বল্লাম, 'ব্যস্ত হবেন না, এখানে নিকটেই আপনার মতো একজন জ্যোৎস্না-পায়ী যুবক আছে।' সেকথা শুনে তিনি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে আমায় অনুরোধ করলেন। তুমি ভাই চল আমার সঙ্গে। লোকটি অতি বিনয়ী ও ভদ্র। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।"

অক্লেশেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত রমণী বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহার বাসা বেশী দূরে ছিল না। বন্ধুবরের সহিত রমণী বাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লোকটি বেশ সুপুরুষ। বয়স আন্দাজ ২৭।২৮ বৎসর। আদর করিয়া আমাকে কাছে বসাইয়া নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তার পর আমি গান গাহিতে পারি শুনিয়া তিনি খুব উৎসাহের সহিত আমায় কয়েকটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। দু'তিন খানি গান শুনিয়া আমায় খুব প্রশংসাও করিলেন। সেইদিন হইতে আমি শুধু রমণী বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, ঠিক যেন সহোদর ছোট ভাইটির মতই হইলাম। ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আহারাদির পরে প্রায় রাত্রিতে রমণী বাবুর বাড়ীতেই সময়টা অতিবাহিত হইত। তিনি তাহাতে বিশেষ সুখীই হইতেন।

আমার মাতৃদেবীকে তিনি মা বলিয়া ডাকিতেন, আমিও তাঁহার জননীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতাম। বৃথা বাজে গল্পে কোনদিনই আমরা সময় কাটাইতাম না। হয় সঙ্গীত, নয় ত কাব্য আলোচনা ও সমালোচনা হইত। এই সময় আমি "উষা" নামক এক কবিতা পুস্তক লিখিয়াছিলাম। যতদিন রমণী বাবু এখানে ছিলেন, সেই সময়টা আমার সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময়। কিছুদিন পরে বহরমপুর নদীয়া ডিভিসনের অন্তর্গত হওয়ায়, রমণী বাবু নদীয়া ডিভিসনের সুপারিন্টেণ্ডেট হন এবং তাঁহার অফিস রাণাঘাটে উঠিয়া যায়। সেখানেও প্রায় ছুটিতে আমি যাইতাম এবং রমণী বাবুও মধ্যে মধ্যে অফিস পরিদর্শন করিতে বহরমপুর আসিতেন। যখনই আসিতেন, আমাদের বাড়ী ভিন্ন অন্য কোথাও উঠিতেন না। কিন্তু এখানে তাঁহার এত বন্ধু হইয়াছিল যে, আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু আহারাদি প্রায়ই অন্যলোকের বাড়ীতে হইত। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আহারাদি না করার জন্য আমার জননী দুঃখিতা হইতেছেন বুঝিতে পারিলেই, তাঁহার নিকট হইতে কোন সময় ভাল মিষ্ট দ্রব্য অথবা সরবৎ চাহিয়া খাইতেন। রমণী বাবু কখনও কোনও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার মত সচ্চরিত্র লোক সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। রাণাঘাটে যাওয়ার কিছুদিন পরেই তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় তাহার মাতা জীবিতা ছিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর যখন সংসারে রমণী বাবুর বিরাগ দেখা যাইতে লাগিল এবং পুনর্ব্বার আর বিবাহ করিবেন না জিদ ধরিলেন, সেই সময় তাঁহার জ্যেঠামহাশয় রাণাঘাটে যাইবার জন্য আমাকে এক পত্র লিখিলেন। আমি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলে আমাকে তিনি সমস্ত কথা বলিলেন এবং রমণী বাবু যাহাতে পুনরায় বিবাহ করেন সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। কথাটা আমি রমণী বাবুর নিকট উত্থাপন করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারি নাই। কিছু দিন পরে তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পার্সন্যাল অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় বদলী হন, এবং পুনরায় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান হইয়াছে, সকলেই প্রায় না-বালক। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র শ্রীমান্ নলিনীমোহন ঘোষ, এম্-এ পাশ করিয়া ওকালতী পাশ করিয়াছে। কন্যা তিনটীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান্ নলিনীমোহন পিতার উপযুক্ত পুত্র। অতি বিনয়ী এবং শান্ত-শিষ্ট। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে দেখিতেছি। যখনই আমি রমণীবাবুর নিকট গিয়াছি, নলিনীর অমায়িক ব্যবহার ও আদর-যত্নে মুগ্ধ হইয়াছি। কাকাবাবু বলিতে বালক যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িত। ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, নলিনী যেন তাহার যশস্বী পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার মতই একজন গণ্য-মান্য সহৃদয় পুরুষ হয়।

রমণীবাবু সম্প্রতি ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইতে ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেলএর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইহার পরই তাঁহার বাঙলার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইবার আশা ছিল।

গত নবেম্বর মাসেও দিল্লী হইতে তাঁহার পত্র পাইয়াছিলাম। রমণীবাবু প্রতি পত্রেই আমাকে স্নেহাস্পদেষু বা স্নেহভাজনেষু প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া আজ মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছি। তিনি কলিকাতায় ভবানীপুরে জাষ্টিস্ রমেশচন্দ্র মিত্র রোডে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার পর, সেই বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত কিছুদিন বাস করিবার জন্য আমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার যাইবার সুবিধা হয় নাই।

অফিসের কায-কর্ম্ম রমণীবাবু খুব যত্নের সহিত করিতেন এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও অনুরাগ নিজের আত্মীয় স্বজনের মতই ছিল। সেজন্য সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি

করিত। সরকারী কার্য্য খুব যত্ন ও আগ্রহের সহিত করিতেন বলিয়া উপরস্থ কর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে খুব পছন্দ করিতেন। সেজন্য তাঁহার উন্নতিও হইয়াছিল খুব অল্প দিনের মধ্যেই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, রমণীবাবুর অকৃত্রিম বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ নলিনীমোহনকে পোষ্ট অফিসের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

রমণীবাবু একজন সুকবি ছিলেন। তিনি 'মুকুর,' ...রী', 'উর্ম্মিকা' ও 'দীপশিখা' এই চারিখানি সুন্দর উপভোগ্য কবিতা পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

তন্মধ্যে 'দীপশিখা' এখনও যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 'প্রবাসী', 'মানসী' এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকাতেই তিনি নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। তাঁহার একটা প্রধান গুণ ছিল যে, তাঁহার লেখার মধ্যে কোথাও এতটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা বা বে-পরওয়া ভাব প্রকাশ পায় নাই। তিনি কবিকুলশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব এবং মৌলিকতা-টুকু হারান নাই। নিজে নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার কবিতাতেও কোন দিন স্বেচ্ছাচারিতা বা প্রেমের মাতলামি দৃষ্টিগোচর হইত না। যে কয়টী প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা অতীব নির্ম্মল ও পবিত্র। আমার 'উষা' বইখানি রমণী বাবুর নামেই আমি উৎসর্গ করিয়াছিলাম। পুস্তক প্রকাশের পর উহা প্রাপ্ত হইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"উৎসর্গ পত্রে ছাপার হরফে আমার নাম দেখিয়া লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু আপনার স্নেহ-ভালবাসা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

আজ আর রমণীবাবু এ জগতে নাই। এ জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতেও পাইব না। আমার প্রতি তাঁহার নিবিড় অনুরাগ, অফুরন্ত স্নেহ ও ভালবাসার কথা এ জীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না। ভগবান তাঁহাকে তাঁহার শান্তিময় সুপবিত্র ক্রোড়ে স্থান দিন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি দান করুন। ওঁ শান্তিঃ!

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলরাম চূড়া

করপুটে মুঠো মুঠো এনেছ আবীর,
　সবুজের মোড়কে মুড়িয়া,
কার তরে পথ চেয়ে বসেছিলে বীর?
　একেবারে দিয়েছ ছুঁড়িয়া—
　সারা পথ হল লালে লাল
সবুজ পলায়ে গেছে ছেড়ে দিয়ে হাল!

চৈত্র এল শেষ হয়ে, শিবের গাজন
　　চারিদিকে ঢাকে পড়ে কাঠী,
ওগো ক্ষেপা তোমার কি নাহিক ওজন?
　কাল ঝড়ে ওড়ে ধূলা মাটী!
　গেলনাক খেলার খেয়াল,
মনে জ্বলে বাসনার রঙীন মশাল।

আকাশেতে মেঘ নাই, কাঠ ফাটা রোদ,
　ধূর্জ্জটির জটাজাল জ্বলে,
তৃতীয় নেত্রের বহ্নি কেবা করে রোধ?
　গঙ্গাধারা নাহিক উচ্ছলে!
যুগান্তের জাগে মহাকাল,
　সিন্ধুবক্ষে উচ্ছুসিছে তরঙ্গ বিশাল!

গেল মাধবের দিন, সাঙ্গ ফুলদোল,
　কোথায় মলয় সমীরণ?
ধমনীতে বিপরীত রক্তের কল্লোল,
　জাগরূক প্রচণ্ড মরণ!
শুকায়েছে মালতী বিতান
থেমে আসে কোকিলের কাকলির তান!

অবেলার খেলা এই, রংএর প্রলাপ ;
নন্দীর ইঙ্গিত অবহেলা,
অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিবে রতির বিলাপ,
চিতা ভস্মে ছেয়ে যাবে মেলা !
বনভূমি জাগে ত্রস্ত হিয়া,
রুদ্ধশ্বাসে পথ কার রয়েছে চাহিয়া।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

চব্বিশ পরগণার কাহিনী

(২৪ পরগণা সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ)

নীলসমুদ্রের তরঙ্গরাশি অপসারিত করিয়া, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি যখন উত্থিত হইলেন, তখন তিনি যেস্থানে আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের চব্বিশ পরগণা। এইখানেই তাঁহার বাহন সুচিত্রিত রাজব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে পদন্যাস করিয়া, মা আমাদের সুবর্ণকিরীট কাঞ্চন-শৃঙ্গে ভূষিত হইয়া, জগতের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাই যে স্থান তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া, অযুত কুসুম ফুটাইয়া দিয়াছিল, আমরা তাহার অধিবাসী বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি। আর আমরাই যে বঙ্গমাতার চরণসেবার অধিকারী, আমাদের বাসভূমি তাহাই বলিয়া দিতেছে। তাই আসুন, আমরা আমাদের সেই শ্যামা মার শ্রীচরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তির কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়া, আমাদের চব্বিশ পরগণার বিচিত্র কাহিনী বলিতে আরম্ভ করি।

ভাগীরথী, যমুনা, ইচ্ছামতী ও বিদ্যাধরীর সলিল-বিধৌত সমুদ্র-ক্ষালিত চব্বিশ পরগণা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও শস্যসম্ভারে যে অতুলনীয়, সে কথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতা মহানগরীকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া, বাণিজ্যে, ব্যবসায়ে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় চব্বিশ পরগণা যে বাঙ্গলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার রহিয়াছে, তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে ইহার গৌরব যেমন চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, অতীত কালেও চব্বিশ পরগণা সেইরূপই গৌরব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার অতীত কাহিনী মনে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, এবং বিস্ময়ে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, সেই অতীত কাহিনী এক্ষণে একরূপ বিস্মৃতির অন্ধ-তমো-গহ্বরে চিরলুক্কায়িত রহিয়াছে। চব্বিশ পরগণা সাহিত্য-সম্মিলন যদি অতীতের সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে বলিয়া মনে হয়। আশা করি, চব্বিশ পরগণা সাহিত্য-সম্মিলন এবিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

আমাদের এই চব্বিশ পরগণা প্রাচীন কালে কোথায় অবস্থিত ছিল, সেই কথাই এক্ষণে বলিতেছি। বঙ্গভূমি ধীরে ধীরে অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। বৈদিক যুগে বা রামায়ণের সময় তাঁহার সম্পূর্ণ উত্থান ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লোকচক্ষুর গোচরে আসে নাই। তাই তখন আমাদের চব্বিশ পরগণার প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মহাভারতে পাণ্ডবগণের গঙ্গাসাগরসঙ্গমে পঞ্চশত নদীতে অবগাহন করিয়া, সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-গমনের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, তখন চব্বিশ পরগণার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তাহা সলিলপ্লাবিত হইয়া, ধীরে ধীরে আপনার অস্তিত্ব জানাইয়া দিতেছিল। এই গঙ্গাসাগরসঙ্গম হিন্দুর মহাতীর্থ, পুরাণতন্ত্রাদিতে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে এই স্থানকে এক বিস্তৃত জনপদ বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। কালীঘাটাদি পীঠস্থানের উল্লেখেও তন্ত্র হইতে চব্বিশ পরগণার পরিচয় জানিতে পারি। মহাভারতের সময় হইতে যদি চব্বিশ পরগণার অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সুহ্ম ও কলিঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহাই মনে হইয়া থাকে। বৌদ্ধযুগে বঙ্গ যখন সমতট নাম ধারণ করিয়াছিল, তখন অবশ্য চব্বিশ পরগণা সমতটের মধ্যেই অবস্থিত হইয়াছিল। কালিদাসের রঘু বঙ্গদিগকে উৎখাত করিয়া, গঙ্গাস্রোতের মধ্যে যে স্থানে জয়স্তম্ভ নিখাত করিয়াছিলেন, সেই বদ্বীপ যে চব্বিশ পরগণাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, ইহাই অনুমান হইয়া থাকে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ও কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে এই বদ্বীপকে উপবঙ্গ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বঙ্গ হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া বলায়, চব্বিশ পরগণাকে উপবঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত বলিতে হয়। এই উপবঙ্গকে ব্যাঘ্র বা বগড়ীও বলা হইয়া থাকে। মুসলমান আমলে এই প্রদেশ সাধারণতঃ ভাটী নামেই অভিহিত হইত। টোডরমল্ল যখন বাঙ্গলা দেশকে ১৯ সরকারে বিভাগ করিয়াছিলেন, তখন চব্বিশ পরগণা সরকার সাতগাঁয়ের মধ্যেই পড়িয়াছিল। আইন-আকবরী হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। তখন সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম বিভাগের শিল্প, সভ্যতা, বাণিজ্য প্রভৃতি সমগ্র বঙ্গদেশেই সুবিখ্যাত ছিল। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সরকার মামুদাবাদ বা ভূষণা সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করায়, সাতগাঁয়ের সহিত তাহার তুলনা হইত না বলিয়া, "সাতগেঁয়ের নিকট মামদোবাজী" বলিয়া একটা প্রবাদ-বাক্য এদেশে এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ যখন বাঙ্গলা দেশকে বৃহত্তর ভাবে ১৩ চাকলায় বিভক্ত করেন, তখন চব্বিশপরগণা সাতগাঁ বা হুগলী চাকলার অন্তর্গত হইয়াছিল।

তাহার পর ব্রিটিশ আমলের কথা। এই ব্রিটিশ আমলেই চব্বিশ পরগণা নামের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এক্ষণে সেই কথাই বলিব। পলাশীর বিশাল প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার বাতাসে যখন কোম্পানীর বিজয়-নিশান গর্ব্বভরে উড়িতে আরম্ভ করিল, তখন তাহা বাঙ্গলায় মুসলমান-রাজত্বের অবসান জানাইয়া দিল। ইংরেজের কৃপাভিখারী নবাব মীরজাফর খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কোম্পানীর ক্রীড়া-পুত্তলরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতেই হইবে। ইংরেজ কোম্পানী বাদশাহ দরবার হইতে বাঙ্গলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার আদেশ পাইলেও মোগলকর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহাদের বিবাদে তাঁহাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী পরিত্যাগ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এবং তাহার সহিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক লইয়া, কোম্পানীর যে কলিকাতা জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছিল, নবাব মীর জাফর খাঁর নিকট হইতে তাহাই বর্দ্ধিত আকারে চব্বিশপরগণা হইয়া উঠে। সেই কলিকাতা জমিদারী ২৪টি পরগণার সমষ্টি হওয়ায়, তাহা চব্বিশ পরগণা জমিদারী নামেও অভিহিত হয়। আমরা নিম্নে সেই ২৪টি পরগণার নাম উল্লেখ করিতেছি। (১) আকবরপুর, (২) আমীরপুর, (৩) আজিমাবাদ, (৪) বেলিয়া, (৫) বারিদহাটি, (৬) বসন্ধারী, (৭) কলিকাতা, (৮) দক্ষিণসাগর, (৯) গড়, (১০) হাতিয়াগড়, (১১) ইক্তিয়ারপুর, (১২) খড়িজুড়ী, (১৩) খাসপুর, (১৪) মেদনমল্ল, (১৫) মাগুরা, (১৬) মানপুর, (১৭) ময়দা, (১৮) মুড়াগাছা, (১৯) পৈকান, (২০) পেচকুলি, (২১) সতল, (২২) শানগর, (২৩) শাপুর, (২৪) উত্তর পরগণা। এই চব্বিশপরগণা জমিদারী আবার ক্লাইবকে জায়গীর প্রদান করা হইয়াছিল, কাযেই ক্লাইবই ইহার রাজস্বের অধিকারী হন। অবশেষে কোম্পানী ও ক্লাইবের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হইয়া, ক্লাইবের দশবৎসর জায়গীরভোগের পর উহা চিরস্থায়ীরূপে কোম্পানীর অধিকারে আইসে। ইহাই চব্বিশ পরগণার উৎপত্তির ইতিহাস। কালে কলিকাতা নগরীকে চব্বিশ পরগণা হইতে পৃথক্ করিয়া, স্বতন্ত্র শাসনপদ্ধতির অধীন করা হয়। মূল চব্বিশ পরগণাকে লইয়া বৃহদাকারে বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলা গঠিত

হইয়াছে। চব্বিশ পরগণা জেলাকে এককালে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া, বারাসতকে একটি স্বতন্ত্র জেলা করা হইয়াছিল। এক্ষণে বারাসত মূল চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা। বারাসত ভিন্ন সদর আলিপুর, বারাকপুর, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও শিয়ালদহ এই কয়টি মহকুমা চব্বিশ পরগণা জেলায় অবস্থিত। তদ্ভিন্ন বারুইপুর ইহার একটি চৌকী। আলিপুর এই জেলার প্রধান স্থান বা সদর। আলিপুরের সহিত প্রথম কোম্পানীর রাজত্বের অনেক সম্বন্ধ আছে। সিরাজউদ্দৌলার প্রদত্ত কলিকাতার আলিনগর নামের সহিত আলিপুরের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনেক স্মৃতি ইহার সহিত বিজড়িত। চব্বিশ পরগণা জেলা প্রেসিডেন্সী বিভাগেরই অন্তর্গত।

আমরা চব্বিশ পরগণার প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থার উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে সংক্ষেপে ইহার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিতেছি। সংস্কৃত গ্রন্থে চব্বিশ পরগণার উল্লেখের কথা আমরা বলিয়াছি। আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও চব্বিশপরগণার উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি বিপ্রদাসের রচিত মনসার ভাসানে চিৎপুর, কলিকাতা ও কালীঘাটের উল্লেখ দেখা যায়। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভাগীরথীর কূলে কূলে চব্বিশ পরগণায় আসিয়া, তখনকার অন্যতম প্রধান তীর্থ ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ নামে শিব দর্শন করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও এই ছত্রভোগের কথা আছে। তদ্ভিন্ন হাতিয়াগড়, সাগর, সঙ্গম প্রভৃতিও উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন চণ্ডীর পুঁথিতে কলিকাতা, কালীঘাটেরও উল্লেখ দেখা যায়। মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে যে চব্বিশ পরগণা ধন্য হইয়াছিল, তাহাতেই আবার নিত্যানন্দ ও তাঁহার তনয় বীরভদ্র বাস করিয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাই খড়দহ যে বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান, তাহা অবশ্য সকলেই অবগত আছেন। আবার সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ ও পরমহংসদেব রামকৃষ্ণও চব্বিশ পরগণাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন।

এইবার চব্বিশ পরগণার দুই একটি ঐতিহাসিক কথা বলিব। চব্বিশ পরগণার ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে হইলে, প্রথমে রাজা চন্দ্রকেতু ও পীর গোরাচাঁদের সংঘর্ষের কথা মনে পড়ে। কিরূপে পীর গোরাচাঁদ চন্দ্রকেতুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায়, গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন ও বালণ্ডার শাসনকর্ত্তা পীরশার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং চন্দ্রকেতু ও তাঁহার পরিবারবর্গের কিরূপ পরিণাম হইয়াছিল, তাহা এদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। দেউলিয়া ও হাড়োয়ার সহিত চন্দ্রকেতু ও গোরাচাঁদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা সেই সেই স্থান হইতে এখনও অবগত হওয়া যায়। এই বাদশাহ আলাউদ্দীন গৌড়ের শাসনকর্ত্তা প্রথম আলাউদ্দীন কি আলাউদ্দীন-হোসেনশাহ, তাহা স্থির করা আবশ্যক। তাহার পর অবশ্য প্রতাপাদিত্যের কথাই বলিতে হয়। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর ও ধূমঘাট এক্ষণে খুলনা জেলার মধ্যে পড়িলেও, এককালে চব্বিশ পরগণার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যতর রাজধানী সাগরদ্বীপ এক্ষণে চব্বিশ পরগণার মধ্যেই রহিয়াছে। এই সাগরদ্বীপকে ইউরোপীয়গণ চ্যাণ্ডিভান নামে অভিহিত করিতেন। কেহ কেহ ধুমঘাটকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বহু প্রমাণের দ্বারা সাগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান বলিয়া স্থির হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন চব্বিশ পরগণা যে প্রতাপের সমরাভিনয়ের প্রধান রঙ্গভূমি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা মানসিংহ প্রতাপের বিরুদ্ধে যে স্থলযুদ্ধের অভিযান করিয়াছিলেন, এই চব্বিশ পরগণার মধ্যেই গৌড়বঙ্গের রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন। তাহার পর ইস্লাম খাঁ চিস্তির সময় ইনায়েৎ খাঁ ও মির্জ্জা নহনের সৈন্যের সহিত প্রতাপের যে জলযুদ্ধ হয়, তাহা চব্বিশপরগণার ইচ্ছামতীর-বক্ষেই সংঘটিত হইয়াছিল। অবশ্য তাহা প্রতাপের রাজধানী পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং প্রতাপ তাহাতে মোগলসৈন্যের

হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। ইস্‌লাম খাঁর সময় প্রতাপ যে বন্দী হইয়াছিলেন, এ কথা প্রথমে প্রতাপাদিত্য-চরিতকার রামরাম বসু উল্লেখ করেন। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় মূল ফারসী গ্রন্থ হইতে তাহা আবিষ্কার করায়, প্রতাপের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের অবতারণা হইয়াছে। মগফিরিঙ্গীর অত্যাচারও চব্বিশ পরগণার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহাদের অত্যাচারে সুন্দরবন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়-গণের বাণিজ্যবিস্তারও চব্বিশ পরগণার ইতিহাসের সহিত বিশেষ ভাবেই সম্বন্ধ আছে। এ সকল ভিন্ন তিতুমীরের হাঙ্গামা প্রভৃতি ইহার আরও দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও বলা যাইতে পারে। কিরূপে নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া, তিতুমীর কোম্পানীর 'গোলা খা ডালা' করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহার পর যে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুনে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এই চব্বিশ পরগণাতেই তাহার সূত্রপাত হয়। প্রথমে দমদমায় টোটা কাটার কথা প্রচারিত হওয়ায়, বারাকপুরের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং মঙ্গল পাঁড়ে প্রথমে বিদ্রোহের সূচনা করে। সুতরাং চব্বিশ পরগণায় যে সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য সকলে বুঝিতে পারিতেছেন।

ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখের পর চব্বিশ পরগণায় যে সকল পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলিবার অভিপ্রায় করিতেছি। চব্বিশ পরগণায় বহুদিন হইতেই সংস্কৃতচর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। যে নব্য ন্যায়ে বঙ্গদেশকে জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে, চব্বিশ পরগণায় তাহার আলোচনা হইত এবং এক্ষণেও হইতেছে।
যুগের যে চারি জন নৈয়ায়িকের নিকট বাগ্‌দেবীও পরাভূতা হইতেন—

"শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্করঃ।
চত্বারো যত্র বিত্তন্তে তত্র বাণী পরাভূতা॥"

তাঁহাদের দুই জনই চব্বিশ পরগণার অধিবাসী। কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার বসিরহাট—পুঁড়ায় ও বলরাম তর্কভূষণ হালিসহর—কুমারহট্টে বাস করিতেন। এখনও ভাটপাড়া নবদ্বীপের ন্যায়ই সমাদৃত। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি তাহার গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবি কৃষ্ণরাম ও দ্বিতীয় কবি রামপ্রসাদ উভয়েই চব্বিশ-পরগণার লোক। বাঙ্গলার প্রথম গদ্যপুস্তক প্রতাপাদিত্য চরিতের গ্রন্থকার রামরাম বসুর সহিতও চব্বিশ পরগণার সম্বন্ধ ছিল। স্বভাবকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত চব্বিশ পরগণাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে চব্বিশপরগণাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। যে 'বন্দে-মাতরম্' মহামন্ত্রে আসমুদ্রহিমাচল প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে, এই চব্বিশ পরগণাতেই তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল। কবিবর হেমচন্দ্র, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ এবং নটরাজ সুরসিক অমৃতলালের সহিতও চব্বিশ পরগণার সম্বন্ধ আছে। বাগ্মীবর কেশবচন্দ্র, বক্তা সুরেন্দ্রনাথ ইঁহারাও চব্বিশ পরগণাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। মনীষী স্যার রমেশচন্দ্র, বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষ, এমন কি, ত্যাগবীর চিত্তরঞ্জনের সহিত যে চব্বিশপরগণার সম্বন্ধ ছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে। ডাক্তার জগবন্ধু ও স্যার নীলরতনের নামও আমরা উল্লেখ করিতে পারি। মৌলানা আক্‌রাম খাঁ, মৌলবী মজীবর রহমন্, নানাভাষাবিদ্ মৌলবী মহম্মদ শহীদউল্লাহ প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। তদ্ভিন্ন মুন্সী কালীনাথের ন্যায় মহাপ্রাণও এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত বংশও চব্বিশপরগণাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। আধুনিক কত কবি, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, দেশানুরাগী যে চব্বিশপরগণার গৌরব রক্ষা করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফলতঃ কি প্রাচীন তথ্যে, কি ঐতিহাসিক ঘটনায়, কি সাহিত্য ও কাব্যসম্ভারে সকল বিষয়েই যে আমাদের চব্বিশ পরগণা গৌরবান্বিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যদি চব্বিশ পরগণার পুরাতন ও নূতন গৌরবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহা

হইলে আপনারা যে ধন্য হইবা উঠিব, তাহা সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে। আপনার মাতৃভূমির গৌরবে কে না ধন্য হয় ?

চব্বিশ পরগণার গৌরবের পরিচয় দিতে হইলে স্থান ও সময়ের আবশ্যক। আমি সংক্ষেপে আপনাদের নিকট তাহার ইঙ্গিতমাত্র করিলাম। ইহার এক এক দিক্ দিয়া গৌরবের আলোচনা করিতে গেলে, বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থের অবতারণা করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, চব্বিশ পরগণা সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে কোনই আলোচনা হয় নাই। ইহার ঐতিহাসিক তথ্য, সাহিত্য ও কবিতার অনুসন্ধান, সংস্কৃত-চর্চ্চার আলোচনা, শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণ, সমাজ-গঠনের ইতিহাস, হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ এ সকল কোন বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনা আজিও পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। অথচ চব্বিশ পরগণা এ সকল বিষয়ে কিরূপ সমৃদ্ধ, তাহার দুই একটী কথা আপনাদিগকে জানাইয়াছি। আপনার মাতৃভূমির গৌরবের কথা প্রত্যেকেরই সুস্পষ্টরূপে জানা কর্ত্তব্য। যে আপনার মাতৃভূমির গৌরব করিতে না জানে, তাহাকে কখনও মনুষ্যনামে অভিহিত করা যায় না। সেই গৌরবের অনুভব করিতে হইলে, তাহার গৌরব-কাহিনীও জানিতে হয়। বঙ্গভূমি আমাদের সকলেরই মাতৃভূমি হইলেও, নিজের জন্মভূমিকে তাঁহারই সহিত অভিন্ন মনে করিতে হয়। তাই আমাদের চব্বিশ-পরগণার গৌরব বিস্তার করা আমাদের কর্ত্তব্য। এই সাহিত্য-সম্মিলন হইতে যদি তাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ইহার যথার্থ সার্থকতা হইবে বলিয়া মনে করি।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

রিক্স ওয়ালা

(সত্যঘটনা মূলক)

বাদল বাতাস হু-হু করে, আর ঝর ঝর ঝরে জল—
নৈশ আঁধার ঘেরে চারিধার, পথটি জন-বিরল !
গাছের তলায় 'ফুটপাথে' পড়ে' বছর দশের ছেলে
শুয়ে শুয়ে ভিজে, ভিক্ষা মাগিছে শীর্ণ দু'হাত মেলে।
অনাহার-ক্ষীণ, শকতি-বিহীন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয়—
"বড় খিদে, কেউ একটি পয়সা দাও যদি দয়া হয় !"
কে শোনে সে কথা, হুহু-করি' বায়ু উপহাসি' চলে ছুটে,
ভিখারী বালক ভিজা কাঁথাখানি জড়ায়ে কাঁপিয়া উঠে !
একটি পয়সা দিতে যাব বলে' গিয়েছি তাহার কাছে,
সওয়ারী সমেত 'রিক্স' কখন দেখি সেথা থামিয়াছে।
কিছুদূর হতে দাঁড়ায়ে দেখিনু, হাতল নামায়ে রেখে
রিক্স-ওয়ালাটি কি যেন বাহির করিল 'গেঁজিয়া' থেকে ;
চুপি চুপি সেটি দিয়ে তা'র হাতে আবার হাতল ধরি'
রিক্স টানিয়া চলিতে লাগিল 'ঠুঙ্ুর' 'ঠুঙ্ুর' করি'।
সওয়ারী তাহার বিরক্তি-ভরে কহিল, "চালাও জোর"—
মোর মাথা মন নত হয়ে গেল, নয়নে ভরিল লোর।

শ্রীরামেন্দু দত্ত।
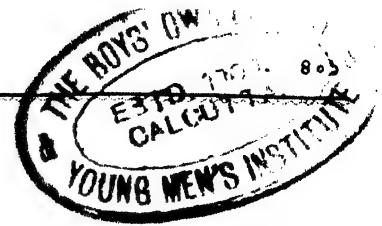
উত্তরাখণ্ডের পত্র

শ্রীমান্ অশোকনাথ কল্যাণীয়েষু—

মসুরীতে আমরা বেশি দিন থাকিনি, এসেছিও মোটে জন ছয়েক মাত্র। ওরা সবাই আগেও এসেছিল, সেজন্য দেখবার আগ্রহ নেই, এর পর দেরাদুনে গরম পড়লে দিনকতক এখানে এসে থাকবে এই রকম ইচ্ছাও আছে। আমি সে পর্য্যন্ত থাকবো না, তাই একটু বেড়িয়ে যাব বলে এসেছি।

দেরাদুন থেকে রাজপুর রোড দিয়ে মোটরে বা টোঙ্গায় মসুরী পাহাড়ের তলায় রাজপুরে যেতে হয়। এই পথটা প্রায় মাইল সাতেক হবে। রাজপুর থেকেই মসুরী পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ। আট মাইল চড়াই উঠে তবে মসুরীতে পৌছানো যায়। রাজপুর রোড রাস্তায় এর আগেও মধ্যে মধ্যে আমরা বেড়াতে এসেছি। রাস্তাটী বেশ চওড়া, দু'ধারে সমানেই প্রায় বড় বড় বাগান, আর তার ভিতরে ভিতরে বাংলো ফ্যাশনের বাড়ী। এর বেশীর ভাগই সাহেবদের। তবে দেশী লোকের বাড়ী যে এর মধ্যে একেবারেই নেই, এমন কথা বলি না। দু' একখানায় আমরাই বেড়াতে গেছি। তার মধ্যে একটী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন এর। রাস্তাটার দু'ধারেই প্রায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইউক্যালিপ্‌টস গাছ—যেন এ রাস্তার প্রহরীর

সার্কুলার রোড হইতে মসুরির দৃশ্য

মসুরির পূর্ব্বাংশ

মসুরি

প্রাচীরের মত শোভা পাচ্চে। দেশটি যেন একটি সুরক্ষিত দুর্গ।

রাজপুরে কতকগুলি হোটেল আছে। সেই সব হোটেলে মসুরী যাত্রীরা ইচ্ছা হলে আহার ও বিশ্রামলাভও করতে পারেন, আর সেখান থেকেই মসুরী যাবার ডাণ্ডি কুলি প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত করা যায়। আমরা পাঁচ খানা ডাণ্ডি নিলুম। পশুপতি ঘোড়ায় চড়ে চল্লো। এদের 'ক্যালিডোনিয়া' 'ইম্পিরিয়াল' আরও ক'টার কি নাম ভুলে গেছি। আমরা অবশ্য বুঝতেই পারবে হোটেলের যাত্রী নই।

পাহাড়ে ওঠবার ঐ দুই ব্যবস্থাই আছে—ডাণ্ডি এবং ঘোড়া। ঢের লোকে হেঁটেও উঠচে—বিশেষতঃ সাহেব এবং মেমেরা। ওদের শরীরে বল, মনে স্ফূর্ত্তি দুইই যথেষ্ট। কাযেই ওদের কাছে এই ৮ মাইলের চড়াই আর কতটুকু? তবে আমাদের মতন অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালীর মেয়েদের পক্ষে ঐ চড়াই ওঠা বড় সহজ

মতন আকাশের দিকে সগর্ব্বে মাথা খাড়া করে পাহারা দিচ্চে। জায়গা জায়গায় ঝাউ, দেবদারু, সেই রকম অস্বাভাবিক মোটাসোটা বাঁশের ঝাড় এবং পাকা লুকাটে ভরা লুকাট গাছ যথেষ্ট পরিমাণে রয়েচে। লালফুলে ভরা এক রকমের গাছ দু'একটা দেখতে পাওয়া গেল, তার ফুলগুলো একহারা জবা অথবা হেলিওক্ ফুলের ধরণেরই, কিন্তু এক সঙ্গে একটা মস্ত থোকা করার মতন হয়ে ফুটে আছে। তার প্রত্যেক গুচ্ছে ষোল সতেরটা করে ফুল। যেখানে আছে যেন পথ আলো করে আছে। নাম কি জানি না। 'পথের আলো' নাম দেওয়া উচিত।

রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা এই রাজপুর রোডের ধারে রয়েচে দেখতে পেলুম। দুটি মন্দির দেখা গেল। চারিদিকের উচ্চ পর্ব্বতরাজি তরঙ্গায়িত সুদৃঢ় দুর্গ

মসুরি

মসুরি নগরের "ম্যাল" নামক রাজপথ

নয়! তোমাদের মাস্তুদিদি নামবার দিন বাহাদুরী করে' হেঁটে নেমেছিল বটে, কিন্তু সে নেমে যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে নামার গৌরব আর বজায় থাকে নি। ডাণ্ডিওয়ালা কুলিগুলো তেমন লোক ভাল না। দুবার আমায় নামিয়ে রেখে ছুটো কুলী পালিয়ে গেল, শেষ কালে সেজদা এজেণ্টকে ডাকিয়ে খুব রাগ করতে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এজেণ্টের লোক সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল। পথে আর কেউ কোন অসুবিধেয় ফেলেনি। মধ্যে মধ্যে ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে নামিয়ে তামাক না খেলে ওরা পারে না, আর তা' পারবেই বা কি করে? একে চড়াই ওঠা, তাও এই ভারি বোঝা ঘাড়ে, তার উপর সের দশেকের কাছাকাছি গরম কাপড় জড়ানো এবং এর উপরে ডাণ্ডিখানারও ভার বড় কম হবে না। পলকা কাঠের হালকা জিনিস না, বেশ মজবুত ও ভারীভুরি। শিশু কাঠের বা সেগুন কাঠের একখানা ইজি চেয়ারের মত ভার হইবে।

মসুরী পাহাড়ে উঠতে হলে প্রত্যেক লোককে ।।৹ হিসাবে 'টোল' দিতে হয়। নামবার সময় হয় না। কিন্তু যদি নীচে থেকে ডাণ্ডি আনানো হয়, তা হলে ফের আর একটা 'টোল' লাগে; কিন্তু উপরে যদি ফিরতি ডাণ্ডি পাওয়া যায়, তা হলে ওটা আর লাগে না। আমরা অবশ্য অত জানতুম না, তাই নীচে থেকে ডাণ্ডি আনার ব্যবস্থাই করে-

'হাফওয়ে হাউস' নাম দিয়ে অর্দ্ধপথে বিশ্রামের জন্যে একটা ছোট হোটেলগোছ আছে। কুলিরা সেইখানে জল-খাবারের পয়সা চেয়ে তারই ব্যবস্থায় আমাদের ডাণ্ডি নামিয়ে দিলে। সেজদা নিজে লেমনেড না কি খেয়ে আমাদেরও অনুরোধ করলেন। পথে ঘাটে ছত্রিশ জাতের ছোঁওয়া ও খাওয়া জিনিষে খাওয়া দাওয়া আমার

মসুরি
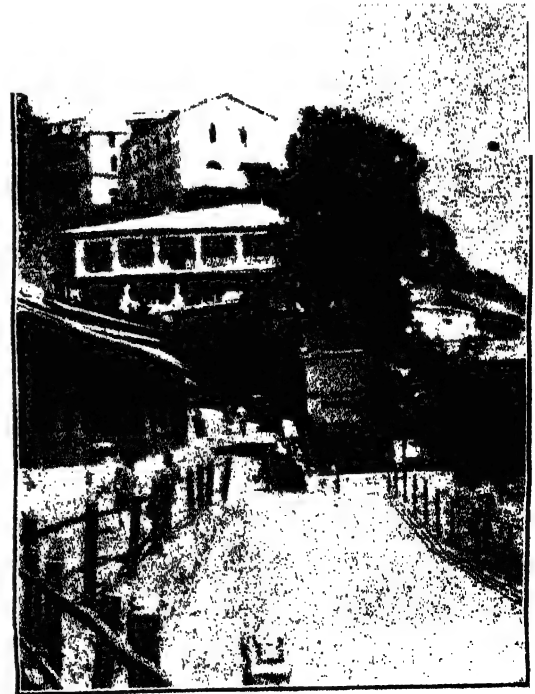
মসুরির চলচ্চিত্র গৃহ

তো কোনদিনই চলে না, কাযেই আমাদের সঙ্গে যা ছিল, আমাদের তাইতেই চলে গেল।

মসুরীর এই রাস্তাটা বেশ চওড়া, ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে যতটা সম্ভব খাড়া চড়াইকে সহজ করতে চেষ্টা করাও হয়েচে, কিন্তু ফলে খুব বেশী এগোয়নি। এই পাহাড়টার খাড়াই দারজিলিং প্রভৃতির চাইতে নাকি বেশী। এতে ট্রামের রাস্তা দু'বার করা হয়েছিল, শেষ চেষ্টার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম এখনও এর গায়ের উপর জড়ো হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। মোটর খানিক দূর পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারে, কিন্তু সবটা পারে না। আর যতটা পারে, সেও এ রাস্তায় নয়, সেটা আর একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছিল, কেন হয়নি জানি না। তবে চেষ্টার যে ত্রুটি হচ্চে না, তা' বলাই বাহুল্য। কেননা প্রত্যেক ছিল ষ্টেশনেই দেশী লোকের চেয়ে সাহেব লোকেরই আধিপত্য এবং প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি। তাঁদের সুবিধার জন্তে ভারতের রত্নাকর সর্ব্বদাই তার আকর খালি করে রত্ন জোগাতে প্রস্তুত।

নেপালরাজের এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ পথে থেকে দেখতে পেলুম। মস্ত বড় বাড়ী, পাহাড়ের গায়ে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। মিশনরীদের স্কুলটাও কিছু কম বড় নয়। সেদিন শনিবার, ওদের সকাল সকাল স্কুল বন্ধ হয়েচে। দলে দলে ইউরোপীয় এবং ইউরেশিয় ছেলেরা উপরে নীচে নামা ওঠা করচে। স্বাস্থ্যের আভায় গালগুলোয় তাদের যেন আপেল পেকে আছে, ডালিম ফেটে পড়চে।

তোমায় বারে বারেই মনে পড়ছিল। তুমিও হয়ত এই সময়ে স্কুলের থেকে বাড়ী ফিরে আসচো। এদের

চলচ্চিত্র-গৃহ

মতন গরমের সুট পরবার দরকার তোমার মোটেই নেই, খাকি সার্ট ও প্যান্ট পরেই গ্যাছো হয়ত! তবে গাল দুটীতে অমন স্বাস্থ্যের লালিমা তো ফেটে পড়তে পায়নি! ঐখানেই যে এদের সঙ্গে তোমাদের মস্ত বড় তফাৎ। এরা ওই রাঙ্গা গালের তাজা রক্তের তেজে বিশ্ব জয় করতে কোন্ অজানা রাজ্যে উধাও হয়ে ছুটে যাবে,—আর তোমরা! না:—

স্যাভয় হোটেল, মসুরি

তাই বা কেন? তোমাদেরও আর কোণের মধ্যে জড় হয়ে বসে থাকবার দিন নেই—'উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত'—বলে তোমাদেরও আজ ডাক পড়ে গ্যাছে। উঠতেই হবে আবার! জাগাতেও হবে ভাল করে। কেমন—স্বাস্থ্য জীবন ও জয় এই জাগ্রত দিনের পুরস্কার। এ যে তোমাদের নিতেই হবে।

ল্যাণ্ডোর বাজারটা দেখে কিছু বিস্ময় বোধ হ'ল। এই পাহাড়ের উপর নেই এমন জিনিসের দোকান নেই! মায় কারপেন্টারীর সমুদয় জমকালো যা কিছু। বড় বড় খাড়া আয়নাওয়ালা ৭॥ ফুট লম্বা আলমারি পর্য্যন্ত।

তরকারির বাজার দেরাদুনের চাইতেও জমকালো। ষ্ট্রবেরি থেকে সমস্ত রকম ফল ও শাক-সব্জী—নেই এমন কিছু নেই। অবশ্য পটলটা তো ও দিকেরই নয়, সে ছেড়ে দাও। কিন্তু মাদ্রাজের আমটা তো বাদ পড়ে নি! তবে পটল বয়কট হ'ল কেন? গরম কাপড় ও সূতী সুটের কাপড় কিছু কিনলুম, আমাদের ওখানে এর চেয়ে মাগ্যি পড়ে। অথচ এতটা উঁচুতে তুলতে হয়েচে!

স্যাভয় হোটেল

আমরা যেখানে বাসা নিলুম, তার সঙ্গেই একটী বেশ বড় দেবালয় আছে। বাড়ীতে কল, ইলেকট্রিক বেশ ভালই বন্দোবস্ত। ঘরগুলিও নেহাৎ ছোট নয়। নেয়ারের খাট

দ্বীপের মধ্যে আমরা ক'জনে কোন মতে এসে পৌঁছে গেছি; কিন্তু এখান থেকে আর বেরুবার পথ নেই!

ক্যান্ট্‌নমেন্টের বাড়ীগুলি উপরে নীচে উপরে নীচে করে' স্তরে স্তরে সাজানো। তার মধ্যে থেকে কোথাও পিয়ানো বাজার শব্দ, কোথাও হাসি চীৎকার গান শোনা যাচ্ছিল। সাহেবদের দু'একটি ছোট ছেলে
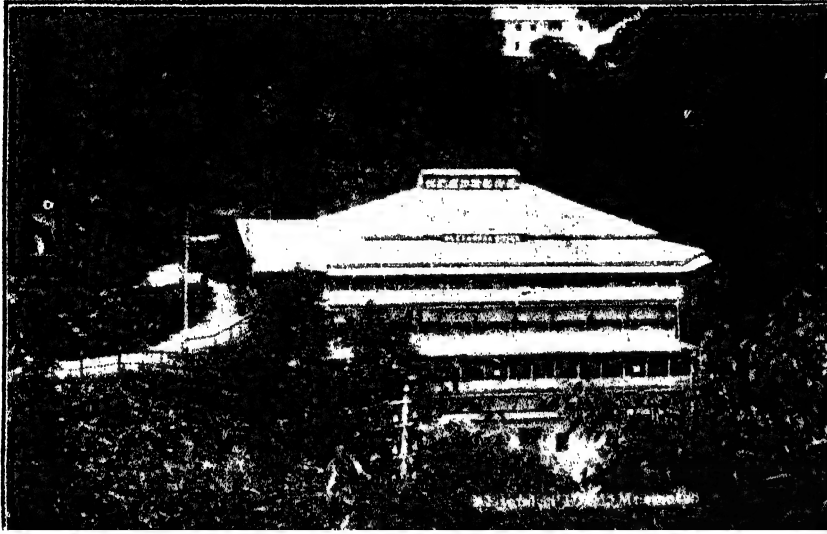
অ্যালেকজাণ্ড্রা হোটেল, মসুরি

আলনা এ সবও ছিল।

একটু জিরিয়ে, খাওয়া দাওয়া করে' আমরা গোচগাচ হ'য়ে প্রথমেই লাল্‌টিবাতে যাবার জন্যে ডাণ্ডি ভাড়া করলুম। দেরাদুনেই শুনেছিলুম, লালটিবার উপর থেকে কেদারনাথ ও বদরিনাথের পাহাড় এবং গঙ্গোত্তরী দেখা যায়। লালটিবা মসুরীর সব চেয়ে উঁচু চূড়ো। সেখানেই ক্যান্ট্‌নমেণ্ট।

আমরা অত কষ্ট করে এলাম বটে, কিন্তু কিছুই কায হলো না। দেখতে দেখতে হঠাৎ মেঘে ও কোয়াসায় সমস্ত পাহাড়গুলিকে আঁচল চাপা দিয়ে লুকিয়ে দিলে। ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট—আর সমস্ত ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। তার তলায় যে কি আছে, ভাল করে তা দেখাই গেল না। মনে হলো আমাদের এই উচ্চতর পর্ব্বতাশ্রয়ের চারিপাশেই যেন ধূসর বর্ণের অসীম সমুদ্র, মাঝখানে এই

আমাদের কাছ দিয়ে চাইতে চাইতে যাচ্ছিল—ডেকে একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করে নিলুম।

মসুরি পাহাড় জায়গাটি নেহাৎ ছোট নয়—বেশ লম্বা সহর। যতদূর চোখ যায়, বাড়ীর অন্ত নেই আশে পাশে সর্ব্বত্রই ছোট বড় বাড়ী বাগান রাস্তা পথ চলেইছে। ম্যালে দু'সারি দোকান কলকাতার চৌরঙ্গীকে মনে পড়িয়ে দেয়। কোম্পানীর বাগান, লাইব্রেরী বেশ দেখবার মতন। ইডেন গার্ডেনের মতন কোম্পানীর বাগানে বাজনা বাজ্‌ছিল। ক্যামেল-ব্যাক রোড রাস্তা থেকে সকালে সূর্য্যোদয় ভারী

মসুরি হাওয়া ঘর

চমৎকার দেখতে। প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে অনেক দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। দূরে—বহুদূরে তুষারগিরির অস্পষ্ট একটা সমুজ্জ্বলতর শুভ্রতা দেখতে পাওয়া গেল। কালো পাহাড়ের পাশে পাশে যেন খানিক খানিক রূপার পাত পাতা রয়েচে।

যা কিছু দেখছি, তোমাদের জন্যে ভারি মন কেমন করচে, আর কিছুই ভাল লাগছে না। রাত্রে খুব শীত ছিল, দুখানা র‍্যাগ ও গরম জামা পরে' শুয়েও শীতে ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে উঠে আর একটা গরমজামা পরতে হলো। ওখানে এখন রাত্রে হয়ত গায়ে কিছুই দিতেই হয় না। মর্ণিংস্কুল, ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্চে কে? রুনু না বৌদিদি?—তোমার মা

সার্ভিল হোটেল, মসুরি

শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বদরী না যাওয়া স্থির করে বীরুর সঙ্গে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার এপারে মুনিকারেতি পর্য্যন্ত একদিন বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু সেই দেখেই মুগ্ধ হয়ে এসেছি। নাঃ, এমন অনায়াসলভ্য সুবর্ণসুযোগ ত্যাগ করা চলে না। ওরা যখন যাচ্চে, তখন আমিও চলে যাই। কষ্ট হয়, ওরা যদি সইতে পারে, আমিই বা না পারবো কেন? অনেকদূর পথ, অনেক দিন সকলকে ছেড়ে থাকতে হবে, হয়ত সব সময় খবরও পাবো না, এই জন্যেই একটু ভাবনা হয়। তা আর কি করা যাবে, ও-ও সয়ে নিতে হবে। কথায় বলে 'কষ্ট না করলে কৃষ্ণ মেলে না'। বদরীনাথ দর্শনও কি আর কষ্টস্বীকার না করেই পেয়ে যাব? অতএব যাওয়াই স্থির। তোমার টেলিগ্রাম পেয়েছি, গবর্ণমেণ্ট কমিউনিক যা

মসুরি—প্রান্তপথ

অবশ্য এই সময়ের জন্যে। আমাদের অতদূরে পৌঁছতেও তো মাসখানেক লাগবে। পুল যেখানে ভেঙেচে, সে বদরী থেকে মাইল পনেরর মধ্যে। প্রায় প্রতি বছরই ভাঙে।

এখানের বাঙ্গালীরা আমায় কাল তাঁদের লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে একটু যত্ন দেখালেন। শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতি এবং অধ্যাপক

মসুরি—বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর নিম্নাংশ

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে বেরিয়েছিল, সেও দেখেছি। পাণ্ডাজী, যিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, বল্লেন, আমরা পৌঁছবার আগে ও বরফের চাপা আটটা ভাঙ্গা পুল জোড়া লেগে যাবে। এদিকের পথঘাট সর্ব্বদাই এসময় মেরামত করা হয়। এর জন্যে ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার ও প্রত্যেক মাইলে ষোল জন কুলি সর্ব্বদা তৈরি থাকে—

হ্যাপি ভ্যালি—মসুরি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন তোমার বন্ধু বি, এল, মিত্রের দাদা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকে এবং এখানের সমস্ত বাঙ্গালী মেয়েরাই উপস্থিত ছিলেন।

এ চিঠিখানা পাঠান হয়নি। কাল ২৬.৪।২৭ মঙ্গলবার আমরা হৃষীকেশে এসেছি। আজ বৈকালে অথবা কাল ভোরে লছমনঝোলা রওনা হব।

এ সুযোগ ছেড়ে গেলে আর কখনও এ জীবনে ফিরে পাব?

এ এক অপূর্ব্ব স্থান। পূর্ব্বেই হয়ত লিখেছি. দেরাদুন আমার তত ভাল লাগেনি, জসিডি হাজারিবাগেরই বড় ও কিছু সংস্কৃত সংস্করণ মাত্র। কোন কোন বিষয়ে, কে নিরেস কে সরেস, বলা যায় না। হরিদ্বার ও হৃষীকেশ একজাতীয়, বরং হৃষীকেশ সরেস তো নীরেস নয়। মা গঙ্গার রূপ এখানে অনির্ব্বচনীয়! 'ইন্দ্রমুকুটমণি-রাজিত চরণে' দর্শকের সমস্ত মনপ্রাণ যেন ভক্তিতে গলে' গিয়ে লুটিয়ে পড়তে চায়। অন্তরের সঙ্গেই বলতে ইচ্ছে করে, 'ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ'। কল কল গদ গদ কি অফুরন্ত শব্দলহরী, ফেনশুভ্র তরঙ্গরাজির কি উদ্দাম লীলারঙ্গ! মেঘধূসর, সুবিশাল পর্ব্বতমালার অঙ্ক-শয্যায় দুহিতারূপিণী এই বাল-তরঙ্গিণীকে যিনি এঁর কন্যা কল্পনা করে গিয়েছেন, তিনি যথার্থ দর্শক বটেন; এ কল্পনা যার তার পক্ষে সম্ভবে না। এই সব প্রত্যক্ষ-দর্শীদের যে মন্ত্রদ্রষ্টা এবং ঋষি বলা হয়, সে ঠিকই।

ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে পুজোর বন্ধে এসে যদি তোমরা দেখে যাও তবেই আমার এ ক্ষোভ দূর হবে। এত ভাল জিনিষ একা দেখে সুখ হয় না।

রাজবাড়ীর মতন প্রকাণ্ড নূতন ও সুপরিচ্ছন্ন ধর্ম্ম-শালাগুলিতে যাত্রীদের খুবই সুখ ও সুবিধা হয়। পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থাও খুব ভাল। আসবার সময় শুধু লিখে দিয়ে যেতে হয় যে, কর্ম্মচারীদের ব্যবহার ভাল, কোনরূপ অসুবিধা হয়নি। তা সত্যই অসুবিধা হয় না, ভদ্রলোক সকলেই। এখানে কালীকম্‌লীর ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত আছে। বদরী পথের যাত্রী যে সব সাধুসন্ন্যাসী সদাব্রতে খেতে চায়, এইখান থেকে পাস জোগাড় করতে হয়, তা হলে বদরী-নাথের সমুদয় বড় বড় জায়গায় তারা কালীকম্‌লীর সদাব্রতে স্থান ও আহার পেয়ে থাকে। এই কালী-কম্‌লী একজন কালো কম্বল পরা গরীব সাধু ছিলেন। পথের যাত্রীদের দুঃখ দূর করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টায় ধনকুবের শেঠদের ঘরে ঘরে বিস্তর টাকা আদায় করে' এখন অনেক সুবিধা করে' দিয়েছেন। সমস্ত বদরী-পথেই 'কালীকম্‌লী'র সদাব্রত ও ধর্ম্মশালা আছে শুনলুম। ধর্ম্মশালা এখানে আরও অনেক শেঠ-নামধারী ধনীদের তৈরি করা আছে। তীর্থের উন্নতি, সাধুসেবা এসব মাড়োয়ারীরা খুবই করে থাকেন।

রাইওয়ালা ষ্টেশন থেকে হৃষীকেশ রোড (লাইট রেলওয়ে) নাম দিয়ে যে ছোট রেলপথ হয়েচে, তাইতে এসে মাইলটাক আমরা হেঁটেই এলুম। (এর আগে বীরুর সঙ্গে যেদিন একা আসি, সেদিন দুজনে ট্রেণে না এসে টোঙ্গায় হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার কাছাকাছি পাহাড়ের তলা পর্য্যন্ত এসেছিলুম।) রাইওয়ালায় সবাই ওজন হওয়া গেল, ব্যবস্থাটা বীরুর। সে ফিরে কে কতটা কমে আসেন, দেখতে হবে। এই হৃষীকেশ রোডটী যেন সমস্ত ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। এর কোনখানে কর্কশ কঠিন পার্ব্বত্যভূমি, কোথাও সুজলা শ্যামলা বঙ্গজননীর স্নিগ্ধমূর্ত্তির অবতার, কোথাও উত্তরপশ্চিমের উভয়মিশ্র রূপ। সুমহান্ বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ, সেও যেমন সুন্দর, এই অনতিদূরে বেতসকুঞ্জের পাশে শেওলাপড়া জমা জলের মধ্যে ব্যাঙ্ লাফাচ্চে, সেও তেমনই চমৎকার! ফলে ফুলে, জলে, স্থলে, সর্ব্বত্রই এই বৈচিত্র্যের রাশি যেন ছড়িয়ে দেওয়া! কোন্ দিক ছেড়ে কোন্ দিকে যে চেয়ে থাকবো, ভেবে পাইনে।

পাহাড় দিয়ে বেড়ের পর এ চারিদিকে বেড় দিয়েছে, নীল মেঘের সঙ্গে আবার তা' বুকে বুকে যেন মিশে গ্যাছে, অসীমে স-সীমের এই কোলাকুলি মেশামেশি মনকে যেন একেবারে সীমাহারা করে দেয়। মনে হয় যেন ক্ষুদ্র এই জগতের এত ছোট প্রাণী আমি, আমারও যেন আর ঐ চিররহস্যময় আকাশের রাজ্য অনধিগম্য নেই। এই হিমালয়ই যেন আমাদের মধ্যের সংযোজক সেতু। কালিদাস এঁর অসংখ্য গুণরাজি কীর্ত্তনের মধ্যে একস্থানে বলেছেন—"ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসাং সতীব।" মহতের স্বভাবই এই যে, শরণাগত ক্ষুদ্রকেও সাধুর মত

মমতা করেন। আমাদেরও এই ভরসামাত্র; তাঁরই তো শরণাগত হ'তে চলেচি। দেখি নিজ মহত্ত্বগুণে এই ক্ষুদ্রতমদের জন্যে কি ব্যবস্থা করেন। পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘনও যা, আর আমাদের হিমালয় ভ্রমণও তা'!

এরই যাত্রাপথের বামভাগে এক উঁচু পাহাড়ের উপর নবনির্ম্মিত নরেন্দ্রনগর টিহিরির বর্ত্তমান নরেন্দ্র সাহের নামে তৈরি করা নূতন সহর, রত্নপ্রসূ হিমালয়ের মাথার উপর তাঁর হীরক কিরীটের মতই সেটা ঝলমল করচে।

হৃষীকেশ হরিদ্বার থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। এর মাঝখানে ভীমগোড়া নামকাহালে ভীমকুণ্ড ও ভীমেশ্বর মহাদেব আছেন। রাইওয়ালার মাইলখানেক পরেই সত্যনারায়ণের মন্দির। এখানে অনেক ধর্ম্মশালা ও দোকান প্রভৃতি আছে। বিস্তর যাত্রী স্নানাহার করচে।

হৃষীকেশের প্রধান মন্দির হৃষীকেশ বা ভরতের। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরও আছে। মুনিকারেতিতে যেতে শত্রুঘ্নর মন্দির। লক্ষ্মণ চলে গেছেন লছমনঝোলায় এগিয়ে। কালো পাথরের মূর্ত্তি, বড় বড় সাদা চোক, বেশভূষা বেশ ভাল। বড়লোকের ছেলের মতই। জটাধারী মূর্ত্তি ওঁদের কোথাও দেখি না! অথচ ঐ মূর্ত্তিতেই ভরতের ও লক্ষ্মণের বিখ্যাতি। রামের না হয় রাজবেশই তাঁর যশের আকর।

হৃষীকেশে গঙ্গার ধারে ও পাহাড়ের গুহায় গুহায়, গায়ে ও মাথায় অনেক ছোট বড় বাড়ী, কুটীর ও ঝুপড়ী তৈরি করে অসংখ্য লোক বাস করচে। স্থায়ী অস্থায়ী অনেক বাসিন্দা দেখলুম। বদরীযাত্রীতেও পথঘাট ধর্ম্মশালা সমস্তই ভরা। তবু পাঁচ ছ'দিন থেকে ক্রমাগত লোক ছাড়া হচ্চে। এতদিন পথ তৈরি হয়নি বলে, আর বরফও মোটে গলেনি বলে যাত্রীদের আটকে রাখা হয়েছিল। আমাদের আজ ডাণ্ডি ঠিক হয়ে উঠলো না। যা দাম সেদিন বীরু স্থির করে গেছলো, আজ ঢের বেশি চাইলে। জলপানি তীর্থমোকাম এসব থাকবে, এ ছাড়া ডাণ্ডি ২৫৲ টাকা করে কিনতে হবে, সে অবশ্য নিয়মই। তা ছাড়া কুলিভাড়া ৩৫০৲।

এখানে তিন রকম যান আছে। ডাণ্ডি তার মধ্যে ভাল। একখানা ইজিচেয়ার গোছেরই—কতকটা পা ছড়িয়ে বসা যায়, মাথার উপর অয়েলক্লথের হুড তোলা থাকে রোদবৃষ্টির জন্যে। চার জনে বহন করে। বেশী ভারি হলে পাঁচ বা ছ'জন কুলিতে হয়। কাণ্ডি একজনে বয়, দামও সস্তা, দার্জ্জিলিংয়ে তরকারীর ঝুড়ি-গুলোর মতই, ভিতরে জিনিসপত্র কিছু রেখে বসা যায়। তবে মোটা মানুষের জন্যে সে নয়। এগুলো ৭৫৲ টাকায় হয়। জলপানী ⁄০ হিসাবে রোজ, তীর্থস্থানে পৌঁছলে ১৲ বকশিস, কোথাও একদিন যদি থাকা হয়, তো সেদিনের খোরাকী যাবে ৷৵০ আনা, তা ছাড়া ফিরে এলে বকশিস—সে যার যেমন ইচ্ছা বা সাধ্য। ঝাপানের আর সবই ডাণ্ডির কুলির সঙ্গে সমান, শুধু ঝাপানগুলির দাম ৭৲ বা ৮৲ টাকা, কখনও ৬৲ টাকাও পড়ে। গাছের ডাল কেটে দড়ি বেঁধে তৈরি করা ছোট ছোট খাটুলী। আরোহীকে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে বসে যেতে হয়।

ভারবাহী কুলিদের মণকরা৮০৲ টাকা মজুরী স্থির হলো। রাত্রে লক্ষ্মণদাস জেঠিয়ার ধর্ম্মশালার তিনটী ঘর নিয়ে থাকা হলো, ঘেরা উঠানেও ক'খানা খাটিয়া পাওয়া গেল। কুলিরা ভারী গোলমাল আরম্ভ করলে। নূতন লোক মুনিকারেতির আড্ডা থেকে এলো, তাদেরও এরা ভাংচি দিলে। পণ্টু শেষে তাদের জ্বালায় বিরক্ত হয়ে বল্লে, "যাঃ আমরা ডাণ্ডি নেবো না, হেঁটেই যাব।" বল্লে "গরজ দেখালে হবে না, চলুন আমরা লছমনঝোলাটা পেরিয়ে যাই।"

আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। যদি ওরা না যায়? তখন উপায়?

পণ্টু বল্লে, "যাবে না আবার? তেরজন যাত্রীকে হাত ছাড়া করবে? না যায় তখন ওপারেই নেওয়া যাবে। ঝাপান সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। আর ডাণ্ডি না হয় কেউ এসে নিয়েও যেতে পারে। একদিন না হয় ওপারেই থাকা যাবে। এখানে সহরে বসে কি হবে?"

আমরাও তাই ভাল মনে করলুম। এখন কোন

রকমে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। বেরুতে যত দেরি হবে, ফিরতেও তো সেই অনুসারে দেরি। কখন কার কি বাধা পড়ে কে জানে।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে' ছেলেরা দেরাছুনে ফিরে গ্যালো। আমরা বিকেল পাঁচটায় এখান থেকে বেরিয়ে মুনিকারেতি হয়ে লছমনঝোলা নৌকায় পার হয়ে ওপারে গিয়ে থাকবো। ডাণ্ডিওয়ালারা যদি ইতিমধ্যে বশে না আসে, অগত্যা কাল ওইখান থেকে আশু বা পরশুকে পাঠিয়ে এপার থেকে ডাণ্ডি নিয়ে যেতেই হবে। 'পাদমেকং ন গচ্ছামি' আমার তো এই রকমই প্রতিজ্ঞা। অবশ্য পারলে তো ভালই হতো। যেহেতু মসুরি পাহাড়ে উঠতেই দেখেছি পাহাড়ের পথে হেঁটে ওঠাই নিরাপদ ; কিন্তু ক্ষমতা চাই হাঁটবার।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

সুখের কবি

মাটীরে যে মাটী বলিছ বন্ধু, তার মাথে মেরে চাঁটি ;
পূজিবে কি তারে যেবা বলে সেটা কাঞ্চন-ভাল খাঁটি ?
　　শাদা চোখে যেবা দেখে সোজাপথ,
　　তার কাছে ধাঁধা নহে এ জগৎ !
বুঝিব কি তবে প্রাজ্ঞ সে জন, আলেয়ার পিছে হাঁটি'—
যে জন স্বপনে সুখ-নন্দনে ঘুরে আসে পরিপাটি !

আমি গো বন্ধু ! অন্ধকারের এক পোঁচ শুধু রং ;
আঁকিতে তাহারে হয় না কষ্ট, বুঝিতে হয় না ভ্রম !
　　যে আলোর ধারা নেই বলে হায়,—
　　কালোর কালিমা জগতে ঘনায় !
সে আলোর পিছে ছোটাই সত্য, এ কেমন ধারা ঢং ?—
অবোধের মত রামধনু-মালা পরিয়া সাজিতে সং !

জুতা খেয়ে যদি গরু নাহি লই, কেন সাধ এত বাদ ?
মারিতে পারিবে, সে কথা বলাই হলো মহা অপরাধ ?
　　খোঁড়া ছেলে ধরি' করি' নানাছল—
　　ভাবিতে পারি এ সুস্থ, সচল !
পা কি তার তাতে গজায় বন্ধু ? কোথা যায় আহ্লাদ ?
চেটে দেখি পিছে মিষ্টি কোথায় ? তুলানি দ্বিগুণ গাদ !

মোসাহেবী যারা করে গো বন্ধু, বড়র দালালী করে,
তাদের ত্বক্ যে অতি বেশী পুরু, বিঁধে না সহজ শরে !
　　গত অপমান ভুলিয়া সর্ব্ব
　　পদবী লইয়া করে কি গর্ব্ব !
সুধা নাহি বলি পয়োমুখে যদি বিষকুম্ভের ডরে !
ছলনায় ধরা নাহি দিলে কি গো হয়ে যাব একঘরে ?

খাঁচার ভিতরে পাখী গায় গান, শিস্ দেয় তাও জানি !
কিসের সে গান ? প্রাণের সে নয় ; ছোলার মহিমা-বাণী !
　　যেটুকু পেয়েছে হারাণোর ভয়ে,—
　　শঙ্কিত গান জাগে ব্যথা ল'য়ে ;
শীতে ঠক্‌ঠক্ কাঁপি কাঁপি যবে, নিই ছেঁড়া কাঁথাখানি ;—
বলিতে কি হবে এ সুখস্বর্গ ? টানি না পেষণ-ঘানি !

গোলাপী কাঁচের ঠুলিটি পরিয়া যদি ধরা নাহি দেখি ;
আশালোকে রাঙা ঠুন্‌কো জিনিষ যদি বলি আমি মেকী ;
　　পরখ করিতে ধরি যদি ছল,
　　সুধাভ্রমে যদি না পিই গরল !
প্রহারে প্রহরে কেঁদে ফিরি যদি অন্যায় হ'বে সে কি ?
দেখি যদি মহাকালের হাসিতে বিদ্রূপ লেখালেখি !

কাঁদায় চাইতে সত্য, বন্ধু, কিবা আছে হেথা আর ?
কেন লুকোচুরি ? আমার নিয়েট তালিটারে ঢাকিবার ?
　　'প্রাচী'র দু'মুঠা স্বর্ণের লাগি—
　　কেন ব'সে তবে সারারাত জাগি ?
তবু কি বলিবে নাই, নাই, ওরে নাই রে অন্ধকার !
সে কথার ছল নিতি পড়ে ধরা, ভেবে দেখো একবার।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

ম্যালেরিয়া

ডাঃ শ্রীআশুতোষ পাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল M Sc, বোলপুর। ২১৮ পৃঃ, মূল্য ২॥০

পুস্তকখানি বাঙ্গালী দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত, কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেক মায় উৎসর্গ ও সূচীপত্র ইংরাজীতে লেখা। সুতরাং হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন কোনও ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেখানে মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক কথা প্রকাশ করা অসম্ভব, সেখানে বৈজ্ঞানিক ভাষা ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা ভাষার এখনও এত দৈন্য উপস্থিত হয় নাই যে, বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিতে অর্দ্ধেকের উপর ইংরাজী কথার প্রয়োজন। লেখকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বা তাঁহার চিন্তাশীলতা বা গবেষণা সম্বন্ধে নিন্দার কিছু নাই—তবে তিনি এই পুস্তকখানি ইংরাজীতে লিখিলেই ভাল করিতেন! যদি বাঙ্গলায় লেখাই তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন ভবিষ্যতে মাতৃভাষাই ব্যবহার করেন!

একটু নমুনা—১৬৩ পৃষ্ঠায় "যাঁহারা barley পছন্দ করেন না, তাঁহাদিগকে sago water দিবেন। ইহাও খুব soothing diet। sago দানাগুলি ছাঁকিয়া দিবেন, তাহা হইলে barley water মত soothing হইবে।" সমস্ত পুস্তকখানি এরূপ ইংরাজী বাঙ্গলা মিশ্রিত অদ্ভুত ভাষায় লিখিত। পুস্তকখানি গ্রাম্যতাদোষেও দুষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ৩৫ পৃঃ লিখিত হইয়াছে—"সেই সময়ে খুব গা বমি বমি করিয়া 'ওয়াক' 'ওয়াক' করিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়; তার পর 'হর' 'হর' করিয়া বমি করিয়া ভাসাইয়া দেয়।"

এই সব দোষের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যায় যে, পুস্তকখানি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। চিকিৎসা, প্রতিষেধের উপায়, প্রভৃতি লেখক বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ছাপার ভুল বহু স্থানে আছে, বিশেষতঃ ইংরাজী কথাগুলির মধ্যে।

লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে—আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে পুস্তকখানি বাঙ্গালায় লিখিয়া ও সাবধানে প্রুফ দেখিয়া তিনি ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিবেন।

(১) চয়নিকা
(২) প্রাচীন সাহিত্য ও (৩) আধুনিক সাহিত্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য যথাক্রমে ২৸০, ৷৵০ ও ৸৵০

'চয়নিকার' পাঠ্যপরিচয়ে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বর্ত্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "গান ও নাটক বাদ দিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত কবিতার সংখ্যা প্রায় ১২০০ হইবে। এর আগের সংস্করণ চয়নিকায় তাহার মধ্যে মোট ১৩৬টি কবিতা ছিল; এবার ২০৮টি কবিতা দেওয়া হইল। কবির নূতন প্রকাশিত দুইখানি বই, 'প্রবাহিনী' ও 'পূরবী' হইতেও আমরা কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কবির অপ্রকাশিত নূতন কবিতাও দুটি দেওয়া হইল। * * এই গ্রন্থে কণিকার কবিতা ছাড়া অন্য সমস্ত কবিতাগুলি কালক্রমানুসারে সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে একটি বইয়ের কবিতা, বিভিন্ন সময়ে লেখা হইলেও, একত্র রাখা হইল।" তারপর এ কথাও উক্ত হইয়াছে যে, ৩২০ জন পাঠকের ভোট লইয়া রবীন্দ্রনাথের ২০০টি কবিতা বাছাই করা হয়, কিন্তু গ্রন্থে, কম ভোট পাইয়াছে এমন কবিতাও রাখা হইয়াছে এবং বেশী ভোট পাইয়াছে এমন কবিতাও বাদ পড়িয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রন্থের সংকলয়িতা কবিতানির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, নানা উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন, তবে কোন উপায়ই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করেন নাই। সাজাইবার রীতিও এইরূপ। ভোটের উপর যে প্রণালীতে কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত ও সাজানো হইয়াছে, তাহা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। তবে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ভাল কবিতা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বহিরবয়ব সুন্দর। মূল্য আরও কম হওয়া উচিত ছিল।

'প্রাচীন সাহিত্য' ও 'আধুনিক সাহিত্য'ও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ছাপা কাগজ পূর্ব্ববৎ।

বীর-কাহিনী

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, মূল্য ॥৵০

চারিটি ছোট গল্প লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। গল্পগুলি রাজপুতদের ইতিহাস হইতে গৃহীত। তবে রচনাভঙ্গী লেখকের নিজস্ব। গ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তু হইতে বোঝা যায় যে, কয়েকটী বীরত্ব কাহিনী প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্য; লেখকের কিন্তু শুধু এই উদ্দেশ্য নয়। তিনি রচনায় ইতিহাসের মর্য্যাদা রাখেন নাই, কেন না তাঁহার বর্ণনা-ভঙ্গী ঔপন্যাসিকের মত। আবার ঐতিহাসের মর্য্যাদা রাখিতে গিয়া অনেক স্থলে উপন্যাসেরও রসহানি করিতে হইয়াছে। তবে গল্পগুলি সুপাঠ্য। তরুণ পাঠকের নিকট ইহার আদর হইবে।

মারাঠির কথা

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক শ্রীআশুতোষ ঘোষ, ১৬ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥০

চারিটি ঐতিহাসিক গল্প এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ইতিহাস লইয়া উপন্যাস রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ণনা অনেক স্থলে উপাদেয়, মনে হয় ঐতিহাসিক ব্যাপার উপন্যাসের ধরণে লিখিতে গিয়া তিনি একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে চান। এই পন্থায় যে সব বাধা আছে, তাহা লেখকের অবিদিত নয়। তিনি যথাসাধ্য তাহাদের এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পগুলি সুপাঠ্য।

অহল্যা-উপাখ্যান

অর্থাৎ হিন্দুজাতির পতনের কারণ ও তাহার পুনরুত্থানের উপায়। শ্রীযোগিরাজ শিষ্য মৈত্রেয় প্রণীত ; "সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্ম" হইতে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত, মূল্য ১৲

কাশীর শ্রীপ্রভুদত্ত শাস্ত্রী অগ্নিহোত্রী ভূমিকায় লিখিতেছেন "প্রদীপ দান আরতি ও হোম প্রভৃতি দেবকর্ম্মে ঘৃত পবিত্র না হইলে হিন্দুর পূজা পণ্ড হয়। * * * যাহাতে দেবকর্ম্মের নিমিত্ত পবিত্র ঘৃত পাওয়া যাইতে পারে, তাহার আয়োজন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। হিন্দুগণকে এই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করানই এই গ্রন্থ প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

লেখক অহল্যার উপাখ্যান হইতে প্রমাণ করিতে চান, পুরাণের গল্পাংশ বেদবিরুদ্ধ ও পরিত্যজ্য ; উহার শাস্ত্রাংশ কিন্তু বেদসম্মত ও গ্রহণীয়। দেবতার প্রকৃতি বিচার করিতে গেলেও এই উপাখ্যানের অসত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। সেকালের কথায় প্রাচীন সমাজ-শাসনের উল্লেখ করিয়াও তিনি দেখাইয়াছেন, অহল্যার কথা প্রক্ষিপ্ত। তারপর সেকালের কথা হইতে একালের কথায় আনিয়া ও কাল পরিবর্ত্তনের হেতু নিরূপণ করিয়া কিরূপে স্বধর্ম্মের উপকার হইতে পারে, তাহারও ইঙ্গিত করিতে গ্রন্থকার ভুলেন নাই।

মোটের উপর গ্রন্থকার দুই চারি কথায় একটা বিরাট সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার আভাস পাওয়া যায়। সর্ব্ববিষয়ে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। পুরাণ পরিত্যজ্য, হিন্দুগণ আপনাদিগের কুরুচির দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কলুষিত করিয়া বিবিধ গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে, এ সব কথায় আমাদের শ্রদ্ধা নাই। লেখকের যুক্তিও অনেক স্থলে অসঙ্গত।

মাঝে মাঝে দুই একটা ভাল কথা যে একেবারে নাই এ কথা বলা চলে না। তবে আমাদের মনে হয়, লেখক শুধু ঘৃতের উপকারিতা সম্বন্ধে ও পবিত্র ঘৃত কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করিলেই ভাল হইত। বেদ পুরাণ লইয়া তিনি যে সব কথা অনেক স্থলে বলিয়াছেন, তাহা এতই অযৌক্তিক যে, তাহার প্রতিবাদেরও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

শাস্ত্র অপেক্ষা লোকসাহিত্য বলীয়ান এ কথা অনেকেই জানেন। বাংলা দেশ স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা দিক আর নাই দিক, তাহাকে শাস্ত্র-কর্ত্রীর পদে বসাইতে কিন্তু দ্বিধা করে নাই। এই শাস্ত্র ও ব্রতকথার মধ্যে স্নেহ, মায়া, ভক্তি প্রভৃতি কোমল ভাব ও দেশের একটি শান্তিময় পবিত্র ছবি নিত্যসরস হইয়া আছে। এই গুলিকে অংশতঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার যে সাধারণের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

নূতন শিশুশিক্ষা

প্রণেতা শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—৫৪।৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, মূল্য /০

লেখক বলেন "হিন্দু বালক-বালিকাগণের হৃদয়ে জাতীয় শিক্ষা বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিলাম।" বিদ্যাসাগর, বর্ণপরিচয়ে দুই ভাগে ছেলেদের যতটুকু শিখাইতে চান, গ্রন্থকার এই একটি মাত্র গ্রন্থে তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বালক-বালিকাদের প্রিয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দু জাতির কাছে ইহার মূল্য হয়ত অধিক হইতে পারে, কিন্তু বালকজাতির পক্ষে ইহার মূল্য অতি সামান্য। পুরাণ, ইতিহাস হইতে কয়েকটা নাম বা বাক্য ছেলেদের শিখাইলেই যে তাহাদের হৃদয়ে জাতীয় শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়া যায়, এ মত আমরা পোষণ করি না। প্রথম শিক্ষার্থীর পাঠ্য পুস্তক পাঠকের প্রকৃতির অনুগত হওয়া চাই।

বঙ্কিম চিত্র

প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। প্রাপ্তিস্থান আর ক্যাম্ব্রে এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর আমাদের বক্তব্য বিষয় অল্প। গ্রন্থকার ভ্রমর, রোহিণী, তিলোত্তমা, আয়েসা, গোবিন্দলাল প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার চিত্র সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা পণ্ডিতী ভাষা নয়, তুলনামূলক বিচারে তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হয়। গ্রন্থখানি ছাত্র সমাজের উপযোগী।

বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকার চিত্র গ্রন্থকার শুধু সাহিত্য-দর্পণের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিয়াছেন—সেই জন্য এই সমালোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহার সবটাই দেশী নয়—সেই জন্য মনে হয় শুধু দেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রদীপ তাহার সব দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে অক্ষম।

সেপাই ঝোরা

প্রণেতা শ্রীবিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

গ্রন্থে পাঁচটি ছোট গল্প স্থান পাইয়াছে। রচনায় করুণরসই প্রধান। যে চিত্রগুলি লেখক আঁকিতে গিয়াছেন, তাহা সুরঞ্জিত হইলেও, 'সেপাই ঝোরা'য় বৈশিষ্ট্য নাই। উপসংহার বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিবার আয়োজন অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। 'বারবেলা'য় ঠাকুরদাদার চিত্রটি সরস। 'দীক্ষা', 'সেনু মামা', 'ব্যথা' চলনসই গল্প। ভাষাটিকে একটি কৃত্রিম ছাঁচে ফেলিতে গিয়া লেখক তাহার সহজ গতিকে প্রতিরোধ করিয়াছেন। রচনায় কলা-কৌশলের অভাব আছে, বর্ণনাও অনেক স্থলে অনাবশ্যক বাহুল্যকে প্রশ্রয় দিয়াছে।

তবে লেখক ভাবুক, রচনায় কাব্যের মাধুর্য্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট গল্পের মালমসলা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যথোচিত ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

পূজারিণী

লেখিকা শ্রীমতী নির্ম্মলা মিত্র। প্রাপ্তিস্থান দেবসাহিত্য-কুটীর, ২১।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। প্লট সাধারণ ও সরল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পালিতা কন্যা নম্রা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছে। সামাজিক নির্য্যাতন ও অন্তরের অভিমানে পীড়িত হইয়া নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র উপলকেই স্বামিরূপে লাভ করিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখক নম্রার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। চিত্রে শরৎচন্দ্রের প্রভাব স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়, তবে লেখিকার নিজস্বই অধিক। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বিজয়, সরমা প্রভৃতির চিত্র মন্দ নয়। তবে চিত্রকার্য্যে অধিকতর নৈপুণ্য আবশ্যক।

মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে লেখিকার কৃতিত্ব আছে। ভাষাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

লেখিকা পুরাতন আদর্শেরই পক্ষপাতী। নায়ক-নায়িকারা দু' এক স্থানে বিদ্রোহের ভাব দেখাইলেও অবশেষে পুরাতন গণ্ডীর মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মোটের উপর গ্রন্থখানি আমাদের দেশে আদর পাইতে পারে, কেন না ইহার সর্ব্বত্রই একটা সুরুচি ও সুনীতির দৃষ্টান্ত আছে। বর্ণনা অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত হইলেও কোথাও নৈতিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

গ্রন্থের বহিরবয়ব সুন্দর, দামও সস্তা।

প্রবাল

লেখিকা শ্রীমতী সরসীবালা বসু। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲

এই উপন্যাস খানি প্রবাসী পত্রিকার প্রথমে প্রকাশিত হয়। প্রবাল স্বাধীনচিত্ত শিক্ষিত যুবক। তাহার সহিত বালবিধবা সেবার বিবাহই লেখিকার বর্ণনীয়। বইখানির ভাষা স্পষ্ট, বর্ণনা ভঙ্গীও সুন্দর। অন্তঃপুরের চিত্রগুলি মধুর।

রচনায় সাময়িক কথার উল্লেখ থাকিবেই। তবে রস-রচনায় কোন সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিতে অত্যধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলে লেখক আর যাহাই করুন না কেন, রসের উদ্বোধন কখনই করিতে পারেন না। লেখিকা একটি বিধবার বিবাহের চমৎকার সরঞ্জাম করিয়াছেন, কিন্তু যে বস্তু উপন্যাসের প্রাণ, যাহা পাঠকের হৃদয়ে অমৃত-রস ক্ষরণ করে, তাহার বিশেষ পরিচয় গ্রন্থে নাই।

চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি অপ্রয়োজনীয়। স্ত্রী-চরিত্রে একটা স্বাধীনতার ভাব অঙ্কিত হইয়াছে, তবে কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। 'সেবা'র পিতার চিত্রটিতে নূতনত্ব আছে।

গ্রন্থখানির অনেক স্থলে লেখিকার রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়টি উপন্যাসের উপযোগী হয় নাই।

মাধবীর বিদ্রোহ

প্রণেতা শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ, প্রকাশক শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ, স্বস্ত্যয়ন সাহিত্য মন্দির, পোঃ মহেশপুর, যশোহর, মূল্য ১৷০

মাধবী ভজের পত্নী। তাহার কন্যা সুরমার বিবাহ হইল এক দরিদ্রের ঘরে। মা কন্যাকে গৃহে আনিয়া তাহার অন্য বিবাহে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। স্বামীর শিক্ষাগুণে, তিনি যে সামাজিক বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা পণ্ড হইল। কন্যা পতির সহিত মিলিত হইল। মা অবশেষে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। মাধবীর বিদ্রোহ ও সেই বিদ্রোহের শাস্তি বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক অনেক বর্ত্তমান সমস্যার কথার অবতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবে হিন্দু-সমাজ যে ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, তাহাই দেখানো লেখকের অভিপ্রায়। গ্রন্থে নানা তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ ও বেকারের সমস্যা লেখক একটি উপন্যাসের মধ্যে সমাধান করিতে গিয়া উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য খর্ব্ব করিয়াছেন।

উপন্যাসের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা আজ-কাল অনেকেই করিতে চান। ইহাতে সাধারণতঃ লেখকের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সমস্যার সমাধানও হয় না, উপন্যাসেরও রসহানি ঘটিয়া থাকে। যাহা প্রবন্ধের উপযোগী, তাহা উপন্যাসের ছাঁচে গড়িয়া পাঠককে কিছুক্ষণের জন্য প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রলোভনের দ্বারা কোন কাব হয় না।

লেখকের ভাষা ভাল। তবে গ্রন্থে উপন্যাসের অংশটি মলিন, তত্ত্ব

কথাগুলি বেশ স্পষ্ট। লাক্ষার চাষের কথাও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তাহার জন্য উপন্যাস কেন?

আবর্ত্ত

প্রণেতা শ্রীহরিপদ পাণ্ডে এম-এ। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল ২৲

গ্রন্থকার এই উপন্যাসে একটি ভাবের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই আবর্ত্তে পড়িয়াছে সুরথ, এই গ্রন্থের নায়ক। মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহার আদর্শের ক্রমোন্নতি দেখানোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

সুরথ স্বাধীনচিত্ত যুবক। কোন হুজুগে মাতিয়া ওঠে না, তবে তাহার চাল-চলন প্রমন্তেরই মত। সে আপনার ভাবে বিভোর এবং ভাব-অনুযায়ী কার্য্য করিতেও সদাই অগ্রসর। চরিত্রটি কখনও কখনও রবিবাবুর গোরাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

সাময়িক সমস্যার কথা, রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, কাব্য, সঙ্গীত, কলা-বিদ্যা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কথা গ্রন্থখানিকে কিছু দুষ্পাঠ্য করিয়া তুলিলেও আমাদের মনে হয় আধুনিক সাহিত্যে ইহার একটি স্থান আছে।

সমাজ যে একটা মোহের ঘোর ঘুচাইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার নিদর্শন সুরথের চিত্রে আছে। আমরা উপন্যাসটিকে সাময়িক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে চাই।

সাময়িক সাহিত্যের গুণ ইহাতে আছে। বইখানি কাযের কথায় পরিপূর্ণ, আধুনিক যুগের মন্তব্য বোধ হয় সবই এখানে সংগৃহীত হইয়াছে।

ভাষা ও রীতিতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রচিত্রেও লেখকের নৈপুণ্য আছে। অটল বাবু, উইলিয়মসন্, সুরথের চিত্রে গাম্ভীর্য্য ও ভাবুকতা আছে—ইহাদের মস্তিষ্কও বেশ সাধারণ অবস্থায় নয়—এইরূপ চিত্রেই লেখকের স্বাভাবিক আগ্রহ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু দুচারি কথায় লেখক একটি চিত্র অতি সুন্দর ভাবে আঁকিয়াছেন, এ চিত্রটি সুরথের মাতার।

এইরূপ সৌন্দর্য্য মাঝে মাঝে অনুভূত হইলেও আমরা বলিতে চাই গ্রন্থে লেখক সাময়িক চিন্তা ও ভাবের বিশ্লেষণে যে যত্ন দেখাইয়াছেন উপন্যাসের রচনা-কৌশলে তাহার অল্পাংশই নিয়োজিত হইয়াছে। সাময়িক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া লেখক উপন্যাসের স্থায়ী রস-বস্তুর অনাদর করিয়াছেন।

মরুশিখা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। বহরমপুর, সত্যরত্ন প্রেস, পৃঃ ১২০, মূল্য ৸০

কবিতার বই। ছন্দ পরিপাটী, মিল নিখুঁত, ভাষা ঝরঝরে—এমন অনেক কবিতাই চোখে পড়ে, কিন্তু মনে থাকে ক'টা? রচনার বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটিলে কাব্য-সৃষ্টি অচিরেই বিস্মরণীর অতল গর্ভে ডুবিয়া যায়। যদি কাব্য বাঁচাইয়া রাখিতে চাও, তবে নূতন বিষয় ধর। কাব্য স্মরণীয় করিবার আরও এক উপায় আছে, সেটা হচ্ছে পুরানো জিনিষকে নূতনভাবে দেখা। সকলে যে চোখ দিয়া একটা জিনিষ দেখিতেছে, তুমি যদি সেই জিনিষটাই আর একদিক হইতে দেখ, তবে তোমার রচনার আর 'মরণ' নাই। কবি যতীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি এবং সমালোচ্য কাব্য-গ্রন্থে তাঁহার এই নূতন ভঙ্গীতে দেখার অনেক উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইবে। "শিব-স্তোত্রে' গ্রন্থের আরম্ভ, আর 'গঙ্গাস্তোত্রে' গ্রন্থের শেষ। হঠাৎ মনে হওয়াই সম্ভব যে হিন্দুর 'স্তোত্র'-সাহিত্যে বুঝি আরও কিছু যোগ হইল! যোগ হউক, কিন্তু কে-ই বা পড়িবে, আর কে-ই বা মনে রাখিবে? 'শিবস্তোত্রে'র প্রথম লাইনও বেশ ধোঁকা লাগাইয়া দেয়ঃ—

"জয় শিব, জয় শঙ্কর, জয় স্বর্গ-মোক্ষ-দাতা" কিন্তু-দু'চার ছত্র পরেই যখন দেখি,—

> "এ সব মন্ত্রে জাগে না হৃদয়, লাগে যেন পরিহাস ;
> ব্যথার দেবতা, কহ গো গোপন বেদনার ইতিহাস।"

তখন আর সন্দেহ থাকে না যে, একটা নূতন জিনিষ পাইতেছি—আর অমনি এক নিশ্বাসে সবটা না পড়িয়া থাকিতে পারি না। গঙ্গার স্তোত্র প্রথম লাইন হইতেই মনকে ধাক্কা দেয়,

> "চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে!
> কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আঁখিজল
> দেব-মানবের এক সঙ্গে!"

এই যে পুরানো জিনিষকে নূতন করিয়া দেখা, কবি যতীন্দ্রনাথের ইহা একটা বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহার কাব্য-সাহিত্যকে দীর্ঘায়ু করিবে। কবির রস-সৃষ্টি করিবার শক্তিও তাঁহার সৃষ্ট কাব্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার একটি প্রধান কারণ, এই রস—বৈচিত্র্যে, গাঢ়তায়, প্রাচুর্য্যে যত শ্রেষ্ঠ হইবে, সেই রসের কাব্যও তত উৎকৃষ্ট হইবে। একাধারে সকল রসের সমাবেশ বড়ই সৌভাগ্যের কথা, এরকম শক্তিশালী কবি জগতে খুবই দুর্লভ। কবি যতীন্দ্রনাথে আমরা সর্ব্বরসের সমাবেশ দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যাহা পাই, তাহাও বড় দুর্লভ, এবং সেই জন্যই আমরা তাঁহার কাব্য উপভোগে এত আনন্দ পাই। আপাতঃদৃষ্টিতে এই কবিকে অনেক স্থলেই ব্যঙ্গ-রসের কবি বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কবিতারই অন্তরালে একটি গোপন করুণ-রসধারা প্রবাহিত, সেইটি ধরিতে পারিলেই কবিতার সমগ্র রস উপভোগ করা যায়। একই কাজে

পাশাপাশি দুইটি বিভিন্ন ধারা বহান খুবই বাহাদুরী, সুদক্ষ 'ইঞ্জিনিয়র' না হইলে এ কাম সম্ভব হয় না। কাঁচা হাতে এ ক্ষেত্রে 'রসাভাস' দোষ ঘটিয়া থাকে। কতকগুলি কবিতাতে আমাদের দেশের উপযোগী শ্রেষ্ঠ রাজনীতি, কোথাও বা সমাজনীতি সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন আছে। কাব্যরসের কোনপ্রকার হানি না করিয়াও এ সকলের অবতারণা কাব্যে সুদুর্লভ। 'লোহার ব্যথা', 'চাবুক' 'কাণ্ডারী' 'নবপন্থা' 'সাদা ও কালো' প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে যে কবি এবিষয়ে কি নিপুণ হস্তেই লেখনী ধরিয়াছেন। কবি দুঃখবাদী এবং তিনি 'দুখেরই বড়াই' করিয়া থাকেন। যাঁহারা জগতে সুখ খোঁজেন, তাঁহারা মরুভূমিতে বৃথাই জল-অন্বেষণে ব্যস্ত। তাঁহার এই Philosophy লইয়া মতভেদ হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু তিনি এমন আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁহার দুঃখবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, তাহা খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। 'দুঃখবাদী' কবিতা হইতে দু'চার লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

"অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু!
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা, তীরে ব'সে গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহুমান।
দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
* * * * *
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী!"

'কাণ্ডারী' কবিতাটির অন্তরালে যে গূঢ়ার্থ নিহিত আছে, তাহা অতীব বিচিত্র। আধ্যাত্মিক অর্থ ধরিলে মনে হয়—পাপী ভগবানকে অনুযোগ করিতেছে 'দেব, পুণ্যবান ত নিজের পুণ্যবলেই তরিয়া যাইবে, তাহাকে তরাইয়া তোমার বাহাদুরী কোথায়? আমার মত পাপীকে ত্রাণ করিতে পারিলেই বুঝিব তোমার মহত্ত্ব—অর্থাৎ দরফখাঁর ভাষায়—"সুরধুনী মুনিকন্তে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং স তরতি নিজপুণ্যৈঃ" ইত্যাদি। আর একটি অর্থও বেশ আছে—আমাদের এই পরাধীন শতদুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের যাঁহারা নেতা তাঁহারা যেন কতকটা সখের খাতিরেই নেতাগিরি করিতেছেন, অনুকূল পবনে ও স্রোতে নৌকা চালাইতে তাঁহারা মজবুত, কিন্তু এ দেশ এখনও সে অবস্থায় পৌঁছায় নাই, এখন যে পাঁকে পড়া গরুর গাড়ী ঠেলিয়া রাস্তায় তুলিতে হইবে, নেতাদের এত স্বার্থত্যাগ আছে কি? অনেক কবিতাতেই এই রকম পাশাপাশি দুইটি সুর আছে। 'শরতে বঙ্গভূমি' রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত কবিতাটির ঠিক parody নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া শরৎকালে বঙ্গভূমির দুর্দ্দশা বর্ণনা, এচিত্রটি মনোমুগ্ধকর নয় কিন্তু সত্য। 'জোলো দুধ' কবিতাটিও ব্যঙ্গার্থে ভরপুর। "জননীর স্তন্যে তেরভাগ জল, তবু গোয়ালাই এ দুধ সরবরাহ করিয়া থাকে, তবুও তোমরা তার জয়ধ্বনি কর, আর আমি যদি সেরে মাত্র আধ পোয়া জল দিই, অমনি মার মার করিয়া ছুটিয়া আস"—গোয়ালার এই বিচিত্র কৈফিয়তে কবি ভগবানের উপর যে অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল উচ্চস্তরের ভক্তেরই সাজে। Onomatopoetic কবিতা বাংলায় বেশী নাই, আলোচ্য কাব্যে 'রেলমুখ' শীর্ষক একটি ঐ শ্রেণীর সুন্দর কবিতা আছে।

গম্ভীর ভাবের কবিতা লিখিতেও কবি যে অপটু নহেন—'অন্ধকার' কবিতাটিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ইহাতেও তাঁহার দুঃখবাদ প্রকট, যথা :—

"অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
জ্যোতিরূপ এ বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ,
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইবে সপ্তরশ্মি রথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ।"

'খেজুর বাগান'ও একটি অপূর্ব্ব কবিতা, দুঃখবাদের রসে সিক্ত। 'বাস্তু' কবিতারও ঐ সুর। বাস্তু-ঘুঘুজোড়ের ক্ষণিকের সুখ-মিলনের মধ্যে যে অতীত ও ভবিষ্যতের চির-বিরহ-বীজ নিহিত আছে, সেই কথাই বার বার মনে পড়ে। 'অপমান' 'সিন্ধু-তীরে' 'মর্ত্ত্য হইতে বিদায়' কবিতাগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত কবিতাটিতে কবি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও 'দুঃখবাদী' করিয়া নিজের দল পুষ্ট করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের পর প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা হিন্দুর চক্ষে অহিন্দুজনোচিত বোধ হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে খুব স্বাভাবিকই মনে হইবে। নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :—

"আজ মনে হয় বৃথা আসিলাম সাধের গোলোক ছাড়ি;
যে কায করিনু হ'ত অনায়াসে পাঠাইলে মহামারী।
* * * *
শোক-উদ্বেল নারীর অশ্রু-সাগরে করিয়া স্নান
কন্দর্পের মাথার খুলিতে বারুণী করিব পান।
* * * *
দিয়ে যাই বর,—নরের যেটুকু পাইলাম পরিচয়,—
নর চিরদিন নর থাকে যেন, নারায়ণ নাহি হয়।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোভাবে কবি যে দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল লাগিল না। কতকগুলি 'গান' এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, সে 'গান'গুলি নিতান্ত মন্দ না হইলেও, কবির উপযুক্ত হয় নাই। এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়—কবি যতীন্দ্রনাথ যে বিশেষ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, তাহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং ইহাই তাঁহাকে বঙ্গীয় কাব্যক্ষেত্রে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বৈদেশিকী

সঙ্কলন

ইতালীর প্রাচীন পার্ব্বত্যপ্রদেশের কতিপয় চিত্র

১। স্বতন্ত্র দুষ্প্রবেশ্য নগর :—সমতল হইতে প্রায় ৬০০ ফুট উচ্চে একটি পর্ব্বত-শীর্ষস্থিত এই নগরটী এক সময়ে মধ্য যুগের একটি বিখ্যাত দুর্গ ছিল। ইহা ইতালির পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত।

২। পথিপার্শ্বে টাস্‌কানির শ্রমশিল্প।

গ্রামাপথে বসিয়াই কৃষকপত্নীগণ চরকায় সুতা কাটে।
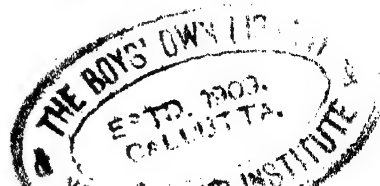
৩। সরকারী ফোয়ারা হইতে জলসংগ্রহে ইতালির স্পোলো নগরবাসিনী।

৪। সর্‌তাল্‌দো গ্রামে বোকাসিওর বাসগৃহ। ডেকামেরণ প্রণেতা এই স্থানেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া দেহত্যাগ করেন।

৫। আসিসি নগর এখনও মধ্যযুগের জলসরবরাহ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক—গ্রামে গ্রামে বহু সংখ্যক ফোয়ারার জন্য ইতালী প্রাচীন রোমদেশবাসীদিগের নিকট যথেষ্ট ঋণী। উক্ত দেশের আধুনিক পূর্ত্তকার্য্যও সেই প্রাচীন প্রথার অনুগামী।

আইসল্যাণ্ডের চিত্র

৬। আইস্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত ইসাফ্জোঃডুর নগরের একটি বিদ্যালয়—আইস্ল্যাণ্ডদেশীয় জনসাধারণ সুশিক্ষিত। জাতীয় সাহিত্যের ধারা এমন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে যে, প্রত্যেক আইস্ল্যাণ্ডবাসী তাহাদের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষায় সহজে কথোপকথন করিতে পারে।
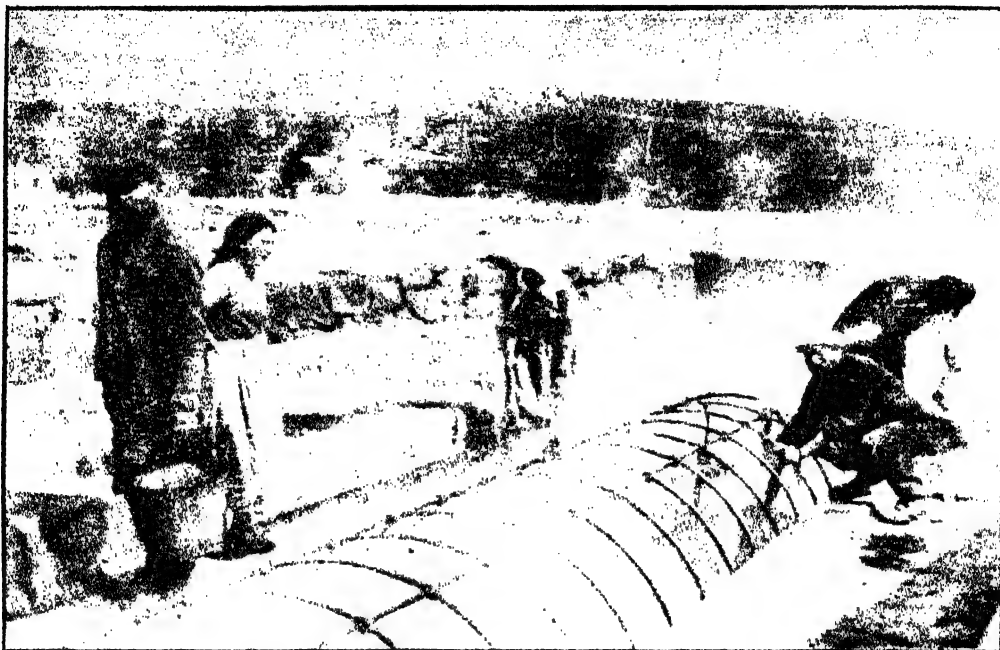
৭। জাতীয় কল্যাণস্বরূপ আইসল্যাণ্ড দেশীয় উষ্ণ-প্রস্রবণ—ইহার উত্তাপেই খাদ্য পাক হয়।

৮। আইস্ল্যাণ্ড দেশে গ্লাইমা নামক জাতীয় মল্লক্রীড়া।

৯। সংহত ধাতুদ্রব দিয়া নির্ম্মিত কৃষকভবন—ইহার টিনের আচ্ছাদন আধুনিক। এই গৃহগুলি এত নীচু যে, কেবলমাত্র বালকবালিকাগণ ইহার ভিতর অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা দেশে এইরূপ ব্যবস্থাই উষ্ণতা সঞ্চারক।

১০। গ্রাইমা-মল্লক্রীড়ায় শক্তির পরিচয় নাই, উহা কেবল কৌশলের উপরই নির্ভর করে।

সাহিত্য

চীনের পুরাণ—জগন্মাতা প্রসঙ্গ

চীনের পুরাণে জগন্মাতা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, পুণ্যশীলা লোজি ফ্যাং একটী উচ্চ বৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। এখনও তিনি প্রত্যহ আকাশমার্গে বিচরণ করেন।

স্বর্গপথেই চন্দ্রলোক বর্ত্তমান। সিয়েন্ মুঙ্ সম্প্রদায়ভুক্ত সূক্ষ্মদেহী ঋষিগণ চন্দ্রের পূজা করেন এবং চন্দ্রলোক-প্রসিদ্ধ ভেষজ সেবনে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন। জাপানে "চন্দ্রবালা"র কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন এক কাঠুরিয়া বংশরন্ধ্রে একটি জ্যোতির্ম্ময়ী শিশুকন্যা দেখিতে পায় এবং তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে থাকে। কালে বালিকা চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কাঠুরিয়া-দম্পতি মুগ্ধ হইয়া তাহার নাম রাখিল "জ্যোৎস্না"। জ্যোৎস্না সদাই অমর সুধা পান করিত। হঠাৎ সে একদিন চন্দ্রলোকে চলিয়া গেল।

চীনের পুরাণমতে চন্দ্রের সহিত ড্রেগনের এবং চন্দ্রের সহিত বংশের নিকট সম্পর্ক, অতএব ড্রেগন ও বংশের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ মানিয়া লইতে হইবে, কারণ একজন পুণ্যাত্মা বংশ নির্ম্মিত ড্রেগনে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন। চীনা সন্ন্যাসিনীগণ যোগক্রিয়াদ্বারা পবিত্র সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া, পক্ষবর্জ্জিত পক্ষিগণের ন্যায় স্বর্গপথে বিচরণ করে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিলিঙ্গ ড্রেগন বাহনেও গমন করে। চীনের পুরাণোল্লিখিত জগন্মাতাই ইহাদের নায়িকা।

পৌরাণিক যুগের সম্রাজ্ঞী সুকাকেও কেহ কেহ জগন্মাতা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন; কারণ তিনিই প্রলয়কর্ত্রী। যখন জলাসুর ও অগ্ন্যাসুরগণ তাঁহারই বিদ্রোহী সেনানায়ক দিগের সহিত একযোগে জগৎ-সংসার ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনিই তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দমন করেন; কিন্তু তাঁহারই এক ভীষণকায় অনুচর অসাবধানতা-বশতঃ স্বর্গের একটি স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তজ্জন্যই পৃথিবীতে প্রলয় ঘটে। প্রলয়ের ভীষণ জলোচ্ছ্বাস সম্রাজ্ঞী অর্দ্ধদগ্ধ বংশযষ্টি সাহায্যে রোধ করেন এবং স্তম্ভটি সংস্কার করিয়া একটি বিশাল কূর্ম্মপৃষ্ঠে তাহা স্থাপিত করেন। সেই অবধি স্বর্গস্তম্ভ পঞ্চদেবতার বর্ণে রঞ্জিত। অতঃপর তিনি চতুর্দ্দিক্‌পাল নিযুক্ত করিয়া স্বর্গীয় নদীর জলনির্গমন পথের ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং মনুষ্যজগতের হিতার্থে সবুজমণি সৃষ্টি করিয়া জাপানে জোকা নামে পরিচিত হন।

অমর বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্মাতার রূপভেদে সুন্দরী যুবতী বা ড্রেগন বা ড্রেগনবাহিনী মূর্ত্তিতে পূজিত হন। ইঁহাকে লোকে বৃক্ষাত্মা, চন্দ্রমণ্ডল মধ্যস্থিতা ও জগজ্জীবনীশক্তিরূপে ধ্যান করে। বৃক্ষফল ইঁহারই দান, উদ্ভিদরস ইঁহারই রক্তস্বরূপ এবং পিচ ফলেই ইঁহার ঐশ্বর্য্য পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান।

মোমোটারোর কথা

(মোমো অর্থে পিচ ফল এবং টারো অর্থে জ্যেষ্ঠপুত্র)

একদিন এক কাঠুরিয়া নদীতীরে কাষ্ঠছেদনে প্রবৃত্ত ছিল। নিকটেই নদীতে তাহার স্ত্রী বস্ত্র ধৌত করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে, একটী অতি বৃহদাকার পিচ ফল ভাসিয়া যাইতেছে। সে একটী যষ্টিসাহায্যে সেটীকে সংগ্রহ করিল। সেই দিন সান্ধ্য-ভোজন সময়ে কাঠুরিয়া লোলুপ-চিত্তে তাহা কাটিতে গিয়া দেখিল যে, তন্মধ্যে একটী শিশু রহিয়াছে। অপুত্রক কাঠুরিয়াদম্পতি উৎফুল্ল চিত্তে করুণাময়ের উদ্দেশে মস্তকে করস্পর্শ করিল।

বালকের নাম হইল মোমোটারো। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত মোমোটারো অসামান্য শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। কিছুকাল পরে সে তাহার পালক-পিতাকে জানাইল যে, অসুর দ্বীপে গমনপূর্ব্বক সে অসুর-দিগের ধনরত্ন অধিকার করিতে উৎসুক। প্রমাদ গণিয়া দম্পতি তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিল, কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মোমোটারো হাসিয়া বলিল, "আমার জন্য কিছু পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দাও, পথে আহার করিতে হইবে।"

কাঠুরিয়া-পত্নী সাশ্রুনয়নে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শিরশ্চুম্বন করিল। মোমোটারো তাহাদের নিকট বিদায়-গ্রহণান্তে যাত্রা করিল।

অল্পদুর পথ অতিক্রম করিলে পর, এক কুকুরের সহিত মোমোটারোর সাক্ষাৎ হইল। কুকুর নিজ ভাষায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "কোথায় চলিয়াছ মোমোটারো?"

মোমোটারো উত্তর দিল, "অসুর দ্বীপের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে।"

"তোমার হাতে কি?"

"পিষ্টক হে, পিষ্টক,—আমার মা'র মত কেহ পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে না।"

"আমাকে একটী দিবে ভাই? আমি তোমার রক্ষী হইব।" মোমোটারো কুকুরকে একটী পিষ্টক দিল এবং কুকুর সানন্দে তাহার অনুগমন করিল।

আরও কিছু দুর অগ্রসর হইলে পর, পথিপার্শ্বস্থিত বৃক্ষ হইতে এক বানর তাহাকে আপন ভাষায় স্বাগত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যাত্রা তোমার কোন দেশে হে?"

মোমোটারো পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিল। বানর তাহার অনুচর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পিষ্টক চাহিল এবং পিষ্টক লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার দলভুক্ত হইল।

পরে এক জীবঞ্জীব পক্ষী উড়িয়া আসিয়া সাগ্রহে বলিল, "কোথায় হে, কোথায়?" মোমোটারো পূর্ব্ববৎ

উত্তর দিল, এবং পক্ষীও পিষ্টক চাহিয়া লইয়া তাহাদের ভ্রমণে যোগদান করিল।

অসুর দ্বীপে উপনীত হইয়া তাহারা প্রধান দুর্গদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। পক্ষী গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। বানর প্রাচীর-গাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরেই এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সহস্র অসুর-সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ভীষণ যুদ্ধে মোমোটারো অসুর দল দমন করিয়া জয়োল্লাসে অসুর-রাজ আকানডেজির সমীপে উপস্থিত হইল। মোমো-টারোকে লক্ষ্য করিয়া অসুর-শ্রেষ্ঠ লৌহদণ্ড নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে কৌশলে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া মোমোটারো বানরের সাহায্যে তাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিল এবং প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া তাহার কোষাগারের সন্ধান জানিতে চাহিল। তদবস্থায় অসুররাজ স্বীয় ভৃত্যবর্গের প্রতি মোমোটারোর যথোচিত সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত আদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কোষাগার হইতে শ্রেষ্ঠ রত্নাদি লইয়া আসিতে বলিলেন। মোমোটারো তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বয়ং কোষাগারে প্রবেশপূর্ব্বক অদৃশ্য কুর্ত্তা, জোয়ার-ভাটা-নিয়ামক যাদুরত্ন, সবুজ মণি-কবচ ও বহুবিধ মহামূল্য রত্নাদি এবং প্রচুর স্বর্ণরৌপ্যাদি গ্রহণ করিয়া তদ্দণ্ডেই স্বদেশ যাত্রা করিল।

মোমোটারোর প্রত্যাবর্ত্তনে কাঠুরিয়া-দম্পতির সুখের সীমা রহিল না।

মোমোটারো পিচফলসম্ভূত বলিয়া জগন্মাতার বড় প্রিয়। ড্রেগন-দেবতারাও জগন্মাতার সন্তান।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

মানব সে, শুধুই মানব

দোলে রে শ্যামলা দোলা, বাসন্তীর আঁচল-বাতাসে,
নীলিমার চাঁদ-মুখে কি হাসির কাহিনী গাঁথা-সে!
নদী আঁকে জলছবি ; রাঙা বাঁশী বাজে ফুলে ফুলে,
অকবিরে কবি ক'রে কে তখন জাগে হৃদি-মূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

সংসারে অশ্রান্ত শান্তি, অন্তরেতে আনন্দ সন্তরে,
বাপের মায়ের প্রাণ বিগলিত স্নেহের মন্তরে,
মা-ষষ্ঠীর মিষ্টি বরে কোল জুড়ে খেলে ছেলেপুলে,
ঘরোয়া সুখের সোতে কে জাগে রে মরমের মূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

যজ্ঞকুণ্ড ভগ্ন চূর্ণ,—তছ্‌নছ্‌ কাব্য ও সংহিতা,
অরণ্য শরণ্য নয়,—নেই গার্গী, আত্রেয়ীর গীতা।
ইষ্টকে পিষিয়া ইষ্ট, প্রকৃতিকে ঢাকে কালি-ঝুলে,
নাগরী সভ্যতা সাথে কে যান্ত্রিক জাগে বক্ষ-মূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

দুঃস্বপ্ন শরীরী যেন—তাণ্ডবে ঐ চণ্ড দিগম্বর!
জঠরে দুর্ভিক্ষ-ক্ষুধা—অট্টহাসে আক্রান্ত অম্বর!
বিপ্লাব-আপ্লাবব্রতী, মুণ্ড গাঁথি নৃশংস ত্রিশূলে,
বিনিদ্র বিদ্রোহ-দর্পে কে নৃসিংহ জাগে চিত্ত-মূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

ফুল-শেজে কাঁপে লাজে ছোট বুক কিশোরী বধূর,
নতুন বঁধুর ছোঁয়া কি অসহ—কেমন মধুর!
পরায় বেলের গোড়ে খোঁপা ঘিরে, চুলবুলে চুলে,
প্রথম চুমার প্রেমে কে শিহরি জাগে প্রাণ মূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, সুধুই মানব!

কে চায় ইন্দ্রের বজ্র? রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কাপুরী?
বিশ্বজয়ে ভীম তেজে নির্ঘোষে কে ভয়ঙ্কর তুরী?
কাঙ্ক্ষা কার তৃপ্ত নহে নন্দনের মন্দাকিনী-কূলে?
পরপুতবুক্ষসম কে স্বাথিক জাগে মনোমূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

জননী, দুহিতা, ভগ্নী যার দৃষ্টি দেখে-নি ভুলিয়া,
তপ্ত মাংসলোভ কাঁদে যার আঁতে চীৎকার তুলিয়া,
কুৎসিত লালসা যার রমণীর মৃতদেহ ছুঁলে,
পশুত্বে জীবত্ব ঢেলে কে অধর্ম্মী জাগে মর্ম্ম-মূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

বন্ধুত্বে শ্রীরামচন্দ্র, শত্রুতায় নির্দ্দয় রাবণ,
হিংসায় জলৌকা সম, করুণায় অনন্ত শ্রাবণ,
রৌরবে গৌরবে দেয় বৈকুণ্ঠের সিংহদ্বার খুলে,
আলো-আঁধারিতে জাগে কে বিচিত্র, মানসের মূলে?
নয় পশু, দেবতা দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

নরে দেখে নারায়ণ কার বুকে বিশ্বপ্রেম ফোটে,
পরার্থে জীবন-যজ্ঞে হাসিমুখে প্রাণ দিতে ছোটে,
বৈরাগ্যের মহা-ব্রতে তপস্বী কে রাজ্যসুখ ভুলে,
স্বর্গের আত্মজ হয়ে কে মহাত্মা জাগে আত্মা-মূলে?
দেবতা বা নয়কো দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

কল্পনায় সৃষ্টি করে ভগবান সর্ব্বশক্তিমান,
স্বয়ং প্রতিমা গ'ড়ে ভক্তরূপে নিত্য গাহে গান,
মর হয়ে অমরতা নিজে দেয় পরহস্তে তুলে,
জগতে আপনি জাগে, ত্রিজগৎ জাগে হিয়া-মূলে,
গড়া যার দেবতা-দানব—
মানব সে, শুধুই মানব!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান—বৈশাখ।

বর্ত্তমান যুগের স্বাস্থ্য—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন। সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে জন্মের হার দিন দিন কমিয়া মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইতেছে। লেখকের মতে ইহার কারণ সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে অনাচারের প্রবেশ। আমাদের অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া সংযম শিক্ষা না করিলে আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই।

বিসূচিকা চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। শাস্ত্রীয় মতে বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা। লেখক শাস্ত্রীয় ঔষধের সহিত সেলাইন ইন্‌জেকসানের ব্যবস্থা দিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। চিকিৎসা কালীন প্রত্যেক চিকিৎসকেরই গোঁড়ামী বিবর্জিত হওয়া উচিত।

পেটের অসুখের চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন। এই সংখ্যায় শেষ হইল। আমরা গত মাসে এই প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। আশা করি লেখক মহাশয় অন্যান্য রোগের চিকিৎসা প্রণালী এইরূপ ভাবে বিবৃত করিবেন।

বৈশাখ মাসে আয়ুর্বিজ্ঞান ব্যতীত আর কোনও চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা আমরা পাই নাই। সেজন্য অন্য পত্রিকা গুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি আমরা পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম না

সাহিত্য।

প্রবাসী—বৈশাখ।

লর্ড সিংহ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লর্ড সিংহের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইল:—

১। তাঁর মধ্যে যে সৌজন্য দেখেছি সে আচারগত নয় সে হৃদয়গত। ২। পদবীর আড়ম্বর করতে তাঁকে একদিনও দেখিনি। ৩। যে আভিজাত্যের অভাবনীয় অধিকার তিনি পেয়েছিলেন, সেই অধিকার যেন তাঁর নূতন পাওয়া সামগ্রী নয়, সে যেন তাঁর সহজাত। তাতে করে তাঁর স্বাভাবিক নম্রতাকে একটুমাত্র আবৃত করেনি। ৪। নিজের পথ তিনি বিচার করেই স্থির করেছিলেন, ঝোঁকের মাথায় করেন নি। * * তিনি যা বুঝতেন বুদ্ধির আলোকে তা তিনি স্পষ্ট করে বুঝতেন। এই জন্য তার মধ্যে তাঁর এমন শান্তি ছিল। ৫। আমাদের গ্রামগুলির জীর্ণতা সংস্কার করে তাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারলে তবে আমাদের দেশকে বাঁচাতে পারা যাবে, এই কথাটি মনে রেখে দীর্ঘকাল থেকে আমরা সাধ্যানুসারে কিছু কিছু কাজ করবার চেষ্টা করেছি। এই কাজে আমার স্বদেশের লোকের মধ্যে যে দুই এক জনের সহায়তা পেয়েছি তার মধ্যে লর্ড সিংহ ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। * * এই কাজ সম্বন্ধে যথার্থ তাঁর আস্থা ছিল—সে কেবল দেশের প্রতি তাঁর প্রেম-বশতঃ, লোকরঞ্জনের জন্যে নয়।

জনমতের ফেনিল উচ্ছ্বাস যাঁহাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, মহতের প্রতি মহতের এই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি আবার তাঁহাকে নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বর্ত্তমান লোকমত ও স্বদেশ-প্রেম সম্বন্ধেও লেখকের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কোথাও গোঁড়ামি বা একগুঁয়েমির লেশ নাই।

কয়েকখানি পত্র—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭নং পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। সবটাই আত্ম-কাহিনী, ভাবে ভাষায় ও বিষয়ে নূতন না হইলেও উপাদেয়—"তুমি মনে করেছিলে তোমার আত্মাকে তৃপ্ত করবার মত কোনো সম্পদ আমার আছে। কিন্তু আমি পথের পথিক, গম্য স্থানের ডাক শুনি; ঠিকানায় পৌঁছে কাউকে জোর করে ডাক দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। আমার আছে বলবার ক্ষমতা, তাই বিধাতা আমাকে দিয়ে নানা কথাই বলিয়ে নেন—কোনো একটি বাণীতে আমার সকল বাণী সংহত করে সাধনার মন্দিরে আলো জ্বালবার কাজে আমার তলব পড়েনি। আমি গুরু না, রাষ্ট্রনেতা না,—আমি কবি, সৃষ্টির বিচিত্র খেলায় নানা ছন্দে গড়া খেলনা জোগান, এই আমার কাজ। তাতে মানুষের যেটুকু আনন্দ সেইটুকুই আমার সার্থকতা। এই আমার স্বধর্ম্ম, আর সেই স্বধর্ম্ম রক্ষার দায়িত্ব আমার। আমার কাছ থেকে রাষ্ট্র-নৈতিক কূট-বুদ্ধি, কর্ম্ম-নৈতিক নৈপুণ্য যারা আশা করেছে তারা নিজে ভুল করেছে অথচ আশা-ভঙ্গের দুঃখের জন্যে আমাকেই দায়ী করেছে।"

যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে ঋষি, গুরু বা রাষ্ট্রনেতা বলিয়া অভিহিত করেন, বোধ হয় তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই এই কথাগুলি লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা যে একেবারেই ভুল করিয়াছেন এ কথাটি কিন্তু আমরা মানিয়া লইতে পারি না। ইহার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়িলে তিনি যে শুধু কবি—গুরুত্ব, ঋষিত্ব বা রাষ্ট্র-নেতৃত্বের কোন দাবীই তাঁহার নাই—একথা অনেকেই মনে করেন না।

গুরু ও কবির পার্থক্য লেখক এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"যাঁরা গুরু তাঁরা নিজের বিশ্বাসের জোরে নিজের মতে সবাইকে প্রবর্ত্তিত করতে চান্। যে কবি, সে কেবল মনের ভাবকে সাজিয়ে দিয়ে চলে যায়, গতিয়ে দেবার গরজ তার নেই।" এখানে 'গুরু' কথাটির নিকৃষ্ট অর্থ ও 'কবি' কথাটির উৎকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃত অর্থ ধরিলে গুরু ও কবিতে বিশেষ পার্থক্য নাই। যিনি প্রকৃত গুরু তাঁহাতে যেমন কবিত্ব আছে, যিনি প্রকৃত কবি তাঁহার গুরুত্বও সেইরূপ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া মানিলে যে ভুল করা হইবে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না।

এ সংখ্যার সব পত্র গুলিই ভাব-গৌরবে সমুজ্জ্বল।

গৌড়ীয় শিল্পের আদি যুগ—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌড়ীয় শিল্পের আদিযুগ কখন্ আরম্ভ হয়, এবং এই যুগের বিশেষত্ব কি, লেখক তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক হয় নাই। নানা কথা সংগৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া সমগ্র রচনাটিকে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা কোথাও লক্ষিত হয় না।

ভারতশিল্প—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্যের Indian Architecture ও Dictionary of Hindu Architecture নামক দুইখানি গ্রন্থের

পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি প্রশংসাপত্রের মত। গ্রন্থ দুইখানির বিশদ বিবরণ থাকিলেও ইহা অনেকের সুপাঠ্য হইতে পারিত।

লালন শাহ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার পাল। লালন ফকীরের কয়েকটি গান ও তাহার ভাবার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবার্থ কিন্তু অস্পষ্ট ও

ছেলেমেয়েদের বাঁচাও—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু। এই সুলিখিত সাময়িক প্রবন্ধে, কি উপায়ে দেশের ছেলেমেয়েরা সবল হইয়া সমাজের বল বাড়াইয়া তুলিতে পারে তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কথাগুলি স্পষ্ট, সরল ও চিত্তাকর্ষক। তবে উপায়গুলি সর্ব্বত্র সহজ নহে। আমাদের মনে হয়, যে উপায়গুলি সহজেই অবলম্বন করা যায়, তাহাই আরও বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলে ভাল হইত।

ভোল্টা শতবার্ষিকী—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা। বিখ্যাত তড়িদ্‌বিজ্ঞানবিৎ আলেস্যান্‌ড্রো ভোল্‌টার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য শতবর্ষের পর বিগত সেপ্টেম্বর মাসের ১১ই তারিখে একটি বিরাট আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সভা আহূত হয়। এই সভার বর্ণনা ও ভোল্টার জীবনী আলোচনাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইহা সুলিখিত, বিবিধ জ্ঞাতব্যে পরিপূর্ণ—রচনা সুন্দর, ও বিষয় চিত্তাকর্ষক।

স্বরাজের আবশ্যকতা ও আমাদের যোগ্যতা—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। লেখক বলিতে চান, স্বরাজ ব্যতীত আমরা প্রকৃত মানুষ হইতে পারি না। স্বরাজের যোগ্যতাও আমাদের আছে একথা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং আগামী সংখ্যায় এই আলোচনা শেষ করিবেন লিখিয়াছেন। লেখক যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই পুরাতন।

জীবনস্মৃতি—রম্যা রলাঁ। অপ্রকাশিত মূল ফরাসী হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ রম্যা রলাঁর জীবনস্মৃতি প্রকাশ করিতেছেন। রম্যাঁ রলাঁ্যা বাংলা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় ইহার অনুবাদ নিষেধ করিয়াছেন। রচনায় কাব্য ও দর্শনের সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

সত্তর বৎসর—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। পূর্ব্ববৎ সরস ও উপভোগ্য।

সাহিত্যরূপ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিবর বলেন, "সাহিত্যে যখন কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। * * * পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে। পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতর বিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি।" দেশবিদেশের নব নব রূপস্রষ্টার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সাহিত্যের যুগ বলতে কি বোঝায় সেটা বোঝাপাড়া করবার সময় এসেছে। কয়লার খনি বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? * * আজকের দিনের বারো আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হ'লেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হয় না—কেননা তার পনেরো আনাই হবে অসাহিত্য। * * * কোনো একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে কখনো হয়নি সেই জন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হোলো সেও অসঙ্গত। * * * যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।" সাহিত্যে সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে লেখক বলেন "য়ুরোপে সাহিত্যের সব ঘরই প্রব্লেমের ভাণ্ডারঘর হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে, তাই প্রতিদিনই দেখ্‌চি সাহিত্যে রূপের মূল্যটা গৌণ হয়ে আস্‌চে। কিন্তু এটা একটা ক্ষণকালীন অবস্থা।" এই কথাগুলি লেখক সুন্দর সরস ভাষায় নানা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। আধুনিক 'তরুণ' সাহিত্যিকদের কথার জবাবটি বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় কতকগুলি কথা উপেক্ষিত হইলেই ভাল হইত।

উপদ্বীপের পথে—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

মাসিক বসুমতী—চৈত্র।

সংস্কৃত সাহিত্য—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এবারে রাম ও বালীবধের কথা। লেখকের সিদ্ধান্তগুলি সর্ব্বত্র সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। রামচন্দ্রকে লেখক একটু নূতন ভাবেই গড়িতেছেন। কষ্টকল্পনার সাহায্যও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

কবি রাজশেখর—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।

রাজশেখরকৃত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থ হইতে লেখক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতীচ্য ভাষার সমালোচনপদ্ধতি যে কেবল প্রতীচীরই নিজস্ব সম্পত্তি তাহা নয়, প্রতীচির নবযুগের বহু পূর্ব্বে, তাহা এ দেশেও অনুশীলিত হইত। রচনা সম্পাদকমহাশয় বড়ই অল্পমাত্রায় প্রকাশ করিতেছেন।

আধুনিক কালের উপযোগী ভারত স্থাপত্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখক আধুনিক কালে গৃহাদি নির্ম্মাণে প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের প্রচলন করিতে চান। যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় সে জন্য তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেও প্রস্তুত। এ বিষয়ে আরও আলোচনা আবশ্যক। বিষয়টি জনপ্রিয় করিতে হইবে।

কালিদাস ও শূদ্রকের প্রাচীনত্ব নিরূপণ—শ্রীমতী কিরণবালা কাব্য-সাংখ্যতীর্থ, পুরাণশাস্ত্রী। লেখিকা বলেন শূদ্রক অপেক্ষা কালিদাস প্রাচীনতর হইতে পারেন। কিন্তু তিনি যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন

তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সাহিত্যহিসাবে মৃচ্ছকটিকের সুবিচারও করা হয় নাই। নীতিশাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের বিচার সকল সকল সময়ে করা চলে না। শূদ্রককে লেখিকা কুকবি বলিয়াছেন। আমরা একথা কোনমতেই স্বীকার করিতে পারি না। শূদ্রককে কালিদাসের নীচে স্থান দেওয়া এত সহজসাধ্য নয়।

পুরাতন বিচার চিত্র—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রায় এগার শত বৎসর পূর্ব্বের বিচারচিত্র—আমাদের দেশের নহে—সুদূর ইরাণের। ধর্ম্মের নামে কত অত্যাচার এ দেশে ঘটিয়াছে তাহাই প্রদর্শন করা লেখকের উদ্দেশ্য। বিষয় চিত্তাকর্ষক, কিন্তু রচনাভঙ্গী সেরূপ নয়।

নবসাহিত্যের আগমন—বীরবল। নবসাহিত্যের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া যাঁহারা রবীন্দ্র সাহিত্যকে দূর করিতে চান তাঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া বীরবল এই সরস প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। লিখনভঙ্গী লেখকের নিজস্ব—পাঠকমাত্রেই তাহা উপভোগ করিবেন।

সাহিত্যের মানহানির মামলার বিচার—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ। রবীন্দ্রনাথ ও নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিকবৃন্দকে লইয়া এই রসরচনার অবতারণা।

জেরুসালেমে—শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ। লেখক জেরুসালেম সমন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোথা হইতে এই সব কথা সংকলিত হইয়াছে তাহা লেখক জানাইয়া দেন নাই। ঋণ স্বীকার করিতে এতটা পশ্চাৎপদ কেন?

পাখী—মার্কিন দেশের কয়েকটি পাখীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তাহাদের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় কোথা হইতে গৃহীত তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতে নারীর সম্মান—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। নানা গ্রন্থ হইতে লেখক প্রমাণ করিতে চান, প্রাচীন ভারতে নারীর যথেষ্ট সম্মান ছিল। এ সব আলোচনা অনেক হইয়াছে। এখন বর্ত্তমানের কথা আমরা শুনিতে চাই।

বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ ও প্রতীকারের উপায়—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এই আলোচনায় লেখক সম্প্রতি স্যার উইলিয়ম উইলকক্স সাহেব বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-হানি ও উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসের যে সকল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই সহজ সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালার অনেক নদীই প্রকৃত নদী নয়—কাটা খাল মাত্র। এ গুলিকে বহমান রাখিলে ও বানের সময় জলধারা ভূমি ধৌত হইতে পাইলে বাঙ্গালা দেশ আবার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া পাইবে। দামোদরের ও অন্যান্য নদীর বাঁধ মুক্ত করিয়া অথবা যাহাতে ঐ সকল বাঁধের ভিতর দিয়া অবাধে জল প্রবেশ করিতে পারে তাহার পথ রাখিয়া দেওয়া উচিত ও 'গঙ্গার রক্তিম জল যাহাতে বর্ষা-বারির সহিত মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র বিসর্পিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।' এরূপ হইতে পাইলে দেশের উন্নতি

ভারতবর্ষ—বৈশাখ।

শ্রীমতী আশালতা দেবীর 'নারী' পাঠ করিয়া আশান্বিত হইলাম। অধুনা নারী-সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা উঠিয়াছে লেখিকা তাহা বেশ চিন্তা-শীলতার সহিত সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদুষী লেখিকা পর-মুখাপেক্ষী পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিতা আজকালকার লেখিকাদের মত একদেশদর্শী না হইয়া, বেশ সংযত ও ধীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। নারীত্বের ভারতীয় আদর্শ কোথাও তাঁহার হস্তে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার মতে 'নারীর কাজ তার গৃহকে তার অস্তিত্বকে স্বজন এবং প্রতিবেশীর সহিত বহুধা বিভক্ত জটিল সম্বন্ধকে সুন্দর কোমল করে রাখা।' যাঁহারা বলেন নারী সৃষ্টি করিতে পারিবে না, তাঁহাদের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, 'শিক্ষার বহু প্রসারের সহিত নারীর outlook দেশ কাল পাত্রের গণ্ডী ছাড়াইয়া যদি 'বিশ্বমানবের আদর্শের সহিত পরিচিত হয়' তাহা হইলে নারীর দ্বারা অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইতে পারিবে; নারী-করে organize করিবার শক্তিও জাগিবে।' আর একটী বড় সত্য লেখিকা বলিয়াছেন "স্ত্রী-লোকের morality তার sexual moralityর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে রয়েচে।"

শ্রীযুক্ত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের 'সিংহল দ্বীপ' সুলিখিত, বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বি-এ সাহেবের 'ফরিদপুর জেলার মেয়েলী গানে' ১২টি গান সংগৃহীত হইয়াছে। লেখকের "মতে এই গানগুলি কোন্ সময়ের রচনা তা ঠিক করা মুস্কিল। তবে এটা সত্য যে, ইহা মুসলমান প্রভাবের বা তার পরের সময়কার। গানগুলির ভাষা অতি সহজ ও সরল, লীলাভঙ্গী মনোহর ও চমৎকার, expression বেশ সুন্দর।" এরূপ পল্লীগীতি সংগ্রহ যতই অধিক হইবে, ততই ভাষার সম্পদ বর্দ্ধিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্নের 'মধ্য ভারতে কয়েক দিন' প্রবন্ধে ছত্রপুরের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনভঙ্গী ভাল। এই সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'দক্ষিণে' পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এবারে তাঞ্জোর ত্রিচিনপল্লীর কথা চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপের কথা' সচিত্র সঙ্কলিত প্রবন্ধ, অষ্ট্রেলেশিয়ার ফিজি প্রভৃতি দ্বীপের কথা বেশ মনোজ্ঞ ভাবে সরস করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রের 'তুক গীতি' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম।

তুক্ক বা তুক মনোহরসাহী কীর্ত্তন গানের একটী অঙ্গ। লেখকের কথায় বলি, "আখর যেমন মূল পদের ভাবের পরিপোষক রূপে শ্রোতৃবর্গকে তাহার ভাব গ্রহণ, আস্বাদন ও অনুভব করিবার পক্ষে সহায়তা করে, তুক্ক গানের ক্রিয়াও প্রায় তদ্রূপ—তবে 'আখর' গদ্যে বা ভাষা কথায়, আর তুক্ক ছন্দোবদ্ধ গাথায় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক বা কবিতায়।" তুক্ক গানে ভণিতা থাকে না, সুতরাং এগুলি কাহার দ্বারা রচিত তাহা জানিবার উপায় নাই। বাস্তবিকই এগুলি অমূল্য রত্নকণা। এ গুলির উদ্ধার করিয়া লেখক বঙ্গভাষা-ভাষীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

বিচিত্রা—বৈশাখ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পল্লিপ্রকৃতি' প্রবন্ধে 'সহর' ও 'পল্লীর' বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া বলিয়াছেন, "নবাবী আমলে দেখা গেছে তখনকার বড়ো বড়ো আমলা যাঁরা রাজদরবারে রাজধানীতে পুষ্ট, জন্মগ্রামের সমাজ বন্ধনকে তাঁরা অনুরাগের সঙ্গে স্বীকার করতেন। তাঁরা অর্জ্জন করেছেন সহরে, ব্যয় করেচেন গ্রামে। মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিরে এসেচে—নইলে মাটি বন্ধ্যা মরু হয়ে যেত। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে যে প্রাণের ধারা সহরে চলে যাচ্চে, গ্রামের সঙ্গে তার দেনা পাওনার যোগ আর থাকচে না।' এই যোগ-সাধন করিবার উপায়ও সুন্দরদর্শী কবিবর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েচে—আজও এই দুটোকেই সহযোগিরূপে চাই।...বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েচে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনি সত্য যুগ আসবে।' বাস্তবিকই পল্লীগ্রামে গিয়া বিজ্ঞানের শক্তির সাহায্যে মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করিবার কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে। পল্লী-প্রকৃতিকে মুখর করিয়া তুলিতে হইবে—অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

এবারে 'ভানু সিংহের পত্রাবলী'তে মাত্র দুই খানি পত্র বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা-পারিপাট্য এ দুই খানিতে পরিলক্ষিত হইল না। ভাব কিংবা ঘটনার বৈশিষ্ট্যও নাই। সাদা-সিধা চিঠি।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবেই চলিতেছে। এবারে ফরাসী দেশের ও ফরাসী জাতির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ফরাসীরা যে বিশ্ব-চেতন, লেখক তাহা তাহাদের পথ-ঘাটের নাম হইতে দেখাইয়াছেন এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে দেশের মহাপুরুষদিগের নামে রাস্তা ও দেশের প্রতি অংশের নাম থাকায় যে সহায়তা করে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লেখক পরিশেষে বলিয়াছেন, 'স্বদেশকে চেনে বলেই তারা স্ব-বিশ্বকেও চিনতে পারে।'

শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্যের 'রূপক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের mysticism কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া কিরূপে পূর্ণায়ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আলোচনা আছে। লেখক বলিতে চান,—"রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণার আরম্ভ গীতাঞ্জলি অথবা নৈবেদ্যে নয়—তার বহু পূর্ব্বে রচিত 'কড়ি ও কোমলে'। শেষোক্ত কাব্যে দৈহিকতা আছে, আবার তার সহিত দেহকে অতিক্রম ক'রে মানসিক স্তরের ঊর্দ্ধে ওঠবার প্রয়াস আছে। পরবর্ত্তী কাব্যেও এই ভাব বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল কাব্যে পূর্ণ উপলব্ধির অভাব। পথের সন্ধান আছে—প্রাপ্তি নেই।" এই অভিব্যক্তির বিকাশ লেখক সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। রূপক কাব্যের প্রাণ কোথায়, তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'চিত্রা' ও 'বিচিত্রা'র রূপকের পার্থক্যও সরল ভাবে বুঝাইয়াছেন। উভয়ের প্রাণ-বস্তু যে এক তাহা দেখাইয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দুই প্রকার রূপককে, তিনি অনুভূতিদ্যোতক ও ভাবব্যঞ্জক রূপক আখ্যা দিয়াছেন। "ইংরাজীতে যাহাকে emotional symbol এবং intellectual symbol বলা চলে।" রূপকের প্রকার ভেদ ছাড়াও যে আকার ভেদ আছে তাহাও লেখক খণ্ড ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা কাব্যের ন্যায় সুন্দর, উচ্ছ্বাসময়। ভাষার সৌন্দর্য্য পাঠককে মুগ্ধ করে—কিন্তু ভাবের সন্ধান বড় দেয় না। বক্তব্য বিষয় আরও অল্প পরিসরের ভিতর দেওয়া যাইতে পারিত।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবীর যুগ্মরচনা 'চীনে হিন্দু-সাহিত্য' ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। পূর্ব্বের মতই জ্ঞাতব্য তথ্যেপূর্ণ।

শ্রীরামেন্দু দত্তের 'দোলের ছুটী' সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী এবারে শেষ হইল। রচনা বেশ প্রাঞ্জল, বর্ণন-ভঙ্গী মনোরম।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার 'টমাস হার্ডির উপন্যাস' প্রবন্ধে বলেন, হার্ডির জন্মস্থান ওয়সেক্সের প্রভাব তাঁহার রচনায় সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়েসেক্সের ঐ দুই প্রকৃতি যে তাঁহার রচিত অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার উপর কার্য্য করিয়াছে তাহা লেখক স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। হার্ডির অঙ্কিত চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বেশ সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসুর 'ভারতীয় মন্দিরের গঠন-বৈশিষ্ট্য' সচিত্র সংগ্রহ প্রবন্ধ। জানিবার বা শিখিবার তেমন কিছুই নাই। গোয়ালিয়রের তেলিকা মন্দির, ভুবনেশ্বর ও বুন্দেলখণ্ডের শিবমন্দির—ভারতের মন্দিরগুলির আদর্শ (type) বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরের গঠন শিল্পশাস্ত্রানুসারে কিরূপ হওয়া উচিত ও কিরূপ গঠিত হইয়াছে তাহার তুলনামূলক আলোচনা না করিলে কি ভারতীয় মন্দিরের গঠন-বৈশিষ্ট্য বুঝান যায়?

কথা সাহিত্য।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ।

উপন্যাসের উপসংহার (গল্প)—শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য। মাণিক বাবু কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। গল্পের মধ্যে বিশেষ নূতন কিছু না থাকিলেও, পুরাতনকে নূতন করিয়া বলিবার ক্ষমতাই গল্পলেখকের কৃতিত্ব। এই গল্পে মণিক বাবু সেই ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

মাসিক বসুমতী—চৈত্র।

রূপসী পল্লীবাসিনী—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। সৌরীন বাবু ফৌজদারী আদালতের উকীল ও প্রতিষ্ঠাবান্ কথাসাহিত্যিক। ফৌজদারী আদালতের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে এই গল্পের প্লট দিয়াছে। তাঁহার পাকা হাতের তুলিকাপাতে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

'পরাজয়' গল্প শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রচিত,—দীর্ঘ ৩১ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ইহাকে গল্প না বলিয়া একখানি অসমাপ্ত উপন্যাসও বলা যায়। প্রথমাংশ পড়িলে মনে হয়—ইহা পল্লী-সংস্কারের উপর একটি সুলিখিত প্রবন্ধ। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্য দান করা যায় লেখক তাহারই একটি পন্থা গল্পের মধ্য দিয়া কৌশলে নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শেষের দিকটা আমাদের ভালই লাগিয়াছে; উদ্ধৃত অংশগুলি মনের মধ্যে পুরাতনের মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। হেমেন্দ্রবাবু প্রবীণ লেখক—হিন্দু সতী নারী চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, সেরূপ আজ-কাল বড় একটা দেখা যায় না। কেমন করিয়া হিন্দু সতী বিধবারা তাঁহাদের জীবন সংযম ও পবিত্রতার মধ্য দিয়া পরিচালন করিয়া ধীরে ধীরে দেবীত্ব লাভ করেন, তাহার আদর্শ চিত্র পিসীমা ও তাঁহার পুত্র-বধূর মধ্যে দিয়া উজ্জ্বল ভাবে ফুটাইয়াছেন। কিন্তু রচনার মধ্যে প্রবন্ধের ভাষা অনেক স্থলে আখ্যায়িকাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর প্রমাণের নজীর ইত্যাদিও রচনাকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। গল্প বা উপন্যাসে ঘটনার স্বচ্ছন্দ-গতি, ভাষার-লালিত্য ও মাধুর্য্য ইহার মধ্যে বেশী নাই।

রমা—শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী। প্লটের মধ্যে নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও, লিখিবার ধরণটি ভাল।

বর্ত্তমান—শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ। 'বর্ত্তমান' বর্ত্তমানের কবি "সবুজদলের অন্যতম অগ্রণী"। এরূপ কবির দল আজকালকার দিনে অনেক। লেখক কবির যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা বাস্তব। কিন্তু গল্পহিসাবে 'বর্ত্তমান' সাফল্যলাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লেখকের বর্ণনাকৌশল ভাল।

প্রবাসী—বৈশাখ।

তাজমহল—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার রায়। গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। স্বামীর সহস্র বিভীষিকা পূর্ণ বিশাল কর্ম্মজগতের মাঝে পড়িয়া, স্ত্রীর অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। লেখার কৌশল ও বর্ণনাভঙ্গী ভাল।

আম্মা—শ্রীমতী সীতা দেবী। মাদ্রাজী আয়ার বুকের গুপ্ত মাতৃ-স্নেহের ধারাটুকু লইয়াই এই গল্পের অবতারণা। গল্পটির মধ্যে প্লটের কোন বিশেষত্ব দেখিলাম না—পাকা হাতের লেখা বলিয়াও মনে হইল না।

বিচিত্রা—বৈশাখ।

কবির সাধনা—শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। গল্পের প্রথম দিকটা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে—কিন্তু শেষের দিকের 'ভূত-পর্ব্ব'টা রসহীন ভূতুড়ে ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নববৃন্দাবন—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্ম্মমূলক গল্প। কর্ণপুর স্ত্রী ও পুত্রের উপর্য্যুপরি মৃত্যুতে সংসারের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। সংসারের আর কোন বন্ধন নাই। পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি এক গ্রামে আসিয়া উঠিলেন। গ্রামে আসিয়া বুঝিলেন মহামারীর প্রাদুর্ভাবে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে—সৎকার করিবার মানুষ নাই। একটি বাড়ীর মধ্যে একটি কক্ষে গিয়া তিনি দেখিলেন, গৃহতলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে—মৃতদেহের পাশে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর শিশু খেলা করিতেছে। কর্ণপুর এই শিশুকে লইয়া আপন পৈতৃক ভিটায় ফিরিলেন এবং তাহাকে সম্বল করিয়া আবার পুরামাত্রায় সংসারী হইয়া উঠিলেন। ... ... বন্ধন এমনি করিয়া দৃঢ় হইয়া উঠিল। বালক নীলমণি বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত হইয়া উঠিল—শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সরে না, নিজের পুত্রের শোক কর্ণপুর ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন।... ... কর্ণপুর বালককে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন।.........মাধবেন্দ্রপুরীর উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন। বালক একমনে শান্তভাবে শুনিল। হঠাৎ এক দিন বালক ধরিয়া বসিল—বৃন্দাবন কোথায় বাবা? আমি বৃন্দাবনে যাব। বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে গ্রামান্তরে যাইবার কালে কর্ণপুর বলিলেন, "নীলু, চল আমরা বৃন্দাবনে যাই"...

উৎসাহে বালকের নিদ্রা বন্ধ হইল। গ্রামান্তরের মাঠে আসিয়া নীলু কর্ণপুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কৃষ্ণ কোথায় বাবা? কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান?"

কর্ণপুর নীলুকে পথের ধারে যাইয়া বলিলেন, "এইখানে বসে থাক, কৃষ্ণ এই পথে যাবেন। উঠে গেলে কিন্তু কিন্তু দেখতে পাবে না।" ......যখন কর্ণপুর ফিরিলেন নীলু বলিল, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে

বাবা ? এইমাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল নিয়ে এই পথ দিয়ে গেলেন।"...... প্রতিদিনই বালক এই কথা বলে। কর্ণপুরের মনে খট্‌কা লাগিল। একদিন কর্ণপুর বালকের সঙ্গে মাঠের ধারের নির্জ্জন পথে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বালক মহোল্লাসে বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখো বাবা ঐ গরুর দল"......কর্ণপুর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।--বিস্মিত হইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার কাণে গেল—এক দল গরুর সম্মিলিত পদশব্দ। কেহ যেন অদৃশ্য একদল গরুকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য বাঁশির তান তাহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিয়া চলিয়াছে। অপূর্ব্ব মধুর তান। কর্ণপুরের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শেষের দিকটা পড়িবার সময় সত্যই শরীর শিহরিয়া উঠে।

কবিতা

প্রবাসী—বৈশাখ।

বিজয়ী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধরায় নব বসন্ত সমাগম চির-দিনই কবিচিত্তকে চঞ্চল করিয়া আসিতেছে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথও বহুবার বহু রকমে বসন্ত বর্ণনা করিয়াছেন--এবারও করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ এক হইলেও, একটি আর একটির ঠিক পুনরাবৃত্তি হয় নাই। এবার বসন্ত 'বিজয়ী' বীররূপে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ, তাঁর সমর-সজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র নূতন না হইলেও শাণিত ও কার্য্যক্ষম। এ ব্যাপারেও মহাকবি বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন।

বাসন্তী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেখানে রস তরল হইবার কথা সেখানে গাঢ় রসের পরিবেষণ করিয়া বিশ্ব-কবি পাঠককে অল্প পরিসরের মধ্যে অনেকখানি দান করিয়াছেন।

নারিকেল—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে কবি-গুরু নারিকেল গাছ দেখিয়া তাহার শুষ্ক নীরস শিকড়ের ও দীর্ঘ উন্নত দেহের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আশা করি এই 'শলাকায়' শিল্পদের চোখ খুলিবে ও অন্যান্য গাছেরও একটা কিনারা হইবে।

চিরাগত—শ্রীমতী অমিয়া দেবী। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লাবণ্য থাকিলেও প্রাণহীন বলিয়া একটি সমগ্র অখণ্ড সৌন্দর্য্যের অনুভূতি পাইলাম না।

দুঃখের কবি—শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার। 'দুঃখের কবি'র প্রতি 'সুখের কবি'র এই শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপে আমরা সুখী হইতে পারিলাম না। জগৎ সংসার নিছক দুঃখে ভরা এ কথা যেমন অতি-রঞ্জিত, তেমনি আবার জগৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখে ভরা এ কথাও অতি-শয়োক্তি দোষে দুষ্ট। বিশ্বে সুখ-দুঃখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সুখ-দুঃখ মানসিক অবস্থা, দর্শকের মনের অবস্থার উপরই নির্ভর করে। তাই যদি কেহ 'দুঃখ-বাদী' হ'ন তাহার উপর 'খাপ্পা' হইবার অধিকার কাহারও নাই। যদি কেহ গাহিয়া থাকেন—

অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
দিগন্ত পারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায় ?

বর্ত্তমান কবিতায় তাহার বেশ সদুত্তর পাওয়া যায়—

অথই দুঃখ-পাথারে ফুটেছে আনন্দ-শতদল।
অমানিশীথেও পূর্ণিমা সুখে উথলে সিন্ধু জল!
জ্বালা আর নেশা—বিষেরই ধর্ম্ম
দুঃখ-সুখের একই যে মর্ম্ম!
কবি চায় নেশা, জ্ঞানী ভয় পায় পাছে করে ফেলে ভুল,
বিষের জ্বালায় অকবি অধীর, কবি যে হরষাকুল!

সুখ-বাদী কবি 'দুঃখ-বাদী' কবিকে 'অকবি' বলিলেও আমরা এই রায় মাথা পাতিয়া লইতে পারিলাম না। দুঃখবাদী ও সুখবাদী দুই জনেই সত্য দর্শন করিয়াছেন কিন্তু আংশিক ভাবে। 'অন্ধের হস্তী-দর্শন' ন্যায়ের ফাঁকি মনে রাখিয়া কলম ধরিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। যাহা হউক সমালোচ্য কবিতাটিতে পদ-লালিত্য, রস-গাম্ভীর্য্য, ভাবৈশ্বর্য্য, রচনা-মাধুর্য্য প্রভৃতির একত্র সমাবেশ থাকায় ইহা সুখ-পাঠ্য হইয়াছে।

বিচিত্রা—বৈশাখ।

উদ্বোধন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শীতের অবসানে নব বসন্তো-দ্গমের অন্তর্নিহিত রহস্য-চিত্র অনুপম তুলিকায় অঙ্কিত। এ অন্তর্দৃষ্টি আজ-কাল বিশ্ব-কবির কৃপায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণের ভিতরও সঞ্চারিত হইয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছে। বড় আদর্শ থাকার ইহাই সার্থকতা।

কুটীরবাসী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাজমহলের শিল্পীর হাতে কৃষকের পর্ণ-কুটীর নির্ম্মিত হইলে কেমন দাঁড়ায় তাহারই নিদর্শন।

সংশয়—শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসু। পাঠান্তে পাঠকের মনে এইরূপ সংশয় জাগা বিচিত্র নয়—প্রশ্নকর্ত্তা কে? পৃষ্ট ব্যক্তিই বা কে? প্রশ্নই বা কি? আর কেনই বা প্রশ্ন? ইত্যাদি।

ভস্মের জন্ম কথা—শ্রীমতী লীলা দেবী। এই ভস্ম-লেপনে বিচিত্রার বৈচিত্র্য বাড়িলেও, বৈরাগ্যের সূচনা করিতেছে।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ।

লালাবাবুর দীক্ষা—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, কবিশেখর বি-এ। ঐশ্বর্য্য-ত্যাগীর মনে অলক্ষিতে ত্যাগের ঐশ্বর্য্যের বীজ নিহিত হয়—সাধকের সিদ্ধিলাভের পথে ইহা একটী বিষম অন্তরায়। লালাবাবুও

এ বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অনেক দান-খয়রাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সৎকার্য্যের ভিতরও তাঁহার মনে অভিমান ছিল। তিনি শেঠ-দিগকে প্রতিযোগী ভাবিতেন, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস করিতেন। দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিতেন, কিন্তু অভিমান ত্যাগ করিয়া কোন দিনও শেঠের মন্দিরে মাধুকরী করেন নাই। গুরু কৃষ্ণদাস তাঁহাকে প্রার্থিত দীক্ষা না দিয়া আত্ম-সংশোধনের অবকাশ দিলেন। লালাবাবু শেঠজীর মন্দিরে ভিক্ষা লইয়া অভিমান-মুক্ত হইলেন, গুরুও স্বয়ং আসিয়া দীক্ষা দিলেন। এই পরম রমণীয় বিষয়বস্তুটি ভক্ত-হৃদয়ের রস-মাধুর্য্যে ও কবি-শিল্পীর সঞ্জীবনী তুলিকা-স্পর্শে অপরূপ হইয়াছে।

আঁখি-জল—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ছন্দ, ভাব কবিত্ব সমস্ত আঁখি-জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

কাল-বোশেখীর ঝড়—শ্রীযুক্ত হরিধন মিত্র। এ বিষম ঝড়ে ছন্দের খুঁটি নড়িয়াছে, ভাবের মটকা উড়িয়াছে। কাজী সাহেবের 'মোক্তবে' এবকম পড়ো আর কটি জুটিয়াছে? শূন্য গোয়াল যে এর চেয়ে ভাল।

রহস্য—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ। কবি কুমুদরঞ্জনের কাছে আমরা যদি গভীর ও সুদূর প্রসারী চিন্তাসমন্বিত কাব্যের আশা করি তবে ব্যর্থমনোরথ হইব, এই ধারণাই ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। যার যা আছে সে তাই দিবে ইহাতে দাতার প্রতি গ্রহীতার অনুযোগের কারণ থাকিতে পারে না। কুমুদবাবু যা দেন তা বেশ মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া হাসি মুখেই দিয়া থাকেন, তাহাতে হয়ত পেট ভরে না, কিন্তু মনটী খুসী থাকে। আলোচ্য কবিতাটিতে কোন ঘোরাল 'রহস্য' নাই, খুব সোজা কথায় গোটাকতক সৃষ্টিরহস্যের উল্লেখ আছে মাত্র।

প্রতিকৃতি—শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য। মানুষ ভগবানেরই প্রতিকৃতি, কাজেই মানুষকে অমলিন থাকিতেই হইবে—এই সাধু সঙ্কল্প লইয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছে। আমরা আর কি বলিব, ভগবান কবির সহায় হউন।

ধ্রুবতারা—শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ। সুদূরের ধ্রুবতারার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কবি ছন্দ, যতি প্রভৃতি কাজের জিনিষের প্রতি দৃষ্টি হারা হইয়াছেন।

মাসিক বসুমতী—চৈত্র।

বসন্ত—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবার বিশ্ব-কবির হৃদয়-কাননে বসন্তের পূর্ণ আবির্ভাব। স্পর্শগুণে পাঠকের হৃদয়-কাননও বসন্তোৎসবে মুখরিত হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে অধিকারীভেদে আনন্দের তারতম্য ঘটিবে।

পিপীলিকা—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। গুণগ্রাহী কবি পিপীলিকার সদ্‌গুণাবলীর সরস বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পিপীলিকা যে দংশন করিয়া থাকে এ কথা তাঁর উদার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কবির মিঠে হাতে দংশনের জ্বালাও মোলায়েম হইয়া হয়ত উপভোগ্য হইত।

চৈতালি—শ্রীযুক্ত হরিপদ গুহ বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভারতী। মিষ্ট শব্দের সমষ্টিযুক্ত মামুলি রচনা। 'নটরাজ' ও 'তাণ্ডব' শব্দ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কবিগুরুর কৃপায় আজ-কাল এ দুটি শব্দের খুব চলন হইয়াছে।

মধুমাসে—ঐ। মৌলিকতা-বর্জ্জিত মামুলি রচনা। পুরাতন অলি-কুল মধুমাসে আর মধু পান না, নূতনেরা চেষ্টা করিয়াও কিছু বাহির করিতে পারেন না। তবু বছর বছর 'মধুমাস' আসিতে থাকিবে এবং তার উপর কবিতাও চলিবে!

রাজ-বন্দী—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। রাজবন্দীর দুঃখে বিগ-লিত হইয়া কবি কবিতাটিকে ছন্দোবন্ধন হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, কবির ভাবও এমন উধাও হইয়া ছুটিয়াছে যে সাধারণ পাঠকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কবির উপমা গুলি অনেক স্থলেই আমরা বুঝিতে পারি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন—

'যবনিকা ছিঁড়ে প'ল কাঠের সেউতি সোনা হ'ল
লজ্জাবতী লতার মত সাজা নিজেই শিহরিল'—

কোথা হইতে যবনিকা ছিঁড়িয়া পড়িল? যবনিকা ছিলই বা কোথায়? 'কাঠের সেউতি' কোথা হইতে আসিল? লজ্জাবতী লতার মত সাজার 'শিহরণ' অভিনব বটে!

রাত্রির যাত্রী—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। বাচ্যার্থের অন্তরালে যে ব্যঙ্গার্থ নিহিত আছে তাহাতেই কবিতাটি পরম উপাদেয় হইয়াছে। শব্দ-সন্নিবেশ, রচনা, ঝঙ্কার, সমস্তই কবির শিল্প-কুশলতার পরিচায়ক। শেষ লাইনটার মর্ম্ম ঠিক ধরিতে পারিলাম না—কবি যেখানে 'অদৃষ্টের জয়' ঘোষণা করিলেন, আমরা বুঝিয়াছিলাম সেখানে অদৃষ্টের পরাজয়ই ঘটিয়াছে।

লঘু গুরু—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। ছাত্র দলন চেষ্টার উপর কশাঘাত। কবি হৃদয়ের উদারতা ও শিক্ষক হৃদয়ের স্নেহপ্রবণতা কবিতাটিতে পরিস্ফুট; কিন্তু এইরূপ গুরুতর সমস্যা লইয়া 'ছড়া' কাটাইতে দেখিলে আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হই। আলোচ্য কবিতায় বিষয়ের গাম্ভীর্য্য কবি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শ্রীচৈতন্য—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পড়িয়া মহাপ্রভুর যে চিত্র ভক্ত পাঠকের মনে উদয় হয়, এই সুরচিত কবিতাটিতে অল্প পরিসরের ভিতর সেই চিত্রেরই আভাস পাওয়া যায়। কবিতাটিতে যে সমস্ত allusion আছে সেগুলি বিশদভাবে আলোচনা করিয়া কবিতাটি পড়িলে পাঠক শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপরূপ লীলার একটি মোটা-

মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারিবেন। রচনার লালিত্য, শব্দ-যোজনার পরিপাট্য প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিষয় বস্তুর গুণেই কবিতাটি পাঠক মাত্রেরই অধীতব্য।

বিদায় প্রার্থনা—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী। বিশেষ কিছুই নাই। তবুও নবীন কবিকে এরি মধ্যে বিদায় দিবার ইচ্ছা আমরা করি না। কবির এ দরখাস্ত নামঞ্জুর।

বঙ্গনারী—কুমারী সিন্ধুবালা আতর্থী। বঙ্গনারীর দুর্দ্দশা বর্ণনা।

চৈতী হাওয়ায়—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায়। বিরহিণীর চিত্ত হঠাৎ 'চৈতী হাওয়ায়' একটু দোল খাইয়াছে। এ রকম ত বরাবরই হইয়া থাকে।

সন্ধ্যা—৺মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। সন্ধ্যার মতই শান্ত, স্নিগ্ধ ও করুণ। প্রকৃতির বুকে যে তুলিকাপাতে সন্ধ্যা-চিত্র ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে, সেই তুলিকাই কবির হস্তে আসিয়া এ আলেখ্য রচনা করিয়াছে।

দর্শন

মাসিক বসুমতী—চৈত্র।

আত্মপ্রসারণ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীতে শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়, নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে হইলে কি আদর্শে করা উচিত, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। "মনে রাখিতে হইবে—ভগবানের এমনই বিধান যে, স্বার্থ ও পরার্থে মেলামেশা করিয়া লইতে হইবে।......কোটি কোটি মানব, অগণ্য জীবজন্তু তাঁহার বিশ্বরাজ্যের অধিবাসী। কাযেই সকলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ, তোমার স্বার্থে সকলের স্বার্থ। সকলকে তোমার জন্য ভাবিতে হইবে, তোমাকে সকলের জন্য ভাবিতে হইবে।......এইটার নাম আত্মপ্রসারণ।" ইহাই সকল নীত্যধর্ম্মের মূল। ইহাকেই সমবেদনা বলে। ভগবানের ভালবাসা পাইতে হইলে, তাঁহার যথার্থ উপাসক হইতে হইলে, আমাদের আত্মপ্রসারণের সাধক হইতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, এই আত্মপ্রসারণতত্ত্ব শুধু এদেশের জন্য নহে, সকল দেশে সকল যুগেই এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। ঈশা, বুদ্ধ এই সত্যই বিলাইয়াছেন। উপনিষদে ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কথা আছে; পাশ্চাত্য দার্শনিক-প্রবর হেগেলেও বলিয়া গিয়াছেন—Die to live.

ভারতবর্ষ—বৈশাখ।

বর্ণধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত এম্-এ।

বর্ণধর্ম্মের মৌলিক অর্থ এই যে, যে কোনও ব্যক্তিকে জীবিকার জন্য তাহার পৈতৃক কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে। যেমন ধোপার পুত্র ধোপার কার্য্য দ্বারা এবং অধ্যাপকের পুত্র অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে। লেখক দেখাইয়াছেন যে, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্ম্মযোগের কথা আছে, তাহা এই মৌলিক অর্থে গৃহীত বর্ণধর্ম্মের কথা। ইহার ফলে এই হয় যে, মানুষ যে-যাহার পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে—অপরের জীবিকায় হাত দেওয়ার লোভ থাকে না। অপরেরও তাহার স্বীয় জীবিকার গাত্রে অপর কর্ত্তৃক হাত দেওয়ার আশঙ্কা থাকে না। জীবিকার জন্য অর্জ্জনের একটা গণ্ডী পড়ায় অজ্ঞানীর এবং লোভীরও সমাজে অসাম্য উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

লেখকবর্ণিত গীতার এই বর্ণধর্ম্মের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও হইতে পারে। প্রচলিত গীতার ব্যাখ্যা সমূহেও এইরূপ অর্থ ই দেখিয়াছি। একস্থলে আমাদের একটু সমস্যা রহিয়া গেল।—লেখক প্রথমেই বলিয়াছেন, বর্ণধর্ম্ম অর্থে জাতিভেদ বলিলে ভুল বোঝা হইবে; আবার শেষে বলিতেছেন, "অধুনা যে ভাবে জাতিভেদ প্রচলিত, তাহা সংশোধন করা আবশ্যক; এবং তাহার পরিবর্ত্তে গীতায় উক্ত বর্ণধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মে গ্লানি দূর হইবে।" জাতিভেদ প্রথা লেখক-বর্ণিত বর্ণধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কেমন করিয়া সংশোধন হইবে বুঝিতে পারিলাম না; আবার লেখক-বর্ণিত বর্ণধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মের গ্লানিই বা কেমন করিয়া দূরীভূত হইবে, তাহাও বোধগম্য হইল না।

বিজ্ঞান

মাসিক বসুমতী—চৈত্র।

'নূতনতার ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র কয়েকটী নূতন তারার আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বিদেশী অনেক মান-মন্দিরের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া গেল। আমাদের দেশে ২।১টী মান-মন্দির আছে। তাহাদের কার্য্যের বিবরণ মোটামুটি ভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত সুখদাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'বিহু নাচ' নামক প্রবন্ধে আসামে প্রচলিত এক নৃত্যের বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। 'আসামীদের বিহু নাচ, চৈত্র-সংক্রান্তির দিন দশ পনর পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয় ও সংক্রান্তির পরও দশ পনর দিন চলিয়া থাকে।' প্রবন্ধটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে প্রবন্ধলেখক মহাশয় এই নাচের উৎপত্তি, বিস্তৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিবেন।

শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্তের 'দেশলাই-শিল্প' তাঁহার লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই।

'পাখী' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ মহাশয়

মার্কিন-দেশীয় কতিপয় পক্ষীর সচিত্র বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন ও আমাদের দেশের বিজ্ঞানবিদ্‌গণকে পক্ষিজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে আমাদের দেশের পক্ষীসম্বন্ধেও কিছু গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ Fauna of British India পর্য্যায়ভুক্ত পুস্তকগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে)। সরোজবাবু যদি এই সমস্ত গ্রন্থাদি ঘাঁটিয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, তবে সাধারণের অনেক উপকার হইতে পারে। মার্কিনদেশীয় পাখীর বিবরণে আমাদের কোনও লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রকৃতি—বসন্ত সংখ্যা ১৩৩৪।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্রের 'পাটনার বৃক্ষ-পূজা' নামক প্রবন্ধ নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখকমহাশয়ের গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের 'নৃ-তত্ত্ব' সম্বন্ধীয়, অনেক প্রবন্ধ নানা ইংরেজী পত্রিকাতে বাহির হইয়াছে। সুখের বিষয় যে, নৃ-তত্ত্বের যে বিভাগে তিনি বিশেষজ্ঞ, সেই বিভাগ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষাতেও সময়ে সময়ে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বরহম নামক উপদেবতা বিশেষের 'অবস্থান' এক অশ্বত্থ বৃক্ষের ও সেই বৃক্ষের মূল-স্থিত মৃত্তিকা-স্তূপের পূজার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের বোধ হয় জানা নাই যে, Indian Civil Service প্রভৃতি পরীক্ষাতে নৃ-তত্ত্ব একটী পাঠ্য-বিষয়-রূপে পরিগণিত।

'আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের নূতন একটা দিক' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় প্ল্যাঙ্কের quantum theoryর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় আলোক-সম্বন্ধে quantumবাদের কথা ইতিপূর্ব্বে 'প্রকৃতিতে'ই বাহির হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোনও আবশ্যকতা ছিল না।

'পৃথিবীর অসভ্য জাতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠান' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোনও বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সাধারণ মাসিক পত্রিকাতে এইরূপ প্রবন্ধ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়। 'প্রকৃতি' ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকার মধ্যে উদ্দেশ্যের বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া আমার মনে করি। সুতরাং অন্যান্য পত্রিকাতে যাহা যাইতে পারে, তাহা 'প্রকৃতি'তে সব সময়ে যাইতে পারে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় 'গোল আলু' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'বর্ষাকালে আলু পচিয়া অযথা নষ্ট হয়।...... এই জন্য এক বৎসর গ্রীষ্মকালে ডাল্‌না ও ভাজার উপযোগী ভাবে কুটাইয়া আলুর টুক্‌রাগুলিকে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রক্ষা করি। শরৎকালে মানকচু ভাজার ন্যায়, আলু ভাজাগুলি সুস্বাদু হইলেও সিদ্ধ না হওয়ায় ডাল্‌না খাইতে পারি নাই। সেই হেতু পচিবার উপক্রম বুঝিলেই আলুগুলিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে কাটিয়া শুকাইয়া লই। কিন্তু এ উপায়টি অবশ্যই উৎকৃষ্ট নহে,—মন্দের ভাল মাত্র।' বাঁধা কপি প্রভৃতিও এই ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটি প্রবন্ধই ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

সম্পাদক মহাশয়ের 'হংস' বর্ণনা ও চিত্রে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশ গুপ্তের 'বিহঙ্গ-প্রেমিক উইলিয়াম্ ক্রুটার' পাঠে সকলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন।'

চিত্র

আমাদের এক বন্ধু সেদিন বলিলেন, "ওহে তোমাদের চোখ নেই, ছবি দেখতে জান না, তোমাদের সমালোচনায় আবার দাম কি?" কথাটার মধ্যে যে একটা খাঁটি সত্য আছে, বন্ধু সেটা লক্ষ্য করেন নাই, করিলে তিনি অন্য ভাষায় তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করিতেন নিশ্চয়।

আমাদের চোখ নাই বলিয়াই আজকাল মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছবির নামে যা-খুসি তাই ছাপা হইতেছে। চোখ নাই বলিয়াই আজ বাঙ্গালা দেশে খাঁটির পরিবর্ত্তে ঘোর মেকির চলন হইয়াছে। এমন কি আমরা ভেজাল অবধি বর্জ্জন করিয়াছি। অবশ্য বর্জ্জন করাটা হাল ফ্যাসন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভেজালের মধ্যে অন্ততঃ আংশিক পরিমাণেও খাঁটির অস্তিত্ব থাকে। মেকিতে তার কিছুই নাই। উদাহরণ দিতে পারি; খাঁটি ঘৃতের বদলে একেবারে ভেজিটেবল ঘী, চর্ব্বির ভেজালও নয়। মাসিকের সম্পাদকগণ যে আমাদের খাঁটির বদলে নিতান্ত মেকি দেখাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ দিতে পারি না। আমাদের যখন চোখই নাই, তখন আসল কি মেকি তাহা বুঝিব কেমন করিয়া? এমন কি সম্পাদকগণই বা বুঝিবেন কেমন করিয়া? ওদিকে মাসের পরে মাস কয়েকখানি তিন বর্ণের ছবি না ছাপিলে কাগজের কাটতি কমিয়া যাইবে। সুতরাং সমস্যার সমাধান হয়ত অসম্ভব। আমাদের নবকুমার খুড়ো একটি গান গাহিতেন—

আমি স্বপ্নে মাণিক পেয়েছিলেম এ-এ-এম্,
জেগে দেখি মাটি,
লাখ শ টাকায় আন্‌লাম কিনে—এ—এ
সোণার পাথর বাটি।

খুড়োকে এই সঙ্গীত-রূপ হেঁয়ালির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার ছানাবড়া-রূপ চক্ষু দুইটি ঘুরাইয়া বলিতেন—"একটু মস্তিষ্ক চালনা কর হে বাপু; ওর অর্থ হচ্চে এই যে, স্বপ্নে মাণিক পেতে হলে গতর খাটাতে হয় না, সুতরাং জেগে মাটি পাবে না ত কি রাজকন্যে আর আদ্দেক রাজত্বি পাবে? আর টেঁকে লাখ শ টাকাও যেমন আছে, পাথর বাটিও তেমনি সোণার হয়েছে।" আসল কথা এই যে আমরা

ীম, ঘুমাইয়া আছি, সুতরাং মেকি চলিবার অবকাশ হইয়াছে। : মূল্য (অর্থাৎ মূল্যের মত মূল্য) দিয়া যদি ছবি ছাপিবার সম্ব নিতে হইত, তবে সম্পাদকগণ তাহা অবশ্যই চালাইয়া লইতেন। ারা স্বগ্রামেই পৌঁছাই নাই, স্বদেশ এখনও বহু দূরে।

চিত্রা—বৈশাখ।

আলো ও ছায়া, তিন বর্ণের—শিল্পী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র। ছবি নির অর্থ জীবন ও মৃত্যু, অথবা নিদ্রা ও জাগরণ তাহা বুঝিতে রিলাম না। ইহাও ধারণা করা কঠিন যে কোন্ আদর্শে উহা ঙ্কিত হইয়াছে। বাস্তবের দিক অনেকটা আছে, কিন্তু আলঙ্কারিক কটাও কম নয়। ইহাঁকে বাধ্য হইয়া সঙ্কর জাতির মধ্যে ফেলিতে ল। পরে সঙ্করের যে দশা ইহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটে। মিত্র হাশয়কে একটু এনাটমি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি—যদি তিনি াস্তবের আদর্শ ধরিয়া সাফল্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। যদি ালঙ্কারিক ছবি আঁকা তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তবে decoration-এর মূল ত্রেগুলির অনুসন্ধান করুন। জাপানী চিত্রে, আমাদের দেশের অতি প্রাচীন এবং প্রাচীন চিত্রে, স্থপতি বিদ্যায় ইহার অনেক নিদর্শন পাইবেন। ভারতীয় স্থপতি এবং সুকুমার কলা সম্বন্ধীয় পুস্তক ইত্যাদি অন্য কোথাও না পাওয়া গেলে, মিউজিয়মে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন।

ছবিখানিতে বাস্তবের ছাপ অনেক পরিমাণে আছে। কিন্তু জাগ্রত রমণীর মস্তক, অবয়ব, হাত ইত্যাদির আপেক্ষিক পরিমাণ (fore-shortening স্বত্বেও) কোথাও ঠিক নাই। নিদ্রিত রমণীর অবস্থাও তাহাই প্রায়, তবে তাহার মস্তক এবং দেহের উপর অংশের কতকটা মাপ ঠিক আছে—উহা বোধ হয় শিল্পীর অজ্ঞানকৃত। সন্তান দুইটির এনাটমি আরও ভুল। শিশু দেহের পরিমাণ যে অন্য প্রকার, শিল্পীর তাহা জানা আবশ্যক। মিত্র মহাশয়ের শিশু দুইটিকে চশমা এবং কাপড় পরাইয়া গোলদীঘির ধারে ছাড়িয়া দিলে তাহারা আধুনিক কলেজের ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

আমাদের স্থানাভাব স্বত্বেও একটু বিস্তৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা জানি যে একদল শিল্পী এবং তাঁহাদের ভক্তসঙ্ঘ বর্ত্তমান, যাঁহারা এক কথায় আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। তাঁহারা বলিবেন, "মাপ কাটি দিয়ে কি আর্ট বোঝা যায়, মশায়? ওটা বুঝ্‌তে হ'লে অন্তর, মন, কল্পনা, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য ইত্যাদির জ্ঞান থাকা চাই।" তাঁহাদিগের নিকট আমাদের করযোড়ে এই নিবেদন, "আর্টের উৎপত্তি ঐ মাপকাটি থেকেই হয়েছিল, এবং এই খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও সেটার পরিবর্ত্তন হয়নি। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যথেচ্ছাচার স্থিরবুদ্ধি সৌন্দর্য্যস্রষ্টার আশ্রয় নয়, ওটা বাতুলের আশ্রয়।"

মাসিক বসুমতী—চৈত্র।

শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তের তিন রঙের ছবি, শিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইঁহার কিছু রংয়ের জ্ঞান আছে, এনাটমি, কম্পোজিসন ভাব প্রভৃতির অভাব। রাজা দুষ্মন্তকে দেখিয়া থিয়েটারের ষ্টেজে আমাদের অন্যতম শিল্পী শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীকে মনে পড়িল—বহু শতাব্দী পূর্ব্বেকার একজন রাজাকে নহে। শকুন্তলার বিষয় উল্লেখই করিলাম না।

চিত্রাঙ্গদা. তিন বর্ণের ছবি, শিল্পী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী। ছবির বিষয় এই :—

"নয়নের দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে,
কেড়ে নিতে আসিছে আমায়।"

আমরা যোগ করিতে পারি :—

কথায় লিখিত যাহা, ছবিতে দাগিতে তাহা,
কাঠ খড় বহু লেগে যায়।"

ভারতবর্ষ—বৈশাখ।

গল্পলোকের রাজকুমারী—তিনবর্ণের ছবি, শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আহা, রাজকুমারীর গল্পে লোকে বাস করাই ত উচিত ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইঁহাকে নরলোকে আনিয়া আমাদের নেশা যে ভাঙ্গিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করি আমরা তাঁহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? আলঙ্কারিকের সঙ্গে বাস্তবের ছাপ আদপেই খাপ খায় নাই। অপিচ নৈপুণ্য (technique) পদার্থটা আর্ট সৃষ্টির অস্ত্রবিশেষ। পার্থের পাশুপত অস্ত্রলাভের ন্যায় শিল্পীরও তপস্যার আবশ্যক।

প্রবুদ্ধ গৌতমের বুদ্ধ-চেতনা—তিন বর্ণের ছবি, শিল্পী—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য। আইডিয়া ভাল। আর কিছুই নাই। এরূপ ছবির প্রাণ কম্পোজিসনে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার অনুশীলন করুন। সঙ্গে সঙ্গে এনাটমিরও চর্চ্চা করুন। আসল কথা এই যে, "লাইফ" থেকে ড্রয়িং মক্স না করিলে সাফল্য-লাভ অসম্ভব।

খাতক, তিন বর্ণের ছবি,—শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল বন্দ্যো-পাধ্যায়। প্রাচ্যকলানুমোদিত এই ছবিখানি ভাল বলিতে পারি। চোখ এবং অধরৌষ্ঠের ভাব আরও একটু স্পষ্ট হইলে সামঞ্জস্য থাকিত।

কবি—তিন বর্ণের ছবি, শিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ। মুণ্ডের সহিত অবয়বের পরিমাণ ঠিক না থাকিলেও, ছবিখানি বৃদ্ধের ছবি হিসাবে ভাল বলা যায়। কবি কিনা সন্দেহ। হিসাবের পাতায় ভুল করিয়া সুদখোর চিন্তিত হইয়াছে, এ কথাও মনে করিতে আটক নাই।

নন্দদার ডায়েরির লেখক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনুষঙ্গিক রেখা চিত্রগুলিরও রচয়িতা। তাঁহাকে পুরাতন ষ্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন গুলি

খুলিয়া জেকব্‌স্‌ লিখিত গল্পগুলির সহিত উইল্‌ওয়েল লিখিত ছবিগুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি।

প্রবাসী—বৈশাখ।

প্রচ্ছদপটের ছবিখানি তিন বর্ণের, আলঙ্কারিক। শিল্পীর নাম দেখিলাম "দেবীপ্রসাদ"। বিলাতী গন্ধ বর্ত্তমানেও ছবিখানি উৎকৃষ্ট। রেখা, বর্ণ, ভাব কল্পনা, নৈপুণ্য সবই আছে। "প্রবাসী" কথাটা লেখা না থাকিলে ঘরে টাঙাইয়া, অন্ততঃ খাতায় আঁটিয়া রাখিতাম।

বুদ্ধ, তিন বর্ণের, শিল্পী শ্রীমতী গৌরীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণী। ভাল হইয়াছে।

গরুড়ের সুধাভাণ্ড হরণ, তিন বর্ণের। শিল্পী শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা। ছবিখানি ভাল। ভাব ও গতি আছে। নৈপুণ্য (technique) আরও চাই। জলের রংয়ের স্বচ্ছতা নষ্ট হইলে ছবি কঠোর হইয়া পড়ে। এ জাতীয় ছবির মূল পদার্থটি বাদে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির ম্লান কল্পনা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক। জাপানী এবং চীনে চিত্র দর্শনীয়।

কাঁটার ব্যথা

একটি চিকণ কাঁটা তোমার মাথার
খোঁপা হোতে কাল রাতে নিয়েছিনু খুলে,
সারানিশি বিঁধেছিল দুখে সে আমার
আকুল কাতর বুক, পশি হৃদি-মূলে ;
ফিরায়ে দিয়াছি তাই তাহারে সকালে,
আবার তোমারে সখি ; ভেবেছিনু মনে
তোমার কাঁটাকে যদি প্রেম-ইন্দ্রজালে
না পারি করিতে—ফুল, নিখিল ভুবনে
রটিবে কলঙ্ক মোর ; বেসেছ যে ভালো—
ম্লান হবে গর্ব্ব তার ; আজি জানিয়াছি
মর্ম্মন্তুদ মিথ্যা ইহা, করিয়াছ কালো
পেলব হৃদয় তব, অনুরাগ যাচি
নির্ব্বিচারে যারে তারে ; বল্লভী কঠোর !
ও কাঁটা তাদেরি দিয়ো, কাঁটা যারা মোর।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

"মতিয়া"

(গল্প)

"দেখ্‌, রেণু, ওরা ওদিকে কত বড় একটা নালা খুঁড়ছে। ওখানটায় কত জল উঠেছে না জানি। চল্‌, চল্‌, দেখিগে গিয়ে,"—শিশু ভাগিনেয়ীর চম্পক কলির মত কচি কচি আঙুলগুলি ধরিয়া শৈলেশচন্দ্র প্রফুল্ল মনে শিস দিতে দিতে বালুকা রাশির উপর দিয়া অগ্রসর হইল। তাহার লম্বা লম্বা পা ফেলার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মাত্র সাত বৎসরের রেণুও আগ্রহভরে সানন্দে ছুটিয়া চলিল। রেণুর পোষা কুকুর 'জলি'টাও লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাহাদের অনুগমন করিল।

সম্মুখে পশ্চাতে যতদূর চক্ষু যায়—দূরবিসারী অনন্ত অবিশ্রান্ত বালুকারাশি,—মধ্যে মধ্যে অতি ক্ষীণ জলধারা রজতসূত্রের মত গোধূলির সিগ্ধোজ্জ্বল মধুর সূর্য্যকরে ঝকমক করিতেছে, কচিৎ কোথাও বালুকারাশির মধ্যে পল্বলাকারে জলধারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, আর অন্যত্র দারোয়া, ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা হইয়া অনন্তবিস্তার মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে।

যেখানে দুইটি লোক কোদালের মত দুইখানা যন্ত্র-সাহায্যে বালুকার রাশি খনন করিয়া নালার আকারে জল-

ধারাকে জাগাইয়া দিতেছিল, শৈলেশ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মুগ্ধনেত্রে পাতাল হইতে ভোগবতীর মত দারোয়ার আত্মপ্রকাশের কাণ্ড দেখিতে লাগিল। নদীর তটে বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত্র, তাহার পার্শ্বে আকের কলে আক মাড়া হইতেছিল, কৃষাণ-সন্তানেরা মৃদুস্বরে গান গাহিয়া গরুর লেজ মলিয়া কল চালাইতেছিল, দূরে শুষ্ক ইক্ষু-ত্বকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বৃদ্ধ কৃষাণ, পত্নীর হস্তস্থিত ছিলিমের সদ্ব্যবহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কেমন একটা স্নিগ্ধ শান্ত ভাব দারোয়ার এই মুক্ত বায়ু ও মুক্ত আলোকের সোণার তটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার ইটের পাঁজার মধ্যস্থ হাপর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাঁওতাল পরগণার এই মুক্ত প্রকৃতির মুক্ত প্রান্তর,—শৈলেশচন্দ্রের যৌবনের গোলাপী আভায় রঙ্গীন ভাবপ্রবণ হৃদয়ে কেমন একটা পরিতৃপ্তি—কেমন একটা অনাবিল শান্তি আনিয়া দিল।

শৈলেশচন্দ্র বালির রাশির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আয় রেণু, আমরাও বালি খুঁড়ি।" সাঁঝের রবির গলিত সুবর্ণধারা রেণুর মুখখানিকে রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়াছিল, তাহার টোপরের মত কুঞ্চিত কেশদামের উপর পড়িয়া সেগুলিকেও রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছিল। মুক্ত বায়ু তাহার চূর্ণকুন্তলগুলিকে লইয়া কি সুন্দর খেলা করিতেছিল।

"ও মামা, বল না কোত্থেকে জল বেরুচ্ছে, বল না।"—হঠাৎ বালিকার অতর্কিত প্রশ্নে শৈলেশচন্দ্রের তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গেল। সে এতক্ষণ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন? শিশুরা কোথা হইতে এমন সব জটিল সমস্যার প্রশ্ন সংগ্রহ করে?

শৈলেশ বলিল, "বালির তলা থেকে—আবার কোথা থেকে?"

"বালির তলা কোথায় মামা?"

"বালির তলা এই নদীর তলার দিকে।"

"নদী কি মামা? গঙ্গা?"

"হাঁ রে বুড়ী, গঙ্গা। নে, কেমন জল দেখ্ দিকি। খাবি একটু?" কথাটা বলিয়া শৈলেশ এক অঞ্জলি জল রেণুকে খাওয়াইয়া দিল; নিজে দুই তিন অঞ্জলি পান করিল। তাহার পর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আঃ! এই জন্যেই বুঝি এরা কলসী ভ'রে জল নিয়ে যাচ্ছে?"

"হাঁ মামা, ঐ সায়েব বাবুরাও জল নিয়ে যায়, বাবা নিয়ে যায় না, কুয়োর জল খায়।"

"সায়েব বাবু?—সে আবার কে রে?"

"দূর মামা, সায়েব বাবুদের জানো না?" রেণু উচ্চ হাস্যের রোল তুলিল। শৈলেশও তাহার হাসিতে যোগ দিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁরে হাঁ, পাকা বুড়ী! তোর মত ত আমি এখানে থাকি না যে জানব!"

"সায়েব বাবু, মামা? সায়েব বাবু? ঐ যে যাদের বাড়ী কলের গান হয়—আমি কেমন গান শিখিছি, শুনবে মামা?—'তুমি কাদের কুলের বউ'—"

হঠাৎ রেণুর কচি গলার কচি-মিঠা আওয়াজকে ছাপাইয়া কর্কশ কুক্কুরকণ্ঠের রব প্রান্তর ছাইয়া দিল। শৈলেশ বিরক্ত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল। অমনি তাহার শরীরের মধ্য দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল, তাহার নয়ন দুইটি বিস্ময়ে আকর্ণবিস্তৃত হইল। সে দেখিল, একটি প্রৌঢ় পুরুষের পার্শ্বে গোধূলির রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব তরুণীমূর্ত্তি—গোধূলির আলো-আঁধারের মত তাহারও অঙ্গে কৈশোর ও যৌবনের শুভ সন্ধির কিসলয়লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সে কি শোভা! সুন্দরী তরুণী আলুলায়িতকুন্তলা, আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা মার্জ্জিতরুচি বাঙ্গালী সমাজের কন্যার ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিতা।

শৈলেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া রহিল—তাহার সেই দৃষ্টি যে অভদ্রতাব্যঞ্জক হইতে পারে, সে ধারণাই তাহার মনে স্থান পাইল না। জলন্ত পাবকশিখা দেখিলে পতঙ্গ যেমন ধ্রুব মৃত্যু জানিয়াও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনই ভাবে সে রূপবহ্নির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু তাহার মোহভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল না।

অপরিচিতা যুবতীর হস্তে ধৃত লৌহ চেইনে একটি চমৎকার টেরিয়ার কুকুর বাঁধা ছিল। রেণুর 'জলি' তাহাকে দেখিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। টেরিয়ারটাও লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া চেইন ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, গর্জ্জনে বালুকাপ্রান্তর ছাইয়া ফেলিল। তখন উভয় কুকুরের মধ্যে চীৎকারের পাল্লাপাল্লি চলিল। দেশী কুকুর—রেণু তাহাকে মাছ ভাত খাওয়াইয়া পোষ মানাইয়াছিল, কিন্তু দেশী হইলেও আকারে বৃহৎ ও বলবান, তাই সে প্রথম আক্রমণ না করিয়া টেরিয়ারের গর্জ্জনের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু টেরিয়ার রাগে ফুলিয়া উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল—রেণু আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল। হঠাৎ টেরিয়ারের অধিকারিণী নদীগর্ভ হইতে উপলখণ্ড উত্তোলন করিয়া জলির অঙ্গে নিক্ষেপ করিল, জলি আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তটপ্রান্তে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে রেণুর কালো মেঘের মত কুন্তলগুচ্ছের উপর হস্ত রক্ষা করিয়া ঈষৎ উষ্ণ স্বরে প্রৌঢ় পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনারা ওকে মারলেন কেন?—ও ত আপনাদের কিছু করে নি।"

প্রৌঢ় কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তরুণী কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গর্ব্বিতকণ্ঠে বলিল, "কুকুর পোষবার এত সখ যাদের, তারা কুকুর বেঁধে রাখলেই পারে। বগলস চেইন না পরিয়ে পথে নিয়ে বেড়ায় কেন?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তরুণী সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপে সঙ্গী প্রৌঢ়ের সহিত তটাভিমুখে চলিয়া গেল; শৈলেশচন্দ্র অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, যেন চক্ষু ঝলসিত করিয়া একটি বিদ্যুৎশিখা নিমেষে দেখা দিয়া নিমেষেই অন্তর্হিত হইল।

"না বাছা, ছিষ্টি নৈরাকার করলে! আমার মাথা-মুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে!" অন্দরের দিক হইতে কথাটা আসিতে এবং পক্ষিবিশেষের পক্ষবিধুনন ও উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি হইতেই প্রবোধচন্দ্র হাসিয়া ফেলিলেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট মাড়োয়ারী মক্কেলটি বলিল, "কি বাবু, হাসলেন যে?"

"হাসব না ত কি! নিষিদ্ধ পক্ষী বোধ হয় পবিত্র পাকশালায় প্রবেশলাভে উদ্যত হয়েছে, তাই পিসীমার উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।"

"বুঝলাম না বাবু।"

"বুঝবে না শেঠজী—কেন না ও ব্যবসাটায় এখনও তোমাদের নজর পড়েনি। ভগবান সুমতি দিন, তোমাদের যেন ওদিকে আর দৃষ্টি না পড়ে।"

"হেঁ, হেঁ, বাবু কি বলছেন যে—"

পুরান্দার বাসা-বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় আরাম-কেদারায় বসিয়া এটর্ণি ও মক্কেলে কথা হইতেছে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী এটর্ণি বাবু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া রুগ্ন পত্নীকে দেওঘরে দেখিতে আসিয়াছেন। ছুটি বলিলে কথাটার অপমান করা হয়, কেন না, প্রবোধ বাবুর নিজেরই আফিস। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি বলিতেন, কেরাণীদের এক মনিব, তাঁহার পাঁচ মনিব। তাহার প্রমাণও আজ হাতে হাতে পাইয়াছেন। মাত্র দুইমাস প্রতিভারা আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে প্রবোধ বাবু তিন চারিবার পত্নী ও কন্যার 'সংবাদ' লইতে দেওঘরে ছুটাছুটি করিয়াছেন বটে, কিন্তু যতবার আসিয়াছেন, একদিন বা বড় জোর দুই দিনের অধিক থাকিতে পারেন নাই। এবার লম্বা ছুটি, তাই মক্কেল তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। 'জরুরী কাম আছে বাবুজী' বলিয়া মাড়োয়ারী মক্কেলটি দলিলের তাড়া বগলে লইয়া দেওঘরে তাঁহাকে ধাওয়া করিয়াছে।

প্রবোধ বাবু চৌকিটা একটু টানিয়া লইয়া একরাশ চুরুটের ধুম উদ্গিরণ করিয়া বলিলেন, "কথাটা হচ্ছে কি জান শেঠজী, সামনের বাড়ীর ব্যারিষ্টার বাবুর একটি ছোট খাটো মিনেজারী আছে,—তাতে দু'দশ কুড়ি

হংস কুক্কুট আদি জানোয়ার থাকে। দরকার হলেই রোজ খাসী মিঞা তাদের দু'চারটের পক্ষী-জন্ম উদ্ধার করে দেন। তা, ওঁরা মাঝে মাঝে এবাড়ী ওবাড়ী হাঁড়ীর সন্ধানে ঘুরে থাকেন, যদি ভাতটা মাছটা আগ্‌লা পড়ে থাকে—"

এই সময়ে একটি সুদর্শন যুবক ছোট একটি ফুটফুটে মেয়ের হস্তধারণ করিয়া বারান্দায় হাজির হইল, সে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত শৈলেশচন্দ্র। মেয়েটি মাতুলের হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া গিয়া প্রবোধ বাবুর ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "বাবা, আজ মামা আমায় কেমন নন্দনপাহাড়ের ওপরে নিয়ে গিয়েছিল!"

প্রভাতের স্নিগ্ধ কোমল আলোয় গৃহ ও প্রাঙ্গণ হাসিয়া কুটিপাটি হইতেছিল, বালিকার হাসিও তাহারই মত স্নিগ্ধ, কোমল। প্রবোধ বাবু কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত, বড়বাবু! ভাগ্নীটিকে ওয়াকিং কম্পিটিশনে পাঠাবে নাকি? যেরকম লায়েক করে তুলছ! কি বল, চা টা আনতে বলা যাক্, না স্বয়ং অন্দরে গিয়ে ফরমাজ দেবে?"

শৈলেশ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "না, না, আঘাটা কুঘাটা কত কি মাড়িয়ে এলুম, এ কাপড়ে অন্দরে যাবনা। পিসীমা—"

প্রবোধচন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "সে ভাবনা নেই ভাই। আজ ভোর না হ'তেই সামনের বাড়ীর ব্যারিষ্টার সাহেবের মুর্গী পিসীমার হাঁড়ী মেরে দিয়ে গিয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ—ভাই! সে কি মজা রে—একলা কত হাসবো!"

শেঠজী এতক্ষণ নীরবে শ্যালক ভগিনীপতির ব্যাপার শুনিতেছিলেন, 'মুরগী' কথাটায় কথার খেই কুড়াইয়া পাইলেন, কিঞ্চিৎ ঘৃণা মিশ্রিত সুরে বলিলেন, "বাবুজী, ঐ আপনাদের কেমন এক রোগ। আপনারা শাস্তর টাস্তর মানেন না, ওটা বাড়ীতে পুষবেন, খান—এ কেমন কথা?"

প্রবোধ বাবু হাসিয়া বলিবেন, "কি করি বলুন শেঠজী! ঐ এক আধটা জিনিষ আছে যাতে এখনও তোমরা ভেজাল মেশাতে পারনি—ঐটেই এখনও যথার্থ পবিত্র শুদ্ধ আছে, তাই খাই। খেলে রোগ হবে না জানি বলেই খাই। কি বল বড়বাবু? হাঃ হাঃ!"

প্রবোধ বাবুর বিকট হাসিতে শেঠজী অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন দেখিয়া শৈলেশ কথাটা ঘুরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে বলিল, "ওঃ—বুড়ীটা এত হাঁটতে পারে! কাল বিকেলে আমার সঙ্গে দারোয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু আজ নন্দন পাহাড় পর্য্যন্ত পারবে ভাবিনি।"

প্রবোধ বাবুর ক্রোড় হইতে রেণু বলিয়া উঠিল, "ছো ছো, ভারি ত নন্দন পাহাড়, জসিডি গিছলুম হেঁটে।"

প্রবোধ বাবু বলিলেন, "হাঁহে সত্যিই পোড়ারমুখী জসিডি গিয়েছিল সেদিন। যা দেখি রেণু, আমাদের চা, পাণ টান আনতে বলগে যা। শেঠজীর, কি আনতে বোলবো—কিছু ফল মিষ্টি?"

"না, না বাবুজী সকালে কিছু খাইনে, মাপ করবেন।"

"ওঃ আহ্নিক পুজো হয়নি বুঝি? তা কপালে ত তিলক রয়েছে! তবে আপত্তিটা কি? ও হো বুঝেছি—মুরগীর পালক টালক ত আর খাবারের গায়ে থাকবে না। হাঃ হাঃ হাঃ! ও খাবার ত তুমিই কলকাতা থেকে এনে ভেট দিয়েছ শেঠজী!"

শৈলেশ হাসি চাপিয়া কপট ধমক দিয়া বলিল, "আঃ কি যে বল। ভদ্রলোককে এমন অপ্রস্তুতও করতে পার তুমি! হাঁ, বুড়ীর কথা কি বলছিলে, জসিডি হেঁটে গিয়েছিল? সিম্‌প্লি এবসার্ড!"

"না হে, সত্যি, তোমার ভগ্নীকেই জিজ্ঞেস করে' দেখোনা।"

শেঠজী দেখিলেন, বেলা বাড়িয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, "তা হলে আসি বাবুজী, ওবেলা কলকাতা ফিরতে হবে, জরুরী কায আছে।"

"আঃ এলে যদি শেঠজী, দুদিন থেকেই যাওনা। টাকা গোণা কি একদিনও কামাই দিতে নেই?" উচ্চ

হাস্যের সহিত প্রবোধ বাবু কথা কয়টি বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শেঠজী অপ্রতিভ হইয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "না, না, তা না। আমাদের আপনারা এমনই দেখেন বটে। কায হয়ে গেল, ব্যস, আর কি করতে থাকবো? তা হ'লে মনসুখলালের নামে মরগেজটা ঠিক করে ফেলবেন। কবে ফিরছেন?"

প্রবোধ বাবু প্রাঙ্গণে নামিতে নামিতে বলিলেন, "ফেরাফিরির মালিক এই বাবু—আমার মালিকের সহোদর ভাই। উনি এসেছেন বেড়াতে আমার সঙ্গে, আমায় ছুটি দিলেই ফিরে যাই।"

বারান্দার উপর হইতে শৈলেশ বলিল, "বেশ যা হোক্, আমিই তোমায় আটকে রেখেছি, না? এটর্ণি হলেই কি কথার ব্যবসা করতে হবে?"

ততক্ষণ প্রবোধ বাবু ধনী মক্কেলকে গেটের বাহির করিয়া দিয়া অভিবাদনান্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে চোখে তখনও হাসি খেলিতেছিল। এদিকে বারান্দায় চা ও জলখাবার হাজির হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশের রুগ্না ভগিনীও বারান্দায় একখানি আরাম কেদারায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভিতরে থাকিয়া বাবুদের কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "ওঁর ঐ রকম কথা। এই! এই আবার কলের গান সুরু হল! দিন রাত অন্য কায নেই।"

প্রবোধ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া চায়ের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে বলিলেন, "এ যে মশাইদের অন্যায় আব্দার! সাহেব লোক—ওঁদের সময় কাটে কিসে এই নেটিভের পাড়ায় বল ত?"

শৈলেশও চা পান করিতে করিতে বলিল, "সাহেব লোক? কে, তোমার ব্যারিষ্টার সাহেব নাকি? ওঁরা কি সামনের বাড়ী থাকেন?"

রেণু বলিয়া উঠিল, "চুপ কর না মামা, ঐ 'কি আর বলিব আমি' গাইছে। আমি জানি মামা গাইতে।"

কথাটা বলিয়াই রেণু কচি কোমল কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, "কি আর বলিব আমি—"

তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, "থাম্ বাপু! রাত দিন প্যান প্যানানি; তার ওপর তোর ঘ্যান ঘ্যানানি ভাল লাগে না।"

প্রবোধ বাবু বলিলেন, "বাঃ! ও কি দোষ করলে বল ত? বুড়ু তুই গা ত রে।"

শৈলেশ বলিল, "ওঁদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ হয়নি দিদি? দাদাবাবুও ত এটর্ণি—তা হাইকোর্টে পরিচয় হয়নি তোমার সঙ্গে?"

প্রবোধ বাবু যেন নিতান্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া বলিলেন, "রক্ষে কর ভাই! ঘাড়ের ওপর ত দুটো মাথা নেই আমার! নেটিভ যাবে ডাট্টা সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে।"

শৈলেশ বলিল, "তা হলেও ত বাঙ্গালী।"

তাহার দিদি বলিল, "হ্যাঁ, বাঙ্গালী ত ভারি! পাড়ার বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিশতে ঘেন্না বোধ করেন! যেমন কর্ত্তাটি, তেমনি মেয়েটি! ঝি চাকর যদি সাহেব মেম ব'লে না ডাকে, তা হ'লে কর্ত্তা মেরে তাড়িয়ে দেন। মেয়েটি ত নাক সিটকেই আছেন। শুনেছি, পাশ দিয়েছে, খুব লেখাপড়া জানে—"

প্রবোধ বাবু হঠাৎ দুই কর্ণে অঙ্গুলি আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "নাঃ, স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ। পরনিন্দা যে করে, আর পরনিন্দা যে শোনে—"

প্রতিভা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন, "তুমি থাম বাবু! নেকামী ভাল লাগে না! নিন্দে কোনখানটায় হল?"

প্রবোধ বাবুও হটিবার পাত্র নহেন। বলিলেন, "না, না, ভুল হয়েছে,—স্তুতি! স্তুতি!"

"স্তুতিই ত! যে যেমন মানুষ, তা বল্‌তেও দোষ?"

শৈলেশ ততক্ষণ ভাগিনেয়ীর সহিত মিষ্টান্নের রেকাবিখানি সাবাড় করিয়াছিল, মুখ মুছিয়া বলিল, "আহা যেতে দাওনা দিদি। ওঁদের ত বাইরে বেরুতে দেখিনি —আর কাল ত সবে এসেছি।"

রেণু বলিয়া উঠিল, "বা রে, দেখনি বুঝি? কাল সন্ধ্যেবেলা—সেই যে দারোয়ান জলির সঙ্গে ওদের কুকুরের ঝগড়া!"

প্রতিভা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "সে আবার কি? কুকুরের ঝগড়া?"

শৈলেশেরও বিস্ময়ের মাত্রা কম হইল না, সে বলিল, "ও:—ওঁরাই ব্যরিষ্টার সাহেব, আর তাঁর মেয়ে?"

প্রবোধ বাবুরও কথাটা শুনিবার খুব আগ্রহ দেখা দিল। ভৃত্যকে আরও দুই চারিখানা গরম লুচি ও তরকারীর হুকুম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি হে ভায়া? ওঁদের সঙ্গে কলিসন টলিসন হয়নি ত?"

শৈলেশ সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, সে সব কিছু না। রেণুর কুকুরটা তাঁদের কুকুরকে তাড়া করেছিল। ভারি পাজি তোর জলিটা, রেণু।"

রেণু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বা রে! জলি বুঝি দোষ করলে? ওদের কুকুরটাই ত ঘেউ ঘেউ করে এল, হ্যাঁ। তবুও ওদের শান্তি জলিকে ঢিল মারলে!"

প্রতিভা বলিলেন, "শান্তি? শান্তি না মাথা—কি দেখেই যে ওর নাম রেখেছিল ওরা শান্তি। মেয়ে ত ঠোঁট ফুলিয়েই আছেন! ঠেকারে মাটীতে পা পড়ে না—"

প্রবোধ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা হা! মিথ্যে অপবাদ দিও না অমন করে'। কবেই বা মিশলে ওদের সঙ্গে। দূর থেকে যতটুকু দেখেছি, মেয়েটি ত বেশ। ওর শান্তি নাম হ'ল কবে? ওকে ত মিসি বাবা বলেই খানসামারা ডাকে।"

"হাঁ বাবা, আর দত্ত মশায় 'মলি' বলে—হিঃ হিঃ! জলি আর মলি!"

শিশুর সরস হাস্যে বারান্দা ভরিয়া গেল।

প্রতিভা বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, তুই থাম! ভারি জেঠা হয়েছে! দেখ কথাটা তুমি নেহাৎ মিথ্যে বল নি—এর মধ্যে বড় একটা কথাবার্ত্তা হয়নি বটে, তবে ওর মার সঙ্গে খুব হয়েছে। দুজনেই আমরা এক গোত্তরের কিনা,—উনিও রুগী আমিও তাই। সবাই বেড়াতে বেরিয়ে যায়, আমরা দুজনে এই দুই বারাণ্ডায় মুখোমুখি হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে থা'কি।"

শৈলেশ বলিল, "তা এদ্দিন রয়েছ, কথাবার্ত্তা হয়নি?"

প্রতিভা বলিলেন, "হবে না কেন, জোর তিন চার দিন। এই সামনের মাঠটাতেই দু চার পা বেড়াতে গিয়ে দৈবাৎ দু'এক দিন দুজনে দেখা, কথা হয়েছে। তারপর দুজনেই আবার শয্যে নিয়েছি, দেখাও হয় নি। মানুষটি বড় চমৎকার, বড় ঠাণ্ডা মেজাজ, দেমাক টেমাক নেই। তবে বাইরে থেকে অমন দেখায়।"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "আর কর্ত্তা আর তাঁর মেয়েটি?"

প্রতিভা বলিলেন, "বল্লুম ত, মিশিনি মেয়েটার সঙ্গে। মেয়েটা কখনও এখানে বেড়াতে আসে না। পাড়ার লোকে বলে দুজনেই গুমুরে।"

প্রবোধ বাবু বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ নহমূলা জনশ্রুতিঃ, না কি বলছে তোমরা, বড়বাবু?"

শৈলেশ বলিল, "যাক্ গে, ওদের কথা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যাথার দরকার কি?"

প্রবোধ বাবু বিস্মিত হইবার ন্যায় ভাল করিয়া বলিলেন, "বল কি হে ছোকরাবাবু—একবারে এত বৈরাগ্য? কবে লোটা কম্বল নিয়ে বদরীনারাণের পথে ছুটে বেরোও, তাই ভাবনা হয়। তা, সে যখন হবে তখন হবে, এখন এবেলা কি খাবে বল দেখি? পক্ষীমাংস না ছাগমাংস? কাল রোহিণীর হাটে গিয়ে এক ঝাঁকা পক্ষী ও একপাল ছাগশিশু ক্রয় করে আনতে যাব দুজনে। কি বল হে—হাঁটতে পারবে ত?"

এই সময়ে তার-পিওন আসিয়া লাল খাম হাতে দিল। প্রবোধচন্দ্র পাঠ করিয়া বিষণ্নমুখে বলিলেন, "মানুষে গড়লে কি হবে, ভাঙবার একজন রয়েছেন যে! কি বাবা, দাঁড়িয়ে কেন? বক্‌শিস্? ও: তার এনে যে সুখী করেছ, ভাবছি কি বক্‌শিস দিই! ভায়া, রোহিণী যাওয়া হ'ল না কলকাতা-ভ্রমরই আমার টেনে নিয়ে চল্লো। কালই যেতে হচ্ছে। জরুরি কায আপিষের, না গেলেই নয়। ভালই হয়েছে তুমি এসেছ। ভগ্নীটিকে আগলে থাক।"

শৈলেশ বলিল, "বাঃ তা কেমন করে হবে? আমার ত তিন দিন মেয়াদ, তারপরে কনসেশন মারা যাবে।"

"আঃ ঘোড়া থাকলে চাবুক মিলে যাবে হে,তার জন্যে ভাবছ কেন? এখনই ত এক্‌জামীন না—তার এখনও দেরী আছে।" প্রবোধ বাবু কথাটা বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্যালকের স্কন্ধে একটি হস্তার্পণ করিয়া সস্নেহে তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি এই সুদর্শন মিষ্টভাষী বলিষ্ঠ শ্যালকটিকে যথার্থই কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "এস হে বড়বাবু, বাজারে যাই একবার। ট্যাক্সি একখানা ভাড়া করে আসিতে হবে।"

৩

ট্যাক্সি একখানা ভাড়া করিয়া এবং বাজার হইতে কিছু পেঁড়া আর রাঁচির ছড়ি, মোড়া, চেয়ার ইত্যাদি খরিদ করিয়া প্রবোধ বাবু বাসায় ফিরিয়া গেলেন। শৈলেশ বলিল, সে আরও একটু ঘুরিয়া ঘরে ফিরিবে, এখনও ১১টা বাজে নাই তাড়াতাড়ি কি? এ বলার একটু কারণও যে ছিল না, তাহা নহে। প্রবোধ বাবু যখন মোড়া ও চেয়ারের দর কসাকসিতে মগ্ন, তখন শৈলেশচন্দ্র কিছু দূরে মিঃ ডাট্টাকে কন্যা ও খানসামা সমভিব্যাহারে তরিতকারীর বাজারে বাজার করিতে দেখিয়াছিল। 'মিস মলি' তখন অম্লানবদনে লোকলোচনের সমক্ষে বড় বড় কামড় দিয়া পেয়ারার মত কি একটা পদার্থ চিবাইতেছিলেন!

বাজারে বাহির হইবার কালে "ঘোষ ভবনের" ফটকের বাহিরে পা দিয়াই শৈলেশ দেখিতে পাইয়াছিল, "জুয়েল ভিলার" বারান্দায় আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ডাট্টা সাহেব চা পান করিতে করিতে একখানি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন এবং "মিস মলি" তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাগজে দৃষ্টি দিতে দিতেই মিহি আওয়াজে ডাকিতেছেন, 'বেয়ারা!' প্রবোধ বাবুও সেই আওয়াজ শুনিয়াছিলেন, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"এদের সবটাই ট, দেখেছ শৈলেশ!" শৈলেশ কোনও জবাব না দিয়াই একটু মন্থরগতিতে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। প্রবোধ বাবু তাহাকে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কি হে বড়বাবু! একবারে তন্ময় যে! তা হবারই কথা, এমন 'রেয়ার বিউটি' ত সচরাচর চোখে পড়ে না।"

শৈলেশ এখনও বাজারে একান্তে সেই রূপসুধা পান করিতেছিল কি? রূপের আকর্ষণ কাহার নাই? কিন্তু যথার্থ শৈলেশচন্দ্র 'মিসি মলির' রূপের কথা ভাবিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল, বাঙ্গালীর ঘরে একি বিসদৃশ চিত্র! হইলই বা ইহারা ব্যারিষ্টার ও ব্যারিষ্টার কন্যা, কিন্তু তাহা হইলেও ত বাঙ্গালী। তা কৈ সেই বাঙ্গালীসুলভ কোমলতা, শালীনতা, লজ্জানত মধুর প্রাণজুড়ানো স্বভাব? ইহারা বিলাতী গৌরাঙ্গীর অনুকরণে চাকরকে মিহিসুরে ডাকে—'বেয়ারা', ঝিকে ডাকে 'আয়া', পথে অপরিচিত পুরুষের প্রতি অশিষ্ট ভাষায় বাক্যপ্রয়োগ করে, প্রকাশ্য বাজারে দাঁড়াইয়া ফল পাকড় চিবায়—মনে করে যেন হাটের মানুষগুলা কুকুর বিড়াল, তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ্যে আহার করিয়া গৌরব অনুভব করে। ইহারা যদি এমন না হইয়া, আপনার গর্ব্বভরে আপন গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া না থাকিয়া, বিরাট হিন্দু সমাজের বিশাল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িত, তাহা হইলে মনে কত সুখ, কত তৃপ্তি অনুভব করিত, সমাজও ইহাদের মত কৃতবিদ্য সুসন্তানকে বক্ষে ধরিয়া কত গৌরব অনুভব করিত! এখনকার কালে ত সমাজের শাসন আর তেমন কঠোর নহে,এখনকার কালে খদ্দরমণ্ডিত দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের মত ব্যারিষ্টারেরও অভাব নাই। তবে এই ডাট্টা সাহেব ও মিস মলি এমন কেন?

চিন্তার স্রোত হঠাৎ ফিরিয়া গেল। শৈলেশ দেখিল, তাহার আলোচনার কেন্দ্র তখন তরকারীর বাজারের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সেও তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতি তাহার অনুসরণ করিল। বাজারের পথে একটা কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ বামনাকৃতি লোক পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ঢাক বাজাইয়া যাত্রী ও পথিকগণের নিকট দয়া ভিক্ষা করিতেছিল। লোকটা বামন হইলেও

বয়োবৃদ্ধ। শৈলেশ দেখিল, রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া লোকটা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কাতর নয়নদ্বয়ে অন্তরের যাতনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একটা পয়সার জন্য তাহার কি কাতরতা, কি আকুলি বিকুলি! আহা, হয়ত তাহার জীর্ণ কুটীরে তাহারই ভিক্ষার উপর একটা বৃহৎ পরিবার নির্ভর করিতেছে! শৈলেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

ততক্ষণ "জুয়েল ভিলার" অধিবাসীরা কুব্জ বাস্তকয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। শৈলেশ নিজের পকেট হইতে একটি দুয়ানি বাহির করিয়া কুব্জকে দিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইল। সে দেখিল, মিস্ মলি বা শান্তি গাত্রবস্ত্র সংযত করিবার অছিলায় পথে চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইল, তখন ডাক্তা সাহেব দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। অমনই মলি ক্ষিপ্রহস্তে লেডিজ্ পার্স হইতে একটি টাকা, বাহির করিয়া কুব্জের হস্তে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিল!

শৈলেশের মাথাটা ঘুরিয়া গেল। এ কি প্রহেলিকা! যাহারা এদেশের লোককে—স্বদেশের স্বজাতিকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া দূরে রাখে, তাহাদের এ দয়ার ভাণ কেন? ইহারা ত সচরাচর সরকারের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য হাঁসপাতালে অথবা খৃষ্টান মিশনে দান করিয়া সংবাদ পত্রে নাম জাহির করিয়াই থাকে,—ইহাদের আবার এমন গোপন সদনুষ্ঠান কেন? এই দানের উৎস কোথায়, শৈলেশচন্দ্র ভাবিয়াও সন্ধান পাইল না।

অপরাহ্নের গাড়ীতে শৈলেশ ভগিনীপতিকে তুলিয়া দিতে গেল। ষ্টেশনে করালীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি পুরান্দার পুরাতন বাসিন্দা, প্রবোধবাবু তাঁহারই হেপাজতে নিশ্চিন্তে পরিবার রাখিয়া যাইতেন। কথায় কথায় করালীবাবু বলিলেন, "কি হে প্রবোধ, শনিবারে কি তোমাদের ত্রিকূট যাওয়ার ঠিক হ'ল? যদি ঠিক করে থাক, তা হ'লে আজই বাসখানা ভাড়া করে রাখি, না হলে যে রকম মেলার ভিড় জমছে, শেষে গাড়ী পাওয়া যাবে না।"

প্রবোধবাবু বলিলেন, "ঠিক করা না করার মালিক ত আর এখন আমি নই করালীদা, এই বড়বাবুই জানেন। করালীদা বোধ হয় এঁকে জানেন না, ইনি আমার মনিবের মালিক—কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এম-এ পড়েছেন, নাম শৈলেশচন্দ্র বোস।"

শৈলেশকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া করালীবাবু উচ্চহাস্যের লহর সংবরণ করিয়া বলিলেন, "তবে ত ভালই হয়েছে, দুজনেই বাজারটা ঘুরে যাব'খন, কি বলেন, বোসজা মশাই?"

শৈলেশ জবাব দিতে না দিতেই বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বিদায় সম্ভাষণের পরেও প্রবোধ বাবু গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "সবই তোমায় দিয়ে গেলুম বড়বাবু। দোহাই তোমার, ফিরে এসে যেন বে-দখল না হই!" গাড়ী হুস হুস করিয়া চলিয়া গেল।

বাজারের দিকে যাইতে যাইতে করালীবাবু বলিলেন, "বড় আমুদে লোক প্রবোধবাবু। জান বোসজা—আমি বুড়ো মানুষ, তোমায় তুমি তুমি করছি, বোধ হয় রাগ করনি ভাই? প্রবোধবাবু মাঝে মাঝে দুই একদিন এখানে আসেন বটে, কিন্তু ঐ দু'চার দিনেই সবাইকে আপনার করে ফেলেন। এলেই ওঁর বাসায় পুরান্দার বাঙ্গালীর পোলাও মাংসের নেমন্তন্ন হবেই। আর তোমার দিদি—এক মুখে কি সুখ্যাত কোরবো, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—অন্নপূর্ণা হতেও পারতেন, তা রোগের জ্বালায় পেরে ওঠেন না, তবুও পিসীমাকে দিয়ে কত নিরামিষ তরকারী রাঁধান, আর উড়ে বামুনটাকে দিয়ে নিমকি সিঙ্গাড়া থেকে সুরু করে পিঠে পায়েস আর পোলাও কালিয়া তৈরী করা ত আছেই। আশীর্ব্বাদ করি শীগ্‌গির সেরে উঠুন—যদিও তাতে আমাদের মত লোভী পেটুক বামুনের ক্ষতিটা কম হবে না;—উনি চলে গেলে মাঝে মাঝে মুখ বদলানর সুখ থেকে বঞ্চিত ত হতেই হবে!"

গল্পপ্রিয় বৃদ্ধের গল্পের স্রোতের বিরাম নাই। শৈলেশ মাঝে মাঝে 'হাঁ', 'না' দিয়া যাইতেছিল বটে,

কিন্তু সেই অবিরাম স্রোতের মুখে পড়িয়া তাহাকে হাবুডুবু খাইতে হইল—তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। কোনও মতে মাথাটা জাগাইয়া রাখিয়া অন্য খাতে স্রোতঃ চালাইবার উদ্দেশ্যে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিকূট যাবার কথা কি বলছিলেন?"

করালীবাবু নূতন খেই পাইলেন, উৎসাহ ভরে বলিলেন "আহা জান না, বৌমা (তোমার দিদি) আমাদের এখানে বলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর পিস-শাশুড়ী আর মেয়েটার ত্রিকূট দেখার বড় সাধ—বিশেষ শনিবারে সেখানে মেলা বসছে। তা যদি আমাদের ওঁরাও যান, তাহলে হারু বাবু (তোমাদের সরকার মশাই গো) সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে আনতে পারেন। একখানা বাস ১০৲ টাকা ভাড়া, তাতে ১২।১৪ জন যেতে পারে। বৌমাই ভাড়াটা দেবেন, গরীব বামুন, আমি কোথায় পাব বল না ভাই? তা, যে রকম ভিড় দেখছি এবার তাতে খপ্ করে কেউ যদি বাসখানা ভাড়া করেই ফেলে। এর মধ্যেই ত একখানা ট্যাক্সি আর একখানা বাস বায়না হয়ে গেছে।"

শৈলেশের পাহাড় পর্ব্বত দেখিবার ঔৎসুক্য বিশেষ ছিল না, কেন না, সে শিমলা বেড়াইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, "তা বেশ ত, চলুন না, ভাড়া করেই যাই।"

করালীবাবু বলিলেন, "তুমি ত্রিকূট যাবে না ভাই? বেশ ত, তুমিও গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই। মেয়ে-ছেলেরা যাবে, তোমাদের মত সকল তাতে চৌকস কালেজের ছেলে সঙ্গে থাকলেই ত ভাল হয়। কি জান বিদেশ বিভুঁই, চোর ডাকাতেরও ভয় যে একবারে নেই তা নয়। তবে যাঁরা ট্যাক্সি নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে নেপালী দরোয়ান যাবে, বন্দুকও যাবে শুনলুম, আর ব্যারিষ্টার সাহেব ত পিস্তল না নিয়ে কোথাও যানই না।"

মুহূর্ত্তে শৈলেশের রুদ্ধ উৎসুক্যের উৎস খুলিয়া গেল। সে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ব্যারিষ্টার সাহেব? আমাদের বাসার সামনে যিনি থাকেন, ডাট্টা সাহেব?"

"হাঁ ভাই, ঐ ডাট্টা সাহেব, না তোমরা কি বল, তিনি। তিনি একা না, তাঁর কন্যাটিও যাবেন—ঐ যে মিসি বাবা। হাঃ হাঃ। তা যাই বল বাপু, ডাট্টা সাহেব নরলোকের সঙ্গে কথা কন না বটে, পুরো সাহেব সেজেই থাকেন, কিন্তু মিসি বাবা তা ন'ন—ওঁর আমাদের বাঙ্গালীর মত দয়ামায়া আছে।"

শৈলেশ উৎকর্ণ হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। বলিল, "কি রকম?"

"হাঁ, বাপের মত ওঁরও মেজাজটা কড়া বটে—কারুর সঙ্গে মেশেন না; কিন্তু দেখেছি, পথে গরীবের ছেলে মেয়েকে আদর করেন, সিকিটে আনিটে দেন। কাঙ্গাল দুঃখী ভিক্ষে করতে এলে নিজে পাত পেতে তাদের ভাত তরকারী দিচ্ছেন, তাও দেখেছি ক'দিন। জান ভাই, ওদের বুড়ী আয়া বিপিন বাবুর ঝিকে বলেছে, ওদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে রাতে মশারি ধরে গিয়ে বাড়ীতে আগুন লেগেছিল। মিসি বাবা বুড়ীকে পাঁজাকোলা ক'রে ওদের ঘর থেকে বের করে এনেছিল। তখন ধোঁয়ায় আর আগুনে ঘর ভরে গিয়েছিল—আর একটু থাকলেই বুড়ীর প্রাণটা যেত। এই যে, বাবা পঞ্চানন? শনিবারে বাস ঠিক ত?"

শৈলেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত গল্প শুনিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ ফিরিয়া দেখিল, পাশের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোফারের উর্দ্দীপরা একটি যুবক বিড়ি ধরাইতেছে। সে বলিল, "ঠিক ত বটে, তবে ১০৲ টাকার কম হবে না। আজ বায়না দিয়ে যেতে হবে, না হলে পাবেন না মুখুজ্যে মশাই।"

শৈলেশ তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে দুইটি টাকা দিল। করালীবাবু বলিলেন, "না, না, অত দিচ্ছ কেন, আট-গণ্ডা পয়সা দিলেই হবে, কি বল হে পঞ্চানন?" পঞ্চানন ততক্ষণ টাকা দুইটা পকেটে পুরিয়াছে।

শৈলেশ আজ প্রভাতে দুইবার অনেকটা হাঁটিয়া এখন ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল। সে বলিল, "তা হোক মুখুজ্যে মশাই, আসুন বাড়ী যাই।"

পঞ্চানন পশ্চাৎ হইতে হাঁকিয়া বলিল, "বাবু, রসীদ নিয়ে যান।"

স্নদীদের কথা শৈলেশের মনেও পড়ে নাই।

বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে করালী বাবুর মুখ জিহ্বা অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে লাগিল। একনিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ শ্রবণ করার মত শৈলেশ পুরান্দা ও দেওঘরের সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ফেলিল। তাহার কতটা তাহার 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল,' তাহা সে-ই বলিতে পারে।

পথে একটা মোড়ে আসিয়া করালী বাবু সন্ধ্যার পর দেখা দিবার আশা দিয়া ভিন্নপথে চলিয়া গেলেন। তখন সুন্দর শুভ্র জ্যোৎস্নায় জলস্থল হাসিয়া কুটিপাটি খাইতেছিল। সাঁওতাল পরগণার শুক্লা চতুর্দ্দশী অথবা পূর্ণিমার রাত্রি যে একবার দেখিয়াছে, সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। এমন করিয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া চাঁদ আর কোথাও হাসে না! সুধাংশু অংশুপুঞ্জ ঢালিয়া দিতেছেন, নিবিড়বিস্তৃত দূরবিসারী সমুদ্র সৈকতের মত চন্দ্রকরস্নাত লতাপাদপহীন অবিশ্রান্ত প্রান্তর যেন একটা বিরাট শ্বেতাস্তরণের মত পড়িয়া ছিল—তাহারই বক্ষোদেশে ক্বচিৎ কোথাও গুল্মকণ্টক বা আম্রকুঞ্জ শুক্লাম্বরে খচিত মরকত মণির মতই শোভা পাইতেছিল,—আর দূর দুরান্তরে গোপপল্লী হইতে মাদলের গুরুগম্ভীর আওয়াজের সহিত বাঁশীর মনভুলানো মিষ্ট সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

শৈলেশচন্দ্র প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্যে স্নপরসম্পর্শ অনুভব করিতেছিল কি?

আর সামান্ত পথ—এই মাঠের পরপারে ঐ আলোর রশ্মি গৃহগবাক্ষ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে—ঐ ত তাহার বাসা। আর তাহারই উত্তরে—পথের পরপারে ঐ আর এক গৃহগবাক্ষ হইতে আলোকধারা যেন তাহাকে অন্ধকারে পথ দেখাইয়া নিকটে আকর্ষণ করিতেছে। শৈলেশচন্দ্রের বক্ষঃস্থল কি জানি কেন অকস্মাৎ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। তাহার চরণ যেন আর চলিতে চাহে না!

মাঠের উচ্চনীচ বন্ধুর পথ হইতে রাজপথে অবতরণ করিতেই মধুর সঙ্গীতের সুধালহরী আকাশ বাতাস ছাইয়া শৈলেশের অন্তরের অন্তর ভরাইয়া দিল—সে স্তম্ভিত রোমাঞ্চিত কলেবরে নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে পথের মাঝে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, হারমোনিয়মের সুরে সুর মিলাইয়া ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে মধুর কণ্ঠস্বর উঠিতেছে, নামিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে,—

চির আদরের বিনিময়ে সখা
চির অবহেলা পেয়েছ।
আমি দূরে ছুটে যেতে দুহাতে পসারি
আমায় বুকে টেনে নিয়েছ॥
ও পথে যেয়োনা ফিরে এস ব'লে
আমার কাণে কাণে কত কয়েছ।
আমি তবু চলে গেছি, আমায় ফিরায়ে আনিতে
আমার পাছে পাছে তুমি গিয়েছ॥

এমনই চাঁদনী রাত্রিতে রাসমণ্ডলে অনন্তসুন্দরের সহিত শ্রীরাধার মিলনে এমনই স্বর্গীয় সঙ্গীত কি বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস ছাইয়াছিল? প্রেম ও আনন্দের মিলনই রাস-পূর্ণিমার মহামিলন,—পতিপত্নীর নিভৃত মিলনের মত তাহা অনুভূতিতেই অনুমেয়, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। এই সুধা-সঙ্গীতে শৈলেশচন্দ্র প্রেম ও আনন্দের মধুর মিলনের অননুভূত অনাস্বাদিত মধুর আস্বাদ পাইয়াছিল কি?

৪

রেণু হাঁটিতে পারে বটে। ত্রিকূট পর্ব্বতের পাদমূল হইতে প্রায় মাইল খানেক পথ দূরে বাস থামিলে সে 'বড়'দের সহিত সমান পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেল এবং পাহাড়ের উপরেও উঠিল। দূর হইতে ত্রিকূটকে তিনটি চূড়াবিশিষ্ট মেঘের মত দেখায়, মনে হয় যেন ত্রিকূট নিরাভরণা বিধবা। কিন্তু কাছে আসিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ত্রিকূট সারা অঙ্গে শ্যাম তরুলতা জড়াইয়া দীর্ঘ জটাজুট মণ্ডিত সন্ন্যাসীর মত ধ্যানে বসিয়া আছে।

সে কি আনন্দ! বদ্ধপিঞ্জরের পাখীর মত বঙ্গললনা আজ এখানে পিঞ্জরমুক্ত। মাথার উপরে মুক্ত অনন্ত আকাশ, আশেপাশে মুক্ত অনন্ত বায়ুস্রোত—সকলের

প্রাণ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। মেলায় কত লোকই না সমাগত হইয়াছে! ললাট হইতে সীমন্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ প্রশস্ত তৈল সিন্দুর রেখাঙ্কিত রাণীগঞ্জ বরাকরের কয়লা নিন্দিত কাল কুচকুচে মর্ম্মর প্রস্তরের মত দেহধারিণী সাঁওতাল রমণী হইতে, মিশনারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা পর্য্যন্ত—এ মেলায় উপস্থিত হয় নাই, এমন লোক দেওঘরে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সেই বিকিকিনি, সেই হৈ হৈ, সেই মাদলের বোল ও ঢক্কানিনাদ,—সকলে মিলিয়া যেন একটা আনন্দের খিচুড়ী পাকাইয়া দিয়াছিল। শৈলেশচন্দ্রও যৌবনসুলভ উৎসাহ ও আগ্রহ বশে সেই আনন্দের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না। সে বহুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া মেলা দেখিয়া ঝরণায় স্নান করিল, চড়ুই ভাতিতে যোগদান করিল, রেণুকে স্কন্ধে লইয়া দীর্ঘ চরণবিন্যাস করিয়া আবার মেলা দেখাইয়া বেড়াইল। কিন্তু যদি কোনও মানবচরিত্রাভিজ্ঞ লোক মেলায় উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বলিতেন, তাহার এই আনন্দের মধ্যেও যেন একটী অভাবের ও আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার আরক্ত নয়ন দুইটি যেন কোনও এক কাম্য বস্তুর অন্বেষণে সর্ব্বদা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বহুক্ষণ ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া শৈলেশ রেণুকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছিল। রেণু অগ্রে,সে পশ্চাতে। শৈলেশচন্দ্র কেবল একবার বলিল, "দুষ্টু কোথাকারে! অমন ক'রে ছুটে চলে না, পা হড়কে পড়ে যাবি।" কিন্তু রেণু তাহার মামাকে রাগাইবার উদ্দেশ্যে আরও ছুটিয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে তরল সরল হাস্যের লহর তুলিয়া মাঝে মাঝে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু এই হাসি মুহূর্ত্ত পরেই কান্নায় পরিণত হইল। একটা পাথরে হোঁচট খাইয়া রেণু সহসা ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। শৈলেশচন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে তুলিতে না তুলিতেই দুই খানি কোমল মৃণাল বাহুলতা রেণুকে জড়াইয়া বুকে তুলিয়া লইল। বাহুর অধিকারিণী রেণুর নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া রেণুর মুখচুম্বন করিয়া নানা মিষ্টবাক্যে তাহাকে ভুলাইতে লাগিল।

শৈলেশচন্দ্র বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। যাহাকে হৃদয়হীনা গর্ব্বিতা বিদেশীয় বিজাতীয় ভাবাপন্না বলিয়া পুরান্দার বাঙ্গালী সভয়ে দূরে রাখিয়াছে,এ কি সেই? না, এ তাহার দৃষ্টিভ্রম? পথের ধূলা হইতে অপরিচিত শিশুকে যে বুকে তুলিয়া লয়, পরের বালিকার ধূলিমলিন অঙ্গস্পর্শে যাহার বহুমূল্য অঙ্গাবরণ ধূলিধূসরিত হইলেও যে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শিশুর অশ্রুপঙ্কিল আনন চুম্বন করিয়া তাহাকে আদর করে, এ কি সেই 'মিস মলি'? এ কি প্রহেলিকা?

ক্রন্দনরতা বালিকার দৃষ্টি পশ্চাতে তাহার মাতুলের উপরেই নিবদ্ধ ছিল, সে অপরিচিতার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া মাতুলের কাছে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। শৈলেশচন্দ্র ভাবিল,— কি অকৃতজ্ঞ এই শিশুজাতিটা! তাহার মনের ভাব বাক্যে ফুটিয়া বাহির হইল, সে দূর হইতে বলিল, "দুষ্টু মেয়ে! উনি আদর করছেন, তা বুঝি ভাল লাগলো না?"

চকিতে তরুণী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল; এতক্ষণ যে নীলোৎপল নয়ন দুইটি নারীর স্বভাবসুন্দর কোমল করুণ রসে ভরপুর হইয়া শিশুর উপর তাহার স্নেহের ধারা অজস্র ধারে ঢালিয়া দিতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহাতে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে নয়নে জগতের যত কঠোরতা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। শিশুকে অঙ্ক হইতে নামাইয়া দিয়া তরুণী নিমেষে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। অদূরে তাহার পিতা মেলায় কি একটা দ্রব্য খরিদ করিতেছিলেন।

শৈলেশ বিস্ময়ে অবাক হইয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। এতক্ষণ যে তাহার আদরের রেণু তাহার জানুদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রোড়ে উঠিবার নিমিত্ত আবদার জানাইতেছিল, সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। সে ভাবিতেছিল, কি অপরাধ করিয়াছে সে, যে এই শিক্ষিতা মার্জ্জিতা তরুণী এমন ক্রোধ ও তাচ্ছিল্যভরে তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া গেল?

বাসায় ফিরিয়া শৈলেশের মনটা বড়ই খারাপ

হইয়া রহিল। তাহার স্নেহময়ী ভগিনী তাহার জন্ত এই অসুস্থ শরীরে কত যত্নে কতপ্রকার তৃপ্তিকর ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, শৈলেশচন্দ্র তাহার দুই একটা স্পর্শ করিল মাত্র, কোনটারই প্রতি সুবিচার করিতে পারিল না। দিদি অভিযোগ করিলে বলিল, "রোদ্দুরে মাথাটা ধরেছে, খেতে রুচি হচ্ছে না।" বিদেশ বিভুঁই, পীড়ার আশঙ্কায় দিদি অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না।

রাত্রি গভীর, গৃহের তাবৎ প্রাণী বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সুখশায়িত। শৈলেশচন্দ্রের তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ কুকুরের চীৎকারে জাগ্রত হইয়া সে শয্যায় উঠিয়া বসিল। ক্ষণপরে শুনিল, বাহিরে কে যেন মৃদু কোমল কণ্ঠে কুকুরকে শান্ত করিতেছে। শৈলেশ লম্ফ দিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া হারিকেনটা হাতে লইয়া বন্দুকের সন্ধান করিতে গেল। যাইবার কিন্তু প্রয়োজন হইল না। সে কোমল নারীকণ্ঠে "রেণু!" সম্বোধন শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দ্বার মুক্ত করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "কে ?"

এ কি স্বপ্ন ? জ্যোৎস্নার দুগ্ধস্নিগ্ধ ধবলিমায় স্নাত হইয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কে ওই তরুণী ? এ কি তাহার দৃষ্টিভ্রম ?

শৈলেশ দীর্ঘ চরণবিন্যাস করিয়া অঙ্গনে নামিয়া বিস্মিত আগ্রহান্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ? এত রাত্রে ? আসুন, দাঁড়িয়ে কেন ? দিদিকে ডেকে দেবো কি ?"

শৈলেশ একনিশ্বাসে ঝড়ের বেগে কথা কয়টা বলিয়া গেল। কিন্তু শান্তিলতার কর্ণকুহরে কথাগুলি পশিয়াছিল কি না সন্দেহ—সে আকুল উদ্বেগ ও শঙ্কাজড়িত কম্পিত স্বরে বলিল, "বাবার বড় অসুখ, একটি পুরুষমানুষ নেই, আপনি একবার আসবেন কি ?" কথাটা বলিয়া শান্তি শৈলেশের মুখের দিকে ব্যাকুল মিনতিভরা নয়ন দুইটি স্থাপন করিল।

শৈলেশ বলিল, "অসুখ ? সে কি, এই ত বিকেলে—"

"হাঁ, বিকেল কেন, সন্ধ্যে অবধি কিছু ছিল না। বাড়ীতে ফিরে এসে খাওয়াদাওয়ার পর রাত ১১টায় সময় একবার দাস্ত হয়েছে। তার পর এই খানিকক্ষণ আগে একবার বমি করেই হাতে পায়ে খিল ধরেছে। শৈলেশ বাবু, কি হবে ?" শান্তির কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, তাহার নয়নকোণে অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল।

শৈলেশ ব্যস্তভাবে বলিল, "চলুন, দেখি গিয়ে। ভয় কি ? ও অমন হয়ে থাকে।"

দু'জনে নীরবে অগ্রসর হইল। শান্তিলতার মনের মধ্যে আশঙ্কা, উদ্বেগ ও দুঃখের তুফান গর্জ্জন করিতেছিল। কিন্তু আকাশে চাঁদ যেমন নিত্য হাসে, তেমনই হাসিতেছিল, সে হাসিতে যোগ দিয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছিল।

"তার পর ভাই, সেই যে ছেলে রুগী নিয়ে বোস্‌লো, আর উঠলো না, আমাদের কাউকে ঘরে ঢুকতে দিলে না, হাতে করে কলেরার ময়লা আর বমি মুক্ত করতে লাগলো! আহা বেঁচে থাক বাছা, আমার মাথায় যত চুল, ওর তত পরমায়ু হোক। এমন ছেলে না হলে গর্ভে ধরে সুখ আছে ?"—কথাটা বলিতে বলিতে শান্তিলতার জননী মায়া দেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রতিভাদের বাড়ীতে তাঁহার সহিত প্রতিভাসুন্দরীর কথা হইতেছিল।

প্রতিভা বলিল, "কেন দিদি, এ ত সবাই করে' থাকে। শৈল তার কর্ত্তব্য করেছে, এতে আপনি এত কথা বলে আমায় লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?"

"সবাই করে' থাকে ? হাঁ, তা বটে। এদ্দিন এসেছি, সবাই আমাদের ঠেলে রেখেছে, যেন আমরা পেলেগের রুগী। বিদেশ বিভুঁই, উনি একলা পুরুষমানুষ, আমাদের কি অবস্থা হয়েছিল বল দিকি ? শৈল না এলে কি হত আমাদের, তা আমিই বুঝতে পারছি। সেই রাত্তিরে তোমাদের দিয়ে দেওঘর থেকে ডাক্তার আনতে পাঠায়, নিজে রুগী নিয়ে বসে, ফিনাইল দিয়ে ঘর দোর সাফ করে। আহা বাছা আমার সারা রাত চোখের পাতা

এক করেনি! পরের দিন উনি একটু সামলে উঠলে বাছার হাত ধরে কাকুতি মিনতি করলে উঠে গিয়ে চান করে একটু মিছরির জল মুখে দিলে, তাও বেলা একটার সময়। এমন ছেলে গর্ভে ধরলে নারীজন্ম সার্থক হয়!"

উপর্য্যুপরি ভ্রাতার প্রশংসাবাদে প্রতিভা পরমানন্দ লাভ করিলেও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কথাটা অন্ত পথে চালাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলেন, "এই যে বলছিলেন, সবাই আপনাদের ঠেলে রেখেছে, তা আমরা ত তাদের দশজনের একজন, আমরা ত ঠেলিনি।"

মায়াদেবী ক্ষণেক নীরব রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "সত্যি কথা বলতে বল যদি বোন, তা হলে বলি, এদ্দিন তোমরাও আমাদের দূরে রেখে এসেছ।"

"বাঃ তা কেমন করে হবে? আমি ত আপনাদের সঙ্গে কত কথা কয়েছি, আপনাদের বাড়ীতে পিসীমাকে পাঠিয়েছি, রেণুকে পাঠিয়েছি। আমার তখন নড়বার ক্ষমতা ছিল না। দেখছেন ত, আমার বাড়ীর গেটে চেয়ারে করে নামিয়েছিল।"

"তার আগে যে অনেক কিছু হয়ে গিয়েছিল বোন, তা ত তোমরা জানতে না। এখানে এসেই দেখি, সবাই যেন আমাদের চিড়িয়াখানার জানোয়ার মনে করে তামাসা দেখে—যেন আমরা বাঙ্গালী না, আর কিছু।"

"সেটা কাদের দোষ দিদি? আপনারা যদি বাঙ্গালীর মত থাকেন, বাঙ্গালীকে আপনার করে নেন, তা হলে তারাও আপনাদের আপনার করে নেয়। তা নয়, সাহেব সেজে থাকলে, বাবুর্চ্চি খানসামা রাখলে, নিজের ঘরে দোর দিয়ে বসে থাকলে, কারুর সঙ্গে না মিশলে তারাই বা আপনাদের কাছে ঘেঁসবে কেন? তারাও বড়লোক মনে করে দূরে সরে যাবে। রাগ করবেন না দিদি, আমি বড় কঁ্যাটকেঁটে, ওটা আমার স্বভাব।"

মায়াদেবী প্রশংসমান দৃষ্টিতে প্রতিভার দিকে চাহিয়া তাঁহার হাত দুইখানি দুইহাতে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি খোসামুদে বন্ধু চাইনে, এই রকম কঁ্যাটকেঁটে বন্ধুই চাই। সত্যিই বোন, আজ তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছ। উনি সত্যিই একটু মন-গুমুরে লোক। বাপের এক ছেলে, বিশেষ আদুরে ছেলে ছিলেন, তার পর বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখে এসে কেমন একরকম সাহেবী মেজাজ হয়ে গেছেন। ব্যারিষ্টারী দু তিন বছর করেই ছেড়ে দিয়েছেন—অভাব নেই ত কিছুর। তাই লোকে ওঁকে অমনই দেখে। কিন্তু ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবে, ওঁর মনটি একেবারে সাদা, একবারে ছেলেমানুষের মত সরল, দেমাক অহঙ্কার কাকে বলে জানেন না। আমি স্ত্রী বলে বলছি না, যে ব্যবহার করে দেখেছে, সেই বলেছে। যাক্, আজ উঠলুম ভাই, তবে যাবার আগে একটা ভিক্ষে চেয়ে যাব, যেন অমূল্য বলে আমায় নিরাশ কোরো না।"

প্রতিভা বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ভিক্ষে? আমার কাছে? সে কি?"

"সব বলছি ভাই। উনি আর এখানে থাকতে চাইছেন না, বোধ হয়, আসছে হপ্তায়ই আমরা কলকাতায় চলে যাব। তার আগে কথাটা পাকা করে যেতে চাই।"

"কি বল?"

"তোমার ভাইটীকে আমায় দাও ভাই। আমার ছেলে নেই, ঐ একটী মেয়ে। ছেলের সুখ কখনও পাইনি—কিন্তু শৈলর ওপর আমার যে মায়া বসেছে, তাই যদি ছেলের সুখ হয়, তা হলে বলতে হবে, ছেলে কোলে ধরার মত সুখ মেয়েমানুষের নেই। কর্ত্তারও ছেলেটাকে এত মনে ধরেছে—"

"ভাইকে দেবো? তার মানে?"

"পুষ্যিপুত্তুর নোবো, ভাবছ? হাঃ হাঃ তা নয়। আমরা ভিক্ষে চাইছি, আমাদের ঐ একটা মেয়ে—মেয়েটাকে তুমি দেখেছো, কুচ্ছিত বলতে পার না, লেখাপড়া গানটানও জানে—ঐ মেয়েটার একটা হিল্লে হয়ে যায়। আমরা শৈলর হাতে আমাদের শান্তিকে

দিতে চাই। তাই, এতে অমত কোরো না, আমরা খৃষ্টান নই, বাঙ্গালী কায়স্থ।" কথাটা বলিয়া তিনি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠাভরে প্রতিভার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

প্রতিভা প্রথমটা বিস্মিত হইয়াছিলেন—এমন প্রস্তাব যে ইঁহাদের তরফ হইতে আসিতে পারে ইহা তিনি মনেও করিতে পারেন নাই—তাই প্রথমে নীরব ছিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার মেয়ের সঙ্গে? শান্তির সঙ্গে?"

"হাঁ বোন্, এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন? ভাবছ, ও শৈলর মত ছেলের উপযুক্ত না? শুধু লেখাপড়া গান বাজনা না, গেরোস্থালীর সব কায জানে—ছুঁচের কায, পশমের কায, রান্নাবান্নাও ওর ঝকঝকে তকতকে। আর—আর ওর বাবার যা কিছু আছে—"

"না, না, তা বলছি না। আমি ভাবছি, আমাদের মত গেরোস্তোর ঘরে—"

"ও খুব সুখেই থাকবে। তুমি অমত কোরো না বোন—তা হলে ওঁদের বড় আশায় হতাশ হ'তে হবে। শুনেছি তোমাদের বাপ মা নেই, তুমিই শৈলর আপনার বলতে একা। তা হলে সব পাকা হয়েই রইল? কি বল? না, না, আর ওজর শুনবো না, লক্ষ্মী দিদি। ভগবান করুন শিগির সেরে ওঠ, সব বজায় রাখ। আজ তা হলে উঠি।"

মায়াদেবী বিদায় গ্রহণ করিবার পরেও প্রতিভা বহুক্ষণ চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বিধাতার একি অভাবনীয় যোগাযোগ!

বিবাহের পর একদিন শৈলেশচন্দ্র পত্নীকে বলিল, "কি দেখে যে আমায় পছন্দ হল, তা'ত বলতে পারিনে। প্রথম দেখা হতেই যে করে' আমার দিকে চেয়েছিলে!"

শান্তি মন-ভুলানো হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, এখনই বা কি কম করে চাইছি?"

শৈলেশ তাহার কুঞ্চিত কুন্তলে মৃদু করস্পর্শ করিয়া বলিল, "সত্যি শান্তি, দারোয়ার বুকে যখন তোমায় আমায় প্রথম দেখা, তখন তোমার সেই চাউনি এখনও মনে হলে বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। কি করে' অমন কঠিন হয়েছিলে, এখন দেখে ত বুঝতেই পারিনি।"

শান্তি প্রেমপুলকিত নয়নে স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিল, "খুব পুরুষমানুষ ত মশাই তা হলে! যাক এখন আর বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে না?"

শৈলেশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "না শান্তি, তামাসা না, সত্যিই তোমায় আমি ঠিক চিনতে পারি নি, তুমি সত্যিই মতিরা!"

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল, "মতিরা? সে কি?"

শৈলেশ বলিল, "শেঠজী দাদাবাবুর মক্কেল, সে তাঁকে একটা তরমুজ পাঠিয়ে দিয়েছিলো, শুনেছিলুম তার নাম মতিরা। সে তরমুজ নাকি বিকানীরের মরুভূমিতে জন্মায়। ভেতরটা তার কি সুন্দর টুকটুকে—আর খেতে মিষ্টি—চিনি দিয়ে খেতে হয় না। যেমন সুগন্ধ, তেমনই তার!"

শান্তির উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সে বলিল, "তাতে কি হ'ল? আমার কথায় মতিরা এলো কেন?"

শৈলেশ হাসিয়া বলিল, "তাও বলতে হবে? তুমি আমার সেই মতিরা—বাইরেটা বিকানীরের মরুভূমি, ভেতরটা সুন্দর টুকটুকে আর মিষ্টি—চিনি দিয়ে খেতে হয় না।"

"যাও, তুমি বড় দুষ্টু!"—কথাটা বলিয়া স্বামীর আদরে আদরিণী শান্তি স্বভাবগৌর সুন্দর মুখখানি আরও রাঙা করিয়া স্বামীর বুকের মধ্যে একেবারে লুকাইয়া ফেলিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ব-কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত ২২শে বৈশাখ ইউরোপ-যাত্রা করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার স্বাস্থ্য বড়ই মন্দ হইয়াছে, তিনি মধ্যে মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন। এই কারণে এখানকার চিকিৎসকগণ তাঁহাকে শীতপ্রধান স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থানের পরামর্শ দিয়াছেন; তাঁহারা বিশ্ব-কবিকে কিছুকাল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের কথাও বলিয়াছেন। কবিবর চিকিৎসকগণের প্রথম পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় পরামর্শটী গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব, মস্তিষ্কের পরিচালনা তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি আপাততঃ ইউরোপের যে স্থান তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, সেই স্থানেই কিছু দিন বাস করিবেন। তাহার পর শীত ঋতুর প্রারম্ভেই তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হইবে। সেখানে হিবার্ট বক্তৃতা প্রদান করিতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এ দেশের মনস্বিবর্গের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন; সুতরাং এই কয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে সেই বক্তৃতা লিখিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর আরও কত স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিবে এবং তিনি সকল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না, ইহা আমরা বেশ জানি। আর বিলাতেই যান, কি অষ্ট্রেলিয়াতেই যান, বাঙ্গলা সাময়িক পত্রাদির রসদ তাঁহাকে যোগাইতেই হইবে। সুতরাং বিশ্রাম তিনি পাইবেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সকলের চিন্তাদূর এবং আশা পূর্ণ করিবেন। বিগত ২৫শে বৈশাখ তিনি ৬৭ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া ৬৮ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিশ্ব-ভারতীর সদস্যগণ ও অন্যান্য ভদ্রলোকবর্গ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই অভিনন্দন-উৎসবে তাঁহার গুণমুগ্ধ অনেক ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে উৎসব-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে তাঁহাকে তুলাদণ্ডের একদিকে উপবেশন করাইয়া অন্য দিকে তাঁহার পুস্তকাবলী দিয়া তাঁহার তৌল করা হয়। সেই সকল পুস্তক বাঙ্গালা দেশের পাঠাগার সমূহে বিতরিত হইবে। কবির দীর্ঘ জীবন কামনায় এই উৎসব সর্ব্বাংশেই সুন্দর হইয়াছিল।

পরলোকগত দেশনায়ক মহামতি গোখলে এক সময় বলিয়াছিলেন, আজ বাঙ্গালা যাহা করিবে, কা'ল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তাহারই অনুসরণ করিবে; অর্থাৎ সে সময় বাঙ্গালা দেশই সকল কার্য্যের সকল প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ছিল। এখন আর সে কথা বলিবার উপায় নাই, বাঙ্গালা দেশের সে গৌরবের দিন চলিয়া গিয়াছে। এক সময়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান ন্যাসন্যাল কন্‌গ্রেসে বাঙ্গালীই অগ্রণী ছিল, স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালা দেশেই প্রথম আরম্ভ হয়, অন্তরীণের দুর্ভোগ বাঙ্গালীই প্রথম ভুগিয়াছে এবং এখনও ভুগিতেছে, নবীনের জাগরণ বাঙ্গালা দেশেই প্রথম আরম্ভ হয়। কিন্তু, এখন সকল বিষয়েই বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। কন্‌গ্রেসের নেতৃত্ব আর বাঙ্গালীর নাই, হিন্দু-মহাসভার কর্ত্তৃত্বও এখন বাঙ্গালীর হাতে নাই, স্বদেশী আন্দোলনও মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়, বাঙ্গালা সাহিত্য যে ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, এখন সে উদ্যম, সে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সাহিত্য-ক্ষেত্র এখন যেন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; ঝগড়া কলহ, পর-শ্রী কাতরতা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রকে পাইয়া বসিয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের দিকে দৃষ্টি করিলেও আমরা অবনতিই দেখিতে পাইতেছি, অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের মধ্যে তেমন একাগ্রতা নাই, ছাত্রগণের ভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহারও ব্যতিক্রম হইয়াছে; প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও বাঙ্গালী ছাত্রগণ পরাজিত হইতেছে। সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, এদেশে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা হয়, তাহাতে একজনও বাঙ্গালী ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই; যে কয়জন এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ছাত্র। সকল দিকেই এই যে অবনতি, এই যে অবসাদ, ইহা বাঙ্গালীর কলঙ্কের কথা। দেশের নেতা বলিয়া যাঁহারা অভিহিত হইতেছেন, তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং দুঃখের কথা এই যে, সে দিকেও তাঁহারা অগ্রণী হইতে পারিতেছেন না, পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণের কথা যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই সর্ব্ববিধ অবনতির কারণ নির্ণয় ও তৎপ্রতীকারের ব্যবস্থা করা এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

এবার সেদিন ময়মনসিংহে হিন্দু-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে যথেষ্ট লোক-সমাগম হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসঙ্গের মহারাজ বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। উভয় সভাপতির অভিভাষণই সুন্দর হইয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় গোঁড়া হিন্দু মতেরই সমর্থন করিবেন, সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত গতানুগতিকতারই গুণ গান করিবেন; কিন্তু, তর্কভূষণ মহাশয় তেজস্বী স্যায়পরায়ণ হিন্দুর স্যায় যাহা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর কর্ত্তব্য, তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন; অস্পৃশ্য জাতির উন্নয়ন, শুদ্ধি, সমদর্শিতা প্রভৃতির সমর্থনই তিনি করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথাও তিনি বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার একটী কথাও সঙ্কীর্ণতা দোষদুষ্ট হয় নাই। ময়মনসিংহের হিন্দু-মহাসভায় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আলোচনা বা মন্তব্য গ্রহণ করা হয় নাই, সেই জন্য কেহ কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আলোচনা মহাসভায় না করাই সঙ্গত হইয়াছে। মহাসভার পরিচালকবর্গের চেষ্টা ও যত্ন সফল হইয়াছে, সভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এখন কথা এই যে, সভায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা না হইলে, এত বিরাট আয়োজন, এত বক্তৃতা সম্পূর্ণই তামাসায় পর্য্যবসিত হইবে।

বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার প্রায় সর্ব্বত্র ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বোলপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির অবস্থা অতীব শোচনীয়। বহু লোক অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে আছে; ক্ষুধার জ্বালায় গাছের পাতা খাইতেছে। বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের অবস্থাও তদ্রূপ; সেখানেও অন্নকষ্ট, হাহাকার! একে লোকে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর, তাহার উপর দেশব্যাপী জলকষ্ট। অন্ন ও জল দুয়েরই অভাব। আমাদের এক বন্ধু সেদিন মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুরে গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, জঙ্গীপুরে গঙ্গার এমন দুরবস্থা যে জুতা পায়ে দিয়াই তিনি গঙ্গাপার হইয়া গিয়াছিলেন। খাল বিল পুষ্করিণী সমস্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থানেরই অবস্থা এই প্রকার। গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, দেশের জনসাধারণও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। বোলপুর শান্তি-নিকেতনে সাহায্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাঁকুড়াতেও বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে।

আগামী ৩১শে মে মুসলমানগণের 'ঈদ' উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। যাহাতে এ বৎসরের ঈদের কোরবানি ও অন্যান্য উৎসব শান্তিতে নিষ্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য দিল্লীর মুসলমান নেতৃগণ এখন হইতেই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখিয়া এবং পুস্তকাদি বিতরণ করিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও শক্তিই সকল ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। যাহাতে এই উদ্দেশ্যানুযায়ী কায হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ইতিমধ্যেই তথায় একটী শান্তি-বৈঠক গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে ঈদ ও কোরবানি লইয়া পূর্ব্বে কোন গোলযোগই ছিল না, এখন যেটুকু হইয়াছে তাহাও অন্য প্রদেশের তুলনায় অল্প। আমরা আশা করি দেশ হইতে সাম্প্রদায়িক বিরোধের শেষ বহ্নিটুকু নির্ব্বাপিত করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দ অগ্রসর হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৯২৬-২৭ সালে কলিকাতায় যত লোক মারা গিয়াছে তাহা শতকরা দশভাগ যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। এই যক্ষ্মারোগ কেবল কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ নহে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন হাঁসপাতাল খোলেন নাই। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মেডিক্যাল এইড ও রিসার্চ্চ সোসাইটীর চেষ্টায় যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে চন্দ্রমোহন ঘোষ স্যানিটেরিয়ম নামে একটি হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য হাঁসপাতালটী বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। আমরা অবগত হইলাম যে, এই হাঁসপাতালের জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক লক্ষ টাকা দেওয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপ কার্য্যের জন্য এক লক্ষ টাকা টাকা যে নিতান্ত অল্প তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক আমরা আশা করি যে, হাঁসপাতালটীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া গভর্ণমেণ্ট টাকাটা অবিলম্বে মঞ্জুর করিবেন এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর পরিচালিত পাটের কল একটিও নাই। যে সব কল বাঙ্গালীর আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই সাহেবদের পরিচালিত, ইদানীং মারোয়াড়ীদের দুই

তিনটি পাটের কল হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ভাগ্যকুলের ধনকুবের কুণ্ডু মহাশয়গণের উদ্যোগে শীঘ্রই বাঙ্গালাদেশে ৮০ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি পাটের কল স্থাপিত হইবে। কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী লাহা মহাশয়েরাও এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। কুণ্ডু ও লাহা মহাশয়গণের সমবেত চেষ্টায় এই পাটের কল যে সুন্দরভাবে চলিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই, কারণ ব্যবসায়ী হিসাবে এই দুই ধনী পরিবার কলিকাতা সহরে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন। এ দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বলিতে গেলে বিদেশীয় ও অন্য প্রদেশবাসী ভারতীয়গণেরই হস্তগত হইয়া পড়িয়াছে; এ অবস্থায় বাঙ্গালীদিগের এই আয়োজন সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এই সঙ্কল্পিত পাটের কলের সাফল্য দৃষ্টে আরও অনেকে যে এই প্রকার কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শোকসংবাদ

৺বীণাপাণি দেবী

নানা মাসিক পত্রের লেখিকা, সুকবি শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, বিগত ২৩শে বৈশাখ, তাঁহার ভবানীপুর বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা একান্ত দুঃখিত হইলাম। তাঁহার বয়স অল্প ছিল, ৩।৪ বৎসর মাত্র তিনি সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মানসী ও মর্ম্মবাণীতে মাঝে মাঝে আমরা তাঁহার কবিতা প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার রচনাশক্তি সম্যক রূপে পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে "সঞ্জীবনী" নামে তাঁহার একখানি উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমতী বীণাপাণি, জয়পুর মহারাজার কলেজের অধ্যক্ষ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের দুহিতা এবং কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

২। শিশিরকুমার রায়

কলিকাতা রিভিউ পত্রের ম্যানেজার, সুলেখক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় এম-এ বিগত ২২শে বৈশাখ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন, এ সংবাদও আমাদিগকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত করিয়াছে। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যে কেবল কলিকাতা রিভিউয়ের ম্যানেজারই ছিলেন, তাহা নহে—ঐ পত্রে মাঝে মাঝে তাঁহার সুচিন্তিত রচনাবলীও প্রকাশিত হইত। কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। মাত্র ৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পাবনার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ৺সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একটি মাত্র ৮ মাসের শিশুপুত্রকে রাখিয়া তিনি গিয়াছেন। তাঁহার বর্ষীয়সী বিধবা জননী বর্ত্তমান। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের চিত্তে শ্রীভগবান সান্ত্বনাবারি সেচন করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ও রূপ তোমার

আমি যে রেখেছি ও রূপ তোমার,
আমার মনের মুকুরে,
সেথায় সে আর নহে ত সাকার
নয়নে অধরে চিকুরে।
কৃশ তনুখার কৃশানু বরণ,
হাসির আলোর আলেয়া,
কমল ফুটায়ে চলে যে চরণ
সকলে মিলিয়া সে ছায়া!

এমনি কি তবে নিখিল ভুবন,
তরু তৃণদলে কাননে,
সুনীল আকাশ কুসুমিত বন
শোভন মানব আননে!
করিছে রচনা সবে একাধারে
যে রূপ চোখের উপরে,
ভাবের আভাস, আলোকে আঁধারে,
তনুর তরুণ নিঝরে?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

চুরির অসুবিধা

(গল্প)
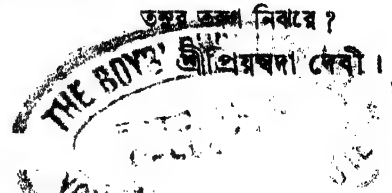
জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া খবর দিল—"পৃথিবী" পত্রিকার অফিসে এক ভদ্রলোক চোর খুব ধরা পড়ে গেছে হে।"

শক্তিময় বলিল, "ভদ্রলোক চোর ? ব্যাপারটা কি ?"

জ্যোতির্ম্ময় যে খবর দিল তাহার সারমর্ম্ম এই—এক ভদ্রলোক স্বরলিপি সমেত একটা গান স্বরচিত বলিয়া পত্রিকায় ছাপাইবার জন্ম দিয়া আসিয়াছিলেন। গানটি পত্রিকার জন্ম যথারীতি মনোনীতও হইয়াছিল। পরে একদিন সেই ভদ্রলোক "পৃথিবী" অফিসে আসিয়া গানটি নিজে গাহিয়া সকলকে শুনাইয়া দিতেছিলেন। গানের শেষের দিকে একজন আগন্তুক আসিয়া বসিলেন। গান শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "মহাশয় অনুগ্রহ করে গানটা আর একবার গাইবেন কি ? অনেক দিন পরে গানটা আবার শুনতে পেলাম।"—সকলেই চমকাইয়া উঠিলেন, গানটা তবে অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে না কি ? অনুসন্ধানে জানা গেল যে গানটা শুধু গাওয়াই হয় নাই, দশ বৎসর পূর্ব্বে একটা পত্রিকায় ছাপাও হইয়াছিল।

শক্তিময় বলিয়া উঠিল, "লোকটা কি বেকুব ! দশ-বৎসর আগেকার গান ছাপাতে গেল কোন হিসাবে ? আরও দশ বৎসর পেছিয়ে গেলেই হত।"

জ্যোতির্ম্ময়। একই কথা ; পুরাণো জিনিষ কি চলে ? কেউ না কেউ ধরে ফেলতই।

শক্তিময়। বটে ? পুরানো জিনিষ চলে না ? বাজি রাখো আমার সঙ্গে—আমি পুরাণো জিনিষ চালিয়ে দিচ্ছি।

স্থির হইল, গান নয়, বিশ বৎসরের পুরাণো একটা গল্প শক্তিময় বর্ত্তমানের যে কোন মাসিক পত্রিকায় চালাইয়া দিবে।

শক্তিময় লাইব্রেরীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। লাইব্রেরিয়ানকে বলিল যে সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে সে একটা প্রবন্ধ লিখিবার জন্ম অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

লাইব্রেরিয়ান খুব আগ্রহ করিয়া সংগৃহীত পুরাতন মাসিক পত্রিকা সকল দেখাইতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে পাওয়া গেল, কাশীধাম হইতে বিশবৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'পথিক' নামে এক বৎসরের বাঁধানো মাসিক পত্রিকা। ভূমিকা এবং শেষ পৃষ্ঠার নিবেদন পড়িয়া দেখা গেল যে পত্রিকাখানার আয়ু ঐ এক বৎসরেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার একটি গল্প শক্তিময়ের বেশ পসন্দ হইল। গল্পটির নাম "বিভ্রান্ত"; গল্পলেখকের নামের উল্লেখ নাই। শক্তিময় এই বিশেষ করিয়া বাছিয়া লইল এই মনে করিয়া যে, পত্রিকাখানা কাশী হইতে প্রকাশিত এবং এক বৎসরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, গল্পটির লেখকও অজ্ঞাতনামা—কলিকাতায় এই গল্পটির প্রচার না হইয়া থাকারই সম্ভাবনা।

শক্তিময় গল্পটি নকল করিয়া "বাণীসেবক" আফিসে পাঠাইয়া দিল, কারণ তখন গল্প-সাহিত্য ছিল বাণীসেবকের বিশেষত্ব। অতিরিক্ত বাহাদুরীর প্রত্যাশায় গল্পটির সমস্তই বজায় রাখা হইল।

কিছুদিন যায়। জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করে, "বাজির কি হল ?" শক্তিময় বলে, "হবে হবে- ফলেন পরিচীয়তে।"

একদিন জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া শক্তিময়ের বাসায় বসিয়াছে ; এমন সময় ডাক আসিল। "বাণীসেবক" অফিস হইতে গল্প ফেরত আসিয়াছে সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ চিঠি—

বাণীসেবক অফিস

২২শে ভাদ্র।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত গল্পটি খুব ঔৎসুক্যের সহিত পড়িলাম। গল্পটি চমৎকার হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি ইহার যতটা প্রশংসা করিতে পারি ততটা হয়ত আর কেহ নাও করিতে পারে। কিন্তু গল্পটি ভাল হইলেও পত্রিকায় ছাপিবার পক্ষে সামান্য একটু বাধা আছে—বাধাটা একটু ব্যবহারিক (Technical)। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন কাশীতে "পথিক" পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করি তখন এই গল্পটি সেই পত্রিকার জন্ম আমিই লিখিয়াছিলাম। আপনার পূর্ব্বগামী হইয়া আপনার কার্য্যে অসুবিধা উৎপাদনের জন্ম ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।

ইতি—

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন

সম্পাদক-পক্ষে।

জ্যোতির্ম্ময়। কি হে ব্যাপার কি ?

শক্তিময়। না তেমন কিছু নয়। *

শ্রীসত্যভূষণ সেন।

---

* গল্পটি ইংরেজী হইতে গৃহীত, সেই হিসাবে ইহাতেও চুরির গন্ধ আছে।—লেখক।

সাঁওতাল মেয়ে

Engraved and Printed by
Halftone Press, Calcutta

শিল্পী — শ্রীসন্তোষনাথ মিত্র
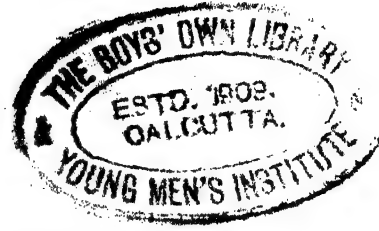
মানসী ও মর্ম্মবাণী

২০শ বর্ষ, ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৩৫ | ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

বেদ-কথা

মাধ্যন্দিন সবন

প্রাতঃসবনের সহিত মাধ্যন্দিন সবনের যোগ রাখিবার জন্য মাধ্যন্দিন সবনের অন্তর্গত কতিপয় অনুষ্ঠান প্রাতঃসবন সমাপ্তির পূর্ব্বেই শেষ করিয়া রাখিতে হয়। প্রাতঃসবনে সবনীয় বস্তুর বপাযাগ পর্য্যন্ত হইয়া আছে, পশ্বঙ্গ যাগ হয় নাই। মাধ্যন্দিন সবনেও পশ্বঙ্গ যাগ হয় না। উহা তৃতীয় সবন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। তবে পশ্বঙ্গের পাকাদি কর্ম্ম তৃতীয় সবনের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া থাকে। পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশাদি যাগ মাধ্যন্দিনেও নূতন করিয়া করিতে হয়, তজ্জন্য পুরোডাশাদি দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া আছে। মাধ্যন্দিনে দুইখানি পুরোডাশ দিতে হয়—অগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপালে একখানি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশ কপালে সংস্কৃত একখানি। পুরোডাশের সহিত ধানা, করম্ভ ও দধিও দিতে হয়, পয়স্যা দিতে হয় না। পশু পুরোডাশের পূর্ব্বে দধিঘর্ম্ম নামক আর একটি দ্রব্যের যাগ মাধ্যন্দিনে বিহিত, প্রাতঃসবনে উহা ছিল না।

মাধ্যন্দিন সবনের সোমাভিষবের বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে, বসতীবরী ও একধনা জলের এক তৃতীয়াংশ জলে অভিষুত সোমরস মাধ্যন্দিনে মিশাইতে হয়। মাধ্যন্দিনে উপাংশু গ্রহ নাই, কাযেই ক্ষুল্লকাভিষবও নাই। একেবারে মহাভিষব। অন্তর্যাম ও দ্বিদেবত্য গ্রহও নাই। শুক্র ও মন্থিগ্রহ আছে।

১ ও ২। শুক্রগ্রহ—মন্থিগ্রহ—এই দুই গ্রহাহুতির নিয়ম প্রাতঃসবনেরই মত। অধ্বর্য্যু শুক্রগ্রহ ও প্রতিপ্রস্থাতা মন্থিগ্রহ হোম করেন। পরে চমসাহুতি প্রাতঃসবনবৎ। প্রভেদ এই যে, প্রাতঃসবনে অচ্ছাবাকের চমস প্রথমে বর্জ্জন করা হইয়াছিল, মাধ্যন্দিন সবনে উহার বর্জ্জন হয় না। দশ চমস হইতেই হোম হয়। হোমশেষ ও চমসশেষ পীত হয়।

৩। মরুত্বতীয় গ্রহ—ইন্দ্র মরুত্বানের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু একটি ঋতুপাত্রে সোম লইয়া আহুতি দেন; এই আহুতির পূর্ব্বে যাজ্যামাত্র পঠিত হয়, শস্ত্র হয় না। হোমশেষ ভক্ষিত হয়। তৎপরেই অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েই

এক একটি ঋতুপাত্র দ্রোণকলশ বা পূতভৃৎ হইতে সোম পূর্ণ করিয়া ইন্দ্র মরুত্বানের উদ্দেশে আহুতি দেন। ইহার পূর্ব্বে হোতা মরুত্বতীয় শস্ত্র পাঠ করেন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মাধ্যন্দিন-পবমান-স্তোত্র কিছু পূর্ব্বেই (শুক্র ও মন্থিগ্রহ যাগের পূর্ব্বেই) ঔদুম্বরী পার্শ্বে (চাত্বাল নিকটে নহে) গীত হইয়াছে। আহুতির পর চমস কম্পন (চমসাহুতি নহে)। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তার গ্রহশেষ পান, চমসীদের চমসস্থিত সোমপান।

৪। মাহেন্দ্র গ্রহ—মহেন্দ্রের উদ্দিষ্ট। অধ্বর্য্যু দ্রোণ কলশ হইতে শুক্রপাত্রে সোম গ্রহণ করিয়া আহুতি দেন। তৎপূর্ব্বে হোতা নিষ্কেবল্য শস্ত্র পাঠ করেন। তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী স্তোত্রের নাম পৃষ্ঠ স্তোত্র। গ্রহাহুতির পর চমস-কম্পন। গ্রহশেষ ভক্ষণ ও চমস ভক্ষণ পূর্ব্ববৎ।

৫। উক্‌থ্যগ্রহ—প্রাতঃসবনে যেমন উক্‌থ্য স্থালীর রস তিন ভাগ করিয়া উক্‌থ্য পাত্রে লইয়া তিন বারে আহুতি হয়, মাধ্যন্দিনেও ঠিক সেইরূপ। হোমকর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তা, গ্রহশেষ ভক্ষণ, চমসাহুতি, চমসশেষ ভক্ষণও প্রাতঃসবনবৎ। তিন বারের তিন শস্ত্রেরই নাম নিষ্কেবল্য শস্ত্র ও স্তোত্রের নাম পৃষ্ঠ স্তোত্র।

উক্‌থ্যগ্রহ-হোমে মাধ্যন্দিন সবন সমাপ্ত হয়।

তৃতীয় সবন

মাধ্যন্দিন সবনের সহিত তৃতীয় সবনের যোগ রাখিবার জন্ত তৃতীয় সবনের সোমাভিষব মাধ্যন্দিন সমাপ্তির পূর্ব্বেই করিয়া রাখিতে হয়। তৃতীয় সবনের অভিষব সংক্ষিপ্ত। অল্প সোমরস আবশ্যক, উহা একখানা বৃহৎ সোমখণ্ড ছেঁচিয়া এবং প্রাতঃসবনের ও মাধ্যন্দিন সবনের সোমের ছিবড়া ছেঁচিয়া বাহির করিতে হয়। বসতীবরী ও একধনার তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, উহা আধবনীয়ে ঢালিয়া সোমরস মিশাইতে হয়। আধবনীয়ের সোমরস দ্রোণকলশে না ঢালিয়া সমস্তই পূতভৃতে ছাঁকিয়া চালিয়া লইতে হয়। পূতভৃতের সোমে আশির (দধি) মিশাইতে হয়।

পশুজ হোম স্থগিত ছিল। উহা তৃতীয় সবনের আরম্ভেই সম্পন্ন করিয়া তৃতীয় সবনের শেষাশেষি পশুজ সম্বন্ধীয় অনুযাজ পত্নীসংযাজাদি কর্ম্ম শেষ করা যায়। পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশ যাগও পৃথক করিয়া করিতে হয়। পুরোডাশের সহিত ধানাদি দিতে হয়, পয়স্যা দিতে হয় না।

তৃতীয় সবনের সোমাহুতিও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে উপাংশু, অন্তর্যাম, দ্বিদেবত্য ত নাই, শুক্র ও মন্থিগ্রহ পর্য্যন্ত নাই। তবে শুক্র ও মন্থিগ্রহের আনুষঙ্গিক চমসাহুতি আছে। পূর্ব্ব সবনে যেরূপে চমসাহুতি হইয়াছিল, এবারও দশচমস হইতেই প্রায় সেইরূপেই আহুতি হয় এবং আহুতির শেষে হোমকর্ত্তা, বষট্‌কর্ত্তা ও চমসীরা চমসশেষ পান করেন।

তৎপরে গ্রহাহুতি—

১। আদিত্যগ্রহ—এই গ্রহাহুতিতে শস্ত্র পঠিত হয় না। আদিত্যস্থালীতে সোমরস সঞ্চিত ছিল, তাহা আদিত্যপাত্রে লইয়া অধ্বর্য্যু যাজ্যান্তে আহুতি দেন। চমসাহুতি নাই।

২। সাবিত্রীগ্রহ—সবিতার উদ্দিষ্ট। আগ্রয়ণ স্থালীতে সোমধারা গৃহীত থাকে। তাহার কিয়দংশ উপাংশু পাত্রে লইয়া উন্নেতা নামক ঋত্বিক্‌ আহুতি দেন। হোতা যাজ্যাপাঠ করেন। শস্ত্রপাঠ নাই। গ্রহশেষও পীত হয় না।

৩। বৈশ্বদেব গ্রহ—বিশ্বদেবগণের উদ্দিষ্ট। ঐ উপাংশু পাত্রেই পূতভৃতের সোমরস লইয়া অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। তৎপূর্ব্বে হোতা বৈশ্বদেব শস্ত্র পাঠ করেন। কিয়ৎপূর্ব্বে ঔদুম্বরী পার্শ্বে আর্ত্তব-পবমান স্তোত্র গীত হইয়াছে।

গ্রহাহুতির পর পূর্ব্বের মত চমস কম্পন। হোম-কর্ত্তা ও বষট্‌কর্ত্তার গ্রহশেষ পান ও চমসীদের চমসস্থ সোমপান।

[এই সময়ে সোমের উদ্দেশে আশির (দধি) মিশ্রিত চরু দেওয়া হয়। এই চরুযাগের বিশেষত্ব এই যে, ইহার পূর্ব্বে আজ্যভাগদান ও পরে স্বিষ্টকৃৎযাগ ও ইড়াভক্ষণ পর্য্যন্ত নাই। চরুশেষ উদ্গাতা ভক্ষণ করেন।

চরুহোমের পর ধিষ্ণ্যগুলিতে একটু করিয়া আজ্য ফেলিয়া দিতে হয়।]

৪। পত্নীব্রত গ্রহ—অগ্নি ও পত্নীবনের উদ্দিষ্ট—আগ্রয়ণ স্থালীস্থিত সোমের আর খানিকটা অন্তর্যাম পাত্রে লইয়া অধ্বর্য্যু আহুতি দেন। শস্ত্র নাই। যাজ্যা-পাঠ করেন এবার অগ্নীৎ। তিনি নেষ্টার কোণে বসিয়া পত্নীব্রত গ্রহশেষ পান করেন। [এই সময়ে নেষ্টা একবার যজমানের পত্নীকে সদোমধ্যে লইয়া আসেন। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, একধনা জল আনিবার সময় পত্নীও দুইটি কলশ জলপূর্ণ করিয়া আনিয়াছিলেন—এই জলের নাম পান্নেজন জল। একটি কলশের জল সবনীয় পশু নিহত হইলে উহার গায়ে ঢালা হইয়াছে, অন্য কলশের জল সহিত পত্নী এই সময়ে সদোমধ্যে প্রবেশ করেন এবং উদ্গাতার সম্মুখে বসিয়া সেই জলে আপনার দক্ষিণ উরুদেশ ধুইয়া ফেলেন। তারপর তিনি যথাস্থানে ফিরিয়া যান।]

৫। আগ্নি-মারুতগ্রহ (ধ্রুবগ্রহ ?)—এই গ্রহ সশস্ত্র গ্রহ। ইহার পূর্ব্বে হোতা আগ্নীমারুত শস্ত্র পাঠ করেন। তৎপূর্ব্বে যজ্ঞাযজ্ঞিয় স্তোত্র গীত হইয়াছে। [এই স্তোত্র গানের সময়েই পত্নী আসিয়া উদ্গাতার সম্মুখে বসিয়া উরুতে জলসেক করিয়াছিলেন] অধ্বর্য্যু এই গ্রহ হোতার চমসে গ্রহণ করেন। অন্য চমসগুলি পূতভৃতের সোমে পূর্ণ করিয়া চমসাধ্বর্য্যুরা স্বয়ং আহুতি দেন। অধ্বর্য্যুও হোতা গ্রহশেষ পান করেন। হোতা তদ্ব্যতীত অন্যান্য চমসেরও শেষ পান করেন। অন্য চমসীরা স্ব স্ব চমসের শেষ পান করেন।

৬। হারিযোজন গ্রহ—হরিবান্ ইন্দ্রের উদ্দিষ্ট। এই গ্রহের হোমের রীতিতে একটু নূতনত্ব আছে। আগ্রয়ণ স্থালীতে এখনও একটু সোমরস অবশিষ্ট আছে। [পূতভৃতে আর সোম নাই, উহা সমুদয়ই চমসে ঢালিয়া হোম করা হইয়াছে।] সেইটুকু দ্রোণ কলশে ঢালিতে হয় ও তাহাতে ধানা (ভাজা যব) মিশাইতে হয়। এই সোমের নাম ধানা সোম। উন্নেতা এই ধানা-সোমপূর্ণ দ্রোণ কলশ মাথায় লইয়া দাঁড়ান। হোতা যাজ্যান্তে বষট্কার ও অনুবষট্কার করিলে উন্নেতাই উহা আহুতি দেন। পরে সকল ঋত্বিকে মিলিয়া ঐ সোমসিক্ত ধানাশেষ ভক্ষণ করে। এইখানে সোমাহুতি শেষ—আর সোমরস কোথাও অবশিষ্ট নাই।"

অতঃপর আর কয়েকটি অনুষ্ঠানেই অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সমাপ্তি হয়।

ঋত্বিকেরা চাত্বালে গিয়া চমসগুলি জলপূর্ণ করিয়া স্পর্শ করেন ও আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্যশালায় প্রবেশ করিয়া দধি ভক্ষণ করেন। পত্নীসংযাগ ইহার পূর্ব্বেই হইয়াছে। উহার পত্নী সংযাজাদি স্থগিত ছিল, তাহা এখন সম্পন্ন হয়।

তৎপরে সামগান শুনিতে শুনিতে সকলে অবভৃথ স্নানের জন্য জলাশয়ে গমন করেন। সোমযাগের সরঞ্জামগুলি জলে ফেলিয়া জলে হোম হয়।

বরুণের উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতির পর সপত্নীক যজমান স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করেন; পরে দেবযজন-ভূমিতে ফিরিয়া উদয়নীয় ইষ্টিযাগ।

প্রায়ণীয় ইষ্টিতে যজ্ঞারম্ভ হইয়াছিল, উদয়নীয় ইষ্টিতে শেষ। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। ইষ্টিযাগের পর একটি পশুযাগ। বন্ধ্যা গাভী, অভাবে উক্ষা (বৃষ) পশুদ্বারা পশুযাগের নিয়মে যাগ হয়—এই যাগের নাম অনুবন্ধ্য পশুযাগ।

পশুযাগের পর মন্থনদ্বারা নূতন অগ্নি উৎপাদন করিয়া সেই অগ্নিতে উদবসানীয় ইষ্টিযাগ। অগ্নির উদ্দেশে পাঁচ কপালে পুরোডাশ দিতে হয়। ইষ্টিযাগের পর বেদিতে আস্তৃত বর্হিঃ জ্বালাইয়া দিতে সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন।

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ব্যয়সাধ্য। অন্ততঃ একশত গাভী ইহাতে দক্ষিণা দিতে হয়। ষোলজন ঋত্বিকের ভাগ এইরূপ—

ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু
প্রত্যেকে ১২টি করিয়া— ... ৪৮টি

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা,
মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্থাতা প্রত্যেক ৬টি করিয়া ...

পোতা, প্রতিহর্ত্তা, আচ্ছাবাক, নেষ্টা

প্রত্যেকে ৪টি করিয়া— ১৬টি

অগ্নীৎ, সুব্রহ্মণ্য, গ্রাবস্তুৎ,
উন্নেতা প্রত্যেকে ৩টি করিয়া— ১২টি

১০০টি

এই গাভী ব্যতীত হিরণ্য, অশ্ব (একটি), বস্ত্র, ক্ষীর-মিশ্রিত শক্তু, তিল ইত্যাদি দক্ষিণা দিতে হয়। এ সকলেরও ভাগ ঐ অনুপাতে। এতদ্ভিন্ন চমসাধ্বর্য্যু প্রবৃত্তিকেও যথাসম্ভব দক্ষিণা পৃথক্ রূপে দিতে হয়। মাধ্যন্দিন সবন মধ্যে দক্ষিণাদানের বিধান।

ব্যয়সাধ্য বলিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সুসাধ্য ছিল না। তবে যে ব্রাহ্মণের পিতা পিতামহ দুই পুরুষে অগ্নিষ্টোম না করিয়াছেন, তিনি দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন এবং প্রায়শ্চিত্তের পর তিনি অগ্নিষ্টোমে অধিকারী হইতেন।

স্তোত্র ও শস্ত্র

শস্ত্রপাঠ ও স্তোত্রগান সোমযজ্ঞের বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রত্যেক সবনে নানা দেবতার উদ্দেশে সোমাহুতি হয়। তন্মধ্যে যে কয়টি আহুতি প্রধান, তৎপূর্ব্বে শস্ত্রপাঠের বিধান আছে। শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে স্তোত্রগান হয়। প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে স্তোত্রগান বিহিত; কাযেই যতগুলি শস্ত্র ততগুলি স্তোত্র। যে ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার সংশন, প্রশংসা বা স্তুতি হয়, তাহার নাম শস্ত্র। ইহার নামান্তর উক্‌থ। হোতা এবং তিনজন হোত্রক (মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অচ্ছাবাক্) এই চারিজনের মধ্যে কোন একজন সদোমধ্যে আপনার নির্দ্দিষ্ট ধিষ্ণ্যের নিকট বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। তৎপূর্ব্বে উদ্‌গাতা এবং তাঁহার সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা এই তিনজন সামগায়ী ঋত্বিক্ মিলিয়া স্তোত্রগান করেন। শস্ত্রান্তে শস্ত্রপাঠক যাজ্যামন্ত্র পড়িয়া বষট্‌কার ও অনুবষট্‌কার করেন। বষটকার কালে ও অনুবষটকার কালে হোমকর্ত্তা (অধ্বর্য্যু অথবা প্রতিপ্রস্থাতা) উত্তর বেদির নাভিস্থিত আহবনীয় অগ্নিতে সোমরসের আহুতি দেন।

কোন্ সোমাহুতির পূর্ব্বে কোন্ শস্ত্র পঠিত ও কোন্ স্তোত্র গীত হয়, শস্ত্রপাঠকের (বৌষটকর্ত্তার) ও হোম-কর্ত্তার নামের সহিত তাহা নিম্নের তালিকায় দেখান যাইতেছে—

প্রাতঃসবন

স্তোত্র	শস্ত্র	সোমাহুতি	উদ্দিষ্ট দেবতা	শস্ত্রপাঠক বষট্‌কর্ত্তা	হোমকর্ত্তা
বহিষ্পবমান	আজ্যশস্ত্র	ঐন্দ্রাগ্নগ্রহ	ইন্দ্র ও অগ্নি	হোতা	অধ্বর্য্যু
আজ্যস্তোত্র	প্রউগশস্ত্র	বৈশ্বদেবগ্রহ	বিশ্বদেবগণ	ঐ	ঐ
ঐ	আজ্যশস্ত্র	উক্‌থ্যগ্রহ	মিত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্র	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	প্রতিপ্রস্থাতা
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্রাগ্নি	অচ্ছাবাক	ঐ

মাধ্যন্দিন সবন

স্তোত্র	শস্ত্র	সোমাহুতি	উদ্দিষ্ট দেবতা	শস্ত্রপাঠক বষট্‌কর্ত্তা	হোমকর্ত্তা
মাধ্যন্দিন পবমান	মরুত্বতীয় শস্ত্র	মরুত্বতীয় গ্রহ	ইন্দ্রমরুত্বান্	হোতা	অধ্বর্য্যু
পৃষ্ঠস্তোত্র	নিষ্কেবল্য শস্ত্র	মাহেন্দ্র গ্রহ	মাহেন্দ্র	হোতা	অধ্বর্য্যু
ঐ	ঐ	উকথ্য গ্রহ	মিত্রাবরুণ	মৈত্রাবরুণ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্র	ব্রাহ্মণাচ্ছংসী	প্রতিপ্রস্থাতা
ঐ	ঐ	ঐ	ইন্দ্রাগ্নি	অচ্ছাবাক	ঐ

তৃতীয় সবন

স্তোত্র	শস্ত্র	সোমাহুতি	উদ্দিষ্ট দেবতা	শস্ত্রপাঠক বষট্ কর্ত্তা	হোমকর্ত্তা
আর্ভব পবমান	বৈশ্বদেব শস্ত্র	বৈশ্বদেব গ্রহ	বিশ্বদেবগণ	হোতা	অধ্বর্য্যু
যজ্ঞাযজ্ঞিয় স্তোত্র	অগ্নিমারুত শস্ত্র	ধ্রুবগ্রহ (?)	অগ্নি ও মরুদ্গণ	হোতা	অধ্বর্য্যু

দেখা যাইতেছে প্রাতঃসবনে পাঁচ, মাধ্যন্দিন সবনে পাচ ও তৃতীয় সবনে ছুই, মোটের উপর বারটি শস্ত্র ও সেই সঙ্গে বারটি স্তোত্র অগ্নিষ্টোমে বিহিত। অগ্নিষ্টোমের বিকৃতি, উকৃথ্য, অতিরাত্র প্রভৃতি সোমযজ্ঞে শস্ত্র ও স্তোত্রের সংখ্যা বারটার অধিক। অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে কেবল হোতার শস্ত্র আছে। হোত্রকদের শস্ত্র নাই। উকৃথ্যাদি যজ্ঞে তৃতীয় সবনে হোত্রকদিগেরও শস্ত্র আছে।

প্রাতঃহোতার প্রথম শস্ত্রের নাম আজ্যশস্ত্র, হোত্রকদের শস্ত্রের নামও আজ্যশস্ত্র। চারিটি শস্ত্রের নাম আজ্য শস্ত্র বটে, কিন্তু তাই বলিয়া শস্ত্র এক নহে। হোতার আজ্য শস্ত্রের অন্তর্গত মন্ত্র আর ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর আজ্যশস্ত্রের মন্ত্র এক নহে, আবার অচ্ছাবাকের মন্ত্রও অন্যরূপ। মাধ্যন্দিন সবনে নিষ্কেবল্য শস্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা।

শস্ত্রপাঠের নিয়ম।

শস্ত্রপাঠের অনেক খুঁটিনাটি নিয়ম আছে। পাঠের পূর্ব্বে শস্ত্রপাঠক সদোগৃহমধ্যে আপনার ধিষ্ণ্যের সম্মুখে পূর্ব্বমুখে বসেন, হোমকর্ত্তাও তাহাকে পিছনে রাখিয়া পূর্ব্বমুখে বসেন। শস্ত্রপাঠক মনে মনে তূষ্ণীংজপ করেন। "সু মৎ পদ্ বগ্ দে পিতা মাতরিশ্বাচ্ছিদ্রা পদাধাৎ অচ্ছিদ্রোবংথাঃ কবঃ শংসন্ সোমো বিশ্ববিন্নীথা নিনেষদ্ বৃহস্পতিরুকথা মদানি শংসিষদ্ বাগায়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বমায়ুঃ ক ইদং শংসিষ্যতি স ইদং শংসিষ্যতি"—এই মন্ত্র মনে মনে আবৃত্তির নাম তূষ্ণীংজপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১০ অধ্যায়, ৬ খণ্ড)।

সম্প্রদায়বিদ্‌গণের মতে তূষ্ণীংজপের আরম্ভে সু, মৎ, পৎ, বক্, দে এই যে পাঁচ অক্ষর উচ্চারিত হয়, ঐ এক একটি অক্ষর ব্রহ্মবাচক। সু দ্বারা ব্রহ্মের পূজিতত্ব, মৎ দ্বারা পরব্রহ্মত্ব, পৎ দ্বারা সর্ব্বব্যাপিত্ব, বক্ দ্বারা সর্ব্ববক্তৃত্ব, ও দে দ্বারা ফলদাতৃত্ব, প্রকাশ পায়। হোতৃজপের পর তিনি "শোংসাবোম্" এই মন্ত্রে অধ্বর্য্যুকে আহ্বান করেন। এতদ্দ্বারা আহ্বান করা হয় বলিয়া ঐ মন্ত্রের নাম আহাব। "শোংসাবোম্"=শংসাবঃ ওঁ=আমরা উভয়ে শংসন বা শস্ত্রপাঠ করি এস। প্রাতঃসবনে আহাবমন্ত্র "শোংসাবোম্"। মাধ্যন্দিন সবনের আহাবমন্ত্র "অধ্বর্য্যো শোংসাবোম্" তৃতীয় সবনের মন্ত্র "অধ্বর্য্যো শোশোংসাবোম্"। আহাবান্তে হোমকর্ত্তা "শংসামো দৈবোম্" =আচ্ছা তুমি শংসন কর, উহাতে আনন্দ (হর্ষ) হইবে (সায়ণ), এই বলিয়া উত্তর দেন। এই উত্তরের নাম প্রতিগর। তিন সবনেই প্রতিগর মন্ত্র এক। প্রতিগর শুনিয়া শস্ত্রপাঠক তূষ্ণীংশংস নামক মন্ত্র মনে মনে জপ করেন। প্রাতঃসবনে তূষ্ণীংশংস "ওঁ ভূরগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ"—মাধ্যন্দিন সবনে "ওঁ ইন্দ্রো জ্যোতির্ভুবো জ্যোতিরিন্দ্রঃ",—তৃতীয় সবনে "ওঁ সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বঃ সূর্য্যঃ" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৯ অধ্যায়, ৭।৮ খণ্ড)। তূষ্ণীংশংস জপের পর শস্ত্রপাঠক শস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হন।

শস্ত্র মধ্যে এক বা একাধিক ঋক্‌সূক্ত থাকে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য ঋক্‌মন্ত্রও থাকিতে পারে। এই সকল সূক্ত ও মন্ত্র, যার পর যেটি বিহিত, সেই ক্রমানুসারে উচ্চস্বরে পাঠ করিতে হয়। এই সকল ঋক্ মন্ত্র ব্যতীত আরও কতিপয় স্বাক্ষরগ্রথিত যজুঃসদৃশ প্রাচীন মন্ত্র শস্ত্রমধ্যে পাঠ করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলির নাম নিবিৎ। নিবিৎ নহিলে শস্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ হয় না। কোন্ শস্ত্রের কোন্‌খানে নিবিৎ বসাইতে হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে। যদ্দ্বারা দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞকে নিবেদন করা যায়, তাহার নাম নিবিৎ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিবিতের এইরূপ তাৎপর্য্য করিয়াছেন। সূক্তগুলিই শস্ত্রের প্রধান অংশ। প্রাতঃসবনে সূক্তের পূর্ব্বে, মাধ্যন্দিনে সূক্তের মধ্যে ও তৃতীয় সবনে সূক্তের শেষভাগে নিবিৎ বসাইতে হয়। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১১ অধ্যায়, ১০ খণ্ড)

শস্ত্র যখন পঠিত হয়, হোমকর্ত্তা তাহার মধ্যে মধ্যেও প্রতিগর করেন। শস্ত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি "ওঁ" বলিয়া প্রতিগর করিয়া সোমাহুতি দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ান এবং যথাস্থানে স্থাপিত সোমরস লইয়া আসিয়া আহবনীয়-পার্শ্বে দাঁড়ান।

শস্ত্রপাঠক শস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া 'উকৃথবীর্য্য' উচ্চারণ করেন। ভিন্ন ভিন্ন শস্ত্রের পর উকৃথবীর্য্যও বিভিন্ন; যথা—প্রাতঃসবনে হোতার পাঠ্য শস্ত্রান্তে "উকৃথং বাচি", মাধ্যন্দিন হোতার পাঠ্য শস্ত্রান্তে "উকৃথং বাচি ইন্দ্রায়", তৃতীয় সবনে হোতার পাঠ্য শস্ত্রান্তে "উকৃথং বাচি ইন্দ্রায় দেবেভ্যঃ"।

হোত্রকেরা সর্ব্বত্র শস্ত্রপাঠের পর কেবল 'উকৃথং বাচি' এই দুইপদ উচ্চারণ করেন, ইহাই তাঁহাদের উকৃথবীর্য্য। উকৃথবীর্য্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমি যে উকৃথ (শস্ত্র) বলিলাম (পাঠ করিলাম), তাহা যেন অমুক দেবতা শুনিতে পান। উকৃথবীর্য্যের উত্তরে অধ্বর্য্যু বলেন "ওঁ উকৃথশাঃ" = হাঁ উকৃথশংসন হইয়াছে। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১২ অধ্যায় ১ খণ্ড)।

উকৃথবীর্য্য উচ্চারণ করিয়া শস্ত্রপাঠক যথাবিহিত যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন। যাজ্যার পর বষট্কার (বৌষট-উচ্চারণ) কালে হোমকর্ত্তা অগ্নিতে সোমাহুতি কিয়দংশ দান করেন। যাজ্যাপাঠক পুনরায় "সোমস্য অগ্নে বীহি"— অগ্নি, তুমি সোমপান কর—বলিয়া পুনরায় বৌষট্ উচ্চারণ করেন, ইহার নাম অনুবষট্কার। অনুবষট্কার কালে আরও খানিকটা সোমরস অগ্নিতে আহুত হয়। হোমের পর কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে। হোমকর্ত্তা সদোমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বষট্কর্ত্তার সহিত একযোগে সেই সোমাবশেষ পান করেন।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে শস্ত্রপাঠের বিধি স্পষ্টতর হইবে। প্রাতঃসবনে হোতার পাঠ্য প্রথম শস্ত্র আজ্য শস্ত্রটিকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ লওয়া যাউক।

ধিষ্ণে উপবিষ্ট হোতার—

হোতৃজপ—সূ মৎ পদ্ বগ্ দে পিতা……শংসিষ্যতি।

আহাব—শোংসাবোম্।

[ধিষ্ণ পশ্চাতে রাখিয়া অধ্বর্য্যুর প্রতিগর—শংসামো দৈবোম্।)

তূষ্ণীংশংস—ও ভূরগ্নি র্জ্যোতি র্জ্যোতিরগ্নিঃ।

নিবিৎ—অগ্নির্দেবেদ্ধঃ অগ্নির্মম্বিদ্ধঃ, অগ্নিঃ সুষমিৎ, হোতা দেববৃতঃ, হোতা মনুবৃতঃ, প্রণীর্দেবানাং, রথীরধ্বরাণাং, অতূর্ত্তো হোতা, তুর্ণির্হব্যবাট, আদেবো দেবান্ বক্ষৎ, যথাদগ্নির্দেবো দেবান্, সো অধ্বরা করতি জাতবেদাঃ।

সূক্ত—[৩ মণ্ডল, ১৩ সূক্ত, ঋষভ ঋষি, অগ্নির্দেবতা অনুষ্টুপ ছন্দ]।

(১) প্রবো দেবায়াগ্নয়ে বর্হিষ্ঠমর্চাস্মৈ।
গমদ্দেবেভিরা স নো যজিষ্ঠো বর্হিরা সদৎ॥
(তিনবার পাঠ্য)।

(২) ঋতাবা যস্য রোদসী দক্ষং সচংত উতয়ঃ।
হবিষ্মংতস্তমীনতে তং সনিষ্যংতোঽবসে॥

(৩) স যংতা বিপ্র এষাং স যজ্ঞানামথা হি ষঃ।
অগ্নিং তং বো দুবস্যত দাতা যোবনিতামঘং॥

(৪) স নঃ শর্ম্মাণি বীতয়েঽগ্নির্যচ্ছতু শংতমা।
যতো নঃ প্রুষ্ণবদ্বসু দিবি ক্ষিতিভ্যো অপ্স্বা॥

(৫) দীদিবাংসমপূর্ব্যং বস্বীভিরস্য ধীতিভিঃ।
ঋক্বাণো অগ্নিমিংধতে হোতারং বিশ্পতিং বিশাং॥

(৬) উত নো ব্রহ্মন্নবিষ উক্থেষু দেবহূতমঃ।
শং নো শোচা মরুদ্বৃধোঽগ্নে সহস্রসাতমঃ॥

(৭) নূনো রাস্ব সহস্রবত্তোকবৎ পুষ্টি মদ্বসু।
দ্যুমদগ্নে সুবীর্য্যং বর্ষিষ্ঠমনুপক্ষিতং॥
(তিনবার পাঠ্য)।

উকৃথ বীর্য্য—উকৃথং বাচি।

[অধ্বর্য্যু ওঁ বলিয়া প্রতিগরান্তে হবির্দ্ধান প্রবেশ করিয়া ঐন্দ্রাগ্নগ্রহ লইয়া বাহিরে আসেন ও আগ্রায়ণের পর বলেন "উকৃথশাঃ—যজ্ঞ সোমস্য"। ইহাই হোতার প্রতি যাজ্যাপাঠে আদেশ।]

যাজ্যা—যে যজামহে।

অগ্ন ইন্দ্রশ্চ দাশুষো দুরোণে সুতাবতো
যজ্ঞমিহোপ যাতং।

অমর্দ্ধন্তা সোমপেয়ায় দেবা॥

(ঋ সং ৩।২৫।৪ বিশ্বামিত্র ঋষি ইন্দ্রাগ্নি দেবতা বিরাট্ ছন্দ)

বষট্কার—বৌষট্।

(অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক ঐন্দ্রাগ্নগ্রহের আহুতি)
অনুবষট্কার—সোমস্য অগ্নেবীহি—বৌষট্।
[অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহের পুনরায় আহুতি।]

আহুতির পর হোতার সম্মুখে বসিয়া অধ্বর্য্যু ও হোতা উভয়ে গ্রহশেষ যথাবিধি পান করেন।

স্তোত্র গানের নিয়ম

প্রত্যেক শস্ত্রের পূর্ব্বে উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্ত্তা এই তিন ঋত্বিক্ একযোগে স্তোত্রগান করেন। যতগুলি শস্ত্র, ততগুলি স্তোত্র, ঋক্মন্ত্র সুর দিয়া গান করিলে উহা সামে পরিণত হয়। গাহিবার সময় কোন কোনও মন্ত্রকে গানের নিয়মানুসারে একাধিক বার আবৃত্তি করিলে সামমন্ত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। যে কয়েকটি ঋকে স্তোত্র নিষ্পন্ন হইয়াছে, গানকালে আবৃত্তি হেতু মন্ত্রসংখ্যা তার চেয়ে অধিক হইয়া পড়ে। এইরূপে মন্ত্র সংখ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাম জন্মে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাইবে। প্রাতঃসবনে হোতা প্রউগ শস্ত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে যে স্তোত্র গীত হয়, তাহার নাম আজ্য স্তোত্র। তিনটি মাত্র ঋকে এই স্তোত্র নিষ্পন্ন হয়। মনে কর, ঐ তিন ঋক্ ক, খ, গ। ঐ তিন ঋকে সুর দিয়া তিন পর্য্যায়ে গাহিতে হয়। প্রথম পর্য্যায়ে প্রথম মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হয়, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্রের তিনবার আবৃত্তি হয়, তৃতীয় পর্য্যায়ে তৃতীয় মন্ত্রের তিন বার আবৃত্তি হয়। এইরূপে মোটের উপর পনের মন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। যথা:—

প্রথম পর্য্যায় ককক—খ—গ—৫ মন্ত্র
দ্বিতীয় পর্য্যায় ক—খখখ—গ—৫ মন্ত্র
তৃতীয় পর্য্যায় ক—খ—গগগ—৫ মন্ত্র

সাকল্যে ১৫ মন্ত্র হওয়ায় এই স্তোত্র পঞ্চদশ স্তোমে গীত হইল। অগ্নিষ্টোমে ত্রিবৃৎ (৯ মন্ত্র) পঞ্চদশ (১৫ মন্ত্র) সপ্তদশ (১৭ মন্ত্র) ও একবিংশ (২১ মন্ত্র) এই চারিটি স্তোমের ব্যবহার আছে। দ্বাদশাহ যজ্ঞে এতদ্ব্যতীত চতুর্ব্বিংশ (২৪) ত্রিনব (২৭) ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) অষ্টাচত্বারিংশ (৪৮) স্তোম ব্যবহৃত হয়।

অগ্নিষ্টোমের প্রাতঃসবনে বহিষ্পবমান স্তোত্র ত্রিবৃৎ স্তোমে ও আজ্যস্তোত্রত্রয় পঞ্চদশ স্তোমে গীত হয়। মাধ্যন্দিনে সমুদয় স্তোত্র সপ্তদশ স্তোমে এবং তৃতীয় সবনের সকল স্তোত্র একবিংশ স্তোমে গীত হইয়া থাকে। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে চারিটির অধিক স্তোম না থাকায় উহার নাম চতুষ্টোম যজ্ঞ।

প্রত্যেক সবনের প্রথম স্তোত্রের নাম পবমান স্তোত্র। সবনের উপক্রমে অধ্বর্য্যু হবির্দ্ধান মণ্ডপে আহুতির সোমরস গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্র পূর্ণ করেন ও পরে বাহিরে আসিয়া অগ্নিতে একটু স্বাহাহুতি দেন। সোমরস গ্রহণকালে সোমবিন্দু যদি ভূপতিত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার দোষ নিবারণের জন্য এই হোম। এই হোমের পর পবমান স্তোত্র গীত হয়। গানের আরম্ভে অধ্বর্য্যু প্রস্তোতার হাতে দুইগাছি কুশ দিয়া বলেন "সোমঃ পবতে" —সোম পূত হইতেছেন। দ্রোণকলশে ও বিভিন্ন পাত্রে সোমগ্রহণের পর আধবনীয়ে যে সোমরস সঞ্চিত ছিল তাহা এই সময়ে পূতভৃৎ নামক পাত্রে ঢালিতে হয়। পূতভৃতের মুখে মেষলোমের ছাঁকনি দেওয়া হয়, উন্নেতা সোম ঢালেন। ছাঁকার নাম পূত করা বা বিশুদ্ধি সাধন। ছাঁকনির নাম পবিত্র। ছাঁকিবার সময় সোম হন পবমান সোম। ছাঁকিবার সময় যে স্তোত্র গীত হয়, তাহা পবমান স্তোত্র।

প্রাতঃসবনের পবমান স্তোত্রের নাম বহিষ্পবমান-স্তোত্র। উহা সদোগৃহের বাহিরে চাত্বালের নিকটে গীত হয়। মাধ্যন্দিন সবনে মাধ্যন্দিন পবমান ও তৃতীয় সবনে আর্ভব (ঋভু দৈবত) পবমান বেদিতে সদোগৃহের মধ্যে উদুম্বর শাখার পার্শ্বে গীত হয়। তিন সবনেই আর সমুদয় স্তোত্র ঐ উদুম্বর শাখা পার্শ্বেই গীত হয়।

অন্যান্য ঐকাহিক সোমযজ্ঞ পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের সাতটি সংস্থা বা প্রকারভেদ—অগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অত্যগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, বাজপেয়, অপ্তোর্যাম। অগ্নিষ্টোম এই সমুদয় যজ্ঞের প্রকৃতি—অন্যগুলি তাহার বিকৃতিমাত্র। অগ্নিষ্টোমের সহিত এই সকল যজ্ঞের সম্বন্ধ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

অগ্নিষ্টোম—১২ স্তোত্র, ১২ শস্ত্র, ১ সবনীয় পশু (অগ্নির উদ্দিষ্ট ছাগ)

উক্‌থ্য—১৫ স্তোত্র, ১৫ শস্ত্র, ২ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ)

অগ্নিষ্টোমের তৃতীয় সবনে তিন হোত্রকের শস্ত্র নাই, প্রথম দুই সবনে আছে, উক্‌থ্য যজ্ঞে তৃতীয় সবনেও তিন হোত্রকের তিন শস্ত্র আছে। কাযেই উক্‌থ্য যজ্ঞে শস্ত্র সংখ্যা ১৫, অগ্নিষ্টোম অপেক্ষা তিনটি অধিক। শস্ত্র ৫ হওয়ায় স্তোত্রও ১৫।

ষোড়শী—১৬ স্তোত্র, ১৬ শস্ত্র, ৩ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ)

[উক্‌থ্য যজ্ঞের পনেরো শস্ত্রের অতিরিক্ত আর একটি শস্ত্র এই যজ্ঞে বিহিত, কাযেই ইহার শস্ত্র ও স্তোত্রের সংখ্যা ১৬। যজ্ঞের নামও এইজন্য ষোড়শী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৬ অধ্যায় ১—৪ খণ্ডে এই অতিরিক্ত ষোড়শ শস্ত্রের বিবরণ আছে।]

অত্যগ্নিষ্টোম - ১৩ স্তোত্র, ১৩ শস্ত্র, ১ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ)

অগ্নিষ্টোমের—অতিরিক্ত একটি শস্ত্র যোগ করিলে অত্যগ্নিষ্টোম। এই শস্ত্র ষোড়শী যাগের ষোড়শ শস্ত্র হইতে অভিন্ন।

অতিরাত্র—ষোড়শী যজ্ঞের উপর রাত্রিকৃত্য অনুষ্ঠান অতিরিক্ত চাপাইয়া অতিরাত্র হয়। রাত্রিকৃত্যে তিন পর্য্যায়, প্রতি পর্য্যায়ে ৪ স্তোত্র, ৪ শস্ত্র (হোতার এক ও হোত্রকদের ৩)। তদ্ব্যতীত পরদিন প্রত্যূষে ১ স্তোত্র (সন্ধি স্তোত্র) ও ১ শস্ত্র (আশ্বিন শস্ত্র) বিহিত। ৪ সবনীয় পশু (অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ, ইন্দ্রের মেষ—সরস্বতীর ছাগ।)

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১৬ অধ্যায়, ৫—৬ খণ্ড, ১৭ অধ্যায়, ১—৫ খণ্ড দেখ।]

বাজপেয়—[উক্‌থ্য দেখ]

অপ্তোর্যাম—অতিরাত্রের উপরে আর চারিটি অতিরিক্ত স্তোত্র যোগে নিষ্পন্ন।

দ্বাদশাহ যাগ

উপরিউক্ত যজ্ঞগুলি ঐকাহিক বা একদিনে সম্পাদ্য সোমযজ্ঞ। দুই হইতে বারো দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম অহীন, আর বারো বা তদধিক দিনে সম্পাদ্য যজ্ঞের নাম সত্র। দ্বাদশাহ যজ্ঞ বারো দিনে সম্পাদ্য বলিয়া উহা অহীন বা সত্র উভয় রূপেই গণ্য হয়। দ্বাদশাহের অনুষ্ঠানক্রম যথা:—

প্রথম দিন—প্রায়ণীয় দিন—অতিরাত্র যজ্ঞ।

পরবর্ত্তী ৯ দিন:
- ষড়হ* ৬ দিন { প্রথমত্র্যহ—৩ দিন; দ্বিতীয়ত্র্যহ—৩ দিন }
- তৃতীয়ত্র্যহ ৩ দিন { ছন্দোম দিন—উক্‌থ্য যজ্ঞ। }

একাদশ দিন—অবিবাক্য দিন—অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞ।

অন্তিম দিন—উদয়নীয় দিন—অতিরাত্র যজ্ঞ।

সংবৎসর সত্র

সংবৎসরব্যাপী সত্রের প্রকৃতি গবাময়ন। উহার মধ্য-দিন বিষুব দিন। তৎপূর্ব্বে ছয় মাস—১৮০ দিন—প্রথমার্দ্ধ, পরবর্ত্তী ছয় মাস—১৮০ দিন—অপরার্দ্ধ; প্রথমার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধের অনুষ্ঠানক্রম পরস্পর উল্টা পাল্টা। সূর্য্যের সংবৎসরে ভ চক্র পরিভ্রমণের অনুকারী। সংবৎসর সত্রের অনুষ্ঠানক্রম নিম্নে দেখান যাইতেছে।

পূর্ব্বার্দ্ধ

প্রায়ণীয় দিন—অতিরাত্র ১

চতুর্ব্বিংশ দিন—উক্‌থ্য (এ দিনের সকল স্তোত্র চতুর্ব্বিংশ স্তোম বিহিত) ১

* ষড়হ দ্বিবিধ—অভিপ্লব ষড়হ ও পৃষ্ঠ্য ষড়হ।

অভিপ্লবে—১ দিন অগ্নিষ্টোম, ২, ৩, ৪, ৫ দিন উক্‌থ্য, ৬ দিন অগ্নিষ্টোম।

পৃষ্ঠ্যে—১ দিন অগ্নিষ্টোম, ২-৩ উক্‌থ্য, ৪ দিন ষোড়শী, ৫-৬ দিন উক্‌থ্য।

অপিচ অভিপ্লব ষড়হে—ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ স্তোম বিহিত। পৃষ্ঠ্য ষড়হে তদতিরিক্ত ত্রিনব, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম বিহিত।

৪ অভিপ্লব ষড়হে—২৪ দিন ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে—৬ দিন	৩০ দিন ৫ মাসে	১৫০
৩ অভিপ্লব ষড়হে—১৮ দিন ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে—৬ দিন ১ অভিজিৎ দিন—১ দিন ১ স্বরসাম—৩ দিন		২৮
		সমষ্টি—১৮০ দিন

মধ্যস্থিত
বিষুবৎ দিন।

অপরার্দ্ধ

৩ স্বরসাম দিন ৩ দিন ১ বিশ্বজিৎ দিন ১ দিন ১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে—৬ দিন ৩ অভিপ্লব ষড়হে—১৮ দিন		২৮
১ পৃষ্ঠ্য ষড়হে ৬ দিন ৪ অভিপ্লব ষড়হে ২৪ দিন	৩০ দিন ৪ মাসে	১২০
৩ অভিপ্লব ষড়হে—১৮ দিন ১ গোষ্টম (অগ্নিষ্টোম) ১ দিন ১ আয়ুষ্টোম (উক্থ্য) ১ দিন		৩০
১ দশ রাত্র প্রথম ও শেষ দিন বর্জ্জিত দ্বাদশাহ		১০
১ মহাব্রত দিন—অগ্নিষ্টোম		১
১ উদয়নীয় দিন—অতিরাত্র		১
		সমষ্টি—১৮০ দিন

সমাপ্ত

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

হরিপদ'র প্রত্যাবর্ত্তন

(গল্প)

আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্ধকার বারান্দায় তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাকী বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন।

এই সময় পুত্রবধূ নলিনী আসিয়া বলিল, "বাবা, আমিও আপনার সঙ্গে যাব!"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "মা তুমিও যাবে কি? সেখানে তো আমাদের জানাশুনো কেউ নেই!"

নলিনী বলিল, "তা না থাক। আমি সেই মেসে গিয়েই উঠবো।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "তুমি গেরস্ত ঘরের বৌ—সেখানে গিয়ে কেমন করে থাকবে মা?"

নলিনী বলিল, "আমি না গেলে তাঁর যত্ন হবে না। এসময় আমার লজ্জা সরম করলে তো চলবে না বাবা।"

"বেশ মা! যাও তাড়াতাড়ি ছুটো আলুভাতে ভাত নামিয়ে নাও গে। রাত্ত বারোটার সময় ট্রেণ, তার আগেই ষ্টেশনে পৌছতে হবে।" বলিয়া কিছুক্ষণ থামিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "মা, তোমার হাতে কিছু টাকা আছে কি?"

নলিনী বলিল, "হ্যাঁ বাবা, আমার হাতে পাঁচখানা দশটাকার নোট আছে, সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে জমিয়ে রেখেছি। এখনি এনে দিচ্ছি।"

"আছে তো মা! বেশ বেশ!" মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেন একটা দারুণ দুশ্চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আনন্দে তাঁহার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল—অন্ধকারে দুই হাত যোড় করিয়া তিনি কপালে ঠেকাইলেন।

বৃদ্ধ বিপত্নীক তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক-মাত্র সন্তান হরিপদ কলিকাতার কোনো কলেজে বি-এ পড়িতেছে। আজ বৈকালে কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসাস্থল হরিপদ সাংঘাতিক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একে এই বর্ষা দুর্দ্দিন, তাহার উপর হাতের অবস্থাও খুব টানাটানি, এই সময় এই সাংঘাতিক বিপদের সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। আর নলিনী—সে বেচারা তো গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ-দুটী অন্ধ করিবার যো করিয়াছে।

পল্লীগ্রামে বর্ষার সময় রাস্তাঘাটের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হয় ভুক্তভোগীর তাহা জানা আছে। আহারান্তে রাত্রি নয়টা'র সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে যাইবার উদ্দেশ্যে গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। সেখান হইতে পাঁচ মাইল তফাতে রেলওয়ে ষ্টেশন। গোরুর গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব চাপিয়া বৃষ্টি আসিল—পথের অবস্থা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। যাহা হউক ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে পৌছিতে না পারার দরুণ ট্রেণ ফেল হইয়া গেল। পরদিন অপরাহ্নে পাঁচটা ছাড়া আর কলিকাতাগামী ট্রেণ নাই।

অগত্যা যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, আবার সেইপথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। কি করিবেন—সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর তো উপায় নাই! কাযেই বুকে পাষাণ-ভার চাপাইয়া ফিরিতেই হইল।

২

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "মা, প্রথমেই যখন বাধা পড়েছে, তখন তোমার আর গিয়ে কায নেই। আমিই যাই।"

নলিনী চুপ করিয়া রহিল—কোনো উত্তর করিল না। বাড়ীতে দূর সম্পর্কীয় পিসতুত ভগিনী মোক্ষদাসুন্দরীকে পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানের জন্য রাখিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচটার ট্রেণে একাই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় কলিকাতা পৌছিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন—সব শেষ হইয়া গেছে। তার পরের ইতিহাস অপ্রকাশ থাকাই ভাল।

হরিপদর সহপাঠী বন্ধুগণ পুত্রশোকবিহ্বল পল্লী-বৃদ্ধকে লইয়া প্রথমটা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। নলিনাক্ষ নামক একটী ছাত্র পরদিন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের গ্রামে পৌছাইয়া দিয়া গেল।

স্বামীর মৃত্যুসংবাদে নলিনীর চোখ দিয়া এক ফোঁটা জলও পড়িল না—সে সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত করিয়া, কেমন করিয়া স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে—একে একে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিল। তার পর ঘষিয়া ঘষিয়া সিঁথার সিন্দূর মুছিয়া ফেলিল এবং হাত হইতে সোণার চুড়ি কয়গাছি খুলিয়া রাখিয়া, নোয়া শাঁখা ভাঙিয়া ফেলিয়া, শাড়ী ছাড়িয়া, থান পরিল।

পুত্রবধূর এই বেশ দেখিয়া উদ্গত-অশ্রু দমন করিয়া মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "মা, চুড়ি ক'গাছা কেন খুলে ফেল্লে ?"

নলিনী বলিল, "বাবা, আপনার যদি কষ্ট বোধ হয়, তা'হলে মাত্র ঐ চুড়ি ক'গাছাই হাতে রাখবো।" বলিয়া সোণার চুড়ি কয়গাছা আবার পরিল।

৩

বৃদ্ধবয়সে একমাত্র পুত্র-বিয়োগে তারাপদ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কাযকর্ম্মে আর উৎসাহ রহিল না। খাইতে শুইতেও স্বস্তি নাই—কেবলি ঘুরিয়া ফিরিয়া হরিপদর কথাই মনে পড়ে। ছেলেবেলায় হরি-পদ যে বইগুলি পড়িত, একটি ভাঙা টিনের বাক্সে সেই তৈলমলিন ছিন্নমলাট বইগুলি আজও দপ্তরে বাঁধা মজুদ আছে। সেই ছোট্ট লাল ফিতাবাঁধা জুতাজোড়াটি আজও কার্ণিশের উপর তোলা আছে—ছেলেবেলায়

যে কঞ্চিটির ডগায় সূতা বাঁধিয়া ছিপ করিয়া সে উঠানে ফেলিয়া মাছ ধরিত—সেই কঞ্চিটি আজও চালের বাতায় গোঁজা আছে—ওরে! বাপরে! হরিপদ তোর সমস্ত চিহ্নই পড়িয়া আছে—এ সব ছাড়িয়া তুই কোথায় গেলি। বৃদ্ধের চোখের জল যেন বারণ মানিতে চাহিত না।

তার পর, হরিপদর মাকে স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ তারাপদ মনে মনে কহিত—তুমি পুণ্যবতী, তাই তুমি আগেই চলে গেছ। এ শোক তোমাকে সইতে হলো না। আমি মহাপাতকী—তাই এ বয়সে এ শোকও আমাকে পেতে হলো।

যে দাবাখেলায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল এবং এককালে যিনি পাড়ার মধ্যে প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এখন সেই দাবা খেলায় আর তাঁহার তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। যদি বা খেলিতে বসেন, তাহা হইলে পদে পদে চাল ভুল হয়—গজ চালিতে অশ্ব চালেন—অশ্ব চালিতে নৌকা চালেন—যাহারা আগে তাঁহার সামনে দাবা ধরিতে সাহস করিত না, এখন তাহাদের কাছে অতি সহজে হারিয়া যান। কোন কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারেন না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহিরের বারান্দায় অন্ধকারে একাকী বসিয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন—

'হরি তুমি দুঃখ দাও যে জনারে—
তার কেউ দেখেনা মুখ,　　　ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ,
দুঃখের উপর দুঃখ দাও হে তারে।'

এমন সময় একটি যুবক আসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। অন্ধকারে চমকিয়া উঠিয়া মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "কে বাবা? আমি তো তোমাকে চিন্‌তে পারছিনে!"

নবাগত যুবক কহিল, "আমি দেবব্রত। নলিনীকে নিতে এসেছি।"

দেবব্রত নলিনীর ভাই। ভগিনীপতির মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সে ভগিনীকে লইতে আসিয়াছে।

মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "মাকে নিয়ে যাবে? তা যাও! আমার জন্যে ভেব না—আমি বেশ থাকবো। একলা ঘর—কোথাও কেউ নেই—বেশ থাকবো।"

দেবব্রত বলিল, "আপনার যদি কষ্ট বোধ হয়, তা হ'লে দু'দিন পরে আবার রেখে যাবো। মা খুব কাঁদাকাটা করছেন—বাবা আসতে পারলেন না—তাই অগত্যা আমি এলাম। বুঝছি আপনার খুবই কষ্ট হবে। তা কি করবেন বলুন, মানুষের তো কোনো হাত নেই—"

অন্ধকারে বৃদ্ধের চোখ দুটো যেন জ্বলিয়া উঠিল—কহিলেন, "কষ্ট! না বাবা আমার কিছু কষ্ট হবে না। যেদিন সে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, সেদিন থেকে দুঃখ কষ্ট ব'লে আমার আর কিছুই নেই—মানুষের সংসার থেকে আমি ছুটি পেয়েছি। এ তো সামান্য ব্যাপার।"

পরদিন পিতৃগৃহে যাইবার সময় শ্বশুরের চরণস্পর্শ করিয়া নলিনী বলিল, "বাবা, আপনি বেশি ভাববেন না। আমি শীগ্‌গির ফিরে আসবো। এ ঘর ছেড়ে আমি কোথাও শান্তি পাবো না।"

পুত্রবধূর মস্তকে কম্পিত ডানহাতখানি রাখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় মৃদুস্বরে কি বলিলেন বোঝাই গেল না।

নলিনী চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় দূর দিগন্তচুম্বিত কর্ষিত ধূসর মাঠের পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। যতদূর চোখ যায়—বিশ্বচরাচরের সর্ব্বত্র মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ধূ ধূ করিতেছে।

বিধবা মোক্ষদাসুন্দরী আপাততঃ পুত্রশোককাতর দাদার সেবাশুশ্রূষার জন্য রহিয়া গেলেন।

এমন শূন্য ঘরে আর মন টেকে না। মধ্যাহ্নে—ভোজনের পর মোক্ষদাসুন্দরী যখন পাড়া বেড়াইতে

বাহির হইতেন, তখন শূন্য ঘরের বিজনতা বৃদ্ধ তারাপদর বুকে যেন জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া বসিত। অবিরত হুঁকা টানিয়া টানিয়া বিরক্তি ধরিয়া গেছে—সময় যেন আর কাটিতে চাহে না। ক্রমে ঘরবাস করা বৃদ্ধের কঠিন হইয়া পড়িল। ঘরেও শান্তি নাই, বাহিরে গিয়াও একদণ্ড কোথাও তিষ্ঠিতে পারেন না। কেহ দেখা করিতে আসিলেও বিরক্তি বোধ হয়—এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে? তিনি স্থির করিলেন, জমিজমা পুকুর বাগান বিষয় আশয় যৎসামান্য যাহা কিছু আছে, সমস্তই পুত্রবধূর নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়া তিনি কাশীবাসী হইবেন। স্ত্রীপুত্রহীন নিরানন্দ গৃহে আর থাকা চলে না।

এই সময় একদিন একখানি পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। নলিনীর পিতা ভবানীচরণ বাবু লিখিয়াছেন—

"ইহা শুনিয়া বোধ হয় সুখী হইবেন আপনার পুত্রবধূ নলিনী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিধবা হইয়াছে। আপনার ব্যানঠাকুরাণীর মুখে গতকল্য এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি যে কি পরিমাণ আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা সামান্য পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। যাহা হউক, তবু মেয়েটা জীবন কাটাইবার একটা অবলম্বন পাইবে। ঈশ্বর এখন ভালয় ভালয় সব দিক বজায় রাখুন। ইতি—"

মজ্জমান জন যেমন একখণ্ড সামান্য তৃণ অবলম্বন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে চায়—মুখোপাধ্যায় মহাশয় তেমনি এই সামান্য আশাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। জগদীশ্বর আবার কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন? পৌত্রমুখ দর্শন করিয়া আবার কি তিনি সুখী হইবেন? কবে সে দিন হইবে? মনে মনে বৃদ্ধ দিন গণিতে লাগিলেন।

এমনি করিয়া মাস তিন চার কাটিয়া গেল।

যেদিন নলিনীর পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল নলিনী নিরাপদে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে এবং পুত্রটি দেখিতে ঠিক তাহার বাপের মতো হইয়াছে—সেইদিন হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিগুণ উৎসাহে ঘর-দুয়ার সাজাইতে লাগিলেন। এবং হুঁকা হাতে পাড়ার ঘরে ঘরে—তাঁহার শূন্য ঘর যে আর শূন্য রহিবে না, শীঘ্রই দাদামণি আসিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিবে—এই শুভ সংবাদ প্রচার করিয়া আসিলেন।

ছেলেবেলায় হরিপদ যে দুইগাছা সোণার বালা হাতে পরিত, তোরঙ্গ খুলিয়া সেই অতি পুরাতন বালাযোড়াটি বাহির করিয়া স্বর্ণকারকে দিয়া রঙ ফিরাইয়া লইয়া আসিলেন—দাদাভাই আসিয়া পরিবে।

উৎসাহে উত্তেজনায় মাস ছয় অতিবাহিত হইয়া গেল। খোকাবাবুর এ বাটি আসিবার দিনস্থির করিয়া যে দিন পত্রখানি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন, তার পরদিন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

লেপ মুড়ী দিয়া হি হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "মুকী, দাদুভাইয়ের সঙ্গে কি আর আমার দেখা হবে না?"

মোক্ষদাসুন্দরী কহিলেন, "তুমি ভাল হও। দেখা হবে বৈ কি!"

মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "দেখা হবে রে? সত্যি বলছিস দেখা হবে?"

বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে মোক্ষদাসুন্দরী কহিলেন, "তুমি ব্যস্ত হয়ো না। সত্যি বলছি দেখা হবে।"

গ্রাম্য কবিরাজ মহাশয় আসিয়া যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া গেলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বিকারে পরিণত হইল।

বিকারের ঘোরে বৃদ্ধ এক একবার বিছানার উপর উঠিয়া বসেন এবং বাহিরের পানে যেন কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক নেত্রে চাহিয়া থাকেন। চাহিয়া চাহিয়া হতাশ হইয়া শুইয়া পড়েন—আবার উঠিয়া বসেন।

মোক্ষদাসুন্দরী সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "দাদা, ব্যস্ত হচ্চ কেন? এখুনি তোমার দাদু আসবে—"

মোক্ষদাসুন্দরীর পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন, "আসবে বৈ কি! নিশ্চয় আসবে। ঐ এল—ঐ দেখ—দাদু—আয় ভাই—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি ছয় মাসের শিশুসন্তান কোলে লইয়া নলিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। মোক্ষদাসুন্দরী ইঙ্গিতে সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন মুখের পানে তাকাইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নলিনী বলিল, "বাবা, এই যে আপনার দাদুকে নিয়ে এসেছি—একে কোলে নেবেন না?"

মুমূর্ষু যেন কিছুক্ষণের জন্য স্থির হইয়া কাণ পাতিয়া কি শুনিবার চেষ্টা করিলেন তারপর বালিসের তলা হইতে একযোড়া সোণার বালা বাহির করিয়া—সমস্ত শক্তি যেন প্রাণপণ বলে সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া বসিয়া, দুইবাহু বাড়াইয়া কাহাকে কোলে লইতে গেলেন। মোক্ষদাসুন্দরী ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলেন।

শ্বশুরের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চিৎকার করিয়া নলিনী বলিল, "বাবা, খোকাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছেন?"

আবার জোর করিয়া উঠিয়া বসিয়া, দূরাগত রোদনধ্বনির ন্যায় অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন—"হরিপদ! আবার কি তুই ফিরে এলি বাপ?"

তারপর বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িলেন—আর চোখ চাহিলেন না।

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুমি মোরে করনি ত দান

মন্ত্রপড়া গ্রন্থিবাঁধা প্রাণ,
তুমি মোরে করনি ত দান!
বসন্তের মত মূর্ত্তিমান,
এলে তুমি দুরন্ত দুর্ব্বার,
অলোরত অযুত কুসুমে দ্রুত করিলে উদ্ধার
শীতের কবল হ'তে!
তটিনীর স্রোতে
কি কহিলে কাণে কাণে?
অধীর আকুল আত্মদানে
টুটাতে শয়ন ছাড়ি,
পড়িল আছাড়ি,
উচ্ছ্বসিত স্ফীত বক্ষে আলিঙ্গনে বাঁধি দুই পার!
তৃণবদ্ধ রুদ্ধ ধরণীর,
পুলকের রোমাঞ্চে শরীর
শিহরিল সহসা অধীর,
অঙ্কুরের শিরায় শিরায়।
নব জীবনের প্রীতি রক্তারুণ কিরণ ধারায়
দিলে সঞ্চালিত করি,
করপুট ভরি,
মুকুলে করালে পান
যে মধু ধারার লাগি প্রাণ
আছিল ধেয়ান ধরি,
নেত্র মুদি নিখিল পাসরি,
যেমনি উঠিল জাগি,
সমাধি তেয়াগি,
মধুকর গুঞ্জরণে জাগরূক করিলে ধরায়॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সাহিত্যে যুগ-প্রবর্ত্তন

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালাভাষায় লিখিত যে সমস্ত রচনাকে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় "অতি-আধুনিক সাহিত্য" নামকরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত রচনার প্রতিকূল সমালোচক একদিকে সেগুলিকে এক নূতন রকম আবর্জ্জনারূপে গণ্য করেন এবং তজ্জন্য ভীত হইয়া সে গুলিকে সাহিত্যের আসর হইতে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন ; অপর দিকে সেগুলির লেখকবর্গ ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক দল সেগুলিকে যুগ-প্রবর্ত্তক এক অভিনব সাহিত্য বলিয়া প্রচার করেতেছেন। এই পরস্পর-বিরোধী দুইটি মতই স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, রচনাগুলি এক নূতন প্রকারের লেখা। সত্যই যদি এগুলিতে কোনপ্রকার নূতনত্ব থাকে—সে ভালই হউক কি মন্দই হউক—তাহা হইলে সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তাহার পরীক্ষা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেন এই রচনাগুলিকে যুগ-প্রবর্ত্তক অভিনব সাহিত্য বলা হইতেছে, কেনই বা এগুলিকে আবার কেহ কেহ আবর্জ্জনার রাশি বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

নূতন যুগের নব সাহিত্য বলিয়া কোন জিনিষকে প্রচার করিতে হইলে বিচার করা প্রয়োজন এই যে, সাহিত্যে যুগ প্রবর্ত্তনা আছে কি না ? থাকিলে, কিসের উপর এই প্রবর্ত্তনা নির্ভর করে ? সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবরাশির উপর, না রচনার প্রকাশভঙ্গিতে ? না এতদুভয়ের সম্মিলনে ?

তাহার পর বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে প্রকাশভঙ্গি যদি নূতনই হয়, তবে সেই অভিনবত্বই যুগ-প্রবর্ত্তনা করে কি না ?

আমার বিশ্বাস যে, সাহিত্যে যুগপ্রবর্ত্তন ঘটে ; এবং প্রকাশভঙ্গির অভিনবত্বের উপরেই যদিও এই প্রবর্ত্তনা অনেকটা নির্ভর করে, তথাপি অভিনবত্ব থাকিলেই নবযুগের প্রবর্ত্তনা ঘটে না।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। প্রকাশভঙ্গি এবং বিভাতিত রূপের অন্তরালে একটা বিশেষ ভাবধারা ভিন্ন কোনও রূপ ফুটাইয়া তোলা কোন রূপদক্ষের পক্ষে সম্ভব নহে। রূপ ফুটাইতে হইলেই এই দুইয়েরই প্রয়োজন। রূপদক্ষের দৃষ্ট রূপ যখন এত শ্রী ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে যে, তাহার প্রকাশভঙ্গি অথবা প্রকাশিত ভাবরাশি অথবা উভয়ের সম্মিলিত রূপটির প্রভাব অতিক্রম করিতে সেকালের অন্যান্য রূপদক্ষগণ সমর্থ হন না, তখনই রূপস্রষ্টা এই শিল্পীকে যুগ প্রবর্ত্তক বলা যায় এবং সৃষ্টিটি যুগ প্রবর্ত্তনা করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপে দেখা যায় যে কোনও কোনও সময় প্রকাশভঙ্গির পরিবর্ত্তনে, কখনও বা ভাবধারার পরিবর্ত্তনে এবং কচিৎ এতদুভয়েরই পরিবর্ত্তনে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আমাদের এই বাঙলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত কেবল প্রকাশভঙ্গিটি বদলাইয়া যুগ প্রবর্ত্তনা করিলেন। মাইকেল, ভাবধারায় সামান্য কিছু অভিনবত্ব আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রকাশের ধারার অভিনবত্বই বাঙলায় আর একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

আরও একটু প্রাচীন যুগে দেখি যে, পুরাতন প্রকাশ ভঙ্গিটি এক থাকা সত্ত্বেও, অর্থাৎ পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা পথে চলিয়াও, মঙ্গল সাহিত্যের যুগ, বৈষ্ণব ভাবধারার যুগ প্রভৃতি এক একটি যুগেরই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্র যুগের ধারায় দেখি প্রকাশভঙ্গি ও ভাবের ধারা এই দুইয়েরই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এবং সে পরিবর্ত্তনেরও নিত্য নব নব বিকাশ। ইহার প্রাচুর্য্য এবং শ্রী ও শক্তি সম্পদ এত বেশী যে, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া চলা এখনকার কালে সহজ নয় এবং এখনও পর্য্যন্ত এমন নূতন সৃষ্টি দেখি নাই যাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত। কাযে কাযেই যুগপ্রবর্ত্তনা হিসাবে রবীন্দ্র

যুগটি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগপ্রবর্ত্তনাগুলি হইতে অনেক বড় অর্থাৎ গভীর এবং স্থায়ী।

সাহিত্যের অভিনবত্বেই কিন্তু যুগ প্রবর্ত্তিত হয় না। Quaintness বা suavity থাকিলে উহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু অপরাপর রূপকারের মনে যদি তা প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে তবে যুগপ্রবর্ত্তনা হইল না।

এখন দেখা দরকার যে "অতি আধুনিক" লেখাগুলি প্রথমতঃ সাহিত্য কিনা? যদি সাহিত্য হয় তবে সেটা নূতন কিনা এবং নূতন সাহিত্য হইলে সেটা যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য কি না?

লেখার মধ্যে কি কি উপাদান থাকিলে সেটা সাহিত্য পদবাচ্য হয়?

প্রকাশভঙ্গি ও ভাব এই দুইটীর সংমিশ্রণে যে রস, তাহা মনোহারী হইলেই কি সাহিত্য হইল? যে উপভোগ করে তার মানসিক অবস্থার উপরেই মনোহারিত্ব নির্ভর করে। যে morbid, যার মন অসুস্থ, সে অতিরিক্ত মত্ততা এবং বীভৎসতার মধ্যেই আনন্দ পায়। আনন্দ পাওয়া মানেই সুন্দরের অভিষেক নয়।

মন যাহাতে প্রশস্ত ও উন্নত হইয়া প্রসাদিত হয়, তাহাই সুন্দর। প্রকাশভঙ্গি ও প্রকাশিত ভাব যে লেখায় সুন্দরকে ফুটাইয়া তুলে তাহাই সাহিত্য।

কেহ কেহ বলিয়াছেন intensity of feeling বা ভাবের প্রাখর্য্যের উপরই সাহিত্যরস নির্ভর করে। তাহা মানিবার হেতু পাই না। স্বদেশীযুগে বাঙালীর মন যখন দেশকে ভালবাসিবার নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিল, তখন কাব্যবিশারদের—

"বেত মেরে কি মা ভোলাবে,
আমি কি মা'সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?
আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে।"

গান কিংবা রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই", এই সকল—রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাঙলা" কিংবা "গোরা" উপন্যাসের স্বাদেশিকতা অপেক্ষা আমাদের মনকে ঢের বেশী উন্মাদনা দিয়াছিল, তবুও সেগুলি সাহিত্যরূপে বাঁচিয়া রহিল না। অথচ উন্মাদনার খোরাক, সে যুগের রচনা অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের এ লেখাগুলিতে অনেক কম যোগান দিয়াও, উহা বাঁচিয়া রহিল। স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে বলা কিংবা ভগবানে আত্মসমর্পণ করা সম্বন্ধে লম্বা চৌড়া বক্তৃতা দেওয়া সহজ; intensity হিসাবে এ ধরণের লেখাগুলি খুবই প্রখর হইতে পারে, কিন্তু form না থাকাতে সেগুলি সুন্দর হয় না। আবার formএর এবং ভাবের intensity "লা মার্সাইয়ে" গানে যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার "limited appeal"এর জন্য সেটা বড় সাহিত্য হয় নাই।

'জনগণমন অধিনায়ক' গানের appeal হয়তো অনেক স্বদেশী গানের appealএর চেয়ে কম শক্তিশালী, কিন্তু সাহিত্যরসে ঢের বেশী ভরপুর। এটা কিসে ঘটিতেছে? একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এগুলি ঢের বেশী ব্যাপক ও চিরন্তন এবং অন্য সব ক্ষণিক ও বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ ও ভাবের দিক হইতেও সঙ্কীর্ণ। তবে কি সময়োচিত appeal এর কোন মূল্য নাই? আছে বইকি! সময়োচিত appeal থাকিলেই সেটা সাহিত্য হিসাবে বড় হয় না, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে যেটা বড়, তাতে আবার সময়োচিত appeal থাকিলে সেটা পাঠকের চিত্ত সহজে অধিকার করে এবং তখনকার উত্তেজনায় সেটার মূল্য, প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হয়। কাযে কাযেই সেটা সহজে প্রভাব বিস্তার করে। আবার form শুধু ভাল হইলেই সাহিত্য হিসাবে সেটা বড় হয় না। ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর"এর ষ্টাইল খুব ভাল, তবুও সাহিত্য হিসাবে "বিদ্যাসুন্দর" বড় জিনিষ নয়। কারণ তাহাতে emotional approach বা spiritual irradiation কম, সে জন্য পাঠকের মনে

চমক লাগিলেও মন সেরূপ প্রসাদিত হয় না, যেরূপ ভাবে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে হয়।

এখন দেখা যাউক আমি যুগ প্রবর্ত্তনার যে মাপকাঠি খাড়া করিলাম, তাহা দিয়া পরখ করিয়া দেখিলে অতি আধুনিক রচনাগুলি যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্য পদবাচ্য হয় কি না? প্রকাশভঙ্গি ও বলিবার বিষয়ের অন্তরালে ভাবধারাতে কোনও অভিনবত্ব আছে কিনা এবং শ্রী ও সম্পদের তার এত প্রাচুর্য্য আছে কিনা যাহাতে তাহার প্রভাব বিস্তীর্ণ হইয়া যুগ প্রবর্ত্তন সম্ভব হইবে।

আমার মনে হয় যে এগুলির মধ্যে তাহার কোনটাই নাই। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের মধ্যে এত দীনতা অক্ষমতা ও কলুষ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, এগুলি বাস্তবিকই আবর্জ্জনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে এমন একটা ন্যাকামি দেখা দিয়াছে যাহা অসহ্য। ইঁহারা নাকি Gorkyর ষ্টাইল আনিয়াছেন! Gorkyর ইংরাজী তর্জ্জমার ষ্টাইল বোধ হয়, কেন না ইঁহারা রুষ ভাষা জানেন বলিয়া আমি শুনি নাই, এবং আমি নিজেও জানি না। সেই তর্জ্জমার ভাষা ইংরেজি ভাষা—উগ্র বাঙলা ভাষা হইতে এত স্বতন্ত্র যে তার ষ্টাইলটা যে কি করিয়া বাঙলায় রূপান্তরিত হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। তবে ডট্ ও ড্যাশ দিলেই যদি ষ্টাইল হয় কিংবা present continuous tense ব্যবহার করিলেই যদি প্রকাশভঙ্গি নূতন করা যায় বলিয়া ইঁহাদের বিশ্বাস থাকে তবে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে 'বলিল'র পরিবর্ত্তে 'বলে' এবং 'গেল'র পরিবর্ত্তে 'যায়' ব্যবহার করিলেই Gorky ষ্টাইল লওয়া হইল না।

তাহার পর ইঁহাদের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ও ইংরেজ আগমনের সমকালের লেখকগুলির সম্বন্ধে যেরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব ইঁহাদের রচনায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে ভাবিয়া পাই না যে বাঙলা ভাষায় ইঁহারা সুলেখক হইবেন কি করিয়া? প্রকাশ করিবার একটা জন্মগত স্বাভাবিক ক্ষমতা না থাকিলে সুলেখক হওয়া যায় না। কিন্তু কেবল মাত্র জন্মগত ক্ষমতার বলেই সে শক্তি স্ফুরিত না। জন্মগত শক্তি একটা brilliant promise এরই আভাস দেয় মাত্র, সেটা যে সাধনার দ্বারা পুরাতন ধারার আলোচনায় পুষ্ট ও সম্পৎশালী হইয়া তবে সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করে, এ কথাকে এই আত্মম্ভরী গর্ব্বিত দলকে কে বুঝাইয়া দিবে? ভাষা বহুলোকের এবং বহুকালের প্রকাশের মধ্য দিয়া যে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে যে তাহার সমস্ত রূপগুলির সহিত পরিচয় আবশ্যক, তাহা যাঁহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত তাঁহাদের লেখা কেমন করিয়া সাহিত্যের পূর্ণতা পাইবে? যে আত্মম্ভরী দল লেখা মক্স না হইতেই ঘোষণা করে যে তাহাদের মধ্যে একজন তিন লাইনে এমন সমস্ত কথা এমন ভাবে প্রকাশ করিতে পারে যাহা বিশ্ববরেণ্য যুগপ্রবর্ত্তক লেখক চেষ্টা করিয়াও তিনি পাতাতে সেইরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না—সেইসমস্ত দাম্ভিকগণের ভবিষ্যৎ কোথায়? এই তো গেল প্রকাশভঙ্গির কথা।

এখন ভাবের ধারার কথা আলোচনা করা যাউক। বিশ্বের সকল সাহিত্যের প্রধান উপকরণ মানুষের দুইটি প্রবৃত্তি—ক্ষুধা ও কাম (Hunger and Sex.) প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই দুটির তাড়নাকেই আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটির তাড়নার intensityর উপর সাহিত্য রস সৃষ্ট হয় নাই, হইয়াছে ইহাদের spiritual irradiation এর উপর, যেখানে পাশব প্রবৃত্তি উন্নত হইয়া মানবের বিশিষ্টতা পাইয়াছে সেই humanised element এর উপর।

পাঠকের মনে যে অনুভূতি জাগে তাহাতে পাঠকের মন কতটা উন্নত হয়, কতটা সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করে, তাহার উপরই সাহিত্যরস নির্ভর করে। জীবনে যাহা ঘটে সেই সত্য ঘটনার বিবৃতিমাত্র সাহিত্য নহে। সাহিত্যে তাহার সামান্য কিছু স্থান হয়তো আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ফুটাইয়া তুলিতে হয়তো অনেক সময় নিখুঁত বর্ণনা প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু শুধু লালসা অথবা কেবল বীভৎস ক্ষুধার চিত্র সাহিত্য হইতে পারে না, যদি না এই ক্ষুধা অথবা লালসার তাড়নায় যাহারা ঘুরিয়া

মরিতেছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও চিত্তে মুহূর্ত্তের জন্যও একটা supreme moment of spiritual height দেখা গিয়াছে এইটাই অঙ্কিত চিত্রে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু "অতি আধুনিক" দল নগ্ন সত্য প্রকাশের ছলে যাহা সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে এ সমস্ত কিছুই নাই। সত্যই কি যাহা কিছু ঘটে সেই সবই সাহিত্যের বস্তু? কখনই না। যাহা অসুন্দর, যাহা বীভৎস, যাহা কেবলই ক্লেদ-পঙ্কিল তাহা সাহিত্যের বস্তু হইতে পারে না। সেই সমস্ত আবর্জ্জনার স্তূপ যাঁহারা জড় করেন তাঁহাদের হয়ত সাহস ও ধৃষ্টতা অসামান্য, কিন্তু তাহা যে বস্তুর সৃষ্টি করে তাহাতে রসবস্তুর সন্ধান মেলে না বলিয়াই তাহা সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না। যাঁহাদের ভগবানও বিকৃত ক্ষুধার তাড়নে কাঁদিয়া ফেরেন, তাঁহাদের সাহিত্য মানুষকে কোনও noble impulse, কোনও সুন্দরের উপলব্ধি দান করিবে কি করিয়া?

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

চন্দ্রাপীড়ের পুনর্জ্জন্ম

শুক্লা চতুর্দ্দশী,—
মধু-সন্ধ্যার মাধুরী নেহারে
আকাশে পূর্ণ শশী।
বহিছে মৃদুল দখিনা পবন
শিরায় শিরায় ঢালি শিহরণ,
ঢালি অপূরিত-আশার রোদন,
বিরহী হিয়ায় পশি'।

কুঞ্জ বনের নিবিড় সরণে
কোকিল কুহরে 'কুহু';
নবীনাঙ্কুর রসাল মুকুল
গন্ধে পরাণ করিছে আকুল;
সমীর পরশে বনতরু ফুল
দুলিছে মুহুর্মুহুঃ।

উচ্চ বিটপিশাখায় পাপিয়া
সাধিছে প্রিয়ারে তার—
"বউ কথা কও",—কাঁদে ফুকারিয়া—
গিরিদরাকুল হ'তে বাহিরিয়া
প্রতিরব তার আসিছে ফিরিয়া,
বাড়ায়ে দুঃখ ভার।

হেমকূট গিরি-উপত্যকায়,
সুন্দরীকুল সারা—
বাম করখানি রাখিয়া কপোলে,
আনত নয়নে বসি শিলাতলে,
চিত্ররথের দুহিতা বিরলে,
ভাবিছে আপন-হারা।

অদূরে প্রাসাদ-উপবন হ'তে
উঠিল বাঁশীর তান!
গন্ধর্ব্বের পুরে সমারোহে
মধুৎসবের কি পুলক বহে!
মুগ্ধা হরিণী সম আগ্রহে
বালিকা পাতিলা কাণ।

চাহি অচেতন দয়িতের পানে
ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস,—
সহসা কি ভাবি, সরোবর-তীরে
চলি গেলা ধনী, সুশীতল নীরে
স্নান করি ফিরি' এল পুনঃ ধীরে
ত্যজিয়ে সিক্ত বাস।

বনফুল দিয়ে যতনে কবরী
বাঁধিলা কাদম্বরী ;—
অঞ্জনে ক'রে নয়ন পিছল,
ফুলরাগ বুকে,—না জানি কি ছল !
আধ-আবরণে ঢাকিয়ে নিচোল
জড়াল নীলাম্বরী !

মৃত পতিদেহ করাইয়ে স্নান
পরা'ল কুসুম মালা ;
শুভ্র দুকূলে, ফুল চন্দনে
সাজাল প্রাণেশে, রুধি ক্রন্দনে
নিবেদে আরতি প্রেম-বন্দনে,
নমিয়া চরণে বালা।

স্নাত অঙ্গের লাবণি নেহারি
তিয়াষা জাগিল মনে !-
একে মধুমাস,—তাহে নিরজন !
চির অতৃপ্ত তনু প্রাণ মন !
বিহ্বলা বালা—তন্দ্রামগন—
জড়াল আলিঙ্গনে !

চুমি কুমারের পাণ্ডুর মুখ
কাতরে বারংবার,—
কহে বালা,—"উঠ প্রাণেশ আমার,
হে চন্দ্রাপীড় ! জাগো একবার
পায়ে লুটে কাঁদে দয়িতা তোমার,
মুছাও অশ্রু তার !

মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের পরশে
মৃত্যু মরিল আজ !
প্রকৃতি-বিধান করি অবহেলা,
ব্যর্থ করিয়া নিয়তির খেলা,
প্রেমের পতাকা হল আজ মেলা
সবার শীর্ষ মাঝ !

প্রেমের প্রভাবে মুনি-অভিশাপ
অবশেষে গেল ভাঙ্গি ;—
প্রাণহীন দেহে ফিরিল চেতন ,
জাগি রাজসুত মেলিল নয়ন
কাদম্বরীর ফুল্ল বদন
চুম্বনে দিলা রাঙি' ।

মধু- প্রদোষের গগনে চন্দ্র
তখনো হাসিতেছিল !
তখনো থামেনি পাপিয়ার তান,
সহকার-শাখে কোকিলার গান,
বাঁশরীর সুর তখনো পরাণ
মাতায়ে তুলিতেছিল !

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কর।

রঙ্গলাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'কাশীযাত্রা', 'উষাহরণ' ও 'কবির গান'

(১৮৪৭—৫০)

'কবি' । কৈশোরে রঙ্গলালের হৃদয়ে বাণী-সেবার যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংসর্গে তাহা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সাহিত্যের নেশার ন্যায় মাদকতা আর কিছুতে নাই। রঙ্গলাল এই নেশায় উন্মত্ত হইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে মাতুলালয় হইতে গুপ্তকবির কলিকাতাস্থ আবাসভবনে চলিয়া আসিতেন এবং সময়ে সময়ে মাসাধিককাল তথায় অবস্থিতি করিতেন।

সমাজে তখন 'প্রভাকর'-সম্পাদকের অতুল প্রতিপত্তি। বঙ্গদেশ তখন 'কবির গানে' মুখরিত এবং বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায় কেবল কবিগণের সমাদর সম্বর্দ্ধনা করিতেন তাহাই নহে, অনেকে স্বয়ং কবির

দল সংগঠিত করিতে এবং কবির গান রচনা করিতে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর হরু ঠাকুর প্রমুখ কবিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র রাজা স্যর রাধাকান্ত ও মহারাজ কমলকৃষ্ণ (যাঁহার খড়দহস্থ উদ্যানবাটিকায় গুপ্তকবির দুঃখময় অন্তিমজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল) হাফ আখড়াই সঙ্গীতরচয়িতা গুপ্তকবির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতার অন্যান্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও ঈশ্বরচন্দ্রকে যথোচিত সম্মান করিতেন এবং মুক্তহস্তে তাঁহাকে বৃত্তি-দান বা অন্যবিধ উপায়ে অর্থসাহায্য করিয়া সাহিত্যের সেই পরমোপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেন। বাস্তবিক আট টাকা মাসিক বেতনের সামান্য কর্ম্মচারীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তখন সমাজে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুজ রামচন্দ্রকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি।" ক্রোরপতি রামদুলাল সরকারের বংশধর আশুতোষ ও প্রমথনাথ দেব (ছাতুবাবু ও লাটু বাবু নামে খ্যাত) কবির গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ও ঈশ্বরচন্দ্রের অত্যন্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহারা একটি কবির দল সংগঠিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আশুতোষ দেব অসংখ্য প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত রচনা করিয়া দলের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল গুপ্তকবির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় কলিকাতার অভিজাতসম্প্রদায়ের অনেকেরই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তরুণবয়সেই তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতরচনা শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ছাতু বাবু ও লাটু বাবু রঙ্গলালকে তাঁহাদের কবির দলের 'কবি' নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতানুরাগী বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত রঙ্গলালের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণের মধ্যে বহুবাজারের অক্রূর দত্তের বংশধর উমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও রাজেন্দ্র এবং পাথুরিয়া-ঘাটার বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহাতাবচাঁদ পর্য্যন্ত কবির গান রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, গোপী-মোহন ঠাকুরের ন্যায় ধনীগণ কলাবিদগণকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন, তখন কবিরা সমাজে কিরূপ সমাদর পাইতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। রঙ্গলাল অত্যল্পকালের মধ্যেই উৎকৃষ্ট 'কবি' বলিয়া পরিচিত হইলেন। সেকালে অনেক গীতে বা গ্রন্থে রচয়িতার পরিবর্ত্তে রচয়িতার পৃষ্ঠপোষকের নামসংযোগ দৃষ্ট হইত। রঙ্গলালের রচিত অনেক সঙ্গীত তাঁহার বলিয়া এখন কেহ অবগত নহেন।

'কাশীযাত্রা'। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে 'ছাতু' বাবু (আশুতোষ দেব) বারাণসীধামে তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলেন। রঙ্গলাল এই সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁহারই সমভিব্যাহারে, কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। 'সংবাদ ভাস্করে' উদ্ধৃত 'রসরাজ' পত্রে প্রকটিত এক প্রবন্ধদৃষ্টে প্রতীত হয় যে লাটু বাবুর (প্রমথনাথ দেবের) আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ছাতুবাবু বাষ্পীয় পোতে কলিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ইহারই অনতিকাল পরে 'কাশীযাত্রা' নামক একটী পুস্তক রচনা করেন। বোধ হয় মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের 'কাশীপরিক্রমা' হইতে কবি এই গ্রন্থরচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থখানি এখন আর পাওয়া যায় না।

'উষাহরণ।' কবির তরুণাবস্থায় রচিত অধুনালুপ্ত "উষাহরণ" গীতিকাব্যও সম্ভবতঃ এই সময়েই রচিত হয়। আমরা বহু অনুসন্ধানেও এই গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং উহার সম্বন্ধে পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করা সম্ভব নহে। 'কাঞ্চী কাবেরী' নামক কাব্যের একস্থানে পাদটীকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেন—

"স্বপ্নযোগে দম্পতিদিগের প্রথম সন্দর্শন নানা দেশীয় কবিগণের এক বিচিত্র কল্পনা। আরব্য, পারস্য, চীন, এবং ভারতবর্ষীয় বহুতর কবি এই মনোজ্ঞ মানসিক উদ্ভাবনা বা বিভাবনা বর্ণনে ত্রুটি রাখেন নাই। ইংলণ্ডীয় কবিকুলতিলক লর্ড বায়রণ স্বপ্নাভিধেয় কবিতায়

প্রেমাভিনয়ের প্রথমাঙ্ক বর্ণনে কি প্রগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটী সংগীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বপ্নান্তে উষার উক্তি।

রাগিণী বিভাস—তাল ঠুংরী।

স্বপনে হেরিনু যাহারে, আরে, আরে সখি দে রে তারে!
চিত্তচোর যামিনী শেষকালে প্রবেশিল হৃদয়-মাঝারে
সরস পরশমণি পুরুষরতন, অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরি দিল দরশন,
তুলনা নাহিক তার এ তিন সংসারে।
আমি তারে আঁখি ঠারে হেরিবার আশে,
যেমন নয়ন মেলি নিরখিনু পাশে,
অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একবারে!"

আমরা রঙ্গলালের কাগজপত্রের মধ্যে কতকগুলি সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি। গীতগুলি কোন্ সময়ের রচনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত উষাহরণের অন্তর্গত ছিল কিংবা কবি ভবিষ্যতে নবসংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য পরে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি।—

চিত্ররথার অনিরুদ্ধ লইয়া শূন্যপথে গমন।

বিভাস যৎ

কে ও যায় অম্বরে, রে বামা, কে ও যায় অম্বরে।
যেন অস্ত থেকো শশী চলে উদয় ভূধরে।
রূপে আলো করে,—পুঞ্জ তিমির সংহরে।—
ধরি দুই করে, রে বামা, ধরি দুই করে।
পুরুষরতন এক পালঙ্ক উপরে,—
স্থির কলেবরে—আছে ঘোর নিদ্রান্তরে।
যেন দিগন্তরে, রে বামা, যেন দিগন্তরে।
আরে, পক্ষ মেলি পরী যায় অমর নগরে।—
সমীরণ ভরে,—উড়ে উড়ানী নিথরে।
চলে একেশ্বরে, রে বামা, চলে একেশ্বরে।
নিশীথ সময় ঘোর কিছু নাহি ডরে।—
কি সাহস ধরে,—ধন্য রামা রত্ন বরে।—
উত্তরে সত্বরে, রে বামা, উত্তরে সত্বরে,—
আরে, শোণিত নগরে উষা বিহার বাসরে
হেরি প্রাণেশ্বরে—দেহে, জীবন সঞ্চরে।—
কহে কবিবরে, রে বামা, কহে কবিবরে,
হেন দূতী নাহি এবে সংসার ভিতরে
বিরহসাগরে প্রেমী জনেরে উদ্ধারে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সঙ্গীতের সমকালেই রচিত আর একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাও সম্ভবতঃ উক্ত উষাহরণ গীতিকাব্যের জন্য রচিত ছিল।

মুলতান—যৎ

মরি কি সুন্দর ব্যবহার।—
তব সম চুরি কার্য্যে কেবা তুল্য আছে আর!
বাল্যে বৃন্দাবন লীলা, কত চুরি প্রকাশিলা,
অন্ন বস্ত্র দধি দুগ্ধ হরিলে হে ভারে ভার॥
হরিলে হে ব্রজনারী, কি কর্ম্ম বুঝিতে নারি,
মাতুলানী হরি' নিলে, হায়, হায়, কি আচার;
লভিয়ে যৌবনকাল, একি রুচি যদুলাল,—
কুব্জা দাসীরে হরি মথুরায় কর বিহার॥—
প্রৌঢ়ে দ্বারকাতে গিয়ে, শান্ত না হইল হিয়ে,
হরিলে ভীষ্মক-সুতা, বিশেষে খ্যাত সংসার।
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, ডাকাতীতে পুত্র বড়;
পৌত্রটি হরিল উষা, স্বপনে প্রেমসঞ্চার।

শক্তি ও বিষ্ণুবিষয়ক গীতগ্রন্থ।

রঙ্গলাল সাধক কবি রামপ্রসাদ ও ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শে শক্তি ও বিষ্ণুবিষয়ক অনেকগুলি সুমধুর প্রাণস্পর্শী ভক্তিগীতি রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্সার্টের দলে উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং মহারাজ স্বয়ং উহা নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাওয়ায় গ্রন্থখানি প্রকাশ হয় নাই এবং বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডার একটি অমূল্য রত্ন হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছে।

অন্যান্য অপ্রকাশিত 'কবির গান'।

রঙ্গলাল যে সকল পালা রচনা করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণাবস্থায় তাহার একটিও পাওয়া যায় না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলীর জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে আমরা

কয়েকটি সঙ্গীত মাত্র উদ্ধার করিয়া পাঠকগণের কৌতূহলের আংশিক পরিতৃপ্তিসাধন করিতেছি :—

অর্জ্জুনের নিকট সত্যভামা কর্ত্তৃক সুভদ্রার অবস্থাবর্ণন।

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

ধন্য ধনুর্দ্ধারি,
ধন্য হে, ধন্য মতিমান্। ধন্য বাণ।—
ধন্য দ্রোণাচার্য্য তোমায় শিখালে শর সন্ধান।
ধন্য পুণ্যব্রতে রতী, তীর্থ পর্য্যটনে রতি,—
সম্প্রতি, যুবতীর প্রতি মারিলে হে পঞ্চবাণ।
অবলা সরলা হায়, বনের হরিণী প্রায়,
সংহার করিয়া তায়, কি আর বাড়িলে মান।
কি কায হে ধনঞ্জয়, ধরণী করিয়ে জয়,
হরিয়াছ সদাশয়, কৃষ্ণ অনুজার প্রাণ।—
তোমার কটাক্ষশরে, জর জর কলেবরে,
তব রূপ ধ্যান করে, কার চিত্ত একতান।

রঙ্গলালের হস্তাক্ষর

কহে রঙ্গ যে জন মারে, লোকে কেন ধ্যায় তারে
সদা পুষ্পময় শরে, করে সবে হতজ্ঞান।

মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

নিম্নোদ্ধৃত গীতটিও সম্ভবতঃ উপরিধৃত গীতের পালার অন্তর্গত,—

পুষ্পক রথে ভদ্রার অশ্বচালনা।

খাম্বাজ—দোলন।

আহা মরি হায়, কে হে তুমি রমণীরতন।—
বিমানে, বিমানে, কর বিমানে রঙ্গে চালন।—
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যেন শোভে মুক্তাদাম,—
অমৃত শীকরে কিবা, ভূষিত শশলাঞ্ছন।
এক করে ধরি রাস, অপরে সুরাগু পাস,
ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস, ফেনমুখে অশ্বগণ।—
রমণী পুরুষ সাজে, পুরুষের মত কায,—
পুরুষেরে দেহ লাজ, করে ধরে শরাসন।—
কহে রঙ্গ অনুজার, শিক্ষা দেখি চমৎকার,
কৃষ্ণেরে সারথ্যে পার্থ করে বুঝি নিয়োজন।

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' মহাবাক্য অবলম্বনে রচিত নিম্নোদ্ধৃত গীতটী ভক্ত বৈষ্ণব পাঠকগণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবে :—

রাজেন্দ্র দত্ত

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দেখ ওগো বৃন্দে, বিহনে গোবিন্দ, শূন্যময় কুঞ্জবন
জলশূন্য সরোবর, অলিশূন্য ইন্দীবর,—
প্রাণশূন্য কলেবর, হরিশূন্য বৃন্দাবন।
শুনেছি সই এ সংসারে, একান্তে যে ভাবে যারে,
তন্ময় হয় সে জন, কহে জ্ঞানীগণ ;—
আমি ত সই নিরন্তর, ভাবি যে শ্যামসুন্দর,
তবে কেন কৃষ্ণগত না হয় জীবন।
কহে রঙ্গ, তব হরি বৃন্দাবন পরিহরি,
এক ক্ষণ নাহি র'ন, কথা পুরাতন ;
ভাব দেখি আত্ম ভাবে, এখনি তাহারে পাবে,—
বল গো কোথায় যাবে,—তব কৃষ্ণধন।—

এইবার আমরা বাৎসল্যরসের দুইটী অপ্রকাশিত গীত পাঠকগণকে উপহার দিব। বাঙ্গালার জননী-হৃদয়ে এই সহজ সরল সঙ্গীতটি কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রতিধ্বনি তুলিবে তাহা কেবল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারিবে :—

ভৈরবী

ওহে গিরি দিনকর হইল উদয়।
উমা শরদের শশী অস্তগত হয়।
ওই দেখ গিরিরায়, প্রাণকুমারী গিরিজায়,
শিবালয়ে লয়ে যায়, জামাতা নিদয়।—

মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর
কে-সি-এস আই

ওহে গিরি কাল যামিনী, কি পুরুষ কি কামিনী
সুখে ছিল সদয়—
আজ আমায় হয়ে নিদয়া,—ছেড়ে যান অভয়া,
মায়াহীন মহামায়া—কঠিন হৃদয়।

মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুর

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটী আমরা পাঠকগণকে বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গীতটীতে প্রাচীন কবিগণের যে অপূর্ব্ব সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে সে সুর আমরা আধুনিক কাব্যসাহিত্যে হারাইয়া কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি তাহা অনুধাবনের যোগ্য।

গৌরী—আড়াঠেকা

আয় যাদু আয়রে, আয় যাদু আয় রে,
আয় কোলে আয় রে।
কেমনে ভুলিয়ে ছিলি অভাগিনি মায় রে।
গোঠে পাঠাইয়ে তোরে, সারাদিন আঁখি ঝোরে,
অবিরত দুগ্ধ ক্ষরে, স্তন ফেটে যায় রে।
ক্ষুধায় আকুলী ব্যাকুলী, সর্ব্বাঙ্গে ধূসর ধূলি,
কেহ ননী মুখে তুলি, দেয়নি তোমায় রে।
তুমিরে অন্ধের নড়ী, কৃপণের ধন কড়ি,
না দেখিলে এক ঘড়ী, ঘটে ঘোর দায় রে।
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, যুক্ত তব মুখ ইন্দু,
হেরি মম দুঃখসিন্ধু, উথলিত হায়রে।
কহে রঙ্গ চমৎকার, পুত্রস্নেহ যশোদার,
এমন জগতে আর না দেখি কোথায় রে।

উপরিধৃত সঙ্গীতটি সেই শ্রেণীর গান, যাহার সরল প্রাণস্পর্শী সুর বাঙ্গালীর হৃদয়বীণায় চিরদিন অপূর্ব্ব সুর

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)

গান ত কেবল শব্দচয়ন নৈপুণ্য প্রদর্শনের চেষ্টা নহে, এই সকল গান ত কেবল ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইয়া বাহাদুরী লইবার জন্য রচিত নহে, ইহা যে প্রাণ দিয়া হৃদয়ের সত্য অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস। এই জন্যই ত মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যের গুণপক্ষপাতী সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ গানের প্রসঙ্গে একসময়ে লিখিয়াছিলেন :—

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচি বিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকার আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি।

তুলিয়া আসিয়াছে ও আসিবে,—ইহা সেই শ্রেণীর গান যাহা শ্রবণ করিয়া কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয় যুগ যুগ ধরিয়া আলোড়িত হইয়াছে—তাহাদিগের নয়নে পবিত্র অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায় বলিতে গেলে, বুদ্ধির দ্বারা, ছন্দের দ্বারা জোর করিয়া এই সকল গীতের প্রাণ-সৃষ্টি হয় নাই। রাবীন্দ্রিক যুগের অধিকাংশ কবিতা ও গানের ন্যায় এই সকল গীতে বাঙ্গালার 'জাত মারা' যায় নাই। এই সকল গীত নব্য- বাঙ্গালীর ড্রয়িংরুমে অনাদৃত হইতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদ ও বৈষ্ণব কবিগণের হৃদয়শোণিতে লিখিত বাৎসল্যের যে সকল গানের প্রতিধ্বনি এই সকল গানে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যতদিন বাঙ্গালী আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সম্পূর্ণরূপে 'ফেরঙ্গ' ভাবাপন্ন না হইতেছে, ততদিন বাঙ্গালার নরনারীর

ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

এই সকল গান য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া নরওয়ে বা সুইডেনবাসীদের প্রশংসা কোনও কালে অর্জ্জন করিতে পারিবে না, কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই সকল গানের সুরই ত আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ঝঙ্কার তুলিতে পারে। প্রাণ দিয়া রচিত এই সকল সরল অকৃত্রিম গানই ত শ্রোতার প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে, এই সকল গানই ত যথার্থ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত—

"গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার,
তাহার সেই গান—গানই নয়।
* * * *
কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ, মিষ্ট শব্দের কথার হার ;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার, তাহার কাব্য শব্দসার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত্ত, ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ ;
উৎসারিত মহাপ্রীতি ;—তাহাই কাব্য, তাহাই গান।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

কুইনাইনের কথা

ম্যালেরিয়ার প্রকোপে আমাদের দেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া যাইতেছে। গ্রামের সে লক্ষ্মীশ্রী আর নাই। কৃষকদিগের সেই সবল শরীর ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জরিত ও প্লীহা যকৃতের আবাস ভূমি হইয়া এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জমিদার ও মধ্যবিত্ত লোকেরাও প্রাণরক্ষার জন্য সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পল্লীগ্রাম এখন জঙ্গলে আবৃত হইয়া শৃগাল ও অন্যান্য জন্তুর লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুকুর ও ঝিল দামে ঢাকিয়া গিয়া মশকদিগের রাজ্য হইয়া পড়িয়াছে।

দেশপূজ্য স্যার রোনল্ড রস্ (Sir Ronald Ross) কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই বাঙ্গালা দেশে দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়া এই ভীষণ ম্যালেরিয়া রোগের বীজ কি এবং সেই বীজের ইতিবৃত্ত কি তাহা সম্যক্ নির্ণয় করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ এমিবা নামক এক অতি নিম্নস্তরের প্রাণিবিশেষ। ইহার কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। এই বীজ স্ত্রীজাতীয় এনোফিলিস্ নামক এক জাতীয় মশার উদর মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়। পরে সেই মশা কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে তাহার শরীরে ম্যালেরিয়ার সুপক বীজ প্রবেশ করে। এইরূপে সুস্থলোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। যখন জ্বর আসে, তখন ঐ বীজের বংশবৃদ্ধি হয় এবং কোটি কোটি বীজ রক্তমধ্যে উৎপন্ন হইয়া শরীর ব্যাপিয়া ফেলে। বিজ্বরের সময় ঐ বীজ

সমুদায় এক প্রকার ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। নিম্নে ম্যালেরিয়া-রোগের বীজের চারিটি অবস্থা ও ম্যালেরিয়া-রোগীর রক্তমধ্যস্থিত ম্যালেরিয়া পারাসাইট্-এর ছবি দেওয়া হইল। (১, ২, ৩, ৪ এর চিত্র দেখুন।)

(Cinchona officinalis)। আবার প্রথম দুই জাতীয় বৃক্ষের সঙ্করোৎপাদনে এক জাতীয় বৃক্ষের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এই বৃক্ষ হইতে অতি উৎকৃষ্ট কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে। এই কুইনাইন বৃক্ষের ছাল

১, ২, ৩ক, ম্যালেরিয়া প্যারসাইটের চারিটি অবস্থা। খ—মানুষের শরীরে প্রবেশের পূর্ব্বাবস্থা
(শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত
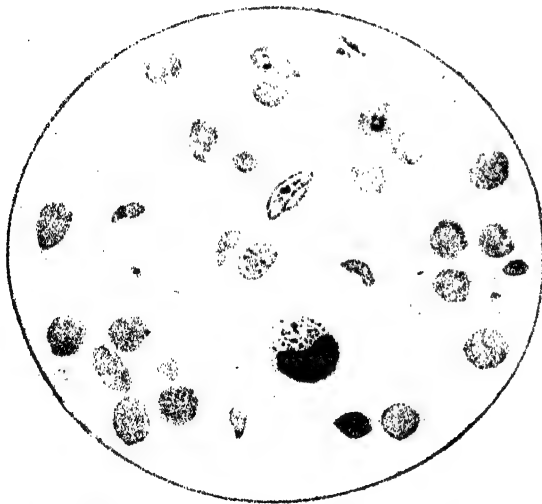
৪। ম্যালেরিয়ার রোগীর রক্তস্থিত ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট

এই বিষাক্ত বীজকে ধ্বংস করিবার একমাত্র মহৌষধ কুইনাইন। কুইনাইন সিনকোনা (Cinchona) নামক গণভুক্ত তিন জাতীয় বৃক্ষের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। যথা:—সিন্‌কোনা সাক্‌সিরুব্রা (Cinchona succirubra), সিন্‌কোনা লেড্‌গারিয়ানা (Cinchona Ledgeriana), এবং সিন্‌কোনা অফিসিনালিস্

সিন্‌কোনা অফিসিনালিস্, লিন্

দার্জ্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত মাংপুস্থিত সিংকোনা বাগানের দৃশ্য

ফুল বিশিষ্ট শাখার ছবি এই সঙ্গে দেওয়া হইল। ৫, শাখার কিয়দংশ, ৬, একটি প্রস্ফুটিত ফুল, ৭, একটি কাটা ফুলের ভিতরকার এন্থার, ৮, ওভারি, ষ্টাইল ও ষ্টিগমা, ৯, একটি সিন্‌কোনা গাছের বীজ

সিন্‌কোনা বৃক্ষের ইতিহাস অতি প্রাচীন দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ অতি পুরাকাল হইতে সিন্‌কোনার ছাল ঔষধরূপে ব্যবহার করিত। স্প্যানিস্ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় এই সিন্‌কোনা বৃক্ষের আবিষ্কার হইয়াছে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পর ফ্রানসিস্‌কো পিজারো (Francisco Pizaro) ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে পেরুদেশ আবিষ্কার করেন। পেরুতে বহুকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পর প্রায় ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে স্প্যানিস্‌রা কথঞ্চিৎ শান্তি-স্থাপনে সমর্থ হন এবং প্রথম শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্প্যানিস্ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা অ্যানডিস্ (Andes) পর্ব্বতস্থিত একপ্রকার গাছের ছাল জ্বরঘ্ন বলিয়া জানিতে পারেন। উক্ত গাছের ছালকে পেরুভিয়ান বা কুইনা কুইনা বলিত। 'কুইনা'—গাছের ছালকে বুঝায়, কুইনা কুইনা বলিতে একপ্রকার গাছের ছালের ঔষধ বুঝায়। এখনও উক্ত গাছের ছাল হইতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়, উহা কুইনাইন নামে খ্যাত।

সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্দ্দশ বৎসরে সিন্‌কন্‌এর কাউণ্ট (Count of Cinchon) পেরুর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার স্ত্রী কাউণ্টেস অব্ সিন্‌কন্ (Countess of Cinchon) কুইনা কুইনা সেবন করিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করেন। তিনি এই ঔষধের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া কিছু পরিমাণ কুইনা কুইনা ইউরোপে

লইয়া যান। তার পর জেসুইটরা (Jesuit) ঐ ছাল জ্বরের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করেন। ক্রমে উহা কাউণ্টেস্ ছাল, কাউনণ্টেসের গুঁড়া বা জেসুয়াতের ছাল বলিয়া খ্যাত হয়।

তাহার পর কিছুকাল ঐ বৃক্ষের বিষয় আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই। ক্রমে ঐ বৃক্ষের বিষয় সম্যক্ গবেষণার জন্য স্প্যানিস্ ও ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ সচেষ্ট হন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জগদ্বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বেত্তা লিনেয়াস্ উক্ত বৃক্ষের নাম করেন কুইনাইন। কাউণ্টেস্ অব সিনকন্ প্রথম ঐ ঔষধ ইউরোপে লইয়া যান, এই জন্য তাঁহার সম্মানার্থ কার্ল লিনেযাস্ (Carl Linneaus) কুইনাইন গাছকে সিকোনা বলিয়া অভিহিত করেন।

সিনকোনা বৃক্ষ স্বভাবতঃ কলম্বিয়া (Columbia) ইকোয়েডার, (Equadodr) পেরু (Peru), ও বোলিভিয়ায় জন্মায়। উহা আন্‌ডিস্ পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বদিকে, ১,৭০০ মাইল ও উচ্চ ২,৫০০ ফিট হইতে ৯,০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। প্রধানতঃ তিন জাতি কুইনাইন-বৃক্ষ দেখা যায়। যথা:—

(১) সিন্‌কোনা সাফ্‌শিরুব্রা, উত্তর ইকোয়েডারের লাল রংএর ছালযুক্ত বৃক্ষ।

(২) সিন্‌কোনা অফিসিনালিস্। এই গাছ হইতে দক্ষিণ ইকোয়েডারের লাক্ষা বা ক্রাউন ছাল সংগ্রহ করা হয়।

(৩) সিন্‌কোনা লেড্‌গেরিয়ানা, ইহা হইতে দক্ষিণ পেরু ও বোলিভিয়ার পীত রংএর ছাল পাওয়া যায়।

এই তিন জাতীয় বৃক্ষেরই এখন ভারতে চাষ হইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই কুইনাইন গাছের ছাল গুঁড়া করিয়াই ম্যালেরিয়ার ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পর, ছাল হইতে বিশুদ্ধ কুইনাইন নিষ্কাশন করিয়া ব্যবহার করিবার চেষ্টা হয়, অধুনাতন গুঁড়া কুইনাইন অথবা বড়ি আকারে (Tabloid) ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পেরু ও বোলিভিয়ায় সিনকোনা বন ধ্বংসের পর, ইংরাজ ও ডাচ্ শাসনকর্ত্তারা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে কুইনাইন প্রস্তুতের বিশেষ অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া ভারতে ও জাভাদ্বীপে সিন্‌কোনার চাষ আরম্ভ করেন এবং তাহাতে সুফল হয়। ভারতে নীলগিরি পাহাড়ে ও দার্জ্জিলিংএ পূর্ব্বহিমালয় শিখরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সিঞ্চল অঞ্চলে রংজু উপত্যকায় প্রথম এদেশে সিন্‌কোনার চাষ ফলবান হয়। ক্রমে গভর্ণমেণ্ট উক্ত কৃষিক্ষেত্র বিস্তার করিয়া ১৮৯৮ অব্দে মাংগপু ও ১৯০০ অব্দে মানসং এই দুইটি স্থানে সিন্‌কোনার চাষ আরম্ভ করেন। এখনও সেই চাষ অতি সুন্দর ভাবে সিন্‌কোনা ডিপার্টমেণ্টের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট mr C, C. Calderএর তদারকে চলিতেছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন ত দার্জ্জিলং হইতে কালিম্পঙে যাইয়া সুপাণ্টেন্‌ডেণ্টের অনুমতি লইয়া দেখিতে পারেন। (দার্জ্জিলিং সিন্‌কোনা ক্ষেত্রের এক অংশের চিত্র প্রকাশ করা গেল।) * জাভার সিন্‌কোনা ছালের উপর যাহাতে নির্ভর না করিতে হয় সে জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সচেষ্ট। বর্ম্মাতে মারগ্মাই নামক এক স্থানেও সিন্‌কোনার চাষ আরম্ভ হইয়াছে—উহাও আশাপ্রদ। বোটানিকেল্ সারভে অব ইন্‌ডিয়ার ডিরেক্টার মিঃ বল্ডার উহারও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিংএ মাংপুতে কুইনাইনের চাষ হইতে কুইনাইন প্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপিত হয়। সম্প্রতি আবার মাংপুতে ট্যাবলয়েড প্রস্তুতের জন্য কলকারখানার বন্দোবস্ত করিয়া ট্যাবলয়েড প্রস্তুত হইতেছে এবং ভারতের নানা স্থানে উহা সরবরাহ করা হইতেছে।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

---

* Mr C C. Calder মহাশয় তাঁহার সিনকোনা বাগানের ফটো প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়াতে আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।—লেখক

আপেক্ষিকতাবাদের স্থূলকথা

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইন্‌ষ্টাইন্, মিকল্‌সনের ঐ নিষ্ফল পরীক্ষাটার একটা ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিলেন। এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক সমাজ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। উহা নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ যদি ধরাই না পড়িল, তবে ঐরূপ একটা বেগের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন কি? যাহা পরিমাপযোগ্য,কেবল তাহাই স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। জড়দ্রব্যের ব্যবহার দেখিয়া পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ নিরূপণ করা যাইবে না, আলোকরশ্মির ব্যবহার হইতেও ঐ বেগ নিরূপণ সম্ভব হইবে না; বুঝিতে হইবে, পৃথিবীর নিরপেক্ষ বেগ পরিমাপের অযোগ্য, সুতরাং অর্থহীন; এবং কেবল পৃথিবী কেন,বুঝিতে হইবে জড়দ্রব্য-মাত্রেরই নিরপেক্ষ বেগ অর্থহীন। অন্যপক্ষে, জড়ের আপেক্ষিক বেগের একটা স্পষ্ট অর্থ রহিয়াছে, এবং রহিয়াছে এই জন্য যে, উহাকে আমরা সকল ক্ষেত্রেই মাপজোখের গণ্ডীর ভিতরে আনিয়া ফেলিতে পারি। অতএব মিকল্‌সনের পরীক্ষার প্রথম সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, জড়দ্রব্যের বেগমাত্রই আপেক্ষিক, এবং উহার নিরপেক্ষ বেগ সোণার পাথরের বাটীর মত, নিছক কল্পনামাত্র, প্রকৃতিতে উহার স্থান নাই।

ঐ পরীক্ষার অপর সিদ্ধান্ত এই যে, আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হইতে হইবে ইহাও প্রকৃতিরই বিধান এবং ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। পৃথিবী স্থির না সমবেগ-সম্পন্ন, অথবা ঐ বেগটা ছোট না বড়, ইহা কল্পনা মাত্র। ঐরূপ কল্পনার অনুরোধে পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপে, অথবা কোন জগতের কোন দ্রষ্টার পরিমাপেই আলোকের বেগ এক এক দিকে এক এক পরিমাণের হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। পরস্পর সম্পর্কে সমবেগ সম্পন্ন বিভিন্ন জড়জগৎ কল্পনা করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রত্যেক জগতের বেগেরই কেবল আপেক্ষিক সত্তা রহিয়াছে—কোনও জগৎকেই বাস্তবিক স্থির বা বাস্তবিক বেগ সম্পন্ন বলিয়া মনে করা চলে না; সুতরাং কোন জগতের পক্ষেই আলোকের বেগ ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। বুঝিতে হইবে জড়ের নিরপেক্ষ বেগ অর্থহীন ইহা যে হিসাবে সত্য, আলোকের বেগ সকল দ্রষ্টার পরিমাপেই সকল দিকে সমান হইতে হইবে, ইহাও সেই হিসাবেই সত্য এবং এই দ্বিতীয় সত্যটাকেই একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মরূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমটাকে উহারই অন্তর্গত করিয়া লওয়া চলে, ইহাই মিকল্‌সনের পরীক্ষার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

বাস্তবিকপক্ষে খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মগুলি, সকল দ্রষ্টার কাছে, একই মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে—খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের ইহাই লক্ষণ। এখন আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, বিভিন্ন জগতের প্রত্যেক দ্রষ্টার পরিমাপে আলোকের বেগ যদি সকল দিকে সমান হইয়া দাঁড়ায়—যদি আলোকের বেগের এইরূপ সমতাকে একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মরূপে অর্থাৎ আলোকের বেগকে দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ একটা ধ্রুব সত্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ বেগটা কেবল দ্রষ্টাসমূহের দিঙ্-নিরপেক্ষ নহে, পরিমাণেও উহা সকল দ্রষ্টার পক্ষেই সমান হইয়া থাকে। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে, প্রকৃতিতে এমন বিধান রহিয়াছে যে, যে সকল জগৎ পরস্পর সম্পর্কে সমবেগসম্পন্ন, উহাদের প্রত্যেকের দ্রষ্টার পরিমাপে আলোকের বেগ, যেমন সকল দিকে সমান হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেকের কাছে উহা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণই ('ভ' পরিমাণ) জ্ঞাপন করিয়া থাকে—"সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ" এই রাশিটা কেবল পার্থিব দ্রষ্টার পরিমাপের আলোকের বেগ নহে, সমবেগসম্পন্ন সকল জগতের

পক্ষেই উহা ঐ বেগের পরিমাপের ফলটা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

আবার আলোককে বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িত-চৌম্বক ব্যাপার রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং আলোকের বেগ সকল দ্রষ্টার পক্ষে সমান, এই কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাড়িত ও চুম্বকধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলিও সকল দ্রষ্টার কাছে একই আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। আইন্‌ষ্টাইন্ বলেন, যদি আমরা আলোকের একটা বেগ-মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে (এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষটাকে একটা প্রাধান্য দান করিতে) প্রস্তুত হই, তবে জড়বিজ্ঞানকে আমরা আলোকবিজ্ঞান ও তাড়িত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া লইবার পথে অগ্রসর হইতে পারি এবং বলিতে পারি যে, সমবেগসম্পন্ন বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টার কাছে, কেবল জড়ের গতিসম্পর্কীয় নিয়মগুলি নহে, অপরাপর ভৌতিক নিয়মগুলিও, একই আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি কেবল "জড়ত্বের" সূত্র ধরিয়া জড়ের গতিসম্পর্কীয় নিয়মগুলি সকল দ্রষ্টার কাছে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি, এবং ইহারই ফলে যদি, ঐ সকল নিয়মের সাহায্য গ্রহণে, কোন্ জগৎ স্থির, কোন্ জগৎ চঞ্চল ইহা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া কল্পনা করিতে পারি, তবে এইটুকু কল্পনায় নিরস্ত না হইয়া এবং জড়ের জড়ত্বের ছাপটাকেই খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মরূপে গ্রহণ না করিয়া বরং বলিব—আলোকের বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা, অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা—ইহাই খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই জড়ের নিরপেক্ষ বেগ অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও সমবেগের বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টার কাছে, কেবল জড়ের গতির নিয়মগুলি নহে, অপরাপর সকল খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মগুলিই একই আকার ধারণ করিয়া থাকে। ফলে আইন্‌ষ্টাইন নিম্নোক্ত মতবাদটা প্রচার করিলেন :—

পরস্পর সম্পর্কে সমবেগসম্পন্ন এইরূপ সকল জগতের সকল দ্রষ্টার পরিমাপেই, যেমন জড় দ্রব্য সম্পর্কীয় খাঁটি নিয়মগুলি, সেইরূপ, আলোক বা তাড়িত বা চৌম্বক ধর্ম্মসম্পর্কীয় নিয়মগুলিও—অর্থাৎ এক কথায়, সকল খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মগুলিই একই আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই মতবাদটা আইন্‌ষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (Special Theory of Relativity) নামে পরিচিত।

সুতরাং দেখা গেল যে, মিকল্‌সনের নিষ্ফল পরীক্ষাকে ভিত্তি করিয়া আইন্‌ষ্টাইন্ দুইটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন—(১) জড়ের নিরপেক্ষ বেগের অর্থ নাই অথবা জড়ের বেগমাত্রই আপেক্ষিক; (২) পরস্পর সম্পর্কে সমবেগসম্পন্ন এইরূপ প্রত্যেক দ্রষ্টার পরিমাপে আলোকের বেগ সকল দিকে সমান হইতে হইবে, এবং এই দুইটা সিদ্ধান্তকে স্বীকার্য্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এবং নিউটনীয় যুগের আপেক্ষিকতাবাদকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া, উহাকে আরও ব্যাপকতা দান করিয়া এবং এইরূপে নিউটনবর্ণিত জড়ের "জড়ত্বের" সংজ্ঞার প্রতি কতকটা অনাস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার "বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ" রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এই সিদ্ধান্তটাকে "বিশেষ" আপেক্ষিকতাবাদ বলার অর্থ এই যে, উহা কেবল সমবেগের বিভিন্ন জগতেই খাটিতেছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, বিবৃদ্ধির জগতেও—অর্থাৎ যে সকল বাস্তব জগতে আমাদের বাস এবং যাহারা পরস্পর সম্পর্কে বেগের বৃদ্ধি ঘটাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, উহাদের পক্ষেও—ঐ নিয়ম খাটিবে কি না, মিকল্‌সনের পরীক্ষা হইতে সহসা সেইরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। আমরা পরে দেখিব যে, এই নিয়মটা বিবৃদ্ধির জগতেও খাটিতেছে বলিয়া আইন্‌ষ্টাইন প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং এইরূপে "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের" প্রতিষ্ঠা দ্বারা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের সূত্রটাকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকার দান করিয়া, বর্দ্ধিত বেগে পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান বিভিন্ন বাস্তব জগতের মধ্যে একটা বিশালতর ঐক্য সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন।

দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা

এখন, আলোকের বেগ যদি সকল দ্রষ্টার পক্ষে সমান হইয়া দাঁড়াইল, তবে দেশ এবং কালকে আপেক্ষিক হইতে হয়, অর্থাৎ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, আপেক্ষিক বেগের ফলে দেশ এবং কালের পরিমাণ-বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এতকাল আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, দেশ বা কাল দ্রষ্টার অপেক্ষা রাখে না—দেশের ধারণা বা কালের ধারণা সকলের পক্ষেই সমান এবং আলোকের বেগটাই, আপেক্ষিক বেগসম্পন্ন বিভিন্ন দ্রষ্টার মাপে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এখন হইতে আলোকের বেগে ঐরূপ আপেক্ষিকতা স্বীকার করা চলিবে না—উহার দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতার দাবীকে খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; সুতরাং বলিতে হইবে,—দেশ বা কালের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ সত্তা নাই—উহাদের আছে মাত্র আপেক্ষিক সত্তার দাবী।

দেশ এবং কালের আপেক্ষিকতার পক্ষে যুক্তি এই-রূপ। রাম ও শ্যামের জগৎ পরস্পর সম্পর্কে সমবেগ-সম্পন্ন। ঐ বেগটা কোন্ জগতের বেগ, এরূপ প্রশ্ন অর্থ-হীন; কেননা, জড়ের নিরপেক্ষ বেগের কোন অর্থ নাই। রাম দেখিতেছে শ্যামের জগৎটা 'ব' বেগে উত্তরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; এরূপ স্থলে শ্যাম দেখিবে রামের জগৎ-টাও ঐ বেগেই কিন্তু দক্ষিণের দিকে ছুটিতেছে। রামের দেখাই ঠিক দেখা এবং শ্যাম যাহা দেখিতেছে,তাহা তাহার দৃষ্টিভ্রম মাত্র, অথবা শ্যামের দেখাই ঠিক, রামের দেখা ভুল, এরূপ বলা চলিবে না। সুতরাং প্রত্যেকেই উহারা নিজের দৃষ্টিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, এবং অপরের দৃষ্টিতেও কোন দোষ নাই ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া অপরের দৃষ্টির সহিত নিজের দৃষ্টি মিলাইয়া লইবে। ইহা সম্ভব হয়, যদি দেশ এবং কালকে আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করা যায়।

রামের জগতে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল। রাম মাপিয়া দেখিল ঐ আলোকরশ্মিগুলির বেগ সকল দিকেই সমান এবং সকল দিকেই সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ পরিমিত। রামের জগৎটা স্থির না চঞ্চল, রামের কাছে ইহার কোন অর্থ নাই, সুতরাং রামের পক্ষে আলোকের বেগটাকে—উহা সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ পরিমিতই হউক অথবা যে কোন পরিমাণেরই হউক—সকল দিকে সমান দেখাই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্যামের জগৎটাকে রাম বেগসম্পন্ন দেখিতেছে, সুতরাং রাম কিরূপে ইহা স্বীকার করিবে যে, শ্যামের পক্ষেও ঐরূপ দেখাই স্বাভাবিক—শ্যামের মাপেও ঐ আলোকরশ্মিগুলির বেগ সকল দিকেই সমান এবং সকল দিকেই সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ পরিমিত হইতে হইবে? অথচ এইরূপই যে হইতে হইবে, ইহাই হইতেছে আপে-ক্ষিকতাবাদের মূল কথা। আবার শ্যামও নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিয়া এবং নিজের মাপজোখের সহিত রামের পরিমাপের ফল মিলাইতে যাইয়া অবিকল ঐ সমস্যার মধ্যে পড়িবে। আইন্‌ষ্টাইন্ বলেন, বাস্তবিক পক্ষে রাম শ্যাম কাহারও কাছেই ঐরূপ সমস্যা উপস্থিত হয় না; আর যদিই বা উপস্থিত হয়, তবে উহা দূর হইয়া যায়, যদি উহাদের প্রত্যেকের মনে এই বোধটা জাগিয়া ওঠে যে, যে সময়টাকে আমার ঘড়ির এক সেকেণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, অপর দ্রষ্টার মাপে তাহা সেকেণ্ড-পরিমিত হইয়া দাঁড়ায় না এবং যে দূরত্বটাকে আমি ক্রোশ বলিয়া মাপিতেছি, উহাও অপরের মাপকাঠির মাপে ক্রোশ হইতে ভিন্ন পরিমিত হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ যদি স্বীকার করা যায় যে, দেশ এবং কালের ধারণা আপেক্ষিক—আপেক্ষিক বেগের ফলে দেশ এবং কালের মাপকাঠি রাম ও শ্যামের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। কারণ, তাহা হইলে এক জগতের দেশ ও কালের মাপ-কাঠিতে আলোকের বেগটা সকল দিকেই সেকেণ্ডে লক্ষ-ক্রোশ পরিমিত হইতেছে বলিয়া, আপেক্ষিক বেগ সম্পন্ন অপর জগতের মাপকাঠিতে উহা এক এক দিকে এক এক পরিমাণের, অথবা সেকেণ্ডে লক্ষক্রোশ হইতে ভিন্ন পরিমাণের হইতে হইবে, কেন দ্রষ্টার পক্ষেই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার আবশ্যক হয় না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যদি ( ) জড়দ্রব্যের বেগ মাত্রকেই আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং (২) আলোকের বেগ সকল দিকে অথবা সকল দ্রষ্টার কাছে সমান হইয়া থাকে

ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে (৩) আপেক্ষিক বেগের ফলে দেশ এবং কালের পরিমাপের ফল বিভিন্ন দ্রষ্টার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—দেশ এবং কাল উভয়ের ধারণাই * রাম শ্যামের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, এরূপ অনুমান করিবার প্রয়োজন কি? দেশ অথবা কাল একটার আপেক্ষিকতা স্বীকার করিলেই ত আলোকের বেগ উভয়ের কাছে সমান সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে; উভয়েরই আপেক্ষিকতা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে, দেশ বা কাল ইহাদের একটাকে আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করিলেই অপরটাও স্বতঃই আপেক্ষিক হইয়া দাঁড়ায়, কারণ বাহ্য ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যেক দ্রষ্টার কালবুদ্ধি তাহার দেশবুদ্ধির সহিত বিজড়িত। একটা দূরের ঘটনার সময় নির্ণয় করিতে হইলে উহা কত দূরের ঘটনা তাহাও জানিবার আবশ্যক হয়। ঘড়ি ধরিয়া আমি বাহ্য ঘটনার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কালটা জানিতে পারি মাত্র, কিন্তু উহার বাস্তব কালটা জানিতে হইলে আমাকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব মাপিতে হইবে এবং ঐ দূরত্ব ও আলোকের বেগের পরিমাণটা জানিয়াই ঘটনাটা আমার প্রত্যক্ষের কত পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, অর্থাৎ উহার বাস্তব কালটা কি, তাহা নিরূপণ করিতে পারি। সুতরাং যদি ঘটনায় ঘটনায় দেশের ব্যবধান (অথবা যদি কালের ব্যবধান) সম্বন্ধে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতদ্বৈধ থাকে, তবে উহাদের মধ্যে কালের ব্যবধান (অথবা দেশের ব্যবধান) সম্বন্ধেও একটা মতদ্বৈধ আপনি আসিয়া পড়িবে। অতএব বুঝিতে হইবে, প্রত্যেক দ্রষ্টার দেশবুদ্ধির সহিত অথবা কালবুদ্ধির সহিত অপর দ্রষ্টার দেশবুদ্ধি ও কালবুদ্ধি, উভয় বুদ্ধিই এমন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে যে একটার পরিমাপের ফল, দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে অপরটার সম্বন্ধেও একটা গরমিল আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে।

সুতরাং দেখা গেল, জড়দ্রব্যের কেবল আপেক্ষিক বেগ স্বীকার করার অর্থ—সঙ্গে সঙ্গে আলোকের একটা বেগমাহাত্ম্য স্বীকার করা এবং আলোকের বেগ-মাহাত্ম্য স্বীকার করার অর্থ দেশ এবং কাল উভয়েরই মাত্র আপেক্ষিক সত্তা স্বীকার করা। আপেক্ষিক বেগের ফলে দেশ এবং কালের মাপকাঠি বিভিন্ন জগতের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে—রামের ঘড়ি যে সময়টাকে এক সেকেণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করে শ্যামের ঘড়িও ফুটরুলের মাপে * তাহা আর এক সেকেণ্ড বলিয়া ধরা পড়ে না এবং রামের ফুটরুল শ্যামের ফুটরুল ও ঘড়ির মাপে এক ফুট হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়।

পুরাতন মতে, দেশ ও কাল দ্রষ্টানিরপেক্ষ ছিল এবং পরস্পর-নিরপেক্ষ ছিল। আমরা এ যাবৎ অনুমান করিয়া আসিয়াছি যে, দেশের পরিমাপে কাল মাপিবার আবশ্যক হয় না এবং কালের পরিমাপে দেশ মাপিবার আবশ্যক হয়না এবং আরও অনুমান করিয়া আসিয়াছি যে, দেশের ধারণা এবং কালের ধারণা অথবা উহাদের পরিমাপের ফল সকল দ্রষ্টার কাছেই সমান হইয়া থাকে। এই অনুমান কতদূর সঙ্গত, অথবা সর্ব্বত্র উহা খাটিতেছে কি না, যথোচিতরূপে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই; এমন কি উহা যে অনুমানমাত্র তাহাও স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয় নাই—বৈজ্ঞানিকগণ এ যাবৎ উহাকে স্বতঃসিদ্ধ রূপেই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। এই কল্পিত স্বতঃসিদ্ধের উপরেই নিউটন তাঁহার গতিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। নিউটনীয় যুগের আপেক্ষিকতা-বাদের সহিত উক্ত অনুমানের বিরোধ উপস্থিত হয় নাই—দেশ ও কাল পরস্পর-নিরপেক্ষ ও দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ

* আমরা 'ধারণা' কথাটাকে বরাবর 'পরিমাপের ফল' এই অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। বাস্তবিক, আইনষ্টাইনের মতে আমাদের প্রত্যেক ধারণার মূলে কোন না কোন ধরণের পরিমাপের ফল নিহিত রহিয়াছে। যাহা পরিমাপের অপেক্ষা রাখে না এরূপ ধারণার কোন মূল্য নাই।

* এখানে মনে রাখিতে হইবে যে রামের কাল-বুদ্ধি শ্যামের কাল-বুদ্ধি ও দেশ-বুদ্ধি উভয়ের সহিতই বিজড়িত।

রূপে কল্পিত হইয়াও সমবেগের বিভিন্ন জগতে জড়ের গতি সম্পর্কীয় নিয়মগুলি কিরূপে একই আকার ধারণ করিতে পারে, ইহা একটা সমস্যার মত দাঁড়াইতে পারে নাই। জড়দ্রব্যমাত্রকেই একটা স্থায়ী "জড়ত্বের" ছাপ দিয়া নিউটন ঐ সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মিকল্‌সনের পরীক্ষা হইতে যখন দেখা যাইতেছে যে, কেবল জড়ের গতিসম্পর্কীয় নিয়মগুলি নহে, তাড়িত বা চুম্বক বা আলোক সম্পর্কীয় ব্যাপারগুলিও সমবেগের বিভিন্ন দ্রষ্টার দৃষ্টিতে একই আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন বুঝিতে হইবে, কেবল জড়ত্বের ছাপ রূপ আবরণ দিয়া প্রাকৃতিক নিয়মমাত্রেরই সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া চলিবে না। বুঝিতে হইবে, সকল দ্রষ্টার দৃষ্টিতে একই আকারে ফুটিয়া উঠিতে হইবে, সকল খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মেরই ইহাই বিশিষ্ট লক্ষণ; বুঝিতে হইবে, যেমন জড়ের গতিসম্পর্কীয় নিয়মগুলি, সেইরূপ আলোকের বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতাও এইরূপ একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম এবং দেশ ও কালের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা যখন এই নিয়মের সহিত খাপ খাইতেছে না, তখন উহাদের ঐ মন-গড়া দাবীর পক্ষে বাস্তবিক কোন যুক্তি নাই—মিথ্যা নিরপেক্ষতার দাবী লইয়া প্রকাণ্ড দুই দৈত্যের মত দেশ ও কাল এতদিন বিজ্ঞানের স্কন্ধ আশ্রয় করিয়া বসিয়াছিল, ঐ মিথ্যা দাবী ঝাড়িয়া ফেলিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।

ইহা সহজেই দেখা যাইতে পারে যে, রামের ঘড়ির মাপে শ্যামের ঘড়ির সেকেণ্ড যতগুণ হইয়া দাঁড়াইবে, শ্যামের ফুটরুলের মাপে রামের ফুটরুলটাও তত ভাগের ভাগ হইতে হইবে।

মনে করা যাক্‌, শ্যামের জগতের 'শ' চিহ্নিত স্থানে একটা ঘড়ি এবং রামের জগতের 'র' ও 'ম' চিহ্নিত স্থানে দুই প্রান্ত স্থাপন করিয়া একখানা ফুটরুল রহিয়াছে

১ম চিত্র

শ

র o→ ম

←
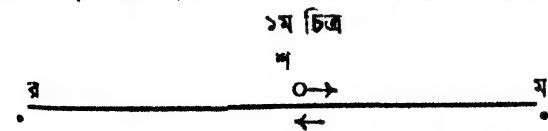
(১ম চিত্র)। আরও মনে করা যাক, ঐ দুই জগতের আপেক্ষিক বেগটা 'র-ম' রেখাক্রমে অর্থাৎ রাম দেখিতেছে শ্যামের জগৎটা তাহার পাশ কাটিয়া 'র-ম' দিক্‌ বরাবর এবং শ্যাম দেখিতেছে যে রামের জগৎটা তাহার পাশ কাটিয়া 'মর' দিক্‌ বরাবর ছুটিয়া চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্যামের জগতের 'শ' স্থানটার সহিত রামের জগতের 'র' ও 'ম' স্থান দু'টার পর পর মিলন ঘটিবে। উভয়ের মতেই 'শর' মিলটা হইবে আগেকার ঘটনা এবং 'শম' মিলটা হইবে পরের ঘটনা।

রাম বলিবে, ঐ মিল দুইটা ঘটিয়াছে তাহার ফুট-রুলের দুই প্রান্তে, অতএব ঐ দুই ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান ১ ফুট পরিমিত। শ্যাম বলিবে, উভয় মিলনই ঘটিয়াছে তাহার জগতের 'শ' স্থানে, অতএব, ঐ দুই ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান নাই। ঘটনা দু'টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত 'শ' চিহ্নিত ঘড়ি দেখিয়া শ্যাম তাহা অক্লেশে নিরূপণ করিতে পারিবে।

মনে করা যাক্‌ শ্যাম দেখিতে পাইল যে, তাহার ঘড়িতে একবার 'টিক্‌' করিতেই 'শর' মিলটা এবং দ্বিতীয়-বার 'টিক্‌' করিতেই 'শম' মিলটা ঘটিল; সুতরাং শ্যাম বলিবে, ঘটনা দু'টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১ সেকেণ্ড। এখন রামের ঘড়ির মাপে ঐ ব্যবধানটা ভিন্ন পরিমিত হইতে হইবে। মনে করা যাক রামের ঘড়িতে ঐ সময়ের ব্যবধানটা দাঁড়াইল শ্যামের মাপের 'ঐ' গুণ (অর্থাৎ 'ঐ' সেকেণ্ড পরিমিত) এবং 'ঐ' ১ অপেক্ষা বড়।

ফলে রাম বলিবে 'ঐ' সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে শ্যামের জগতের 'শ' স্থানটা তাহার ফুটরুলের 'র' প্রান্ত হইতে 'ম' প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ঐ স্থানটা অগ্রসর হইয়াছে $\frac{১}{ঐ}$ ফুট পরিমিত; অতএব রামের মতে শ্যামের জগতের বেগ দাঁড়াইবে সেকেণ্ডে ফুট $\frac{১}{ঐ}$ পরিমিত।

এখন রামের ফুটরুল ও ঘড়ির মাপে শ্যামের জগতের বেগটা যাহা দাঁড়াইবে, শ্যামের ফুটরুল ও ঘড়ির মাপে রামের জগতের বেগটাও তাহাই হইতে হইবে, কিন্তু

উল্টা দিকে। ফলে শ্যাম বলিবে, রামের জগৎটা সেকেণ্ডে $\frac{১}{ঐ}$ ফুট বেগে 'মর' দিক বরাবর অগ্রসর হইয়াছে এবং ইহারই ফলে 'শর' মিলটার ১ সেকেণ্ড পরে 'শম' মিলটা ঘটিয়াছে, অতএব রামের ফুটরুলের উভয় প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব হইতেছে $\frac{১}{ঐ}$ ফুট; অর্থাৎ শ্যাম বলিবে রামের ফুটরুল তাহার ফুটরুল অপেক্ষা ছোট—উহার 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র।

সুতরাং দেখা গেল, যদি বিভিন্ন জগতের কালের মাপকাঠিকে আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে উহাদের দেশের মাপকাঠিও আপেক্ষিক হইয়া দাঁড়ায়; এবং reciprocally, যদি বিভিন্ন জগতের দেশের মাপকাঠিকে আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে উহাদের কালের মাপকাঠিও আপেক্ষিক হইয়া পড়ে। বুঝিতে হইবে, দেশ বা কালের মাপকাঠি এক এক জগতের পক্ষে এক এক পরিমাণের;—একই জগতের * সকল ফুটরুলই পরস্পরে সমান এবং সকল ঘড়িই সমান দ্রুত চলিয়া থাকে এবং ঐ ফুটরুলগুলি বা ঐ ঘড়িগুলি কাছাকাছি থাকুক বা দূরে দূরে থাকুক তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু ভিন্ন জগৎ হইতে মাপিয়া দেখিলেই ঐ মাপকাঠিগুলি ছোট বড় হইয়া যায়। আরও দেখা গেল, যদি শ্যামের ঘড়ি রামের ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে 'ঐ' গুণ 'স্লো' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে রামের ফুটরুলও শ্যামের ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে 'ঐ' গুণ খাটো হইয়া দাঁড়ায়।

আবার ব্যাপারটা যখন আপেক্ষিক বেগের ফল, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্যামের ঘড়ি যখন রামের ঘড়ির মাপে 'ঐ' গুণ স্লো হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন রামের ঘড়িও শ্যামের ঘড়ির মাপে 'ঐ' গুণ 'স্লো' বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে এবং শ্যামের ফুটরুলও রামের মাপে $\frac{১}{ঐ}$ ফুট পরিমিত অর্থাৎ 'ঐ' গুণ খাটো হইয়া দাঁড়াইবে।

মনে রাখিতে হইবে, এই ঘড়ি 'স্লো' হওয়ার অর্থ উহা বিকল হইয়া যাওয়া নহে। প্রত্যেকের ঘড়ি প্রত্যেকের কাছে ঠিক সময়ই নির্দ্দেশ করিতেছে; কিন্তু এক জগতের ঘড়ির মাপে একই স্থলের যে দুই ঘটনার মধ্যে (যথা শ্যামের মতে 'শর' ও 'শম' মিল দু'টার মধ্যে) কালের ব্যবধানটা ১ সেকেণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে, অপর জগতের ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে তাহা ভিন্ন পরিমিত অর্থাৎ 'ঐ' সেকেণ্ড পরিমিত হইবে। আর ফুটরুল খাটো হওয়ার অর্থ উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া অথবা উহার সঙ্কোচন ঘটা নহে। যাহার যাহার জগতের ফুটরুল তাহার তাহার কাছে ১ ফুট পরিমিতই থাকিবে; কিন্তু দেশের মধ্যে যে দুইটা চিহ্নের মধ্যে (যথা 'র' ও 'ম' চিহ্নের মধ্যে) দূরত্বটা এক জগতের ফুটকাঠির মাপে ১ ফুট পরিমিত হইবে, অপর জগতের ঘড়ি ও ফুটকাঠির মাপে তাহা ভিন্ন পরিমিত অর্থাৎ ১ ফুটের 'ঐ' ভাগের ভাগ হইয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পরে দেখিব যে, আপেক্ষিক বেগটা খুব বড় হইলেই, অর্থাৎ আলোকের বেগের সহিত তুলনার যোগ্য হইলেই, দেশ অথবা কাল সম্পর্কে উভয় জগতের মাপ-জোখের গরমিলটা গণনার যোগ্য হয়। সাধারণতঃ যে সকল আপেক্ষিক বেগ লইয়া আমাদের কারবার তাহাতে উক্তরূপ পার্থক্য একেবারেই ধরা পড়ে না; কিন্তু ধরা পড়ুক বা না পড়ুক ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশ বা কালের পরিমাপে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ মানিয়া লওয়ার অর্থ,দেশ ও কালের কথা তুলিয়া জাগতিক ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টাকেও একটা বিশিষ্ট স্থান দান করা; এবং আলোকের বেগটাকে সকল পরিমাপের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করার অর্থ দ্রষ্টার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষটাকে একটা সম্মানের আসন প্রদান করা।

আমরা দেখিলাম, আলোকের একটা বেগ মাহাত্ম্য বা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা যদি স্বীকার করা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে (১) জড়দ্রব্যের বেগমাত্রকেই এবং (২) দেশ ও কালকে আপেক্ষিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আরও দেখা গেল যে, ঐ দুইটা স্বীকার্য্য হইতে এই সিদ্ধান্তটা পাওয়া

* একটা বিশিষ্ট জগৎ অর্থে যাহার অংশ সমূহ পরস্পর সম্পর্কে স্থির এইরূপ বুঝিতে হইবে।

গেল যে (৩) আপেক্ষিক বেগের ফলে একই ঘড়ি বা একই ফুটরুলের ব্যবহার দ্রষ্টাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং এক জগতের কালের মাপ অপর জগতের মাপে যতগুণ 'শ্লো' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এক জগতের দেশের মাপও অপর জগতের মাপে ততগুণ ছোট হইয়া দাঁড়ায়।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ণের ব্রাহ্মণ

বর্ণের গুরু বর্ণের গুরু চিরদিন ভবে বন্দ্য সে,
বর্ণমালার স্বরবর্ণেরা নিন্দিত হবে কোন্ দোষে?
হিন্দুত্বের দিক্‌পাল তারা ধর্ম্ম তাদের বাঞ্ছিত,
পতিতেরে কোল দিল বলে, হবে পতিত বলিয়া লাঞ্ছিত?
অনাচারী দলে আচার শিখালে, হীনেরে করিল উন্নত,
আবাহন ক'রে তারাই এনেছে পাপের রাজ্যে পুণ্য ত!
আগতেরে দিতে অভ্যর্থনা তারা বই কেহ জানতো না
যে যেতে চেয়েছে, ধরে রাখিয়াছে দিয়ে ধর্ম্মে সান্ত্বনা।

তারাই রুখেছে বিধর্ম্মীদের বিরাট বিপুল চেষ্টাকে
তারাই ম্লেচ্ছ আচার হইতে রক্ষা করেছে দেশটাকে।
খণ্ড ছিন্ন ক্ষুদ্রে বেঁধেছে বিরাটের সাথে এক করি,
গৌরব তারে না দিয়ে পতিত করিয়া রাখিবে ধিকারি।

ঘৃণা অনাদরে পর করিয়াছ আপনার জনে নিত্য হে
শত্রুরে ভয়ে যেচে মান দেছ, ভীরু কাপুরুষ চিত্ত হে।
জাতি গড়িবার শক্তি হারালে জাত্ মারিবার ফন্দিতে
সিদ্ধিকে তুমি দূরে রাখিয়াছ ভুলি' বন্দিতে বন্দিতে।

পতিতপাবন দেবতা তাদের, পার্থসারথি পাণ্ডা হে,
বিলাবার মত অমৃত কত, সঞ্চিত আছে ভাণ্ডারে।
শিব তা'রা ফেরে জীবের শ্মশানে, মরা প্রাণ করি জাগ্রত,
উদ্ধার করা তাহাদের ব্রত, উদার হৃদয়, অক্রোধ।
শবর গুহক গোয়ালার মিতা, জান তো তাদের সঙ্গীরে,
তাঁহারে পতিত কর নাই কেন সব বেদবিধি লঙ্ঘি রে?
বর্ণের গুরু বর্ণের গুরু চিরদিন ভবে বন্দ্য সে—
সমাজ গীতের 'সারিগামা'তারা, নিন্দিত হবে কোন্ দোষে?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দেব-দেউল

(উপন্যাস)

[ভিক্টর হ্যুগো রচিত নোৎর-দাম্ উপন্যাস অবলম্বনে]

বহরমপুরের দক্ষিণে যে স্থানকে এখন রাঙামাটী বলে, সেকালে তাহার নাম ছিল কর্ণ-সুবর্ণ—গৌড়-নগর রাঢ়ের প্রবল পরাক্রান্ত অধিপতি মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী বাঙ্গালীর মহাসাম্রাজ্য তখন পশ্চিমে কুশীনগর এবং দক্ষিণে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্য তখন শশাঙ্কের পদানত হইয়াছে। উত্তরে বর্দ্ধমান
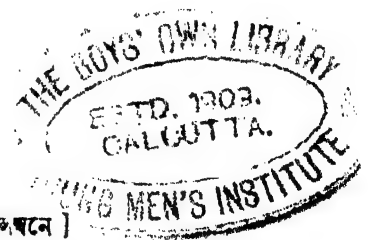
ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত রাজ্য সে সময়ে শশাঙ্কের গৌড়-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া মহারাজ শশাঙ্ককে কিছুদিন পর্য্যন্ত পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ জয় করিয়া বিজয়ী ভাস্করবর্ম্মা 'কর্ণসুবর্ণবাসক' হইতে যে তাম্রশাসন প্রচার করিয়াছিলেন, এতকাল পর তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গঙ্গার মোহানায় তাম্রলিপ্তই ছিল সেকালের বাঙ্গালার প্রধান বন্দর—বহির্জগতের সহিত সমুদ্রপথে সম্বন্ধস্থাপনের একমাত্র সিংহদ্বার। তখন তাম্রলিপ্তের জাহাজ-ঘাটায় নানা দেশের জাহাজ ও বণিক দেখা যাইত। তাহার নিকটেই ছিল মাঝি-পাড়া ও সূত্রধর-দিগের কর্ম্মশালা। সেই সকল কর্ম্মশালায় সেকালে জাহাজ নির্ম্মিত হইত। বলিতে গেলে তখন বণিকদেরই রাজনগরী ছিল তাম্রলিপ্ত। বণিকেরাই প্রবল হইয়াছিল বলিয়া তাম্রলিপ্তের শাসনভারও লইয়াছিলেন। রাজা ছিলেন নামে মাত্র কর্ত্তা—বণিকসঙ্ঘের মুখাপেক্ষী।

তাম্রলিপ্তের 'শ্রেণী'বল বা 'গণ-সেনা' যেদিন হৃদয়ের শোণিত দিয়া রাজনগরী কর্ণসুবর্ণ উদ্ধার করিয়াছিল, সেদিনের বিজয়-মহোৎসবের কথা স্মরণ হইলে এখনো মন পুলকিত হইতে হয়। শ্রেণীবলের অসীম শৌর্য্যবীর্য্য চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাম্রলিপ্তশাসক বণিকসঙ্ঘ বা শ্রেণী এমন একটী বিরাট স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল যে, তাহা একদিন বাঙ্গালী স্থপতি ও ভাস্করের অশেষ খ্যাতি দেশে ও বিদেশে প্রচার করিয়াছিল। এই কীর্ত্তিস্তম্ভের গঠনসৌষ্ঠব দেখিয়া পুলকিত পরম শৈব মহারাজ শশাঙ্কের আদেশে উহার নিম্নতলের প্রশস্ত কক্ষে যে দিন শ্রীকালভৈরবের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, সে দিন তাম্রলিপ্ত নগর উৎসবে মত্ত হইয়াছিল। সেই দিন হইতে কীর্ত্তিস্তম্ভকে লোকে দেবালয় বলিত। এই বিরাট দেবালয়ের পার্শ্বেই ছিল সুবিখ্যাত বরাহ মন্দির ও বরাহ বিহার—যাহা ওয়ান্‌-চোয়াং তাম্রলিপ্তে আসিয়া দেখিয়াছিলেন। কিছু দূরেই সম্রাট অশোকের ১৩৩ হস্ত উচ্চ বিশাল প্রস্তর-স্তম্ভ তখন নিয়ত ঊর্দ্ধমুখে ভগবান শ্রীবুদ্ধের জয়ঘোষণা করিত।

তমোলুক মহকুমার যে অংশ এখন মহিষাদল ও সুতাহাটা থানা বলিয়া পরিচিত, পুরাকালে—সেই সপ্তম শতাব্দীতে—ভাগীরথীর তরঙ্গ রূপনারায়ণের তাণ্ডবের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেখানে থৈ থৈ করিয়া নাচিত! কীর্ত্তিস্তম্ভের চূড়ায় উঠিয়া পূর্ব্বে এবং দক্ষিণে চাহিলে দেখা যাইত, বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুরাশি ধূধূ ধূধূ করিতেছে। এই জন্যই বোধ হয় তাম্রলিপ্তের অপর নাম হইয়াছিল—'বেলাকূল' বা অকূলের বেলা।

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ 'জঙ্গল-মহাল'। এক সময়ে জঙ্গলমহাল আরও ঘন নিবিড় বনে পূর্ণ ছিল। শবর প্রভৃতি নানা যাযাবর জাতি সেই বনে বাস করিত এবং দূর-দূরান্তরে নিয়ত লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া বেড়াইত। সাধারণ ভাবে লোকে ইহাদের নাম রাখিয়াছিল 'বেদে'। তাম্রলিপ্তের উপকণ্ঠে বেদেদের যে বৃহৎ পল্লী ছিল, তাহার পরই ছিল বন। সূর্য্যাস্তের পর ভয়ে কেহ এ পথে আসিত না। নগরপালের রক্ষিবর্গ অথবা গণসেনা পর্য্যন্ত নিশাকালে বেদে-পল্লীতে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইত। বেদেদের অত্যাচার হইতে প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাম্রলিপ্তের বণিকসঙ্ঘ যে সকল বিধি প্রণয়ন করিলেন, তাহাতে বেদেদের জন্য লঘুপাপেও গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা রহিল! বেদে-আসামী হাতে পাইলেই পৌরমুখ্য বা বিচারকর্ত্তা তাহার উপর কঠোরতম দণ্ডের আদেশ করিতেন। বেদেরা যে সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট, তাহাই দেখাইবার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বেদের সৎকারের ব্যবস্থা ছিল সমাধি! অবিচারে জর্জ্জরিত হইয়া বেদেরা এমনি মরিয়া হইল যে, তিল-মাত্র সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা সাধন করিতে ছাড়িত না।

সেকালে কর্ণসুবর্ণ ছাড়া বাঙ্গালা দেশে চারিটী প্রধান রাজ্য ছিল—উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পূর্ব্ববঙ্গে ডবাক, দক্ষিণপূর্ব্বে সমতট এবং দক্ষিণবঙ্গে তাম্রলিপ্ত। মহারাজ শশাঙ্ক যেমন এই চারিটী রাজ্যের প্রাচীন রাজবংশকে

উন্মূলিত করিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীকেও তেমনি আবার স্থানীশ্বর-পতি হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক সিংহাসচ্যুত হইতে হইল। দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দিল। বাঙ্গালার সেই দুর্দ্দিন শতাধিক বৎসর চলিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

দুর্দ্দিনের অন্ধকার যখন অল্পে অল্পে আকাশ ঢাকিতেছে, তখনো সেই অষ্টকোণ দেবালয়—বঙ্গবীরের কীর্ত্তিস্তম্ভ পূর্ব্বগৌরবেই বিরাজ করিতেছিল। তাহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে রক্তবর্ণ সিদ্ধিদাতার অতিবৃহৎ মূর্ত্তি পূর্ব্বের মতই উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিত, যেন সতীসীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু। স্তম্ভের আটটী কোণে স্তরে স্তরে বত্রিশটী সুবৃহৎ চৈত্য ছিল। উৎসবকালে চৈত্যের স্বর্ণচূড়াগুলি যখন ফুলের মালায় মালায় সংযুক্ত হইত, যখন চূড়ায় চূড়ায় লাল, নীল, হরিৎ, পীত রেশমী পতাকাগুলি পবন-হিল্লোলে কম্পিত হইত, তখন মনে হইত, বীরধাত্রী বঙ্গমাতার স্বর্ণরথখানিই যেন দাঁড়াইয়া আছে।

কীর্ত্তিস্তম্ভের উত্তরদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রশস্ত একটি অঙ্গন ছিল—উহা কারুকার্য্যখচিত প্রাচীরে বেষ্টিত, সবুজ ঘাসের নির্ম্মল আস্তরণে আচ্ছাদিত। তাহার পরই মুক্ত তোরণ। তোরণের সম্মুখে প্রশস্ত রাজপথের অপর পারে মণিকার শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদতুল্য গৃহের মুক্ত-চত্বর—অনুচ্চ প্রস্তর-বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টিত। পথের উভয় পার্শ্বেই, শ্রেষ্ঠীদের দ্বিতল, ত্রিতল ও চতুস্তল গৃহের সারি—কোনটী ইষ্টকে, কোনটী প্রস্তরে, কোনটী বা কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

দেব-দেউল বা কীর্ত্তিস্তম্ভ একে একে পাঁচটী তলে বিভক্ত হইয়া ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। ইষ্টক, প্রস্তর ও কাষ্ঠে নির্ম্মিত ফল, পুষ্প ও লতায় বেষ্টিত মন্দিরের গায়ে ছোট বড় অসংখ্য কুলুঙ্গী ছিল। উহাদের গর্ভে নানা প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজ করিত। সর্ব্বনিম্নতলে ভাস্করবর্ম্মার সহিত শশাঙ্কের যুদ্ধের ছবি, দ্বিতীয় তলে সমুদ্রযাত্রা ও নানা পশুপক্ষীর মূর্ত্তি, তৃতীয়ে যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, নাগ, নাগিনী এবং রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান—চতুর্থে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী, পঞ্চম তলের স্থানে স্থানে বসন্ত বর্ষাদি ঋতুর এবং ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর মূর্ত্তি সেই দেব-দেউলের অলঙ্কার ছিল। যাঁহারা বুদ্ধগয়ার সুবিখ্যাত মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহা-দিগের সেই বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও গঠন-চাতুর্য্য তাঁহারা কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। এই দেবালয়ের গণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীকালভৈরবের মোহান্তের আদেশ প্রয়োজন হইত।

স্তম্ভের সর্ব্বোচ্চ শিরে প্রকাণ্ড একটী মুক্ত কক্ষের মধ্যে অতি বৃহৎ যে ঘণ্টা ছিল, তাহারই গভীর রব নগরবাসীকে প্রহর জানাইত। ঘণ্টায় একসঙ্গে তিনটী ঘা পড়িলে বন্দরের করগ্রাহীরা বুঝিত যে, বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িল, অথবা কোন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। বৃহৎ ঘণ্টাকে ঘিরিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আরও ছয়টী ঘণ্টা ছিল। উৎসবের সময়ে সাতটী ঘণ্টা একসঙ্গে বাজিত। নগরের সুদক্ষ শিল্পিগণ এমন কৌশলে ঘণ্টাগুলি নির্ম্মাণ ও স্থাপন করিয়াছিল যে, একটী চাকা ঘুরাইয়া যে কোন বলবান লোকেই এক সঙ্গে সবগুলি ঘণ্টা বাজাইতে পারিত। চাকা ঘুরাইলেই বড় ঘণ্টা বাজিত এবং উহাকে বেষ্টন করিয়া ছোট ঘণ্টাগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিয়া উঠিত। উহাদের স্বরগ্রামানুযায়ী অপ্রতিহত রব মন্দপবনে ভাসিয়া ভাসিয়া দূরে জল-কল্লোলের সঙ্গে মিশিয়া যাইত মনে হইত যেন আকাশে গভীর জলতরঙ্গ বাজিতেছে। লোকে সেই মুক্ত কক্ষটীকে বলিত ঘণ্টাঘর।

স্তম্ভের ভিতরে যে সোপানশ্রেণী ছিল তাহা কুতুব-মিনারের সোপানের মত, আলোক ও অন্ধকারের ভিতর দিয়া সাপের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চূড়ায় যাইয়া পৌঁছিয়াছিল। সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে স্তম্ভের তলে তলে অনেক অনেকগুলি ছোট বড় প্রকোষ্ঠ ছিল। তাহাদেরই কোনো একটীতে ঘণ্টাবাদক থাকিত।

সেকালে এই স্তম্ভের পশ্চাতেই দক্ষিণ দিকে একটী সুবিস্তৃত ও সুগভীর খাল ছিল। নদীর স্রোত সেই খালে প্রবেশ করিয়া সহরের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে এবং নানা শাখা খাল দিয়া সহরের ভিতরে ও বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। প্রধান খালের

উভয় তীরেই তাম্রলিপ্ত নগর বিস্তৃত থাকিয়া ধনে জনে, সৌধে উদ্যানে বাঙ্গালীর জয়শ্রীই ঘোষণা করিত।

দেবালয়ের একটী গুপ্ত দ্বার ছিল। সেই দ্বার হইতে কতকগুলি প্রস্তর-সোপান খালের তলদেশ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। শ্রীকালভৈরবের মোহান্ত সেই গুপ্তদ্বারের চাবিটী নিজে রাখিতেন।

ঘণ্টা-ঘরের ছাদটী ছিল চতুষ্কোণ চত্বর। সেই চত্বরের চারি কোণে শ্বেতবর্ণের উজ্জ্বল অতি বৃহৎ চারিটী চৈত্য সোণালী লতাপাতায় ভূষিত ছিল। চত্বরের ঠিক মধ্যস্থলে মর্ম্মর দেবীর উপর স্বর্ণময় আমলকে বিদ্ধ স্বর্ণময় বৃহৎ ত্রিশূল রৌদ্রকরে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিত। নানা কারুকার্য্যময় বেষ্টনীর মধ্যে স্তম্ভের কোণে কোণে পাঁচটী তলে বারান্দাগুলি স্তম্ভকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। বারান্দার স্থূল স্তম্ভাবলী ছিল মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত। বারান্দার গা হইতে গাঁথিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী মুক্ত চত্বর নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেখিলে মনে হইত—চত্বরগুলি যেন স্তম্ভকে ঘিরিয়া স্তরে স্তরে শূন্যে ঝুলিতেছে। উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া যে অনুচ্চ প্রাচীর রচিত হইয়াছিল তাহারই উপর নানা ধাতুর পাত্রে নানা প্রকার ফুলের গাছে নিত্য ফুল ফুটিত। দেব-দেউলের গঠনসৌষ্ঠব ও ভূষণরাশি, উহার মনোহর বেষ্টনী ও ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং যুগ্ম ও অযুগ্ম স্তম্ভাবলী, রক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তিশিল্প—বলিতে গেলে উহার প্রতি অঙ্গ গুপ্ত-যুগের উন্নত স্থাপত্যের মনোহর নিদর্শন-রূপেই বর্ত্তমান ছিল। বাঙ্গালী-স্থপতি এবং ভাস্কর মিলিত হইয়া পাটলীপুত্র হইতে সে কলানিদর্শন আনিয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সকল কাব্যের রস যেন সেই দেবালয়ের অঙ্গ বহিয়া ধারায় ধারায় ক্ষরিয়া পড়িত।

এই অনিন্দ্যসুন্দর দেবালয়ের অনন্যসাধারণ ঘণ্টাবাদক ছিল একচক্ষু ভৈরব—মূক ও বধির, বিকলাঙ্গ ও বলিষ্ঠ।

(২)

সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি। কপাল-মোচন তীর্থে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হইবার জন্য বহু নরনারী দূর-দূরান্তর হইতে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছে। চারিদিকে লোকারণ্য। সহরের পঞ্চাশটী দেবমন্দির পত্রে, পুষ্পে ও পতাকায় সুশোভিত হইয়া প্রভাতেই অপূর্ব্ব শ্রী ধরিয়াছে। মঙ্গল-শঙ্খের গম্ভীর কোমল নিনাদে নগর মুখরিত। এত ভিড় যে, তাম্রলিপ্তের ছোট বড় অসংখ্য পথে নিরাপদে চলিবার উপায় নাই। দোকানে দোকানে জনতাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নানা দেশের নানা জিনিষ সাজাইয়া দোকানীরা সেদিন পল্লীবাসীদের কাছে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ দাম চাহিতেছে—কিন্তু মুখে কেহ বলিতে ছাড়ে না যে, 'সস্তা মাল' শুধু তাহারই দোকানে পাওয়া যায়! দশটী বৌদ্ধ বিহারের কাষায়-পরিহিত সহস্রাধিক ভিক্ষু ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যখন পথের শৃঙ্খলা রক্ষায় ও যাত্রীদের পরিচর্য্যায় রত, সেই সময়ে শ্রেণী-সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল—১০৮ জন পদাতিক ও ৮১ জন অশ্বারোহী। এই সেনাদলকে সেখানে 'গণ' বলিত। শৃঙ্খলা রাখিতে গিয়া গণসেনা অল্প সময়ের মধ্যেই এত বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে সমর্থ হইল যে, পথিকদের কাহারো হাত কাটিল, পা ভাঙ্গিল—কেহ বা সঙ্গীহারা হইয়া যে-দিকে সেদিকে ছুটিয়া গেল!

সেবার পৌষ-সংক্রান্তির দিনে শুভযোগে তাম্রলিপ্তের শ্রমজীবী ও দোকানীগণ কীর্ত্তিস্তম্ভের নিকটেই বিশ্বকর্ম্মার ছোট একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সেই নবীন দেব-গৃহের সম্মুখে প্রশস্ত মণ্ডপের মধ্যে প্রভাত হইতেই অত্যন্ত জনতা হইয়াছিল। সকলেই শুনিয়াছিল, বারোয়ারি মণ্ডপে অপরাহ্ণে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হইবে—গাহিবার জন্য কর্ণগড় হইতে নূতন একটী দল আসিয়াছে। অভিনয়ের পরই তাম্রলিপ্তের শ্রমজীবীদের নূতন সং-রং ও বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি লইয়া নগর-ভ্রমণ—বিরাট শোভা-যাত্রা।

অপরাহ্ণে অভিনয় আরম্ভ হইল, কিন্তু জলকল্লোলের ন্যায় সেই হট্টরোলের মধ্যে কিছু শুনিতে পায়, কাহার সাধ্য? গোলমাল থামাইতে যাইয়া অনেকেই নূতন গোল-যোগ বাধাইয়া তুলিতে লাগিল। রঙ্গপীঠে দক্ষ আসিলেন,

দক্ষরাণী আসিলেন এবং কিছুক্ষণ হাত-পা ও মুখ নাড়িয়া নেপথ্যে প্রস্থান করিলেন; কৈলাসে নন্দীভৃঙ্গীরও সেই অবস্থা ঘটিল। গানের ধ্বনি উঠিল—শব্দ কেহ বুঝিতে পারিল না! শ্রোতারা যেমন গোল করিতেছিল, তেমনি করিতেই লাগিল। যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা কিছু কিছু শুনিতে পাইল—কিন্তু অনেকেই পাইল না এবং সকল দোষ কবি জয়ন্তের শিরে চাপাইয়া দিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—'কোন্ মূর্খ এ পালাটা লিখেছে হে! লেখা যদি ভাল হ'তো, তা' হলে আর গোল থামে না?"

দরিদ্র নবীন কবি কর্ণগড়ের জয়ন্ত—সে কখনো তাম্রলিপ্ত দেখে নাই। জনসমুদ্র কাহাকে বলে, কল্পনায় তাহার পরিচয় পাইলেও, সে কখনো উহা প্রত্যক্ষ করে নাই। কর্ণগড় হইতে বহু দূরের পথ তাম্রলিপ্ত। কত আশা করিয়া সে আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নেপথ্যে থাকিয়া সহস্র মুগ্ধ দর্শকের নিকট হইতে অসংখ্য জয়-মাল্য লাভ করিবে! আহা বেচারী! দলের অধিকারী প্রথমে ত নূতন কবির নূতন পালাটা গাইতেই চাহে নাই; শেষে বলিয়াছিল, পালাটি জমিলে জয়ন্তকে সে এক মুঠা টাকা দিবে!

সকল আশাই যে একে একে দূর হইতেছে, জয়ন্ত ইহা বুঝিতে পারিল। রঙ্গপীঠের কাছে দাঁড়াইয়া আশাহত অখ্যাত মৌন কবি কেবল কাঁদিলই না।

এইবার স্বয়ং মহাদেব ও উমা আসরে নামিলেন। জয়ন্তের বুক এক হাত ফুলিয়া উঠিল। নিজের রচনাই তাহার নিজের কাণে মধু ঢালিতে লাগিল। জয়ন্ত ভাবিল, এবার আর কথাটী নাই—নিশ্চয় কোলাহল থামিবে! জয়ন্ত ব্যাকুল হইয়া সেই উদ্বেলিত নর-সমুদ্রের দিকে চাহিল। সত্য সত্যই গোলযোগটা তখন থামিয়াছিল। হর-পার্ব্বতীর কথাগুলি জয়ন্ত নিজেই একেবারে গিলিতে লাগিল। এত সুন্দর—এত মধুর তাহার রচনা? এ কি সত্যই জয়ন্তের লেখা? জয়ন্ত আনন্দে চক্ষু মুদিল। মনে করিল যেন স্বপ্ন দেখিতেছে!

রঙ্গপীঠের অপর দিকে শূন্য অথচ সুসজ্জিত একটী মঞ্চ ছিল। হর-পার্ব্বতীর অভিনয় বেশ একটু জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় মঞ্চের নিকট হইতে অতিশয় করুণ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"নাচার কুষ্ঠীকে দয়া কর বাবা!"

জয়ন্তের সোণার স্বপ্ন তখনি ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, মঞ্চের পাশে ছিন্ন মলিন বেশে এক্জন ভিখারী। ভিখারী এতক্ষণ লোকের ভিড়ের মধ্যেই ছিল। যখন দেখিল, কেহই তাহার দিকে চাহে না, কাহারো পকেট মারিবারও তেমন সুযোগ নাই—তখন সে নিরুপায় হইয়া লোক ঠেলিয়া মঞ্চের কাছে আসিল। ভাবিল, কোনো মতে লোকচক্ষুর সম্মুখে নিজের দৈন্য ও বাহুর ভীষণ ক্ষতটাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইলে অবশ্যই কিছু মিলিবে।

ভিখারী সুযোগ বুঝিয়া আবার কাতরকণ্ঠে কহিল—"কুষ্ঠীকে দয়া কর বাবা!"

ভেকসমাকুল পল্বলে ইষ্টক নিক্ষেপ করিলে যেমন হয়, নদীর চড়ায় হাঁসের দলের উপর সহসা বন্দুকের ব্যর্থ-গুলি চালাইলে যেমন হয়—রঙ্গপীঠে পার্ব্বতীর অভিমান-মাখা করুণ অভিনয়ের মাঝখানে ভিখারীর আর্ত্তকণ্ঠ তেমনি একটা এলো-মেলো গোলযোগের সৃষ্টি করিল। কবি জয়ন্তের মনে হইল, আকাশের একটা নির্ম্মম বিদ্যুৎ-শিখা হঠাৎ যেন তাহারই বুকের ভিতর প্রবেশ করিল। দর্শকমণ্ডলী হর-পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া ভিখারীর দিকে চাহিতেছে দেখিয়া ভিখারী অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে আরো কাতরস্বরে অধিক বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"নাচার কুষ্ঠীকে দয়া কর বাবা!"

ভিখারীর প্রসারিত দক্ষিণ বাহুর বৃহৎ ক্ষতটায় আলো পড়িয়া তখন আরও দগ্ দগ্ করিতে লাগিল।

কে একজন বলিয়া উঠিল—"বা-রে! এ যে দেখছি বেদে বন্ধু তোরমান! কি বন্ধু, পায়ের ঘাটা আবার হাতে উঠলো কবে? পায়ে বুঝি ভালো মানালো না?"

একথা যে কহিল, তাহার নাম দেবব্রত। তাহার সহিত নানা কারণে তোরমানের বিশেষ পরিচয় ছিল।

দেবব্রত তোরমানের দিকে একটা টাকা ছুঁড়িয়া দিল। তোরমান টাকাটাও যেমন প্রসন্নচিত্তে লইল,

ব্যজটাকেও তেমনি গ্রহণ করিল এবং চারিদিকে বাহুর ক্ষতটা দেখাইতে দেখাইতে চীৎকার করিতে লাগিল—"রাজা বাবা, কুষ্ঠীকে দয়া কর বাবা!"

ভিখারীর কাণ্ড দেখিয়া অনেকেই হাততালি দিতে আরম্ভ করিল। বেচারী হর এবং পার্ব্বতী কি আর করিবে—নিরুপায় হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

জয়ন্তের বুকটা একেবারেই ভাঙ্গিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া সে নটদিগকে বলিতে লাগিল, "ও কি হচ্ছে? দাঁড়িয়ে রইলে যে? চালাও—চালাও—এইবার গোলটা একটু থেমেছে।"

আবার অভিনয় আরম্ভ হইল। কম্পিত, ক্ষুব্ধ, চঞ্চল জনসমুদ্র যেন ধীরে ধীরে স্থির হইতেছিল দেখিয়া জয়ন্ত ভাবিল,- হবে না? এ যায়গাটার লেখা কত ভাল! তবু ত জোরের কথাগুলো কেউ শুনতেই পেলনা!

হর যেখানে সতীকে দক্ষালয়ে যাইতে নিষেধ করিতেছেন, কত আকুলতা সেখানে, কত শঙ্কা সেখানে, আসন্নবিচ্ছেদের উদ্যত আঘাতের ভয়ে কত ব্যথা সেখানে। হরের বক্তৃতার প্রত্যেকটা শব্দ যেন জয়ন্তের পঞ্জরের এক একখানি অস্থি! কত শ্রমে জয়ন্ত নিজেই হরকে তালিম দিয়া মনের মত করিয়া শিখাইয়াছিল। আর ত কিছু চাহে না সে—শুধু চায়, লোকে একটীবার শুনুক। শুনিবার জন্ত ত তাহারা মণ্ডপ পূর্ণ করিয়া বসিয়াও ছিল!

হতভাগ্য জয়ন্ত! এমনই কি বিধি লেখা?

হরের কণ্ঠকে ডুবাইয়া দিয়া হঠাৎ দৌবারিকের ভেরী বাজিয়া উঠিল ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ—ও! সমস্ত আকাশটা যদি তখনই ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলেও জয়ন্তের কাণে তেমন বাজিত না, যেমন বাজিল ক্ষীণপুণ্য সেই দৌবারিকের কর্কশ ভেরীনাদ!

ভেরী বাজাইয়া দৌবারিক কহিল, "পথ ছাড়, পথ ছাড়—শ্রেষ্ঠী আস্‌ছেন।"

তাম্রলিপ্তের বণিকসঙ্ঘের সভাপতি মোহনচাঁদ শ্রেষ্ঠীর মান সেকালে রাজার মান অপেক্ষাও বেশী ছিল। জয়ন্ত যেদিন শুনিল যে শ্রমিকদের নিমন্ত্রণে শ্রেষ্ঠী মোহনচাঁদ স্বয়ং আসিতে পারেন, সেই দিনই দক্ষযজ্ঞের পাণ্ডুলিপিখানা দলপতির তোরঙ্গ হইতে গোপনে লইয়া স্থানে স্থানে কাটিয়া কুটিয়া এমন কয়েকটা স্তুতিবাক্য লিখিল যাহা শ্রেষ্ঠীর কর্ণে মধুর লাগিবারই কথা। সেই সময়ে একথাও জয়ন্তের মনে হইয়াছিল যে, শ্রেষ্ঠী অভিনয় দেখিতে আসিলে দরিদ্র গ্রাম্য শ্রোতাদের মন হয়ত তাঁহাকেই ঘিরিয়া থাকিবে। যেভাবে অভিনয়টা দেখিলে তাহারা জয়ন্তের প্রশংসায় শতকণ্ঠ হইতে পারিত এবং তাম্রলিপ্তের গ্রামে গ্রামে তাহার যশ প্রচার করিয়া বেড়াইত, তেমন মনোযোগের সহিত অভিনয় দেখা ঘটিবেনা! কিন্তু কি করিবে সে—ক্ষুধার তাড়না তাহাকে আকুল করিয়াছিল। প্রতিদিনের সেই সত্য দাবীটাকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। আর কেহ নন, স্বয়ং মোহনচাঁদ শ্রেষ্ঠী—একটীবার হাত নাড়িলেই ত জয়ন্তের শিরে স্বর্ণবৃষ্টি হইতে পারে!

স্বর্ণবৃষ্টির আশায় জয়ন্ত ছন্দের পর ছন্দে স্তুতিবাক্য রচনা করিয়াছিল। নানা প্রসঙ্গে হর এবং পার্ব্বতীর মুখে, নন্দী ও ভৃঙ্গীর মুখে সেগুলি দিতেও সে ছাড়ে নাই। কিন্তু যে ভয় জয়ন্ত করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিল। মোহনচাঁদ আসিয়া মঞ্চে উঠিতেই মণ্ডপে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠিল—শ্রেষ্ঠী—শ্রেষ্ঠী। কেহ তাঁহার পরিচ্ছদের, কেহ মুখের, কেহ বুদ্ধির—কেহ বা বিচারকৌশলের—এইরূপ নানাজনে একসঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা জুড়িয়া দিল। যাহারা শ্রেষ্ঠীর নামই শুধু শুনিয়াছিল, চক্ষে কখনো দেখে নাই—তাহারা হর-পার্ব্বতীকে না দেখিয়া শ্রেষ্ঠীর উষ্ণীষের দিকেই হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। যাহারা ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না তাহারা পাশের লোককে ঠেলিতে লাগিল, না-হয় উঠিয়াই দাঁড়াইল। শ্রেষ্ঠী এ সকল লক্ষ্যই করিলেন না—জনসাধারণের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া একটী ক্ষুদ্র অভিবাদন করিলেন এবং বিশিষ্ট মহার্ঘ্য আসনে যাইয়া বসিলেন।

জয়ন্তের প্রাণটা তখন কণ্ঠের কাছে আসিয়া ছট্‌-

কটু করিতেছিল। হরপার্ব্বতীকে সে পরুষকণ্ঠে কহিল, "এইবার—এইবার! জুড়ে দাও পালা। খুব চেঁচিয়ে আরম্ভ কর।"

তখনই আবার ভেরী বাজিল। দৌবারিক জানাইয়া দিল, পৌরমুখ্য আসিতেছেন। এইবার নগররক্ষক—এই আসিলেন শ্রেষ্ঠক—এইবার পোতাধ্যক্ষ অনন্তরাম!"

জয়ন্ত ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! তাহার সে চোখের জল দেখিলেন শুধু সেই বিধাতা যিনি এমনি নির্ম্মম হৃদয়ে জয়ন্তের মাথায় বাজ হানিলেন—আর কেহ দেখিল না। জনসাধারণ—সেই অস্থিরচিত্ত লঘু-হৃদয় দর্শকমণ্ডলী তখন গণ্যমান্য অভ্যাগতের নাম, পদ, বেতন, ভূষণ প্রভৃতির আলোচনায় এমন মাতিয়া উঠিল যে, দক্ষযজ্ঞ ভাসিয়া গেল।

জয়ন্ত তখনো আশা ছাড়িল না। তাড়াতাড়ি মণ্ডপে আসিয়া নিজেই দর্শকের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল এবং পাশের দর্শককে ঠেলা দিয়া শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "মশায় আর দেরি কি? এখনো এরা আরম্ভ করছে না যে?"

দর্শক উত্তর দিল, "কি আরম্ভ করবে মশায়?"

"কেন? অভিনয়! এতক্ষণ ত বেশ হচ্ছিল। খাসা গায় এরা।"

দশজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "আবার অভিনয়! চাপা দাও—চাপা দাও। আমরা এখন সং বের করবো।"

সকল কণ্ঠের উপরে সুর তুলিয়া জয়ন্ত বলিল, "না-না—অভিনয়—অভিনয়—দক্ষযজ্ঞ।"

দেখিতে দেখিতে শ্রোতাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়া গেল। কেহ বলিল—"রেখে দাও অভিনয়—সং চাই—সং।" কেহ বলিল—"সং নয়—সং নয়—শোভাযাত্রা।" কেহ বা চীৎকার করিতে লাগিল—"পরে হবে—পরে হবে—আগে দক্ষযজ্ঞ হোক্।"

জয়ন্তের চক্ষু দুইটী তখন চারিদিকে চাহিতেছিল বটে, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না!

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া শ্রেষ্ঠী উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুহীন মৌচাকের মত মঞ্চ শূন্য হইয়া গেল। দৌবারিকের ভেরী বাজিতে লাগিল ধুধু ধু—ধুধু ধু—!

সেই শব্দে জয়ন্তের চমক ভাঙ্গিল। সে দেখিল লোকের চাপে তাহার পা দুইখানি আর মাটীতে নাই! কোনো মতে নিজেকে বাঁচাইয়া জয়ন্ত রঙ্গপীঠের পশ্চাতের দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল বড় ভিড়। ভিতরে প্রবেশ করিতেই তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। কোথায় বা তাহার অধিকারী আর কোথায় বা হরপার্ব্বতী। দলে দলে লোক সেখানে বিকট এক একটা মুখোস পরিয়া ধেই ধেই নাচিতেছে। বাহিরে জনতার উল্লাস ও করতালি এবং ভিতরে সংএর নৃত্য—মনে হইতে লাগিল, মণ্ডপটা যেন তখনই ভাঙ্গিয়াই পড়িবে!

সংএর পর সং—সংএর পর সং—তাহার যেন আর শেষ নাই। সর্ব্বশেষে রথের উপর সমাসীন বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি। শোভাযাত্রা মহা সমারোহে রাজপথে বাহির হইল। গীতে বাদ্যে জয়নিনাদে চারিদিক কাঁপিয়া

জয়ন্ত সহসা দেখিল সম্মুখেই তাহার দলের অধিকারী। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "আপদগুলো সব চলে গেল—আসুন এইবার আমরা গান আরম্ভ করি। সমঝদার দু'চারজন পাবই।"

অধিকারী করুণ কণ্ঠে কহিল, "আর গান!"

"কে—ন?"

"ওরা কি আর কিছু রেখেছে—সব নিয়ে গেছে!"

"নি-য়ে-ছে! কি নিয়েছে? কে নিয়েছে?"

"ওই সংএরা—পোষাকগুলো ত গেলই—বস্তর-পত্তরও আর নেই!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে জয়ন্ত বলিল, "আমার পুঁথি খানা—সেই দক্ষযজ্ঞ?"

"ওরা তার পাতা ছিড়ে চিড়ে তামাকের আগুন করেছে।"

জয়ন্ত টলিতে টলিতে রাজপথে আসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

—লাল আচার্য্য।

প্রাণের কথা

সন্ধ্যা হয়ে আসে আমার জীবনের
প্রান্তি দুখ তাপ হইয়া আসে—ম্লান,
আঁধার হয়ে আসে অগাধ আলো ওই
শান্ত হয়ে আসে ব্যথিত হৃদি প্রাণ।

থামিয়া আসে ধীরে চোখের জলধার
মলিন হয়ে আসে সুখের যত আশ,
এবার লহ মোরে করুণা-পারাবার,
থামায়ে দাও মোর বুকের ব্যথা শ্বাস,

চোখের জল মুছে ব্যথিত আঁখি মোর
সাঁঝের আগমনে পড়েছি ধীরে ঢুলে,
মরণ পথ চেয়ে বসে যে আছে চির
এবার লও তারে লও গো কোলে তুলে॥

৺লীলা মিত্র।

উত্তরাখণ্ডের পত্র

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ কল্যাণবরেষু—

আমরা ২৭শে বুধবার হৃষীকেশ থেকে বেরিয়ে আজ ৪২ মাইলে (হরিদ্বার থেকে) মহাদেব-চটিতে পৌঁছেচি। আজ শনিবার ৩০শে। বুধবার বিকাল পাঁচটার পরে হেঁটে যখন যাত্রারম্ভ করা হল, তখন আমরা মনে করেছিলেম আমাদের হয়ত স্বর্গপথ থেকেই ফিরতে হবে, কারণ ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে চটে গিয়ে পণ্ডু পাণ্ডাজীকে শুদ্ধ বলে দিলে যে তাঁকে আমাদের দরকার নেই; যাই তো আমরা নিজেরাই যাব। পাণ্ডাজী তাঁর তিনজন গোমস্তা নিয়ে এবং বদরীর পাণ্ডার গোমস্তাটী ভয় পেয়ে পিছিয়ে রইল।

গঙ্গা এখানে প্রশস্ত। স্থানটা কতক সমতল বলেই বোধ হয় প্রায় নিস্তরঙ্গ। হৃষীকেশের গঙ্গার সে কি উদ্দাম চপলতা। সারারাত ঘুমের মধ্যেও সেই অফুরন্ত কলনাদ শুনতে পেয়েছি। এখানে কিন্তু তা নেই। এর সেই স্বভাবপ্রসন্ন শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তি! পরপারে স্বর্গের মতই শ্রীসম্পন্ন স্বর্গপথে কূল পর্য্যন্ত বাঁধা ঘাটের উপর সুন্দর মন্দির; স্থানে স্থানে ছোট বড় পরিচ্ছন্ন বাড়ীগুলি যেন ছবির মত শোভা পাচ্চে। এদের কারু কারু সঙ্গে ছোট খাট বাগান, কোথাও দেবমন্দিরও দেখা যাচ্ছিল। শুনলেম এগুলির মধ্যে অনেক রিটায়ার করা জজ, সবজজ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি তীর্থবাসী হয়ে আছেন। সাধনের এবং বানপ্রস্থের উপযুক্ত স্থানই বটে!

এপারেও তপোবন নামক পুণ্যস্থলী। কৈলাস-নামক আশ্রমটী একটী রাজপ্রাসাদের মতই জমকালো। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই কৈলাসাশ্রমে দু'টী হাতী দেখেছি। এদের জলখাওয়ানর জন্তে গঙ্গার ধারে একটী পাথরের গাঁথনীতে মোটা শিকল বাঁধা আছে। নতুবা বর্ষার জল-স্রোত মত্তহস্তীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঐরাবতের দুর্দ্দশার কথা মনে পড়লো। হিমালয়জাত বিশুদ্ধ শিলাজতু প্রভৃতির দোকান এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একটী আশ্রম এখানে রয়েছে। ঋষিকুল, মহর্ষিকুল,

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, আরও কয়েকটী বিদ্যালয় দেখা গেল। খানিকটা সমতল জমি শ্যামল হয়ে শস্যসম্ভার বুকে ধরে হাসচে। আর তার ওপাশেই গুল্ম-পাদপ-সমাকীর্ণ পর্ব্বতরাজি।

আমরা পথ চিনিনে। পথের মধ্যে একটী দল বাঙ্গালী ছেলে সঙ্গী জুটলো, তাদের অবস্থাও তথৈবচ! কাযেই "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" গোছের হয়ে আমরা দেড় মাইল পথের বদলে উল্টো পথে তিন মাইল রীতিমত খাড়া চড়াই ও সোজা উৎরাই উঠে নেমে হাঁপিয়ে, ঘেমে, রেগে, পারিনা পারিনা করতে করতেও অথচ যেন কিসের একটা আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'তে হ'তে লক্ষ্মণ ও ধ্রুব মন্দির দর্শন করে স্বনামপ্রসিদ্ধ লছমন-ঝোলায় এসে পৌছলেম। কিন্তু ঝোলার দর্শন পাওয়া গেল না! ১৩৩১ সালের প্রবল বন্যায় অনেক কিছুর সঙ্গে এই লছমন-ঝোলার পুলও গঙ্গাগর্ভে ভেসে চলে গেছে। তার পর আর তৈরি হয়ে ওঠেনি। আমরা নৌকা করে নদী পার হলেম। জলস্রোত খুবই কম। (অথচ এই গঙ্গাই হৃষীকেশে কি লাফানই লাফাচ্ছিলেন!) জলের রং ঠিক বাঁধা জলের ধরণের—ঈষৎ হরিদ্রাভ নীল। গভীরতা এখানে বেশী তা বেশ বোঝাই যায়। ওপারে পেরিয়ে গিয়ে পুরাতন লছমন ঝোলার পুলের থামটার ভাঙ্গা গাঁথনি খানিকটা দেখতে পাওয়া গেল। এর উপর দিয়ে ১৮৮৮ অব্দে তৈরি রায়বাহাদুর সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা তাঁর মায়ের আদেশে বহু অর্থ ব্যয়ে লোহার পুল তৈরি করে দেন, সেই পুলটি ছিল।

বিখ্যাত লছমন ঝোলা অনেক দিন আগেই গত হয়েছিলেন। তীর্থভ্রমণ বইখানার বর্ণনায় আছে—

"ঝোলা দেখিয়া সকলের জ্ঞানহত হইল, তাহার কারণ ঐ ঝোলার আকৃতি পাহাড়ের উপর হইতে পাঁচ শত হাত দূরে বিপরীত পারে পাহাড়ের উপর গাছ আছে, তাহার সহিত বন্ধন। এই মত তিন রশি দেওয়া আছে। তিন রশিতে দেড় হাত প্রস্থ; ঐ রশিতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক এক খাদি কাঠের থাক বান্ধা, যেমন সিঁড়ি মই এই মত থাক থাক বান্ধা, দুই পার্শ্বে দড়ির রেল বন্ধ, কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ। তাহার উপর দুই পার্শ্বে মোটা দুই রশি আছে, তাহা ধরিয়া ঐ ঝোলার উপর উঠিয়া ঐ খাদি কাঠের উপর পদক্ষেপ করিয়া, ভীত ব্যক্তিকে উপরের রজ্জু ধরিয়া গঙ্গা পার হইতে হয়। একজন মনুষ্য যাইতে কি আসিতে পারে, যদি কেহ যাইতেছে আর বিপরীত পার হইতে কেহ আসিতেছে, তাহা হইলেই বড় কঠিন হয়। ঝোলার দুই মুখ উচ্চ পর্ব্বতের উপর, মধ্যস্থল নিম্ন হইয়া ঝুলিয়া আছে, ঐ স্থলে আসিলে প্রাণ সশঙ্কিত। তাহার কারণ যে, ভাগীরথী ৺গঙ্গা আছেন—তাঁহার জল এমত স্রোতবতী যে, দশ বার শত মণ যে প্রস্তর, তাহাকে ভাঁটার ন্যায় গড়াইয়া, আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল দন্তকাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্রোতের দ্বারা দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। জলের শব্দ এমত বিপরীত হইতেছে যে, ঝোলা হইতে হাজার হাত নীচে গঙ্গার জল, তথাচ তাহার কলকল শব্দে কাণে তালা লাগে এবং নিকটের ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে হয়, তবে বাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। ঝোলা হইতে এক হাজার হাত এই বিকট রূপ গঙ্গার জল, তাহাতে ঝোলাতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পদক্ষেপ করিতে হয়। কিছু দূর গমন করিয়া যাইলে ঝোলা হেলিতে দুলিতে থাকে, মধ্যস্থলে আসিলেই আন্দোলিত হয় এবং এক পার্শ্ব উচ্চ এক পার্শ্ব নিম্ন হয়। তৎকালে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' এই অন্তর্যাগ হয়। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুদিগের বাচনিক এমত শ্রুত ছিলাম যে, লছমন ঝোলা পার হইবার সময় দৈব-বাণী শুনা যায় যে, পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিয়া কহে "পন্থি! সাবধান—পগ্ ধ্যান—মুখে বল 'রাম নাম—হিঁয়া কহি নাহি নাহি হায় আপনা।" এই শব্দ শূন্য পথ হইতে শুনা যায়, তাহা ঝোলাতে উঠিবার সময়ে আপন স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তাহার বিশেষ তদারক করিয়া দেখা হইয়াছে, কোন ক্রমে মনুষ্য কি পক্ষী কিছুই নহে, দৈববাণী তাহার সন্দেহ নাই। পরে ঝোলাতে উঠিয়া আপন ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পার হওয়া হইল।"

সেই ভয়াবহ লছমন ঝোলার হাত থেকে যিনি আত্ম-প্রাণের মমতাত্যাগী ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রী হিন্দুকে রক্ষা করেছেন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ! সুরযমল ঝুনঝুন-ওয়ালার দয়ার দান এ রাস্তায় আরও অনেক আছে, শুনেছি।

যাহোক আমরা বেশ নিরাপদেই গঙ্গা পার হলেম, কাযেই কোন রকম দৈববাণী আমাদের ভাগ্যে শোনার সুযোগ হল না। কিন্তু মেজাজ তখন আমাদের আরও খারাপ হয়ে এসেচে। আমাদের সামনেই প্রকাণ্ড উঁচু নীলকণ্ঠেশ্বর পর্ব্বতচূড়া, তার ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষপাদপ-সমাকীর্ণ বিশাল দেহ মেলে অস্ত সূর্য্যের ক্ষীণালোককে সন্ধ্যার অন্ধকারে খুব শীঘ্রই মিলিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। দেখতে দেখতে দিবসান্তের শেষ আলোটুকু পর্ব্বতের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়ে গাঢ় অন্ধকারে ভরা অন্ধকার পক্ষের সন্ধ্যাকে আমাদের সামনে এগিয়ে এনে দিলে। আমরা একটু ভীত হলেম।

চারিদিক প্রায় শুব্ধ। যাত্রীদল কা'কেও কোথাও দেখা গেল না, পাণ্ডাজীদের সঙ্গে আসতে মানা করে দেওয়া হয়েচে। একেবারে সব কটাই সমান আনাড়ী। আবার সেই খাকী পরা বাঙ্গালী ছেলের দল, তারাও সমাবস্থ! অবশেষে সবাই মিলে যুক্তি করে সামনে একটা আধভাঙ্গা মন্দির দেখতে পেয়ে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া গেল। পুজারী ঠাকুর খুসী হয়েই আমাদের রাখতে রাজী হলেন। তিনিও বল্লেন নীচে এর চেয়ে অনেক ভাল ভাল আশ্রয় আমরা একটুখানি পাশের দিকে গেলেই পেতে পারতুম।

যাহোক ঐ যা পাওয়া গেল, সেই যথেষ্ট! তখন মনে হচ্চে আর কায নেই, রাতটা কোন গতিকে পোয়ালে সকালে উঠেই বাড়ীমুখো হওয়া যাবে। নমুনা দেখেই চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। এই রকম করে অতবড় দীর্ঘ পথ যাওয়া অসম্ভব!

আমরা এঁদোপড়া নীচেতলায় না থেকে ছাদের উপর আড্ডা করলেম। বেশ ফাঁকা ছাদ, কিন্তু উঁচু নীচু আল পাঁচিলে ভাগ যোগ করা। তা হোক, মন্দ হল না একরকম। নূতনত্ব অন্ততঃ বেশ একটু আছে। ষ্টোভে কিছু এবং আশু বামুন নীচে থেকে কিছু রান্না করে আনলে, পরশু বিছানা পাতলে। বৈশাখের এই মাঝামাঝি সময় তোমাদের ওখানে যেমন, তার চেয়ে একটু ঠাণ্ডা, প্রথম বৈশাখের মতই হবে। র‍্যাপার গায়েই চলে। আমরা র‍্যাগ চাপালুম তবুও।

রাত্রে ঘুম হল না। প্রবল স্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকচে, চোক চাইলেই মনে হচ্চে যেন আকাশের গা ঠেলে কতকগুলো বিরাটমূর্ত্তি দানব তাদের মিশ-কালো চেহারা নিয়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার উপর হাজার হাজার ঝক্‌ঝকে তারার মালাকে যেন তাদের মাথার চকচকে মাজা শিরস্ত্রাণের মতই দেখাচ্ছিল। অন্ধকার যেন ওদের স্পর্শে নিবিড় হয়ে রয়েচে। সমস্ত প্রকৃতিটাকেই যেন অপরিচিত অনাত্মীয়ের মত বোধ হচ্ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে কোনদিন কোন দেশকে আমি প্রবাস বলতে চাইনি, অনুভবও হয়নি। আজ এই রাত্রিকালে হঠাৎ মনে হল, এ যেন কোন্ সুদূর প্রবাসে চির অপরিচিত দেশে এসে পড়েচি। এর সঙ্গে আমার চির-পরিচিত ভারতবর্ষের যেন কোথাও দিয়ে কোন যোগ নেই। মনটা বড়ই ভার বোধ হতে লাগলো।

সকাল হল অতি চমৎকার! সূর্য্য বেশ একটুখানি দেরি করে আমাদের ছাদের উপর দেখা দিলেন, অথচ আলোটা তাঁর পাওয়া গেল যথাসময়েই। দীপ্তি-বিহীন সেই গোলাপী মেশানো সোণালী আলোয় স্নাত হয়ে দুরন্ত প্রকৃতি রম্যতরা হয়ে উঠলেন। অদূরে রক্ষাপ্রাচীরের মতই শ্যামশোভা বিমণ্ডিত পর্ব্বতরাজ নীলকণ্ঠ সূর্য্যালোকে দীপ্তশির উন্নত করে রয়েছেন। এদিকে তীর বালুকার কোলের কাছে মাতা জাহ্নবীর শান্ত পবিত্র নীলধারা, পরপারে আবার সেই হিমরাজের ভীমকান্ত অপরূপ রূপ। আর আমাদের দক্ষিণেই বড় বড় মন্দির ধর্ম্মশালা জনাবাস। মনে মনে করুণার সঙ্গে হাসিও এল। আমাদের অবস্থা এমনই বটে! শুনেছি আমার প্রপিতামহ ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মশাইকে

একজন কেউ প্রশ্ন করেছিলেন, "মশাই দু কথায় বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, মুক্তিটা কি?" তিনি উত্তর দেন, "যেমন কানে কলম গুঁজে খুঁজে বেড়ান।"—অর্থাৎ মুক্তই আছ, শুধু সেটা তুমি জানতে পারচো না। আমাদের কাল রাত্রে কাণে কলম গুঁজে খুঁজে বেড়ানই হয়েচে! এত কাছে অমন সহর, অথচ মনে হচ্ছিল আমরা যেন দণ্ডকারণ্যেই বাস করচি।

ডাণ্ডিওয়ালারা সঙ্গ ছাড়েনি তা ঠিকই; সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল। পরশুর সঙ্গে তারা পার হয়ে ডাণ্ডি আনতে চলে গেল। আমরা স্থির করলেম, ওরা ফেরবার আগে আমরা একটু হেঁটে এগিয়ে যাই। এমন সকাল, এমন দীপ্তমূর্ত্তি প্রকৃতি, একে উপভোগ না করে বসে থেকে লাভ কি?

পথ গঙ্গার ধারে ধারে। দৃশ্য অতি সুন্দর! ক্ষণ-পরিবর্ত্তিত। কিছুদূর বালুচরের উপর দিয়ে চলে অল্প পরে পাহাড়ের গায়ের রাস্তা। পুল তৈরির কাযকর্ম্ম চলচে। কাঠের কড়ি বরগা গঙ্গায় ভাসিয়ে বিস্তর চালান হচ্চে, স্রোতে টেনে নিয়ে যায়, কোথাও আটকে গেলে লোক বন্দোবস্ত আছে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিছুদূর পর্য্যন্ত লোকাবাস। রামকৃষ্ণ মিশন এসে দুঃস্থদের সেবার জন্যে একটা আড্ডা করেচেন। একটা ছাপানো নোটিস দিলেন। ওপারে অনেকদূর পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে গায়ে দড়ির টানা রেখার মত গাঁয়ের রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে উঁচুতে নীচুতে ছোট ছোট কুটীরগুলি ছড়ান আছে। গ্রামিকরা কর্ম্মব্যস্ত হয়ে রয়েচে। বেশ ক্ষিপ্র গতিতে ঐ কঠিন পথে যাওয়া আসাও করচে। ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। আমাদের দেখেই ভয় করছিল যে, আমাদের সামনেই পোড়ে না একটা মরে!

দু মাইল পরে গরুড় চটি। স্থানটী পুরাণবর্ণিত তপোবন। কি চমৎকার যে তা' বলতে পারিনে! প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে সুরু করে গভীর নীচু খড পর্য্যন্ত কলাগাছের বন। তা ছাড়া নানা রকমের গাছপালা ঝুপরের মাঝখানে একত্র হয়ে মায়ামন্ত্রপুত শ্যামছবির মতই অনির্ব্বচনীয় শোভার আধার হয়ে রয়েছে। গরুড়ের মন্দিরটী একটা বাঁধান জলাশয়ের মধ্যে। এর মধ্যে কিন্তু শেষশায়ী ভগবানের মূর্ত্তিই মানাতো এবং মনে হত মা কমলার করস্পর্শেই বুঝি এই কমলালয়টী এমন দিব্যমূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে!

এখানে জল খেয়ে পুনর্যাত্রা করে আমরা ফুলবাড়ীতে ন'টার মধ্যেই পৌঁছে গেলেম। সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্থাপিত একটী বড় গোছ ধর্ম্মশালা এখানে আছে, তাতে দেবমন্দির আছে। পূজাপাঠ আরতি বেশ আড়ম্বরেই করা হয়। আমরা চটিতেই রইলেম। চটি গঙ্গার উপরেই, বেশ দৌড়দার লম্বা দালান। দুপাশে দুটি ঘর, একটীতে চটিওয়ালার দোকান, তাই থেকে চাল ডাল, আলু কুমড়া না কিনলে চটিতে থাকতে দেয় না। ঘিটাও কেনা দরকার, যেহেতু আমরা যে চটিতে থাকি সেখানে আর কারুকে তো থাকতে দেওয়া হয় না, তাই এর লোকসানিটা পুষিয়ে দেওয়া ওর চাই তো। আর এটা খুব অসঙ্গত নয়। আমাদের সঙ্গে গাওয়া ঘি, কিছু তেল, মাথার তেল, মেওয়া মিছরি, ইষপগুল, চিনি বা মশলা প্রভৃতি পাণ মশলা, অল্প সল্প সুজি, কলের ময়দা, তৈরি মিষ্টি যতটা সম্ভব নেওয়া হয়েছিল। পথে এসব আগে পাওয়াই যেত না। এখন নাকি স্থানে স্থানে মেওয়া, চিনি, মিছরি পাওয়া যায়। হয়ত সবই যেতে পারে, তবে সে সর্ব্বত্রও নয় এবং মূল্যও অগ্নির সঙ্গে তুলনা যে দেয় তেমনই। বেশি মোট নেওয়া ভুল। কুলিভাড়াও তো ৬০৲ টাকা মণ। তাছাড়া ঘি নুন এসব না নিলে চটিওয়ালা রীতিমত কোঁদল করে। মশলা গুঁড়ো, বড়ি, পাঁপর, তেঁতুল, আমসত্ত, আচার, হিঙ্গু এসব না নিলে দীর্ঘ দিনে অরুচি ধরে যায়, এই দিকেই লক্ষ্য রাখা ভাল।

গঙ্গায় স্নান ও আহারাদি সেরে আমরা সাড়ে চারটের রওয়ানা হলেম। এর মধ্যে ডাণ্ডি করে' সেজদি ও সেজদা এসে পৌঁছলেন। পাঞ্জাবীও তাঁর সঙ্গের চারজন এলেন।

সব মিটমাট হয়ে গিয়ে যাত্রা শুরু হল। দেখা গেল

যে ডাণ্ডিওয়ালাদের গর্ব্ব নিরর্থক নয়, এবং পাঞ্জাবীদের সাহায্যও খুব বেশী দরকার।

ডাণ্ডি অবশ্য সব পাওয়া গেল না। পঞ্চু ও ফণিবাবু এবং আর ক'জন হেঁটে যাবার গৌরবে ঝাপানও নিলেন না। আবার ডাণ্ডিগুলি এমন মজবুত! একখানা স্বর্গপথ থেকে আসতে (ওঁরা দুজনে ডাণ্ডি এলে আসবেন বলে' সকালে সেখানেই ছিলেন) এবং একখানা ফুলবাড়ী থেকে নাইমোহনে আসতে (হিউল নদীর পুলের কাছে) সেজদার ডাণ্ডি দুখানা দুবারে ভাঙ্গলো। প্রথমখানা তাঁর কুলিরা বদলাতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছলো, শেষখানা আর এখান থেকে কে নিয়ে যায়? ওর বদলে ৭৲ টাকা দিয়ে এক ঝাপান কেনা হল। রাত্রে নাইমোহনে কাটান গেল। সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম-শালার পাশেই একখানা মোটা শালের খাম্বার উপর তৈরি দোতলা লম্বা ঘর পেয়ে তোমার সেজ মাসিমা খুব স্ফূর্ত্তি করে তারই উপর আমাদের ক'জনকার বিছানা করালেন। কাঠের খাড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। ছাড়লে না, অগত্যাই সেইখানে রাত কাটানো গেল। মধ্য রাত্রে আমাদের পাশে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী কুকুর শুয়ে আছে দেখা গেল। আমাদের প্রথমটা মনে হয়েছিল বাঘ। পঞ্চুর কাছে একটা ভরা পিস্তল ছিল। তবে কুকুরটাকে যে শিকার করা হয়নি, সেই ভাল। এ-গুলি চটির প্রহরী কুকুর, এদের রূপ গুণ দুই আছে।

সকালে ছোট বিজলী হয়ে তিন মাইল চড়াই চড়ে কুণ্ড চটিতে দুপুর কাটিয়ে ফের চড়াইএর শেষ ও এর সমান মাপের উৎরাই নেমে বৈকালে বন্দর মেলে পৌঁছলেম। এরকম চড়াই শুনলেম এ পথে এখন আর প্রায় নেই। অর্থাৎ এক সঙ্গে এত বেশি। উপরে উঠে চারি পাশের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। নাইমোহন পেরিয়ে হিউল নদীর গর্ভটা খুব প্রশস্ত—বিশেষ যেখানে গঙ্গার সঙ্গে এর সঙ্গম হয়েছে সেটা খুবই চওড়া। এখন জলাভাবে প্রস্তর কঙ্কালে জীর্ণ হয়ে রয়েচে, হাড় চওড়া মানুষ রোগা হলে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে মাথায় গ্রামগুলি স্থানে স্থানে বেশ সুদৃশ্য দেখাচ্ছিল। এতক্ষণকার কুটীরগুলিকে পর্ণকুটীর বলা যেত, এখন এরা রূপ বদলালো! পর্ণের বদলে এদের প্রস্তর কুটীর বলা উচিত; কারণ এদের মাথায় মাথায় শ্লেট পাথরের ছাউনি। রানীগঞ্জের টালির মতন, শুধু রং কটাসে কালো। এই কুটীরগুলি দেখতে বেশ সুশ্রী। গায়ে গেরুয়ার রং, তার মধ্যে মধ্যে অভ্র গুলো বাহার করা, চুণকাম করার মত দেখাচ্চে, অথচ চকচকেও বেশ। কোনটা সাদার মধ্যে গৈরিক বা এলামাটির হলদের বাহার দেওয়া। চটিগুলিও প্রায় তাই। কুণ্ড ছিল উচু পাহাড়ের মাথায়, তাই জলাভাব সেখানে খুব। একটি ক্ষীণধারা, তাও খড়ের মধ্যে। উপরে ফার্লং দুই তফাতে একটা ছোট ঝরণা ছিল, সেখানে ভিড়ও খুব বেশি এবং তার জলেরও খুব অভাব। তেমনই জলের সুখ হলো এই বন্দরমেলে। গঙ্গার ঠিক উপরেই, আর এই এত নীচুতে; কিন্তু ভোরের বেলা যখন বেরুনো হলো, তখন শীত করছিল, তাই গঙ্গাস্নান আর কপালে হলো না। না হোক তবু দেখেও চোক জুড়ালো! গম্ভীর কল-কলধ্বনি, দূর থেকে মনে হয় যেন দু'তিনখানা ট্রেণ পাশাপাশি আসচে। উদ্দাম জলস্রোত নিশ্চয়ই কোথাও বিশেষ বাধা পাচ্ছিল, সেটা আমরা পাহাড়ের বাঁকে দেখতে পাচ্ছিলুম না, শব্দটাই শুনতে পাচ্ছিলুম। গঙ্গা এখানে বেশ প্রশস্ত। চটিটিও খুব বড়, একটা শাখা নদীর ওধারে পাহাড়ের তলায় দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ের উপর একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে, তার আলো এখান থেকে দেখা যায়। একটি অধ্যাপক চাঁদা নিতে এলে আমরা অনেকেই কিছু কিছু দিলুম। পথ এবার গঙ্গার ধারে ধারে যেন পাহাড়ের পোস্তা গাঁথা, সঙ্কীর্ণ পথে প্রায়ই একটু উচু পাঁচিল দেওয়া।

সকালে বেরিয়ে সেম্বল হয়ে এই মহাদেবে এসেছি। চটির পাশেই একটি মহাদেবের মন্দির আছে তাই এই নাম। এ চটিটা তেমন ভাল নয়। বড় নীচু চাল, মাথায় ঠেকে। একটা ধারা থেকে পাইপ এনে কল করেচে। তেমন সুখ নেই জলের। যাত্রী অনেকগুলি এসে

পৌঁছবে। অবশ্য চটিতে অনেক দোকান, স্থানাভাব নেই। তা ছাড়া আমাদের একজন গোমস্তা আগে চলে' গিয়ে সব ঠিক করে রাখে। সঙ্গেও বিস্তর লোক রয়েচে; এ পথে যতটা সুবিধা হ'তে পারে তা' হয়। দুপুর বেলাতেই একটু খানি ঝড় উঠে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। ভাল হল, পৃথিবী যেন ফাটছিল। কুলিরা বল্লে 'বাবুজী! আপলোক বড়া ভাগবন্ত হ্যায়, এক বরিষ পানী নেহি হুয়া।' ক'দিন পাহাড়ের মাথায় গায়ে আগুন জলতে দেখেছি, ওরা বলেছে ও সব দাবানল। বৃষ্টি না হওয়ায় শুকনো কাঠে কাঠে ঠেকে আপনি আগুন ধরে যাচ্চে।

আমরা যতটা এসেছি তার চটির একটা হিসেব দিলাম। হৃষীকেশের এক মাইল পরে রাসাশ্রম, ছোট চটি গঙ্গাতীর। ২ মাইলে লছমনঝোলা, বড় চটি, গঙ্গাতীর। ৪ মাইলে খৈরাড়ী, ছোট চটি, গঙ্গাতীর। ৩॥ মাইলে ফুলবাড়ী, বড় চটি, গঙ্গাতীর। ১ মাইলে ঘটগাউ, ছোট চটি। ১ মাইলে নাইমোহন, বড় চটি, হিউল নদী। ১ মাইলে ছোট বিজলী, ছোট চটি, ধারার জল। ২॥ মাইল বড় বিজলী, বড় চটি, ধারার জল। ১ মাইলে কুণ্ড, ক্ষুদ্র ঝরণা। ৬ মাইলে বন্দরমেল, বড় চটি, গঙ্গাজল।

শীত এখনও পাই নি। র‍্যাপার ও সাদা জামাতেই চলে যাচ্চে। তোমাদের জন্তে মনটা উদ্বিগ্ন রয়েচে। স্বর্গপথ থেকেও কতবার মনে হয়েচে যে, ফিরে যাই। যিনি তাঁর অদৃশ্য স্নেহহস্তে এমন করে টেনে এনেচেন, তিনি এখন শেষরক্ষা করলেই বুঝতে পারি।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

বিরহে

দিবসের শেষ-আয়ু সাথে চ'লে গেলে ওগো মোর প্রিয়
জনমের মত ক'য়ে কথা!
নিয়ে গেলে আননের সেই সুরভিত শেষ হাসিটিও
মোরে দিয়ে বুকভরা ব্যথা!
প্রভাতের প্রথম বেলায় যেই মালা দিনু তব গলে
পুন কেন দিলে ফিরাইয়া?
তুষিতে কি ছিল কিছু বাকী? অভিমানে তাই তুমি ছলে
ফেলে গেলে দলি' দীন হিয়া?
আজিও যে মেটেনিকো সাধ;-ঝরে মোর প্রেম-ভিক্ষু আঁখি
অন্তহীন বিদায়-ব্যথায়!
এখনো যে গোধূলির পথে ফিরে নাই দিবসের পাখী
খেলা-শেষে আপন কুলায়!
অভিমানে কেঁদে কেঁদে ফেরে করবীর বিরহী নিশ্বাস,
নেমে আসে ঘন আঁধিয়ার!
আমারও যে বেলা এল কাছে; জাগে দূরে বিদায়-আভাস
নভাতলে ওই তারকার!
তুমি ছিলে, তাই সারাদিন ফুটেছিনু অম্লান শোভায়
তব বক্ষে শতদল মেলি'!
এবে তুমি চ'লে গেছ, তাই ঝ'রে পড়ি ব্যথাম্লানিমায়
তীব্র দুখে তপ্ত অশ্রু ফেলি'!

শ্রীভারতকুমার বসু।

পরলোকে রায়বাহাদুর তড়িৎকান্তি বক্সী

বাঙ্গালী হইয়াও বহুদিন হইতে আমরা জব্বলপুর-প্রবাসী। এই প্রবাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঙ্গলার কথা ভুলিতে বসিয়াছিলাম— বাঙ্গালীর মধুর স্বভাব, কর্ম্মে নিষ্ঠা, উচ্চ হইয়াও অমায়িকতা এবং সর্ব্বোপরি দরিদ্রসেবা! ভুলিতে বসিয়াছিলাম—কিন্তু ভুলিয়া যাই নাই; কারণ তড়িৎকান্তি বাবুকে আমরা পাইয়াছিলাম।

সে আজ বত্রিশ বৎসর আগের কথা। তড়িৎকান্তি বক্সী মহাশয় এখানকার রবার্টসন্ কলেজের সায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছিলেন। তখন জানিতে পারি নাই যে, ইনিই ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মধুর স্বভাবগুলি বিদেশীর কাছে পরিচিত করিয়া দিবেন। কিন্তু জানিতে পারিলাম। ফুলের সুবাস লুকানো থাকে না—তড়িৎকান্তি বাবু চারিদিকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন।

ফুল যখন ফোটে,—মধুকরকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ত সে ব্যস্ত হয় না; সে বলেনা—"ওগো, আমি ফুটিয়াছি—আমার কাছে এস"। তড়িৎকান্তি বাবুর গুণাবলীর সন্ধান কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় নাই; সমস্ত সহরে তাঁহার গুণগ্রাহীর সংখ্যা ছিল অনেক।

এই গুণগ্রাহীদের লইয়া তড়িৎকান্তি বাবু একেবারে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন। কাউন্সিলে গিয়া গলাবাজি করাই যদি দেশের কায হয়, তাহা হইলে বলিব তড়িৎকান্তি বাবু দেশের কোনও কায করেন নাই। কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দের মনে সৎসাহস দেওয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান, তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া, তাহাদের মধ্যে দরিদ্রদিগকে অর্থসাহায্য করিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি নৈতিক চরিত্র গঠন করা যদি দেশের কায হয়, তাহা হইলে বলিব যে, দেশসেবায় যে কোনও যথার্থ দেশসেবী অপেক্ষা তড়িৎকান্তি বাবু কোন অংশে পশ্চাৎপদ ছিলেননা। শিক্ষাবিভাগে থাকিয়াই যে প্রকৃত দেশের কার্য্য করা যায়, একথা আমরা খুব বিশ্বাস করি। তড়িৎকান্তিবাবু এই কায একনিষ্ঠার সহিত করিয়াছিলেন। আমাদের স্থানীয় বাঙ্গালা গ্রন্থাগার (Library) তাঁহার স্বহস্তে তৈয়ারী। এই লাইব্রেরী কর্ত্তৃক যে বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন হইতেছে, তাহার মধ্যেও তড়িৎকান্তিবাবুর অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম নিহিত রহিয়াছে।

শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে যে একটা ব্যবধান থাকে, কলেজের বাহিরে তড়িৎকান্তিবাবু সে ব্যবধান ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার প্রাণ খোলা সরল ব্যবহারে ছাত্রগণ তাঁহার সহিত অসঙ্কোচে মিশিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। তিনি প্রত্যহই গাড়ী করিয়া যাইতেন। কিন্তু অনেক ছেলেকেই অনেক দূর হইতে পদব্রজে কলেজে আসিতে হইত। যখনই তড়িৎকান্তিবাবু এইরূপ ছাত্রদিগকে পদব্রজে যাইতে দেখিতেন, তিনি অমনি গাড়ী থামাইয়া তাহাদিগকে নিজের গাড়ীতে উঠাইয়া লইতেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। পরীক্ষা নিকটে আসিবার সময় তিনি একবার ক্লাসে পড়াইতেছিলেন। পরীক্ষার কোর্স শীঘ্রই শেষ করিতে হইবে, সেজন্ত নির্দ্ধারিত সময়ের চেয়ে একটু বেশীক্ষণ পড়াইবেন মনে করিলেন। ছেলেরা অমনি আবদার করিয়া বসিল—"আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে আর বেশীক্ষণ পড়িতে পারিব না।" তড়িৎকান্তি বাবু তৎক্ষণাৎ বেয়ারাকে দিয়া মিষ্টান্ন আনাইলেন এবং স্বহস্তে সংস্তে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া পাঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেক ছাত্রকে তিনি অর্থ সাহায্যও করিতেন।

গুণগ্রাহী রাজসরকার তড়িৎকান্তিবাবুকে রায়-বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তিনি ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে উন্নীত হইয়াছিলেন। এখানে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী ইহাতে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন। কিন্তু উচ্চ সম্মান পাইয়াও তড়িৎকান্তি বাবুর আচার ব্যবহারের কোনও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় নাই। সেই একটী অর্দ্ধমলিন ধুতি ও শার্ট এবং সাধারণ কোট; কিন্তু ইহাই তাঁহাকে চিরনূতন ও চিরসুন্দর করিয়া আমাদের প্রাণে তাঁহার মূর্ত্তি জাগরিত রাখিয়াছে।

তড়িৎকান্তি বক্সী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। কিন্তু আমরা তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার লাইব্রেরী ও বিদ্যালয় তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। যাহাতে এই দুইটী চিরস্থায়ী হয়, এই চেষ্টা এখানকার সকলেরই করা উচিত।

বঙ্গজননীর এই প্রবাসী সুসন্তানের কথা বাঙ্গলার কাছে পাঠাইয়া নিজেকে ধন্ত মনে করিলাম।*

শ্রীমতী শান্তিলতা বসু।

* জব্বলপুর মহিলা-শোকসভায় লেখিকা কর্ত্তৃক পঠিত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

মর্ম্মবাণী

শ্রীযুক্ত রসময় দাস প্রণীত। হবিগঞ্জ সীতারাম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পৃঃ ৩৯ মূল্য ।০

কবিতার বই। লেখক বয়সে তরুণ কিন্তু তাঁহার রচনা তথা-কথিত আজ-কালকার 'তরুণ-সাহিত্য' নয়। এই নবীন লেখকের ধীর সংযত মার্জ্জিতরুচির কবিতাগুলি পড়িয়া মনে হয়, 'তরুণ-সাহিত্য' সৃষ্টির জন্ম লেখকের বয়স ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী তাহার শিক্ষা ও প্রবৃত্তি। সমালোচ্য পুস্তকখানিতে অনেক দোষ ত্রুটি আছে, ভাব-প্রকাশের অযথা তারল্য আছে, তা সত্ত্বেও ইহাতে এমন জিনিষ পাইয়াছি, যাহাতে লেখকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। কাগজ, ছাপা ।০ আনা দামের পক্ষে যথেষ্ট।

গ্রামের কাজের ক খ গ ওরফে মোহমুদ্গর

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস প্রণীত। সুরেন্দ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পৃঃ ৮ মূল্য ৴১০। পুস্তিকার সকল স্বত্ব হাওড়াজেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতিতে ন্যস্ত।

সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়া সরল ছড়াতে রচিত। গ্রামের সর্ব্বপ্রকার বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কতকগুলি সারবান্ উপদেশ আছে। উপদেশ অনুযায়ী কায হইলে গ্রামের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দুই একটা নমুনা দিই—

গ্রামের ভিতর বাঁশ বন
রাখবে না কেউ, কর পণ।

*　　*

গ্রামের জমী চষে যারা তারাই আসল জ্ঞানী,
গ্রামের কাজে যে দেয় টাকা তারেই বলি দানী।

*　　*

বন্দে মাতরম্ মুখে
ছোরা প্রতিবেশীর বুকে,—
যাবে যে দিন এই ভাব
সে দিন হবে স্বরাজ লাভ।

কাগজ ছাপা উৎকৃষ্ট। ইতিমধ্যে ইহার তিনটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

পল্লী-সংগঠন

শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার প্রণীত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, পৃঃ ২১ মূল্য ।০

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-মহাসম্মেলনের সাধারণ সভায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকারের বক্তৃতা—৮ই এপ্রিল ১৯২৬ খৃঃ। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণা-মূলক বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইলাম। ডাঃ সরসীলাল একজন কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি, পল্লী-সংগঠনে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিশেষ ফল-দায়ক হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পল্লীগ্রাম-বাসী নিকর্ম্মা অথবা দুষ্কর্ম্মা অলস প্রকৃতির পুরুষদের চরিত্র-চিত্র দেখিয়া ঘৃণায় শরীর শিহরিয়া ওঠে, লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, পল্লী-নারীদের উপর তাহাদের কাপুরুষোচিত অত্যাচার ও অবিচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, অথচ বাংলার পল্লী-সমাজ এমনি প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, এই অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্য কাহারও নাই, বিধির অলঙ্ঘ্য বিধি বলিয়া সকলই নতশিরে ইহা মানিয়া লইতেছেন। আর যাঁহারা বোঝেন, তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা নাই। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন "কেবলমাত্র অলস নিশ্চেষ্ট জ্ঞান কোন কাজের জিনিষ নয়।" ম্যালেরিয়া নাশের ও স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়ও এই পুস্তিকাতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, গৃহস্থালীর কথাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের লিখিত উপাদেয় ভূমিকাটিতে পুস্তিকার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি। মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাগজ ছাপা চলনসই।

বিবাহ-কল্যাণ

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত। সিদ্ধেশ্বর প্রেস, পৃঃ ৩২ মূল্য ।৵০

ইতিপূর্ব্বে শান্তি-নিকেতন হইতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'বিবাহ-মঙ্গল' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। সমালোচ্য পুস্তিকাখানি তাহারই অনুরূপ। বিবাহের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলি নির্ব্বাচিত করিয়া সরল বঙ্গানুবাদসহ গ্রন্থকার এই পুস্তিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র অনুবাদ না দিয়া মন্ত্রগুলির অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ ও তাৎপর্য্য নিষ্কাশিত করিয়া গ্রন্থকার যদি জন-সমাজে মন্ত্রগুলির প্রচার করিতেন, তবে আমরা সমধিক তৃপ্তিলাভ করিতাম। বিবাহ-বাসরে আজকাল অপাঠ্য কাব্য-সৃষ্টি ও বৃষ্টি হয়, যদি সেগুলার পরি-বর্ত্তে এই পুস্তিকা বিতরিত হয়, তবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অধিকতর আপ্যায়িত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সুন্দর লাল অক্ষরে সুমসৃণ কাগজে অতি পরিপাটীরূপে মুদ্রিত এই পুস্তিকাখানি উপহার দিবার পক্ষে বেশ উপযোগী।

অপ্রকাশিত রাজ-নৈতিক ইতিহাস

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত (প্রথম খণ্ড)। মেটকাফ প্রেস, পৃঃ ১০২, মূল্য ১৲

এই গ্রন্থখানি যখন 'বঙ্গবাণী'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখনই আমাদের মনে হইয়াছিল বাঙলা-সাহিত্যে তথা বাঙলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইহার একটি স্থায়ী আসন থাকা উচিত এবং প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হইলে ইহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার যুগান্তরকারী 'যুগান্তরের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, স্বদেশী প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার একজন প্রধান উদ্যোক্তা, এ কথা বাঙালী এর মধ্যেই ভুলিবে না। এই পুস্তকের ভিতর বাঙালীর রাজ-নৈতিক অভিযানের যে ইতিহাসটুকুর অভিব্যক্তি ফুটিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বাঙালীমাত্রেরই হৃদয় আশা-নিরাশায়, সুখে-দুঃখে, গৌরবে ও লজ্জায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। লেখক দুঃখ করিয়াছেন, অন্যান্য দেশে আগে "বিপ্লবের দর্শন" সৃষ্টি হইয়াছে, পরে সেই শিক্ষা সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে তাহার বিপরীত প্রথায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং এখানে বিপ্লব যে বিফল হইয়াছে, অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ। এই পুস্তকখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে তথাকথিত 'দেশ-নেতা'গণের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, তাঁহাদের কাজের অনেক গলদ ধরা পড়ে, আর সেই সঙ্গে মনে একটা দারুণ অবসাদ আসে, পক্ষান্তরে অনেক সরল নির্ভীক আত্ম-ত্যাগী দেশ-প্রাণ যুবকের সাক্ষাৎ পাইয়া মনে উৎসাহ আসে, দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা হয়। গ্রন্থকার মহাশয় অল্প-পরিসরের ভিতর অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন ও বেশ দক্ষতার সহিত অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার লিপি-কুশলতাও প্রশংসনীয়। তবে বইখানিতে দোষ-ত্রুটি যে একেবারেই নাই, এমন কথা আমরা বলি না, গ্রন্থকার যেখানে বৈদেশিক বিপ্লববাদের সঙ্গে বাংলার বিপ্লব-বাদের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, সেখানে মনে হয় বাংলাদেশের তথা বাঙালীর সামাজিক, রাজ-নৈতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি উপযুক্তরূপে লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই; তা ছাড়া বইখানিতে স্থানে স্থানে ভাষার জড়তা ও ভাব-প্রকাশের দৈন্য পরিলক্ষিত হইল। যা হউক, গ্রন্থখানি খুবই উপাদেয় ও সময়োপযোগী। আমরা ইহার বহুলপ্রচার কামনা করি। ইহার ২য় খণ্ড সত্বরেই প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজ আরও ভাল হওয়া উচিত।

পুরীর মন্দির সম্বন্ধে গুটি কতক নূতন কথা

শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বরের বাণী ও ৺কাশী ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মার লেখনী। ৺কাশী মহামণ্ডল প্রেস, পৃঃ ৪৪, মূল্য (লেখা নাই)।

এ একখানি অদ্ভুত বই। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির যে রূপান্তরিত বুদ্ধ-মন্দির, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম বিগ্রহ যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘেরই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি, এই প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে 'ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভার' এই বিরাট অভিযান। কোন একটি মত থাকিলেই যে তাহা অভ্রান্ত, অবশ্য এ রকম অন্যায় কথা আমরা বলিতে চাহি না। পুরীর মন্দির ও বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রচলিত মতটিকে যে নির্ব্বিচারে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে, এমন অযৌক্তিক কথা কে বলিবে? তবে পূর্ব্ব মনীষিগণ অনেক বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা খণ্ডনের জন্য লেখনী ধারণ করিতে হইলে যে সকল প্রমাণ যুক্তি-তর্ক ও বিচারের প্রয়োজন, সমালোচ্য গ্রন্থে তাহার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইল। রাজার মতে মন্দিরটি পূর্ব্বে "শ্রী" দেবীর ছিল; এখনও বিগ্রহের সম্মুখে "শ্রী"-যন্ত্র আছে। তাহার উপর ভোগ রাখিয়া 'মহাপ্রসাদ' করা হয়; নচেৎ জগন্নাথদেবের ভোগ 'মহাপ্রসাদ' আখ্যা পায় না। ভোগে যে আদার কুচি দেওয়া হইয়া থাকে, তাহে মৎস্য ও মাংসের অনুকল্পেই দেওয়া হয়! ভোগের উপর প্রতিদিন 'নারিকেলোদক' 'প্রোক্ষণ' করা হয়; নারিকেল জল বোধ হয় মদ্যেরই অনুকল্প? এইরূপ যুক্তিদ্বারা রাজা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পূর্ব্বে "শ্রী" মন্দিরে তান্ত্রিক সাধনাই প্রচলিত ছিল, এখনও গুপ্তভাবে তন্ত্রোক্ত সাধনাই চলিয়া থাকে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপরও রাজাবাহাদুরের ভক্তির বাহাদুরী আছে, রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিও রাজা শশিশেখরশ্বরের করুণা অসীম। রাজার মতে চৈতন্যদেব চতুর politician. তিনি যে কেমন মৎলববাজ ছিলেন, এতদিন পরে তাহিরপুরের রাজা-মহোদয়ের কৃপায় আমরা বুঝিতে পারিলাম। তিনি প্রথমে "রাজার প্রধান অমাত্য সার্ব্বভৌমকে আয়ত্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজমন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন"। (পৃঃ ২৬) চৈতন্যদেব অবশেষে রাজা প্রতাপরুদ্রকে হস্তগত করেন ও তাঁহার দ্বারা মন্দিরের পূজা ও ভোগরাগেরও মনোমত পরিবর্ত্তন করেন। সুভদ্রা দেবীর হস্ত কর্ত্তন ব্যাপারের জন্যও চৈতন্যদেবকে পরোক্ষে ও রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হইয়াছে। জীবিত থাকিলে তাঁহারা উভয়েই আজ দায়রা সোপরদ্দ হইতেন সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেবকে বলা হইয়াছে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য, আবার প্রতাপরুদ্রকে বলা হইয়াছে চৈতন্যদেবের 'মন্ত্রশিষ্য'। রাজা শশিশেখরেশ্বর চৈতন্যদেবকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা যেমনি নূতন তেমনি আমোদজনক—"রাজনৈতিক উচ্চবাসনার বীজ চৈতন্যের উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে এই মুহূর্ত্তে রোপিত হইল"..."অতিশয় বুদ্ধিমান চৈতন্যদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন"......ইত্যাদি (পৃঃ ২৩)। চৈতন্যদেবের এমন appreciation ইতিপূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। তিনি নির্ব্বংশ, নতুবা এই সার্টিফিকেটের বলে তাঁহার বংশধরেরা এ দুর্দ্দিনে চাকুরী যোগাড় করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে পারিত।

এই পুস্তকখানিতে প্রমাণের জন্য নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে

শ্লোক তুলিয়া রাজাবাহাদুর উদ্ধৃত শ্লোক হইতে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বস্থানে তাহা সমীচীন ভাবিতে পারিলাম না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুস্তকের ২৪।২৫ পৃষ্ঠায় বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর মিলনের যে যে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, রাজাবাহাদুর তাহার মূল তত্ত্ব আদৌ বুঝিতে না পারিয়া নিজের কল্পিত সিদ্ধান্তের প্রমাণ বুঝিয়া তাহার অপ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীঅমিয় নিতাইচরিত অমিয়েরই মত মিষ্ট হইলেও উহাতে তত্ত্ব-বিরোধের অভাব নাই, উহা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজ স্বীকার করেন না। রাজাবাহাদুর যদি ঐ পুস্তকের ভিতর কোথাও নিজের মত সমর্থনের সাহায্য পাইয়া থাকেন, তাহাতে খুসী হইবার বিশেষ কারণ নাই। স্কন্দ-পুরাণ হইতে রাজা যে সকল শ্লোক তুলিয়া দিয়া নিজের মত সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বিশেষ বিচার-সাপেক্ষ। সেগুলি হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে অপরের মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত সংস্থাপন করিতে হইলে যে রকম ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিপ্রণালীর প্রয়োজন, এই পুস্তকখানিতে তাহা পাইলাম না। শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিকে যুক্তির তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলেই শ্লোকোদ্ধার সার্থক হইত। পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহা সফল করিতে হইলে গোঁড়ামী পরিহার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-রক্ষা-সভা ব্রাহ্মণ রক্ষা করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া যে বৈষ্ণব মারিয়া ব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে হইবে, এমন মাথার দিব্য কে দিয়াছে? কাগজ ছাপা মন্দ নয়।

রামমালা ছাত্রাবাস (কুমিল্লা ১২৯২ ইং)

ছাত্রাবাসের নিয়মাবলী পড়িয়া মনে হয় যে, ছাত্রগণের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে এই আদর্শ ছাত্রাবাসটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে নিয়মগুলি কতদূর সম্মানিত হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ আমরা পাইব উৎপন্ন 'ফসলের' দ্বারা। তবে সদুদ্দেশ্য ও সাধু সঙ্কল্পের সহায় ভগবান হইয়া থাকেন এই যা ভরসা।

মুকুল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ঢাকা বাণী প্রেস, পৃ ৩৪, মূল্য ৵০

শিশুপাঠ্য পুস্তক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ও ৺ মনোমোহন বসুর 'পদ্যমালা' এই তিনখানি চিরপরিচিত শিশুপাঠ্য পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারাংশ ভিন্ন আকারে একত্র গ্রথিত করিয়া এই মুকুল ফুটাইবার প্রয়াস। কেহ কেহ এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়া থাকে শুনিয়া আসিতেছি, এই ক্ষেত্রে দেখিতেছি এক ঢিলে তিন পাখী মারিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু একটি পাখীও মরে নাই।

সদ্ভাব শতকের কবি

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন প্রণীত। পৃঃ ৩৭, সখা প্রেস মুদ্রিত। মূল্য ।৵০

কবির স্বরচিত 'আত্ম-চরিতের' সহিত গ্রন্থকার দু'চার কথা জুড়িয়া দিয়া এই পুস্তকখানি খাড়া করিয়াছেন। সরল ভাষায় লিখিত এই ক্ষুদ্রকলেবর বইখানি পড়িয়া কবির জীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু কবির কাব্য-সাধনা সম্বন্ধে গ্রন্থকার একেবারে নীরব কেন? মজুমদার মহাশয় 'কবি-খ্যাতি' অর্জ্জন না করিলে তাঁহার সরল গ্রাম্যজীবন জানিবার কৌতূহল পাঠকের জাগরিত হইত না একথা ভুলিলে চলিবে না।

ইলাবতী

শ্রীনিতাইচাঁদ শীল প্রণীত। হিন্দুধর্ম্ম প্রেস, কলিকাতা, পৃঃ ১৬৮, মূল্য ১৲

এখানি নাটক। সুবিখ্যাত এণ্টনী এণ্ড ক্লিয়োপেট্রা নাটকের অনুবাদ, তবে স্থানে স্থানে রূপান্তর করা। বাংলা ভাষায় যদি কখনও 'অপাঠ্য' পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত হয়, তবে এই পুস্তকখানি সেই তালিকার একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে।

নীল সবুজের প্রাণের দোলায়

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীউপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, কুমিল্লা,ত্রিপুরা। মূল্য ॥৵০

কয়েকটি ছোট কবিতা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তার অধিকাংশই পুরাতন।

কবি প্রকৃতিকে ভালবাসেন, "নীল সবুজের প্রাণের দোলায়" দুলিতে চান, ভাষা ও ভাবে কিছু নূতনত্বেরও দাবী করেন। বইখানি পাঠ করিয়া আমরা দেখিলাম, ভাবের গাম্ভীর্য্য নাই, ভাষাও অনেক স্থলে অমার্জ্জিত ও অসংযত, রচনায় নবীন প্রাণের স্পন্দন অতি ক্ষীণ, প্রতি পদে দীনতাই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া বন্ধুপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। কাব্য সমাজে তাঁহার অভিমত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

নবদ্বীপ-কাহিনী বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। ৫৪ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥৵০

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক নদীয়ার রাজবংশ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল

তাঁদের সামান্য পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকার রসরাজ গোপাল ভাণ্ডারী বা তাঁদের বংশধর। সেইজন্য এই গ্রন্থখানির বিশেষ সমাদর হইতে পারে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থটির শ্রীবর্দ্ধন করিয়াছেন। গ্রন্থকার সাহিত্য ও রস সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। আলোচনা আরও বিশদ হওয়া উচিত ছিল।

রক্তকরবীর মর্ম্মকথা

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৹

গ্রন্থকার বলেন "বইখানিতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাটক রক্তকরবীর 'নন্দিনী' নাম্নী ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম 'নন্দিনী' হইলেই ভাল হইত।

গ্রন্থকার রক্তকরবীর গল্পাংশ, চরিত্রগুলির অর্থ ও ইহার দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অর্থ বর্ণনা করিয়া পাঠকের জন্য ইহার বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা রক্তকরবী পড়েন নাই বা পড়িয়া দুর্বোধ্য মনে করেন, তাঁহারা এই বইখানি পড়িয়া কিছু উপকার পাইবেন সন্দেহ নাই। তবে রক্তকরবীর মর্ম্মকথা ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। ব্যাখ্যাটি মূলের অর্থকে সরল ও স্বাধীন ভাবে বিকশিত হইতে দেয় নাই —বরং তাহাকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সংহত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাখ্যাটি মূলের একটি মলিন প্রতিবিম্ব মাত্র—রক্তকরবীর মাধুর্য্য খুব অল্পই ইহাতে আছে। তাহার সরসতা, গন্ধ ও বর্ণ ইহাতে নাই বলিলেও চলে।

শৈলজার কথা

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই কাব্যত্রয় ও শৈলজার চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিয়াছেন। গ্রন্থকার নবীনচন্দ্রের এই মানসী সৃষ্টির মহিমা অনুধাবন করিয়া এই গ্রন্থে তাহার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত কাব্যত্রয়ের মধ্যে শৈলজার চরিত্রেই নবীনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য অধিক। লেখক সেই চরিত্রের আলোচনা করিতে গিয়া নবীনচন্দ্রের সমগ্র কাব্যের মর্ম্ম কথাটি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানির ভাব ভাষা বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত। রচনাভঙ্গীও পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিবে।

গ্রন্থে নবীনচন্দ্রের কাব্য হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাঠক ইহাতে নবীনচন্দ্রের কাব্যরসও উপভোগ করিবেন, তবে গ্রন্থকারের উক্তিগুলির অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য মাঝে মাঝে প্রীতিপ্রদ হয় নাই।

দামোদরের মেয়ে

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা বুকডেপো লিঃ হইতে শ্রীকৃপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

ইহাতে ছয়টি ছোট গল্প আছে। প্রথম গল্পটির নামে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলি নিছক গল্প হিসাবে আমাদের মন্দ লাগে নাই। নামজাদা লেখকের সুনিপুণ রচনা কৌশলে কতকগুলি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ঘটনার ভিতর দিয়া গল্পগুলি শেষ পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক আগ্রহ বজায় থাকে। ভাষার সমালোচনা না করাই ভাল তবে কথোপকথনের মধ্যে "জননীত্ব মহিমান্বিত" প্রভৃতি শব্দ না থাকিলেই ভাল হয়।

গল্পগুলির মধ্যে "শীকারী"ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহুকালাবধি ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত অথচ তাহার প্রতিকারে নিশ্চেষ্ট ও শঙ্কিত রঘুপুরের মা প্রভৃতি স্থানীয় লোকের গো মহিষাদি বধের প্রতিবিধানকল্পে বন্দুক হস্তে বাঙ্গালীর মেয়ের ভীষণ জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ ও তৎকর্ত্তৃক অত্যাচারী দস্যুর নিপাত, দেখিবার ভাবিবার ও বুঝিবার জিনিষ। আবার অবস্থা বিশেষে সেই দুষ্টের দমন কারিণী রমণীর হস্তে নির্ব্বিরোধী ঘুঘু পক্ষীর বিনাশ, তার সঙ্গিনীর অহোরাত্র হৃদয়বিদারক করুণ ক্রন্দন ও কয়েকদিন পরে "স্বামীর বুকের উপর পড়িয়া ঠোঁটে ঠোঁট দিয়া চির মিলনবন্ধনে" সহমরণ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। নিদারুণ অনুশোচনায় প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাকুল অবস্থায় টেলিগ্রামে স্বামীর "বড় শক্ত অসুখের" সংবাদ প্রবীণ লেখকের উপযুক্তই হইয়াছে।

দামোদরের মেয়ের বিবাহ সমস্যাটি লেখক মহাশয় অতি সহজেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। হিমানীর বিবাহ সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্রে এম-এ প্রফুল্লকুমারের যুক্তিগুলি অপেক্ষা তার স্ত্রীর যুক্তিগুলি আমাদের ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। জাতটা বাস্তবিক অন্নগত না জন্মগত? ছয় মাসের কুড়ান মেয়ের রূপ দেখিয়া তাহাকে নিঃসন্দেহে বামুন কায়েতের মেয়ে সাব্যস্ত করিবার কারণ ঠিক বুঝা গেল না।

পুস্তকের কাগজ ছাপা ও বাঁধাই ভাল।
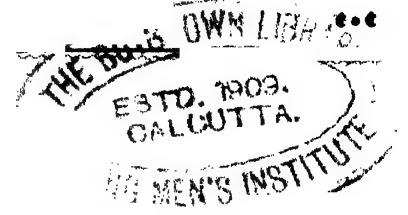
ফুলের দেশ

'হাওয়াই' একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে প্রায় এশিয়া ও আমেরিকার মাঝামাঝি। এদেশে সারা বৎসর রাশি রাশি সুন্দর ফুল ফুটিয়া থাকে, এবং দেশের মেয়েরা সর্ব্বদাই ফুলের মালা মাথায় গলায় পরিয়া জীবনটা প্রজাপতির মতই আনন্দে কাটাইয়া দেয়।

হাওয়াই রমণী

এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন কুক সাহেব (Captain Cook)। তিনি যখন প্রথম এখানে আসেন (১৭৭৮ খৃঃ অঃ), তখন এখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় ছিল। শ্বেতাঙ্গ সাহেবকে দেখিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল, স্বর্গ হইতে বোধ হয় কোনও দেবতা নামিয়া আসিয়াছেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার এই দ্বীপে আসেন, তখন সাহেবরা দ্বীপের অধিবাসীর উপর অত্যাচার করায় কলহের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে কুক সাহেব নিহত হ'ন।

এই দ্বীপবাসীদের রং খুব কালো নয়, তাম্রবর্ণ বলা যায়, চুল খুব কালো, চক্ষু সুন্দর এবং বড়। আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। কুক সাহেব যখন প্রথম আসেন, তখন ইহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চারি লক্ষ। এখন দাঁড়াইয়াছে, তেইশ হাজার। সংখ্যা এত কমিয়া যাইবার একটী কারণ এই ফুলের দ্বীপের আরামপ্রিয় জননীরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের একেবারেই যত্ন লয় না বলিলেও চলে। অধিকন্ত বসন্ত ও হাম এই দুই রোগের প্রকোপ এ দেশে অত্যন্ত বেশী। এ দেশে কুষ্ঠব্যাধির প্রথম আমদানি হয় চীন হইতে; কুষ্ঠজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও অধুনা বড় কম নহে। ইহা ছাড়া পানদোষ এবং নানাবিধ কুৎসিত ব্যাধি লোকসংখ্যা হ্রাসের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তবে এখন ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, এবং এই বিবাহ-জনিত জন্মসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দ্বীপে এখন চীন, জাপান, স্পেন, আমেরিকা প্রভৃতি নানাজাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এত বিভিন্নজাতির বাস সত্ত্বেও বিশুদ্ধ হাওয়াইবাসীরা তাহাদের জাতীয় প্রথাসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহারা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়; সকল ব্যক্তির সহিতই অত্যন্ত মিষ্ট ব্যবহার করে। পুরুষেরা তুলার কামিজ, পায়জামা আর একটা ষ্ট্রহাট পরিধান করে, মেয়েরা মস্‌লিনের সেমিজ ব্যবহার করে; এবং সর্ব্বদাই ভাল ভাল ফুলে নিজেদের অঙ্গ সুসজ্জিত করে। এইরকম ফুল তাহারা দিনের মধ্যে অনেকবার বদল করিয়া থাকে। যাহারা উচ্চশ্রেণীস্থ, তাহারা কিন্তু বেশী

হাওয়াই পরিবার।

করিবার জন্য কখনও কখনও শৈবাল অথবা লতাগুল্মে দেহ আচ্ছাদিত করে। ছোট ছোট নৌকা করিয়া ছুটির দিন জলের উপর কাটাইয়া দেওয়া ইহাদের আর একটা আমোদ।

হাওয়াই দেশের ভাষা খুব মিষ্ট—গানের মতন কোমল, কর্ণসুখকর। ইহারা যেমন মিষ্টপ্রকৃতির লোক, বিধাতা ইহাদের ভাষাও তদনুরূপ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের স্বভাবত ছোট পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন—এই ফুলের মালাকে (Leis) একরকম ঘৃণা করে বলিলেও চলে। ইহাদের মধ্যে বিলাসিতার চূড়ান্ত হইতেছে মশারি ব্যবহার করা। হাওয়াই দ্বীপে মশার অত্যাচার অত্যন্ত বেশী। একজন আগন্তুক এই দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন —"The mosquito is the serpent in the paradise."

ফুলের মতন, ইহারা নৃত্য এবং সঙ্গীত এই দুইটীই খুব ভালবাসে। এই নৃত্য অথবা হুলা (Hula) জাতীয় আমোদের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। নাচের সময় নানা রঙের পুষ্প পত্রে নিজেদের সারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করে। সে দেশের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে এই নৃত্য অতি শোভন হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানো এবং সন্তরণ দিয়া জলাশয়ে স্নান করা অত্যন্ত ভালবাসে; এতদ্ভিন্ন যত প্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া আছে, প্রায় সবগুলিতেই তাহারা অন্তরের সমস্ত স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি লইয়া যোগদান করে। শনিবার দুপুরবেলা সমুদ্রের উপকূলে এইসব অধিবাসীর স্ফূর্ত্তি ও চপলতার চরম প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দিন কত শত লোক সমুদ্রের গভীর শীতল জলে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, এবং লজ্জা রক্ষা

হাওয়াই ধীবর

আর একটি হওয়াই সুন্দরী।

শিশুদের মত সরল ও চিত্তাকর্ষক। কায অপেক্ষা খেলাই ইহারা বেশী ভালবাসে। Richard Curle সাহেব বলেন—"Life is to them a light hearted affair, and the beauty of their islands and their climate is reflected in their attitude towards life."

দরিদ্র হাওয়াইবাসীরা ইক্ষুর ক্ষেত্রে চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহাদের বাড়ীগুলি সব কাঠে প্রস্তুত, অথবা আমাদের দেশের মত বাঁশের এবং উপরে ঘাসের চাল দেওয়া থাকে। আমরা যেমন চড়াই-ভাতি (picnic) করিবার সময় উন্মুক্ত প্রান্তরে রাঁধিয়া থাকি, হাওয়াই দ্বীপে অধিকাংশ রন্ধনকার্য্যই এইরূপ বাড়ীর বাহিরে খোলা জায়গায় সম্পন্ন হয়। 'Poi' নামক একরকম খাদ্য তাহাদের বড় প্রিয়; 'তারো' গাছের শিকড় হইতে এই খাবার প্রস্তুত হয়। রাঙা আলু, মাছ এবং শুকরের মাংসও ইহারা খুব ভালবাসে ইহাদের নিমন্ত্রণ খাইবার ব্যাপারটী বেশ মজার। ভোজে (Luan) নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু দ্রব্য সরবরাহের ভার লইতে হয়. এবং ভোজের পর কয়েকদিনের জন্য কেহই কোনও কায করিতে পারে না। মাটীর উপর ফার্ণ গাছের

নিমন্ত্রিত পরিবার ভোজে বসিয়াছে

পাতা বিছাইয়া দেওয়া হয়। এক একটি ভোজে প্রচুর পরিমাণ মৎস্য ও poi ধ্বংস হইয়া থাকে।

হাওয়াই দ্বীপের প্রাকৃতিক শোভা খুব মনোরম; কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে তত্টা মনে হয় না; কারণ, প্রথমেই চোখে পড়ে বরফে আবৃত বড় বড় পাহাড়ের চূড়া। কিন্তু যতই ভিতরে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তাহার মনোহারী নব নব সৌন্দর্য্য আমাদের নয়ন-পথে ভাসিয়া ওঠে। ষ্টিফানোটি, জিন্জার, প্লুমারিয়া ফুলের গন্ধে মন যেন মাতাল হইয়া উঠে। পাহাড়ের গায়ে পুষ্পিতা লতা বেষ্টন করিয়া আছে; আর চারিদিকে ঝরণা—কুল কুল শব্দে গান করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। হাওয়াই দ্বীপে দৃশ্যাবলী যেমন অনন্ত বৈচিত্র্য আছে, তাহার আবহাওয়াও সেইরূপ বিচিত্র। এই দেশের আগ্নেয়গিরি পৃথিবী-বিখ্যাত। Kilanea আগ্নেয় গিরির মুখগহ্বরের পরিধি

নৌ-ক্রীড়া

হাওয়াই নৃত্য
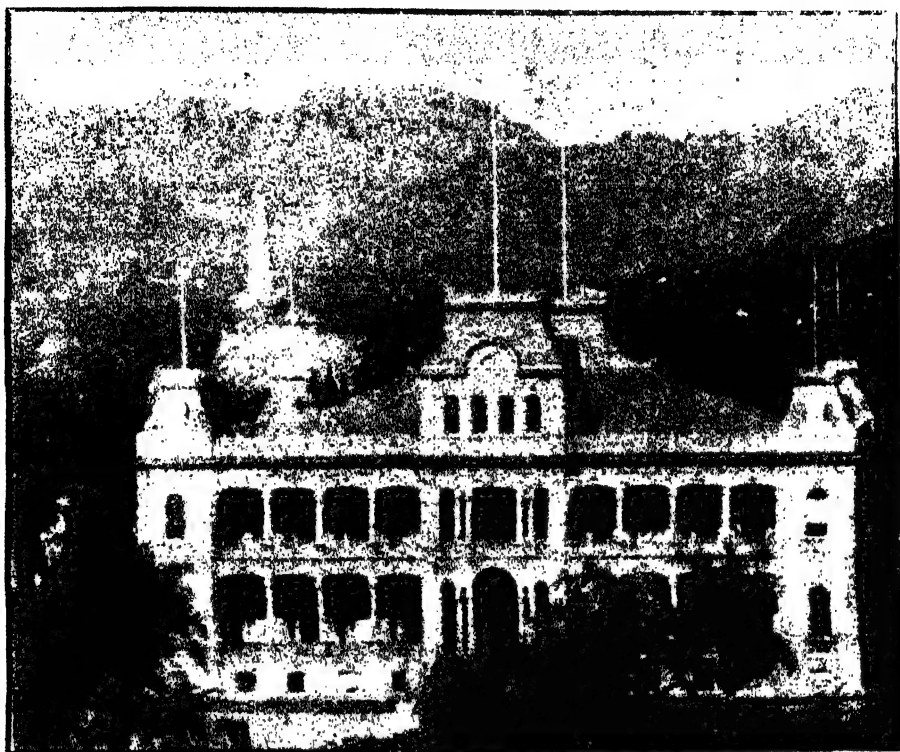
হনলুলুর সরকার ভবন

আট মাইল। সেথান হইতে যখন ধাতুস্রাব উদ্‌গিরিত হইতে থাকে, তাহা দেখিতে যেমন ভীতিপ্রদ, তেমনই আশ্চর্য্য ও রহস্যপূর্ণ। Mrs Bishop এই পাহাড়ের ভিতরে কি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া এক অতি মনোরম বর্ণনা লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"I think we all screamed, I know we all wept ; but we were speechless, for a new glory and terror had been added to the earth. There were groanings, rumblings and detonations, rushings, hissings, and splashings , and the crashing sound of breakers on the coast ; but it was the surging of fiery waves upon a fiery shore......It was all confusion, commotion, force, teror, glory, majesty, mystery and even beauty. And the colour ! Molten metal has not that crimson gleam, nor blood that living light !" এই সকল আগ্নেয়গিরি থাকায় এই দ্বীপে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ফুটন্ত জলের কেটলির ঢাকা যেমন করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, অনেক সময় সমস্ত দ্বীপটাই সেরূপ দ্রুত কম্পিত হয়। এই দ্বীপের প্রধান সহর হনলুলু (Honolulu)।

হাওয়াই দ্বীপে স্তন্যপায়ী জীব-জন্তু নাই বলিলেও চলে। সাপ একেবারেই নাই। কিন্তু বনে বনে অতি সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য পক্ষী এবং সমুদ্রের উপকূলে নানা জাতীয় আশ্চর্য্য মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষীদিগের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বিখ্যাত, মামো (mamo) পাখী এবং iiwi পাখী। এই দ্বীপের আদিম সম্রাটেরা যে হলুদ এবং লাল বর্ণের পালকের পোষাক পরিত, তাহা এই দুই পক্ষীর পালক হইতেই প্রস্তুত। এই পোষাক অতিশয় মূল্যবান এবং এখন আর পাওয়া

যায় না। বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে এখনও এরূপ দু একটি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। নানা জাতীয় ফল ও ফুলের গাছ প্রায় সহস্র প্রকারের অধিক আছে। Mr Spencer Howells এই দ্বীপ সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন "An Island Paradise ;—নামটি সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

হাওয়াই দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ঠিক ভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে মনে হয় আদিম হাওয়াই বাসীরা পলিনেশীয় দ্বীপ হইতেই আসিয়া বাস করিয়াছে। জাতিহিসাবে ইহারা মন্দ নহে ; তবে হাওয়াই বাসীদিগের ধর্ম্মের মধ্যেও নিয়মপদ্ধতি ভজের সহিত অত্যন্ত জঘন্য নিষ্ঠুরতা মিশানো আছে। নর-বলি ধর্ম্মের একটি অঙ্গ। স্ত্রীলোকেরা কদলী, নারিকেল, শূকর মাংস এবং কয়েক প্রকার মৎস্য খাইতে পায় না। যদি কোন স্ত্রীলোক এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে তাহার শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু এই দেশে দুইটি মন্দির আছে, যেখানে এই সব অপ-রাধীরা অথবা হত্যাকারীরা একবার প্রবেশ করিতে পারিলে আর কেহই তাহাদিগের কিছু করিতে পারে না। ইহার ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে। বহুসংখ্যক দেবতা বিশ্বাস করে, কিন্তু তন্মধ্যে

৯। হাওয়াই দেশের প্রসিদ্ধ বাস্তযন্ত্র

তৃণ-কুটীর।

চারিটি প্রধান—কানে (Kane) যিনি মনুষ্য ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কর্ত্তা ; দ্বিতীয়—কানালোয়া (Kanaloa) কানের ভ্রাতা ; তৃতীয়—কু (Ku) নিষ্ঠুর দেবতা এবং চতুর্থ লোনো (Lono), যাঁহার নামে নব-বর্ষে বাৎসরিক ক্রীড়াসমূহ উৎসর্গ করা হইয়া থাকে।

হাওয়াই-দ্বীপবাসীদের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহারা সহজেই অন্যান্য লোকেদের সহিত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। অধিকন্তু ইহারা স্বভাবতই বেশ বুদ্ধিমান্ ও ধীর প্রকৃতি। এই জন্যই বোধ হয় ইহারা অতি সহজেই বিজাতীয় সভ্যতা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। ইহারা খুব সহিষ্ণু। কেহ কোনও প্রকারে বিরক্ত না করিলে, স্বাধীনতা প্রভৃতি লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে চায় না।

তাহাদের শরীরের গঠনও খুব সুন্দর ; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের—অতি সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পদ থাকায় তাহাদিগকে বেশ সুশ্রী দেখায়। জীবনকে সব দিক দিয়া পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করিয়া লইতে তাহাদের মত দ্বিতীয় কেহ নাই। Curle সাহেব বলেন—"Indeed if we regard life mainly as an experiment in enjoyment, the Hawaiians must be ranked among the most favoured peoples on this planet." বাস্তবিক হাওয়াই বাসীদের কথা পড়িতে এত ভাল লাগে যে, সহজে তাহাদের মন হইতে বিদায় দিতে পারা যায় না। কিন্তু বিদায় যখন লইতেই হইবে, তখন তাহাদেরই বিদায়-বাণীতে বিদায় লই—আলোহা !

শ্রীঅনিলকুমার বসু।

বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের গতি ও বৃদ্ধি *

আপনাদের অনুষ্ঠানের সম্পাদক মহাশয় আমাকে এ সভায় যে বিষয়টির আলোচনার সূত্রপাত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজের স্বভাব ও অবস্থা, অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনায় আলোচনা করা দরকার।

আমরা হিন্দু একটা স্বতন্ত্র সমাজরূপে বর্ত্তমান আছি—সেই সমাজ একটা সত্য। সেটা ভাল কি মন্দ, তাহার সেই স্বতন্ত্র সত্তার কোনও বিশেষ উপকারিতা আছে কি না, কিংবা সেটা স্বতন্ত্র ভাবে থাকাই উচিত কি না, এ সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। হইতে পারে যে, হিন্দু বলিয়া একটা স্বতন্ত্র জাতি যদি না থাকিত, সমগ্র ভারতবাসী যদি ধর্ম্ম ও সমাজ-নির্ব্বিশেষে এক জাতি হইত, কিংবা সমগ্র মানবজাতি যদি এক হইত, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ ও আচারগত শত সহস্র দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান না থাকিত, তবে তাহা বড়ই বাঞ্ছনীয় হইত। এই একধর্ম্ম একজাতি, মহামানবের এই এক বিরাট সমবায়ের স্বপ্ন আমি দেখিয়া থাকি, তাহা স্বীকার করিতে আমার কুণ্ঠা নাই। কিন্তু বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের মধ্যে সে স্বপ্নের স্থান নাই। এই আলোচনায় আমাদের হিন্দুসমাজকে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্য, যা আছে ও দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকিবে, এবং যাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদিগকে এখনও হয়তো যুগযুগান্ত ধরিয়া অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—এমনি একটা বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

মানুষের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র সত্তার পরিসর কোনও সমাজে অল্প, কোনও সমাজে বেশী, কিন্তু কোনও সমাজেই মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। ব্যক্তি বাঁচে চারিদিক দিয়া,

* ভবানীপুর বারোয়ারির উৎসব উপলক্ষে "সামাজিক বৈঠকে" পঠিত।

অন্য ব্যক্তির উপর ভর দিয়া, আর এই যে বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর পরস্পর নির্ভরের নিবিড় সম্পর্ক ইহাই সমাজ। ইহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সত্ত্বা সম্ভব হইয়াছে, ইহা না থাকিলে ব্যক্তিত্বও অসম্ভব হইত। এই পরস্পর নির্ভরের সম্পর্কের নিবিড়তাই আবার বিভিন্ন সমাজের ভিতর ভেদের গণ্ডী টানিয়া দিয়াছে। আজ বিশ্ব-জগতের সমগ্র মানব-সমাজের জগদ্ব্যাপী বিরাট আদান প্রদানের ভিতর ব্যক্তি যেমন তাহার সমাজের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তেমনি প্রত্যেক বিশিষ্ট সমাজ আর সব বিশিষ্ট সমাজের সহিত অল্প বিস্তর নির্ভর ও সংযোগের সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু জগদ্ব্যাপী এই যে নির্ভর সংযোগ ইহা ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ নয়, সমাজের সঙ্গে সমাজের সংযোগ। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার বিশিষ্ট সমাজের ভিতর দিয়া অপর সমাজের ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত।

যতই দিন যাইতেছে, বিশ্বের বিরাট সম্বন্ধ-বন্ধন যতই বাড়িয়া উঠিতেছে, ততই এই আদান প্রদান ব্যাপারে সমাজের মধ্যবর্ত্তিতা কমিয়া আসিতেছে, ব্যক্তির পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে সমাজ অতিক্রম করিয়া বিশ্বের ভিতর আপনাকে সংক্রান্ত করা সম্ভব হইতেছে। চির-দিনই এমন কতকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁরা যে সমাজে থাকুন, তাঁরা বিশ্ববাসীর লোক, বিশ্বের নিজস্ব। আজকাল এমন লোক বোধ হয় বেশী পরিমাণে হইতেছে। কিন্তু তবু আজও জগদ্ব্যাপী আদান প্রদান ব্যাপারে সমাজ অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সঙ্গে কারবারের এই শক্তি বা অধিকার আছে অল্প লোকের। অধিকাংশের জীবনের বৃদ্ধি ঋদ্ধি ও পরিণতি সমাজের গণ্ডীর ভিতরই আবদ্ধ। কাযেই লোকশ্রেয়ের কথা ভাবিতে গেলে, সমগ্রভাবে দেশবাসীর অভ্যুদয় বা উন্নতির কথা ভাবিতে গেলে এ সব লোকোত্তর ব্যক্তিদের কথা উঠে না। সমাজের সকলের যদি হিতসাধন করিতে হয় তবে সে হিত সাধিত হইবে সমাজের ভিতর দিয়া।

আমি, তুমি বা রাম শ্যাম হয় তো বড় মানুষ, হয় তো বা আমাদের লোকাতীত প্রতিভা আছে, কিংবা অশেষ সম্পদ, শক্তি ও প্রতিপত্তি আছে। আমরা নিজেদের উন্নতি করিতে পারি এই শক্তির বলে, সমাজ উঠুক বা না উঠুক আমি ইহার বলে উঠিতে পারি। এবং প্রয়োজন হইলে সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা অন্য সমাজে স্থান করিয়া লইতে পারি। কিন্তু যদি আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয়, যদি আমারই ছেলে বা নাতি বা আর কারও ভবিষ্যতে কোনও দিন এই সমাজের মুখাপেক্ষী নাও হইতে হয়, তবু, আমাদের পক্ষে এমন কায নিতান্ত স্বার্থপরের কায হইবে। আমি উন্নত হইব, আর আমার সমাজ সে উন্নতির ফলভোগী হইবে না, তাদের ফেলিয়া আমি আকাশে উড়িয়া চলিব—এই ভাবটা কি সমাজ কি ব্যক্তি কারও পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুর যদি অভ্যুদয় লাভ করিতে হয়, ব্যক্তি বিশেষ বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নয়, সমস্তভাবে সকলের যদি উন্নতি সাধন করিতে হয়, তবে সমগ্র সমাজের কিসে উন্নতি হয় সে কথা চিন্তা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের দিকে চাহিলে একটা কথা সবার আগে আমাদের মনে পড়ে যে, এ সমাজ একটা সম্পূর্ণ সমাজ নয়,—একটা সমস্তের খণ্ডমাত্র। পরিপূর্ণ সমাজ তাকেই বলি—যার একটা সমগ্র স্বতন্ত্র জীবন আছে। সমাজের রাজনীতি আছে, ধর্ম্ম আছে, আচার আছে, ব্যবহার আছে, অর্থশাস্ত্র আছে। এই প্রত্যেকটি বিভাগ সমগ্র সমাজের জীবনের এক একটা অঙ্গ। আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে যে সমাজের চিত্র দেখিতে পাই, সে ছিল এমনি একটা সমগ্র সমাজ—যে, ব্যক্তিগত জীবনকে সহস্র সম্বন্ধ বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল; তাহাদিগকে জগতের অন্যান্য সমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়াছিল।

কিন্তু আজ আমাদের রাজনীতি, শাসননীতি, সমর-নীতি, অর্থশাস্ত্র—এ সবের সঙ্গে সমাজের কোনও সম্পর্ক নাই। ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রনীতিতে অনেকের সম্পর্ক আছে, ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে

অনেকের অধিকার ও কার্য্য আছে, কিন্তু যে রাজকর্ম্মচারী বা ব্যবসায়ী বা ব্যবহার জীবী—সে হিন্দুসমাজের হিন্দুরূপে নয়, একটা স্বতন্ত্র বাহিরের সমাজের অঙ্গ স্বরূপে।

কাযেই সমাজ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের খুব প্রকাণ্ড একটা অংশের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। সমাজের সম্পর্ক আছে শুধু আমাদের জীবনের কতকটা অংশের সঙ্গে,—আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে, আহার-বিহারের সঙ্গে, বিবাহাদি সংস্কারের সঙ্গে। সুতরাং ব্যক্তির সমাজের সঙ্গে সেই পরিপূর্ণ নির্ভরের সম্পর্ক নাই, যাতে সমাজ শক্তিমান্ হয়। সমাজ আমাকে অর্থ দেয় না, অন্নবস্ত্র দেয় না, শত্রুর হাত হইতে আমাকে রক্ষা করে না, বাণিজ্যে আমাকে আশ্রয় দেয় না, এ সবের জন্য আমার নির্ভরতা অপর সমাজের উপর।

আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের সমাজের সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজের এই যে বিরাট প্রভেদ, একথা আমরা স্মরণ রাখি না বলিয়া, আমাদের সামাজিক জীবনের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় অনেকটা ভুল থাকিয়া যায়। স্মৃতিকারেরা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন সমগ্র সমাজের জন্য। তাঁহারা সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ববর্ণের ধর্ম্ম ও জীবন নিঃশেষে নিয়মিত করিয়াছিলেন,—সেই সমগ্র ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র জাতির অভ্যুদয় সাধনের উদ্দেশ্যে। সমাজের বিশিষ্ট অবস্থায় তাঁহারা হয়তো এক শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন, অপর এক শ্রেণীকে খাটো করিয়াছিলেন, আর এক শ্রেণীকে হয়তো সমাজের অভ্যুদয়ের প্রতিকূল বলিয়া সমাজ হইতে অনেক বিষয়ে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল শ্রেণীর সর্ব্ব বিষয়ক আদান প্রদান ও কর্ম্মসমবায় দ্বারা তাঁরা সমগ্র জাতির জীবনধারণ ও সুখসমৃদ্ধি সাধন বিষয়েও সম্যক্ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই নিম্ন বা সমাজ-বহিষ্কৃত জাতির যেমন একদিক দিয়া অধিকার লোপ হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে তাহাদের বৃত্তি, জীবনোপায় এবং হয়তো অভ্যুদয়েরও আয়োজন হইয়াছিল। আজ যদি আমরা এই সমাজ-বহিষ্কৃত জাতিদিগের বৃত্তি, জীবন ধারণ বা অভ্যুদয়ের কোনও ভার লইতে না পারি এবং তবু তাহাদের সেই প্রাচীন বন্ধনগুলি দিয়া বাঁধিতে চাই, তবে সে বন্ধন যে মিথ্যা ও অসার্থক বলিয়া আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজও বৃটিশ ভারতে বৃটিশ বিধানে কতকগুলি অন্ত্যজ আছে—ইহারা Criminal tribes। ইহাদের মতিগতি সাধারণতঃ সুস্থসমাজের এত প্রতিকূল যে, ইহাদিগকে স্বচ্ছন্দভাবে সমাজে বসিয়া মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য ইহাদের বসবাস সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। সবার সঙ্গে ইহারা বাস করিতে পারে না, ইহাদিগকে পুলিসের নজরবন্দী থাকিতে হয়, চলাফেরা সম্বন্ধে পুলিশকে জানাইতে হয়। কিন্তু এই সব বিধি-নিষেধের ভিতর তাহাদের জীবিকার্জ্জন ও ইচ্ছামত জীবনযাপনের সুব্যবস্থা আছে। অপরাধ না করিয়া ইহারা ঠিক অন্য সাধারণ লোকের মত জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, শিক্ষালাভ করিতে পারে। সমাজের কেহ তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিকার পাইতে পারে। ইহাদের চরিত্র ও অবস্থা বিবেচনায় এ সব বিধান অন্যায় বলিতে পারা যায় না। আর ইহাদের পক্ষে এ বিধান মানিয়া চলা ছাড়া উপায় নাই তাহাও বটে, বস্তুতঃ মোটের উপর এরূপ নিয়ম মানা তাহাদের পক্ষে ভালও বটে।

কিন্তু মনে করুন, এদেশের গভর্ণমেণ্টের এমন একটা অবস্থা হইল, যাহাতে তাঁহাদের শান্তিরক্ষার অধিকার নাই, এবং এই সব জাতিকে সহজভাবে জীবিকার্জ্জন বা শিক্ষালাভ করিতে দিবার শক্তি নাই, কেহ ইহাদের উপর অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিকার করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তখন যদি এদেশের গভর্ণমেণ্ট এই সব আধুনিক অন্ত্যজদের বলে, তোমরা সমাজে মিশিতে পারিবে না, বাহিরে বাস করিতে হইবে, তোমাদের গতিবিধির কথা আমাকে জানাইতে হইবে —ইত্যাদি, তখন সমস্ত ব্যাপারটা একটা হাস্যকর

নির্ব্বুদ্ধিতা হইয়া দাঁড়াইবে না কি? কারণ, প্রথমতঃ যেখানে ইহাদিগকে সুবিধাগুলি দিবার শক্তি তোমার নাই, জীবিকার্জ্জনের সুযোগ দিবার শক্তি তোমার নাই, সেখানে তুমি সুধু শাসন করিবে কি অধিকারে? তা ছাড়া তোমার শাসন যদি ইহারা না মানে, তবে মানাইবার শক্তি তোমার নাই, কেন না পুলিশ তোমার হাতে নয়। সেখানে সুধু চোখ রাঙাইয়া ইহাদের শাসনের চেষ্টা বাতুলতা নয় কি?

ইহার উপর যদি এমন হয় যে, বাস্তবিক যে যে কারণে Criminal tribeদের উপর এই সব নিষেধমূলক আজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল, সে সব কারণ এখন নাই, তাহাদের মতিগতি সমাজের প্রতিকূল নয়, এবং তাহাদের স্বচ্ছন্দভাবে সমাজে মিশিতে দিলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তবু যদি এই নিষেধ চালাইবার জন্য উক্ত শক্তিহীন গভর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হন, তবে ব্যাপারটা কতদূর বিসদৃশ হইয়া পড়ে?

এই হাস্যকর ব্যাপার আমাদের সমাজে আজ অনুষ্ঠিত হইতেছে না কি? সুদূর অতীতে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে অন্ত্যজদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তাহারা অস্পৃশ্য, সামাজিক ব্যবহার তাহাদের সহিত, নিষিদ্ধ, গ্রামে বাস তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ—ইত্যাদি। যে সমাজের মধ্যে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা ছিল পরিপূর্ণ সমাজ—শাসন, প্রজারক্ষা, সমাজের শুদ্ধিসাধন, ধর্ম্মের অভ্যুদয়—সমস্ত বিষয়েই সমাজ যত্নবান্ ছিল। তাঁহাদের সেই সব ব্যবস্থার ফলে এই অন্ত্যজগণ তাহাদের বাহ্য প্রতিষ্ঠানে নিরঙ্কুশ ভাবে জীবন যাপন করিত, রাজার দ্বারা রক্ষিত হইত—তাহাদের জীবিকার জন্য যে বৃত্তির প্রয়োজন হইত, তাহা তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবার যথেষ্ট হেতু ছিল; কেননা, স্মৃতির সমাজে যে লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল, ইহাদের জীবন ছিল তার পরিপন্থী, ইহাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ-সংস্পর্শে সে আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইত—তা ছাড়া ইহারা সম্ভবতঃ পাপাচারী ও অসামাজিক ছিল। অনেক স্থলে ইহারা ছিল বিজিত জাতি, জেতা তাদের প্রাণ রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আপনার সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ যে সেদিন নাই, তাহা কি বলিতে হইবে? একদিকে সেই পাপমতি সমাজে প্রতিকূল প্রবৃত্তিশালী অন্ত্যজ নাই, এখন যাহাদের অন্ত্যজ বলা হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকের চিত্তবৃত্তি সুনিয়ত, এবং সমাজের পরিপন্থী মোটেই নয়। অপর দিকে সেই শুদ্ধাচারী, ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত জীবন আর্য্যসম্প্রদায় নাই, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। ইংরাজী হোটেলে "শূকর গো মৃগ" ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিয়া উচ্চশিক্ষিত শুদ্ধাচারী নমঃশূদ্র যুবককে অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃতির নিষেধের দোহাই পাড়িতেছেন। আমরা বলিতেছি, অন্ত্যজদের আমাদের নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, অথচ তাহাদিগকে সে নিয়ম মানাইবার শক্তি আমাদের নাই, শাসনযন্ত্র পরের হাতে। তাহাদের জীবিকার্জ্জন সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় তাহারা যথেচ্ছ জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। আর, আমাদিগের অধিকার বা সম্পর্ক সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারে; কেন না, দেশে এমন সব ভিন্ন সমাজ আছে, যাহারা তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা ভাল স্থান দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তবু আমরা বলিব—তোমরা আমাদের সমাজের না হইয়াও আমাদের সমাজের থাক। তোমাদের আমরা কিছু করিব না, তোমরা আমাদের নিষেধগুলি মানিতে থাক।

এই একটা খুব সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমাদের স্মৃতি পরিপূর্ণ সমাজের জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আজিকার খণ্ড-সমাজের মধ্যে ইচ্ছামত তাহার যে কোনও খণ্ড অবিকৃত ভাবে প্রচলিত করিবার চেষ্টা কিরূপ অন্যায় ও অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতা চারিদিক দিয়া আমরা অনুভব করিতেছি এবং ইহা মানিয়া লইয়া আমাদের জীবন ও ধর্ম্মে অনেক পরিবর্ত্তন আমরা অলক্ষ্যে করিয়া চলিয়াছি—তবু আমরা এক এক স্থানে নিতান্ত গোঁড়া হইয়া বলিতেছি যে, আজও

আমাদের স্মৃতির বিশিষ্ট বিধানের ষোল আনার ভিতর এক কড়া বাদ দিলে চলিবে না।

একটা দৃষ্টান্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। আমরা হিন্দু বলিতে বুঝি বর্ণাশ্রমী—অনেকের মুখে শুনি বর্ণাশ্রমই হিন্দু-ধর্ম্মের সার এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষার জন্য নানা রকম আস্ফালন দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি না যে, আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই এবং থাকিতে পারে না। স্মৃতির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যুগ যুগান্ত ধরিয়া গোঁজামিল দিতে দিতে আমরা এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি যে, এখন আমাদের বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। এ অবস্থায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলন একেবারে মিথ্যা এবং মেকী।

স্মৃতিতে বর্ণধর্ম্ম আছে, আশ্রমধর্ম্ম আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণ—ইহা ব্যতীত পঞ্চম নাই। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ধর্ম্মের নাম আশ্রম ধর্ম্ম। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য, যৌবনে গার্হস্থ্য, প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ এবং বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাস। সকল বর্ণের চারি আশ্রমে অধিকার নাই।

চারি বর্ণ আমাদের সমাজে নাই, আছে বহু বিভিন্ন জাতি। সেই সব জাতিকে অন্তরাল বর্ণ বলিয়া গোঁজা-মিল দিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে—অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, কোনও চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে সফল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বর্ণের মধ্যে একটি মাত্র বর্ণ এখন আছে—সে ব্রাহ্মণ।

কিন্তু বাঙ্গলার ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ববর্ণের লক্ষণ কয়টি আছে। স্মৃতিতে দ্বিবিধ ব্রাহ্মণত্বের কথা উক্ত হইয়াছে,—জন্ম দ্বারা ও কর্ম্ম দ্বারা। কর্ম্মে ব্রাহ্মণ এখন হয় না, এখন যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদের একমাত্র অধিকারপত্র তাঁহাদের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম।

ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনয়ন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ অপরিহার্য্য। উপনয়নের অভিনয় এখনও আছে, কিন্তু উপনয়ন নাই। উপনয়ন একটা ব্রত গ্রহণ। উপনীত ব্যক্তি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া বিদ্যা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিবেন, তৎপরে স্নাতক হইবে, তাহার পর বিবাহ করিয়া গৃহস্থ। এখন ব্রহ্মচর্য্য নাই, আছে তাহার একটা অর্থহীন অভিনয়। স্নাতক নাই, গৃহস্থ আছে, কিন্তু স্মৃতির গৃহস্থধর্ম্ম নাই। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নাই।

ব্রাহ্মণের পক্ষে আজীবন স্বাধ্যায় রক্ষা অবশ্য প্রতি-পাল্য বর্ণধর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায় রক্ষা করে না, সে শূদ্রাধম। বাঙ্গলার কোন্ ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায় রক্ষা করেন? বেদ দেখিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, কয়জন? অগ্নিহোত্রী আছেন কেহ? এখনকার ব্রাহ্মণের এ অভিযোগের বিরুদ্ধে একমাত্র আশ্রয় রঘুনন্দনের ব্যবস্থা—গায়ত্রী পাঠ করিলেই স্বাধ্যায় রক্ষা হয়। রঘুনন্দনের এই অনুকল্প, কেবল প্রাচীন ধর্ম্মের ভাঙ্গা মন্দিরে জোড়া তালির ব্যবস্থা। কিন্তু আজ এমন দিন আসিয়াছে যে, স্বাধ্যায়ের এই সংক্ষিপ্ত অনুকল্পও অনেকে রক্ষা করেন না। এই বেদহীন, অগ্নিহীন, চতুরাশ্রম বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ যখন স্মৃতি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বর্ণাশ্রমের ধ্বজা উত্তোলন করেন, তখন প্রাচীন ঋষিগণ বোধ হয় স্বর্গে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন—তাঁহাদের ধর্ম্মের এই বিদ্রূপে। যে দেশে স্মৃতির প্রতিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক কল্পসূত্র কাহাকে বলে জানেন না, সে দেশে বর্ণধর্ম্মের নামমাত্রও নাই—এ কথা বলিতে আমার সঙ্কোচ নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, গৃহ্যসূত্রের যুগ হইতে পরাশরাদি অর্ব্বাচীন সংহিতার যুগ পর্য্যন্ত যুগপ্রয়োজন ভেদে এই ধর্ম্মের যথোপযুক্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আবার পরবর্ত্তী কালে শবর, কুমারিল, মেধাতিথি প্রভৃতি হইতে ভবদেব চণ্ডেশ্বরাদির নিবন্ধ হইতে দেখিতে পাই যে, নিবন্ধকার-গণও যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে এই ধর্ম্মের আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজ সম্পূর্ণ ছিল, রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সমাজের বিচ্ছেদ হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত সুস্থ ভাবে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সুসংবদ্ধ ভাবে এই সব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। যখন রাজশক্তি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজকে খণ্ড করিয়া ফেলিল, তখন হইতে

দেখিতে পাই যে, এই সব পরিবর্ত্তন সমাজের পারিপার্শ্বিক সমুদয় অবস্থার দিকে চক্ষু বুজিয়া এমন পথে চলিয়াছে, যাহাতে সমাজকে একটা কঠিন সঙ্কীর্ণ স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, যাহাতে তাহার আত্মহত্যাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে।

সমাজের এই আত্মহত্যা বাঙ্গলা দেশে অন্ততঃ চারি শতাব্দী হইল চলিতেছে—সম্ভবতঃ আট শতাব্দী। স্মৃতির যুগে সমাজ ছিল অখণ্ড, দেশের ভিতর এক বৃহৎ বর্ণজাতি-বহুল সমাজ ছিল, তা ছাড়া অন্য সমাজ ছিল না। সমাজের বিধিনিষেধ পালন কঠিন ছিল না; কেন না, সেগুলি ছিল পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থার অনুকূল। যে তাহা লঙ্ঘন করিত, তাহার শাস্তি ছিল—সে হয়তো অভিশপ্ত বা অপপাত্রিত হইত—কিন্তু প্রায়ই তাহার ফলে সমাজের এক স্তর ছাড়িয়া তার অন্য স্তরে যাইতে হইত। সুতরাং এ শাস্তির ফলে সমাজের শক্তিবৃদ্ধি হইত—লোকহ্রাস হইত না।

কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ এবং গত চারি পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী বঙ্গদেশের যে সমাজ, সেখানে এ অবস্থা ছিল না ও নাই। সমাজের বিধি-নিষেধ পালন ততটা সহজ রহিল না। প্রাচীন যুগে পরিপূর্ণ রূপে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিয়া লোকের স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু এখন জীবিকার্জ্জন করিতে গিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সকল বিধি পালন করিতে গেলে জীবিকার্জ্জন কঠিন, আর্থিক অভ্যুদয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ বাহিরে এক বা একাধিক স্বতন্ত্র সমাজের প্রতিঘাতের ফলে আত্মরক্ষায় ব্যাকুল সমাজ বিধিনিষেধের কঠোরতা বৃদ্ধি করিল। সমাজ হইতে বহিষ্কার কাষেই বেশী হইয়া পড়িল। অভিশপ্ত ও অপপাত্রিত যাহারা, তাহারা সমাজের ভিতর স্থান না পাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমাজে আশ্রয় লইল।

এমনি করিয়া জাতিচ্যুত ও বহিষ্কৃত এবং অন্ত্যজ ও সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিদিগকে লইয়া মুসলমান সমাজ গত ৪।৫ শতাব্দী হইতে আমাদের দেশে সংখ্যায় কত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা চক্ষুর উপর দেখিতে পাইতেছি। হিন্দু-সমাজ এমনি করিয়া সমাজ-বন্ধনের অস্বাভাবিকতা ও অতিমাত্র কঠোরতার ফলে ক্রমশঃ আপন সমাজ হইতে লোককে দুইহাতে ঠেলিয়া মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে। ইংরাজ অধিকারের আরম্ভের সময়ে কথায় কথায় লোককে জাতিচ্যুত করা হইত। এই জাতিচ্যুতের দল বাহ্য হইয়াও হিন্দু-সমাজের অঞ্চল ধরিয়া নাই। তাহারা মুসলমান হইয়াছে, খৃষ্টান হইয়াছে—এবং যাহারা তাহা হয় নাই, তাহারাও হিন্দু-সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে একটা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু সমাজ গড়িয়া লইয়াছে।

গত চারি পাঁচ শতাব্দী হইল, হিন্দুসমাজ কেবল আপনার লোককে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। যে বাঁধনের কোনও সার্থকতা আজ নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় যে বাঁধন আজ টিকিতে পারে না, সেই সব বাঁধন খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে গিয়া সমাজ ক্রমে ক্রমে আপনার গলায় ফাঁস শক্ত করিয়া আঁটিতেছে। এই পদ্ধতির শেষফল মৃত্যু—আত্মহত্যা, তাহা আমরা এত দিনে বুঝিতে পারিতেছি।

হিন্দুসমাজ যখন সুস্থ ও সজীব ছিল, তখন দেখিতে পাই, যুগে যুগে ঋষিগণ ও পণ্ডিতগণ সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহার বিধি ব্যবস্থার বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আর সমাজের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের ফলে আচার ব্যবহার আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবন ধারণের অনুকূল ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর হইতে, এবং বিশেষভাবে বৃটিশ শাসনের পর হইতে একদিকে যেমন বাহির হইতে ঘা খাইয়া ইহাকে দুর্ব্বল হইতে হইয়াছে, তেমনি অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভিতরের ব্যবস্থা সুস্থভাবে পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় ইহা ক্রমে ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতেছে।

সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে এই ধ্বংসলীলা নিবারণ করিতে হইবে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সমাজ কেবল সমাজের লোকদের দুই হাতে গলহস্ত দিয়া বাহির করিয়াছে। আজ তাহাদের সবাইকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিবার সময় আসিয়াছে—এখন দুই বাহু

বাড়াইয়া সেই সকলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যে নীতি, যে আচার, যে ব্যবহার কেবল সমাজকে ভাঙ্গিতেছে, সেগুলি বর্জ্জন করিয়া আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে —সেই সব আচার অনুষ্ঠান, সেই সব নীতি ও সূত্র, যাহাতে লোককে সমাজের ভিতর আকর্ষণ করিয়া রাখে।

অস্পৃশ্যতা-বিচার একটা প্রকাণ্ড ভাঙ্গিবার যন্ত্র—ইহাকে আমাদের বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্ত্যজ জাতিদিগকে যদি হিন্দু বলিয়া আমরা দাবী করিতে চাই, তবে তাহাদিগকে হিন্দুর ধর্ম্ম ও আচারে পরিপূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। সুদূর অতীত যুগে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের তাৎকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যে সব বিশিষ্ট বিধান করা হইয়াছিল, সেগুলির হেতু ও মূল নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কাযেই সেগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন অস্পৃশ্যাতিরিক্ত যে সমাজ তাহার ভিতর বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, কেবলমাত্র কতকগুলি নেতিবাচক বিধানের প্রাধান্য। হিন্দুসমাজের সুস্থ অবস্থায় তাহার কতকগুলি লক্ষ্য ছিল ও সে লক্ষ্যলাভের জন্য উপযুক্ত সাধনপদ্ধতি ও কর্ম্ম-নিয়ম ছিল। তাহার দ্বারা কালোপযোগী বিশিষ্টধর্ম্ম সাধিত হইত, লোকশ্রেয়ঃ অনুসৃত হইত। তাহাতে কতকগুলি ছিল বিধি, কতকগুলি ছিল নিষেধ। যাহা বিধি ছিল, যে কায করিবার আদেশ ছিল, তাহার দ্বারা চরিত্র গঠিত হইত, সমাজের ঋদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হইত। নিষেধের দ্বারা সমাজের সেই সব লক্ষ্য ও আদর্শলাভের প্রতিকূল কার্য্য নিবারিত হইত।

রাজশক্তি হস্তান্তরিত হইয়া ভিন্ন সমাজের সংঘর্ষের ফলে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের সেই সব positive বিধান প্রয়োগ করিবার শক্তি সমাজ হারাইয়াছে। যে সব নিষেধ ছিল, তাহারই উপর সমাজের ঝোঁক ষোল আনা পড়িয়াছে। তাহার ভিতরেও আমরা বাছিয়া লইয়াছি সুধু কতকগুলি নিষেধ, কতকগুলি নেতিবাচক বিধি—স্মৃতির বিধান সমগ্রভাবে আচারে গ্রহণ করি নাই।

ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, হিন্দুর সমাজনীতি আজ কেবল কতকগুলি নেতি নেতিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহা করিও না, ইহা খাইও না, উহাকে ছুঁইও না, ইহাই হিন্দুসমাজের সারধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে, আর সে নিষেধ অমান্য করিলে তাহার শাস্তি সামাজিক পীড়ন ও বহিষ্কার।

হিন্দুসমাজকে যদি আমরা পুনরায় সুস্থ ও জীবন্ত দেখিতে চাই, তবে আমাদের এই নেতিধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া সমাজের positive দিক দেখিতে হইবে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও জীবনের একটা অতি উচ্চ positive আদর্শ আছে—জীবনে, ধর্ম্মে সমাজে কেমন করিয়া সেই মহৎ আদর্শ আয়ত্ত করা যায়, আজকালকার সমাজের পরিবর্ত্তিত আবেষ্টনের ভিতর কি প্রকারে সেই সব আদর্শ অনুসরণ ও রক্ষা করা যায়, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং সেই সব আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা positive কার্য্যের দ্বারা সমাজে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতে হইবে, যাহাতে সমাজ সমগ্রভাবে নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন ঋদ্ধি ও অভ্যুদয় লাভে অগ্রসর হইতে পারে।

হিন্দুর সমাজ ও আচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারা ইহার ভিতরকার এই সব জীবনানুকূল positive বিধি ও আদর্শ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা এ প্রবন্ধে করা যাইতে পারে না। তবে মোটামুটি একটা কথা বলা যাইতে পারে, হিন্দুর সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রধান আদর্শই এই যে, ব্যক্তিগত স্বার্থকে ছোট করিয়া সামাজিক মঙ্গলকে বড় করিয়া দেখা। প্রত্যেক হিন্দুর জীবনের নীতি ও মূল-সূত্র ইহাই যে, সকলে স্বার্থকে সংযত করিয়া সকল চেষ্টা সমাজ ও ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের জন্য নিয়োজিত করিবে; সমস্ত জীবনটা একটা প্রচণ্ড স্বার্থান্বেষণে পর্য্যবসিত না হইয়া, ধর্ম্ম ও সামাজিক মঙ্গলের দ্বারা নিয়মিত হইবে। এই নিয়ম বা discipline হিন্দুসমাজের জীবনের প্রধান কথা।

আর একটা প্রধান কথা এই যে, discipline বা নিয়ম বাহিরের প্রয়োজনে কোনও বাহ্যশক্তির দ্বারা নিরূপিত ও শাসনরক্ষিত না হইয়া আত্মশাসনের দ্বারা

আত্মপ্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হইবে। আমাকে সমাজের জন্য, ধর্ম্মের ধন্য, লোকহিতের জন্য জীবন নিযুক্ত করিতে হইবে, কিন্তু সে নিজের আত্মার অভ্যুদয়ের প্রয়োজনে—পরের প্রয়োজনে নয়। মানুষের ভিতর বাসনাটা বড় নয়, আত্মাটাই বড়—সেই আত্মার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ জীবনের প্রয়োজন সাধনের অনুকূল—ধর্ম্ম। সকল আচার অনুষ্ঠান, সমস্ত হিতসাধন চেষ্টা সকলের কেন্দ্র ও মূল এই আত্মার অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ। শাসনের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে ইহা লাভ হয় না, স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে, ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মের অনুসরণে তাহা লাভ হয়।

নিবিষ্টমনে দেখিলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সকল দর্শনের পরস্পর বিরুদ্ধ নানা উপদেশের ভিতর আমরা এই সত্য নিহিত দেখিতে পাইব। আমাদের নেতিবাচক ধর্ম্ম, আমাদের চলিত বাহ্যাচারমাত্র। সার ধর্ম্মের ভিতর এই মহৎ আদর্শের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? হিন্দুজাতি অতীত যুগে যে গৌরব লাভ করিয়াছিল তাহা বাহ্যাচারের জোরে নয়, তার সজীব সমাজের ভিতর এই আদর্শ, এই প্রাণ ছিল বলিয়া।

বাহ্য আচারের চেয়ে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের ভিতরকার এই মৌলিক ধর্ম্ম অনেক বড় কথা। এই মৌলিক ধর্ম্মরক্ষায় হিন্দুর হিন্দুত্ব, ইহাই সমাজধর্ম্মের সার। ইহাকে ছাড়িয়া বাহ্য আচার কিছুই নয়, ইহাকে রাখিয়া আচারাদি যতই পরিবর্ত্তন করা যাউক তাতে হিন্দুত্ব বা হিন্দু সমাজের বাস্তবিক কোনও ক্ষতি নাই।

হিন্দুসমাজে পুনর্জ্জীবন সঞ্চার করিতে হইলে আমাদের সংস্কারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া এই সত্যকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে; এই আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করিয়া যাহাতে ইহা সমাজের ভিতর সজীব হইয়া উঠিতে পারে সে জন্য শিক্ষাবিস্তারাদি positive কার্য্যের দ্বারা আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, বাহ্য নেতিমূলক ধর্ম্মের উপর হইতে আমাদের দৃষ্টি সরাইয়া নিঃশেষরূপে তাহা নিবদ্ধ করিতে হইবে এই সব সার সত্যের উপর।

এ কায একদিনের নয়, একজনের নয়। এ কায করিতে গেলে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার দ্বারা তার প্রত্যেক চলিত আচার অনুষ্ঠানের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তার ভিতর কোনটি কি পরিমাণে সমাজের জীবনের অনুকূল বা প্রতিকূল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কি উপায়ে হিন্দুর সমাজ-জীবনের অনুকূল আদর্শ ও বিধি আমাদের মুমূর্ষু সমাজের ভিতর অনুস্যূত করা যায়, কি উপায়ে আপামর সাধারণের ক্রমশঃ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স্ লাভের সুযোগের সৃষ্টি করা যাইতে পারে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, এবং সেই নির্দ্ধারণমূলে কার্য্য করিতে হইবে।

আমি পণ্ডিত পরিষদকে সর্ব্বাগ্রে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের এই প্রকার বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছি। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় যে জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আজ এক শতাব্দী পরে আমি আমার সমাজকে সমস্তভাবে সেই আলোচনা সম্পূর্ণ করিতে আহ্বান করিতেছি। ইহা ছাড়া হিন্দুসমাজের বাঁচিবার উপায় নাই, তার সমৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পতিহারা

ভুবন-ভোলানো রূপ
আজিকে মলিন কেন?
তরুণ অধর তোর,
কি লাগি নীরস হেন?

কোমল ও দুটি বাহু,
ফুলেরে দিত যে লাজ—
আজিকে শিথিল কেন,
কেন এ বিরহ সাজ?

করুণ ও দুটি আঁখি,
বিজলী হানে না আর
মিটেছে কি সব সাধ,
নাহি কিছু বলিবার ?
যৌবন আজিকে তোর,
হয়ে গেছে বুঝি শেষ ?

নিঠুর কালের দণ্ড
রাখেনিক' কোন লেশ !
দয়িতে হরিয়ে তোর,
রেখে গেছে ভাঙ্গা বুক,
অভাগী আজিকে তুই,
তাই মসীমাখা মুখ !

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

"মাণিক-দহ্"

(গল্প)
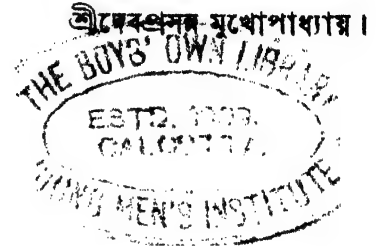
এই আঠারো বছর বয়সেই ক্ষীরোদার ওপর দিয়ে যে কত ঝড়ঝাপ্‌টা গেছে, তা' আর এককথায় বলা যায় না। তার ছিল সবই ; কিন্তু আজ সে সর্ব্বরকমে নিঃস্ব। সমস্ত কিছু খুইয়ে দিনগুলো তা'র কাটছে,—মজে-যাওয়া-নদীর ক্ষীণস্রোতের মতো ধীর মন্থর গতিতে।

ক্ষীরোদার জীবনের আগের দিকের দিনগুলো যে নেহাৎ মন্দ কেটেছিল, তা' নয়।

গ্রামখানি পদ্মার ধারে। আম, সুপারীর গাছগুলো গ্রামখানাকে বুকে ক'রে আগ্‌লে রেখেছে। বাড়ীর উঁচু সীমানা ছাড়িয়ে গাছের ঝোপ কুঞ্জ তৈরী করেছে। জলের ধারে একটা বড় অশথ গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তার গোড়ার মাটিটুকু জলের স্রোতে এবং ঢেউয়ে ধুয়ে গিয়ে শিকড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে। গাছটা শিকড়-নখে প্রাণপণে যেটুকু মাটি নাগাল পেয়েছে, তাই খাম্‌চে ধ'রে নিজের পতন বাঁচোবার চেষ্টা করছে। অনেক কালের একটা মন্দির তার ভাঙ্গা চূড়া আকাশের দিকে উঁচু করে রেখেছে, যেন ঊর্দ্ধবাহু যোগীর মত ক্ষীণ অপুষ্ট হাত। মন্দির শূন্য ক'রে দেবতার অন্তর্দ্ধান অনেকদিন আগেই হয়েছে, এখন তাঁর স্থান পূর্ণ ক'রে বাসা বেঁধেছে পায়রারা।

ক্ষীরোদার বাড়ী ছিল এই গ্রামে—একেবারে পদ্মার কোলের উপর।

দেশের প্রথা অনুযায়ী তার খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর কয়েক বছর তার দিনগুলো হয়তো অনেকের চেয়ে ভাল ভাবেই কেটেছে। সকলের ভাগ্যে যা জোটে না—শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহ ভালবাসা—তা সে যথেষ্টই পেয়েছিল। স্বামিসৌভাগ্যই কি তার কম ছিল? কিন্তু এ সব থাক্‌লেই বা কি হবে? বিধাতা তার কপালে কোথায় যে একটা রেখার মারপ্যাঁচ ক'রে রেখেছিলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।

ক্ষীরোদার স্বামী গ্রামের জমীদার সেরেস্তায় কায করত। সকালে খেয়ে দেয়ে কাছারী যেত এবং বিকেলে কর্ম্মক্লান্ত শরীরে বাড়ী ফিরে আস্‌তো। ক্ষীরোদা স্বামীর সেবাযত্ন কর্‌তো—কোথাও এতটুকু অভাব অভিযোগের ফাঁক থাক্‌তে দিতো না। সেই ছিল বাড়ীর একমাত্র বৌ, কাযেই সংসারের সমস্ত খবরদারীর ভার তার কাঁধের উপরই প'ড়েছিল। সেও নিজের কর্ম্মপটুতার গুণে সকলকে মুগ্ধ ক'রে রাখতো।

শ্বশুর বৃদ্ধ হ'য়েছিলেন, বাড়ীতেই থাক্‌তেন। কোন কাযকর্ম্ম করতেন না। ক্ষীরোদার স্বামীর অর্জ্জিত অর্থেই সংসার চল্‌তো। সংসার যে খুব সচ্ছল ছিল তা নয়। ক্ষীরোদা কিন্তু তাতেই বেশ গুছিয়ে চালাতো। কেউ কোন অসুবিধা বুঝতে পার্‌ত না।

ক্ষীরোদার অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার দরুণ অল্পদিনের ভিতরই সে অনেক ক'টি সন্তানের জননী হ'য়ে পড়লো।

সংসার যখন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়ে চল্‌ছে, ঠিক এমনি সময় সংসারে ভাঙন ধর্‌লো। প্রথম তার দেবতুল্য শ্বশুর সংসার ছাড়্‌লেন। তার পর এক বছরের মধ্যে শাশুড়ী তাঁর অনুগমন করলেন। এই দুই শোকের ধাক্কা সামলাতে না সাম্‌লাতে তার স্বামী—যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় সে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কাটিয়ে এসেছে, সংসারের সুখদুঃখ, ভালো মন্দ কোন অবস্থাই বিচলিত করতে পারে নি, সেই স্বামী তাকে একলা এবং অকূলে ফেলে, তাকে দুর্ভাবনার হাতে নিক্ষেপ ক'রে নিজে নির্ভাবনা হলেন। ক্ষীরোদার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সে শোকে দুঃখে কাঁদবে কি কী করবে কিছুই বুঝতে পারলে না। তার চোখের সমস্ত অশ্রু জমাট বেঁধে বুকের ভিতর পাষাণের মতো চেপে বস্‌লো। মূর্ত্তি তার শুক্‌নো, পাগলের মতো। চোখদু'টো কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে। সে স্থির নিশ্চল। শোকের এই অবস্থাই হ'চ্ছে সব চেয়ে ভীষণ। যে কাঁদ্‌তে পারে, সে তো নিজের মনকে অনেকখানি হাল্‌কা করে; কিন্তু যে কাঁদ্‌তে পারে না, তাকে শোক নিদারুণ ভাবে পীড়ন করে। যন্ত্রণা তার অসহ্য। আর এই অবস্থা হয় তখনই, যখনই শোক কাউকে গভীর ও মর্ম্মান্তিক ভাবে আঘাত করে।

ক্ষীরোদার পিতৃকুলে কেউ ছিল না। এদিকের অবস্থাও দাঁড়ালো এই। যে ক্ষীণ অবলম্বনটুকু ধ'রে, তার জীবন দুঃখ-দৈন্যকে তুচ্ছ ক'রে, সংসারের অকূল পাথারে পাড়ী জমাবার চেষ্টায় ছিল, আজ সেইটুকুও যেন কালবৈশাখীর লুকানো হঠাৎ ঝড়ে তার বন্ধন হ'তে ছিন্ন ক'রে নিয়ে গেল। এখন কোথায় বা কূল, আর কোথায় বা তার অবলম্বন!

ক্ষীরোদার ভাবনা হল কেমন ক'রে ছেলেদের মানুষ ক'রে তুল্‌বে। কোথায় গিয়ে কারো বাড়ীতে যে কোন কায করবে, তারও উপায় নেই। তার কোলে একটি এক বছরের দামাল শিশু। তাকে ফেলেই বা কায করতে যায় কেমন ক'রে, আর তাকে নিয়ে যাওয়া তো মোটেই চলে না!

সমস্ত ব্যাপার মিলিয়ে তার চোখের সামনে ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠলো। শীতের কুয়াসা যখন ঘন এবং জমাট হ'য়ে পৃথিবীর বুকের উপর চেপে পড়ে, তখন মানুষের দেখ্‌বার জন্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখে না বা রাখাও দরকার মনে করে না। সমস্ত পৃথিবী চেপে সে কালো আঁধারের যবনিকা টেনে পৃথিবীকে লোপ করতে চায়; এমন কি প্রখর সূর্য্যতেজকেও সে রোধ করে, তার প্রভাব তখন এত।

ক্ষীরোদার অবস্থাও এখন ঠিক এই রকম দাঁড়িয়ে গেল। তার চোখের সাম্‌নে এবং বুকের উপর দুর্ভাবনার ঘন কুয়াসা গাঢ় যবনিকা ফেলে তার সামনের সমস্ত আলো আশা ম্লান ক'রে দিলে। এই অন্ধকার ভেদ করবার মতো দৃষ্টিশক্তিও যে তার আর নেই। অন্ধকার যদি চিরদিনের মতো তার কাছ থেকে পার্থিব সমস্ত কিছুকে লুকিয়ে দিত, তা হ'লে যে এর চেয়ে ঢের ভাল ছিল। কিন্তু মানুষের আশা সব সময় মেটে কৈ! ভগবানের পরীক্ষার আর অন্ত নেই। কিন্তু সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে যে প্রাণান্ত হ'য়ে যায়!

জীবনব্যাপী দুঃখের মধ্য দিয়ে যে কখন কোন্ ফাঁকে সুখ উঁকি মেরে ক্ষণিকের দেখা দিয়ে যায়, তা সব সময় উপলব্ধি করা যায় না। ঠিক যেন বর্ষার কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিরে পড়ন্ত রোদের ক্ষণিক দীপ্তি। মুহূর্ত্তের জন্যে একটু ফাঁক পেয়ে তারই সুযোগে একটুখানি আলো পৃথিবীকে আনন্দ দান করে। সুখও তেমনি দুঃখের অন্ধকার ভেদ ক'রে মুহূর্ত্তের জন্যে জীবনকে পুলক-দীপ্ত করে; কিন্তু তার আনন্দ স্থায়ী হ'তে পায় না, দুঃখ আবার দ্বিগুণ হ'য়ে তা'র অতর্কিত ফাঁকের অবহেলা পূরণ করে।

ক্ষীরোদাও ক্ষণিক সুখের আস্বাদ পেতে না পেতেই দুঃখের কবলে পড়লো। এই দুঃখের সঙ্গে তাকে আমরণ যুঝতে হবে। সে একলা হলেও তার দুঃখ ছিল না। এতগুলি ছেলেপিলে নিয়ে সে কেমন ক'রে দুঃখের সঙ্গে বোঝা পড়া করবে, এই হল তার ভাবনা।

ক্ষীরোদা কোনই উপায় না পেয়ে হতাশভাবে কাঠ হয়ে বসে রইল। ছেলেমেয়েগুলি যে কেঁদে কেঁদে কখন তার আশে পাশে মাটিতে শুয়ে অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেদিকে তার লক্ষ্যও নেই। অন্য দিন হলে কি সে ছেলেমেয়েদের একটু কান্নাও সহ্য করতে পারতো?

আজ শোক নাকি তাকে এতই মুহ্যমান ক'রে তুলেছে যে, ছেলের কান্নাও ক্ষীরোদাকে সচেতন করতে পারেনি। হঠাৎ ক্ষীরোদাকে দেখ্‌লে মনে হয় বুঝি তার দেহ প্রাণহীন। কোন স্পন্দনই অনুভূত হয় না। বয়স তার অঙ্কের হিসাবে না ধরলেও মনে হচ্ছে যেন অনেক এগিয়ে গেছে। শোক যে মানুষকে কতখানি অভিভূত করতে পারে, তা ক্ষীরোদাকে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। সে যেন মূর্ত্তিমতী শোক। ক্ষীরোদার চোখের কোণে তার অজ্ঞাতসারে ঝরে-পড়া অশ্রু শুকিয়ে সাদা রেখার দাগ রেখে গেছে। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে স্থাণুর মতো সে ব'সে আছে

এতবড় দুর্দ্দিন স্ত্রীলোকের আর নেই। সৌভাগ্যবতী যে, সে পার্থিব সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও কঠোরতার পরীক্ষায় হাসিমুখে উত্তীর্ণ হতে পারে। কোন অবস্থাই তাকে বিচলিত করতে পারে না। স্বামীকে বড় ক'রে তাকে একান্ত অবলম্বনরূপে দেখেছে বলেই মেয়েরা সমস্ত দুঃখ দৈন্য আনন্দ নিরানন্দ সমান হাসিমুখে গ্রহণ করতে পেরেছে। আজ ক্ষীরোদা তার সেই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হারিয়েছে। এই হারানোর ভিতর ফিরে পাবার আশা তার এক কণাও নেই। সেইজন্যে তার দুর্ভাগ্যের আজ সীমাপরিসীমা নেই।

পাড়ার লোকে তাকে সান্ত্বনা দিতে আস্‌তো। তারা শুধু মুখের 'আহা' দিয়ে তার মন ভোলাতে চাইতো, সেটা যে তাদের কতখানি ভুল, তা কি তারা বুঝতো, যেমন বুঝতো ক্ষীরোদা? কি অপরাধে যেন সে অপরাধী, লোকের কাছে মুখ দেখাতেও তার লজ্জা করতো—একেই বলে বোধ হয় যমলজ্জা।

ক্ষীরোদা যখন এমনি ক'রে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে তন্ময় হয়ে বসে আছে, তখন পাড়ার এক বৃদ্ধা এসে তা'কে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন, "ক্ষীরো! ওঠ্ মা, এমন করে বসে থাকলে কি দিন চলবে? ছেলেগুলো যে ধুলোয় লোটাচ্ছে, ওদের দ্যাখ্। তোকেই যে এখন বাপ মা এক হয়ে ওদের মানুষ করতে হবে।"

ক্ষীরোদার চমক ভাঙ্‌লো। সত্যই তো, দিন কি করে চল্‌বে? দিনের দিন হয় ত চলে যাবে, কিন্তু তার দিন কি করে' চল্‌বে! দিন চলার কঠিন সমস্যাই তো তাকে সব চেয়ে বেশী মুহ্যমান ক'রে তুলেছে। সে একলা হলে তো সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে তুচ্ছ ক'রে দিনান্তের অন্তরালে নিজের জীবন লুটিয়ে দিত। কিন্তু তার ত উপায় নেই। এতগুলি সন্তান যে তার জীবনকে বেষ্টন করে আছে, তাদের উপায় কি হবে।

মানুষের ভাবনাচিন্তা শোকদুঃখ যতই প্রবল হোক না কেন, দিন একরকম ক'রে কাটেই। দিন কারো অপেক্ষা করে না ব'লেই, দিন কাটানোর ভাবনা যতই প্রবল হোক, দিন ভাবনাচিন্তার অপেক্ষা না করেই কেটে যায়; আর সেই জন্যেই মানুষ ভাবনাচিন্তার হাত থেকে উদ্ধার পায়। নইলে তার জীবন হয়ে উঠতো ভারী বোঝা।

ক্ষীরোদার দুর্ব্বহ দিনগুলো তার চিন্তাকে অতিক্রম ক'রে তার অজ্ঞাতসারেই কেটে যেতে লাগলো। দিনান্তে যখন সে ভাবতো যে, আজকের দিন কেমন করে কেটেছে, তখন সে তার কোন কৈফিয়ৎই খুঁজে পেত না। আবার যখন কালকের দিন কি ক'রে কাটবে ভাবতে বসতো তখনও কোন হদিস্ খুঁজে পেত না। তবু তার দিন কাটতে লাগলো।

কিন্তু এইটুকুও বোধ হয় বিধাতার সহ্য হল না। তিনি যেদিন সূতিকাগারে ক্ষীরোদার কপালে ভাগ্যলিপি লিখেছিলেন, সেদিন হয়তো অনেক ক'টা রেখাই অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে মুছে গিয়েছিল। আজ এক এক ক'রে তারই ফল ফলতে সুরু হয়েছে।

যাদের নিয়ে তার ভাবনা হয়েছিল তাদের প্রতি এইবার ভগবানের দৃষ্টি পড়লো। যে ছেলেমেয়ের জন্যে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে দারিদ্র্যের সঙ্গে অহরহঃ যুদ্ধ করেছে, সংসারের সমস্ত দীনতা স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছে, আজ তারাই একটির পর একটি তার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে সরে পড়তে লাগলো। যেটুকু উদ্যম ও উৎসাহ অনেক কষ্টের পর ক্ষীরোদা নিজের মনের মধ্যে সংগ্রহ করেছিল, এইবার তাও আবার অন্তর্হিত হয়ে যেতে বসলো। এ কি গ্রহবৈগুণ্য! তার সব ক'টি ছেলেমেয়ে তার কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করার পর একমাত্র অবশিষ্ট রইল তার কোলের বছর দেড়েকের ছেলে মাণিক। সমস্তই যখন গেল, তখন মাণিকের প্রতিও তার আর ভরসা রইল না। মনে ভাবলে এ তো কোন্ এক মুহূর্ত্তে তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। সে মাণিককে ভাল ক'রে যত্ন করতো না। হত-শ্রদ্ধায় যেটুকু দেখাশোনা না করলে নয়, তাই করতো মাত্র। যে বড়দের আশা সে করতো তারাই যখন রইল না, তখন এই দেড় বছরের ছেলের কি-ই বা আশা সে করতে পারে?

ক্ষীরোদা মাণিককে যতই অবহেলা করতো, মাণিক ততই অস্ফুট মা ডাকে তার মাতৃহৃদয়কে আলোড়িত ক'রে তুলতো। ক্ষীরোদা তাকে কোলে নিতে চাইতো না, মাণিক অসীম আগ্রহে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং তার বুকের মধ্যে মাথা ঘষে নিজের স্নেহ জানাতো। ক্ষীরোদা চোখের জল রোধ করতে পারতো না। এ কি মায়া!

পাড়ার বর্ষীয়সীরা বলতেন, "ক্ষীরো, ছেলেটাকে অমন অযত্ন করিস্নে। ওরা তোকে ছলনা করতে এসেছে। জানিস্, কোন্ দেবতা কখন কোন ছলে যে ছলতে আসেন, তা বলা যায় না। এই ছেলেই দেখিস্, তোর সবার বড় হয়ে থাক্‌বে।"

কথা শুনে ক্ষীরোদার মুখে ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি ঈষৎ স্ফুরিত হ'য়ে উঠতো, সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়তো। যারা বড় হয়েছিল তারাই বড় করলে, তা এই করবে। হায় রে আশা!

কিন্তু মনে করলেও তো মাণিককে অযত্ন করবার ক্ষমতা ক্ষীরোদার নেই। তার মনের অন্তস্তল হ'তে মাতৃস্নেহ তাকে মাণিকের প্রতি যত্ন নিতে আগ্রহান্বিত ক'রে তুলতো। গতাসুদের শূন্য স্থান যেন একা মাণিকই পূর্ণ কোরে আছে। মাণিক ক্ষীরোদার যত অযত্ন পেতে লাগলো, ততই যেন মার প্রতি তার আগ্রহ ও আকর্ষণ বেড়ে উঠতে লাগলো। ক্ষীরোদা ক্রমাগত নিজের মনের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। কিন্তু সমস্তই তার ব্যর্থ হয়ে যায়। মনের কঠোরতা অশ্রুর পারাবারে ভেসে যায়। এ কি বিড়ম্বনা! মাণিককে কোলে ক'রে, বুকে চেপে ধ'রে কান্নায় মাণিককে ভিজিয়ে দেয়। এমনি ক'রে একদিকে মাতৃস্নেহ এবং অন্য দিকে সেই স্নেহের বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করাবার জন্যে যে শক্তি সে সঞ্চয় করতে চাইছিল, সেই শক্তি, এই দু'য়ের সংঘর্ষ অহরহঃ চলছিল। কোনো বার মাতৃস্নেহের জয় হচ্ছিল, কোনোবার তার বিরুদ্ধ ইচ্ছার। এমনি ক'রেই তার দিন কাটতে লাগলো।

মাণিক কিন্তু সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ ক'রে ক্রমশঃ বড়ই হ'য়ে উঠতে লাগল। এবং তার বুদ্ধি ও মেধা তীক্ষ্ণ ও অসাধারণ হ'য়ে উঠলো।

সকলে বললে, "দেখিস্ ক্ষীরি, এই ছেলে হ'তেই তোর বরাত ফিরবে।"

ক্ষীরোদাও নিজের অজ্ঞাতসারে মাণিককে যে কখন সম্পূর্ণভাবে নিজের স্নেহক্ষুধাতুর হৃদয়ের মধ্যে গভীর ভাবে গ্রহণ ক'রে ফেলেছে, তা' সে নিজেও বুঝতে পারেনি। যখন সে এইটে উপলব্ধি করতে পারলে, তখন আর নিজেকে ফেরাবার উপায় নেই। তখন সমস্ত হৃদয় মাণিকময় হ'য়ে গেছে। শেষে এমন হল

যে, ক্ষীরোদা এক মুহূর্ত্তও মাণিককে কাছছাড়া করতে চাইতো না। প্রতিমুহূর্ত্তেই তার মনে হত—বুঝি একটু অসাবধান হলেই সে মাণিককে হারাবে। পক্ষীমাতার মতো সে নিজের বক্ষপুট বিস্তার ক'রে মাণিককে আগ্‌লে রাখতে লাগ্‌লো।

এমনি করেই মাণিক প্রায় বছর ছয়েকের হল মায়ের স্নেহের মধ্যে মানুষ হ'য়ে সে একটু চঞ্চল ও ছেলেমানুষী দুষ্টামিভরা হয়ে উঠলো। সমস্ত দিন ছুটোছুটি করে বেড়াত। পদ্মার ধারে ধারে ঢেউয়ের তালে তালে খঞ্জন পাখীর মতো নেচে নেচে বেড়াত। ক্ষীরোদা ভীতকণ্ঠে যত বারণ করতো, সে অগ্রাহ্য ক'রে যেন বেশী ছুটোছুটি করতো। আরুড়ীর ভাঙনের উপর গিয়ে দাঁড়াতো। ক্ষীরোদা শিউরে উঠতো, এই বুঝি পড়লো। ব'কে যখন তাকে ফেরাতে পারতো না, তখন অনুনয় ও নানা প্রলোভনে তাকে ফেরাতো এবং বুকে অসীম আগ্রহে চেপে ধরে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো, হে ঠাকুর, মাণিককে সুমতি দাও ঠাকুর, সে যেন একটু স্থির হ'য়ে থাকে ; তার কোন বিপদ ঘটিও না, তার বিপদ ঘটবার আগে যেন আমার মরণ হয়

সকাল বেলা মাণিকের গায়ে একটা দোলাই বেঁধে দিত। একটা ছোট ধামীতে ক'রে চারটি মুড়ি এবং একটু গুড় দিত। সেই খাবার খেতে খেতে মাণিক সতীশ পরামাণিকের পাঠশালায় পড়্‌তে যেত। ক্ষীরোদা নিজে সঙ্গে ক'রে তাকে পাঠশালার দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আস্‌তো এবং পড়াশেষে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তো।

পাঠশালায় দেবার আগে সতীশকে অনেক অনুনয় ক'রে ক্ষীরোদা বলেছিল—দেখো দাদা, ছেলেটার উপর একটু নজর রেখ, আমার ওই বই আর নেই।

সতীশ তাকে সান্ত্বনা দেওয়া সত্ত্বেও তার মন পড়ে থাক্‌তো পাঠশালায়, মাণিক ফিরে এলে তবে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌তো। এমনি আবেগ উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে দিন কাট্‌তে লাগলো। আর লোকের বাড়ী ধান ভেনে মুড়ি ভেজে সংসার চালাতে লাগলো। এ সব যে তাকে কোন দিন করতে হবে, এ কি সে কোন দিন ভাবতেও পেরেছিল ? একেই বলে দৈব বিড়ম্বনা।

দিনগুলো এক এক করে বৎসর তৈরী করে তুল্‌লে। মাণিকের বয়স আর এক বছর বেড়ে গেল। ক্ষীরোদাও উদ্বেগক্লান্ত মন নিয়ে আর এক বছর কাটিয়ে দিলে। বসন্ত গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এসে পড়লো। এবারকার বর্ষা একটু বেশী ক'রেই যেন ধরিত্রীর বুকের উপর ঝ'রে পড়লো, অনেক বৃদ্ধও নাকি এমন বর্ষা দেখেন নি। পদ্মা স্ফীত হ'য়ে দু'কূল প্লাবিত ক'রে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতিতে প্রিয়তম সমুদ্রের সঙ্গে মিলন-আশায় ছুটে চল্‌লেন। কিন্তু যেমন একের আনন্দোৎসব, অন্যের নিরানন্দ, তেমনি পদ্মা মিলন আশায় চল্‌লেন বটে, কিন্তু অনেক গৃহস্থকে গৃহহীন ক'রে তাদের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস বহিয়ে দিয়ে চল্‌লেন।

আজকে সকাল থেকে আকাশ থম্‌থমে হ'য়ে ছিল। সন্ধ্যা হবো হবো হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামলো এবং ঝড়ও প্রচণ্ড বেগে বইতে লাগলো। পদ্মা প্রচণ্ড ক্রোধে কূলের উপর আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো, যেন সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করতে চায়।

মাণিক বৃষ্টির আগে পাড়ায় খেলা করতে গেছে, এখনো ফেরে নি। কিন্তু এত জল-ঝড় যে, বের হ'য়ে দেখবারও উপায় নেই। ক্ষীরোদা একবার ভিতর একবার বার করতে লাগলো। উদ্বেগের আর অন্ত নেই। পদ্মা তখন ফুলে উঠে তাদের বাড়ীর দোর গোড়ায় এসেছেন। যে অশথ গাছটা তার শিকড়-নখের খামচানিতে মাটি আঁকড়ে ছিল, সেটা আর নিজের অবলম্বন রাখতে পারলে না—সশব্দে জলের উপর প'ড়ে গেল। বাইরের পাঁচিল জলের তোড়ে ও পদ্মার তরঙ্গাঘাতে ধরাশায়ী হ'ল। ক্ষীরোদা ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করতে লাগলো—মাণিক।

অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠলো। ক্ষীরোদার উঠানের

কিয়দংশ পদ্মা গ্রাস করলেন। হঠাৎ ক্ষীরোদার কাণে এল মাণিকের ব্যাকুল আর্ত্তস্বর—মা!

ক্ষীরোদা আকুল কণ্ঠে উত্তর দিলে—বাবা।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে মাণিক নূতন-ভাঙা আরুড়ীর উপর দাঁড়িয়ে, সে পাগলের মতো ছুটে এগিয়ে আসতে গেল, কিন্তু পিছলে প'ড়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই মাণিকের স্বর ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠ্‌লো—মা। স্বর মেলাতে না মেলাতে, মাণিক যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেই থানটা ধ'সে পদ্মাগর্ভে মাণিককে শুদ্ধ তলিয়ে নিলে।

ক্ষীরোদা ক্রন্দনমথিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো—মাণিক, বাবা মাণিক! সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসী পদ্মার কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তার পর সব স্থির। শুধু ক্ষীরোদার আকুল কণ্ঠ হতাশ্বাসে বাতাসে ভর করে কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগলো—মাণিক, মাণিক, মাণিক।

পরদিন ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে গ্রামবাসীরা দেখলে, পদ্মা ক্ষীরোদার বাড়ী ধ্বংস ক'রে আবার দূরে সরে গেছে, কেবল সেখানে তার প্রচণ্ড ক্ষুধার চিহ্ন রেখে গেছে, প্রকাণ্ড হাঁ করা বিশ্বগ্রাসী একটা দহ।

সেই থেকে গ্রামের নাম হয়েছে—মাণিকদহ। আর আজও নাকি ঝড়ের রাতে গ্রামের সকলে শুনতে পায়, কে যেন আকুল কণ্ঠে কাঁদছে—মাণিক, মাণিক, মাণিক!

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

স্বাস্থ্য—জ্যৈষ্ঠ

কি খাইব ?—ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়। কিরূপ খাদ্য আমাদের প্রত্যহ খাওয়া উচিত তাহা লেখক মহাশয় "যাহাতে কথাগুলি প্রাণস্পর্শী হয়, অথচ মনে থাকে, এই জন্য খুব ঝড়া ঝাপ্টা ভাবে" আমাদের জানাইয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় 'আইটেম'টি হইতেছে—"প্রত্যহ এক সের করিয়া নির্জ্জলা দুধ পান করিবে।" উপসংহারে তিনি বলিতেছেন, "প্রত্যহ কিছু না কিছু টাট্‌কা ফল এবং সেই সঙ্গে আখরোট, বাদাম, কল বাহির করা ছোলা প্রভৃতি প্রত্যেক শিশুকেই খাইতে দিতে হয়। সহমত মাখম বা ঘৃতও রোজ খাওয়ান ভাল।" কলিকাতা সহরে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ এইরূপ আহার যোগান কতদূর সম্ভব, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষক কে ?—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় তাহা অতি সরস ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশগুলি পড়িবার সুযোগ পাই নাই—এবারে যেটুকু বাহির হইয়াছে (বোধ হয় এবারেই শেষ হইয়া গেল) তাহাতেই আমাদের এত লোভ বাড়িয়াছে যে, লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করি তিনি যেন পুরাতন কলিকাতার অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকগণকে আনন্দ দান করেন।

আম্রকথা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন। জ্যৈষ্ঠমাস—আম খাওয়াইতে পারিলেন না বলিয়া লেখক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আম্রের জন্মবিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া আম্রের গুণ, রোগনাশিনী শক্তি প্রভৃতির যে মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকগণকে আম খাওয়াইবার মতই তাঁহার পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে। আমরা আম্রকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছি।

মানুষের শত্রু ইন্দুর—শ্রীমতী মঞ্জুলিকা দেবী। স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারে লেখিকারাও অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। আলোচ্য প্রবন্ধটি ইন্দুর সম্বন্ধীয় নানাবিধ তথ্যে পূর্ণ। ইন্দুর বিনাশের কোনও সহজ উপায় লেখিকা আমাদের বলেন নাই।

শিলং—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল। শিলং সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ। স্বাস্থ্যান্বেষী শিলংযাত্রীদের কাযে লাগিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের টাইমটেবেল ও ভাড়া প্রভৃতির বিজ্ঞাপন থাকায় প্রবন্ধটির উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান—জ্যৈষ্ঠ।

শরীর ও ব্যাধি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক শরীর-কোষান্তর্গত বিন্দুর (Body cell protoplasm) এর উৎপত্তি ও গুণের কথার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

পেটের অসুখের চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন। বেশ চলিতেছে।

রাজযক্ষ্মা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন। থাইসিসের নাম রাজযক্ষ্মা। লেখক নিপুণতার সহিত এই রোগের নিদান আলোচনা করিয়াছেন।

পিঁয়াজ ও রসুন—ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। "আজকালকার দুর্ব্বল, ক্ষীণবীর্য্য, চক্ষু-ব্যাধিগ্রস্ত বা শক্তি অভাবে চশমাধারী, অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, অনেকস্থলে ফুসফুসের ব্যাধিগ্রস্ত বাঙ্গালীর পক্ষে পিঁয়াজ ও রসুন শুধু উৎকৃষ্ট আহার নহে—অবশ্য প্রয়োজনীয় ঔষধ।"

গো-বসন্ত—শ্রীযুক্ত অসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। গোমড়কের লক্ষণ ও চিকিৎসা। তেরটি মুষ্টিযোগের মধ্যে কোন্‌টি পরীক্ষিত, তাহা বুঝা গেল না। একটি আবার (কুমীরের ডিম) সহজলভ্য নহে।

তান্ত্রিক চিকিৎসা—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ। তন্ত্রশাস্ত্রে মনুষ্যের শরীর রক্ষার জন্য রোগোপশমকারী মন্ত্রৌষধির উপদেশ আছে,—আগামী সংখ্যা হইতে সেইগুলি আলোচিত হইবে।

চিকিৎসকের রোজনামচা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন। তিনটি রোগীর বিবরণ ও চিকিৎসা প্রণালী। এইরূপ প্রবন্ধের উপকারিতা নিশ্চয়ই আছে—তবে কবিরাজ মহাশয় ঔষধ নির্ব্বাচনের সহিত রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে আর একটু বেশী আলোচনা করিলে ভাল হইত।

সাহিত্য

বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর 'ভারত রোমক সমিতি'র (Indo Latin Society) দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ। আলোচ্য প্রবন্ধে 'বাঙালী মনকে ফরাসী মনের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করাই' লেখকের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য যে তাঁহার কথঞ্চিৎ সফল হইয়াছে তাহা বলিতেই বলিবে। ফরাসী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তিনি স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—এ সাহিত্য চর্চ্চা করিলে সুক্ষ্মদর্শী ও স্পষ্টভাষী হওয়া যায় এবং মাত্রাজ্ঞানের সম্যক ধারণা জন্মে, 'আইডিয়া পরিস্ফুট পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার' হয় ও সুস্থ রসজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। সত্যের প্রতি ফরাসী সাহিত্যের অবিচল নিষ্ঠা আর একটি মহৎ গুণ। এক হিসাবে এ সাহিত্যকে সামাজিক সাহিত্য বলা যাইতে পারে, কারণ এ সাহিত্য দুই চারিজন 'গুণী ও পাকা সমজদারের একচেটিয়া সাহিত্য নয়, এ সাহিত্যে সাধারণের অধিকার আছে।' এই সুন্দর প্রবন্ধ পড়িয়া রস-পিপাসু পাঠক তৃপ্তিলাভ করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে এবার মাত্র দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ কিছু নাই।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'শিক্ষা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে দৃঢ়ভাবে বালকদিগের মনন-শক্তি বর্দ্ধিত করিবার কয়েকটী পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির দোষগুণ আলোচনা না করিয়া মাত্র শিশু-মনকে শিক্ষা দিবার কয়েকটী কথাই লেখক বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধ সুচিন্তিত। কবিগুরু সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন 'স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে' সত্য কিন্তু 'প্রকৃতি উভয়ের জন্য দুইটী স্বতন্ত্র জগৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই।' তাঁহার মতে 'সংসারের মেয়ে-পুরুষের ক্ষেত্র একই। সেই এক ক্ষেত্রে উভয়ে ভিন্ন ভাবে কাজ করে। * * পৃথিবীর সকল বিভাগের সকল কাজই মেয়েদের বিশেষ শক্তির অপেক্ষা রাখে। সেই শক্তির প্রকাশ অবরুদ্ধ বলে জগতে কত যে দৈন্য তা আমরা জানতেই পারিনে। মেয়ে-পুরুষে যদি সর্ব্বাংশে এক হ'ত তা হলে এই দৈন্য কেবল মাত্র সংখ্যাগত হ'ত. কিন্তু তাদের স্বভাবে পৃথক বিশিষ্টতা আছে বলেই মেয়েদের শক্তির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করাতে আমাদের দৈন্য গভীরতর গুণগত হয়েছে।' পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, স্বাদেশিকতার 'যজ্ঞক্ষেত্রে মেয়েকে আপন স্থান নিতে হলে তাঁর দেহ-মন হৃদয়ের পরিপূর্ণ শিক্ষা চাই।' আর চাই 'উভয়ের সম্মিলিত অখণ্ড সম্পদে' গরীয়ান্ হয়ে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে। রবীন্দ্রনাথ চান না 'এই নূতন যুগে মেয়েরা গায়ের জোরে পুরুষ হোক।' তিনি চান সংসারে মেয়েদের দুরূহ কর্ত্তব্য আছে সেই কর্ত্তব্য তাঁহারা সম্পাদন করুন। এত দিন পৃথিবীতে মানুষের আত্মপ্রকাশ প্রায় অর্দ্ধেক হয়েছিল—অবশ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল।' আজ সম্পূর্ণ হউক।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' পূর্ব্বের মতই সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এবারে 'আইল্ অব ওয়াইটে'র মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, লোকচরিত্র-বিশেষজ্ঞ লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। স্থানটী সম্বন্ধে লেখকের উক্তি একটু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না:—"বড় সুন্দর স্থান। নীল রঙের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মতো সুন্দর। তবে এদেশের সবুজ যেন আমাদের সবুজের মতো কান্ত নয়, স্নিগ্ধ নয়, কেমন যেন তীব্র আর ঝাঁঝালো। তৃপ্তি দেয় না, উন্মাদনা দেয়; ছাড়তে চায় না, টেনে রাখে, আবেশের চেয়ে জ্বালা বেশি।" বাস্তবিকই লেখকের বর্ণনভঙ্গী পড়িয়া পাঠকের মনে যে ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা তাঁহার ভাষাতেই বলি,—"সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে যেন স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম।"

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবীর 'চীনে হিন্দু-সাহিত্য' পূর্ব্বের মতই বহু তথ্যপূর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছে। 'বাই' রাজত্বের দেড় শতাব্দীর মধ্যে যে ৭ জন শ্রমণ ৬৯ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন তাহার মধ্যে ৪২খানা পাওয়া গিয়াছে। এই ৭ জনের ভিতর ৪জন ছিলেন হিন্দু—তাঁহাদের নাম ধর্ম্মরুচি, রত্নমতি, বুদ্ধশান্ত ও বোধিরুচি। এবারে বোধিরুচির সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনের 'স্মৃতিকথা'য় কালভে-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। বর্ণনভঙ্গী মনোরম। বিবেকানন্দের প্রতি জগদ্-বিখ্যাত ফরাসী গায়িকার সশ্রদ্ধ ভক্তির অর্ঘ্যদান বড়ই মধুর।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের কথানাট্য 'ফল লাভ' পাঠ করিয়া আমরা কিছুমাত্র ফল লাভ করিতে পারিলাম না। ইহা পাঠ করিয়া ভক্তের চক্ষু দিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিতে পারে; কিন্তু গোপালকে কি এত সহজেই পাওয়া যায়? গুরু নিতাইএর বর্ণনার ভিতর না আছে যুক্তি না আছে ভক্তি। শিষ্য রামধন বেচারী শুধু কৃপণ নন, ভাবেরও কাঙ্গাল।

এবারে বিবিধ সংগ্রহে শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসু 'ভারতীয় মন্দির গঠন বৈশিষ্ট্যে' দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের গঠনপ্রণালীর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এই সচিত্র প্রবন্ধে জানিবার জিনিষ কিছুই নাই। কোনরূপ আলোচনা না করিয়া লেখক যে সকল কথা সাধারণভাবে generlaise করিয়া বলিয়াছেন তাহার প্রমাণ আদৌ দেন নাই। একস্থানে বলিয়াছেন—'গঠন-প্রণালীর দিক হইতে দেখিলে মামল্লপুরম্ মন্দির বৌদ্ধ স্থপতি শিল্পের আদিযুগের হুবহু অনুকরণ। বাস্তবিক পক্ষে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মন্দিরের গঠন-প্রণালীই যে বৌদ্ধস্থাপত্যের আদর্শ অবলম্বনে উদ্ভূত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।'

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্তের 'অজান্তা ও এলোরার ভাস্কর্য্য-তীর্থ' আর একটী সচিত্র প্রবন্ধ। বর্ণন-ভঙ্গীর গুণে পুরাতন কথাও যে কেমন সুন্দর হইতে পারে, আলোচ্য প্রবন্ধ তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। লেখকের ভাষার সহজ সরল ও চিত্তাকর্ষক।

সহযোগী সাহিত্যে শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য 'নুট হাম্‌সুনের বাস্তবতা ও তাঁহার বৈশিষ্ট্য' বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

এবারকার সচিত্র ভ্রমণ কাহিনীগুলিই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। এগুলিতে বলিবার বিষয়ও যেমন আছে, লেখকের বর্ণনভঙ্গীও তেমনই মনোরম। শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'ষ্ট্রেট্ সেট্‌লমেণ্টে'র কথাও এই ভ্রমণ-কাহিনীরই অন্তর্গত। এ সংকলিত রচনাটিও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর 'পৌরাণিকী' পূর্ব্বের মতই চলিতেছে।

সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী লিখিত তিনপৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধ 'ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য।' এত অল্প পরিসরের ভিতর এত বড় গুরুতর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ আর কেহ কখনও লিখিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। প্রবন্ধে আবার প্রায় একপৃষ্ঠাব্যাপী ভণিতা আছে। ইহা মনীষারই পরিচায়ক বটে!

লেখকের ১নং আবিষ্কারের বার্ত্তা শুনুন,—"কি ভাবে, কি ভাষায়, কি বলিবার ভঙ্গীতে আমরা কাব্য লিখিবার সময় আজিও রামপ্রসাদের অনুসরণ করিতেছি। বাংলার বর্ত্তমান কাব্যসাহিত্য বলিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকেই বুঝায়। বৈষ্ণব কবিদের নিকট রবীন্দ্রনাথ যে বহু দিক হইতে ঋণী, সে কথার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু রামপ্রসাদের নিকট রবীন্দ্রনাথ কতখানি ঋণী, সে কথা আমরা আজ পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিলাম না।' একথার প্রমাণ করিয়াছেন তিনি সাধক কবির—

"শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়িখান উঠেছিল,
কু আশার কু বাতাস লেগে ডব্‌কা খেয়ে পড়ে গেল।"

উদ্ধৃত করিয়া। অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি! লেখক আরও বলিয়াছেন উহা রবীন্দ্রনাথের 'সত্যই সুদূরের পিয়াসী একটি ব্যাকুল হিয়ার করুণ আর্ত্তনাদ!...রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে ইহা বলিতে হয়—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না।"

দুইটা গানের ভিতর লেখক কি সুন্দর সমতাই না বাহির করিয়াছেন! কি সুন্দর analogy! লেখকের কল্পনার বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে।

লেখকের ২নং আবিষ্কারের বার্ত্তা শুনুন—রামপ্রসাদের—

"মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত।"

সুদূরের পিয়াসী বদ্ধ আত্মার আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

৩ নং আবিষ্কারের কথা লেখকের কথাতেই বলি:—'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্য দিয়া যে সুরটি সব চেয়ে বেশী করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং সে সুরটি থাকার জন্য তাঁহাকে আমরা mystic কবিদের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকি—সেই অসীমের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা, সুদূরের জন্য প্রাণের সেই অতৃপ্ত পিয়াসা রবীন্দ্রনাথ কোথা হইতে পাইলেন? এ জিনিষ ইংরাজ মিষ্টিক কবিদের নিকট হইতে ধার করা জিনিষ নয়, ইহা বাংলার মাটীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।' বাস্তবিক ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে আমাদের গর্ব্ব করিবার প্রভূত কারণই থাকিত; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতের উপনিষদে কি এই mysticismএর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় নাই? বাঙ্গালা

দেশ এই ভাবের প্রসূতি বলিয়া মিথ্যা গর্ব্বে স্ফীত হইলে চলিবে কেন? মিষ্টিক কবিতার পরিচয় বাঙ্গালা সাহিত্যে রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে লেখক প্রথম পাইয়াছেন। অবশ্য এখানে লেখক একটু শান্তভাবে বলিয়াছেন "আমার মনে হয়"। যুক্তির সাহায্যে কোন কথা বলিলে আমরা সে যুক্তির বিচার করিতাম; কিন্তু লেখক সে পথ ধরিয়া চলেন নাই। লেখকের এরূপ যুক্তিতর্কহীন বাক্য শুনিলে বাস্তবিকই হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, লেখক ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রতি যে কটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সংযতভাবে করিলেই শোভন হইত।

'সাহিত্যসংগ্রম' ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলন ও শাখাপরিষদের বার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ। এরূপ সাময়িক ঘটনা লইয়া ইতঃপূর্ব্বে কোন সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। এ জাতীয় অভিভাষণ স্থায়ী সাহিত্যের জিনিষ হওয়াই উচিত। তরুণদিগের পক্ষ লইয়া তিনি যে ওকালতী করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিয়া দেয় যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যাবহারজীবী—পক্ষ সমর্থনে (advocacy) বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নূতন ও পুরাতনের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহাতে তিনি শান্তি আনিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য যে হন নাই তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। প্রাচীন সমালোচক দিগকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন—নূতনের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ দেখাইতে তাঁহারা বিরত হউন, নূতনের প্রতি নির্ব্বিচার বিরুদ্ধতা যেন তাঁহারা না করেন (যদিচ এরূপ করিতে আমরা কোন সমালোচককে দেখি নাই)—সেইরূপ তরুণ দিগের কর্ত্তব্যের প্রতি কি তিনি কোনরূপ ইঙ্গিত করিতে পারিতেন না? প্রাচীন ও তরুণদিগের ভিতর মিলন-স্থাপন করিতে গেলে একদেশদর্শী হইলে চলিবে কেন? প্রাচীনদিগের প্রতি তরুণদিগের ব্যবহার কি ভাল হইতেছে?

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ 'শিক্ষায় লাভালাভ' প্রবন্ধে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এখন শিক্ষার নামে আমরা যাহা পাইতেছি তাহা প্রকৃত শিক্ষা নয়।

প্রবাসী— ।

বর্ষশেষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতার মত হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু ভাব পুরাতন। প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত হইল:—

"যে মৃত্যু আপন বিরাট রথে বিশ্বকে বহন করে নিয়ে যায় আরম্ভ থেকে অবসানে, অবসান থেকে নব জন্মে, সেই পরম গম্ভীর মৃত্যুকে প্রত্যুদ্গমন করে নেবার জায়গা হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে, গৃহ প্রাচীরের মধ্যে নয়। * * * আজ অবসান আমাদেরকে মুক্তির রূপ দেখাক্ যে মুক্তির মধ্যে পূর্ণতা। শান্ত হয়ে বলি হে অন্ত, তুমি ওঁ, তোমার মধ্যে অনন্ত।"

নববর্ষ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যরস, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও দার্শনিক আলোচনায় প্রবন্ধটি উপভোগ্য। তবে ভাবা সর্ব্বত্র সরল নয়, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট বলিয়াও মনে হয়। প্রবন্ধটি উপনিষদাবলীর এক সাময়িক ভাষ্য—যাঁহারা বিদেশী শিক্ষাই অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ইহার মর্ম্ম সহজে উপলব্ধি করিবেন। বিষয় পুরাতন হইলেও বলিবার ভঙ্গী নূতন, দৃষ্টান্তগুলি হৃদয়গ্রাহী।

সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সিটি কলেজের ছাত্রদের বলিতে চান যে ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পর্কিত কোন ছাত্রাবাসে জোর করিয়া সরস্বতী পূজা করা অবৈধ। তিনি যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাও আমরা অসঙ্গত মনে করি না। তবে ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে, আর দুই পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাটের সম্ভাবনা নাই। এক জন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতার প্রয়োজন হইয়াছে। যতক্ষণ মিটমাট না হয় ততক্ষণ এক পক্ষকে তিরস্কার করিলে বা উপদেশ দিলে অন্য দলকেই উৎসাহ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ "নিজের সমাজে অপ্রিয়তা ও অশান্তির আশঙ্কায়" নয়—অন্ততঃ বিচারকের ধীরতা অবলম্বন করিয়া, আরও কিছু দিন চুপ করিয়া থাকিলে ভাল হইত।

উত্তেজিত ছাত্রগণের কটু ব্যবহার, অভদ্রতা বা স্বাধিকার প্রমত্ততার কথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাবে সাধারণের গোচরে আনিয়াছেন। কিন্তু যে অধ্যাপক বা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দল ছাত্রদের বিপক্ষে একটা সমর ঘোষণা করিয়া জয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা যে বিদ্যা-দাতার মর্য্যাদা রাখিতে পারেন না এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

ছাত্রাবাস কোন মনিবের বাড়ী এবং ছাত্রদল তথায় ভৃত্য এরূপ কল্পনা করিলে রবীন্দ্রনাথের উপমাবলী কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা চলে। কিন্তু ছাত্রাবাস তাহা হইতে পারে না। সেখানে ব্রাহ্ম গুরু যদি ব্রাহ্ম-সমাজের পোষকতা করেন এবং হিন্দু ছাত্রকে ভর্ত্তি করিয়া তাহার ধর্ম্মের অবমাননা করেন তাহা হইলে ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় এবং ব্রাহ্ম অধ্যাপক যে আইন লইয়াই নিজ পক্ষ সমর্থন করুন, আধুনিক স্বাধিকার প্রবুদ্ধ হিন্দু-ছাত্র তাহা না মানিতে পারে এরূপ সন্দেহ কিন্তু অধ্যাপক বা কলেজের কর্তৃপক্ষগণ করিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে শুধু ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়াই কথা কহিয়াছেন, অন্য পক্ষের প্রতি তাঁহার বক্তব্য কি তাহাও অপ্রকাশ থাকা উচিত নয়। আমরা ছাত্রদের রূঢ় ব্যবহার সমর্থন করি না, আবার কোন কলেজ বা ছাত্রাবাসের কর্তৃপক্ষ ব্রাহ্ম-সমাজের নিয়ম মানিয়া হিন্দু-

ছাত্রদের ধর্ম্মাধিকারে বাধা দিবেন ইহাও সমর্থনযোগ্য নয়। এটা যে গোঁড়ামীর যুগ নয় এ কথা সকল পক্ষেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।

বাংলার আধুনিক চিত্র-কলা ও চিত্র-শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। আধুনিক চিত্র-কলা সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। শিল্পীর পরিচয়ও যৎ-সামান্য। তাঁহার শিল্পের বৈশিষ্ট্য আছে শুনিলাম কিন্তু বৈশিষ্ট্য কিরূপ তাহার বর্ণনা নাই। মোটের উপর আলোচনাটি অগভীর ও অসার।

ইংরেজি পঠন সাহিত্যের নূতন ধারা—শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য। লেখক ইংরাজী শিক্ষার জন্য কিরূপ পাঠ্য পুস্তক রচিত হওয়া উচিত তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝাইয়া বলিতে চান্। আমরা প্রবন্ধটির প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষক বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শিক্ষা আধুনিক যুগের একটা গুরুতর সমস্যা। এ বিষয়ের আলোচনা যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। এই নূতন আলোচনার পথ লেখক প্রশস্ত করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

জার্ম্মেনীর তরুণ আন্দোলন—শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। লেখক জার্ম্মেণীর Wandervogel সংঘের একটি বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শিরোনামাটি ঠিক হয় নাই, কেন না তরুণ আন্দোলনের কথা অতি সামান্য। তবে জার্ম্মেণীর মনস্বী শিক্ষকগণ তরুণদের কি ভাবে চালিত করেন তাহার বিবরণটি চিত্তাকর্ষক। আমাদের দেশের শিক্ষাযন্ত্রের চালকগণ আশা করি এই সব নবপদ্ধতি শুধু আলোচনা না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অনুসরণ করিবেন। প্রবন্ধ আরও বিশদ হইলে ভাল হইত।

সেলমা লাগেরলফ—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ। প্রবন্ধটি জার্ম্মাণ গ্রন্থ হইতে সংকলিত। সুইডেনের সামান্য গৃহস্থ কন্যা সেল্‌মা লাগেরলফ শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন এবং কেন যে তিনি আজ জগতে সুপরিচিত তাহাই বিবৃত করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রচনাটি ছোট হইলেও সারগর্ভ। মোটের উপর প্রবন্ধটি সাময়িক ও উপাদেয়।

সাহিত্য-সমালোচনা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্য, সমাজ-নীতি ও সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আত্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মানুষ যে সকল মনের সৃষ্টিকে চিরন্তন মূল্য দিয়ে থাকে, চিরকাল রক্ষা করিবার যোগ্য ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করে, তাকে সাহিত্যে এবং আর্টে চিরকালের ভাষায় চিরকালের চিত্রে চিত্রিত করে। মানব-জীবনকে বড় করে দেখবার শক্তি সব চাইতে বড় শক্তি। যে আত্মসংযমের দ্বারা মানুষ বড় শক্তি পেয়েছে তাকে অবিশ্বাস করে যদি বলি সেটা পুরাণো ফ্যাসান, এখন তার সময় গেছে, তাহলে আমাদের মৃত্যু।"

সমাজ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—"সমাজ-ব্যবস্থা জন্য বাঁধাবাঁধি যে নিয়ম হয়েছে, সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে, সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু যে সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্ম্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না ইত্যাদি, সেগুলির ব্যতিক্রম কোনো কালে হতে পারে বলে মনে করি না।"

সমালোচনা সম্বন্ধে কবি বলেন, "যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নাই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করিনে।"—এ সব কথা রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন. তবে এখনকার কথাগুলি সুস্পষ্ট।

সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা রামায়ণের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার ব্যতি-ক্রমও যে কখনও হয় নাই এ কথা কে বলিবে? ব্যতিক্রম খুবই হইয়াছে, এবং আজ-কাল সাহিত্য যখন ব্যবসায়ের জিনিস, অধিকার ভেদ সকল ক্ষেত্র হইতেই নির্ব্বাসিত হইতে বসিয়াছে, মাসিক পত্রগুলি নির্ব্বিচারে যে কোন লেখা সাহিত্য বলিয়া প্রচার করিতে প্রস্তুত এবং পাঠক কুৎসিত রচনাই পাঠ করিতে ব্যগ্র, তখন এই ব্যতিক্রমের আধিক্যই যে দৃষ্ট হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উপদেশ মতে যে আধুনিক সব লেখকই চলিবেন তাহা আমরা আশা করি না।

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' বলিতে যাহা বোঝেন, আমাদের মনে হয় এখন অনেকে তাহা বুঝিতে চান্ না। 'সাহিত্য' কথাটির অর্থ এখন খুবই ব্যাপক। সাহিত্যে মানুষকে শুধু বড় করিয়া দেখিবারই চেষ্টা থাকিবে এ কথা বলিতে গেলেও সাহিত্যকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হয়। ধর্ম্ম সমাজ নীতি সবই দেশ-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, মিথ্যা বা প্রতারণা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র সমান ভাবে পরিত্যাজ্য একথাও আমরা নিঃসঙ্কোচে মানিয়া লইতে পারি না। কলুষিত সাহিত্য অনেক দেশেই আছে। তবে সমাজ-শাসনে সেগুলি সাধারণের নাগালের বাহিরে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আদর্শ বা ধর্ম্মকে সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত ও সীমাবদ্ধ না করিয়া যদি সমাজের পক্ষ হইতে কথা কহিতেন তাহা হইলে আমাদের কোন আপত্তি থাকিত না। শক্তিশালী লেখকের কলুষিত চিত্রও সাহিত্যে টিকিয়া আছে। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাহাকে নির্ব্বাসন করা চলে না, তবে সমাজ তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারে।

এই প্রবন্ধে কবি নিজের কথাই নিজে রিপোর্ট করিয়াছেন। অনেককে তিনি নিজেদের মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাহা করেন নাই। যে সভায় এই প্রবন্ধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে সে সভায় রবীন্দ্রনাথ একাই বক্তা—অন্যে যে দু'একটি কথা কহিয়াছেন তাহা না কহিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আত্মমত একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করিলেই বোধ হয় সরল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইত।

আমরা মনে করিয়াছিলাম প্রবন্ধে বিরুদ্ধদলের যুক্তিতর্কও কিছু

শুনিতে পাইব। কিন্তু কবি সে অবকাশ আমাদের দেন নাই।

সন্ধাভাষা—শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য। প্রায় দশ বৎসর হইল কোন কোন বঙ্গীয় লেখক বাংলা ও ইংরাজী রচনায় "সন্ধ্যাভাষা" এই শব্দটি প্রয়োগ করিতেছেন। লেখক এই প্রবন্ধে কথাটির প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে, তবে রচনা সাধারণ-পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য।

সম্পাদকের চিঠি। সুরমা উপত্যকার সাহিত্য-সম্মেলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্রকাশিত হইয়াছে। রচনায় জ্ঞাতব্য তথ্য নৎসামান্য।

জীবন স্মৃতি—রম্যা রলাঁ। Spinoza র দর্শন লেখক কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা। রচনা হৃদয়গ্রাহী, ভাবের প্রাচুর্য্যে কাব্যের মত।

যবদ্বীপের পথে—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবারে সিঙ্গাপুরের চীনাদের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় চিত্তাকর্ষক, রচনা বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

স্বরাজের যোগ্যতা—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই প্রবন্ধে সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়া, ভারতবাসী যে স্বরাজের যোগ্য, লেখক তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। রচনায় আড়ম্বর নাই, সাদা সিধা সত্য কথা। বিষয় সরল ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য—রবীন্দ্রনাথের মত নিম্নে সংকলিত হইল :—

"মানবমনের সমগ্রতা এবং বিচিত্র সম্ভবপরতাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার নিকট কেবলমাত্র চরকা চালনার দাবী করিলে তাহার শক্তিকে মূলে আঘাত করা হয়। * * চরকা কাটা একটা বাহ্য ক্রিয়া। * * কোন একটা অভ্যস্ত দৈনিক কর্ম্মকে যখনি ইষ্ট সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো যায়গা দেয় * * * আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা তাতে বাড়ানো হবে বলে আশঙ্কা করি।"

মহাত্মা গান্ধী কিন্তু 'চরকা কাটো' এ কথার মধ্যে একটা মহৎ অনুশাসনই জানাইয়াছিলেন। তিনি শুধু আঙ্গুলকে ডাক দেন্ নাই, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মাকেও ডাক দিয়াছেন। এ কথাও বলিতে পারা যায় তিনি শুধু আত্মাকে ডাক দিয়াই নিরস্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেন্দ্রিয়কেও ডাক দিয়াছেন।

হাউস্ অব্ লেবারস্ কুমিল্লা—কুমিল্লাস্থিত শ্রমিকদের একটি যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিবরণ। গুটিকতক ছন্নছাড়া নিঃসম্বল যুবক হেয় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া একমাত্র আত্মবিশ্বাস ও বিপুল কর্ম্ম-প্রেরণার বশে এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন।

সিটি কলেজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠি—এই পত্র হইতে জানিতে পারা যায় সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষগণ কোন গলদ করিয়াছেন কি না তাহা রবীন্দ্রনাথ জানেন না। যদি কোন গলদ হইয়া থাকে তাহা স্বতন্ত্র নালিশের অন্তর্গত এবং তাহায় বোঝাপাড়ার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা ও অবকাশ তাঁহার নাই। তাঁহার আলোচনার প্রধান বিষয় পূজার অধিকারের সীমানির্দ্দেশ। আমরা ছাত্রদের উপদ্রব ও রূঢ় আচরণের জন্য লজ্জিত। আবার একটি কলেজের কর্তৃপক্ষগণ একটা ভ্রান্ত ধারণা বা একগুঁয়েমির বশবর্ত্তী হইয়া যে ছাত্রদের শিক্ষার ভার লইয়াছেন তাহাদের পূজার অধিকারে বাধা দিবেন ইহাও একটা শোচনীয় ব্যাপার। হইতে পারে আইন তাঁহাদের পক্ষে। কিন্তু এতকাল এই স্বার্থপর আইন-পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। সিটি কলেজে সরস্বতী পূজা লইয়া গোলযোগ পূর্ব্বেও হইয়াছে।

কোনও পক্ষেরই এ ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতা আমরা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি না। এ বিষয়ে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

শিবের ভিক্ষা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিব ও শিবের ভিক্ষার একটা নূতন ব্যাখ্যা। কবির ভাবুকতার বিশেষ পরিচয় আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু। ভাষা ও বর্ণনা সুন্দর। সাধকের কথা অনেক পাঠকের মনোরঞ্জন করিবে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্যাটালগ—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী। সংস্কৃত সাহিত্যের একটা ছোটখাট ইতিহাস, লেখক আপনার ভাষা ও ভঙ্গীতে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। রচনা সুন্দর। লেখক এমন অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও গভীর তথ্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান কত উচ্চে এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা কত অধিক তাহাও লেখক অল্প কথায় অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন।

বিলাতের স্মৃতি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। এ সংখ্যায় যাত্রার পূর্ব্বপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবুকতায় ও বিবিধ সারবান সমালোচনায় প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। সর্ব্বত্র কবির নিরভিমান সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাজমহল—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তাজমহলের পুরাতন কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রবন্ধে নূতনত্ব কোথাও লক্ষিত হইল না।

বর্ত্তমান সাহিত্য—শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘটক। সাহিত্যের আধুনিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে লক্ষ্য করিয়া লেখক অনেকগুলি সারবান্ কথা বলিয়াছেন। তিনি শুধু সাহিত্যধর্ম্ম নয়, সমাজধর্ম্মের প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, "মতিমান শ্রীমান হিন্দু গৃহস্থকে এখন সাবধান হইতে হইবে। যে কোনও সাহিত্য বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত

নহে। কুলললনাদের অন্তঃপুরেই যথেষ্ট শিক্ষা হয় ও হইবে, এই দায়িত্ববিহীন নির্লজ্জ সাহিত্যের দ্বারা তাঁহাদের কল্যাণ সুদূরপরাহত।" উপদেশ ভাল, তবে কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। এখন আর সে অন্তঃপুর নাই। তাহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কুলললনাদের শুধু অন্তঃপুরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে অন্তঃপুরেও সংস্কার আবশ্যক।

রাজর্ষি ভর্ত্তৃহরি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। ভর্ত্তৃহরির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক সুপণ্ডিত। আমরা তাঁহার নিকট আরও সুসমম্বদ্ধ আলোচনা প্রত্যাশা করি।

মিথিলা ও জনক রাজগণের বিবরণ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত। নানা গ্রন্থ হইতে বিষয়টি সংকলিত হইয়াছে। বলিবার ভঙ্গী হৃদয়-গ্রাহী নয়। বিষয়টা পুরাতন হউক্, বলিবার ধরণটা নূতন হওয়াই আবশ্যক।

শ্রীরঙ্গম—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিচীনপল্লী ও শ্রীরঙ্গমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সামান্য। রচনাও কেমন একঘেয়ে—চিত্ত আকর্ষণ করিবার কোন কৌশলই লক্ষিত হয় না।

কুকুর—নানা দেশের কয়েকটি কুকুরের সুন্দর ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। কুকুরের উপকারিতা সম্বন্ধে যে কয়টি কথা বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত, না বলিলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

সংস্কৃত সাহিত্য—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। রচনায় সংযমের অভাব আছে। সংস্কৃত কাব্যের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া লেখক মাঝে মাঝে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়াছেন। তিনি স্থান বিশেষে টীকা টিপ্পনী না লিখিয়া মুলের সাদাসিধা অনুবাদ করিয়া দিলে বোধ হয় প্রবন্ধটি সুপাঠ্য হইত।

নারীজাগরণ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু। একটি ছোট সারবান্ প্রবন্ধ—নূতন কথা না হইলেও বঙ্গীয় পাঠকের নিকট আদৃত হইবে।

অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। চব্বিশ পরগণা সাহিত্যসম্মেলনে পঠিত। বঙ্গসাহিত্যের অনেক পুরাতন কথা লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুরাতত্ত্বের জন্য প্রবন্ধটির সমাদর হইবে। নূতন যুগের কথা লেখক একেবারে বাদ দিয়াছেন।

কবিতা

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ।

পরিচয়—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। শেষ কয় লাইনেই কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয় পাইলাম।

অকাল-বৈশাখী—শ্রীযুক্ত জীবনময় রায়। "জীর্ণ তরুর গান" এই সঙ্কেত দ্বারা কবি কবিতাটির মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়াছেন। ওস্তাদের গান শুনিয়া গুণী মাত্রই মুগ্ধ হ'ন, গুণীরই কাণের ভিতর দিয়া ওস্তাদের বীণাধ্বনি মরমে পশিয়া থাকে, কিন্তু ওস্তাদ না হইয়াও যদি কেহ হুবহু অনুকরণ করিয়া সেই ওস্তাদী-বীণার অনুকরণ পাঠকের হৃদয়-তন্ত্রীতে জাগাইতে পারেন তবে সুধী পাঠক সেই নবীন বীণা-বাদকের নিকটও কৃতজ্ঞ হ'ন। ঘরের আলমারীতে সাজান নকল-তাজমহল দেখিয়া আসল-তাজমহলের কথা মনে পড়ে; তাই নকল-তাজমহলের আদর। এই জন্যই সমালোচ্য কবিতাটি প্রশংসনীয়। বিষয়োপযোগী শব্দ ও ছন্দ নির্ব্বাচনে এবং রসের ক্রম-বিকাশে কবি বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

বিদায় ভেরী—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর। মামুলি বিদায়-বুলি। চন্দ্র-করে অধীর হইলে হয়ত পাঠক ইহাতেই 'ভেরীর' আওয়াজ পাইবেন; আমরা ত ভেঁপুর আওয়াজও পাইলাম না।

বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ।

স্বপ্ন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বোধোদয়ে পড়িয়াছিলাম "স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র।" সে বিশ্বাস পরে টলিয়াছিল 'ভয়ঙ্করী অল্প-বিদ্যার' লগুড়াঘাতে। কবিতাটি পড়িয়া কিন্তু বোধোদয়ের সাবেক 'বোধ'ই কায়েম রহিল। যথা :—

> চাওয়া পাওয়ার বুকের ভিতর
> না পাওয়া ফুল ফোটে,
> দিশাহারা গন্ধে তারি—
> আকাশ ভরে ওঠে।

অথচ তাঁহার কাব্যের অর্থ খুঁজিবার জন্য "পাণ্ডার দ্বারস্থ" হইতে কবি-গুরু মানা করিয়াছেন।

মায়া—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি-গুরু অনেক পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—"আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা।" সেই ভাবই এই কবিতাটির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে। তবে পূর্ব্বে যিনি শ্রোতা ছিলেন এবারে তিনি বক্তা হইয়াছেন—এইটুকু যা তফাৎ।

সনেট—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ। আত্মহারা প্রেমিকের মুখে এই যা' তা' শুনিয়া পাঠকও আত্মহারা হইবেন কিন্তু প্রেমে নয়।

সিন্ধুকূলে—হুমায়ূন কবির। আর একটু ছোট হইলে তবে জমাট বাঁধিত, কিন্তু তাহা হইলে আবার চৌদ্দ লাইন হয় না। কবিতার Formকে বেশী প্রধান্য দিলেই এই দোষ ঘটে। এই ধরণের কবিতার অতি-প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে প্রশ্ন ওঠে—সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে কবিদের

এই হৃদয়োচ্ছ্বাস, না কবিদের হৃদয়োচ্ছ্বাসের জন্যই সিন্ধুর তরঙ্গোচ্ছ্বাস। 'বীজাঙ্কুর' সমস্যার মত এ সমস্যারও বোধ হয় সমাধান নাই।

নিরাসক্ত—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। "পথে প্রবাসে" কবি যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন ও অভিনন্দন পাইতেছেন, আমারও কবির এই সম্মানে সুখী ও তৃপ্ত। কবি বোধ হয় আরও চান, তাই এই কণ্টকময় বিপদ-সঙ্কুল কাব্যকানন পথে তাঁহার সহসা প্রবেশ। কবিরাও নিরঙ্কুশ হইলেও 'অক্ষয় কবচাবৃত' নহেন। এই দুর্গম পথে কবির পথ হারাইবার বা কণ্টকবিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে; আমরা সেই জন্য শঙ্কিত।

দুর্লভ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী। কবিতাটিতে ভাব, ছন্দ, রস, অভিব্যক্তি—সব গুলিই দুর্লভ।

শেষ সাধ—শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু। করুণ রস উদ্রেকের প্রয়াসে রচিত। বেচারী মারা গেলে তাহার সমাধি মন্দির যেন একটি মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়—এই তার শেষ সাধ। এ সামান্য সাধটুকু কিছু অপূর্ণ থাকিবার কথা নয়, তবে যাহারা জীবনে তাহাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে তাহারাই ঐ বাতি জ্বালাইবে—মুমূর্ষুর এই সাধ পুরিবে কি না সন্দেহ। সমাধির উপর যদি 'মন্দির'ই নির্ম্মিত হইল তবে তাহাতে শুধু একটি 'মাটীর বাতি' কেমন বেখাপ্পা দেখায়।

সাবধানী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। রসাল মধুর ধ্বন্যাত্মক কবিতা। সংসারে রূপ রসের তরঙ্গিণী প্রবাহিত। সাবধানীরা তীরে দাঁড়াইয়া শুষ্ক থাকুক, বাহাদুরী লউক, কিন্তু অসাবধানীরা তাহাদের নিষেধ না মানিয়া এই প্রবাহে ঝাঁপ দিবেই দিবে। কবি সাবধানীর চিত্র আঁকিয়া অসাবধানীরই সংখ্যা বাড়াইলেন।

আঁধার রাতের গান—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। এ চুটকী সুরের গান আঁধার রাতে মোটেই মানায় না।

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

মাধবীলতা—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। মাধবীলতারই মত সরস মিষ্ট ভাবটিকে কবি কতকগুলি উপমার স্তূপে চাপা দিয়াছেন।

পথের সাথী—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। "রবিকর"-স্নাত এই কবিতাসুন্দরীর সুকোমল তনুখানি কবি নিজস্ব সুক্ষ্ম বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 'পথ' না পাইলে দেখিতেছি কবি কিছুতেই স্ফূর্ত্তি পান না। 'পথে-প্রবাসে'র কবির 'পথের সাথী' না জুটিলে কবিত্ব স্ফুরিবে কেন?

চির-অদর্শন—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তত্ত্ব-দর্শনের অদর্শন না ঘটিলেও কবিত্বের অদর্শন বটে।

নিরাশায়—মহারাজকুমারী ৺অনঙ্গমোহিনী দেবী। মহারাজকুমারীর সমগ্র কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেই তাঁর স্মৃতির প্রকৃষ্ট সম্মান করা হইবে।

দূরের গান—শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার চক্রবর্ত্তী। দূরের গান হইতে পারে, কিন্তু সুরের গান নয়।

তুমি—শ্রীমতী চারুবালা দত্ত গুপ্তা। ভাষা ও ছন্দ নিতান্ত মন্দ নয়, ভাবটি কিন্তু গতানুগতিক।

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ

দিনান্তে—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছেলে-বেলায় বাউল-বৈরাগীদের মুখে গান শুনিয়া প্রাণ-মন কেমন উদাস হইয়া যাইত, কিন্তু কারণ বুঝিতাম না। বড় হইয়া বাউলের গানে সে 'অকারণ পুলক' পাই নাই, সমালোচকদের তথা-কথিত সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে উহার কত দোষ-ত্রুটি ধরা পড়িত, তবুও মনে মনে একটা আফশোষ জাগিত সেই হারাণ বিরহানন্দের জন্য। বাউল-সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত এই অপরূপ মাধুর্য্য রবীন্দ্রনাথের চক্ষু এড়াইল না, তিনি ইহার বহিরঙ্গের সমস্ত ক্লেদ ধুইয়া মুছিয়া সুদক্ষ মণিকারের মত ইহার সমস্ত খাদ বাহির করিয়া ইহাকে কষিত কাঞ্চনে পরিণত করিলেন। আলোচ্য কবিতাটি উক্ত শিল্প-কার্য্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মানবের কাম্য ধন বাহিরে নাই, অন্তরেই আছে, এই বাণী আমরা চিরদিনই কাব্যে সঙ্গীতে বক্তৃতায় উপদেশে শুনিয়া আসিতেছি, রবীন্দ্রনাথও সেই কথাই শুনাইলেন, কিন্তু এমন সুরে শুনাইলেন যে ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইল।

পঞ্জাব—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পঞ্জাবের অতীত মহিমা ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশার আভাস দিয়া কবি একটি উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাব-প্রকাশের উপযোগী ছন্দ নির্ব্বাচন করিলে কবি অধিকতর সাফল্য লাভ করিতেন বলিয়া মনে হয়। জালিয়ানা বাগের ব্যাপারটি ত নিশ্চয়ই আধুনিক, উহাকে কবি কি চক্ষুতে দেখিয়াছেন ঠিক বোঝা গেল না। পদের অন্তর্গত মধ্যমিলের খাতিরে স্থানে স্থানে ভাব-প্রকাশের বাধা আসিয়া পড়িয়াছে।

মৃত্যু-আহ্বান—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কুণ্ডার। কবি মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছেন জীবন-কারার মুক্তি স্বরূপে। এই ভাবটিকেই কেন্দ্র করিয়া কবিতাটি রচিত এবং ফলে ইহার পরিপোষক কতকগুলি ভাব সহচর হিসাবে আসিয়া জুটিয়াছে—Laws of association অনুযায়ী। কাজেই কবিতাটি কতকটা mechanical হইয়া উঠিয়াছে; তবু বলিতে হইবে রচনা মিষ্ট ও সরস।

শিশুর প্রতি—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল। এই শিশু, বিশ্ব-কবির 'উর্ব্বশীর' সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার প্রয়াসী। কিন্তু কবিগুরুর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই উর্ব্বশীকে এই দুর্দ্দৈব হইতে বাঁচাইয়াছে—তাই গোড়াতেই তিনি উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন—'নহ মাতা' বলিয়া। উর্ব্বশীর কোলে শিশু মানায় না। তবে একটা বড় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কবিতাটি রচিত হওয়ায় মৌলিকতার অভাব ঘটিলেও কবিতাটিতে কারু-কার্য্যের নিতান্ত অভাব নাই।
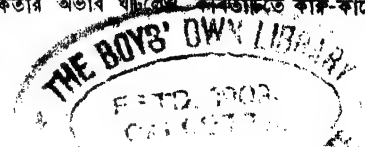
বৈশাখী—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। এ মহারুদ্রের উদ্দণ্ড নৃত্যের তালে আত্ম-বিসর্জ্জন নয়, নৃত্য-পরায়ণ নটরাজের চটুল চঞ্চল চরণে এ যেন আত্ম-নিবেদন। এই আত্ম-ত্যাগে সুখ আছে, শান্তি আছে, সান্ত্বনা আছে। কাল-চক্রের আবর্ত্তনে যে কোথাও ফাঁক নাই, কোথাও ফাঁকি নাই, কবি এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়া পাঠকের মনে অনুরূপ অনুভূতি প্রকাশের প্রয়াস করিয়াছেন।

স্বরূপে ফিরেছ এবে রাজরাজেশ্বরী—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। (রবীন্দ্র নাথের অষ্টাষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে রচিত)। কবির বক্তব্য এই যে, দেবী সরস্বতীর পূর্ণ মূর্ত্তি বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাসের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাই তিনি নানা কাব্যে সম্পূর্ণাঙ্গ সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন ; আর এত দিন পরে সেই দেবী পূর্ণ প্রতি-ভাত হইয়াছেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরে, এবং কালিদাসের পর রবীন্দ্রনাথই সরস্বতী মাতার প্রকৃত ষোড়শোপচারে পূজা তাঁহার অসংখ্য ও অতুলনীয় কাব্যে প্রচার করিয়া অমর হইয়া রহিলেন। মধ্যবর্ত্তী কবিগণের উপর মার ষোল-আনা কৃপা ছিল না, তাই ভবভূতি, মাঘ, বাণভট্ট, ভারবি, জয়দেব, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, হেম, বঙ্কিমচন্দ্র কেহই মার 'স্বরূপ' অর্থাৎ রাজ-রাজেশ্বরী রূপ দেখিতে পান নাই। কবি-গুরুর জন্ম-তিথি উপলক্ষে শিষ্যাভিমানী কবির এই অর্ঘ্যাঞ্জলি, compliment হিসাবে অপূর্ব্ব বটে! রাজকবি কালিদাস কি কেবল নাম-মাহাত্ম্যেই বাঁচিয়া গেলেন ?

রিক্ত—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার রায় চৌধুরী। রচনা অনেকটা রঞ্জনেরই মত। অতিরিক্ত মশলা দিলে ব্যঞ্জন তিক্ত হয়, আবার মশলা-রিক্ত ব্যঞ্জনও স্বাদু হয় না। কবিতায় ব্যঞ্জনা একটা বিশেষ গুণ, কিন্তু তা বলিয়া অস্পষ্ট হইলেই সে কবিতা ব্যঞ্জনাময় হইবে এ ধারণা ভুল। আলোচ্য কবিতাটিতে এই দোষ ঘটিয়াছে।

দ্বন্দ্ব—শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য। নিম্নলিখিত গভীর গবেষণা দ্বারা কবি গোলাপের লাল রংএর কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন—গোলাপ আগে ধপধপে সাদা ছিল, "কবি-প্রিয়াও" তথৈবচ। হঠাৎ তর্ক উঠিল কে বেশী সুন্দর অর্থাৎ সাদা, (বাজী রাখা হইয়াছিল কি না এ সম্বন্ধে কবি নীরব)। প্রিয়া জিতিল, গোলাপ হারিল এবং সেই অবধি পরাজয়ের লজ্জায় গোলাপ লাল হইয়াই রহিল। প্রিয়া বোধ হয় আর রং বদলাইলেন না! Botanyর পুস্তকে এই গবেষণা স্থান পাওয়া উচিত।

কালিদাস কবি—৺মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ। সরস গম্ভীর রচনা। এ শ্রেণীর রচনা আজ কাল যেন উঠিয়া যাইতেছে।

বৈশাখ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায়। কবিতাটির ছন্দে ছন্দে বৈশাখের রুদ্র তাপস মূর্ত্তি দেদীপ্যমান। মৌলিকতার প্রশংসা করিতাম যদি না কবিগুরু বহু পূর্ব্বে লিখিতেন—'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' ইত্যাদি!

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার নিয়োগীর প্রতি—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কাব্য রচনার কৈফিয়ৎ কবি প্রকৃষ্ট রূপেই দিয়াছেন। কবি দেখিতেছি দৈনিক সংবাদ-পত্রের নিয়মিত পাঠক, শুধু তাই নয়, উহাতে তিনি রসও পাইয়া থাকেন। বসুমতী সর্ব্বংসহা বটে।

নবীন বর্ষ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। নব বর্ষের সম্ভাষণ। নিতান্ত মামুলি।

ইচ্ছামতীর প্রতি—৺মুণীন্দ্রনাথ ঘোষ। সংযত ও সরস-মধুর কবিতা, অর্থ বুঝিতেও গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয় না।

প্রলয়—শ্রীযুক্ত জ্ঞানঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। এ কিসের প্রলয় নিম্নে কয়েক ছত্র হইতে মালুম হইবে—

বাজিবে ভীষণ ঠন্ ঠন্ ঠন্
অঙ্গে ভূষিত হাড়ের ভূষণ,
* *
থর থর থর কাঁপিবে ধরণী
কড়্ কড়্ কড়্ পড়িবে অশনি
চড়্ চড়্ চড়্ মেদিনী বিদারী পাহাড় উঠিবে ঠেলি,
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলিবে অনল লক্ লক্ জিহ্বা (?) মেলি,
রুষিয়া রুষিয়া ফুসিয়া ফুসিয়া গর্জ্জিয়া পারাবার"—ইত্যাদি

আর কিছু নাই হ'ক ছন্দ লয়ের ত প্রলয় বটেই!

প্রাণের টানে—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন

'পরিত্রাণায় চ সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এই কবিতায় কবি কালিদাস বলিতেছেন—

"দূরে র'য়েও এক নিমেষেই পাপের শাসন করতে পারো
ভক্তগণের প্রাণের টানে না এসে যে থাকতে নারো,
মিথ্যে কথা যুগে যুগে নামো পাপের আস্ফালনে,
প্রেমের আকুতিতেই তুমি—আসো ধরার আলিঙ্গনে।"

ভক্ত হৃদয় দিয়া দেখিলে কবির উক্তি অসমীচীন বলিয়া মনে হইবে না—এবং গীতার উক্তির সহিত ইহার কোন অসামঞ্জস্যও বোধ হইবে না। তবুও ভাবি, গীতার উক্তিকে 'মিথ্যা কথা' না বলিয়া, আর একটু নরম সুরে লিখিলেই কবি ভাল করিতেন।

ধর্ম্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ।

সংসারে থাকিতে গেলে ইচ্ছা না করিলেও বাধ্য হইয়া অন্যায় বা

পাপ করিতে হয়, যেমন চলিতে ফিরিতে আমাদের পায়ের চাপে অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণী মারা যাইতেছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার সময়, গৃহ-সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিবার সময় কত প্রাণী আমরা হত্যা করিয়া ফেলিতেছি। যদি বলি "এ সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রাণিবধ করিবার কোন ইচ্ছা নাই, নিশ্বাস না লইলে বাঁচিব কি করিয়া"—তাহা হইলেও পাপের ক্ষালন হয় না। তাহা হইলে পাপ হইতে কেমন করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায়? মহর্ষি মনু এবম্বিধ পাপ হইতে মুক্ত পাইবার নিমিত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহ যদি কোনও মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলে, সেই অন্যায় কার্য্য করায় তাহার কোনও পাপ হয় না। পঞ্চ মহাযজ্ঞ এইরূপ পাঁচটি মহৎ কর্ম্ম :—

"অধ্যাপনা ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্।"

অধ্যাপনা হইতেছে ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দৈবযজ্ঞ, বলি ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিগণের পূজা নৃযজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞতত্ত্ব লেখক মহাশয় অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কথা-সাহিত্য

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

দৈবাৎ—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। আখ্যানবস্তুর মধ্যে যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে। মোহিনীর চরিত্র উপভোগ্য।

অনাগতের আতঙ্ক—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু। আখ্যায়িকা মন্দ নহে। তবে পরিকল্পনার মাত্রা একটু বেশী দূর গিয়া পড়িয়াছে।

ডোরা—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ডোরা খৃষ্টান নার্শ। নিরঞ্জন ধনী জমিদারের সন্তান। টাইফয়েড্ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া নিরঞ্জন শুশ্রূষার জন্য ডোরাকে নিযুক্ত করিল। ডোরা অক্লান্ত পরিশ্রমে নিরঞ্জনকে সুস্থ করিয়া তুলিল।......নিরঞ্জন পিতৃহীন। রামু তার পিতার আমলের ভৃত্য। নিরঞ্জন ডোরার সম্বন্ধে এক দিন রামুকে বলিল—আমি মনে স্থির করেছি যদি বিয়ে করি ডোরাকে ছাড়া আর কাউকে করব না।......রামু ইহাতে বলিল—ছি, দাদাবাবু ও কথাটা তুমি মুখেও এনো না......ঐ ডোরা তোমার আপন বোন্। নিরঞ্জন রামুর কাছে ডোরার জন্ম-রহস্য শুনিল।......ডোরার মা তার পিতার রক্ষিতা ছিলেন, ভবানীপুরে থাকিতেন—সেইখানেই ডোরার জন্ম হয়, তখন নিরঞ্জনের বয়স তিন কি চার। নিরঞ্জনের মা জানিতেন না,......প্রথমে কেহ জানিত না, শেষে মামাবাবু জানিয়াছিলেন। নিরঞ্জনের পিতার মৃত্যুর পর মামাবাবু ডোরার মার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতেন। ডোরার নাম ছিল তখন পুঁটি। মিশনারীরা ডোরা নাম রাখিয়াছিল। ডোরা যখন পাঁচ বছরের তখন তার মার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর যা কিছু সম্পত্তি মিশনারীদের ফণ্ডে দান করিয়া যান। আর বলিয়া যান, মেয়েটিকে যেন তাঁর মৃত্যুর পর উঁহারা লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করেন ও ভাল পাত্র দেখিয়া বিবাহ দেন।

নিরঞ্জন রামুর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে ডোরা এ সমস্ত জানিতে পারিয়াছে এবং আপন ভাই জানিয়াই প্রাণ দিয়া তার সেবা করিয়াছে।......মামাবাবু ডোরাকে তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেই সে কর্ত্তার নাম করিয়াছিল। পরে তার মা বাপের একখানি ফটোও দেখাইয়াছিল।......নিরঞ্জন মামাবাবুকে চিঠি লিখিল এবং তাঁহার মত লইয়া নিরঞ্জন তাহার বোন্‌টিকে নার্শেস্ হোম হইতে বাড়ী লইয়া আসিল। শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তান্তে ডোরার নতুন নাম হইল কমলা,—এবং পরবৎসর যোগ্য পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ।

মরু-মায়া—শ্রীমতী সীতা দেবী। চলনসই। তবে 'মৌচাক' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পত্রিকায় স্থান হইলে ইহার আদর হইত।

বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ।

কাণা-কড়ি—শ্রীযুক্ত জগদীশরঞ্জন রায়। গল্পটির সারাংশ ভাল। লেখকের ভঙ্গিমাটিও মন্দ নয়। তবে স্থানে স্থনে উপমার ঠেলায় পাগল হইয়া যাইতে হয়। যথা,—নদীর কিনারে কিনারে......খালের ধারে বাজপরা মাথাকাটা.........ইত্যাদি। লেখক এই লম্বা লম্বা উপমার নেশাটুকু কাটাইয়া ফেলিতে পারিলে ভাল গল্প লিখিতে পারিবেন।

কামার-দাদা—শ্রীযুক্ত বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার মধ্যে রস খুঁজিয়া পাইলাম না। কামার-দাদা নদীর ধারে হাটে নিজের কায করিত। তিন বৎসর পরে হাট উঠিয়া গিয়া সেখানে পাটকল বসিল। কামারদাদা হইল কুলির বড়-সর্দ্দার। বিবাহ করিল,—স্ত্রী-কন্যা লইয়া সংসারযাত্রা সুরু করিল। ইহাই গল্পের সারাংশ।

গানের পালা—শ্রীযুক্ত সমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিশেষত্ব কিছুই নাই। চলন-সই!

শেষ-আলো—শ্রীযুক্ত কৃপানাথ মিশ্র। নূতনত্ব কিছুই নাই। লিখিবার ধারার মধ্যেও এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহাতে পুরাতনকেও উপভোগ্য করা যায়।

ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ।

চাকর—শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। বড় গল্প অথবা ছোট উপন্যাসও বলা চলে। প্রথম দিক্‌টা একটু একঘেয়ে রকমের—শেষের দিক্‌টা বেশ মর্ম্মস্পর্শী!

পরিচয়—শ্রীমতী আশালতা দেবী। ইহাকে যে কেন গল্প বলা হইয়াছে, বুঝিলাম না। ইহা যে কি তাহা বলাও দুঃসাধ্য।

শেষ-কাজ—শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ। মন্দ নয়। লেখা ভাল, ছোট গল্প বলিবার ক্ষমতা আছে।

চিত্র

বিচিত্রা—জ্যৈষ্ঠ।

১। 'দ্বিপ্রহর'—তিনবর্ণের। শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানিতে সার্থকতা অনেকটা আছে।

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ।

২। 'মিলন স্বপ্ন' (মেঘদূত), তিনবর্ণের। শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ মজুমদার। আর একবার এই শিল্পী সম্বন্ধে বলিয়াছি ইঁহার রঙের কতকটা জ্ঞান আছে, কিন্তু ড্রয়িং কাঁচা। পারস্পেক্‌টিভ জ্ঞান আরও অল্প। খাঁচায় দাঁড়কাক দেখিলাম—নয়ত ওটা কি পাখী? আকারে প্রকারে আর কিছু বুঝায় কি?

৩। 'আদর্শ স্বামী'—তিনবর্ণের। শিল্পী—শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানি ব্যঙ্গচিত্র বোধ হয়। উপহাসটা কি দর্শকের উপর হইয়াছে?

৪। 'তৃষিত নয়নে,বসে পথপানে নীরবে ব্যাকুল রামা'—রবীন্দ্রনাথ। তিনবর্ণের। শিল্পী—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাসগুপ্ত। আহা কিবা অপরূপ পেখলুঁ রামা! রবীন্দ্রনাথ, সাবধান।

৫। 'জামাই-ষষ্ঠী'—তিনবর্ণের। শিল্পী—শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য তিন নম্বর অনুযায়ী।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ।

৬। 'ভিখারী'—তিনবর্ণের। শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (শান্তিনিকেতন)। প্রায় ঠকিয়াছিলাম শান্তিনিকেতনের নাম দেখিয়া। কিছুই বুঝিলাম না ছবি দেখিয়া। আর্কিটেক্‌চারটা বাঁকাপথ ধরিয়াছে। দূরে, অতিদূরে সোপানশ্রেণী কোন্ অন্ধকূপের দিকে চলিয়াছে। বাঁকা সিঁড়ি বাহিয়া, বাঁকা দেওয়াল হাতড়াইয়া রমণী অগ্রগামিনী, অষ্টাদশ ইঞ্চি পরিমিত উচ্চ ধাপে উঠিতে আয়াসক্লিষ্টা, পশ্চাতে বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত ভূতপূর্ব্ব যুবক। আমরা বলি, হে ওসমান! তুমি এ বয়সেও আয়েষার আশা ত্যাগ করিতে পারিলে না? নিরস্ত হও, হয়ত বা পিসা-নগরী লীনিং টাওয়ারের অনুরূপ এই গৃহ এখনই তোমার অগ্রাহাতিশয্যে ভূশায়ী হইবে।

আর আছে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কয়েকখানি উডকাট ইত্যাদি ছবি। অনুধাবনযোগ্য।

ভারতবর্ষ—ঐ

৭। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—তিন বর্ণের। শিল্পী শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র। ছবিখানি চলিতে পারে। পারস্পেক্‌টিভের দিকে আরও একটু নজর থাকা উচিত।

৮। সানাই—তিন বর্ণের। শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বাস্তব ও আলঙ্কারিকের মিশ্রণ সত্ত্বেও ছবিখানি মন্দ হয় নাই। কম্পোজিসনের দোষ আছে। তবলচি ও করতাল বাদকের অধমাঙ্গ সহসা চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি।

৯। বৃন্তচ্যুত—তিনবর্ণের। শিল্পী শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার। ভাল হইয়াছে। ইহাকে লম্বা প্যানেল আকারে আঁকা উচিত ছিল। তাহাতে ছবিখানির রিলিফ হইত।

ভাববোধিনী টীকা

আমাদের নবকুমার খুড়ো বলিতেন, "বাপুহে, শ্রোতা নইলে গান জমে না।" আমরা বলিতাম, "তাহলে খুড়ো তোমার গান আমাদের কাছে জমে কি করে?"

"তোরা পাঁড় মূর্খ! কথাটা যাই বলে থাকি না কেন, মনে হচ্চে যে তোদের অন্তরের কাছে আমার গানটা পৌঁছায়, কানটার কাছে ফস্‌কে গেলই বা।"

খুড়ো ঠিক বলিয়াছিলেন। আমাদের বাহ্যিক চাঞ্চল্য স্বত্ত্বেও অন্তরটা খুড়োর কাছে স্থির হইয়া থাকিত। তার অনুভূতির আনন্দে খুড়ো বিভোর হইয়া গান করিতেন। গায়ক এবং শ্রোতার মধ্যে একটা মিল ছিল।

তেমন মিল আমাদের শিল্পী এবং দর্শকদের মধ্যে হয় না কি? আমরা বিশ্বাস করি যে তা হয়, যদি তার মধ্যে সত্য থাকে। খুড়ো বলিতেন,—

অসাধ্য সাধিতে পারি সত্য যদি পাই,
মেকির আশ্রয় নিলে শুধু নিদ্রা যাই।
ইষ্টলোভে কষ্ট করি কৃষ্ণপদ পাব,
তুড়ি দিয়ে মেরে দি' ত ব্যাসকাশী যাব।

বৈদেশিকী
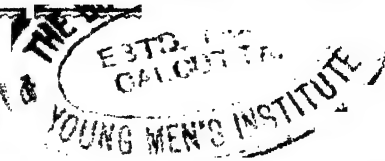
সাহিত্য

চীনের পুরাণ—দেবদারুবৃক্ষ-প্রসঙ্গ।

চীনের পুরাণ মতে দেবদারুবৃক্ষের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। বৃক্ষ চিরশ্যামল বলিয়া চীনাদের বিশ্বাস যে উহাতে পরমসত্ত্ব বর্ত্তমান। চীনদেশীয় কোন প্রাচীন ঋষি বলেন যে বৃক্ষজগতে দেবদারুবৃক্ষই চিৎশক্তি-সম্পন্ন ও অমর, কারণ ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত তাহাদের অবস্থান্তর ঘটে না। সহস্র বৎসরের প্রাচীন দেবদারুবৃক্ষ কুকুর বা মনুষ্যাকৃতি ধারণ করে, এবং ৩০০০ বৎসরের পুরাতন দেবদারু শাখার মধ্যে একপ্রকার বৃক্ষনির্য্যাস জন্মিয়া থাকে, তাহা সেবন করিলে ৫০০ শত বৎসর পরমায়ু হয়। চীনের পুরাণে দেবদারুবৃক্ষ-সম্পর্কে বহু গল্প আছে—তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৃদ্ধ হানা সাকো জিজির কথা।

বৃদ্ধ হানা সাকো জিজির 'শিরো' নামে এক অদ্ভুত কুকুর ছিল। একদিন কুটীরসংলগ্ন উদ্যানের একস্থানে শিরো বার বার আঘ্রাণ লইয়া ঘন ঘন ডাকিতে থাকে। জিজি প্রথমে গ্রাহ্য করে নাই, কিন্তু অবশেষে কৌতূহলী হইয়া সেই স্থানটী খনন করিয়া দেখিল যে, তাহা স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডে পরিপূর্ণ। এক ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশী তাহা গোপনে লক্ষ্য করিয়াছিল। বৃদ্ধের নিকট হইতে শিরোকে সে লইয়া গিয়া নিজ উদ্যানে স্বর্ণ-রৌপ্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিল। একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে সে তাহা খনন করিয়া দেখিল যে, সেই স্থানটী আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। এইরূপে নিরাশ হইয়া সেই লোকটা কুকুরটীকে হত্যা করিয়া তাহার দেহ এক দেবদারুবৃক্ষতলে সমাহিত করিল। ক্রমে সেই সংবাদ বৃদ্ধ জিজির কর্ণগোচর হইল এবং সে শিরোর শোকে কাতর হইয়া নিত্য সেই বৃক্ষতলে পুষ্প ও ধূপ দান করিয়া অশ্রুনিক্ষেপ করিতে লাগিল।

একদিন রাত্রে বৃদ্ধ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল—যেন শিরো বলিতেছে, "দেবদারুবৃক্ষ কাটিয়া তাহা হইতে উদূখল প্রস্তুত করিবে এবং সেই সময় আমাকে স্মরণ করিবে।"

স্বপ্নাদেশমত কার্য্যকালে উদূখলটী স্বর্ণখণ্ডে পরিপূর্ণ হইতে দেখিয়া, বৃদ্ধ জিজির আনন্দের সীমা রহিল না। অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ ধনী বলিয়া পরিচিত হইল।

সেই স্বার্থপর প্রতিবেশী গোপনে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া একদিন জিজির নিকট হইতে উদূখল চাহিয়া লইল। সরলপ্রাণ বৃদ্ধ পূর্ব্বকথা ভুলিয়া তাহাকে উদূখলটী দিল। সেই পরশ্রীকাতর লোকটির স্পর্শেই উদূখল আবর্জ্জনায় ভরিয়া উঠিল। তাহাতে সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উদূখল দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

সেই রাত্রেই শিরোর আত্মা বৃদ্ধকে স্বপ্নে বলিল, "তুমি উদূখল ভস্ম কিঞ্চিৎ লইয়া শুষ্ক প্রায় বৃক্ষে নিক্ষেপ কর।" পরদিবস প্রাতে বৃদ্ধ তাহা করিল এবং শুষ্ক বৃক্ষ মঞ্জরিত হইতে দেখিয়া তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেই দিন হইতে বৃদ্ধ নগরের পথে পথে এই নূতন আবিষ্কার ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বহু নগরবাসী তাহার শক্তি পরীক্ষা করিয়া মুগ্ধ হইল।

ক্রমশঃ এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তিনি বৃদ্ধকে ডাকাইয়া তাঁহার উদ্যানের মৃতপ্রায় বৃক্ষগুলির ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকেও চমৎকৃত করিয়া আশাতীত পুরস্কার লাভ করিল। সেই দুষ্ট প্রতিবেশী, বৃদ্ধ জিজির এই নূতন ভাগ্যপরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া গোপনে সমস্ত সংবাদ লইল এবং সেই উদূখলভস্ম সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধ জিজির ন্যায় তাহার অত্যাশ্চর্য্য শক্তির কথা নগরমধ্যে প্রচার করিয়া দিল।

যথাসময়ে সম্রাটের নিকট হইতে দূত আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। চতুর বাক্যবিন্যাসে সকলের মন আকর্ষণ করিয়া সম্রাটের আদেশমত সে এক শুষ্কবৃক্ষে সেই ভস্ম নিক্ষেপ করিল। বৃক্ষের ত নব-জীবন সঞ্চারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, উপরন্তু বায়ুতাড়িত ভস্মকণা সম্রাটের চক্ষে প্রবেশ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। সম্রাট ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া সেই লোকের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিলেন এবং শিরোর আত্মাও তৃপ্ত হইল।

জাপানীরা বলিয়া থাকে যে, দেবদারুবৃক্ষেই রতি-দেবীর অধিষ্ঠান। জাপানের অন্তর্গত টাকাসাগো নগরে দ্বিকাণ্ডবিশিষ্ট এক অতি প্রাচীন দেবদারুবৃক্ষ আছে, তাহাতে কুমারী দেবী বাস করিতেন। একদিন ইজানাগির পুত্র তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করে এবং দম্পতী দীর্ঘকাল সুখে অতিবাহিত করিয়া একত্রে একই মুহূর্ত্তে ইহলীলা সম্বরণ করে। এখনও তাহারা মানবদেহ ধারণ করিয়া অমরত্বপ্রদায়ক দেবদারুশলাকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। জোওউবা নামক অপর এক লোলচর্ম্ম স্থবির আত্মা-দম্পতীও দেবদারুবৃক্ষে বাস করে। দেবদারুশলাকা সংগ্রহকাল জো'র হস্তে বিদা ও উবার হস্তে ব্যজনী দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্যোৎস্নামাত মর্ত্ত্যশ্রী উপভোগ করিবার জন্য প্রত্যহ চন্দ্রবালা জ্যোৎস্না বাহিয়া দেবদারু বৃক্ষতলেই অবতরণ করেন।

ভেষজ-প্রসঙ্গ।

চীনের পুরাণে অধিকাংশ স্থলে অমরত্ব ও দীর্ঘজীবনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং সেইকল্পে বহু দুর্লভ ভেষজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

স্ত্রীরোগে "সাংসি" একটি মহৌষধ বলিয়া খ্যাত, এমন কি উহার নিয়মিত সেবনে বন্ধ্যার পুত্র প্রসবও সম্ভব হয়। ঐ ভেষজ দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে পাওয়া যায়। এই "সাংসি" ভেষজ একজাতীয় ধূসরবর্ণ ছাগের প্রিয়খাদ্য এবং সেই ছাগের রক্ত, উচ্চস্থান হইতে পতনজনিত রক্তস্রাবে পরম উপকারী। ইহা পরীক্ষা করিয়া একজন ইংরাজ ধর্ম্মপ্রচারক "The Chinese Traveller" পুস্তকে ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

চীনদেশীয় মহৌষধের মধ্যে "জিন্‌সেঙ" অন্যতম। ইহা সঞ্জীবনী শিশীরবৃক্ষের ন্যায় অমরলোকেই জন্মিয়া থাকে। স্ত্রী-মৎস্যের মাংস সহ ইহা সেবন করিলে কয়েক সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতে পারা যায়। এক সময়ে এই "জিন্‌সেঙ" ঔষধের জন্য তাতার ও চীনাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। তাতার জাতি যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং "জিন্‌সেঙ" ক্ষেত্র অধিকার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। চীনাদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

আয়ুর্বৃদ্ধিকর বলিয়া চীনদেশে চা ব্যবহৃত হয়। রক্ত শোধন, মেধাশক্তি বৃদ্ধি ও অজীর্ণ নিবারণ—এই কয়টী চায়ের প্রধান গুণ। ইহা সেবন জন্য চীনদেশে বাতরোগের প্রাদুর্ভাব নাই।

"হুচু" নামক অপর বনৌষধির উৎপত্তির একটী গল্প আছে। এক ব্যক্তি পর্ব্বতারোহণকালে এক গভীর ঢালুস্থানে পতিত হয়। একেই ত মসৃণ পর্ব্বতগাত্র, তাহার উপর উচ্চস্থান হইতে পতন জনিত আঘাতে সে কাতর হইয়া পড়িল। ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সে নিকটেই "হুচু" দেখিয়া তাহা সেবন করিল। অল্পক্ষণ পরেই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া তাহার যথেষ্ট স্ফূর্ত্তির উদয় হইল এবং স্বদেশ ও স্বজন ভুলিয়া সেই স্থানেই সে "হুচু" সেবনে কাল কাটাইতে লাগিল।

একদিন এক ভূমিকম্পে তাহার পথ মুক্ত দেখিয়া সে সানন্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। আপন গৃহে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল যে, কতকগুলি অপরিচিত ব্যক্তি সেই গৃহে বাস করিতেছে। সে তাহাদের অনধিকার প্রবেশ প্রতিপন্ন করিয়া তাহাদের সহিত বিবাদ বাধাইল এবং নির্য্যাতিত হইয়া সে গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করিয়া সে কোথাও তাহার পরিবার-বর্গের বা কোন পরিচিতের সন্ধান পাইল না। অবশেষে তাহার কাতরতায় এক বৃদ্ধের দয়া হইল। তিনি

তাহাকে লইয়া গিয়া "জন-পরিচয় পুস্তকে" দেখিলেন যে সেই নামের একব্যক্তি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল এবং হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া যাওয়ার পর আর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সেই ব্যক্তি তখন পর্ব্বতকন্দরে অতিবাহিত তাহার জীবন-কাহিনী ও "হুচু" সেবনের কথা বিবৃত করিল। সেই অবধি "হুচু" মহৌষধি বলিয়া খ্যাত। "হুচু" কেশহীনতা রোগ নিবারণ ও নবযৌবন প্রাপ্তির মহৌষধ।

একদিন ওয়াংচি নামক এক তাও পুরোহিত জ্বালানি কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন। একটী গুহামুখে উপস্থিত হইয়া তিনি কয়েকটী বৃদ্ধকে দাবা খেলায় মত্ত দেখেন। ওয়াংচি দাবা খেলা জানিতেন, সেই জন্য একপার্শ্বে কুঠার রাখিয়া তিনি তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এইভাবে কাটাইয়া তিনি ক্ষুধা বোধ করিলেন। প্রস্থান জন্য যেমন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজন যেন তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই একটী খর্জ্জুরের ন্যায় ফল দিয়া বলিল, "এইটী চোষণ কর।"

ওয়াংচি তাহা চোষণ করিয়া বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলেন এবং অল্পক্ষণ পরে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া গেলেন। দাবা খেলা চলিতে লাগিল। ওয়াংচির মনে হইল যেন কয়েক ঘণ্টা মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে এবং অপর সকলেও বলিল, "তুমি বহুক্ষণ আসিয়াছ।" ওয়াং চি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কুঠার লইতেই, কুঠারদণ্ড জীর্ণের ন্যায় তাঁহার মুষ্টিমধ্যে চূর্ণ হইল।

স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ওয়াংচি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি দুই শতাব্দী অনুপস্থিত ছিলন। যে বৃদ্ধেরা দাবা খেলিতেছিলেন, তাঁহারা ষ্টেন লুঙ্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত অমর ঋষি।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাউফার বলেন যে, উক্ত খর্জ্জুরের ন্যায় ফল একজাতীয় কুল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সঙ্কলন

১। উপাসনা মন্দিরের জন্য চীনামাটির ঘণ্টাশ্রেণী—

জার্ম্মাণীর অন্তর্গত মাইসেন গির্জ্জার জন্য সম্প্রতি এই নূতন ব্যবস্থা হইতেছে। প্রত্যেক ঘণ্টার কারুকার্য্যের বিভিন্নতাবশতঃ সুরের ঐক্য থাকে না, সেইজন্য প্রস্তুত-কালেই উহাদের স্বরসঙ্গতি ঠিক করিয়া লওয়া হয়।
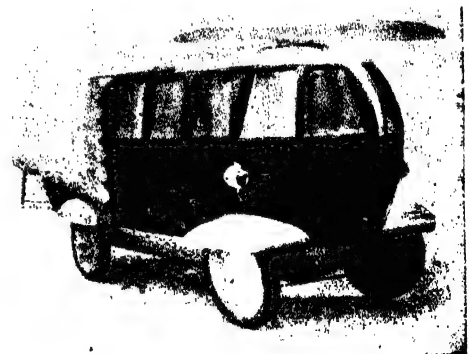
২। হাওয়াগাড়ী, প্রমোদতরণী ও বিমানপোতের একত্র সংযোগে অভিনব যান—

যন্ত্রের সামান্য পরিবর্ত্তনে ইচ্ছামত এক এক সময়ে এক একটী যান চালিত হয়।
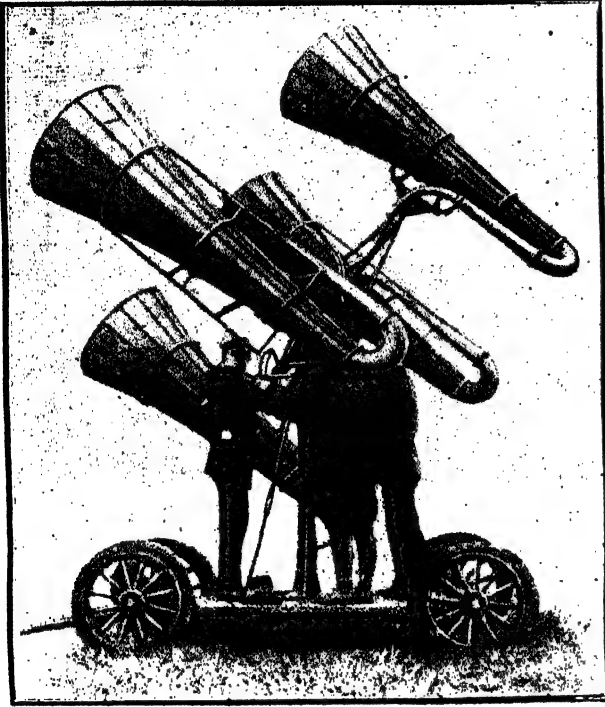
৩। শত্রুপক্ষীয় বিমানপোতের গতি-বিধি নির্ণয়ার্থ গোলন্দাজদিগের জন্য এই অতিশক্তিসম্পন্ন শব্দসংগ্রাহক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪। একত্র নৌকা ও দ্বিচক্রযান :—ইহার সাহায্যে মাস্তুলদণ্ডেও আরোহণ করা যায়, আবার ইহার সহিত যে ক্যাম্বিস কাপড় থাকে, তাহা ঠিক মত লাগাইয়া লইলে ইহা নৌকারূপেও ব্যবহৃত হয়।

৫। অতিকায় জলকীট ভেককে আক্রমণ করিয়াছে।

৬। পুলিন্দাবন্ধন যন্ত্রঃ—এতদ্দ্বারা মিনিটে ৪০ টী পুলিন্দা বন্ধন সম্ভব বলিয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে যথেষ্ট সময়-সংক্ষেপ ও শ্রমলাঘব হইবে।
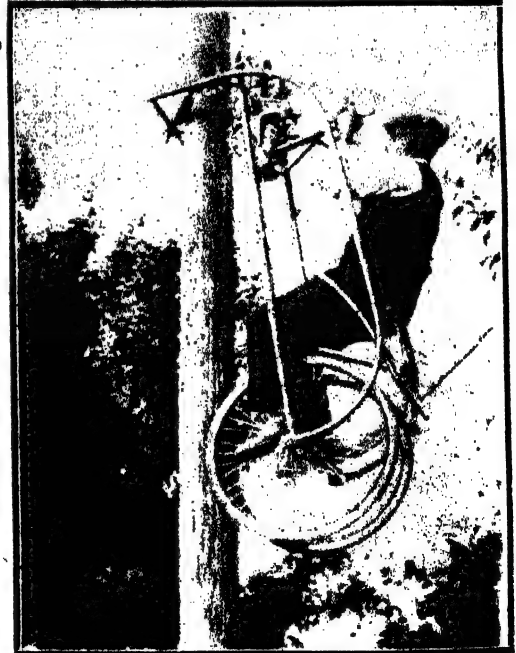
৭। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের একটী প্রাচীন চিত্র। পূর্ব্বে হল্যাণ্ডদেশে এইরূপ যন্ত্র প্রচলিত ছিল।

৮। দুর্ঘটনা নিবারক ছত্র
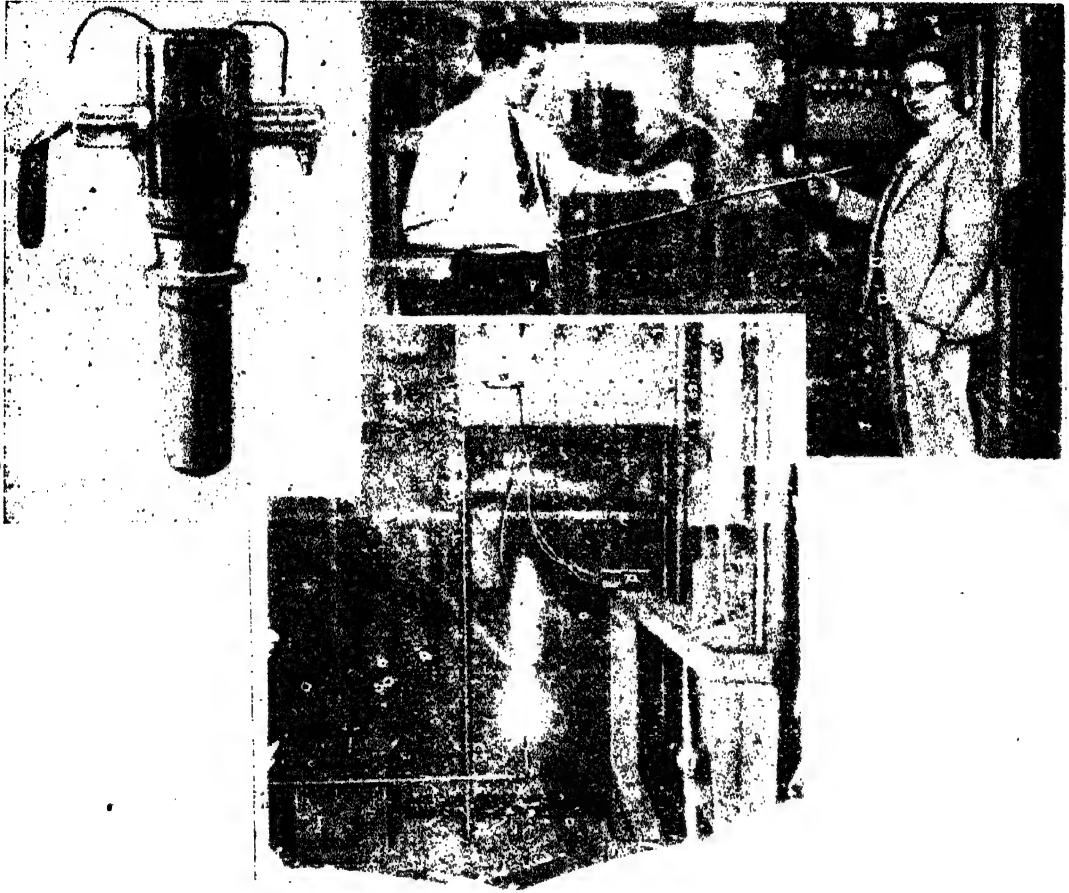
৯। অত্যারতাড়িতশক্তি সাহায্যে আলোক ও উত্তাপ :—চিত্রের বামভাগে শক্তিসঞ্চারার্থ কাচগোলক রহিয়াছে, দক্ষিণভাগে ২৫০ তাড়িতাঙ্কের আলোক প্রজ্জলিত করা হইতেছে, এবং নিম্নভাগে ২ফুট উচ্চ আলোকচাপের উত্তাপ পরীক্ষা চলিতেছে।

১০। মুদ্রাক্ষর (type-writer) যন্ত্রের লিখন মুছিয়া ফেলিবার জন্য আঠাযুক্ত ফিতা :—ইহার সাহায্যে লিখন একেবারে তুলিয়া লওয়া যায় এবং তাহাতে নিম্নস্থ অঙ্গুলিপিতে কোন দাগ পড়ে না।

১১। সঙ্গীত যন্ত্রের (gramophone) জন্য নবোদ্ভাবিত কৌশল :—ইহাতে যন্ত্র স্বয়ংচল হইয়া ক্রমানুসারে ১০টি ধ্বনিচক্র (record) চালিত করে এবং কল টিপিয়া ১০ টীর মধ্যে যে-কোন সঙ্গীতও পুনর্ব্বার শুনিতে পারা যায়।
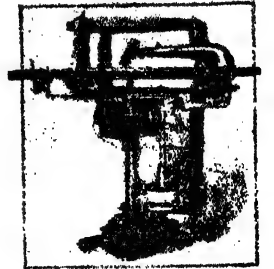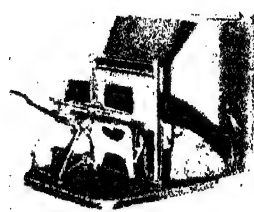
১৩। দ্রুত আলোকচিত্রমুদ্রণ যন্ত্র :—সাধারণ মুদ্রা-যন্ত্রের ন্যায় ইহা কার্য্যোপযোগী।

১২। আতসবাজি-আবৃত পরিচ্ছদ :—নূতন প্রথায় কৌতুক দেখাইবার জন্য একজন ইংরাজ যুবক এই বিপজ্জনক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। এই পরিচ্ছদের ভিতরের অংশ অদাহ্য পদার্থে নির্ম্মিত।

১৪। প্রাচীন মৃৎশিল্পে মসৃণতা সম্পাদন :—পুরাতন যুগের শিল্পী প্রাকৃতিক কৌশলই অবলম্বন করিত [illegible]
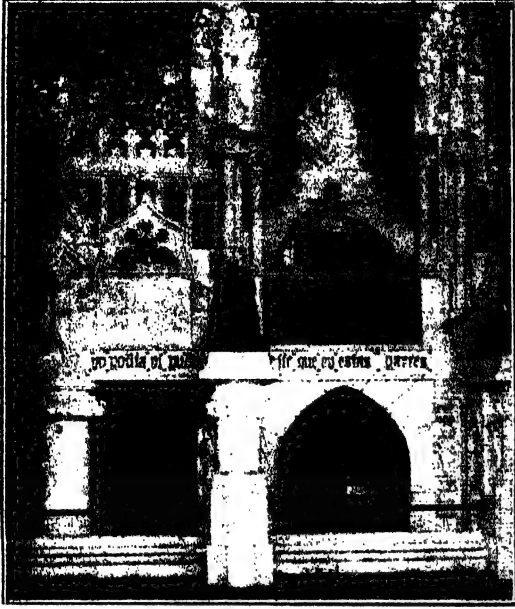
১৫। কলম্বসের চরমবিশ্রাম স্থান :—স্বয়ং কলম্বসের শেষ অনুরোধে তাঁহার দেহাবশেষ স্পেন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া সাণ্টো ডমিঙ্গোর অন্তর্গত এক গির্জ্জায় সমাহিত করা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সেভিলে তাঁহার শেষ শয্যা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই।

১৬। এই বৃক্ষে কলম্বস তাঁহার নৌকা বাঁধিয়াছিলেন, সেই অবধি বৃক্ষটী "কলম্বস ট্রী" নামেই খ্যাত ছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা মরিয়া যায় ; কিন্তু অতিকষ্টে ইহার মূল বাঁধাইয়া, ইহাকে রক্ষা করা হইয়াছে
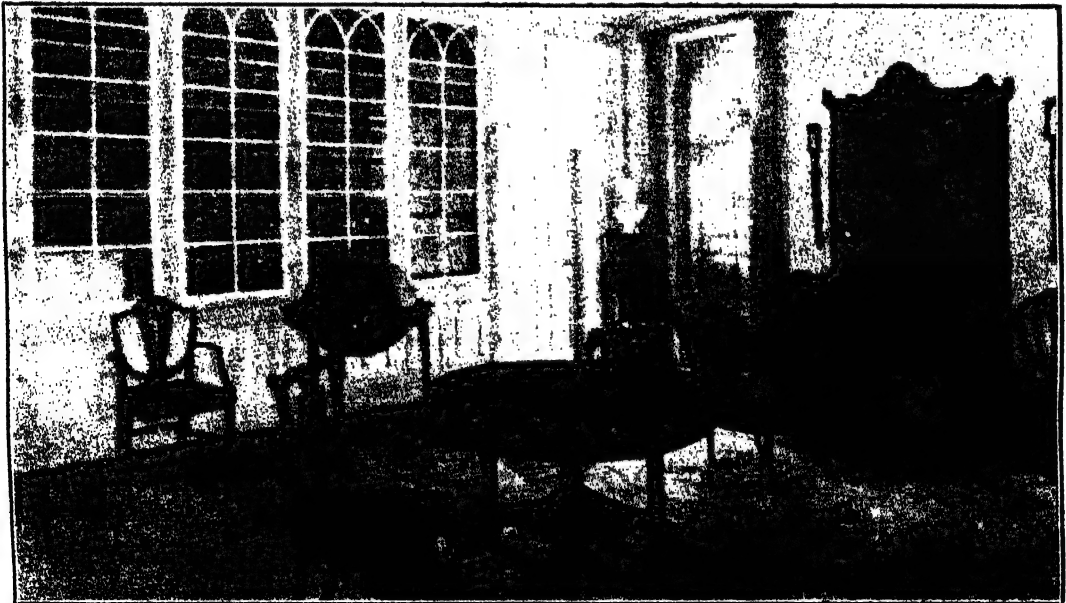
১৮। ৮০০ শত বৎসরের প্রাচীন ইউ বৃক্ষ—ম্যাগ্‌নাকার্টার পূর্ব্বে । জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মরজগতে অমর হইয়া কেহই আসে না, সুতরাং মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে, আপাত-দর্শনে, আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু, আজ পুণ্যভূমি শ্রীনবদ্বীপ,—কেবলমাত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ কেন—সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া যে রোদন-রোল উঠিয়াছে, তাহার কারণ মহারাজ বাহাদুরের মহাপ্রয়াণ নয়,—তাহার কারণ, তাঁহার অকাল-প্রয়াণ।

"বিনামেঘে বজ্রাঘাতে"র কথা প্রায়শঃই শোনা যায়। কিন্তু উপমা যে এমন নিদারুণভাবে কি কারণে উপমেয় হইল, তাহা সর্ব্বকার্য্যকারণের নিয়ন্তা যিনি, কেবলমাত্র সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বরই বলিতে পারেন; আমরা এই বিয়োগবেদনাপূর্ণ নাট্যের দর্শক মাত্র, এবং দর্শকের মতই উপায়হীন। "অমৃতস্য পুত্রাঃ" হইলেও মৃত্যুকে নির্ব্বিকারচিত্তে বরণ করিবার শক্তি সামর্থ্য আমাদের কোথায়? আমরা কেবল দেখিলাম যে বঙ্গমাতার অঙ্ক সহসা শূন্য হইল; বঙ্গজননীর বক্ষ, প্রিয়তম-পুত্রের বিয়োগ বেদনায়, অশ্রুপ্লাবিত হইল; দেশমাতৃকা, আর একটি সুযোগ্য সন্তানকে, মরণের নির্ম্মম করে সমর্পণ করিলেন।

যে কয়টি মাত্র অভিজাত বংশ বঙ্গদেশে আজ বর্ত্তমান, সেই বংশসমূহের মধ্যে নদীয়ার রাজবংশের নাম চিরপ্রসিদ্ধ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম শোনে নাই, এমন বাঙ্গালী জীবিত নাই, এবং সেই রাজরাজেন্দ্র-প্রদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি বংশানুক্রমে ভোগ না করিতেছেন, এরূপ ব্রাহ্মণবংশ পদ্মানদীর দক্ষিণ দিকে নিতান্তই বিরল; আছে কি না সন্দেহ! কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বে, ও পরে, নদীয়ার বহু নরমণি, রাজোচিত বহু-গুণালঙ্কৃত হইয়া রাজ্যপালন করিয়া, মরধাম হইতে অমরধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ইতিহাস তাহার সাক্ষী, এবং তাহার সাক্ষী তাঁহারাই, যাঁহারা কেবলমাত্র রাজসরকারের দানের দৌলতে অদ্যাপি সপরিবারে জীবিত আছেন; এবং শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার চিরশ্যামমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, চিরকৃতজ্ঞ অন্তরে রাজবংশের অনন্ত গৌরব ও অফুরন্ত বৈভব প্রতিনিয়তই প্রার্থনা করিতেছেন।

বাঙ্গালী বাঙ্গালীই—এবং বঙ্গমাতার স্নেহাশীর্ব্বাদে যেন চিরকাল এই বাঙ্গালীই থাকে। আমরা অতীতকে স্বীকার করি, অতীতকে মান্য করি, অতীতকে অর্চ্চনা করি; এই খানেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য, এবং ঠিক এই খানেই আমরা—আমরা। এবং এ কথাও ধ্রুবসত্য যে, যে-জাতি যখনই পৃথিবীর বরেণ্য হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে সেই জাতিকে অতীতের চরণে বিনম্রশিরে অভিবাদন করিয়া ভবিষ্যতের অজ্ঞাত রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অতীতের অবমাননা তিনি কখনই ক্ষমা করেন না, কাল যাঁহার চিরকালই করায়ত্ত। কেবল মাত্র পুস্তকের পৃষ্ঠায় আমরা ইতিহাসকে দেখি না; দৈনন্দিন জীবনে আমরা ইতিহাসকে উপলব্ধি করি, করিয়া আসিতেছি—এবং শ্রীভগবানের কৃপায় যেন চির কালই তাহা করিতে পারি।

মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতে গেলে, অনেক কিছুই বলিতে হয়। শ্রেষ্ঠাদপিশ্রেষ্ঠ অভিজাত-বংশ-সম্ভূত মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র, কখনও আভিজাত্যের গর্ব্ব করেন নাই; সেই নিরহঙ্কার সৌম্যমূর্ত্তি যিনি একবার দেখিয়াছেন, সে-মূর্ত্তি তিনি ভুলিতে পারেন না। ক্ষৌণীশ-চন্দ্র রাজাধিরাজ ছিলেন; কিন্তু, "নিমাই-পদ-রজ-পূত ভূমির, নৃমণি" ক্ষৌণীশচন্দ্র, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অনুজ্ঞা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মরণ হন নাই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

—এই মহাবাক্য, তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এইখানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র যেবার নাটোরে যান, তাঁহার শুভাগমনোপলক্ষে, আমার পিতৃদেব, একটি অভ্যর্থনা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুরের শুভা-গমনের অব্যবহিত পরেই, আমি এবং আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান নীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী—আমরা উভয়েই মৃদঙ্গ-সঙ্গত সমভিব্যাহারে নিম্নলিখিত গানটী গাই। রচনামাধুর্য্যে গানটি মনোহর—তাই উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"নাটোরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল—তব
শুভাগমে আজ হে!
জয় জয় নদীয়া-রাজ হে।
নিমাই-পদ-রজ-পূত যে ভূমি,
তাহারি শিরোমণি নৃমণি হে তুমি—
স্বাগত ওহে নৃপতিসত্তম
আসন লহ হৃদি মাঝে হে—
জয় জয় নদীয়া-রাজ হে।

শতেক বরষের সুদৃঢ় বন্ধন
বাঁধিলে নব করি নৃপতি-নন্দন,
লহ হে প্রীতির পুষ্প চন্দন
ক্ষৌণি-পতি মহারাজ হে!
তোমার দরশনে, পুণ্য পরশনে
ধন্য এ পুর সমাজ হে—
জয় জয় নদীয়া-রাজ হে!"

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়

মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের চক্ষে অশ্রুবন্যা বহিয়াছিল; এবং উপস্থিত সমবেত সমগ্র জনতার মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না, যাঁহারা চক্ষু শুষ্ক ছিল! সমাগত জনতার চক্ষু শুষ্ক ছিল না—তাহার কারণ, আমার ও শ্রীমানের কণ্ঠমাধুর্য্য, এ কথা যিনি মনে করিবেন, তিনি "মামা ভাগ্‌নের গান" কখনও শ্রবণ করেন নাই, ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি! চক্ষু শুষ্ক ছিল না, তাহার কেবলমাত্র কারণ—রচনার অমৃতময়ী ভঙ্গী ও ভাষা তাহাও বলি না—ভাষার সহিত বিজড়িত ছিল সেই বহু পুরাতন ইতিহাস! তাই বলিতেছিলাম যে, ইতিহাস-লোলুপ বাঙ্গালীর নিকট, সমস্ত ইতিহাসই—অতীতের পবিত্র স্মৃতি, বর্ত্তমানের পূত প্রেরণা ও ভবিষ্যতের চিরনির্ভর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতে গেলে, অনেক কিছুই বলিতে হয়। কৃষ্ণনগর রাজ-সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত করিয়াই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে এই চির ঐশ্বর্য্যময় রাজসংসারে পাঠাইয়াছিলেন। ক্ষৌণীশ সত্য সত্যই ক্ষৌণীশই ছিলেন!

অতি অল্প বয়সে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই, মহারাজ যে বিদ্যা-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন—তাহা আমাদের বঙ্গদেশে, কেবল তাঁহার ন্যায় ভূপতির পক্ষেই সম্ভব।

বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য হইলেও মহারাজ এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বিস্মরণ হন নাই। দেশের ও দশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার কথা আজকাল নিতান্তই "বৈঠকী কথা" হইয়াছে; কিন্তু ক্ষৌণীশচন্দ্রকে যাঁহারা অন্তরঙ্গ ভাবে জানিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিদিত আছেন যে, "দেশের ও দশের" জন্য তিনি কি ভাবে, কতবার, স্বীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া, সকলের সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়াইয়াছেন। নিজে যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সত্যের জন্য স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; অন্যের ভ্রুকুটী-ভঙ্গী অবজ্ঞার অন্তরালেই রাখিয়া দিতেন!

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্—

নীতিশাস্ত্রের এই প্রবচনটি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। যদি কখনও কোন ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত হইয়া মহারাজের প্রতি কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন, মহারাজ তাঁহার সহজাত ক্ষমাগুণ বশতঃ সেই ব্যক্তির সহিত সেই মুহূর্ত্তেই, এমনই আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া তাহাকে স্নেহাভিষিক্ত করিয়াছেন যে, সে অন্যায়কারী কেবলমাত্র অনুতপ্ত হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, মহারাজের প্রাপ্য মর্য্যাদা প্রদান পূর্ব্বক, প্রণামান্তর প্রস্থান করিয়াছেন—এবং দশাননে (দশাননে অর্থে রাক্ষসরাজ দশাননে নয়, বাঙ্গলা ভাষায় যাহাকে "দশ মুখে" বলে) মহারাজের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছেন।

রাজরাজেন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে যে পরিমাণ দান করা সম্ভব ছিল, আজ কেবলমাত্র বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে কয়জন নৃপতির পক্ষে তাহা সম্ভব? কিন্তু তথাপি, মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র, শ্রীভগবান্-প্রদত্ত এই অত্যল্প আয়ুর মধ্যেই কত শত-সহস্র অন্নহীনের মুখে অন্ন ও বস্ত্রহীনের অঙ্গে বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহার হিসাব মহারাজের অন্তরঙ্গতম আত্মীয়গণও জানেন কিনা সন্দেহ।

আজ মহারাজ নাই। তাঁহার অভাবে, কত শত সহস্র নরনারীর করুণ ক্রন্দনে কত শত গ্রামে, নিরানন্দ, মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে তাহার সংবাদ কেবলমাত্র তিনিই রাখেন যিনি আনন্দের আধার, এবং যাঁহাকে স্মরণ মাত্রেই নিরানন্দের নিপাত হয়।

ক্ষৌণীশচন্দ্রকে যাঁহারা বিশেষ ভাবে জানিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহারাজের সঙ্গীতপ্রিয়তার পরিচয় পাইয়াছেন; চৈতন্য-চরণ-রেণু-পূত নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্রের সুধাবিপ্লাবী কণ্ঠ-নিঃসৃত শ্রীভগবানের শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রবণান্তর ইহাই মনে হইত যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অনুজ্ঞা-ক্রমেই ক্ষৌণীশচন্দ্র নদীয়ার রাজা হইয়াছিলেন।

নদীয়ার এই নিতান্ত দুর্দ্দিনে রাজপরিবারকে প্রবোধ দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। রাজেন্দ্রাণীর মনের

অবস্থা কেবল তিনিই জানেন, যিনি মর্ত্ত্যমানবের সমস্ত সুখ ও দুঃখের বিধানকর্ত্তা। শ্রীমতী মহারাজকুমারীদ্বয় দীর্ঘায়ু হউন, এবং সর্ব্বসুখমণ্ডিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। মহারাজকুমার শৌরীশচন্দ্র সহস্রায়ু হইয়া পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক আদর্শ নৃপতিরূপে রাজ্য পরিচালনা করুন; এবং পুত্রযশোমণ্ডিত পৃথ্বী পরিদর্শন পূর্ব্বক ক্ষৌণীশচন্দ্র অমর-সভায় বসিয়া অনন্ত আশীর্ব্বাদে শ্রীমান্ শৌরীশচন্দ্রের তরুণ তনু স্নেহাভিষিঞ্চিত করুন্।

ওঁ শান্তি!

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্কিমচন্দ্র

মেঘ-মসীময় অম্বর আজি, মিহির ঢলেছে অস্তাচলে—
চন্দ্র তারকা তিমির-লুপ্ত, খদ্যোত-দ্যুতি নিভিয়া জ্বলে!
গহন আঁধার ঘেরে চারিধার, দূরে শিবাদল করিছে রব,
বাণী-মন্দিরে দেউটি নিভিছে, মা বীণাপাণির বীণা নীরব!
আজি অসময়ে বঙ্কিম, তব স্মৃতির বাসরে বোধন গাহি!
আবার আমরা দীপ্ত তোমার মন্ত্র-শোধনে জাগিতে চাহি!
স্বর্লোক হ'তে মলিন মরতে বরিষ' আশীষ, পুণ্য-শ্লোক!
কালিমা-কলুষ ধুয়ে মুছে যাক, অন্তর মন ধন্য হোক্!

সেদিন উষায় সামগান সম উদাত্ত তব কণ্ঠে, ঋষি।
উদ্গীত হ'ল যে মহা-মন্ত্র,সে আজ হিয়াতে গিয়াছে মিশি!
সে আজি ধ্বনিছে গগনে গগনে ভবনে ভবনে ভারতময়!
জয় জয়! ওগো স্বদেশ-মন্ত্র-উদ্গাতা গুরু, তোমার জয়!

সম্রাট, তব বিরাট বাহুতে ধরেছিলে সে কি বিপুল বল,
এক হাতে তুমি লড়িলে, অন্যে গড়িলে বাণীর পূজা-কমল।
আজিও সে ফুল গন্ধে অতুল, আজো অম্লান সুষমা তা'র
হেরি সম্ভ্রমে বিস্ময়ে মোরা, ধরিয়া বাণীর দেউল দ্বার!
কাণে আসে আজ শুধু কোলাহব,বৃথা উৎসব, প্রলাপ-বাণী,
ব্যর্থ পূজারী ফেলিয়াছে হায় তব আদর্শে ধূলায় টানি!
পাপ-পঙ্কিল পূজা-মন্দিরে উর বঙ্কিম জ্যোতির্ম্ময়!
মোহের আঁধার ঘুচাও সবার আনি কল্যাণ, ঋদ্ধি, জয়!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

* ২৬শে চৈত্র, ১৩৩৪ তারিখে লেখক কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ গৃহে বঙ্কিম-শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা সিটি কলেজের সরস্বতী পূজার গোল-যোগ কিছুতেই মিটিতেছে না। কলেজের কর্ত্তারা জিদ ধরিয়াছেন, রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে তাঁহারা প্রতিমা পূজা কিছুতেই হইতে দিবেন না, কারণ তাহা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিরোধী; ছাত্রেরা বলিতেছেন উক্ত হষ্টেল ব্রাহ্ম সমাজের বা সিটি কলেজের সম্পত্তি নহে, ছাত্রা-বাসের বাড়ী গবর্ণমেণ্ট তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার অধিকারী; সুতরাং সেখানে হিন্দুছাত্রগণ পূজা করিবার অধিকার ন্যায়তঃ দাবী করিতেছেন। কলেজের কর্ত্তারা বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ঐ ছাত্রাবাসের পরিচালন ভার সিটি কলেজের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। সিটি কলেজ ব্রাহ্ম সমাজ সমিতির নিয়মাধীন; ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মূর্ত্তি পূজার বিরোধী; এই কারণেই তাঁহারা ঐ ছাত্রাবাসে কোন মূর্ত্তিপূজা করিতে দিবেন না। তবে কলেজের হিন্দু ছাত্রেরা যদি মূর্ত্তিপূজা বা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানাদি করিতে চান, তাহার জন্য তাঁহারা পৃথক ছাত্রাবাস ভাড়া করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন; সেখানে ছাত্র

গণের স্বধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানে কেহ কোন বাধা প্রদান করিবেন না। ছাত্রেরা এ অবস্থায় সম্মত নহেন; ঐ রামমোহন রায় হষ্টেলেই পূজা করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দাবী রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর।

আমরা এই দুই দলের কেহই নহি; কিন্তু আমরা সিটি কলেজের ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দিরের কোন ক্ষতি হয়, তাহা চাহি না। কলিকাতায় যে কয়েকটী কলেজ আছে, তাহার মধ্যে সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠা যে অগ্রতম, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সিটি কলেজের অধ্যাপনা যে ভাল হয় তাহাও বলিতে হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে আই-এ, ও আই-এস্ সি পরীক্ষায় সিটি কলেজ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনে কতকগুলি ছাত্র কলেজ ত্যাগ করায় কলেজের কর্তৃপক্ষ পাছে ব্যয় সংকুলান করিতে না পারেন, এই জন্য কয়েকজন অধ্যাপককে বিদায় করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু যাহাতে ছাত্রগণের অধ্যাপনার ক্ষতি বা অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাত-নামা অধ্যাপকগণের সাহায্যলাভ করিবেন; ইঁহারা সিটি কলেজে যথারীতি অধ্যাপনা করিবেন। সুতরাং ছাত্রগণের পড়ার দিক দিয়া যে সিটি কলেজ যথোপযুক্ত বা যথাতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কিন্তু, মা সরস্বতীকে লইয়া যে গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে, তাহার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে এত আয়োজন যে ব্যর্থ হইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

এই গোলযোগ মিটাইবার জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকেই চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা একটা কথা বলিতে চাই। রামমোহন রায় হষ্টেল গবর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিষ্ঠিত; গবর্ণমেণ্ট এই হষ্টেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়াছেন; বিশ্ববিদ্যালয় ইহার পরিচালন-ভার সিটি কলেজের ট্রাষ্টীদিগের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। এই হষ্টেলের আয় ব্যয়ের হিসাব বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করিতে হয়, সিটি কলেজের হিসাবের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই; সিটি কলেজ কর্তৃক নিযুক্ত হষ্টেলের সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট হষ্টেল পরিচালন ও আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন; সমগ্র দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের; এমন কি হষ্টেলের সুপারিণ্টেনডেণ্টের কয়েকদিনের ছুটীর প্রয়োজন হইলে, সিটি কলেজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিতে হয় না, সে ছুটী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে এই হষ্টেল বিশ্ববিদ্যালয়েরই সম্পূর্ণ অধীনে; পরিচালনভার মাত্র কলেজের হাতে। ঐ অবস্থায় কলেজ কাউন্সিল এই হষ্টেলের পরিচালনভার একেবারে ত্যাগ করিলেই ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় এই বাড়ীটির যাহা হয় ব্যবস্থা করুন। হষ্টেল রাখিতে হয়, তাঁহারাই রাখুন, ব্রাহ্ম সমাজ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ব্রাহ্মদিগের প্রিন্সিপলেও আঘাত লাগিবে না, ছাত্রগণেরও কোন আপত্তি হইবে না। ইহাতে সিটি কলেজের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ আমাদের দেশের এমন একটা সুপরি-চালিত বিদ্যামন্দিরও বিপন্ন হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কার্য্যকাল আগামী আগষ্ট মাসেই শেষ হইবে। কে তাঁহার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন যদুনাথবাবুই পুনরায় নিযুক্ত হইবেন; কেহ বা চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়কে তক্তে বসাইতেছেন; কেহ বলিতেছেন সার আবদর রহিমই এই পদ লাভ করিবেন; আবার একদল বলিতেছেন স্কটিস্ চার্চ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আরকোহার্ট সাহেবই ভাইস-চ্যানসেলর। দারজিলিং শৈল-শিখরে অনেকেই নাকি আনা-গোনা করিতেছেন; কিন্তু শৈলবিহারী লাট বাহাদুর নীরব আছেন। শীঘ্রই যাহা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে। আমরা বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না হইলে, তক্তে যিনিই বসুন, কিছুই হইবে না।

ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল যে সময়ে বাহির হইত, গত ও বর্ত্তমান বৎসর সে সময়ের অনেক পূর্ব্বে পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, এবং ইহা যে বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সেলার অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শুনা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বৎসরেও গত বৎসরের ন্যায় কৃতকার্য্য ছাত্রের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য Grace নম্বর দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে হইলে এইরূপ Grace

নম্বর দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিজনক। Grace নম্বর যে, কোন সময়েই দেওয়া হইবে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে পরীক্ষাতে Grace নম্বর যত কম দেওয়া হয়, ততই ভাল। আমাদের মনে হয় যে, ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় moderator নিয়োগ সম্বন্ধে যে বিধি আছে, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বর্ত্তমান বিধি অনুসারে moderatorদের কার্য্য আরম্ভ হয়—পরীক্ষা শেষ হইবার পর; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রশ্নপত্র moderator কর্ত্তৃক পরীক্ষিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া মুদ্রিত হইলে পরীক্ষার শেষে হয়ত Grace নম্বর দেওয়ার কোনও আবশ্যকতা হয় না। Grace নম্বর দেওয়া যে অত্যন্ত demoralising, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রশ্ন যদি দুরূহ হয় তবে পূর্ব্বেই তাহার পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে পর শতকরা কত ছাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছে ও অন্যূন শতকরা কতজন কৃতকার্য্য না হইলে জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি দোষারোপ করিবে, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া Grace নম্বর স্থির করা লোকপ্রিয়তা হিসাবে মন্দ না হইলেও, প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে যে অন্তরায়, তাহা বোধ করি কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমরা রাজনীতির সম্বন্ধে কোন কথা কখনও বলি না, বা সে সম্বন্ধে মত প্রকাশও করি না। কিন্তু নিম্নে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, তাহা রাজনৈতিক হইলেও আমাদের দেশের শিক্ষানীতির সহিত তাহার একটু সম্বন্ধ আছে। এদেশ শাসন সম্বন্ধে অতঃপর কি ব্যবস্থা করা হইবে, অর্থাৎ মণ্টফোর্ড শাসন-নীতি এই দশ বৎসর কি ভাবে কার্য্য করিল, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দশ বৎসর অন্তে নূতন কিছু করা বিহিত হইবে কিনা, অথবা দশ বৎসরের জন্য যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাহৃত হইবে কিনা, তাহারই সিদ্ধান্ত করিবার জন্য সাইমন কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে ভারতীয় প্রতিনিধি কেহই নাই। কমিশনের সদস্যগণ এ দেশে আসিয়া এ দেশের হাল চাল এক দফা দেখিয়া গিয়াছেন; আগামী শীতকালে পুনরায় আগমন করিয়া যথারীতি সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ ও সরেজমিনে অনুসন্ধান করিবেন।

এই কমিশনের সদস্যগণ বিলাতে গমন করিয়া আর একটা সহযোগী কমিশন গঠিত করিয়াছেন। সে কমিশনের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এই সহযোগী কমিশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে সাইমন কমিশনের নিকট তাঁহাদের মন্তব্য দাখিল করিবেন। এই কমিশনের সদস্য ছয় জন নিযুক্ত হইয়াছেন; তাহার মধ্যে তিনজন সাহেব এবং তিনজন ভারতবাসী। সাহেবদের নাম বলিয়া লাভ নাই; ভারতবাসী তিন জনের মধ্যে একজন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর শ্রীযুক্ত সুলতান আহমেদ, আর একজন পঞ্জাবের রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত রাজা নরেন্দ্রনাথ, আর তৃতীয় জন মান্দ্রাজের রাষ্ট্রীয় পরিষদের ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট শ্রীমতী নাথুলক্ষ্মী রেড্ডি। বাঙ্গালা দেশের কেহই এই শিক্ষা কমিশনে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কেহ মিলিল না, এই বড় বাঙ্গালা দেশে এমন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষানবীশ পাওয়া গেল না যিনি এই কমিশনে স্থান পাইবার উপযুক্ত বলিয়া সাইমন কমিশনের নিকট আদৃত হইতে পারেন। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা আর কি হইতে পারে? এই কথাটী বলিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল, সম্প্রতি অনুমান হইতেছে যে, সে দুশ্চিন্তার অবসান আসন্ন-প্রায়। লর্ড লিনলিথগো-প্রমুখ কৃষিপরিষদ্ তাঁহাদের আলোচনা ও গবেষণা শেষ করিয়া রিপোর্ট সমাপ্ত করিয়াছেন। আর চিন্তার কোনও হেতু নাই। স্যাডলার কমিশনের দ্বারা বাঙ্গালার শিক্ষাসমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে, লিনলিথগো কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে অন্ন-সমস্যাও মিটিয়া গেল। ভারতবাসীর অদৃষ্ট ভাল!

স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্ট তাকে তোলা আছে—ইনিও খুব সম্ভবতঃ থাকিবেন—না হয় বড় জোর গোটা কয়েক মোটা চাকরীর ব্যবস্থা হইবে।

কমিশন এত দীর্ঘ গবেষণার পর কি কি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এখনও সাধারণের গোচর হয় নাই। সে সব না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করাই ভাল। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কাছে কোনও সহযোগী

কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে কতকটা আঁচ পাইয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর মতে কমিশন সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ভারতে কৃষির উন্নতি কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উন্নতির দ্বারা সাধিত হইবে না। উন্নতি করিতে হইলে চাষার হৃদয়ে উন্নতির জন্ম যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। বর্ত্তমানে তাদের যে পেটের ক্ষুধা আছে তাহা কমিশনের বিচারে যথেষ্ট নহে। তাঁহাদের মতে আরও ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আকাঙ্ক্ষা চাষাদের মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেই জন্ম কমিশন পল্লীজীবনের উন্নতির জন্ম নানা রকম পরামর্শ দিয়াছেন।

তা' ছাড়া কমিশন পরামর্শ দিয়াছেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধান হউক, ইরিগেশন্ সম্বন্ধে সার্ভে করা হউক।

আর একটা আবিষ্কার তাঁহারা করিয়াছেন যে, মামলা মোকদ্দমা চাষীদের ঋণগ্রস্ত হওয়ার একটি প্রধান কারণ। সুতরাং মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্ম গ্রাম্য সালিস প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন। তা ছাড়া বাঙ্গালা দেশে একটা উচ্চশ্রেণীর কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

সম্প্রতি আর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এক বিস্তারিত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কৃষি-বিভাগে ও কৃষিঘটিত গবেষণার জন্ম অতি অল্প টাকা খরচ হয়, এজন্ম আরও অনেক টাকা খরচ হওয়া দরকার। ভারতবর্ষে কৃষিবিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভাব, অতএব বিদেশ হইতে লোক আমদানী করিয়া একটা খুব বড় জাঁকাল রকমের বহুব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হইয়াছে। এ কথাটাও লিনলিথগো কমিশনের রিপোর্টেরই পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে হয়, যদিও নগেনবাবু এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই।

সমস্ত রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই সব খণ্ড বিবরণীর উপর সমস্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চাই না। কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ইহার একটির দ্বারাও বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষের কৃষিঘটিত সমস্তার সমাধানে একবিন্দু সহায়তা হইবে না। নগেন বাবুর মতে কৃষিকমিশন যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভারতের কৃষিসমস্তার সব চেয়ে বড় কথা সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের (economic organisation of society) আমূল পরিবর্ত্তন। তাহা না হইলে রিসার্চ্চের জন্ম কোটি কোটি টাকা ঢালিলেও চাষীর বা চাষের তাহাতে কোনও উপকার হইবে না। এই সিদ্ধান্ত যদি কমিশন করিয়া থাকেন, তবে মন্দের ভাল; কেননা, এই সত্য কথাটা এমন জোর করিয়া বলার একটা দরকার ছিল। এ কথাটা এমন কিছু ভয়ানক নূতন তথ্যও নয়। যখন কমিশন নিযুক্ত হয়, তখনই একাধিক ব্যক্তি এ কথা বলিয়াছিলেন এবং মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভূমিঘটিত বিধিব্যবস্থার আলোচনা কমিশনের বিবেচনা-বহির্ভূত হওয়ায় এ কমিশন কিছুই করিতে পারিবেন না। কাযেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য এতগুলি টাকা খরচ করিবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

প্রজারা মামলা করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছে এবং মামলা মোকদ্দমা আপোষে মিটাইলেই তাহাদের ঋণসমস্তার অনেকটা সমাধান হইয়া যাইবে, এ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তের কোন্ অদ্ভুত যুক্তি কমিশন দিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। হেতুবাদ দেখিলে তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কথা বলি। কমিশন বাঙ্গালা দেশে যখন ছিলেন, তখন যে সব সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অনেকটাই দেখিয়াছি, অন্যান্য প্রদেশের সাক্ষ্যের বিবরণও খবরের কাগজে পড়িয়াছি। কোনও খানে তাঁহারা প্রজার ঋণভার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কোনও অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। বাঙ্গালা দেশে যে করেন নাই, তাহা আমরা জানি। প্রজার ঋণভার সম্বন্ধে নাকে কান্না অনেক শুনিয়াছি, অনেকের মুখে ইহার নানা কারণনির্দ্দেশ শুনিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি ব্যাপক ভাবে প্রজার আয় ব্যয় স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এরূপ দেখি নাই। ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশের প্রজাদের পারিবারিক আয় ব্যয় স্থিতির হিসাব আলোচনা করিলে নিশ্চয় দেখা যাইবে যে, এ সম্বন্ধে যে সব মতামত সাধারণতঃ প্রচলিত আছে এবং কমিশনের পক্ষে নগেন বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সবই একান্ত অশ্রদ্ধেয়। আর সে আলোচনা না করিয়া এ সম্বন্ধে কেবল বাজে মত প্রকাশ করা এত বড় ধৃষ্টতার কার্য্য যে, এ হতভাগ্য অনুসন্ধান-বিমুখ দেশ ছাড়া অন্য কোথাও তাহা করা সম্ভব হইত

না। যাহা হউক, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হইলে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

———

প্রজার ভিতর 'উন্নত' জীবনপ্রণালী (higher standard of living) সৃষ্টি করিয়া কৃষির উন্নতি বিধানের চেষ্টার কথায় আমাদের আতঙ্ক হয়। আমরা প্রজার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু শুধু তাদের অভাব বাড়াইবার জন্য ইহা করিবার প্রস্তাব শুনিলে মনে ভয় হয়। যাদের পেটে দুবেলা দুই মুষ্টি অন্ন পড়ে না, তাদের কি উন্নতির আকাঙ্ক্ষার অভাব থাকিতে পারে? কৃত্রিম উপায়ে তাদের অভাব বাড়াইয়া: সে অভাব পূরণের ভার তাদের চেষ্টার উপর ছাড়িয়া দিলে, তাদের দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না। এত ক্ষুধায় যে চেষ্টা আসে না, সে নিশ্চেষ্টতার কারণ আরও অনেকটা গভীর। সেই সব কারণের অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহা দূর করা আবশ্যক; নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া তাহা পূরণ করিবার আয়োজন সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার। কিন্তু মজুর যথেষ্ট উৎপাদন করিতেছে না বলিয়া, তার আধ-পেটা খাবার কাড়িয়া লইলেই যে সে বেশী উৎপাদন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িবে, এ কথা যেমন নৃশংস, তেমনি হাস্যকর। কমিশন যদি সত্যই এ ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে চিন্তার বিষয়।

———

আর কৃষিকলেজ। কলেজে শিক্ষিত বহু কৃষক (?) তো বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কে চাষের কি উন্নতি করিয়াছেন? নগেনবাবু স্বয়ং একজন কৃতবিদ্য চাষী। কিন্তু চাষ করিয়া তিনি কিছু করিয়াছেন কি? কেন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই—কেন আরও শত শত লোক তাঁ'রই মত নিষ্কর্ম্মা হইয়া দেশের অন্ন ধ্বংস করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? যদি দেখিতেন, তবে বুঝিতেন যে, বাঙ্গালায় কৃষির উন্নতি গ্রাজুয়েট চাষীর দ্বারা হইবে না। বাঙ্গলার মাটি যারা চিরদিন চাষ করিয়া আসিয়াছে, শুধু তাদের দ্বারাই চাষের উন্নতি সম্ভব হইবে। তাহাদিগকে ভূমিশূন্য শ্রমিকে পরিণত করিয়া, একদল ধনিক farmer সৃষ্টি করা দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা হইবে না।

ফল কথা কৃষি কমিশনের রিপোর্টের এই সব পূর্ব্বাভাস আমাদের বিষম দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে—আমরা সম্পূর্ণ রিপোর্টের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আরও একটি কমিশন সম্প্রতি সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট সমাপ্ত করিয়াছেন—সেটি সিনেমা কমিটি। সিনেমায় আজ দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এ বস্তুটির উপকারিতা ও অপকারিতার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। কমিটি সেই সব বিষয় আলোচনা করিয়া ইহা দেশের মঙ্গল ও অভ্যুদয়ের পক্ষে নিযুক্ত করিবার জন্য কি কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা জানিতে ব্যাকুল। আজকাল বায়স্কোপে যে সব ছবি দেখান হয়, তাহার সম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি যে, সেগুলি আর্টের মাথায় প্রায় বজ্রাঘাত করে। সিনেমায় ছবির গল্প যদি আরও বেশী করিয়া লোককে পাইয়া বসে, তবে কথাসাহিত্যিক বা নাট্যকারের পক্ষে আর সুন্দর কলাসম্মত গল্প বা নাটক লিখিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। এ সম্বন্ধে কমিটি কি নির্দ্ধারণ করেন, জানিবার জন্য আমরা ব্যস্ত রহিলাম। তা ছাড়া আরও অনেকগুলি সমস্যা কমিশনের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, যথা এদেশে বায়স্কোপের ছবি তৈয়ারির সাহায্য জন্য কি চেষ্টা করা যায়? এটাও একটা বিশেষ ভাবিবার বিষয়, কেন না, ভবিষ্যতে সিনেমার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীন লোকশিক্ষার বিস্তার সাধন সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সিনেমা যদি সুপথে পরিচালিত হইয়া আমাদের দেশে আর্ট, নীতি, ধর্ম্ম, দেশহিতৈষণা প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষার বাহন হইতে পারে এবং আমাদের দেশবাসী ইহাতে হাত দিতে পারেন, তবে বিশেষ আনন্দের বিষয়।

———

আমাদের দেশে বৎসরে দুইবার গবর্ণমেণ্টের কৃপায় উপাধি বর্ষিত হইয়া থাকে; একবার ইংরাজী বৎসরের প্রথম দিনে, আর একবার ভারত-সম্রাট মহোদয়ের জন্মদিনে। এবারও সম্রাট মহোদয়ের জন্মদিন উপলক্ষে উপাধি বর্ষিত হইয়াছে। এই উপাধি লাভের জন্য যাহারা চাতকের মত ঊর্দ্ধ মুখে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই তৃষ্ণা মিটে নাই; বাঙ্গালা দেশে এবার বারি বর্ষণও যেমন কম, উপাধি বর্ষণও তাই। বাঙ্গালী কেহই এবার রাজা, মহারাজা, বা ইংরাজী অক্ষরে শোভিত হন নাই। যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নদীয়ার মহারাজা বাহাদুর চারিটি অক্ষর পাইতেন। নাম করিবার মত বাঙ্গালী কেবল পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়, তিনি মহামহোপাধ্যায় হইয়াছেন। রায় বাহাদুর ও

রায় সাহেব অনেকে হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সাড়ে পনের আনাই সরকারী কর্ম্মচারী ও সরকারের খয়েরখাঁ লোক।

এধারে দেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, দিনাজপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; দিনাজপুর বালুরঘাট অঞ্চল হইতে যে সংবাদ প্রতিদিন আসিতেছে, তাহা পাঠ করিয়া মর্ম্মপীড়িত হইতে হয়। বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর সেদিন এই সকল অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা দুর্ভিক্ষ নহে—অন্নকষ্ট। ওটা শুধু কথার মারপেঁচ; দুর্ভিক্ষই হউক আর অন্নকষ্টই হউক, লোকে যে অনাহারে আর্ত্তনাদ করিতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানও প্রপীড়িত অঞ্চলের লোকদিগের ক্ষুধায় অন্নদানে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি এই ভিক্ষার অন্নে কয়দিন চলিবে? দেশের এই দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট নিবারণের কি কোন পন্থাই কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন না? দু'দশ বৎসর পরে পরে নহে, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় এ কষ্ট যে লাগিয়াই আছে। ইহার প্রতিকার কি নাই? ওদিকে এই অন্নকষ্টের হাহাকার, আর এদিকে লিলুয়ায় প্রবল ধর্ম্মঘট, জামসেদপুরে ধর্ম্মঘট, বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘট। সহস্র সহস্র নরনারী কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে; এমন কিছু সঞ্চিত অর্থ নাই যে তাহার দ্বারা এই শ্রমজীবিগণ দিনান্ন সংগ্রহ করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী ও টাটা কোম্পানী এই ধর্ম্মঘটীদের আবেদনে কর্ণপাত করিতেছেন না, তাঁহারা শ্রমিকদের দাবী অন্যায় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রমিকদিগের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে, তথাপি তাহারা অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া ধর্ম্মঘট রক্ষা করিতেছে। শ্রমিকের ও ধনীর এই সংঘর্ষণের ফল যে ভাল হইবে না, তাহা সকলেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন।

খোয়াজা মুঈন-উদ্দীন চিশ্‌তী

ভারতে যে মুসলমান সাধুরা অরব ইরাণ ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, অথবা এই দেশেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের চেষ্টায় ভারতে বেশীর ভাগ ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে খোয়াজা মুঈন-উদ্দীন চিশ্‌তী বোধ হয় প্রসিদ্ধতম। এখন রাজপুতানার অজমীর নগরে তাঁহার সমাধি ও মঠ সর্ব্বাপেক্ষা বিভবসম্পন্ন ও বাহ্যদৃষ্টে গরীয়ান্।

ইরাণের সীস্তান প্রদেশে হসনী-অল-হুসেনী (১) বংশীয় সৈয়দ গিয়াসউদ্দীনের ৫৩৭ হিজরার [১১৪২ ঈ] কাছাকাছি কোন সময়ে মুঈনউদ্দীন নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। গিয়াসউদ্দীন খোরাসান প্রদেশে বাস করিতেন, সেইখানেই মুঈন প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হইয়াছিলেন, ১০।১১ বৎসর বয়সে পিতাকেও হারাইলেন। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে একটি জলের বলে আটা পিষিবার কল ও একটি ফলের বাগান ছিল। তাহার আয়েই তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহিত হইত। তিনি বাল্য কালে সেকালের অন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকদের মত সামান্ত প্রয়োজনীয় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরে একদিন আপনার বাগানের গাছে স্বয়ং জলসেচন করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, সে সময়ের প্রসিদ্ধ

(১) ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদের পুত্র ছিল না। একমাত্র কন্যা জোহরা ফাতিমার বিবাহ মহম্মদের জ্যাঠার পুত্র অলীর সহিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার গর্ভে হসন ও হুসেন নামক দুই পুত্র হইয়াছিল। ইঁহাদের বংশধরেরা হজরৎ মহম্মদের বংশধররূপে সম্মানিত। তাঁহাদের নামের সহিত "সৈয়দ" শব্দ ব্যবহার করা হয়। হসনের বংশধর "হসনী সৈয়দ" ও হুসেনের বংশধর "হুসেনী সৈয়দ" নামে প্রসিদ্ধ। যাঁহাদের পিতৃ ও মাতৃপক্ষ হসনী ও হুসেনী, তাঁহারা উভয়ের বংশধর ও "হসনী-অল-হুসেনী সৈয়দ" নামে পরিচিত।

ফকীর ইব্রাহীম কন্দজী তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তিনি ফকীরকে সম্মান ও বন্দনা করিয়া এক বৃক্ষতলে বসাইলেন এবং এক গোছা ভাল পাকা আঙ্গুর দিয়া অতিথিসৎকার করিলেন। ফকীর একটি আঙ্গুর স্বয়ং দাঁতে কামড়াইয়া বালক মুঈনউদ্দীনের মুখে দিলেন। ঐ আঙ্গুরটিতে কি শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছিলেন জানা নাই, কিন্তু ঐটি খাইয়া মুঈনউদ্দীনের মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল, সংসারে বাস কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। দুই তিন দিবস এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি—স্থাবর অস্থাবর—বিক্রয় করিয়া দান করিলেন এবং পরিব্রাজক ফকীর বেশে সমরকন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমরকন্দের বিদ্যাকেন্দ্রে বাস কালে তিনি কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়া "হাফিজ" হইলেন, এবং সেখানে নানাপ্রকার প্রকাশ্য ও গূঢ়, সাংসারিক ও ব্রহ্মবিদ্যা অর্জ্জন করিলেন। পাঠশেষ করিয়া সমরকন্দ হইতে ইরাক্ যাত্রা করিলেন। পথে নেশাপুরের কাছে হরূণ নগরে হজরৎ খোয়াজা ওসমান হারুণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেকালে ওসমান হারুণীর মত ক্ষমতাপন্ন যোগী সাধক ইরাণে ছিল না; কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কতকটা উন্মাদের মত অভিনয় করিতেন, সেই জন্ত সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিয়া বিরক্ত করিত না। তিনি মুঈনউদ্দীনকে দেখিয়াই ইঙ্গিত করিয়া নিকটে ডাকিলেন, এবং এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া বলিলেন, "কোরাণের সুরা বকর [প্রথম অধ্যায়] আবৃত্তি কর।" আবৃত্তি করিলে বলিলেন "নমাজ উপাসনা কর।" নমাজ শেষ হইলে কিবলার [মক্কার প্রধান উপাসনালয়] দিকে মুখ করিয়া বসাইয়া কিছুক্ষণ "সুব্হান অল্লা" শব্দ জপ করিতে বলিলেন। পরে, তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "তোমাকে খোদাতালার কাছে পাঠাইলাম।" ইহার পর বলিলেন, "এক দিবারাত্রি উপাসনা করিয়া জাগরণ করিও।" ঐরূপ করিবার পর, পর দিবস মুঈনউদ্দীন তাঁহার কাছে যাইলে বলিলেন, "একবার আকাশের দিকে দেখ, কি দেখিতে পাইতেছ?" মুঈনউদ্দীন দেখিয়া বলিলেন,"আকাশের সকল অংশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।" ফকীর বলিলেন "নীচে মাটির দিকে দেখ, কি দেখিতে পাইতেছ?" ঐরূপ দেখিয়া মুঈন বলিলেন, "নীচে পাতাল পর্য্যন্ত সকল দ্রব্য দেখিতে পাইতেছি।" ফকীর বলিলেন, "সহস্র বার সুরা-ইখ্লাস্ [কোরাণের একটি অধ্যায়] আবৃত্তি কর।" আবৃত্তি করা হইলে বলিলেন "এইবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, কি দেখিতে পাইতেছ?" মুঈন দেখিয়া বলিলেন, "এখন জগতের শেষ পর্য্যন্ত সব দেখিতে পাইতেছি।" ফকীর আপনার একটি অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি দেখিতেছ?" মুঈনউদ্দীন বলিলেন, "আঠার হাজার (অর্থাৎ অগণিত) জগৎ দেখিতে পাইতেছি।" ফকীর বলিলেন, "এইবার তোমার শিক্ষা পূর্ণ হইল।" ইহার পর মুঈনউদ্দীনের পায়ের কাছে যে একখানা ইট কতক মাটিতে পোঁতা ছিল, তাহা দেখাইয়া তুলিতে বলিলেন। তুলিয়া মুঈনউদ্দীন দেখিলেন, কয়েকটি সোণার মুদ্রা দীনার রহিয়াছে। ফকীর বলিলেন, "যাও, বিদ্যা সমাপ্তির জন্য ফকীরদের দান দাও।" তাহার পর মুঈনকে কিছু দিন আপনার কাছে রাখিয়া নানাপ্রকার উপদেশ করিলেন ও সকল বিষয়ে ব্যুৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে ফকীরের খির্কা (২) দিয়া বিদায় করিলেন। মুঈন গুরুর কাছে সর্ব্বশুদ্ধ আড়াই বৎসর ছিলেন।

মুঈনউদ্দীন গুরুর কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশ-দেশান্তরের সাধুদর্শন ও তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি বাগদাদে গিয়া কিছুকাল সূফী যোগীপ্রবর বৃদ্ধ আবদুল কাদির গীলানীর [১০৭৮—

(২) খির্কা:—ভারতের সন্ন্যাসী ও দণ্ডীরা যেমন বিশেষ প্রকার বেশ, দণ্ড ইত্যাদি গুরুর কাছে পাইলে তবে ধারণ করিবার অধিকারী হন, সেইরূপ ইরাণের সন্ন্যাসী বা ফকীরেরা গুরুর কাছে একটি চোগার মত বেশ পাইয়া থাকেন। ইহাকে খির্কা বলে। বড় বড় ফকীরদের খির্কা উত্তরাধিকার সূত্রে গদিয়ান প্রধান শিষ্য পাইয়া থাকেন। ৭।৮ শত বৎসরের প্রাচীন খির্কা এখনও কোন কোন ফকীরের কাছে আছে।

১১৬৬] সেবা করিলেন। তাঁহার কাছে উপদেশ লাভ করিয়া শেখ নজমউদ্দীন কিব্রাকে [মৃত্যু ১২২`] দর্শন করিলেন। তাহার পর সুফীযোগী শিহাবউদ্দীন সহর-ওয়র্দীর [১১৪৫ -১২৩৪] গুরু শেখ জিয়াউদ্দীনকে দর্শন করিলেন। পরে হমদান নগরে গিয়া শেখ ইউসুফ হমদানীকে দর্শন করিলেন, ও তবরেজ নগরে গিয়া শেখ অবুসঈদ তবরেজীকে দর্শন করিলেন। ইঁহারাই সেকালে প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। তাঁহাদের উপদেশ ও সৎসঙ্গে উপকৃত হইয়া তিনি ইসপহান নগরে শেখ ইসপহানীর দর্শন লাভ করিলেন। এই সময়ে, এই নগরে খোয়াজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, ও তাঁহার সহিত গাঢ় প্রীতি স্থাপিত হইল। তিনি মুঈনউদ্দীনের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিলেন, এবং মুঈনউদ্দীনের মৃত্যুর পর ওসমান হারুণী দত্ত খির্কা পাইয়াছিলেন।

মুঈন উদ্দীন ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে গিয়া দেখিলেন, অগ্নি উপাসকদের এক প্রকাণ্ড মন্দিরের দ্বারে বখতিয়ার নামক এক বৃদ্ধ একটি ৬।৭ বৎসর বয়স্ক বালককে কোলে লইয়া বসিয়া আছে। তিনি বৃদ্ধের সহিত অগ্নি উপাসনা সম্বন্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে, আপনার ক্ষমতা দেখাইয়া তাহাদের চমৎকৃত করিবার জন্য, হঠাৎ শিশুকে কোলে তুলিয়া, বাধা দিবার পূর্ব্বেই, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহারা বালকের প্রাণের ভয়ে কোলাহল করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি শিশুর সহিত কুণ্ড হইতে উঠিয়া আসিলেন, ও শিশুকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা শিশুর মুখে শুনিল যে, শিশু অগ্নির উত্তাপ মোটেই অনুভব করে নাই, এমন কি, মুঈনউদ্দীন অথবা শিশুর গায়ের কাপড়ে দাগও লাগে নাই। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া অগ্নি উপাসকেরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। অনেকে তাঁহার কাছে দীক্ষিত হইয়া ইসলাম স্বীকার করিল। বৃদ্ধ বখতিয়ার ও শিশু বালকের সমাধি এখনও সে স্থানে আছে।

মুঈনউদ্দীন ঘুরিতে ঘুরিতে সবজাওয়ার নগরে গিয়া এক সুন্দর উদ্যানে এক বৃক্ষতলে আসন করিলেন। ঐ উদ্যানটি সেখানকার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ ইয়াদগারের ছিল। এই ব্যক্তি অত্যন্ত লম্পট, প্রজাপীড়ক ও মদ্যপ ছিল। তিনি দেখিলেন সেবকেরা নাচগানের স্থান পরিস্কৃত করিতেছে। সেই দলের একজন লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "উদ্যানের অধিকারী মদ্যপ ও সাধুগণের অপমানকারী। আপনাকে দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠিতে পারে, অতএব আপনার স্থানান্তরে যাওয়াই ভাল।" তিনি কিন্তু সে কথায় কাণ দিলেন না। যখন ইয়াদগার আসিয়া সুরার পাত্র মুখে তুলিয়াছে, তখন হঠাৎ সাধুকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই কোনও গুপ্ত শক্তি-বলে, ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার হাত হইতে সুরাপাত্র পড়িয়া গেল। সে উন্মাদের মত ছুটিয়া সাধুর চরণে নত হইয়া বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। মুঈনউদ্দীন তাহাকে তোবা (প্রায়শ্চিত্ত) করাইয়া, দীক্ষিত করিলেন। সে তখন আপনার ধনরত্ন আনিয়া গুরুকে উপহার দিল। তিনি উপদেশ দিলেন, "ঐগুলি যাহাদের কাছে অত্যাচার করিয়া লইয়াছ, তাহাদের ফেরৎ দাও, এবং ক্ষমাপ্রার্থনা কর।" ইয়াদগার সে সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া তপস্যা দ্বারা জীবন কাটাইতে লাগিল।

মুঈনউদ্দীন সে স্থান ত্যাগ করিয়া বল্খের পথে গজনীতে আসিলেন; গজনী হইতে লাহোরে আসিলেন, ও লাহোর হইতে দিল্লীতে আসিলেন। দিল্লীতে কিছু কাল বাস করিয়া অজমীরে আসিলেন। সে সময়ে পৃথ্বীরাজ চোহান রায় পিথোরা সাম্ভর দেশের রাজা ছিলেন। তিনি অজমীরে বাস করিতেন। মুঈনউদ্দীন অজমীরে আপনার খান্‌কাহ্ (মঠ) স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং অবসর-মত নানাপ্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া সাধারণ অধিবাসীদিগকে স্তম্ভিত করিয়া, ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই সকল মুসলমান যোগী সাধকেরা, অষ্টসিদ্ধির এক বা একাধিক ক্ষমতা লাভ করিয়া, নিরক্ষর অজ্ঞ লোকদের অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা দেখাইয়া স্তম্ভিত করিতেন এবং ঐ ক্ষমতাগুলি ইসলাম

ধর্ম্মের গুণ বলিয়া প্রচার করিতেন। ভারতের মুনি ঋষিরা অষ্টসিদ্ধির কামনা করেন না, ক্ষমতা লাভ করিলেও ব্যবহার করেন না। জনশ্রুতি আছে যে, যখন মহম্মদ ঘোরী অজমীর আক্রমণ করিলেন, তখন মুঈনউদ্দীনের মঠে প্রায় দুই সহস্র বিদেশী মুসলমান ছিল। ইহারা যুদ্ধের সময়ে ঘোরীকে সাহায্য করিয়াছিল। মুঈনউদ্দীনের ভক্তেরা লিখিয়াছেন, রায় পিথোরা মুসলমানদের সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, তাহাদের কোনরূপ প্রশ্রয় দিতেন না। তাহারা মুঈনউদ্দীনের কাছে অভিযোগ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি পিথোরাকে বন্দী করিয়া দান করিলাম।" সে সময়ে লোকে ইহার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। পরে যুদ্ধ হইলে পিথোরা বন্দী হইলেন। ঘোরী তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া নির্দ্দয় ভাবে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। [১১৯১ খ্রী] কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সরস্বতী নদীতীরের যুদ্ধে সম্মুখ সমরে পিথোরা বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মুঈনউদ্দীন বহুকাল অজমীরে বাস করিয়া বহু হিন্দুকে ইসলাম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। পরে, ৬ রজব ৬৩৩ হিং [১৬ মার্চ্চ ১২৩৬] অজমীরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার সমাধি মূল্যবান শ্বেতপ্রস্তর দিয়া সম্রাট আকবর বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার মৃত্যুর তারিখে ভারতের দূরদেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহার সমাধি পূজা করিতে আসে।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

ঝরা ফুল

(চিত্র)

মা, আর যে যাতনা সইতে পারছি না! কত দিনে এ যাতনা শেষ হবে মা? ছেলেবেলার মত তোমার কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও মা, যেন আর এ ঘুম না ভাঙে। মা, মাগো—

ও কি, তুমি চোখে কাপড় চাপা দিলে কেন মা? কাঁদছো বুঝি? বুঝি মা সব, যে আমি চলে গেলে তোমার বুকে কত বাজবে, কিন্তু তবুও যে না বলে থাকতে পারছি নে।

জানি মা, একটি বোঁটায় ফোটা দুটি ফুলের মতো, আমি আর অরু, তোমার হৃদয়ের বৃন্তে ফুটে আছি। তার একটি যদি ঝরে' যায়, তুমি সইতে পারবে না। জানি মা, বাবা আমাদের ছেড়ে গেলে, তুমি কত আদরে যত্নে, নিজে না খেয়ে না পোরে, আমাদের মানুষ ক'রে বড় ক'রে তুলেছ। সে কি ভোলবার?

কি ব'লছ? চুপ করতে? বেশী কথা ব'লতে ডাক্তার বারণ করেছে, তাই?

তা হোক্ মা, তা হোক্—কথা কইতে দাও আমায়। যা বলবার আছে বল্‌তে দাও, হয়তো কিছু পরে আর তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পাবো না। হয়তো মৃত্যুর ডাকে কোন সুদূরে আমায় চলে যেতে হবে।

তখন তো তোমার আদরের রমার কথা আর শুনতে পাবে না মা! আজকের দিন বোধ হয় আর কাটবে না। বুকটা যে কি ক'রছে, কি ব'লবো তা!

মা, তার দেখা পেলে ব'লো, সে হাজার লাথি মেরে ফেলে দিক্, যা তার জন্যে বেঘোরেই মরি, তবুও তার ওপর আমার একটুও রাগ নেই। হোক্ সে মাতাল, হোক্ সে দুশ্চরিত্র, তবুও সে স্বামী। তবে বড় দুঃখ মা, পেটেরটা অপঘাতে গেল। বড় আশা করে' বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলে, মেয়ে সুখে থাকবে। সে সুখ খুবই ভোগ করেছি মা,—উঠতে বসতে লাথি ঝাঁটা, গা'ল মন্দ। কিন্তু তবু মা আমরা হিন্দু ঘরের মেয়ে, স্বামীই আমাদের সব। এই ভেবেই সব নীরবে সহ্য করেছি। তোমারও

কিছু জানতে দিইনি, বলেছি ঘুমন্ত পড়ে গেছি খাট থেকে,—শুধু তুমি কষ্ট পাবে ব'লে।

এই পাঁচ বছর তোমার কাছে আসতে পাইনি, কেননা বড়মানুষের বৌ, গরীবের ঘরে কি ক'রে' থাকবে? হায় মা, তারা ভুলে গেছে যে এত বড়টা হয়েছি ঐ গরীবের ঘরের স্নেহ আদরেই। তার কাছে তুচ্ছ এই ধন সম্পত্তি,—বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হৃদয়হীন মৌখিক ভালবাসা।

সব শুনে তুমি কাঁদছ মা? তা কাঁদ মা, কাঁদ, কেঁদে শান্তি পাবে। হিন্দু ঘরের মেয়ের মা, শুধু কাঁদতেই জন্মায়। পেট থেকে মেয়ে ফেলেই কান্নার সুরু, আর মেয়েকে শেষ শয়ানে শুইয়ে দিয়ে তার শেষ। চুপ ক'রতে ব'লছ মা? এই যে চুপ ক'রছি।

মা, মা,—শীগ্‌গির কাছে এস, শোন; আজ না মা ভাইফোঁটা? ঐ বুঝি তাই শাঁখ বাজছে? বিয়ে হবার পর থেকে পাঁচ বছর আর ত ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিতে পারিনি। আজ মা তার কপালে ফোঁটা দেবো। সে যে ভোর বেলা এসে ব'ল্‌লে, 'দিদি আমি এসেছি, আজ আমায় ফোঁটা দিতে হবে।'

ক'দিনই জিজ্ঞাসা করছি, সে কেন আমার কাছে আস্‌ছে না। তোমরা বল্‌ছ সে মামার বাড়ী গেছে। এ সময় সে একবার আমায় দেখতে এল না, কেবলি সে কথা মনে হ'চ্ছিল। কিন্তু আজ সে আসবে আমি তা' জানি। সে ব'লে গেল, 'দিদি এবারে তোমায় ফোঁটা দিতে হবে, ফাঁকি দিলে চ'লবে না।'

মা ওঠো। চন্দনের বাটী, শাঁখ, ফুলের মালা, কাপড় সব আনো—আমায় তুলে বসিয়ে দাও। এ জন্মের মত তার কপালে ফোঁটা দিই, যমের দোরে কাঁটা দিয়ে সে অমর হ'য়ে বেঁচে থাক।

ও কি? ও কি? মা, তুমি 'অরু বাপ রে!' ব'লে অমন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে কেন? তবে—তবে কি—অরুও তোমাদের ফেলে চলে গেছে? উঃ মাগো, যাই যে! এ সাধও তবে মিটলো না! না—না—মিটবে। মিটবে, ঐ যে অরু গরদ পোরে ফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালে চন্দন মেখে দাঁড়িয়ে,—হাসি আর মুখে ধরছে না। ডাকছে 'দিদি, এস, ফোঁটা দেবে এস।'—যাই—যাই ভাই অরু, দাদা আমার!

ধোরোনা—ছাড়ো,—ছাড়ো, ব'লছি মা! ঐ অরু ডাকছে 'দিদি, দিদি, আয় শীগ্‌গির আয়, সময় যে চলে যায়, কখন ফোঁটা দিবি?'

কৈ? যাই, চল্লুম,—মা আমার!"

শ্রীতমাললতা বসু।

দুরাশা

আমায় তুমি করলে ধনী।
খাদ ছিল মোর হিয়ার যত
খাটি হ'লো সোণার মত,
জীবন আমার সফল ক'রে
বুলিয়ে দিলে পরশমণি—
করলে ধনী॥

আমার গভীর মানস সরে
জানি না সে কি মন্তরে
ফুটিয়ে দিলে পঙ্কজে হে,
ধন্য ক'রে পঙ্ক-খনি—
করলে ধনী॥

নিকষ-কালো অন্ধকারে
ছিলাম পড়ে পথের ধারে,
দৃষ্টিহারা পথ-হারারে
আলোক দিলে চিরন্তনী—
করলে ধনী॥

এমন দিন কি হবে প্রভু,
শূন্য হিয়ায় আসবে কভু?
ধ্যানে আমার জাগবে কি গো
ভক্ত-চিতের চিন্তামণি?—
করবে ধনী?

মহমুদ হোসেন।

গরীব স্বামী

(উপন্যাস)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জুন মাস। মধ্যাহ্নকাল সমাগত প্রায়, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কার্ট রোড ধরিয়া দুইটি বঙ্গমহিলা—অথবা একটি মহিলা ও একটি বালিকা—দার্জ্জিলিঙ ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়াছে। একটি উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর। অপরা গৌরাঙ্গী—দেখিতে অন্ততঃ পনেরো ষোল, কিন্তু আসলে তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক নহে। এ দুইটী আর কেহ নয়—কনিষ্ঠা, বীরপুর-নিবাসী, হাল সাকিম কলিকাতা, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা উষাবলা, এবং জ্যেষ্ঠা তাহার শিক্ষয়িত্রী মিস্ লীলা দত্ত। আজ কলিকাতা মেলে দেবেন্দ্রবাবু আসিয়া পৌঁছিবেন,—তাই ইহারা তাঁহাকে আনিতে যাইতেছে। পরিধানে বঙ্গ-মহিলার শাড়ী থাকিলেও, উভয়ে ইংরাজিতেই কথোপকথন করিতে করিতে চলিয়াছে। লীলার মুখখানি বেশ প্রফুল্ল, উষার কিন্তু সেরূপ নহে।

আজ পাঁচ বৎসর কাল উষা দার্জ্জিলিঙে শিক্ষালাভ করিতেছে। তাহার অবস্থান জন্য "ডেজি ভিলা" নামক যে বাড়ীখানি দেবেন্দ্র বাবু পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ভাড়া করিয়াছিলেন, এখন উহা তিনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। মিসেস্ হেমাঙ্গিনী বসু এখনও গৃহকর্ত্রী রূপেই অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু উষার শিক্ষয়িত্রী এখন আর মিস্ দত্ত একা নহেন;—দুই জন য়ুরোপীয় মহিলাও তাহার শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্তা। একজন মিস্ গ্রেহাম—ইনি ইংরাজ মহিলা, উষাকে ইংরাজি সাহিত্য পড়াইয়া থাকেন, তা ছাড়া কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতও শিক্ষা দেন। অপরা, সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড নিবাসিনী ফ্রোলাইন (অর্থাৎ মিস্) রোমানো—ইনি উষাকে ফরাসী ভাষা এবং ব্যায়াম-শিক্ষা দিয়া থাকেন।

দেবেন্দ্রবাবু দুই তিন মাস অন্তর একবার দার্জ্জিলিঙে আসেন এবং কয়েকদিন থাকিয়া, উষার লেখা-পড়া কিরূপ হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া যান। এখানে আসিয়া "ডেজি ভিলা"য় বাস করেন না, জুবিলি স্যানিটেরিয়মে উঠিয়া থাকেন। উষা প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া, পূজার সময় তিন সপ্তাহ এবং ফাল্গুন মাসে দুই সপ্তাহ, কলিকাতায় গিয়া পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায়। মধুবাবু সেই প্রথম বার যে দার্জ্জিলিঙে আসিয়াছিলেন,—তারপর আর তিনি এখানে পদার্পণ করেন নাই, "কোট্ পেণ্টুল" পরিধান করা তাঁহার আদৌ সহ্য হয় না।

ট্রেণ পৌঁছিবার মিনিট দশ পূর্ব্বেই লীলা ও উষা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। উভয়ে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে—উষার গাল দুটি রক্তিমাভা ধারণ করিয়াছে। ট্রেণের অপেক্ষায় উভয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিল।

যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। দেবেন্দ্রবাবু গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া ছিলেন,—ইহারা দেখিতে পাইয়া, ক্ষিপ্রপদে সেই দিকে অগ্রসর হইল।

দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজি পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন,—দার্জ্জিলিঙে আসিতে হইলে তিনি ঐ পরিচ্ছদই ব্যবহার করেন। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি প্রথমে লীলার সহিত, তার পর উষার সহিত করমর্দ্দন করিয়া, লীলার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কতক্ষণ এসেছেন? আপনারা আবার কষ্ট করে এতদূর এলেন কেন? বিকেলে আমি ডেজি ভিলায় যাব চিঠিতে ত লিখেই দিয়েছিলাম।"

লীলা বলিল, "আমরা মিনিট দশ হল এসেছি। আজ

রবিবার কি না—আজ ত ঊষার পড়া-শুনো কিছু নেই। ভাবলাম, ষ্টেশনে যাওয়া যাক্—খানিক বেড়ানও ত হবে !”—বলিয়া লীলা মুখখানি নত করিল।

কুলি আসিয়া দেবেন্দ্রবাবুকে সেলাম করিয়া, গাড়ীর কামরার ভিতর হইতে তাঁহার বিছানার বাণ্ডিল ও স্যুট্‌কেস্ নামাইয়া লইল। এই পাঁচ বৎসর ঘন ঘন যাতায়াতের কারণ, কুলিরা সকলে দেবেন্দ্রবাবুকে চিনিয়া ফেলিয়াছে।

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, “খুব ক্লান্ত হয়েছেন বোধ হয় ? স্যানিটেরিয়মে একটু বসে’ জিরিয়ে যাবেন ?”

লীলা বলিল, “বেশ ত, চলুন।”

তিনজনে তখন ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া, স্যানিটেরিয়মের দিকে নামিয়া গেলেন। নিজ কক্ষে গিয়া দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক এক পেয়ালা চা দিক্ ?”

লীলা সম্মতি জানাইলে দেবেন্দ্রবাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া চা আনিতে আদেশ করিলেন। ঊষার পড়াশুনার বিষয় দেবেন্দ্রবাবু খুঁটিয়া খুটিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ব্যায়াম-চর্চ্চা রীতিমত চলিতেছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। ঊষা এই সময় বলিল, “দেবেন বাবু, আমায় একটা ছোট ঘোড়া কিনে দিতে হবে। কত ইংরেজের মেয়েরা ঘোড়া চড়ে’ বেড়ায়, আমারও চড়তে ইচ্ছে করে।”

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, “ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে শেষকালে হাত-পা ভাঙো যদি ?”—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

ঊষা বলিল, “পড়বো কেন ? এত লোক পড়ে না, আমিই পড়ে যাব ? বেশী বড় ঘোড়া নয়, একটা পাহাড়ী পোনি, কিন্তু দেখতে খুব সুশ্রী হওয়া চাই।”

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, “বেশ, তোমায় পোনি কিনে দেবো আমি। কিন্তু এখন নয়, আর একটু বড় হও আগে।”

ঊষা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, “কেন, আমি বুঝি যথেষ্ট বড় হইনি ? এখন ত প্রায় লীলাদি’র সমান হয়ে উঠেছি। —দুই এক বছরের মধ্যেই লীলাদি’র চেয়েও বড় হয়ে যাব।”

দেবেন্দ্রবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “হ্যাঁ তা হবে বটে। আচ্ছা, তোমায় পোনি একটা কিনে দেবো। কিন্তু এখনই না, আরও কিছু দিন যাক্—কি বল ?” —বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু সকৌতুক দৃষ্টিতে ঊষার পানে চাহিলেন।

“আচ্ছা।”—বলিয়া ঊষা নীরবে চা-পান শেষ করিল। লীলা বলিল, “আচ্ছা ঊষা, আমরা এখন যাই চল, এখন উনি স্নান টান করবেন।”

দেবেন্দ্রবাবু উঠিয়া নিম্নতল অবধি ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। লীলা বলিল, “আপনি বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গেই চা খাবেন ত ?”

“হ্যাঁ, খাব বৈকি। আমি সাড়ে পাঁচটার সময় গিয়ে পৌঁছব। মিসেস্ বসুকে আর মিস গ্রেহামকে বলে দেবেন, তাঁদের সঙ্গে আমার একটু, বিশেষ কথা আছে। আমি আসার পূর্ব্বে তাঁরা যেন না বেরোন্।”

“আচ্ছা, বলে’ দেবো তাঁদিকে। নমস্কার।”—বলিয়া, ঊষাকে লইয়া লীলা প্রস্থান করিল।

গত ফাল্গুন মাসে দেবেন্দ্র বাবু কলিকাতা হইতে ঊষাকে আনিয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, এ কয় মাস কার্য্যগতিকে আসিতে পারেন নাই। এবার আসিয়া দেখিলেন, ঊষা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় হইয়াছে, এবং তাহার রূপও যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ঊষা ষোল বৎসরের না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাকে এখানে রাখিয়া শিক্ষাদান করাই পূর্ব্ব হইতে দেবেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় ছিল। আরও দুই বৎসর—তারপর ঊষাকে তিনি বিবাহ করিয়া আপন গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই সঙ্কল্প তাঁহার মনে এতদিন পর্য্যন্ত খুব দৃঢ়মূলই ছিল ;—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ সে মূল যেন কিঞ্চিৎ শিথিল বোধ হইতেছে। দু—ই—বৎসর ! বড় দীর্ঘকাল !

ঊষাকে দেবেন্দ্রবাবু যে নিজ ভাবী-পত্নীরূপেই লালন পালন ও শিক্ষাদান করিতেছেন, এ সংবাদ ঊষাও এখন

জানেই, লীলাও জানিয়াছে। বৎসরে দুইবার ঊষা যখন কলিকাতায় যায়, লীলাও প্রতিবার গিয়া থাকে। অপরা শিক্ষয়িত্রীদ্বয় এবং মিসেস্ বসু, প্রতিবারেই কলিকাতা গমন করেন না,—কেহ কেহ কোনও বার যান, কেহ কেহ থাকেন। লীলা কলিকাতায় গিয়া মাঝে মাঝে ঊষার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করে। ঊষা যে দেবেন্দ্র বাবুর মনোনীতা ভাবী পত্নী, তাহা লীলা অনেক দিন আগেই জানিতে পারিয়াছে। মিস্ গ্রেহাম প্রভৃতিও আভাসে তাহা বুঝিয়াছেন। অবশ্য কেহ কোনও দিনই প্রকাশ্যভাবে একথা লইয়া আলোচনা করেন না। দেবেন্দ্র বাবুর বিষয় কথা কহিবার সময় ইঁহারা তাঁহাকে ঊষার অভিভাবক বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় দেবেন্দ্রবাবু ডেজি ভিলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। লীলা তখন বারাণ্ডায় বেতের চেয়ারে বসিয়া একখানি সচিত্র ইংরাজী মাসিক পত্রের পাতা উল্টাইতেছিল। দেবেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। দেবেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঊষা কৈ ?"

"সে মিস্ রোমানোর সঙ্গে গির্জ্জায় গেছে। মিসেস্ বসু, মিস্ গ্রেহাম আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—ভিতরে আসুন।"—বলিয়া লীলা দেবেন্দ্রবাবুকে কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া বসাইয়া, তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতে গেল।

স্বল্পকাল পরে মিস গ্রেহাম ও মিসেস বসু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মামুলি কথাবার্ত্তার পর, খানসামা চা লইয়া আসিল। সকলে চা পান করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজীতে বলিলেন, "আপনাদের তত্ত্বাবধানে, ঊষার লেখাপড়া যেরূপ হইতেছে, তাহা বেশ সন্তোষজনক, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এখন একটা কথা আমার মনে হইতেছে, সে বিষয়ে আপনাদের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।"

মিস্ গ্রেহাম বলিলেন, "কি, মিষ্টার ব্যানার্জ্জি বলুন।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন, "বাল্যকাল হইতে এতদিন অবধি ঊষা, জনহীন দ্বীপে মিরাণ্ডার মতই লালিত পালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। কিন্তু এখন উহার বয়স হইতে চলিল। একদিন ত উহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে! সেজন্য সামাজিক বিষয়, লোকচরিত্র ইত্যাদি জ্ঞান অর্জ্জন করা উহার আবশ্যক—সমাজে মেলামেশা, না করিলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?"

মিসেস্ বসু বলিলেন, "এ কথা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন মিষ্টার ব্যানার্জ্জি। এখন আর উহাকে গৃহপ্রাচীর সীমার ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখা, উহার মানসিক পরিণতির অনুকূল হইবে না। এখানে আমার পরিচিত কত সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবার মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন, আপনি যদি বলেন ত আমি ঊষাকে সে সকল স্থানে লইয়া যাইতে পারি। মিস্ গ্রেহামের সহিতও এখানকার কয়েকটি য়ুরোপীয় পরিবারের বন্ধুত্ব আছে। উনিও বোধ হয়—"

মিস্ গ্রেহাম বলিলেন, "নিশ্চয়। আমি আহ্লাদের সহিত ঊষাকে সে সকল পরিবারের মধ্যে লইয়া গিয়া, তাঁহাদের সহিত পরিচয় সাধন করিয়া দিতে পারি। শুধু য়ুরোপীয় পরিবারই বা কেন ? এই ত, আগামী শনিবারে রুকমপুরার রাণী সাহেবার গৃহে একটা সান্ধ্য-সম্মিলনী আছে। আমি পূর্ব্বে ঐ রাণী সাহেবার গৃহ-শিক্ষয়িত্রী ছিলাম কি না। তিনি মাস খানেক হইল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়া, জলাপাহাড়ে অবস্থিতি করিতেছেন। আমাকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করেন—আমাকে ঐ সম্মিলনীতে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিঙ-প্রবাসী অনেক য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সে দিন ঊষাকেও আমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "বহু ধন্যবাদ- লইয়া যাইবেন। মিসেস বসুও মাঝে মাঝে, বাছা বাছা বাঙ্গালী পরিবারের

মধ্যে উষাকে লইয়া গেলে, উহার সামাজিক শিক্ষা ক্রমে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিবে। রবিবারে ত উষার কিছু পড়া-শুনা নাই—শনি রবি—এই দুই দিনই পড়া শুনা বন্ধ দিলে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হইবে না। এ দুই দিন, যখন যেরূপ সুযোগ ও সুবিধা হইবে, আপনারা উষাকে বেড়াইতে লইয়া গেলেই ভাল হয়!"

মিসেস্ বসু বলিলেন, "আপনি যখন বলিতেছেন, তখন সেইরূপই করা হইবে।"

অতঃপর উষার সম্বন্ধেই অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মিস্ গ্রেহাম তাহার ভাষা-জ্ঞানের খুব প্রশংসা করিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে এই বয়সেই উষার যেরূপ অধিকার জন্মিয়াছে, সেরূপ ইংরেজ বালিকাদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। পিয়ানো ও বেহালাতেও উষা বেশ দক্ষতা দেখাইতেছে। ইংরাজি বা ফরাসী গান যখন সে গায়, তখন বাহির হইতে কেহ শুনিলে স্থির করিয়া বসিবে, নিশ্চয়ই এ বালিকা ইংরাজ বা ফরাসী জাতীয়া।

এই সকল কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবাবুর মনটি পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা, উষা এইবার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে। তিনি স্থির করিয়াছেন সংস্কৃত পড়াইবার জন্য একজন পণ্ডিত তিনি নিযুক্ত করিয়া যাইবেন, সেই পণ্ডিত সপ্তাহে দুই দিন বা তিন দিন আসিয়া উষাকে সংস্কৃত পাঠ দিবে।

কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে সাতটা বাজিল। দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আজ আমি এ সময় আসিয়া, আপনাদের বৈকালিক ভ্রমণে বাধা উৎপাদন করিলাম। মিস্ রোমানোর ফিরিতে কি এখনও বিলম্ব আছে?"

মিস্ গ্রেহাম উত্তর করিলেন, "তিনি ৮টার মধ্যে গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া থাকেন।"

দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এখন তবে আমি উঠি। কাল প্রাতে ৯টার সময় আবার আসিব। উষাকে আমার কথা বলিবেন।"—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হস্ত প্রসারণ করিলেন।

মিস্ গ্রেহাম তাঁহার করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন, "আপনি কার্ট রোড দিয়াই ফিরিবেন ত? বোধ হয় পথেই উষা ও মিস্ রোমানোর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে।"

সত্যই তাহা হইল। দেবেন্দ্রবাবু অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই, পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে চন্দ্রোদয় হইল। গিরি দরী বনভূমি সেই চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইয়া যেন হাসিয়া উঠিল। আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেবেন্দ্র বাবু দেখিলেন, মিস্ রোমানোর সহিত উষা আসিতেছে।

জ্যোৎস্নালোকে, পথে দাঁড়াইয়াই উহাদের সহিত মিনিট খানেক কথাবার্ত্তা কহিয়া দেবেন্দ্রবাবু বিদায় হইলেন।

স্যানোটরিয়মে আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিয়া, উষার সেই জ্যোৎস্নাধৌত তরুণ-সুন্দর মুখখানি, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রবাবুর মনের মধ্যে সুধা-বিতরণ করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মায়ের মন্দিরে

(চিত্র)

পঞ্জিকাতে সেদিন বেশ বড় রকমের একটা পুণ্যতিথির যোগের কথা লেখা ছিল। তাই মায়ের মন্দিরে সেদিন নরনারীর বিপুল জনতা। মন্দির প্রাঙ্গণে পূজার জন্য পুষ্পবিল্বদল দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। স্বার্থান্ধ সেবক-সম্প্রদায় মন্দিরের তিনটী বৃহৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, একটী ক্ষুদ্র দ্বার মাত্র উন্মুক্ত রাখিয়া, দ্বারপথ আগুলিয়া রহিয়াছে। জগন্মাতার মন্দিরে অর্থলালসার প্রচণ্ড কোলাহল—প্রণামী দাও—দর্শনী দাও—পূজা দাও—দক্ষিণা দাও।

সংসার-দুঃখ-তাপিত নরনারী মায়ের চরণে প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে আসিয়া, বিকিকিনির হট্টগোলে মনোমধ্যে যে ভাব লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে, তাহার মধ্যে পূজার তৃপ্তি নাই, সকলভোলা আত্মনিবেদন নাই।

মাতৃদর্শন আকাঙ্ক্ষিত নরনারী ক্ষুদ্র দ্বারপথে যথোপযুক্ত দর্শনী দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে। জনতার পেষণে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া মাতৃচরণ পূজার উদ্দেশে যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে, তাহা কোথায় যাইয়া পড়িতেছে তাহার স্থিরতা নাই।

পদতলে পূজার নির্ম্মাল্য পুষ্প বিমর্দ্দিত করিয়া, যখন তাহারা অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় করিয়া গর্ভগৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পাণ্ডার হস্তের সিন্দুরের তিলক মৃত্যুঞ্জয়ের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের ললাটে শোভা পাইতেছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে ঢাক ঢোল কাঁসি বিপুল উদ্যমে বাজিয়া উঠিল। কোথাকার একজন ধনী তাঁহার একমাত্র পুত্রের আরোগ্য লাভে সদলবলে মায়ের পূজা দিতে আসিয়াছেন। সোণা রূপার বিল্বপত্র, সোণার শাঁখা, নথ, নোয়া, বেনারসী শাড়ী, সওয়া মণ চিনির নৈবেদ্য, যুগল মেষশাবক, আরও কত কি—কে তাহার সংখ্যা করে? শত হৃদয়ের ব্যাকুল অনুরোধে যাহা সাধিত হয় নাই, তাহাই নিমেষমধ্যে সম্পাদিত হইল—বহৎ দ্বারপথ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। যথোপযুক্ত আদর সম্বর্দ্ধনায় সুবিধার মধ্যে ধনীর মাতৃপূজা নির্ব্বিঘ্নে আরম্ভ হইল। মন্দির প্রাঙ্গণে যূপকাষ্ঠের নিকটে তখন মেষশাবক দুইটী সদ্যস্নাত হইয়াছে। দুইটা পা ও মুণ্ডটাকে ধরিয়া মানুষগুলা নির্ম্মম টানা-হেচড়া সুরু করিয়াছে। ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল চীৎকারে তাহারা করুণ ক্রন্দনে ডাকিল—মা মা মা! হায়, কোথায় মা?

উষ্ণ রক্তের একটা বিস্তৃত রেখা টানিয়া লইয়া ছিন্নমুণ্ড দেহ দুটাকে একপার্শ্বে লইয়া গেল। বলির প্রসাদ বলিয়া বোধ করি মানুষগুলির লোলুপ রসনায় কাঁচা মাংস দেখিয়াই রসসঞ্চার হইতেছিল। এদিকে রক্তলোলুপ সারমেয়ের দল ক্ষিপ্তের মত রক্তধারা চাটিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। অদূরে প্রসাদ-লোলুপ মানুষগুলা তৎক্ষণে চর্ম্ম-উৎপাটন করিয়া দেহ দুইটাকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে। রক্তে ও মাংসে মানবের কি কুক্কুরের কাহার লোভ অধিক, তাহা প্রভেদ করা গেল না।

যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন গগন পবন ব্যাপিয়া একটা করুণ মা মা ধ্বনি জগৎ জুড়িয়া উঠিতেছে। পথিপার্শ্বে একজন অন্ধ ভিখারী করুণ কণ্ঠে গান গাহিতেছিল—

শ্মশান ভালবাসিস ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।

শ্রীমতী উষা দেবী।

সাহিত্য-সমাচার

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গল্পগ্রন্থ "যুবকের প্রেম" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৷৹।

—•—

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান"-সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত "কায় চিকিৎসা" বা আয়ুর্ব্বেদীয় মেটিরিয়া মেডিকা সম্পূর্ণ খণ্ড বাহির হইয়াছে। মূল্য ৩৲ টাকা।

—•—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী প্রণীত নূতন পুস্তক "ধ্বংসের পথে বাঙ্গালী" শীঘ্রই বাহির হইবে।

কলিকাতা ১৩।১এ বিডন ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে
শ্রী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
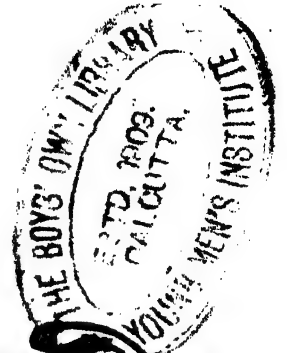
মানসী ও মর্ম্মবাণী

২০শ বর্ষ ১ম খণ্ড } শ্রাবণ, ১৩৩৫ { ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শৈবধর্ম্ম

শৈবধর্ম্ম বা পাশুপতধর্ম্ম কোন্ সময়ে ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা কঠিন; তবে ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারা যায় যে, মহাভারত বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেও, এ ভারতে শৈবধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত। এই শৈবধর্ম্মের অনেক শাখা দেখিতে পাওয়া যায়। সে কথা বলিবার পূর্ব্বে, ইহার অতি প্রাচীনত্ব ও বৈদিক শিষ্টসম্প্রদায়-গৃহীতত্ব যে অবিসম্বাদিত সত্য, তাহাই অগ্রে দেখান যাইতেছে।

প্রাচীন শিষ্টপরিগৃহীত উপনিষৎসমূহের মধ্যে 'অথর্ব্ব শিরস্' নামে সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদের মধ্যে এই শৈবধর্ম্মের উল্লেখ বিস্তৃত ও বিশদভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ এই উপনিষদের টীকা করিয়াছেন, সুতরাং ইহার প্রামাণিকত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না

এই অথর্ব্বশিরা উপনিষদে এই শৈবধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে-

"দেবা হবৈ স্বর্গং লোকমায়ন্ তে রুদ্রমপৃচ্ছন্ কো ভবানিতি।"

(দেবগণ [এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে] স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কে?)

"সোঽব্রবীত্ অহমেকঃ প্রথমমাসং বর্ত্তামি ভবিষ্যামি চ নান্যঃ কশ্চিন্মত্তো ব্যতিরিক্তঃ। সোঽন্তরাদন্তরং প্রাবিশত্ দিশশ্চান্তরং প্রাবিশত্, সোঽহং নিত্যানিত্যোঽহং ব্যক্তাব্যক্তোঽহং ব্রহ্মাব্রহ্মাহং প্রাঞ্চঃ প্রত্যঞ্চোঽহং দক্ষিণঞ্চ উদঞ্চোঽহং অধশ্চোর্দ্ধং চাহং দিশঃ প্রতিদিশশ্চাহং পুমানপুমান্ স্ত্রিয়শ্চাহং" ইত্যাদি।

(রুদ্র বলিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আমিই ছিলাম, এখনও আমিই আছি, আবার পরেও আমিই থাকিব। যে পুরুষ অন্তরের অন্তরে প্রবিষ্ট, যিনি বাহিরে সকল দিকের অভ্যন্তরেও প্রবিষ্ট, আমিই সেই। আমিই নিত্য ও অনিত্য, আমিই ব্যক্ত ও অব্যক্ত, আমিই ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম, আমিই পূর্ব্ব, আমিই পশ্চিম, আমিই দক্ষিণ ও উত্তর, আমিই অধঃ ও ঊর্দ্ধ, আমিই সকল দিক্ ও বিদিক্ ইত্যাদি।)

এই প্রকার বহুবাক্যের দ্বারা—সর্ব্বাত্মভাবে আত্মপরিচয় দিয়া পরিশেষে রুদ্র বলিয়াছিলেন্—

"যো মাং বেদ স সর্ব্বান্ দেবান্ বেদ সর্ব্বাংশ্চ বেদান্ সাঙ্গান্ অপি।"

(আমাকে যে জানে, সে সকল দেবতাকে জানে। আমাকে যে জানে, সে সকল অঙ্গের সহিত সকল বেদকেও জানে।)

তাহার পর দেবগণ সেই রুদ্রকে নিজরূপে দেখা দিবার জন্ম প্রার্থনা করিলেন। তখন (তাঁহারই কৃপায়) দেবগণ রুদ্রকে যথাযথরূপে দেখিতে পাইলেন। তাহার পর তাঁহারা ভক্তিভরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সেই রুদ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "ওঁ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমোনমঃ। ১। ওঁ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ। ২।ওঁ যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ স্কন্দস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ। ৩।" ইত্যাদি।

(যিনি রুদ্র তিনিই ভগবান্, তিনিই ব্রহ্মা, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি নমস্কার করি। ১। যিনি রুদ্র তিনিই ভগবান্ তিনিই বিষ্ণু, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি নমস্কার করি। ২। যিনি রুদ্র তিনিই ভগবান্ তিনিই স্কন্দ, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি নমস্কার করি। ৩। ইত্যাদি।)

এই অথর্ব্বশিরা উপনিষদের মধ্যে পাশুপত বা শৈব ব্রতের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্রতের ভস্মধারণ একটী প্রধান অঙ্গ।

"অগ্নিরিতি ভস্ম, বায়ুরিতি ভস্ম, জলমিতি ভস্ম, স্থলমিতি ভস্ম, ব্যোমেতি ভস্ম, সর্ব্বংহবা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি, যস্মাদ্‌ব্রতমিদং পাশুপতং, যদ্ ভস্মনা অঙ্গানি সংস্পৃশেৎ তস্মাৎ ব্রহ্ম তদেতত্ পাশুপতং পশুপাশ বিমোক্ষণায়।"

(অগ্নি যাহার নাম, তাহাও ভস্ম, বায়ুও ভস্ম, জলও ভস্ম, স্থলও ভস্ম, আকাশও ভস্ম, এই মন ও এই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, ইহা সকলই ভস্ম, যে কারণে ইহাই পাশুপত ব্রত। অঙ্গ সমূহকে যদি ভস্মের দ্বারা লিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া উঠে, পশুপাশবিমোক্ষণের জন্ম সেই হেতু এই ভস্মধারণরূপ ব্রত পাশুপত ব্রত (বিহিত হইয়াছে)।" এই পশুপাশ বিমোক্ষই হইল পাশুপত বা শৈব সম্প্রদায়ের চরম লক্ষ্য। এই শব্দটীর পাশুপতসম্প্রদায়সিদ্ধ প্রকৃত অর্থ কি, তাহা অগ্রে যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

এই অথর্ব্বশিরা উপনিষদে পাশুপতসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতার কয়েকটী নামও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং নাম কয়টীর তাৎপর্য্যার্থ কিরূপ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—

অথ কস্মাদুচ্যতে পরংব্রহ্ম, যস্মাৎ পরমপরং পরায়ণঞ্চ-বৃহৎ, বৃহত্যা বৃংহয়তি, তস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম। অথ কস্মাদুচ্যতে একঃ? যঃ সর্ব্বান্ প্রাণান্ সংভক্ষ্য সংভক্ষণেনাজঃ সংসৃজতি বিসৃজতি, তীর্থমেকে ব্রজন্তি, তীর্থমেকে দক্ষিণাঃ প্রত্যঞ্চ উদঞ্চঃ প্রাঞ্চঃ অভিব্রজন্তি একে, তেষাং সর্ব্বেষামিহ সদ্‌গতিঃ সাকং স একো ভূতশ্চরতি প্রজানাং তস্মাদুচ্যতে একঃ। অথ কস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ? যস্মাৎ ঋষিভির্নান্যৈর্ভক্তৈ দ্রুতমস্য রূপমুপলভ্যতে, তস্মাদুচ্যতে রুদ্রঃ। অথ কস্মাৎ উচ্যতে ঈশানঃ? যঃ স সর্ব্বান্ দেবান্ ঈশতে ঈশানীভির্জননীভিশ্চ পরমশক্তিভিঃ। অথ কস্মাৎ উচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ? যস্মাদ্ ভক্তা জ্ঞানেন ভজন্তি, অনুগৃহ্নাতি চ বাচং সংসৃজতি বিসৃজতি চ, সর্ব্বান্ ভাবান্ পরিত্যজ্যাত্মজ্ঞানেন যোগৈশ্বর্য্যেণ মহতি মহীয়তে তস্মাদুচ্যতে ভগবান্ মহেশ্বরঃ।"

(কি কারণে তাঁহাকে পরব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা হয়? যেহেতু তিনি পর, অপর ও পরায়ণ। তিনিই বৃহৎ কারণ, তিনিই বৃহতী দ্বারা বৃদ্ধির বিধান করিয়া থাকেন, এই কারণেই তিনি পরব্রহ্ম। কেন তাঁহাকে এক বলা যায়? যিনি সকল প্রাণকে ভক্ষণ করিয়া সেই ভক্ষণের দ্বারাই আবার স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং সংহারও করিয়া থাকেন। জনসমূহ তীর্থে যাইয়া থাকে। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকের লোকই তীর্থযাত্রা করে, কিন্তু সকল তীর্থযাত্রীরই

তিনি একমাত্র সদ্‌গতি, একা তিনিই সকল তীর্থযাত্রীর সহিতই সত্যস্বরূপে গমন করিয়া থাকেন, এই কারণেই তিনি এক। কেন তাঁহাকে রুদ্র বলা যায়? যে হেতু ভক্তব্যতিরেকে অন্য কোন ঋষিই তাঁহার রূপের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, এই কারণেই তিনি রুদ্র। কেন তাঁহাকে ঈশান বলা যায়? যেহেতু তিনি সকল দেবতারই ঈশ্বর হয়েন, জগতের জনয়িত্রী ঈশানী নামক শক্তিসমূহের তিনিই আশ্রয়, এই কারণেই তিনি ঈশান। কেন তিনি ভগবান্ মহেশ্বর? যেহেতু ভক্তগণ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ভজনা করেন, তিনিও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনিই বাক্‌সৃষ্টি করেন এবং বাক্যের উপসংহারও করেন, সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া নিজ জ্ঞান ও নিজ মহৈশ্বর্য্য প্রভাবে তিনিই মহতের উপর উপাসিত হইয়া থাকেন, সেই কারণেই তিনি ভগবান্ মহেশ্বর।)"

এই উল্লিখিত অংশের মধ্যে দেখা যায়, ভগবান্ মহেশ্বর বা রুদ্রের ঈশানী বা ঈশনী নামে বহুশক্তি বিদ্যমান আছে—কিন্তু সেই শক্তিনিচয়ের মধ্যে উমা বা মাহেশ্বরীর নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। অথর্ব্বশির উপনিষদ্ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের আদৃত কেনোপনিষদের মধ্যে আমরা ঈশশক্তিস্বরূপা উমাকে দেখিতে পাই। এই উমাকেই কেনোপনিষদ্ হৈমবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; কিন্তু ইনি যে রুদ্রের পত্নী, তাহা স্পষ্টভাবে সেখানে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পুরাণে ও মহাভারতে কিন্তু প্রচুর স্থানেই উমা হৈমবতী মাহেশ্বরী প্রভৃতি সকল নামেরই যে অর্থ ঈশানী শক্তি, তাহা ব্যক্ত ভাবেই কথিত আছে। প্রামাণিক উপনিষৎসমূহের মধ্যে পাশুপতধর্ম্মের একমাত্র উপাস্য দেব ভগবান্ মহেশ্বর ও তাঁহার শক্তি ঈশানী বা উমা সম্বন্ধে আর কোন অধিক পরিচয় আমরা দেখিতে পাইতেছি না। যাহাই হউক, ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঔপনিষদ্‌যুগে পশুপাশ বিমোক্ষের জন্য ভারতবর্ষে পাশুপতধর্ম্মের অনুষ্ঠান বেদমার্গানুযায়ী শিষ্টগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নব্যযুগের সংকুচিত ভারতের বাহিরে অবস্থিত হিমালয় পর্ব্বতে এই শৈবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল বলিয়া এই শৈবধর্ম্মকে ভারতীয় ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, এইরূপ কোন কোন পণ্ডিতের মত যে অজ্ঞানপ্রসূত, তাহা উদ্ধৃত উপনিষদ্‌বাক্যই বলিয়া দিতেছে। এক্ষণে মহাভারতে এই শৈবধর্ম্মের পরিচয় কিরূপ পাওয়া যায়, আগামীতে তাহাই দেখাইতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার ও সংস্কারে তিব্বতরাজ লালামা

নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে মগধের সিংহাসনে যখন সম্রাট্ মহীপাল অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিমান দেবরাজ লালামা তিব্বতের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া "প্রজারঞ্জন রাজা" নামে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। এই সময়েই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশ) শিক্ষা সমাধা করিয়া দেশে আসিয়া নিভৃতবাস কামনা করিয়া বজ্রাসন বা বিজ্রসনের (Vijrasana) (গয়াধামের সে কালের নাম) মহাবোধি-মন্দিরে অবস্থান করিতেছিলেন। দীপঙ্কর সে সময়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিব্বতরাজ লালামা তাঁহার যশে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দর্শন ও স্বরাজ্যে লইবার জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার তুলনা জগতে বিরল। সে বিচিত্র কাহিনী পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একটি মুণ্ডিত মস্তক নগ্নপদ পণ্ডিতের জন্য ভিন্ন দেশীয় একটি পরাক্রান্ত রাজার সমস্ত সম্পদ এবং রাজ্য পণ করা, অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত

দান করা, জগতের ইতিহাসে একটি অতুলনীয় কীর্ত্তি। সে মর্ম্মস্পর্শী বিচিত্র কাহিনী তিব্বতের রাজগ্রন্থাগার ও মন্দিরাদিতে যত্নরক্ষিত পুঁথি হইতে যেরূপ ও যতটা সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল—

এই সময় দীপঙ্করের যশঃসৌরভে সমগ্র এসিয়াখণ্ড পরিপূর্ণ। রাজা লালামা (তাঁর পুরা নাম লালামা ইএস্ এ হড্) (Lha-lama yese hod) তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিছুকাল হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কাণ্ড প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে বড়ই কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছিল, ইহার উপর বনধর্ম্মের প্রভাব—এই দুইটি কারণে দেশের বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা এতই খারাপ হইয়াছিল যে, সাধারণ জনমণ্ডলী এমন কি লামাগণ পর্য্যন্ত চরিত্রহীন হইয়া সমাজকে একান্ত বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছিল। এই অবস্থার একটু উন্নতি না হইলে দীপঙ্করের ন্যায় একজন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতকে লইয়া যাওয়া যায় না। তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যথোচিত সুগম ও উপযুক্ত করা আবশ্যক মনে করিয়া সে বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। রাজা তাঁহার রাজধানীকে ধর্ম্ম ও বিদ্যা-চর্চ্চার কেন্দ্র করার উদ্দেশ্যে জন-কোলাহল হইতে দূরে একটা নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া "নাহড়ি" (Nahari) প্রদেশের অন্তর্গত "খলিন" (Kholin) নামক মনোরম স্থানটী পছন্দ করিয়া রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত করিলেন। সেথান হইতেই অতি শান্ত ভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও বিদ্যা-চর্চ্চায় মন দিলেন। ১০২৫ খৃষ্টাব্দে খলিন নগরের একটা উচ্চ ভূমিতে বিখ্যাত "থরিং" বিহার প্রশস্ত উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। স্থানটি "পুরাং" পরগণার অন্তর্গত প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনীয় শান্তিময় স্থান। এখানে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধা মনে করিয়াই বিহার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই নিভৃত স্থানের এই মন্দির বৌদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রমের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া এখান হইতেই তিব্বতের সর্ব্বপ্রথম ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও সংযম অভ্যাসের ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিলেন। মন্দিরের আশ্রমাদি সম্পূর্ণ হইলে পর তিনি দেশের বালকদিগের মধ্যে ৭টী তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মেধাবী বালক সংগ্রহ করিয়া, যত্নের সহিত তাহা-দিগকে তিব্বতী ভাষায় শিক্ষিত করিলেন। তাহাদের পিতামাতা এবং অভিভাবকদের অনুমতি লইয়া ভিক্ষু-শ্রেণীর প্রথম স্তরে শিক্ষা দিয়া দীক্ষিত করিয়া বালকগণকে উপযুক্ত গুরুর অধীনে ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার পন্থা করিয়া দিলেন। ইহারা উপযুক্তরূপ শিক্ষালাভ করিলে পর ভিক্ষুর অত্যাবশ্যক চরিত্রগঠন ও তাহার আনুষঙ্গিক সাধনায় একমনে নিযুক্ত থাকার জন্য প্রত্যেকের সাহায্য এবং পরিচর্য্যার জন্য দুই জন করিয়া "শ্রমণেরা" (Sramanera) নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই ভাবে তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত মঠে আশ্রমবাসীর সংখ্যা একুশ জন হইল। ইহাদের প্রতি ব্যবহারে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি ক্রমে দেখিলেন বন ধর্ম্ম (ভূত, প্রেত পূজা) ও নিকৃষ্ট তান্ত্রিক ভাবাপন্ন তিব্বতী পণ্ডিতদিগের দ্বারা ইহাদের উপযুক্ত শিক্ষা হইতেছে না। ইহা বুঝিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া যুবকদিগকে কাশ্মীরের "আনন্দ গর্ভের" দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য প্রথমতঃ কাশ্মীরে পাঠাইয়া দেন; সেথান হইতে মগধ এবং অপরাপর স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট আকাঙ্ক্ষিত যথার্থ শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়া, বিনয় শাস্ত্রপাঠে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিবার জন্য উপদেশ দেন।

দীপঙ্করের আগমনের পূর্ব্বে এই ভাবে রাজা দেশের অবস্থা যথাসম্ভব উন্নত করিতে লাগিলেন। তিনি দেশের ধর্ম্মসংস্কার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণের তিব্বত গমনচেষ্টা মধ্যে এই যুবক-দিগকে শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে পাঠাইবার সময় বলিয়া-ছিলেন, "তোমরা বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, এই শিক্ষা-কাল মধ্যে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা পণ্ডিতদিগের সঙ্গে পরিচিত হইবে। আমার দেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে, ধর্ম্ম-সংস্কারের কার্য্যে সহায়তা হইতে পারে এমন

লোক তাঁহাদের মধ্যে পাইলে, আমার নামে সাদরে নিমন্ত্রণ করিবে। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীরের বিখ্যাত পণ্ডিত রত্নবজ্র এবং মগধের ধর্ম্মসঙ্ঘের সভাপতি যিনি থাকেন, এ উভয়কে তিব্বতে আনয়ন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে।" এইরূপে রাজার উৎসাহে বিদ্যার্জ্জন মানসে এবং তাঁহার আদেশমত ধর্ম্মাত্মা এবং শাস্ত্রপণ্ডিতের অনুসন্ধানে যুবকগণ দীর্ঘকালের জন্য স্বদেশ ও স্বজাতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা লা লামার চেষ্টার বিরাম ছিল না। তিনি এই একাগ্র চেষ্টার ফলও কতকটা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রবাদ এই যে, যদিও এই সময় রাজা ভারতবর্ষের ১৩ জন শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অত যত্নে শিক্ষিত ও প্রতিপালিত ২১ জন যুবকের মধ্যে ১৯ জন ভারতবর্ষে সর্পাঘাতে, জ্বরে এবং অন্যান্য রোগে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণ পরম স্নেহশীল লা-লামার প্রাণে ইহাতে বড়ই দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। উপরিউক্ত একুশটী যুবকের মধ্যে যে দুইটী ভাগ্যবান যুবক রক্ষা পান, তাঁহাদের নাম "রিন্ চেন্ জান্পো" (Rinchan-Zan-Po) এবং "লেগস্পাহি" (Legs-Pahi)। এই সাহসী বিদ্যানুরাগী যুবক-দুইটী অতগুলি সঙ্গী হারাইয়া প্রাণে ভীষণ আঘাত পাইয়াও নিরুৎসাহ হন নাই। প্রাণপণ চেষ্টার পরে স্বল্পকাল মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতদের নিকট জ্ঞানার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত "রিন্-চিন্ জান্পো" ভাষাতত্ত্ববিদ্ লোচাভা (পণ্ডিত) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রব্যাখ্যাতা বলিয়া যথেষ্ট আদরও পাইয়াছিলেন। ইঁহারা রাজাজ্ঞা স্মরণ করিয়া মগধের জগদ্বিখ্যাত বিক্রমশিলা বিহারে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের নিকট নানাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ মত অনুসন্ধানের ফলে ঋষিতুল্য মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের সহিত পরিচিত হন। তৎকালে মগধে তাঁহার তুল্য জ্ঞানী ও পণ্ডিত কেহ ছিল না, তথাকার অসংখ্য পণ্ডিত মধ্যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মগধের এই আর্হৎদিগকে মহাসাঙ্ঘিক (Maha sanghik) বলিত। স্বদেশের অবস্থা এবং মগধে দীপঙ্করের দায়িত্ব ইত্যাদি চিন্তা করিয়া লোচার্ভা রিন্ চিন্ ও লেগস্পাহী তাঁহাকে এ সময়ে তিব্বতে যাওয়ার জন্ম নিমন্ত্রণ করা অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া এবং প্রত্যাখাত হওয়ার আশঙ্কায় সে প্রস্তাব করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহারা দেশে ফিরিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, মগধের বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধতা এবং সঙ্ঘের অবস্থা বিস্তৃত ভাবে রাজার নিকট জ্ঞাপন করেন।

রাজা লা-লামা, লোচাভা রিন্ চিন্ ও লেগ্পাহীর মুখে সমস্ত অবগত হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় রাজা মহাপণ্ডিত দীপঙ্করের দর্শন বাসনা পরিত্যাগ বা ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তাঁহাকে আনাইবার চেষ্টায় ক্ষান্ত না হইয়া, ধর্ম্মের ও মগধের এবং দীপঙ্করের বর্ণনা শুনিয়া বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পুনরায় চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিব্বতের তাগশাল (Tag-tshal) পরগণায় "সাঙ"নিবাসী কর্ম্মী ও চতুর যুবক "জ্ঞাসন্রুকে (Rgya-tsan-gru) বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত বলিয়া অবগত হইয়া, তাঁহাকে "সাঙ্" হইতে আনাইলেন বহু উপদেশে তাহাকে উৎসাহিত করিয়া, তাঁহার সঙ্গে ১০০ জন পরিচারক ও অনুচর এবং প্রচুর সোণা দিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া পণ্ডিতের জন্ম আশাপথ চাহিয়া রহিলেন।

ভীষণ কষ্টকর দুর্গম পথে তাঁহাদের অশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল।

চীনে, তিব্বতে ও ভারতে যাতায়াতের দুইটী পথ ইতিহাসে লিখিত আছে। একটি পথে চীন হইতে তিব্বত ও নেপাল হইয়া ভারতবর্ষে আসিতে হইত, এইটি নিম্নে আসিবার পথ; অপরটি উচ্চে আসিবার পথ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই পথের অনুসন্ধানে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ-ইতিহাসের পক্ষে অমূল্য। ঐতিহাসিকগণ বলেন, "উদয়ন" (বর্ত্তমান আফগানিস্থান) হইতে পারস্য, তাতার, গান্ধার, কাসগর, মেরান, খোটান হইয়া চীন-প্রান্তপ্রদেশ "লাইওয়াং"

তত্রত্য "য়ে-ভ-সেলা" বা পঞ্চাগ্র পর্ব্বতের বিখ্যাত "টাবোথা চোরটেন" বিহার পর্য্যন্ত এই মহা-ভূ-ভাগ সম্পূর্ণই বৌদ্ধরাজ্য ছিল। সকল স্থানেরই ভাষা সংস্কৃত, সভ্যতা ভারতীয়, ধর্ম্মবৌদ্ধ। এই সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপী পথের পার্শ্বস্থ প্রত্যেক নগরে, এবং পল্লীতে পল্লীতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে চৈত্য, বিহার, ধর্ম্মশালা, পান্থনিবাস পর পর যেন মালার মত বিরাজ করিত। পথিকগণ এই সব স্থানে আশ্রয় পাইতেন। ইতিহাসের এই তথ্য পরে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সার ওরেল ষ্টাইনের আবিষ্কার। বালুকার নিম্নে লুপ্ত নগর, ভূগর্ভে প্রোথিত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ, এবং এই সব ধ্বংসস্তূপ হইতে তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত ও ব্রাহ্মী অক্ষরে ভারতবর্ষে তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত শত শত পুরাতন পুঁথি, সহস্র সহস্র বুদ্ধ বিগ্রহ, ইতিহাসের বর্ণনা নিঃসন্দেহ সপ্রমাণ করিয়াছে।*

জ্ঞান-সনক মগধে পৌঁছিয়া বুদ্ধমন্দিরে পূজা ও ভগবৎ-চরণে ধন্যবাদ জানাইয়া, কালবিলম্ব না করিয়া বিক্রমশিলা বিহারে পৌঁছিয়া, দীপঙ্করকে দর্শন করিলেন। সে সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের পথশ্রম যেন মুহূর্ত্তে দূর হইয়া গেল। তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া তিব্বতের রাজার নিমন্ত্রণ পত্র এবং বৃহৎ একখণ্ড স্বর্ণ উপঢৌকন দিয়া অতি বিনীতভাবে তিব্বতে তাঁহার পদার্পণ প্রার্থনা জানাইলেন। এই উপঢৌকন এবং তিব্বতের যাওয়ার জন্য প্রার্থনার উত্তরে দীপঙ্কর বলিলেন, "তবে তো আমার তিব্বতের যাবার দুটী উপলক্ষ ও উদ্দেশ্য আমার মনে স্বতঃই উপস্থিত হইতেছে, প্রথম—আমার ধনসঞ্চয় বাসনার পরিতৃপ্তি সুযোগ, দ্বিতীয়—অন্যের স্নেহ-ভালবাসা এবং অনুগ্রহে ঋষি মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন?" জ্ঞা-সন্-ক্রকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিলেন,

* "In 290 A. D. a Chinese scholar named "Chu su hing" visited Northern India by the way of Wu-than (Khotan)"

2. "During the reign of "Hian Wu" the Chinese Emperor (350—400 A. D.) Buddhism received the greatest encouragement. Nine tenths of the common people embraced the religion of Sakya Muni. The study of the Sacred books created a desire for pilgrimage to Fo-defang (land of Buddha). Travellers of this period taking the land route across the Budhist kingdoms in Higher Asia, extending from China to Persia, there were numerous Monastic institutions where the pilgrims found shelter and where Sanskrit was studied by the Clergy."

Rev. S. Beal's Buddhist Literature and S. Das.

3. "Fa hian (Chinese traveller) in 400 A. D. found Buddhism in flourishing conditon in the steppes of Tartary and the Oughours and the tribes residing west of the Caspian Sea, in Afganisthan then called Udayan, where the sacred language of India and Magadha prevailed."

(Fa-Hian's Travels, translated by S. Beal.)

4. Hieun-tsang (Chinese traveller) returned from his Indian tour across the Pamir, through Kashgar and Khotan districts."

(Hieun-tsang's Travels, by S. Beal.)

5. Sir Oral Stein (the great archæologist) discovered and collected :—

"Dhyan Mudra, Abhaya Mudra and other images of Buddha, besides several volumes of sacred books under the feet of those images, in the ruined temples at Meron, Khotan etc, books written in India in the 4th Ceutury A. D.

"In Tun-huang, a cave temple in ruins, he found one thousand images of Buddha.

(Ancient Khotan and ruins of desert Cathay—by Sir Oral Stein.)

"কিন্তু আপনাদিগকে আমি স্পষ্টই জানাইতেছি, ধনসঞ্চয় অথবা খ্যাতি অর্জ্জন, এ দুইয়ের কোনটিরই আমার কোন প্রয়োজনই দেখিনা।" একথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রদত্ত উপঢৌকন স্বর্ণখণ্ড তাঁর হাতে ফিরাইয়া দিলেন।

'জ্ঞাসন্' পণ্ডিতের এই ব্যবহারে যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে ও প্রত্যাখ্যানে এতই ক্ষুব্ধ হইলেন যে, তিনি সে সময় কিছুতেই অশ্রু-সম্বরণ করিতে না পারিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট তাহাদের পথক্লেশ, বর্ণনা করিতে করিতে, উত্তরীয় দ্বারা চোখ মুছিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন অনশনক্লেশ, প্রাণ হাতে করিয়া এই সুদীর্ঘ পথে দুর্লঙ্ঘ্য অরণ্যসমাকুল পর্ব্বতের পর পর্ব্বত উত্তীর্ণ হইতে কত সঙ্গীলোক প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট না বা সঙ্কল্পত্যাগ না করিয়া বুকে আশা পোষণ করিয়া এই যাত্রাপথের সব বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া কত কষ্টে মগধে পৌঁছিয়াছেন বলিতে লাগিলেন। অবশেষে কি তাঁহার কাছে এই দারুণ নিরুৎসাহের কথা শুনিতে হইল! এমন নিষ্ফলতার সংবাদ লইয়া কি করিয়া দেশে ফিরিবেন? রাজা আশাপথ চাহিয়া আছেন, তাঁহার কাছে পৌঁছিয়া এই বজ্রাঘাততুল্য ব্যর্থতার কথা কি করিয়া বলিবেন? ইত্যাদি সমস্ত দুঃখকাহিনীই বলিলেন।

করুণার প্রতিমূর্ত্তি দীপঙ্কর তাঁহাদের এই মর্ম্মস্পর্শী কথা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া নানাপ্রকার উপদেশ ও স্নেহ-সম্ভাষণে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ বা উত্তর প্রত্যাহার করিলেন না। তিনি তাঁহার দিব্যশক্তি গুণে জানিতেন, ক্ষেত্র উপযুক্তরূপ প্রস্তুত হয় নাই, তিব্বত যাওয়ার সময় এখনও আইসে নাই। সুতরাং যথোচিত উপদেশাদি দিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। লোচাভা বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও রাজা লালামা দেশের ধর্ম্মসংস্কার-সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না বা দীপঙ্করের দর্শন বাসনা তাঁহার হ্রাস হইল না। রাজার অন্যান্য কায ও কর্ত্তব্য মধ্যে ইহাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। এই এক উদ্দেশ্যে তাঁহার ধন জন ও জীবনসর্ব্বস্ব পণ, একথা সমবেত জনমণ্ডলী এবং সভাসদ্দিগকে দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া, আবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

লোচাভা-জ্ঞা-সন্রু রাজার নিকট বিদায় লইয়া বিশ্রাম জন্য বাড়ী গেলেন। বেশীদিন বাড়ী থাকা তাঁহার হইল না, রাজা অল্পদিন পরে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে। আবার মগধে বিক্রমশিলা বিহারে গিয়া দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে আজ্ঞা করিলেন। এবারে আরও বলিলেন, "যদি সে মহাপণ্ডিতকে আনিতে না পার, বা তাঁহাকে পাওয়ার যদি কোন আশাই না থাকে, তবে মগধে দীপঙ্করের পরেই যে পণ্ডিতকে জ্ঞানী ও পবিত্র বলিয়া বুঝিবে, অন্ততঃ তাঁকেই আমার নামে তিব্বত আসিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিবে।"

গত যাত্রার অভিজ্ঞতার ফলে এ যাত্রা সঙ্গে মাত্র পাঁচটী অনুচর এবং নিজেদের খরচের উপযুক্ত পরিমাণ মাত্র সোণা সঙ্গে লইয়া লোচাভা জ্ঞাসন্ পুনরায় মগধের পথে যাত্রা করিলেন। এই সময় গুং থান্ (Gugn than) বিহারের উৎসাহী যুবক "নাগ্ সো" (Nag tcho) লোচাভা জ্ঞাসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁর সঙ্গে মগধে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহার শিষ্য হওয়ার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু ভীষণ পথ, প্রাণের আশঙ্কা বিশেষতঃ পণ্ডিতকে আনার আশা একরূপ দুরাশা, ইত্যাদি বুঝাইয়া তাঁহাকে সংপ্রতি ক্ষান্ত থাকিতে বলিয়া, মগধ হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন, বলিয়া গন্তব্য-পথের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজা লা লামার শেষ পরিণাম, এই একটী উদ্দেশ্যে স্বর্ণ-সংগ্রহ চেষ্টা, কারাগারে মৃত্যু।

রাজা লা লামা বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কারের জন্য নানা ভাবে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্যপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ এখনও এই একমাত্র সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে আরও কত ব্যয় হইবে, তাহার নিশ্চয়তা

নাই। জ্ঞাসনের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে পারেন নাই ইত্যাদি চিন্তা করিয়া জ্ঞাসনের যাত্রার পর স্বর্ণসংগ্রহে মনোযোগ দেন। এই সময় তাঁহার রাজ্যের পুরাঙ প্রদেশের দক্ষিণে নেপাল রাজ্যের সীমায় তাঁহার কোন মন্ত্রী একটী স্বর্ণ-খনি আবিষ্কার করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, নিজেই অল্পসংখ্যক রক্ষিসৈন্য ও খননকারী সঙ্গে করিয়া সীমান্তে উপস্থিত হইলেন। গারলণ্ডের * রাজা বহু সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্দীভাবে নিজ রাজধানীতে একটি বৃহৎ লৌহপিঞ্জরে করিয়া লইয়া যান এবং কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যারপর নাই কষ্ট দিয়া তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত করিবার চেষ্টা করেন। এই রাজা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন। রাজা বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তিব্বতের এই রাজা মগধ হইতে জনৈক পণ্ডিতকে তিব্বতে লইয়া গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। অতএব যে পর্য্যন্ত ইনি আমার অধীনতা স্বীকার না করেন এবং আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত ইঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না।" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, এবং নিষ্ঠুরভাবে একটী সঙ্কীর্ণ লোহার গারদবেষ্টিত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

রাজা লালামার এই শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র চনচুব (Chan Chub) অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া চানচুব একশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পিতৃব্যের উদ্ধার জন্য যাত্রা করিলেন। গারলণ্ডের সীমায় পৌঁছিয়া রাজার প্রবল প্রতাপ, ও বিপুল সৈন্যের বিষয় জানিতে পারিলেন। এমতবস্থায় তাহার এই সামান্য সৈন্য লইয়া গারলণ্ড রাজ্য আক্রমণ করা অসম্ভব; তবে তাঁহাদের সমস্ত তিব্বতী সৈন্য লইয়া গারলণ্ড আক্রমণ করা যাইতে পারে সত্য। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধর্ম্মী গারলণ্ডের রাজা প্রতিশোধ অভিপ্রায়ে যদি কারাগারে রাজা লালামাকেই হত্যা করে! চানচুব এই সব চিন্তা করিয়া রাজ্য আক্রমণ হইতে ক্ষান্ত হইয়া মুক্তি মূল্য দিয়া রাজাকে মুক্ত করা যায় কিনা, এই উদ্দেশ্যে গারলণ্ড রাজার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

গারলণ্ডের রাজা চানচুবের প্রস্তাবে দুইটী সর্ত্তে মুক্তি দিতে পারেন জানাইলেন,—প্রথম সর্ত্ত এইরূপ যে, রাজা লালামা গারলণ্ড রাজার অধীনতা স্বীকার করিবেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন;—দ্বিতীয় সর্ত্ত এই, যদি প্রথম সর্ত্তে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে লালামার পরিমিত তাঁহার একটী স্বর্ণ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ সোণা লাগিবে, তাহা দিতে হইবে। চানচুব দ্বিতীয় সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়া, সোণা সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত সাং উ খাম্প (Tsang U Kham) প্রদেশের আরও নয়টি স্থানে প্রজাদিগের নিকট ভ্রাতা ও কর্ম্মচারী-দিগকে প্রেরণ করিলেন। প্রজাগণ ধর্ম্মপ্রাণ প্রজা-বৎসল রাজার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া আবশ্যক পরিমাণ সোণা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের হাতে দিলেন। তাঁহারা চানচুবের হস্তে সমস্ত সোণা দিয়া রাজার মুক্তির আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গারলণ্ডের রাজা সমুদয় সোণা গলাইয়া বন্দী রাজার মূর্ত্তিগঠনের আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকদিন পরেই গারলণ্ডের রাজা চানচুবের নিকট সোণা ফেরৎ পাঠাইয়া জানাইলেন "মস্তক গঠনের পরিমাণ সোণা কম হইয়াছে।" সোণা ফেরৎ দিয়া লালামার জীবন আর অসহনীয় করিবার জন্য তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

মনঃক্ষুণ্ণ ভ্রাতুষ্পুত্র চানচুব, গারলণ্ডের রাজার অনুমতি লইয়া কারাগারে খুল্লতাতের সহিত দেখা করিতে

* This was either the King of Kanonj or the Raja of Garwal.

—Indian Pandits in the land of snow. Das.

গেলেন। তাঁহার প্রতি এই অত্যাচার, কারাগারের এই ক্লেশকর ব্যবস্থা চক্ষে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দারুণ মনঃকষ্টে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন্, পিতঃ, আপনি পরম স্নেহশীল, ধর্ম্মপ্রাণ ও দয়াবান, আপনি সর্ব্বজনপূজ্য দেবতুল্য ব্যক্তি, আমার মনে হয় ইহা আপনার বর্ত্তমান পুণ্যময় জীবনের জন্য নয়, সম্ভবতঃ এই কঠোর শাস্তি আপনার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। সে যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এই দুষ্টের রাজ্য আক্রমণ করা এবং ইহাকে পরাজিত করিয়া আপনার উদ্ধারসাধন করা। কিন্তু ইহার দুশ্চরিত্রতার কথা যখন ভাবি তখন আশঙ্কা হয়, দুরাচার রাজা প্রতিশোধের জন্য হয়ত আপনাকেই নিষ্ঠুরের ন্যায় কারাগারে হত্যা করিবে; তাই বড় কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছি। গারলঙের রাজা প্রস্তাব করেন, আপনি যদি তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, একান্ত পক্ষে সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেও আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন

একথা শুনিয়া রাজা লালামা উত্তর করিলেন "এরূপ নীচাশয় ধূর্ত্ত এবং নাস্তিকের অধীনতা স্বীকার করিয়া জীবন ধারণ করার অপেক্ষা মৃত্যু বরং আমি সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ মনে করি

চানচুব পিতৃব্যের নিকট দ্বিতীয় সর্ত্তে সোণার পরিবর্ত্তে মুক্তির কথাও বলিলেন এবং সে চেষ্টাও যে নিষ্ফল হইয়াছে, উল্লেখ করিয়া জানাইলেন। প্রচুর সোণা দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি গারলঙ রাজার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই তাহাও বলিলেন, এবং তাঁহার মুক্তির জন্য আরও সোণা সংগ্রহ জন্য যাওয়ার তাহার ইচ্ছা ইত্যাদি সকল কথা বলিয়া, রাজার উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্র চানচুবের মুখে সকল কথা শুনিয়া, রাজা নিজ জীবনের শেষ বাসনা মৃত্যুদ্বারে দাঁড়াইয়া, যাহা বলিলেন, তাহাতে একদিকে দীপঙ্করের জন্য তাঁহার অসীম আকর্ষণ, অপর দিকে তাঁহার আত্মসুখ বা আত্মচিন্তাশূন্য নিষ্কাম জীবনই বুঝায়। স্বল্প মৃদু হাসিয়া বলিলেন;—

"প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ প্রিয় পুত্র, এ কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, আমাদের বংশের গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মরক্ষাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমার অভিপ্রায়, ভগবান বুদ্ধদেবের নীতি অনুসারে প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। আমার নিয়তি ও কর্ম্মফলে আমার ভাগ্যে দেশের ধর্ম্মসংস্কার দেখা ঘটিল না। আমি বৃদ্ধ এবং মৃত্যু-দ্বারে উপনীত। ধর, তুমি আমাকে মুক্ত করিতেই যেন সমর্থ হইলে, কিন্তু আমি তো আর অমর নই! বড় জোর আমার জীবন আর দশ বৎসর, তাতে কিই বা সম্ভব? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোনও জন্মেই ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম্মের জন্য আমার তুচ্ছ জীবন দান করিতে সমর্থ হই নাই। এবারে যদি সুযোগই হইয়াছে, বৎস, আমাকে পবিত্র ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান করিতে দাও। এক কণা সোণাও আমার এ তুচ্ছ জীবনের জন্য এই দুষ্ট রাজাকে দিও না। সমস্ত সোণা ফিরাইয়া লইয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মার্থে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিখ্যাত পণ্ডিতকে আনাইবার জন্য ব্যয় কর। যদি তুমি কখনও আমার চিরাকাঙ্ক্ষিত পরমপূজ্য পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে আনিবার জন্য মগধে দূত প্রেরণ কর, সেই লোক দ্বারা আমার এই শেষ নিবেদন তাঁহাকে জানাইও, তিব্বতের হতভাগ্য রাজা লা লামা ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের জন্য, এবং পণ্ডিত মহোদয়েরই উদ্দেশ্যে স্বর্ণসংগ্রহ করিতে গিয়া গারলঙের রাজার কারাগারে আজ বন্দী, মৃত্যুর দ্বারে উপনীত। পণ্ডিত যেন তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য করুণা করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কামনা এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পণ্ডিতকে তিব্বতে আনাইবেন, এবং তাঁহার সাহায্যে ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিবেন। কিন্তু হায়! তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না, কোন্‌দিন কখন তিনি পণ্ডিতের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, এই আশায় পথের

দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই ত্রিপবিত্র * চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

এই করুণ দৃশ্য চানচুবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। রাজার শেষ মর্ম্মভেদী কথাগুলি শুনিতে শুনিতে, খুল্লতাতের নিকট তিনি বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। গারলঙের নিষ্ঠুর রাজা অনেকক্ষণ তাঁহাদিগকে একত্র থাকিতে দেন নাই। চানচুবের পক্ষে অশ্রু সম্বরণ চেষ্টা বৃথা, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে "হায় খুল্লতাত, তোমার অদৃষ্টে এমন দারুণ কষ্ট ছিল!" বলিতে বলিতে এক পদ অগ্রসর হন, আর ফিরিয়া দেখেন। লৌহগারদের ফাঁক দিয়া পিতৃব্যকে দূর হইতে যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিতে দেখিতে পথ চলিতে লাগিলেন। নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া কাতর প্রাণে চানচুব দেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজধানীতে ফিরিয়া রাজার মুক্তির জন্য স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সংবাদ পাইলেন, কারাগারেই রাজা লালামার মৃত্যু হইয়াছে। রাজার এরূপ শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র বিশ্ববাসী অত্যন্ত বিচলিত ও শোকাকুল হইয়াছিল। †

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ।

*। ত্রিপবিত্রাত্মা=বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ।

† The Great King La-Lama, King of Tibet ruled his kingdom from 1005—1036 A D. He was contemporary of Mahipal, Emperor of Magadha and of Nayapal, King of Bengal & Magadha (Magadha as Capital)
—V. Smith's Ancient India & Rev. S Beal's Buddhist Literature.

বারতা

মন ভরে গিয়েছে আশায়,
সে কথা ভাষায়
করেনিক পরকাশ নিগূঢ় স্বপন।
বহু সুদূরের হাওয়া করে আজ আসা যাওয়া
সে বারতা করিয়া বহন!

হেথায় ঝরিছে ফুল, আকাশ ধূসর,
হিম বায়ু উদাসীন, পিক কলস্বর
কখন গিয়েছে নেমে, কপোত সে থেমে থেমে,
গদ্গদ কাতর কণ্ঠে করে শুধু আত্মনিবেদন!

তোমার সুদূর পরবাসে,
বসন্ত বাতাসে
বেজে ওঠে বনানীর ললিত গীতিকা,
পরিমল সমাকুল, অযুত কমলকুল,
অশোকের জ্বলে দীপ্ত শিখা!
তাহারি আভাস আসে আকাশে ভাসিয়া,
ধূসর আসর ছাড়ে, নীলে বিকশিয়া
সোণার কিরণ নামে, কলহংস দল বামে,
বহি আনে মাধবের পুষ্পবাণ-বাহিত লিপিকা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

পিটুলির জুতা

(গল্প)
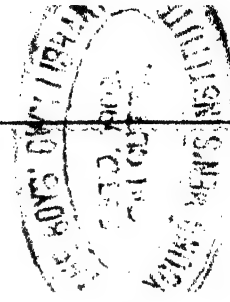
মাদারিপুরের বিস্তৃত বিল; বিলের ধারে খৃষ্টান পল্লী; বহুদিন পুর্ব্বে ফরিদপুর মিশনের চেষ্টায় গ্রাম-শুদ্ধ নমঃশূদ্র খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। অবসাদগ্রস্ত শিথিল হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্ট নির্লিপ্তভাবে চাহিয়া রহিল। মুসলমান মোল্লারা খবর পাইয়া তাহাদের আপন দলে টানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

পল্লীর একপ্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কুটীর, পরিষ্কার ঝর-ঝরে, দেখিতে যেন ছবিখানি। সামনে একটু বেড়া দেওয়া হাতা, তাহাতে কয়েকটা ফুলের গাছ। কুটীর ঘেঁসিয়া পুঁই, লাউ ও কুমড়ার লতা বাঁশের জাফরী বাহিয়া চালে উঠিয়াছে। কুটীরে বিধবা মগ্‌দলীনা * তাহার তিনবৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রের সহিত বাস করে ঘরের মধ্যে একটী তক্তাপোষ, এক পার্শ্বে একটী আমকাঠের সিন্দুক, তাহার উপর কাঠের হাতবাক্স ও একটী চরকা, এক কোণে গুটী চার পাঁচ হাড়ী ও সোণার ন্যায় উজ্জ্বল মার্জ্জিত পিতল কাঁসার বাসন, চাল হইতে তিনটী শিকা ঝুলিতেছে, দেওয়ালের এক-দিকে ক্রুশে বিদ্ধ যীশুমূর্ত্তি ও অপর দিকে বাঙ্গালী সৈনিকের সাজে সজ্জিত একটী যুবকের ক্ষুদ্র ফোটো-গ্রাফ বাঁধান, তাহার উপর টাট্‌কা ফুলের মালা। এই হইল কুটীরের আসবাব। সকলি কিন্তু পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে মগ্‌দলীনার স্বামী পূর্ণচন্দ্র দাস বাঙ্গালী সৈনিকদলে কুট-এল-আমারার যুদ্ধে চিরবিশ্রাম লাভ করে। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির একমাসের মধ্যেই গ্রামে কলেরার প্রকোপে অভাগিনীর পিতামাতা ও ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সদ্যোবিধবা তাহার শিশুপুত্রটী লইয়া মাত্র দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে অনাথা হইয়া পড়ে।

মিশন হইতে পাঁচটাকা মাসিক সাহায্যে ও আপনার চেষ্টায় ধান ভানিয়া, চিঁড়া কুটিয়া, শিকা বুনিয়া, চরকা কাটিয়া কোনওরূপে তাহার দিনপাত হয়। অল্পবয়স্কা সুশ্রী বিধবাকে অনেক খৃষ্টানযুবক তাহার পুত্র থাকা সত্ত্বেও বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সে প্রত্যেকের প্রস্তাবই ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। তাই পল্লীস্থ ক্ষুদ্র গির্জ্জার বৃদ্ধ আচার্য্য জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বাস মহাশয় তাহাকে নিজ কন্যার মত স্নেহ করেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সে আছে।

তিন বৎসরের পুত্র দুলাল, কালো রঙের উপর মস্ত নাক খাঁড়ার মত ঝুলিয়া আছে, মাথাভরা কোঁকড়া চুলের নীচে বড় বড় দুইটী উজ্জ্বল চোখে যেন মাণিক ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। আধ আধ স্বরে কত কথা, কত গানের উলোট পালোট বেসুরা তান, সমস্তদিন কুটীর-খানিকে মুখরিত করিয়া তাহার দুঃখিনী মাতার সকল দুঃখ দূর করে। মা টেকোয় সূতা কাটে, ছেলে আসিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। কখনো হাতে পাইলে টেকো আড়া করিয়া দেয়। মা ধান শুকাইতে দিলে ছেলে মুঠা মুঠা বাহিরে ফেলিয়া পাখী ডাকে,—"পাপি আ' আ' ধাম্ খাবি আ'।" মা চরকা কাটিতে বসিলে হাতল ধরিয়া টানাটানি করে,—"আমি ঘুলোবো।"

খেলা করিতে করিতে চক্ষের আড় হইলে মা ডাকে, "আমার দুলাল বাপি কৈ ?" দুলাল অমনি মধুর কণ্ঠে সাড়া দেয়, "তি বলথো ?" তাহার পর আসিয়া ঝাঁপাইয়া কোলে পড়ে ও একরাশি চুম্বন লইয়া আবার টলিতে টলিতে চলিয়া যায়।

* ইংরাজী Magdalene এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ "মড্‌লীন", কিন্তু দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায়শঃ উহার বিকৃতি "মগদলীনা"ই শুনা যায়।

রাত্রে মা ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে করিয়া, অনেকক্ষণ প্রার্থনার পর, শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে। আবার সকাল হইতে ছেলের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়, মাকে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইতে দেয় না।

দুলালের খেলার সামগ্রী, কয়েকটী ছোট ছোট মাটীর অর্দ্ধভগ্ন হাঁড়িকুঁড়ি, একটী বিবর্ণ কাঠের ঘোড়া, একটী ভাঙ্গা চিনামাটীর পুতুল, আর একটী তাহার বড় আদরের ডলি পুতুল, কলিকাতার কোনও পাদরী সাহেব বড়দিনের সময় আসিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পুতুলের মাথায় সত্যকার চুলে লাল ফিতা বাঁধা, গায়ে জামা। মা দিনের মধ্যে শতবার তাহা সাবধানে শিকায় তুলিয়া রাখে, দুলাল শতবারই তাহা নামাইয়া লয়।

সকালে উঠিয়াই দুলাল খোঁজ করে, "আমা তুতুল কৈ?" তাহার পর 'তুতুল' লইয়া জিজ্ঞাসা করে, "এর জুতো নেই কেন?" এ প্রশ্নের মীমাংসা আর হয় না। গায়ে জামা অথচ পায়ে জুতা নাই কেন, মাকে যখন তখন জিজ্ঞাসা করিয়া অস্থির করিয়া তুলে।

অবশেষে একদিন তাহার মা চাউল বাঁটিয়া পিটুলির দুইটী ছোট ছোট সাদা জুতা পুতুলকে পরাইয়া দিল। সেদিন দুলালের আনন্দ দেখে কে! পিটুলির জুতা দুই দিনেই নষ্ট হইয়া যায়, আবার তাহার মাতাকে নূতন প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়।

দুলাল রবিবার বিকালে আচার্য্য বিশ্বাস মহাশয়ের প্রদত্ত রেশমের ফ্রক ও জুতায় ফিট ফাট্ সজ্জিত হইয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, মা দরজার কাছে বসিয়া তাহাকে পাহারা দেয়। মগদলীনা কোন দিনই গির্জ্জায় যায় না, বা কাহারও সহিত মিশে না, আচার্য্য মহাশয়ের অনুমতিক্রমে আপন কুটীরেই প্রার্থনা সারিয়া থাকে।

২

আজ ভোর হইতে দুলালের গা বড় গরম, ক্রমাগত উস্‌খুস খুঁৎখুঁৎ করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত মাকে ছাড়িতেছে না। একটু বেলা হইতেই মা ছেলেকে বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া শুষ্কমুখে বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে হাজির হইল। বিশ্বাস মহাশয় থার্ম্মমিটরে দেখিলেন, ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। সাবধানে বহি দেখিয়া হোমিওপ্যাথি বাক্স হইতে যথাবিহিত ঔষধ দিয়া তাহাকে ঘরে পাঠাইয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দূরগ্রামের সব-অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সুগার-অফ-মিল্ক দেওয়া ঔষধ খাইয়া দুলাল বলিল, "মা, পার্দি-ছাবের (পাদরী সাহেবের) ওচুধ বালো।" তাহার পরই নিঃঝুম হইয়া পড়িল।

সাব-অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আসিলেন, মাথায় বরফ পড়িল, সেবারও কোন ত্রুটী হইল না—মা তিন দিন জলবিন্দু মুখে না দিয়া ঠায় ছেলে লইয়া বসিয়া। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্থ দিন প্রাতে মাতার কোলে দুলাল একবার চক্ষু মেলিয়া বলিল, "মা, আমা তুতুল?" তাহার পর সকলই ফুরাইল।

মা দেখিল, আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র অঙ্গ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল, নিশ্বাস রোধ হইয়া গেল। মার চোখে জল নাই, মুখের ভাব অবিকৃত, অটল গাম্ভীর্য্যে ভরা। ধীর ভাবে বিছানা করিয়া আস্তে আস্তে তাহাতে দুলালকে সাবধানে শোয়াইয়া দিল, বুঝি ভয় পাছে তাহার কোমল অঙ্গে আঘাত লাগে। তাহার পর দরজায় শিকল দিয়া বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে গিয়া স্থির স্বরে একটী কফিনের বন্দোবস্ত করিল। তাহার দুলাল যে বিনা শবাধারে মাটীতে প্রোথিত হইবে, তাহা যে সহ্য হয় না।

শবাধার লইয়া যে আসিল, তাহাকে সে আপনার শেষ সম্বল ৬৷০ দিয়া, একরাশি ফুল লইয়া শবাধার সাজাইতে বসিল।

দুলালের চুলগুলি বেশ করিয়া আঁচড়াইয়া, রেশমের ফ্রক পরাইয়া, তাহার কপালে একটি টিপ কাটিয়া দিল। অবশেষে শবাধারে তাহার পৈতৃক অতিযত্নে রক্ষিত শালখানি পাতিয়া তাহাতে শোয়াইল। নজর পড়িল, পা খালি। খালি পায়ে দুলাল আমার প্রভুর কাছে যাইবে? প্রাণে যে তাহা সহে না; কিন্তু দুলালের জুতা

কোথায়? এ-ধার ও-ধার,—কৈ, ঘরে তো নাই;—কোথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—দুলালের পুতুলের জন্য পিটুলির জুতা করিয়া দিত। চাউলের হাঁড়ীতে দুই মুঠা চাউল আছে দেখিয়া তাহা জলে ভিজাইয়া দিল।

মা যখন পিটুলির জুতা প্রস্তুতে ব্যস্ত, বাহিরে তখন ভিন্ন গ্রামের এক বিকলাঙ্গ মুসলমান ভিখারী ডাকাডাকি করিতেছে, "মাগো এক মুঠো ভিক্ষা পাই, আল্লা তোমার ভাল করবে।" মগদলীনা তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

জুতা পরান হইলে, শবাধার বন্ধ করিয়া, একরাশি ফুলের সহিত মা তাহার সর্ব্বস্বধন, সাত রাজার ধন মাণিক বুকে তুলিয়া, বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে পৌঁছাইয়া দিল।

৩

দুলালের কবর যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, মগদলীনা রাত্রে আপন কুটীরে এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে। বিশ্বাস মহাশয় তাহাকে আপন বাটীতে স্থান দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে থাকিতে রাজি হয় নাই।

ঘর অন্ধকার। হঠাৎ যেন দেখিল সামনে দুলাল উপস্থিত। "বাবা আমার, তুমি এসেছ? কিন্তু একি, তোমার মুখ এমন শুক্নো কেন? তোমার কি এখনো অসুখে বড় কষ্ট হচ্ছে?"

দুলাল আধস্বরে বলিল, 'মা, আমার পায়ে কি দিয়েছ? আমি যে প্রভুর কাছে যেতে পারছি না!

মা দেখিল একি! পায়ে যে দুইটী বৃহৎ জুতা, অসম্ভব ভারি! দুলাল তাহার ভারে আড়ষ্ট! "মরি মরি বাবা আমার, এ কি ক'রে হল? আমি যে তোমার পায়ে দুটী ছোট ছোট জুতো করে দিয়েছিলুম! আহা কতই লাগছে!"

হঠাৎ যেন কে ডাকিল, "মগদলীনা!"—মগদলীনা চাহিয়া দেখে দেওয়ালের ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্ত্তি যেন সজীব হইয়া কথা কহিতেছেন। যীশু যেন বলিলেন, "মগদলীনা, পরমেশ্বরের প্রার্থনায় আছে 'অদ্য আমাদের অন্ন দাও' (Give us this day our daily bread—Lord's Prayer) সেই অন্ন ভিক্ষা করিতে তোমার দুয়ারে ক্ষুধাতুর আসিয়াছিল, তুমি তাহাকে বঞ্চিত করিয়া তোমার পুত্রের পায়ে অন্নের জুতা দিয়াছ। অন্নের অপমান হইয়াছে, ভগবানের নিকট তুমি অপরাধী। আজ তাই তোমার দুলাল স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না

যীশুখৃষ্টের সহিত দুলাল যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। মগদলীনা বাহির হইয়া দেখিল পূর্ব্বগগন লোহিতবর্ণে উদ্ভাসিত, ভোর হইয়াছে।

অনেক ডাকাডাকির পর মিশন হাউসের একজন লোক বিশ্বাস মহাশয়কে ডাকিয়া দিলে মগদলীনা তাঁহাকে রাত্রের স্বপ্নের কথা বলিয়া দুলালের কবর উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিল। উপস্থিত সকলে শুনিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—শোকে দুঃখে ইহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। শুধু বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয় যোড়হস্তে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনুচরবর্গকে ডাকিয়া কবর খুঁড়িয়া দুলালের শবাধার বাহির করিবার আজ্ঞা দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না। সকলে তাঁহার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

কফিন খোলা হইলে—মা দেখিল—দুলাল তেমনি শুইয়া আছে, কিন্তু মুখ বড়ই বিষন্ন। জুতাযোড়া পা হইতে খুলিয়া মা বিলের জলে ফেলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল, আর এক মুহূর্ত্তও সেথায় দাঁড়াইল না। সমস্ত দিন আর কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বিশ্বাস মহাশয়ের আজ্ঞায় কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে গেল না।

রাত্রে মগদলীনা স্বপ্নে দেখিল—আবার দুলাল যেন আসিয়াছে, কিন্তু তাহার মুখ আর বিষন্ন নহে, স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভরা। দুলাল বলিল, "মা, এইবার আমি স্বর্গরাজ্যে যাচ্ছি, তুমিও আমার সঙ্গে এসো। প্রভু তোমাকেও ডেকেছেন।"

মা বলিল, "চল বাবা, যাই।"

*   *   *

পরদিন প্রাতে বিশ্বাস মহাশয় খবর লইতে আসিয়া দেখিলেন—কুটীরে মগ্‌দলীনার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, মুখে নির্ম্মল প্রশান্ত হাস্য, যেন ঘুমাইতে ঘুমাইতে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে।

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু।

বেদ-কথার পরিশিষ্ট

(১) যজ্ঞ শ্রেণি-বিভাগ

যজ্ঞ

স্মার্ত্তকর্ম্ম   শ্রৌতকর্ম্ম

পাকযজ্ঞ (১)   হবির্যজ্ঞ (২)   সোমযজ্ঞ

প্রাতর্হোম সায়ংহোম স্থালীপাক নবযজ্ঞ বৈশ্বদেব পিতৃযজ্ঞ অষ্টকা

অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম উক্‌থ্য ষোড়শী বাজপেয় অতিরাত্র অপ্তোর্যাম

অগ্ন্যাধান (বা অগ্ন্যাধেয়) অগ্নিহোত্র ইষ্টিযাগ নিরূঢ় পশুবন্ধ (৩)
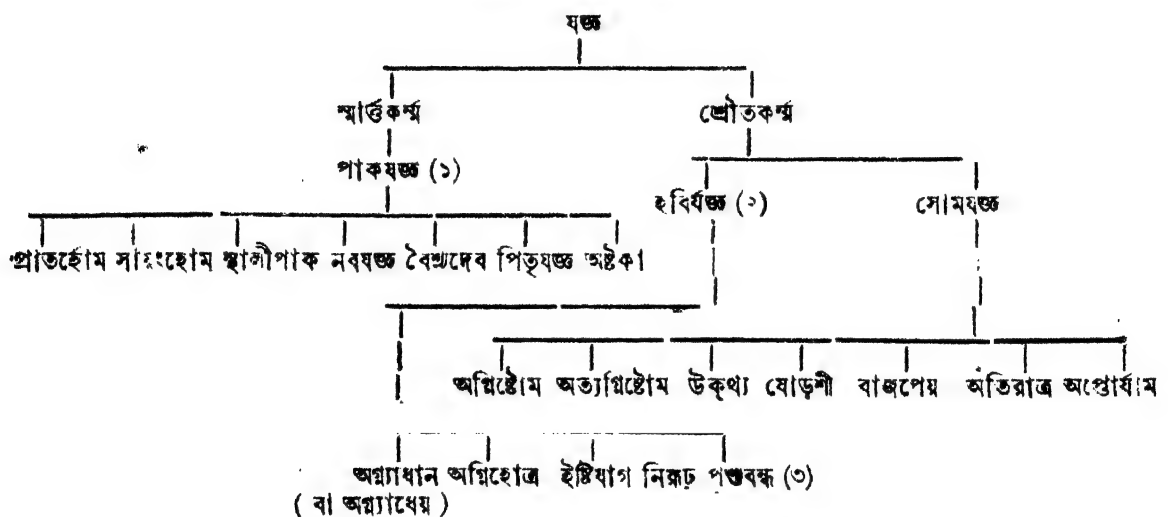
অগ্নীষোমীয় পশুযাগ সবনীয় পশুযাগ

দর্শ পৌর্ণমাস আগ্রয়ণ চাতুর্মাস্য
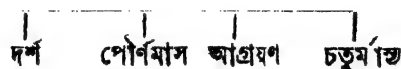
(১) গৃহ্যসূত্রভেদে গৃহস্থের পাকযজ্ঞ বিভিন্ন। আশ্বলায়ন মতে হুত, প্রহুত ও আহুত এই তিনটি পাকযজ্ঞ। অন্য সূত্রকারের মতে হুত, প্রহুত, আহুত, শূলগব, বলিহরণ, প্রত্যবরোহণ, অষ্টকাহোম এই সাতটি পাকযজ্ঞ। মতান্তরে শ্রবণাকর্ম্ম, সর্পবলি, আশ্বযুজী, আগ্রয়ণ, প্রত্যবরোহণ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ও অন্বষ্টকা এই কয়টি পাকযজ্ঞ।

(২) মতান্তরে অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, দাক্ষায়ণ, কৌণ্ডপায়িনাময়ন, সৌত্রামণী এই কয়টি হবির্যজ্ঞ।

(৩) নিরূঢ় পশুবন্ধ প্রকৃতি ; অগ্নীষোমীয় ও সবনীয় পশুযাগ উহার বিকৃতি বলিয়া উহাদিগকে হবির্যজ্ঞশ্রেণি-মধ্যে দেখান হইল। বস্তুতঃ উহারা সোমযজ্ঞের অন্তর্গত।

প্রাগ্‌বংশ শালা

আহবনীয়

উত্তরবেদি

দক্ষিণাগ্নি
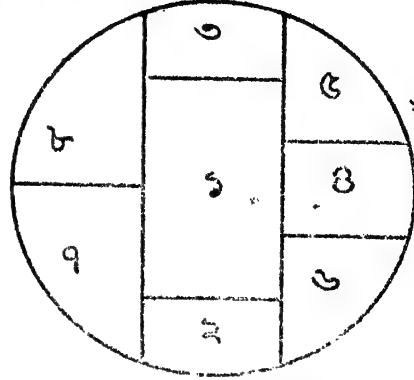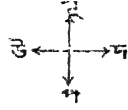
গার্হপত্য

অষ্টাকপালোপধান
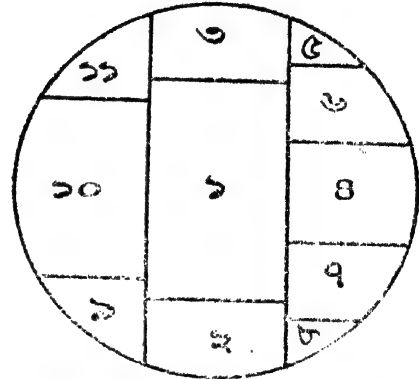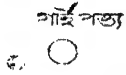
অগ্নীষোমীয় একাদশ কপালোপধান

["মানসী ও মর্ম্মবাণী" ১৩৩৪ সাল পৌষ সংখ্যা ৪১৭ পৃষ্ঠা।]

অগ্নীৎ ধৃষ্টি (উপবেষ) দ্বারা গার্হপত্য খরের অঙ্গারগুলি ঠেলিয়া খরের পূর্ব্বাংশে লইয়া যান। পশ্চিম ভাগ খালি হইলে ঐ তপ্তস্থানে কপালগুলি সাজাইতে হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য। এই অঙ্গার হইতে একখানা অঙ্গার ঐ রিক্তস্থানে আনিয়া উহার উপর মধ্যম কপাল রাখা হয়। ঐ কপাল বামহাতের অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া উহার উপর অঙ্গার রাখা হয়। মধ্যম কপালের পশ্চিমে দ্বিতীয় কপাল ও পূর্ব্বে তৃতীয় কপাল। মধ্যমের দক্ষিণে চতুর্থ কপাল, চতুর্থের পূর্ব্বে পঞ্চম, চতুর্থের পশ্চিমে ষষ্ঠ এবং সকলের উত্তরে সপ্তম ও অষ্টম রাখা হয়। অগ্নীষোমীয় একাদশ কপালও ঐরূপে সাজাইবে। তৎপরে গার্হপত্য হইতে জলন্ত অঙ্গার লইয়া সমুদয় কপাল আচ্ছাদন করিয়া উত্তপ্ত করিয়া তপ্ত কপালের উপর পুরোডাশ রাখিলে উহা নীচে হইতে তাপ পাইয়া পক্ক হইবে। সেই সময়ে অগ্নীৎ উপসর্জ্জনী (পিষ্ট ব্রীহিকে পিণ্ডাকার করিবার জন্ত মিশাইবার জল) গার্হপত্যে গরম করেন।

(·) শ্রৌত পদার্থ নির্ব্বাচন

ই—ঋত্বিক্‌চতুষ্টয় সম্পাদ্য সপত্নীক যজমান কর্ত্তৃক কর্ম্ম।

যজমান—যিনি নিজের জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। কর্ম্মকালে যজমান আহবনীয়ের দক্ষিণে উত্তরমুখে বসেন।

ঋত্বিকচতুষ্টয়—

অধ্বর্য্যু—যজমানস্য অধ্বরং ইচ্ছতীতি অধ্বর্য্যুঃ। প্রথমে ইঁহার বরণ হয়। কর্ম্মের আরম্ভ ও সমাপ্তি ইঁহার সম্পাদ্য।

ব্রহ্মা—ঋক্ সাম যজুঃ মন্ত্রক কর্ম্মের ত্রুটিতে অগ্নিত্রয়ে প্রায়শ্চিত্তাহুতিহোমকর্ত্তা—ইনি যজমানের পূর্ব্বে উত্তর-মুখ হইয়া বসেন। প্রণীতাপ্রণয়নাদিতে অনুজ্ঞাকর্ত্তা।

হোতা—ইষ্টিকর্ম্মে সামিধেনী, প্রযাজ, আজ্যভাগ-যাজ্যা, পুরোনুবাক্যা, সূক্তবাক্, শংযুবাক্ পাঠ করেন—বেদির উত্তর-শ্রোণির উত্তরে পূর্ব্বমুখে বসেন।

আগ্নীধ্র—অগ্নীৎ—অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক আশ্রাবণের পর প্রত্যাশ্রবণ করেন—দক্ষিণহস্তে উর্দ্ধাগ্র স্ফ্য ধরিয়া উৎকর দেশে দক্ষিণমুখে বসেন।

পত্নী—যজমানের স্ত্রী, যজমানের মত যজ্ঞফল-ভোক্ত্রী—গার্হপত্যের পশ্চিমে পূর্ব্বমুখী হইয়া বসেন।

বিহার—যাগার্থ নির্দ্দিষ্ট ভূমি।

অগ্নিহোত্রশালা—সমচতুরস্র বা দীর্ঘচতুরস্র—পূর্ব্ব ও দক্ষিণে দ্বারযুক্ত।

গার্হপত্য—ঐ শালার পশ্চিমভাগে মধ্যদেশে মণ্ডলাকার অগ্নিস্থান।—ব্যাস ২৭ অঙ্গুলি। (গৃহপতিনা যজমানেন সংযুক্ত ইতি গার্হপত্যঃ।)

আহবনীয়—গার্হপত্যের পূর্ব্বে চতুষ্কোণ অগ্নিস্থান। (তন্মধ্যে স্থাপিতোঽগ্নিঃ আহূয়তে অস্মিন্ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মুখ্য হোমাধারত্বাৎ আহবনীয় পদবাচ্যঃ।)

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে শূর্পাকৃতি অগ্নিস্থান। =অন্বাহার্য্য পচন।

অন্বাহার্য্য পচন—দক্ষিণাগ্নি—যাগের পর চারিজন ঋত্বিকের ভোজনের জন্য পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাগ্নিতে পক্ব অন্ন =অন্বাহার্য্য (অনু পশ্চাৎ যাগানন্তরং ঋত্বিকভোজনার্থং আহ্রিয়তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অন্বাহার্য্যঃ ওদনঃ।)

মেখলা—অগ্নিস্থানত্রয়ের বেষ্টনকারী মৃত্তিকার প্রাচীর—প্রথম মেখলার উপর দ্বিতীয় মেখলা থাকে। প্রথম মেখলার উচ্চতা ৬ অঙ্গুলি, বিস্তার ৬ অঙ্গুলি, দ্বিতীয় মেখলার উচ্চতা ৬ অঙ্গুলি, বিস্তার ৪ অঙ্গুলি।

বেদি—ঐষ্টিক বেদি—দক্ষিণোত্তর পার্শ্বযুক্ত, দক্ষিণোত্তর শ্রোণি সহিত, দক্ষিণোত্তর অংসযুক্ত—যাগকালে দর্ভাচ্ছাদিত আজ্য, চরু, পুরোডাশাদি হব্য দ্রব্যের আশ্রয়, উহাও মৃণ্ময় মেখলাবেষ্টিত। প্রথম মেখলা ৪ অঙ্গুলি উচ্চ, ৪ অঙ্গুলি বিস্তৃত, তদুপরি দ্বিতীয় মেখলা ২ অঙ্গুলি উচ্চ, ২ অঙ্গুলি বিস্তৃত।

উৎকর—বেদির উত্তরে ভূমি, যেখানে বেদ্যাদির অবকরাদি ক্ষেপণ করা হয়। (উৎকিরন্তি অস্মিন্ বেদ্যাদি সম্বন্ধ্যবকরাদিকমিতি ব্যুৎপত্ত্যা উৎকরঃ।)

(৫) যজ্ঞায়ুধ বা যজ্ঞপাত্র

১ স্ফ্য—খদির নির্ম্মিত খড়্গাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড।

২ কপাল—পুরোডাশ পাকের জন্য মৃণ্ময় বহ্নি পক্ব পাত্র। গার্হপত্যের পশ্চিমে থাকে।

৩ অগ্নিহোত্র হবনী—বিকঙ্কত নির্ম্মিত অগ্নিহোত্রের হাতা।

৪ শূর্প—ব্রীহির নিস্তুষ করণার্থ বংশনির্ম্মিত কুলা।

৫ কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম—ব্রীহির অবঘাতকালে উদূখলের নীচে থাকে।

৬ শম্যা—খদির নির্ম্মিত কাষ্ঠখণ্ড—তণ্ডুল পেষণকালে দৃষদের নীচে থাকে।

৭ উলূখল—(উদূখল) পলাশ কাষ্ঠনির্ম্মিত ব্রীহি খণ্ডনোপযোগী।

৮ মুষল—খদির কাষ্ঠনির্ম্মিত।

৯ দৃষৎ—পাষাণময়—পেষণীয় দ্রব্যের আশ্রয়।

১০ উপলা—পাষাণময় পেষণসাধন।

১১ স্রুক্ —

জুহূ—পলাশ কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা, অধ্বর্য্যু মুখ্যহোমে ধরেন।

উপভৃৎ—অশ্বত্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা (উপ জুহ্বাঃ সমীপে ভ্রিয়তে ধ্রিয়তে অধ্বর্য্যুণা বামহস্তেন।)

স্রুব—খদির কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা—আজ্যহোমে ব্যবহৃত। (স্রবতি আজ্যাদি দ্রব্য অস্মাৎ ইতি স্রুবঃ।)

ধ্রুবা—বিকঙ্কত কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতা যাগসমাপ্তি পর্য্যন্ত বেদিতে স্থির থাকে বলিয়া ধ্রুবা।

১২ প্রাশিত্রহরণ-বরুণ—কাষ্ঠনির্ম্মিত দর্পণাকৃতি (বর্ত্তুল) অথবা চমসাকৃতি (চতুরস্র) পাত্র—ব্রহ্মার হবিঃ-শেষভাগ রক্ষার জন্য।

১৩ ইড়াপাত্র—অশ্বত্থ—ইড়ার আধার।

১৪ মেক্ষণ—অশ্বত্থ—পুরোডাশার্থ পিষ্টক মদন্তী জলে পাকার্থ হাতা।

১৫ পিষ্টোদ্বপনী—গার্হপত্যে রক্ষিত যে পাত্রে পুরোডাশার্থ পিষ্টক রাখা হয়।

১৬ প্রণীতা প্রণয়ণ—অশ্বত্থ—প্রণীতা জল রাখিবার পাত্র।

১৭ আজ্যস্থালী—প্রায়শ্চিত্তাদি হোমে স্রুকে লইবার জন্য আজ্য যে পাত্রে থাকে।

১৮ বেদ—বেদি সম্মার্জ্জনাদির জন্য দর্ভমুষ্টি।

১৯ যোক্ত্র—পত্নীর কটিতে বন্ধনার্থ মুঞ্জরজ্জু—আগ্নীধ্র উহা পরাইয়া দেন।

২০ বেদ পরিবাসন—বেদনামক দর্ভমুষ্টির ছিন্ন অগ্রভাগ।

২১ ধৃষ্টি—গার্হপত্য হইতে অঙ্গার তুলিবার হাতা।

২২ ইধ্ম—যে কাষ্ঠ হইতে সমিধ্ কাটিয়া লওয়া হয়।

২৩ অন্বাহার্য্যস্থালী—অন্বাহার্য্য পাকের পাত্র।

২৪ মদন্তী—পুরোডাশ পাকে ব্যবহৃত গরম জল অথবা তদাধার পাত্র।

২৫ কণীকরণ পাত্র—পুরোডাশাদির ধান্য তুষমুক্ত করিলে পর সেই তুষাদি যে পাত্রে রাখিতে হয়।

২৬ অন্তর্ধান কাষ্ঠ—অশ্বত্থ—পত্নীসংযাজকালে সমাগত দেবগণের লজ্জানিবারণার্থ screen। *

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

* সময়ান্তরে পরিশিষ্টের অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

লুকানো মাণিক

নাভির মূলে বদ্ধ রে'খে সৌরভময় কস্তূরী,
মৃগের যেমন গন্ধ খুঁজে কানন ভ্রমণ দস্তুরই—
চিত্তে রে'খে তেমনি পরম সত্যশিবসুন্দরে,
ইষ্ট আশায় ঘুরেছিলাম বন গহনে কন্দরে!

বেদ পুরাণে তন্ত্রে গানে নাইকো যাহার বর্ণনা,
উল্লাসে যার ব্যর্থ ঋষির জীবনব্যাপী কর গোণা,
বিষয়ত্যাগে, যজ্ঞযাগে ব্রাহ্মণেরে ধন দানে
সম্রাটেরও পুর্ণ আশা হয়না যাহার সন্ধানে—

জন্ম জরা মরণহারা বৃন্দারক বন্দিত,
সত্য পুরুষোত্তম সৎচিদানন্দ নন্দিত,—
নিত্য নবীন মুক্ত স্বাধীন বুদ্ধ আত্মবিশ্বাসে
বিশ্ব বিভল মুগ্ধ পাগল যার সুরভি নিশ্বাসে—

প্রাণসাগরের গোপন মণি, ধ্যানধারণার সামগ্রী,
শৌর্য্য বিভায় সূর্য্যসম মণ্ডিত যশ্ জয়শ্রী
নিত্যশুভ দীপ্ত-ধ্রুব পুণ্য পুলকাঙ্কিত,
আমার মাঝের সেই যে আমি বিজয়-
জ্যোতিঃলাঞ্ছিত—

আজকে আমার সেই অনন্ত শ্রীমন্ত ধীমন্তরে,
খুঁজে খুঁজে পেয়েছি এই অন্তরেরই অন্তরে,
প্রাণের মানুষ জাগো জাগো—দাও সাড়া দাও
শীঘ্র হে,
আট কোটি এই ভক্ত আজি চিনুক তোমার
বিগ্রহে।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।

কলহান্তরিতা
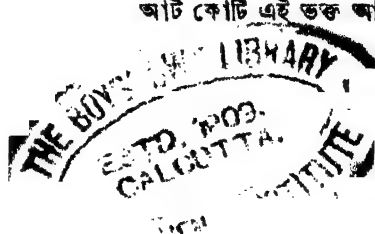
তুক্ক-গীতি *

বৈষ্ণব রস-গ্রন্থে সর্ব্ববিধ নায়িকার—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা—এই অষ্টবিধ অবস্থার কথা বর্ণিত আছে। যে নায়িকা রোষবশতঃ, সখিগণ সমক্ষে, পদানত বল্লভকে তাড়ন ভর্ৎসনাদি দ্বারা পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চাৎ অতিশয় অনুতপ্তা হয়, তাহাকেই 'কলহান্তরিতা' বলে। নিশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপ, ভ্রান্তি, মোহ, উষ্ণশ্বাস, অনুতাপ ও প্রলাপাদি ইহার লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মনোহরসাহী কীর্ত্তনে, সাধরণতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের,—

হরিরভিসরতি বহতি মৃদু পবনে।
কিমপরমধিক সুখং সখি ভবনে॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানম্॥ ধ্রু॥

এই পদ দ্বারা, কলহান্তরিতা-পালায় সূত্রপাত করিয়া গোবিন্দদাসের—'আকুল প্রেম' ইত্যাদি পদ গাহিয়া, শ্রীমতীর খেদোক্তি প্রকাশিত করা হয়। এই বিরহ-জনিত খেদোক্তির কারণ এই যে—'আমি গোকুল-বীর শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিলাম না। তিনি ত আমার কত ভজনা করিয়া গেলেন, কিন্তু আমি তাঁহার অভজন জন্য এখন অস্থির হইতেছি। কেননা, তোমরা আমার সুহৃদ্ সখী—তোমাদের উপদেশবাক্য মান্য করা দূরে থাক্, তাহা শ্রবণ-সীমায় পর্য্যন্ত আনয়ন করি নাই। সর্ব্বোপরি, মাধবের মধুমাখা কথা আমি শুনি নাই—শুনিলে এখন কাঁদিব কেন? আহা, তাঁহার মধুমাখা কথা কেন আমি শুনি নাই গো?'

সখিগণ বলিলেন—'মানিনি, সত্যই আমরা তোমার ব্যথায় অতিমাত্রায় ব্যথিত হইতেছি। কিন্তু আমরা তোমার সহিত তোমার প্রিয়তম বল্লভের মিলন সংঘটন করাইতে পারি। তবে, তুমি আবার তার কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ পাইলেই এইরূপভাবে কলহ করিতে বিরতা হইবে না—

পদ

সে হেন রসিক নাগরের সনে
করিলি কতেক কলহ।
আগে না বুঝিলি কান্দিলি কান্দালি
অব কাহে মূঝে বলহ॥
ধনি, নারিলি পীরিতি রাখিতে। ইত্যাদি।

(কৃষ্ণে প্রেম রাখা কি কথার কথা?—সে তোর সঙ্গে প্রেম রাখবে কেন?—সে যে স্বাধীন স্বতন্ত্র নাগর—তুই যে পরাধিনী—ইত্যাদি)

এইভাবে সখিগণ শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-উপেক্ষার জন্য ভর্ৎসনা করিতেছেন। এমন সময় ললিতাদি প্রিয় নর্ম্ম-সখিগণ তাঁহাদিগকে আসিয়া বলিলেন—'তোমরা মানিনী রাজনন্দিনীকে কেন ব্যথিতা করিতেছ?'

তৈখনে এক সহচরী সখীপ্রতি কহে বেরি বেরি

(তোরা, আমাদের রাইকে কেন কাঁদিয়েছিস্ গো? —ওবে কেঁদে কেঁদে বদন ফুলায়েছে—ধীরা বৃন্দা তোরা শ্যামের দূতী জানি—তোরা জানিস্ ও মান একা ত করে নাই—ও মানে আমিও আছি, বিশাখাও আছে—মান করবে নৈ কি?—কপট বাকী কি রেখেছে? কাল সঙ্কেত করে' আসে নাই—বাসকসজ্জার কথা কি মনে

* কীর্ত্তনের পালাবলী লীলাগানে মহাজন পদাবলী ব্যতীত, অনেক ভণিতাহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান, কবিতা বা শ্লোক, মূল পদাবলীর ভাব-আস্বাদনের সহায়তা করে, যাহা আখররূপে গীত হইয়া থাকে। এই ভণিতাহীন গানগুলিই, 'তুক্ক'-নামে পরিচিত। এগুলি এক একটি রত্নকণাতুল্য। বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী প্রবন্ধ-গুলিতে, আমরা এই অপ্রকাশিত 'তুক্ক' গানগুলি সংগৃহীত করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু শুধু 'তুক্ক'-গানগুলি সংগৃহীত করিলেই উহার সৌন্দর্য্য সম্যক্ অনুভূত হইবে না। এই জন্য আমরা লীলাগানের পালায় বর্ণিত বিষয়, মূল পদাবলীর ভাষায় বর্ণন করিয়া, যথাযথ স্থানে তুক্কগানগুলি সন্নিবেশিত করিতে যত্নপর হইব।——লেখক।

নাই ? কুসুমশয্যা কেঁদে কেঁদে ভাসায়েছে ! সে কি জানে না, জানে না—কাঁদালে কাঁদতে হয়—দুঃখ দিলে দুঃখ পেতে হয়—সে কি জানে না জানে না ?)

প্রিয় নর্ম্মসখিগণ শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'মানময়ি, তুমি জগন্নারী-শিরোমণি—তুমি কাঁদলে নারী-গর্ব্ব খর্ব্ব হবে—নারীজাতির মান বৈ আর কি ধন আছে ?' ললিতার এইরূপ উক্তির মধ্যেই বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত-দূতী বীরা বৃন্দাকে শুনাইয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন—'মান করবে বৈ কি ?—মান করেছে—খুব করেছে—এনে আবার পায়ে ধরাব'—ইত্যাদি।

পদ

মান কয়লি ত করলি।
আবার কলহে কাহে রোয়সি
বৈঠহ রাজহি ভবনে।
সো কাঁহা যায়ব আপনি আয়ব
পুনহি লোটায়ব চরণে॥

পদ

(আবার পায়ে লুটাবে গো, ভুবনমোহন চূড়াসহ পায়ে লুটাবে গো—শুধু তোমার পায়ে ধরে খালাস নয়—)

তুয়া লাগি মধু ঘরে যাওব কত বেরি
শুনিয়ে না শুনব তাই।
বলি তোহারিক প্রেমে সমাধান দেওল
সো ধনী রসবতী রাই॥ ইত্যাদি

পদ

প্রেম-কারিকর এই যত সখীগণ।
নিতি ভাঙ্গি নিতি গড়ি পীরিতি রতন॥

(রাধাগোবিন্দ বিলাস মিলনের ভাব নিতুই নূতন দেখাবার তরে)

সখিগণের সম্বোধনে আশ্বস্ত হইয়া শ্রীরাধা বিরহ-ব্যাকুলতার মধ্যে, মৃতদেহে প্রাণপ্রাপ্তির ন্যায়, শ্রীললিতা বিশাখা দুইজনকে দুই দিকে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন—

পদ

আমার, সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥

(ও ললিতা, ও বিশাখা—তোমরা চতুরার শিরোমণি—তোমাদের আর কি শিখাব ?—যেন মান থাকে, আর হরি আসে গো)

চেয়ে পাই নাই বৈঠবি হরি করি বামে।
ইঙ্গিতে জানায়বি মধু পরণামে॥
পুনঃ পালটি বৈঠবি তুহুঁ না চাহবি ফিরি।
চন্দ্রাবলীনাথ কহবি বেরি বেরি॥

(বলবে—কেমন চন্দ্রাবলীর নাথ ! তুমি ভাল ত আছ হে !—রাধার ভাগ্যে যাই হোক্—তুমি সুখে ত আছ হে !)

এইরূপ কথোপকথনের মধ্যে মানিনীর নয়নাশ্রুসিক্ত গণ্ড মধ্যে, ঈষৎ হাস্যের সঞ্চার দেখিয়া সখিগণ বলিলেন—রাধে, আমরা এখনি তোমাদের মিলনানন্দ দেখিয়া সুখী হইব। এখন আশীর্ব্বাদ কর—আমরা যেন শ্যাম এনে মেলাতে পারি।

[তুক]

দাও দাও, পায়ের ধুলা দাও হে॥
আমরা যুগল বড় ভালবাসি,
আমরা প্রেমানন্দ রসে ভাসি,
আমরা আর কিছু ধন চাই না হে॥
মিলন হলে দেখব কেবল নয়ন ভরে
যেন যুগলেই তোমরা চরণ দিও হে॥ ইত্যাদি॥

পদ

রাই পরবোধ করি চলতহি সহচরী
ধরলহি বিপিনক পন্থ।
যায় গোঠ গোবর্দ্ধন যমুনা কানন
এ সব কেরত একান্ত॥
যায় গতি মধুর কুঞ্জর বর
গমন করত নারী।
বংশীবট যাবট তট
বনহি বন হেরি॥
দেখি রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড
মদন কুঞ্জ তীরে।

(রাধাকুণ্ডে থাকলেও থাকতে পারে—এ যে চিন্তামণির দিব্যচিন্তামণিধাম এ যে মধ্যাহ্ন বিলাসের ধাম)

দ্বাদশ বন করত ভ্রমণ
দেখে শৈলহি কিনারে॥
বাঁহা সব গাভীরব
তঁহি চলত জোরে।
দেখে, শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম
সহিত বলবীরে॥

(রাম আছে, শ্যাম নাই—দেখি কোথায় ধূলায় পড়ে আছে)

দূতী যমুনাতীরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—

একহি নীপ মূলে পড়ি রহ মাধব
রাই বিরহ জ্বরে ভোর।

(দেখি চূড়া একঠাঁই, বাঁশী একঠাঁই—নাগর ধূলায় পড়ে আছে—অঙ্গে ধূলা মেখে রাধার নাম লেখে—প'ড়ে বাঁশী ভূমিতলে—বাঁশী জয়রাধে শ্রীরাধে বলে—বাঁশী নাম শুনায়ে প্রাণ রেখেছে—একেই বলে, রাধানামের সাধা বাঁশী—আজ, ধূলায় পড়ে আছে হে—রাধা-বিরহে বিভোর হয়ে—আজ ধূলায় পড়ে আছে হে—লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান, মুরলীগানামৃতধাম—আজ বাঁশী বদনে বাজে নাই, বাঁশী পবনে বাজে হে, পবন যত প্রবেশ করে, বাঁশী বাজে উচ্চৈঃস্বরে—রাধা রাধা নাম করে)

এমন সময় দূতী দেখিতেছেন—ভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ একটি স্বর্ণবর্ণের পদ্ম লইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন—এবং বুকে, মুখে চোখে বারম্বার স্পর্শ করাইতেছেন ও বলিতেছেন—'ও হো, এমনি আমার রাইয়ের রূপ!

[তুক]

হেম অম্বুজ এক করে ধরি নাগর
রোওত বারহি বার।

(হেম-অম্বুজ করে ধরে—বলে, এমনি আমার রাধার রূপ—আমি কেন চরণ ছেড়ে এলাম—পায়ে ধরে পড়ে থাকলে, এতক্ষণ রাইয়ের দয়া হতো—এতক্ষণ আমি রাইকে পেতাম—বদন দেখে পরাণ জুড়াতাম—না হয়, মান করেছিল—সে ত আমার চরণ ছেড়ে আসতে বলে নাই—না হয়, রাধা মানেই ছিল—কেন চরণ ছেড়ে এলাম! ইত্যাদি)

এইরূপ বারম্বার বিলাপ করিতেছেন। দূতী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাকাঙ্ক্ষার নিদর্শন দেখিয়া, রোমাঞ্চিত হইয়া মনে মনে বলিতেছেন—'ইহাকেই ত বলে প্রেমের নিষ্ঠারতি। এত দুঃখে পড়েও রাধার নাম ভুলে নাই—নাম জপে জপে প্রাণ রেখেছে—আমি এখনি বলবো, রাধারাণীর কাছে গিয়ে এখনি বলবো—বলবো, তোমার চেয়ে তার নিষ্ঠা ত ঊন নয়।' ইত্যাদি

দূতী ভাবিলেন—'যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিলনের কথা বলি, তা' হলে মানময়ীর সখী-শিক্ষার কথায় মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা হইবে? কেন না

মান মহাধন মূলে

বলেছেন, যাতে মান থাকে, আর বঁধু আসে। আমি মানিনীর মান-গর্ব্ব রেখে শ্যাম মিলাব—তবেই ত দূতী মহিমা?'

এইবার দূতী, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন—কিন্তু, বামে দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিতেছেন না—

পদ

দূরে হেরি নাগর চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
যেন আন কাজে চলত বর রঙ্গিণী
ডাহিনে বামে নাহি চায়॥
সহচরি গমন হেরি হরি উলসিত
হৃদয়ে করত অনুমান।

* * *

(ঐ দূতী বুঝি আমায় নিতে এসেছে—বুঝি রাই নিতে পাঠিয়েছে—নিতে এসেছে—বুঝি, আমায় দেখে নাই—একবার আমি ডেকে দেখি—)

পদ

সহচরি সহচরি সহচরি করি হরি
বহু বেরি করত ফুকার।
সহচরি কহতহি ঝোঁকি কহত মধু
নাম লও কোন্ গোয়ার॥

তবকি কহত হরি হাম ধনি কিঙ্কর
করুণা করি মোরে চাহ।

(এস, আমার দুঃখ দেখে যাও হে—আমি তোমাদের রাধাদাস ধুলায় পড়ে আছি)—

চন্দ্রশেখরে কহে ইহ দুঃখ দেখিয়া
তবহি অন্তত্র যাহ।

দূতী ভৎর্সনা-স্বরে 'কিতব'-শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া বলিলেন—'কি বলবে?—বলবার ত কিছু বাকী রাখ নাই! তোমার কাছে দাঁড়িয়ে কথা শুনবার ত আমার অধিকার নাই—মানিনীর প্রতিজ্ঞা-বাক্য শুনেছ কি?—দূরে থেকেই বলি, শোন—

[তুক]
ওহে নাগর, তুমি ত রসিক বট হে
তবে কেন চরণ এলে হে ছেড়ে।
তুমি কি তার মন জান না
চরণ ধরে রইলে পড়ে
একবার চাইলেই রাধার দয়া হতো॥

পদ

কি কহবি কিতব তুরিত করি কহ কহ
হাম যাওব আন কাজে।

(আমি রাজনন্দিনীর কুসুম নিতে এসেছি হে—মৌন-ব্রতের পূজা হবে—শ্যামনামে তিলাঞ্জলি দিবে—আর কালো বরণ দেখবে না হে—যা ভেবেছ তা হবার নয়—আমি তোমায় নিতে আসি নাই—বলা হলো ত এবার চলে যাই—ইত্যাদি)

তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—সত্যই ত আমি অপরাধী! আমার অপরাধ স্বীকার করি—সখীকে বিনয় করিয়া বলি। তখন গলে পীতাম্বর দিয়া জোড়হস্তে কহিতে লাগিলেন—সখী, দাঁড়াও—

পদ

রাই মোহে তেজল তোরা বদি বকবি
তো সব লাগি বিখ পিয়ব

(আমি এ-জীবন রাখবো না হে—রাই-বৈমুখীর জীবনে কি সুখ আছে? আমি রাধাকুণ্ডে প্রাণ দিব—আমি

দেখলাম অনেক ভেবে ভেবে।
আমার গতি নাই আর রাধা বিনে॥

রাধা রাধা নাম বলে, রাধা কুণ্ডে প্রাণ দিলে,
রাধার নামের বলে—

আন জনমে পাব রাধা দূতী আমায় রাধা কুণ্ডে নিয়ে চল।

তখন দূতী অন্তরে দ্রবীভূত হইয়া, প্রেমাশ্রু অন্তরের দিকেই নিক্ষেপ করিলেন—বাহিরে বাহ্যরূঢ়তা রক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'ওহে শ্যামসুন্দর, তোমার চন্দ্রাবলীর মুখচন্দ্রের সুধা পান করিয়া অমর হবার সাধ কোথায় গেল?'

পদ

কাহে হাম- সব লাগি
বিখ পিয়বি।
চন্দ্রাবলীমুখ চন্দ্রসুধানিধি
যুগে যুগে পিবি পিবি জীয়বি॥

(তোমার শুধুই কি চন্দ্রাবলী?—এত সুখের সাগর থাকতে, সাধের নাগর, আমাদের জন্ত কাঁদ কেন? চন্দ্রাবলীর সখী, তারাও ত তোমায় ভালবাসে)—

পদ্মা শৈব্যা পদ্ম গন্ধ মাতাওল
ভদ্রা মদন বাণে।

পদ্মা, ভদ্রা—তারাও ত তোমার প্রেয়সী বটে—সখী রূপ হয়ে পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখর বলিতেছেন—

চন্দ্রশেখরে কহে শুন বহুবল্লভ
রাই পীরিতি কিবা জানে।

(আমাদের রাধা, তোমার প্রেমের কিবা জানে? তাহার জন্ত এত কাঁদ কেন?)

তখন শ্যামসুন্দর বলিতেছেন—'সখি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর—তুমি মিলালে মিলাতে পার—আমার রাধা পাবার উপায় কর'—এই বলিয়া পীতবসনের দ্বারা ধূলি ধূসরিত গাত্র ও মুখচন্দ্র মুছিয়া বিনয় গদ্গদ স্বরে বলিলেন—'আমি আর তোমার সঙ্গ ছাড়বো না, আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।'

তখন দূতীর, অন্তরে মহা হর্ষ, কারণ মানিনীর মান রক্ষা করিয়া বিনা সাধনেও সগর্ব্বে মিলন করাইবার

পারিবে। এইরূপ অন্তরে কৌতুক, ও বাহিরে ক্রোধস্বরে বলিতে লাগিলেন 'শ্যামসুন্দর—

[তুক]

শৈল সমান হয়েছে মান
তুমি আমি রেণুর সমান।
আমি শুধু কি মিলাতে পারি
তবে যদি দাসখৎ লিখতে পার হরি।
তবে না হয় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?
তোমার হয়ে দুটো বলে কয়ে মিলাতে পারি॥

(কিন্তু আশা দিতে পারি না—মিলাতে পারবো কিনা তা জানিনা হে—তবে তোমার হয়ে দু'টা বলে দেখবো কথা থাকবে কিনা জানিনা হে। কেননা

শৈল সমান হয়েছে মান।
তুমি আমি রেণুর সমান॥ ইত্যাদি

পদ

তৈখনে নাহ দূতী দোঁহে মেলি।
কুঞ্জ নিয়ড়ে দোঁহে উপনীত ভেলি॥

দূতী মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই স্থানে একটু রহস্য করিতে হইবে। তাই বলিলেন—

[তুক]

এই স্থানে দাঁড়াও বংশীধারী।
দেখে আসি কি করেন কিশোরী॥

পুনর্ব্বার বলিলেন—

এই স্থানে দাঁড়াও ঘনশ্যাম।
মনে মনে জপ রাধার নাম॥

(একান্ত হয়ে জপ কর হে—দু'টি কর হৃদে ধরে নাম জপ কর হে—তুমি ত সকলি জান—রাধার নাম জপ্‌তে জপ্‌তে রাধার দয়া হবে—নাম জপতে জপতেই চরণ পাবে—মনে মনে জপ রাধার নাম। ইত্যাদি)

এইবার দূতী কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধোন্মাদিত শ্রীরাধা বলিতেছেন—

[তুক]

কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ পেয়ে দশ দিশে চায়।
সম্মুখে সখীরে হেরে বারতা সুধায়॥

(সঙ্গে করে তুমি কি এনেছ—লম্পটের কলাঙ্কন—ইত্যাদি)

সখী বিনীত স্বরে বলিলেন—'মানময়ি, এইবার দয়া কর; কাছে ডেকে আনি—দেখলেই বুঝবে—শুধু একা তুমি ত কাঁদ নাই—কাঁদার ফলে সেও অনেক কেঁদেছে—না হয় দাসখৎ লিখিয়ে নাও।'

তখন শ্রীরাধা, চম্পকলতিকা সখীকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—

[তুক]

সখি, উহার নাম আর করো না করো না
উহার নামে নাই মোর কাজ।
উহার জন্য আমার এই দুর্দ্দশা
এ-তিন ভুবন ভরে লাজ।
লম্পটকে ডেকে শুধা গো চম্পকলতা
পিরীতের জনম কোথা
নিষ্ঠা নইলে প্রেম থাকে কোথা॥

সখিগণ বলিলেন—'সত্য, নিষ্ঠারূপ আধার মধ্যে প্রেম আধেয় স্বরূপ। তবে প্রেমের মধ্যে ক্ষমা করাও চলে। এবারের মত আত্মজন জ্ঞানে ক্ষমা কর। আজ্ঞা করিলে কাছে ডেকে আনি—যা বলবার বলে কয়ে ক্ষমা করে নাও।'

এই স্থানে গায়কগণমধ্যে কেহ কেহ দাসখৎ মিলনের অবতারণা করিয়া এইরূপ ভাবের পদ আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিলেন—মানিনী আবেগ ভরে বলিতে লাগিলেন—

পদ

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব-বিলাস।
দূরে করবি সব প্রিয়জন আশ॥
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান॥

এই ভাবের সর্ব্বের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দাসখত লিখিতে বলিলেন—

(আর তোমায় ত দাঁড়াতে দিব না—কেলিকদম্ব তলে আর দাঁড়াতে ত দিব না—আর তোমায় চাহিতে

ত দিব না—কোন প্রিয়জন পানে আর চাহিতে ত দিব না—শুধু আমায় শয়নে স্বপনে দেখ্‌বে। ইত্যাদি)

এইরূপে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া করিয়া ষোল আনা দখল করাই প্রেমের স্বভাব। একটু অণু পরমাণু উন হইলে চলিবে না। শ্যামসুন্দর এই সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন ও দাসখত লিখিয়া দিলেন—

কন্তু ইয়াদি কীর্দ্দ গুণ-সমুদ্র
শত সাধব শ্রীরাধা।
তস্তু খাতক　　　হরি নায়ক
পুরাহ মনের সাধা॥
মহাভাব প্রেম　　　বিলাস মধ্যে
আর নাহি কোন বাধা।
শ্রীচরণে স্থান　　　কর দাসে দান
প্রেম-মহাজন রাধা॥
আদরিণী যূথেশ্বরী মোর রাধা॥

(সকল সখী মিলে দয়া কর—আর যেন চরণ ছেড়ে বৈমুখী হতে না হয় হে)

এইস্থানে আমরা বিচিত্র-রসের (ভয়ানক ও করুণ রসের মিশ্রণ) একটি পালা, শাঁকচিন্নির ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন,—চণ্ডীদাসের দেয়াসিনী মিলনের ন্যায়—পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এযাবৎ ইহা গায়কগণের কণ্ঠে ছিল—কোন পদ-সংগ্রহ পুস্তকে ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

শাঁখিনীভয়ে মিলন

[তুক]

শুন হে মানিনী শুনহে রাই।
বিপদের কথা বলিয়া যাই॥
প্রাণ গেলে মান করিবে কারে।
কহিয়াছি দোষ ক্ষমহ মোরে॥

*　　　*

শাঁখিনী পাইল কি মোর হবে।
জলের ভিতর আলয় তার।
করে ধরি বলে দেখ ছুরার॥
নাকে কথা কয় জলটু পা'।
পরশে শিহরে বাতাসে গা'।
জড়াজড়ি করি হাড়াই হাত।
শপথি করিয়া আমার মাথ॥
শুনি বিনোদিনী চমকি ওঠে।
শাখিনী পাইল বুঝিনু বটে॥

[তুক]

শুন শুন, গোকুল আনন্দ কন্দ।
তুঁহ যদি লাখ　　　রমণী সঙে বিলসহ
তাহে মুঞি পাই আনন্দ॥

(তোমার সুখেই আমার সুখ হে—তবে কি মান সাধে করি—যারা কৃষ্ণ-সেবা জানেনা—সেই 'দাসী বাঁদীর' ইত্যাদি।)

তদনন্তর মিলন। মিলনান্তে, ললিতাদি সখিগণকে উদ্দেশ করিয়া একটি পদ এই—

সখি, কি ছার দারুণ　　　মানের লাগিয়ে
এত গুণের বঁধু হারিয়েছিলাম।
আমার, শ্যামল সুন্দর　　　অতি মনোহর
দেখিয়া পরাণ পেলাম॥

(এমন বঁধু কার আছে—এ ব্রজমণ্ডল মাঝে—আমি মানে মাণিক হারিয়েছিলাম—আমি পরশনে প্রাণ পেলাম—এতক্ষণ আমি মরে ছিলাম—এমন বঁধু কার বা আছে—ইত্যাদি।)

এখন, তোরা সখিগণ　　　করাহ সিনান
আনিয়া কালিন্দী নীরে।
শ্রীমধু মঙ্গলে　　　আন কুতুহলে
গোরস ভুঞ্জাহ ধীরে॥

(কোন্ পাপিনী পরশেছিল—আমার প্রাণবঁধুকে কোন্ পাপিনী পরশেছিল—সখি, তোরা স্নান করাও—দ্বিজে দান কর ইত্যাদি।)

ললিতা আসিয়া　　　হাসিয়া হাসিয়া
পরাইছে পীত বাস।

(ছাড়, চন্দ্রাবলীর নীল বসন ছাড়—মান হলো কিসে, তাও কি জান না হে,—ইত্যাদি।)

তখন　সিনান করিয়া　　　বসন পরিয়া
বসিলা ধনীর পাশ।

দু'বাহু পশারি নবীনা কিশোরী
বঁধু অগরোল কোর॥
(এস, আমার হৃদয়ের ধন হৃদে এস—আজ,
সারাদিন কত কাঁদায়েছি—তুমি যার কালো—তারি
আল—রাধার যুগে যুগে হৃদয়ের আলো—ইত্যাদি)
হেরিয়ে দোঁহার ও রসবিলাস
দাস নরোত্তমে ভোর॥

শ্রীশিবরতন মিত্র।

রাঙা পিয়ালার গান

দুনিয়ায় ব'সে গেয়ে যাই আমি রাঙা পিয়ালার গান !
নীলিমায় দোলে চাঁদিমা-চাঁদোয়া,
তারি মাঝে জাগে শ্মশানের ধোঁয়া,
হাসির বাঁশীতে অশ্রুর শ্বাস, মন করে আন্‌চান্—
আর আমি গাই রাঙা পিয়ালার গান।
জাগে ফাগুনের নৃত্য-স্বপন,
হিরণ-কিরণ দীপ্ত তপন,
চাতক কোথায় কহে চুপি চুপি—'কর, কর বারিদান'—
শুনি আর গাই রাঙা পিয়ালার গান।

*

নাচে রে দখিনা চিত্ত-দুলানো,
কুঞ্জে রঙের তুলিটি বুলানো,
কাঁদে শিউলীর ফুলহারা গাছ—'আজ কোথা ফুলজান ?'
আমি গেয়ে চলি রাঙা পিয়ালার গান।

*

কার বুকে ভরা মৌ-মাখা প্রীত !
কারা গায় দুয়ে যৌবন-গীত !
আমারি কেবল সখী নেই পাশে !—বুকে বেঁধে ব্যথা-বাণ,
আরো জোরে গাই রাঙা পিয়ালার গান

*

কান্না-সায়রে ভাসাইয়া ভেলা,
মানবক হেথা করে ছেলেখেলা,
জ্বালা নিয়ে তারা মালা রচে প্রাণে, করে বাঁচিবার ভাণ,
দেখি আর গাই রাঙা পিয়ালার গান।

*

পিয়ালায় জাগে জগতের ধারা,
কত রামধনু, কত চাঁদ-তারা,
কত অশোকের পরাগ-কেশর, কত মধুপের তান,
কত না গোলাপী অধরের রস,
কত না হিয়ার কমল-পরশ,
কত চরণের আল্‌তার ছোপ,—চপল চোখের টান,
কত মরা-আশা, ভোলা ভালবাসা,
কুসুম-ফোটানো কবিতার ভাষা,
হারা-প্রেয়সীর ফেরা-চুম্বন, অনুরাগ, অভিমান,
কত আলো-ছায়া বসন্ত-ঝরা,
স্মৃতির নূপুর অনন্ত-ভরা,
কত যে মরণ, কত যে জীবন,—বিষামৃত-মাখা প্রাণ,—
রাঙা পিয়ালার গান গাহি তাই, রাঙা পিয়ালার গান !

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
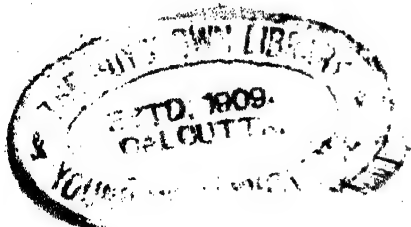
রঙ্গলাল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'রসসাগর', 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'

(১৮৫০—৫৬)

'রসসাগর'। নীলকর-প্রপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণের অকৃত্রিম আত্মত্যাগী বন্ধু, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম অনুরাগী, অক্লান্তকর্ম্মী রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ তৎসঙ্কলিত বাঙ্গালা পুস্তক ও লেখকগণের যে তালিকা গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন, তদৃষ্টে প্রতীত হয় যে রঙ্গলাল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রকাশিত 'সংবাদ রসসাগর' নামক একখানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্র সম্পাদিত করিতেন। ১২৫৯ সালে ১লা বৈশাখ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' বাঙ্গালা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে একটি বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটিত হয় এবং তাহার অনুবাদ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এবং ৮ই মে তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রকাশিত হয়। আমরা উহা হইতে 'সংবাদ রসসাগর' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য অবগত হই :—

"সংবাদ রসসাগর—খিদিরপুর (২৪ পরগণা) হইতে বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মাসিক মূল্য আট আনা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র। সোম, বুধ ও শুক্রবারে রসসাগর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী—সম্পাদক।"

'সংবাদ রসসাগর' রঙ্গলাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কি না কিংবা তিনি সম্পাদকের সমস্ত দায়িত্ব প্রথমাবধি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কারণ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে (১২৫৭ সালের ১লা শ্রাবণ) "আমাদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন" বলিয়া 'প্রভাকর'-সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় ক্ষেত্রমোহন 'রস মুদ্গার' নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রভাকরে 'রসসাগরের' উল্লেখ মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়। রঙ্গলাল যে প্রথম হইতে উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন তাহাতে এক্ষণে আমাদের সন্দেহ নাই।

আমরা 'সংবাদ রসসাগর' দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। তবে 'সংবাদ প্রভাকরে' মধ্যে মধ্যে উহার যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয় পত্রখানি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিতই পরিচালিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের কার্য্য এই পত্রের বিশেষ সমালোচনার বিষয় ছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৫ঠা জানুয়ারীর প্রভাকরে আমরা অবগত হই যে "মিশনরি দৌরাত্ম্য" বিষয়ে সুধাংশু সম্পাদকের সহিত বিতণ্ডাযুদ্ধে রসসাগর-সম্পাদক জয়লাভ করিয়াছেন।" পাঠকগণ বোধ

হয় অবগত আছেন যে 'সংবাদ সুধাংশু' সুপণ্ডিত আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerjea) কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। উক্ত বৎসরের ৩০ শে এপ্রিল তারিখের প্রভাকরে রসসাগর হইতে তিনটি বালকের খ্রীষ্টিয়ান হওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ বৎসরের ১৩ই মে তারিখের প্রভাকরে গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন, "রসসাগর-সম্পাদক বাঙ্গালা পত্র এবং বঙ্গভাষার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম" ইত্যাদি।

১২৫৯ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ) হইতে রঙ্গলাল পত্রখানির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া 'সংবাদ সাগর' নাম রাখেন। বোধ হয়, রসরাজ প্রভৃতি পত্রের অশ্লীলতার খ্যাতি তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় (৩রা বৈশাখ ১২৫৯ ইং ১৪ই এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'প্রভাকরে') লিখিয়াছিলেন :—"আমাদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে পত্রের নাম 'রসসাগর' ছিল, এইক্ষণে 'সংবাদ সাগর' হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরো রসময় হইয়াছে কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা এই সাগর পূর্ব্বে রস সাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক।"

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত 'সংবাদ সাগর' সম্পাদন করিয়া রঙ্গলাল বিশেষ কার্য্যানুরোধবশতঃ উক্ত পত্র সম্পাদনে বিরত হন।

শ্যামাচরণ সরকার

সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের সময় তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন তাহার প্রকাশ কালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে এককালে গুপ্ত কবির গুণগ্রাহিতা এবং রঙ্গলালের কৃতিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৬০ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে (ইং ১৬ই জুন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ) 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর চন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"আমারদিগের জীবনাধিক স্নেহান্বিত সুলেখক

সুকবি সহযোগী সাগর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধবশতঃ সাগর পত্র সম্পাদনে অবকাশশূন্য হইবায় তদ্বিষয় সাধারণের সুগোচর করণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দিগকে যে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পত্র নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে এতৎপ্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক নয়নান্তপাত করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে, যত্ন মাত্র না করিয়া আমরা সর্ব্বদাই সাগরোত্তব অমূল্য মহারত্ন সকল প্রাপ্ত হইতাম। অধুনা সেই অত্যুৎকৃষ্ট অব্যক্ত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইলাম। যাঁহার রচিত গদ্য পদ্য জনসমূহের পক্ষে অনন্ত শ্রুতিসুখকর এবং উপকার

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (যৌবনে)

জনক তিনি লিপিকার্য্যে বিরত হইলে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যে সকল পত্র কেবল কটু কাটব্যে পরিপূরিত, দেশের মহানিষ্টকর, সৎসংস্কার সংহার করিয়া পাঠকগণকে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ করে, সদুপদেশের বিনিময়ে অসদুপদেশে ও দ্বেষে দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, যে সকল বালক বালিকা ও যুবক-যুবতী অনুশীলনের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদিগে কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে, সেই সকল পত্রের বিনাশ হইলে কিছু মাত্র খেদ নাই, বরং তদ্বিষয় বুধবর্গের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর হয়। চক্ষুঃ আছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি শক্তি নাই, সে চক্ষু যেমন শুদ্ধই পীড়াদায়ক সেইরূপ গ্লানিজনক গ্লানিসূচক পাপপূরিত পত্র সকল কেবল অশেষ অসুখ ও বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে, গোশালা শূন্য থাকুক তথাচ দুষ্ট গাভীর প্রয়োজন করে না! নিন্দক লেখকেরা অস্মদাদির অনর্থক গ্লানি লিখিয়া যত সুখী হইতে পারে হউক, তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না, কিছুই দুঃখ বোধ করি না, বরং আনন্দ লাভ করিতেই থাকি। কারণ তাহারা ঝাঁটা স্বরূপ হইয়া আমার দিগের সমল অন্তঃকরণকে পরিষ্কার পূর্ব্বক নির্ম্মল করিতেছে। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাহারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যথার্থ মঙ্গল করুন। কিন্তু তাহারা যেন এমত বিবেচনা করে না যে মনুষ্যকে ভয় দেখাইয়া নীরব করণ, কটু কহিয়া প্রভুত্ব স্থাপন, দাম্ভিকতা দ্বারা কালযাপন, এবং অলীকরূপে নিন্দা লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক সুখভোগ করণ, ইত্যাদিই পরমেশ্বরের করুণার দ্বারা হইয়া থাকে। সে ভ্রম মাত্র, চাতুর্য্য, ছলনা, নিন্দাবাদ, তোষামোদ, পরগ্লানি, পরপীড়ন প্রভৃতি পরিহার করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে সকলের সহিত সদ্ভাব করাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব হে সহযোগিগণ! মৃত্যুকে নিকট জ্ঞান করিয়া অভিমান পরিত্যাগ কর। লেখনী যন্ত্রে অমৃত বৃষ্টি করিতে থাক। মধুর বচনে জগৎ সংসার মুগ্ধ কর। সমুদ্রে পরিপূর্ণ পীযুষ সত্ত্বে কেন হলাহল লইয়া দানববৎ ব্যবহার কর। কোকিল কাহাকে রাজ্য প্রদান করে নাই, কাক কাহারো সর্ব্বস্ব হরে নাই, জীব কেবল মুখের দোষেই ত্যাজ্য ও মুখের গুণেই পূজ্য হইয়া থাকে।

শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিহিত বাণীসহ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

সংপ্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদসাগর পত্র সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলাম, যদ্যপি কোন মহাশয় তদ্ভার গ্রহণে পারগ হয়েন তবে আগামি কোন এক রবিবারে খিদিরপুরে মন্নিলয়ে স্বয়ং আগমন অথবা পত্র প্রেরণ করিলে বিবেচনা করা যাইবেক।

সংবাদপত্র সম্পাদনীয় ব্রতোত্থাপন কালে সাধারণের প্রতি আমার ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে আমি এক কালে তাহা হইতে বিমুখ হইলাম না, প্রায় বাঙ্গালা সমাচার পত্র মাত্রেই মল্লেখনী বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ রহিল. বিশেষতঃ যদিস্যাৎ উপযুক্ত রূপ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হই তবে উত্তরকালে সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি লিপি-সাহায্য প্রদান করিব ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬০ বঙ্গাব্দা।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"
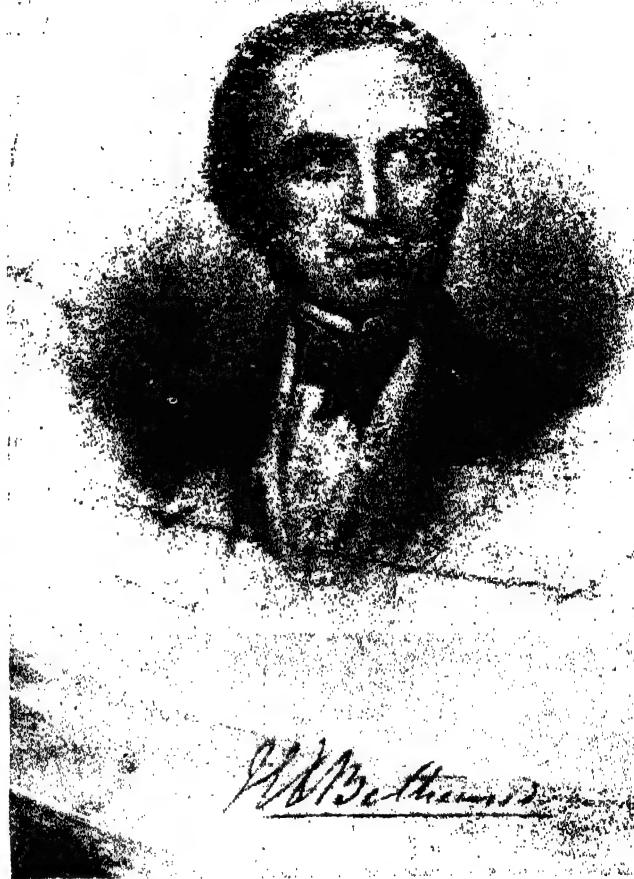
ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

'বিবিধার্থ সংগ্রহ।' রঙ্গলাল 'রস-সাগর' সংবাদপত্রের সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিয়া কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের অনুমান এই সময়েই তিনি ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তৎসহিত-সম্পাদিত সচিত্র মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' প্রবন্ধ সকলনে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে (১২৫৮ সালে কার্ত্তিক মাসে) বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের' আনুকুল্যে এই পত্র স্থাপিত হইয়াছিল। যাঁহাদের তত্ত্বাবধানে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পরিচালিত হইত সেই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সভ্যগণের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রসময় দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ সরকার, রেভারেণ্ড জে রবিন্সন, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ., মিষ্টার ডব্লিউ এস সীটনকার, মিঃ ওয়াইলি, মিষ্টার হজসন প্র্যাট ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "যাহাতে

সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী

সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্প বোধে ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্ব্বক উপকারক বিষয়ের চর্চ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টি-জনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য" ছিল। বলা বাহুল্য এই লক্ষ্যের সহিত রঙ্গলালের গভীর সহানুভূতি ছিল এবং তিনি উক্ত পত্রে সারগর্ভ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলির নিম্নে লেখকের নাম মুদ্রিত না থাকায় এক্ষণে তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলির তালিকা প্রদান করা বা তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে।

'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ।'

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি, ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে ডাক্তার এফ, জে, মৌয়েট এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় 'বেথুন সোসাইটী' নামক এক সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সভার প্রতিষ্ঠা। যদিও রঙ্গলাল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না, তথাপি বেথুন সভার পুরাতন কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে 'রস-সাগর' সম্পাদক রঙ্গলাল প্রায় প্রথমাবধি এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

বাঙ্গালী সভ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে এই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ডাক্তার সূর্য্যগুডিভ চক্রবর্ত্তী 'কলিকাতার স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতি সাধন,' ফেব্রুয়ারি মাসে রেভারেণ্ড কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংস্কৃত কাব্য', ও মার্চ্চ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র 'সেকাল ও একালের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য, সমাজ, জ্ঞান, ও নীতি সম্বন্ধীয় অবস্থা' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত বৎসরে ৮ই এপ্রিল রাত্রি ৮ঘটিকার সময় মেডিক্যাল কলেজ গৃহে বেথুন সভার যে অধি-বেশন হয়, তাহাতে কলিকাতার রামবাগানস্থ দত্ত বংশোদ্ভব ইংরাজী ভাষায় সুলেখক হরচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'বাঙ্গালা কাব্য' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে (কলিকাতা রিবিউ ত্রৈমাসিক তখন যথাসময়ে প্রকাশিত হইত না বলিয়া) কলিকাতা রিবিউ পত্রের জানুয়ারি (১৮৫২) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কৌতূহলী পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। এই প্রবন্ধের কোন কোন স্থানে তিনি বাঙ্গালা কাব্যের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। এক স্থানে বলেন—

"While on this subject, we are com-

pelled to admit the truth of a charge often urged against the Bengali poets. All their writings and more especially their panchalis or songs, are inter-larded with thoughts and expressions grossly indecent."

প্রবন্ধ পাঠের পর কতিপয় সভ্য লেখকের মন্তব্যের আলোচনা করেন। মহেন্দ্রনাথ সোম, নবীনচন্দ্র পালিত, কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকটিত করেন। বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিত মহাশয় * বলেন, প্রবন্ধ মধ্যে রামপ্রসাদ সেন ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম প্রসিদ্ধ কবিগণের সহিত উল্লেখ করা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে জীবিত কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিরও পরিচয় প্রদান করা উচিত, যথা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যাধ্যাপক এবং এক্ষণে মুরশিদাবাদের বিচার বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্রভাকর সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'রসসাগর' সংবাদপত্রের সম্পাদক বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং 'রাস-রসামৃত' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা বাবু দ্বারকানাথ রায়। উপসংহারে তিনি বলেন, বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্য অনিন্দনীয় এবং সমালোচকের প্রতিকূল মন্তব্য বিচারসহ নহে।

অতঃপর ইংরাজী সাহিত্য রসে বিভোর মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে প্রবন্ধ-লেখক মূলের যে অনুবাদ শুনাইয়াছেন তাহা মূলের ঠিক অনুযায়ী নহে। মূল অপেক্ষা অনুবাদ অধিকতর কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মতে বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যাহা কোনও শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির সন্তোষবিধান করিতে পারে। উহা কুৎসিত অশ্লীলতা ও কুরুচিতে পরিপূর্ণ এবং ভদ্র ও সভ্য ব্যক্তিগণের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা কবিদিগের অঙ্কিত চিত্র ও উপমাগুলি যে উৎকৃষ্ট নহে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিদ্যাসুন্দর হইতে কতকগুলি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া মুখে মুখে তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন।

হরচন্দ্র দত্ত

কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতা বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। একজন উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন, কিন্তু

* ইনি হিন্দু কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টার' দৃষ্টে প্রতীত হয় যে ইনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২ টাকার জয়কৃষ্ণ সিংহ জুনিয়র স্কলার্শিপ এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪০৲ স্কলার্শিপ পাইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ হইতে উচ্চ প্রশংসাপত্র লইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। ইনি মাতুল রামগোপাল ঘোষের বাণিজ্যব্যবসায়ে সহকারী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে কলেজ রি-ইউনিয়ন প্রসঙ্গে ইঁহার উল্লেখ আছে।

রাত্রি ১১টা বাজিয়া যাওয়ায় সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে উহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রাচীন কবিদিগের জীবনচরিত ও পদাবলীর অক্লান্ত সঙ্কলয়িতা ঈশ্বর গুপ্তের প্রিয়শিষ্য রঙ্গলাল প্রাচীন কবি গণের অত্যন্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি বাঙ্গলা কাব্যের নিন্দকদিগের অযুক্তি নিবারণ নিমিত্ত সযত্নে একটি প্রস্তাব রচনা করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে মেডিক্যাল কলেজ গৃহে রাত্রি ৮টার সময় বেথুন সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সভার অন্যান্য কার্য্যের পর রঙ্গলাল তাঁহার "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটি কিছু দীর্ঘ হইয়াছিল, কিন্তু 'বেঙ্গল হরকরার' সংবাদ দাতার পত্রে প্রতীত হয় যে উহা সকলে অতীব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় রঙ্গলালের প্রবন্ধের বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই, সভাপতি ডাক্তার মৌয়েট সভাভঙ্গ করিয়া দেন।

এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রেভারেণ্ড লঙ্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত প্রাগুক্ত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রঙ্গলাল প্রণীত Defence of Bengali Poetry' নামোল্লেখ আছে। ১২৫৯ সালের ৫ঠা আষাঢ় (ইং ১৬ই জুন ১৮৫২) সংবাদ প্রভাকরে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। স্বাবকাশ মতে দৃষ্টি করিয়া অভিমত ব্যক্ত করিব।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বাঙ্গালা কবিগণের ভক্ত জীবনচরিত লেখক গুপ্ত কবির মূল্যবান অভিমত আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। রঙ্গলালের কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থখানিও এ পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

নবীনচন্দ্র পালিত
(পুরাতন ড্যাগারিয়োটাইপ হইতে)

পদ্মিনী কাব্যোরসূচনা। বন্ধু বিয়োগ।

রঙ্গলালের বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এবং রঙ্গপুর কুণ্ডী পরগণার সাহিত্য রসিক ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক তাঁহাকে একটি নির্দ্দোষ সদ্ভাবপূর্ণ কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। রঙ্গলালও রাজস্থানের পুরাবৃত্ত অবলম্বনে 'পদ্মিনীর উপাখ্যান কাব্যাকারে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজা সত্যচরণ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করায় তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন যে কাব্যখানি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখেন। প্রায় তিন বৎসর পরে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। যথাস্থানে সেই কাব্যের পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি রঙ্গলালের আর একজন গুণমুগ্ধ ও

কৈলাশচন্দ্র বসু

উৎসাহদাতা স্বনামধন্য আশুতোষ দেব পরলোকগমন করেন। ইহাতে রঙ্গলাল অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। আশুতোষ দেবের অনেক গান আজিও অনেকের নিকট সমাদৃত, কিন্তু তাঁহার চরিত কথা অনেকেরই অপরিজ্ঞাত। সেই জন্য কিছু অবান্তর হইলেও ১২৬২ সালের ২০শে মাঘ (ইং ১৮৫৬ খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারি) তারিখের সম্বাদ প্রভাকরে কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত তৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না :—

"আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্টদেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। হে পাঠকগণ এই হৃদয় বিদীর্ণকর সংবাদ লিখিতে আমার দিগের লেখনী মসীছলে শোকাশ্রু নিক্ষেপ করিতেছে। আহা! কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষত রোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরাজ, বাঙ্গালি, ফরাসি, ইউনানি প্রভৃতি বহুগুণ সম্পন্ন চিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রম ও উপায়াবলম্বন করিয়াও তাহা আরোগ্য করিতে পারিলেন না। ঐ সাংঘাতিক নিদারুণ রোগ কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল; কি পরিতাপ! বাবু আশুতোষ দেব এ প্রকার উৎকট ও ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া আমার দিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন আমরা তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই। এতদিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন। হা পরমেশ্বর! আশুতোষ বাবু জীবিত থাকাতে আমার দিগের পূর্ব্বকার সকল শোক নিবারণ হইয়াছিল, অধুনা তাঁহাকেও কৃতান্তের করালদন্তে নিক্ষেপ করাতে আমরা একেবারে অসীম শোকে অভিভূত হইয়াছি, কি লিখিতেছি কিছুই স্থির নাই। হে বন্ধুবর বাবু গিরিশ দেব কোথায়? তোমার পিতৃবিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃবিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরল স্বভাব, উদার চিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্ধন লোক তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল স্বরূপ হইয়া তাঁহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। আহা! তাঁহারদিগের দশা কি হইবেক তাহা অনুভূত হয় না। রে নিষ্ঠুর কৃতান্ত এই সর্ব্বজনপ্রিয় বহুজনাশ্রয় বঙ্গদেশের মহারত্ন স্বরূপ আশুতোষ দেব মহাশয়কে অপহরণ করিতে তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না? আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখদর্শনে সর্ব্বদা কাতর এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন, তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দেশের হিতবর্দ্ধন ও হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যা সুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন? আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব, রস, সুর, রাগ, তান, মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

"মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়। অদ্য আমরা তাঁহার মৃত্যুশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এই বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল এতৎপাঠে সকল লোকই শোকাভিভূত হইবেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।
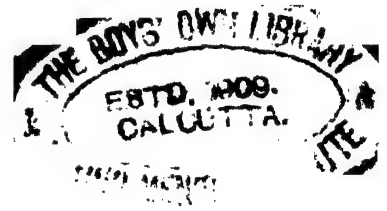
চির-বিদায়

এমন সুন্দর রাতি, এমন জ্যোছনা,
কিন্তু আজি কোথা গেল সেই উন্মাদনা?
কোথা সেই অনুভূতি? সে আত্ম-বিস্মৃতি?
সেই স্বপনের পুরী, ভাঙাগড়া নিতি?
আর ত ঢালে না তারা প্রতি রোম-কূপে
অমৃত-মদিরা! তারা আসে চুপে চুপে—
চলে যায় চুপে চুপে কোন্ পথ দিয়া—
নাহি মোর অবকাশ দেখিব চাহিয়া!
—বুঝি তারা যৌবনের চিরদ্যুতিমান্
অভিন্ন-হৃদয়বন্ধু—করেছে প্রয়াণ
যৌবনের সাথে সাথে হায় রে কুক্ষণে—
তাই তাহাদের রূপ আজি এ নয়নে
হয় নাই প্রতিভাত কভু কভু আর—
রেখে গেছে বিনিময়ে নিত্য হাহাকার!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

আগুনের ফুল

শ্রীঅমূল্যকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক আর্য্য পাবলিশিং কোং, পি ৫৭ রসা রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

যাঁহারা নূতন ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কয়েকটি ছোট কবিতায়, তাঁহাদেরই বন্দনা প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, "এই লেখার ভিতর দিয়ে সাহিত্যসম্পর্কিত কোন দুরাকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করবার মত বাসনা আমার নেই। এ রকমের সন্দেহ যদি কারো মনে ভুলেও জাগে, তবে এই দরিদ্র অরসিক ফুলের মালীটির প্রতি যে নিতান্তই অবিচার করা হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।"

বইখানি ছোট বালক-বালিকাদের জন্য। জয়দেব হইতে গান্ধী, জগদীশচন্দ্র, বারীন্ ঘোষ পর্য্যন্ত অনেকেরই ছবি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বইখানি যাহারের জন্য রচিত, তাহাদের নিকট সমাদৃত হইবে।

বিনোদিনী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীব্রজজনবল্লভ বসু। বোলপুর, বীরভূম। মূল্য ১৲

এই গ্রন্থে নয়টি গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে ডট্ ও ড্যাশের এবং দুই চারি কথার ছোট ছোট প্যারার প্রাচুর্য্য দেখিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল. এই গল্পগুলি বুঝি প্রথম-রিপুমূলক অর্থাৎ "অতি-আধুনিক" ধরণের হইবে। কিন্তু পড়িয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল—কোনও গল্পেই লেখক ভদ্রতা ও শালীনতাকে কিছুমাত্র অতিক্রম করেন নাই। অতি-আধুনিক ভাষাপদ্ধতিমাত্র তিনি অনুকরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে রচনা অনেক স্থলে জটিল ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ভঙ্গি করিয়া কথা বলার মোহ তিনি সম্বরণ করিলে, সহজ সরল ন্যাকামি-বর্জ্জিত ভাষায় লিখিলে, গল্পগুলি অধিকতর উপাদেয় হইত।

কয়েকটি গল্পের আখ্যানবস্তু বেশ ঘোরালো হইয়াছে। "পয়োমুখম্" গল্পটির আখ্যান-কৌশল, যে-কোনও প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখকের যোগ্য। ডট্ ও ড্যাশ এবং স্থানে স্থানে ভাষার বক্রতাকে ছাপাইয়াও, ইহার রস ও সৌন্দর্য্য পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলে। "পল্লীশ্মশান" চিত্র হিসাবে অনবদ্য। ভাবের দিক দিয়া "দিবসের শেষে" এবং "ভরা সুখে" গল্পদ্বয়ও সুন্দর। কিন্তু বাকী কয়টি গল্প—হংসমধ্যে বকো যথা হইয়া এই পুস্তকে জুড়িয়া বসিয়াছে। হয় আখ্যান-কৌশল, নয় কেন্দ্রগত ভাবটি উচ্চাঙ্গের হওয়া আবশ্যক। যে গল্পে আখ্যান-বস্তু এবং কেন্দ্রগত ভাব উভয়ই তুচ্ছ, তাহা অচল হইয়া দাঁড়ায়।

পুস্তকের প্রারম্ভে "গল্প কেন লিখিলাম" কৈফিয়ৎটি, নিতান্ত বালকোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা বাদ দিলেই শোভন হইবে।

গল্পগুলি পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছে, কথাসাহিত্যে জগদীশবাবু বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অতি-আধুনিকদের বিকৃত ও বিরক্তিকর বাগ্‌ভঙ্গির অনুকরণ বর্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন।

হালুম বুড়ো

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—প্রবাসী কার্য্যালয়, ৯১ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ৷৵০

শিশুদের নিকট এই সচিত্র বইখানির আদর হইবে। কণ্ঠস্থ করুক আর নাই করুক, হাতে পড়িলেই যে তাহারা সাগ্রহে আগাগোড়া পড়িয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

গ্রন্থে পুরাতন ছড়া সংগৃহীত হয় নাই, তবে পদগুলি ছড়ার ধরণেই রচিত। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং শিশু-সাহিত্যও দেশকালপাত্রের উপযোগী হউক্। আধুনিক যুগে শিশুদের হিতার্থে কিরূপ সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত, তাহাও বিশেষরূপে বিচার্য্য ; কেন না, এ কাযে দায়িত্ব বড় কম নয়।

গ্রন্থকার পুরাতন পথটি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তবে কয়েকটি নূতন চিত্রও তিনি আঁকিতে ভোলেন নাই। সেগুলি আমরা উপভোগ করিয়াছি।

নভোরেণু

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস লাইব্রেরী, ২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০

ছোট একটি কবিতার বই। বদ্ধ জীব হঠাৎ বাহিরের সাড়া পাইলে যে দুঃসহ পুলক ও বেদনায় অভিভূত হয়, তাহারই সুর কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। অনেকস্থলে কবি-প্রাণের সরস স্ফূর্ত্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

অনেকগুলি কবিতায় আধুনিক যুগের কথা আছে, এগুলির মধ্যে কবিকে দেখিতে পাওয়া যায় উপদেষ্টার রূপে। দেশের তামস প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া লেখক আবেগের সহিত কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শুধু আবেগ থাকিলেই কাব্য হয় না।

হিন্দু মরে ভূত না হলে কাঁপত জগৎ হুঙ্কারে,
গগন ভুবন করত মুখর লাখ ধনুকের টঙ্কারে।

কুলের বধূ ধর্ষিত আজ, সইত কি তা চোখ বুজে?
লুণ্ঠিত বৌ আনত কেড়ে, চলত ভবে কান বুজে!

এই সব কথায় আবেগ থাকিতে পারে, কিন্তু কাব্য নাই। পাঠক কিন্তু নিম্নলিখিত রচনায় কাব্যরস উপভোগ করিবেন। কবি সহরের লোককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ওগো পরগাছা টবের পাদপ ডাকে পল্লীর মৃত্তিকা,
সুধাধারা পিয়া তাজা করো হিয়া গজাও সবুজ পত্রিকা।
কোটি মানবের বিকট গুমটে, ঘন প্রাসাদের আওতাতে
চেহারা করেছ ভীষণ ফ্যাকাসে তবু রহ পচা বাওরাতে।

ভাষা সর্ব্বত্র মার্জ্জিত নয়, ছন্দের গতিও মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়াছে। তবে যেখানে লোক-শিক্ষা বা উপদেশ ছাড়িয়া কবি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার কাব্য হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। একটু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম—

শোনো লক্ষ্মী শোনো আজ বলিতে নাহিক লাজ
সেদিনের পদ্মনেত্র জল,
আঁচলে যায়নি মরে, আঁচল হইতে গড়ে
পড়েছিল এ হৃদে কেবল।
তখনি গভীর সুখে, লুকায়ে রাখিনু বুকে,
সে যে স্বাতী নক্ষত্রের দিন!
জীবনে কি জানি কবে, সে মুক্তা ফলিয়া রবে,
হবে'না তা হবে না মলিন।

ভাবটি সুন্দর, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী মনোহর হয় নাই।

আরবী ও সংস্কৃত ছন্দে যে কয়টি কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহা সুখপাঠ্য হয় নাই। ছন্দের কঠিন বন্ধনে তাহা কান্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

মোটের উপর বলিতে পারা যায় কবির শক্তি আছে, তবে তাহার অনুশীলন আবশ্যক। তিনি নূতন সুরে গান গাহিতে গিয়াছেন, কিন্তু আসর জমাইতে পারেন নাই। তবে তিনি যে নিজের পথ শীঘ্রই মনোরম করিয়া তুলিবেন সে আশা করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

The Mysteries of the Bible, Supplement to the Mysteries of the Bible.

প্রণেতা শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট, মূল্য ॥০

লেখক এই পুস্তিকায় বাইবেলের কয়েকটি রহস্য হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিলে ইহা যে সনাতন ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়-বিধানে সমর্থ, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। লেখক এই আলোচনার দ্বারা তুলনামূলক ধর্ম্মবিজ্ঞানের (Science of Comparative Roligion) পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। আলোচনাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইলেই ভাল হইত। লেখকের উক্তির সার এই—

(১) শয়তান সর্পরূপ ধারণ করিল কেন, এ কথায় মীমাংসা করিতে গিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে বেদ, গ্রীক পৌরাণিক তত্ত্ব ও আভেস্তায় যে স্বর্গ মর্ত্ত্যের শত্রু, তাহার সর্পরূপেরই বর্ণনা আছে।

(২) বাইবেলের নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা বেদেও আছে।

(৩) বাইবেলের ইভ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, এবং আদম পুরুষ।

(৪) আদম ও ইভের স্বর্গচ্যুতির কথা বলিতে গিয়া লেখক পূর্ব্ব-কথার সামান্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহাতে অসঙ্গতি দোষ ঘটিলেও লেখকের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। লেখক বলিয়াছেন আদম সত্ত্ব, ইভ রজঃ ও সর্প তমঃ। সুতরাং আদম ও ইভের স্বর্গচ্যুতি ও রজস্ ও তামস্ গুণের প্রভাবে সত্ত্বের অভিভব একই জিনিস।—আমরা লেখকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি। তবে ইভকে একবার প্রকৃতি ও দ্বিতীয় বার রজোগুণ বলিয়া বর্ণনা করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

(৫) আদি পাপ (Original sin) যাহার জন্য বিশ্বজগৎ আজও পীড়িত, তাহা তমোগুণের প্রাধান্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৬) যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া। ক্রুশ জগতের পাপভার। যীশুর ক্রুশ গ্রহণের অর্থ এই যে, শিব যেমন হলাহল পান করেন, সেইরূপ যীশুই জগতের পাপভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লন। ইহার ফলে তাঁহার জীবননাশ হয় বলিয়াই বাইবেলে পুনরাবির্ভাবের (Resurrection) কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

যীশুর সহিত শিবের তুলনা ও পুনরাবির্ভাবের এই অর্থ আমরা যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী মনে করিনা।

(৭) পবিত্র আত্মা (Holy Ghost) এর অর্থ এই যে, যীশু সকলের পাপভার মাথায় লইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারেন নাই, সেই পাপভার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি "পবিত্র আত্মা" হইলেন।

এই কথাগুলি লেখক নানা দেশের নানা কথার সাহায্যে প্রাঞ্জল করিয়া তুলিয়াছেন। আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নাই। কষ্ট-কল্পনাও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বিষয়টি কঠিন ও নূতন। রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতী এইরূপ তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। লেখকও সেই পথ দিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। তবে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে গিয়া ইংরাজী ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা এখন আর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ ভাষা ভাবের বাহন, যে ভাবা একেবারে দেশী, তাহার জন্য দেশী ভাষাই আবশ্যক।

গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়।

রায় রাজা।

স্বর্গীয় কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রণীত। শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা এম্-এ, কর্তৃক কর্ণেল হাউস, আগরতলা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৩৩৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন পুস্তকখানির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকার সমালোচনা অনাবশ্যক। পুস্তকখানিতে পরলোকগত লেখকের নিম্নলিখিত নিবন্ধগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

১। ভারতে দেশীয় রাজ্যের স্থান। ২। দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। ৩। দেশীয় রাজ্য। ৪। দিল্লীর দরবার ও ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ। ৫। দিল্লীর শিল্পপ্রদর্শনী। ৬। দেশীয় রাজগণ ও উপাধি-ব্যাধি। ৭। দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান সমস্যা। ৮। ত্রিপুরায় বীরচন্দ্র। ৯। ঝুলনস্মৃতি। ১০। হোরি। ১১। বীরচন্দ্রের শাসনে জেল। ১২। ত্রিপুর-দরবারে রবীন্দ্রনাথ। ১৩। ত্রিপুরা প্রসঙ্গ। ১৪। ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা। ১৫। বার্ষিক। ১৬। ত্রিপুরার শিল্প। ১৭। মণিপুর চিত্র। ১৮। মহীশূরে রাজ্যোদ্বাহ।

এই পুস্তকের সমালোচনা করিতে অর্থাৎ দোষ ধরিতে একেবারেই ইচ্ছা হয় না। গল্পনিপুণ ঠাকুর্দ্দাকে যেমন কেবলই "আরও বলুন," "আরও বলুন"—বলিয়া যতদূর পারা যায় আদায় করিতে ইচ্ছা হইতে থাকে,—এই পুস্তক পড়িয়াও আমাদের সেই অনুরাগী নাতির দলের অবস্থা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে "আরও বলিতে" সাহিত্যপ্রাণ ত্রিপুরার উজ্জ্বলরত্ন কর্ণেল মহিমচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। সম্ভবতঃ ত্রিপুরার তরফে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জীবিত নাই, যিনি, কর্ণেল মহিমচন্দ্রের নিবন্ধগুলি শুনিবার যে আগ্রহ জাগাইয়া তোলে, তাঁহারই ভঙ্গীতে, তাঁহারই মত রস দিয়া, দরদ দিয়া, সেই কথাগুলি "আরও বলিয়া" আমাদের শুনিবার পিপাসা মিটাইতে পারেন।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে সাতটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ আছে। যাঁহারা রাজনীতির চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের এই প্রবন্ধগুলি সাবধানে আলোচ্য—চিন্ত্য—পাঠ্য। প্রবন্ধগুলিতে যথেষ্ট গুণ থাকিলেও,—এক হিসাবে এইগুলি বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব হইলেও—আমাদের নিকট এগুলি যেন কতকটা rambling (ছাড়া ছাড়া) ধরণের বোধ হইল। কিন্তু এই দোষই গুণ হইয়া উঠিয়াছে ২য় খণ্ডের অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলিতে—যেখানে গ্রন্থকার 'যা খুসী তা' বকিয়া গিয়াছেন, আর আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছি। এই সকল প্রবন্ধে প্রবন্ধকার মূল প্রবন্ধের সূত্রে যন্ত্রের মত চলিয়া গেলে অত্যন্ত রসভঙ্গ হইত—তিনি মূল বিষয় অনুসরণ করিতে করিতে আরও দশটা এমন মনোরম অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে, এই সাহিত্যিক ভুরিভোজনের তৃপ্তির তুলনা নাই। "ত্রিপুরায় বীরচন্দ্র", "হোরি", "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ","মণিপুরচিত্র", "মহীশূরে রাজ্যোদ্বাহ" শুধু কর্ণেল মহিমচন্দ্রই লিখিতে পারিতেন। প্রথম স্বরচিত সঙ্গীত-গীতে সপরিবারে ঝুলনোৎসবে মত্ত গুণী-কবি-ভক্ত-ভূপতি বীরচন্দ্র মাণিক্যের এমন চমৎকার চিত্র কর্ণেল মহিমচন্দ্র ভিন্ন আর কে আঁকিতে পারিত? "মণিপুর চিত্রে"র জন্য বঙ্গীয় পাঠক তাঁহার নিকট এবং তাঁহার পুস্তকের প্রকাশক তাঁহার পুত্রের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে। প্রকাশকগণ পুস্তক-প্রকাশকালে ছাপাইবার খরচের সহিত বিজ্ঞাপনের খরচাটা ধরিতে ভুলিয়া যান। এই চমৎকার পুস্তকখানা যদি বিজ্ঞাপনের অভাবে কর্ণেল হাউসেই উই-ইঁদুরেরর খাদ্যে পরিণত হয়, তবে আমাদের আর পরিতাপের সীমা থাকিবে না। প্রকাশক সম্ভবতঃ সম্পন্ন লোক, পুস্তকবিক্রয়-লব্ধ অর্থে তাঁহার প্রয়োজন না থাকিতে পারে—কিন্তু বাঙ্গালী পাঠকের এই পুস্তকখানা পড়িবার প্রয়োজন আছে।

তাম্বুল বণিক্।

বা বঙ্গীয় তাম্বুলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ২৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০। ছাপা, কাগজ বিশেষ ভাল নহে। দাম অত্যন্ত অল্প বলিতে হইবে।

পুস্তকখানা পড়িয়া স্থানে স্থানে বেশ আনন্দ লাভ করিলাম। জাতিত্বের গহনে পড়িয়াও যে গ্রন্থকারের সাধারণ বুদ্ধি ঘোলাটে হয় নাই, ইহা বড়ই আশার কথা। কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

"শাস্ত্রকার……ইহাদিগকে সঙ্করবর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। কি প্রকারে যে এই সকল সঙ্কর বর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভারতবর্ষে অধুনা লোকসংখ্যা গণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ অপেক্ষা সঙ্কর বর্ণের অস্তিত্ব অধিক। যথায় ব্রাহ্মণ একজন, তথায় সঙ্করবর্ণের সংখ্যা সহস্রজন হইবে। কিন্তু এ সকল সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে হাস্যোদ্রেক হয়। ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের সহবাসে এই সকল সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ এরূপ বলেন।

[সমালোচকের বক্তব্য। অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহ, বিবাহ বলিয়াই শাস্ত্রে স্বীকৃত—তাহা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক-সহবাস নহে। মিশ্রবর্ণগুলি অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহের ফল, ইহাই বোধ হয় শাস্ত্রের অভিপ্রায়]

"যথারীতি প্রকাশ্য বিবাহের সন্তান সন্ততিগুলির সংখ্যা এত অল্প হইল এবং গুপ্ত বিবাহের সন্তান-সন্ততিগণের সংখ্যা তাহার সহস্র গুণ অধিক হইল, এ কথা কোন্ বিচারে গ্রহণ করা যায়?…… বাঙ্গালায় এক্ষণে বৈশ্যবর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। পরন্তু প্রাচীন কালে জনসাধারণকেই বৈশ্য বলিত; সুতরাং সমুদয় বর্ণের লোকাপেক্ষা বৈশ্যবর্ণের জনসংখ্যাই অধিক। কিন্তু কিরূপে এই বর্ণ ক্রমে ক্রমে

লোপ পাইল? ইহারা কি সবর্ণা স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বর্ণের স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পরিণামে সঙ্করবর্ণে পরিণত হইয়া আপনাদের অস্তিত্ব লোপ করিল? এইরূপ আশঙ্কা সম্ভবপর নহে, পরন্তু ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, মনুর সমকালীন বৈশ্যগণ বৃত্তিভেদে এক্ষণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে।" ২৯—৩০ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকারের এই উক্তিতে যে সত্য আছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সম্ভবতঃ স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ আর শূদ্র মাত্র সমাজে রহিল আর ক্ষত্রিয় বৈশ্য কর্পূরের মত সমাজদেহ হইতে উড়িয়া গেল, ইহা বড়ই অবিশ্বাস্য কথা। আর্য্যগণের আদি নিবাস যেখানেই হউক এবং আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বিভাগ যে যুগেই উদ্ভূত হইয়া থাকুক, পরবর্ত্তী কালে আর্য্যসভ্যতা যেখানে যেখানে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেখানেই খাঁটি আর্য্য ব্রাহ্মণ, আর্য্য ক্ষত্রিয়, আর্য্য বৈশ্য মূল স্থান হইতে উঠিয়া আসিয়া খাঁটি আর্য্যসমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এই মতবাদ বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন। বলিদ্বীপের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও খাঁটী আর্য্যসন্তান, এই theory বিশ্বাস করিলে তাহাই ধরিয়া লইতে হয়। অন্যান্য অনেক theoryর মত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিবিভাগ ও আর্য্যসমাজ গঠনপদ্ধতির একটি সর্ব্বজনমান্য theory বলিয়াই বোধ হয়। যখনই যেখানে আর্য্যসভ্যতা প্রবেশলাভ করিয়াছে, দেশের তাবৎ অধিবাসীর উপর এই theory খাটাইবার চেষ্টা হইয়াছে,—বাঙ্গালা দেশে হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে হইয়াছে, জাভা, সুমাত্রা, বলি, শ্যাম, কাম্বোজে হইয়াছে। ইহারই ফলে সাঙ্কর্য্যের যত কল্পনার সৃষ্টি।

যাহা হউক, জাতিতত্ত্বের গহনবনে প্রবেশ করিয়া আর দরকার নাই। এই পুস্তক পাঠে অবগত হইলাম—পশ্চিম বঙ্গীয় তাম্বুলীগণ পূর্ব্ববঙ্গীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বারুজীবিগণ হইতে ভিন্ন। বারুজীবিগণ কি বলেন? গুণকর্ম্মবিভাগশঃ যদি জাতি চিনিতে হয়, তবে অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান অধুনা শৌণ্ডিক বা চর্ম্মকার বলিয়া গণ্য হইবেন সন্দেহ নাই। তাম্বুলীগণ বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়া বৈশ্য হউন, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হউন, ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হউন—আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক এই আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। দেশ শূদ্রাচারীতে ভরিয়া যাইতেছে—তাহার প্রতিবিধান করুন।

১৪২ পৃষ্ঠায় মহাত্মা গোবর্দ্ধন রক্ষিতের অবদান কাহিনী পাঠে করিয়া ধন্য হইলাম। এই মহাত্মা চিনির কারবারে বিপুল ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে অসংখ্য দীঘি পুষ্করিণী কাটাইয়া এবং রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া ধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কাহিনী বাঙ্গলার পাঠ্য পুস্তকে গৃহীত হইবার যোগ্য। এই কাহিনী পড়িয়া লুপ্ত চিনিশিল্পের জন্যও একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

রাজার জাতি।

কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ ধারাবাহিক ইতিহাস। কবিরাজ শ্রীরমেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও সঙ্কলিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী পাতলা এণ্টিক কাগজে ভাল কালিতে ছাপা, ২৮০ × ২০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "রাজন্যকাণ্ড" ও "কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ের" পরে এই পুস্তকের কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এই সকল propaganda পুস্তক ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে লিখিত হওয়া আবশ্যক, যেন কায়স্থেতর জাতিও স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, পুস্তকখানি সত্যই ইতিহাস, পক্ষপাতদুষ্ট অক্ষম ওকালতি পুস্তক নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজন্যকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সমালোচ্য পুস্তক পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর যত পুস্তক দেখিয়াছি, তাহাদের একখানা সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে না। কায়স্থ বলিয়া পরিচিত জাতি একটা বিরাট মিশ্রিত জাতি, ইহাতে যে কতপ্রকার উপাদান ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহার হিসাব করা বড়ই দুষ্কর। পঞ্চ কায়স্থ যদি সত্যই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত আসিয়া থাকেন, তবু ইহা ঠিকই যে, পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের পূর্ব্বেও যেমন বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, পঞ্চ কায়স্থের আগমনের আগে তেমনি বাঙ্গালা দেশে কায়স্থেরও অভাব ছিল না। ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব ইত্যাদির তাম্রশাসনগুলি খ্রীষ্টাব্দের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদের। এই গুলিতে বিষ্ণু ঘোষ, শুচি, পালিত, নয়নাগ, জনার্দ্দন কুণ্ড,, অনিমিত্র, নয়সেন, শূরদত্ত, প্রিয় দাস ইত্যাদি সোপাধিক কায়স্থের নাম পাওয়া যায়। কায়স্থজাতির ইতিবৃত্তমূলক একখানা খাঁটি ইতিহাস-পদবাচ্য পুস্তকের অভাব এই পুস্তকে দূর হইল না।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস।

দুই ভাগে সম্পূর্ণ। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ, বিদ্যানিধি প্রণীত, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা হইতে প্রকাশিত। আগরতলায় গ্রন্থকারের নিকট ও ১০নং বনফিল্ড লেন, এবং কলিকাতায় শ্রীসমরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি, এস, সি, মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য। ডবল ক্রাউন ১৬পেজি, ২৪০পৃঃ, মূল্য ১।০

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—"প্রকৃত ইতিহাসের প্রণালী আমরা বুঝি যে, কিম্বদন্তী কিংবা লিখিত বিবরণ প্রথম সত্য বলিয়া গ্রহণ করতঃ, তাহারই সমর্থক যুক্তিপ্রমাণ সংগ্রহ করিতে আমরা চেষ্টা করিব। যুক্তিপ্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্বিপরীত কোন বলবত্তর কথা জানা না যায়, ততক্ষণ সেই সত্যটিকে পরিত্যাগ করিয়া অপর তুল্য দুর্ব্বল সত্যকে তৎস্থলে গ্রহণ করিব না।" ৯ পৃষ্ঠা।

এতদনুসারে "কিম্বদন্তী আছে যে"—বলিয়া কেহ যাহা কিছু

লিখিয়া গিয়াছেন, সমস্তই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে গ্রন্থকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমর্থক প্রমাণ সংগ্রহে প্রাচীন ভাষার চিহ্নমাত্র বর্জ্জিত, কিন্তু ১৫দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া প্রথিত—"রাজমালা" প্রামাণ্য বলিয়া অনুসৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইতিহাস রচনার এ পদ্ধতি এখন অচল। এখন মাটি খুঁড়িয়া, পুরাণো পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া, প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলিপি, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদির পাঠোদ্ধার করিয়া ইতিহাস না লিখিলে তাহা ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হয় না।

আদি আর্য্যভূমি।

উপরের গ্রন্থের গ্রন্থকার কর্ত্তৃকই প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৭৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

গ্রন্থারম্ভে লিখিত হইয়াছে—"লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক Arctic home of the Vedas (বেদে আর্য্যদিগের মেরু নিবাস) নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে জ্যোতিষের জটিল ও কঠিন বিচার করা হইয়াছে। সুতরাং উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য নহে।......... আমি উল্লিখিত কোন মতেরই অনুসরণ না করিয়া ভিন্ন প্রণালীতে ও ভিন্ন প্রমাণ সহকারে মেরুতে আদি আর্য্য নিবাসের মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সুধীবর্গেরই বিচার্য্য। আমাদের শাস্ত্রে আর্য্য জীবনের সমস্ত বিষয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের আদি নিবাসের বিষয় সন্নিবিষ্ট হয় নাই ইহা বিশ্বাস হয় না। আর্য্যদিগের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় তাহাদের আদি নিবাসের বিষয় সরল সত্যরূপে শাস্ত্রে পাওয়া গেলে তাহাই স্বাভাবিক হয়। এই রূপেই পাওয়া যায়, আমি তাহাই আমার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছি।"

এখানিও, পূর্ব্ব গ্রন্থখানির মত "আর্য্য পদ্ধতি"তে লিখিত—প্রমাণ ও যুক্তির সারবত্তা নাই। বিস্তৃত সমালোচনা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রমমাত্র হইবে বলিয়া, তাহা হইতে আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

প্রার্থনা

যাবে জানি,—যাবো জানি,—তবু কেন, স্বামী,
ভাবতে গেলে বুকের নাচন নিমেষে যায় থামি?
এলাম যদি, পেলাম যদি এমন পরাণ ভরে,
তবে কেন পলায় জীবন মিলন-বাঁধন ছিঁড়ে?

জীবন যদি মরণ সাথে বাঁধা অনুরাগে,
দাওগো আশীষ—আমি যেন যাই তোমারি আগে।
যাবো আমি আগেই যাবো, বাঁধবো সেথায় বাসা,
তুমিও যাবে—পিছু-পিছু—সেইতো দাসীর আশা!

গৃহস্থালী সাজিয়ে সেথা, বিছিয়ে ফুলের বাসর,
পারিজাতের রেণু দিয়ে রাঙিয়ে প্রাণের আসর—
অশ্রুজলে কেশের কালো গালিয়ে, তোমার রাণী—
লিখবে লিপি, অমি যেয়ো পেয়ে লিপিখানি!

দুদিন যদি যেতে দেরী হয়গো তোমার, প্রিয়,
হাওয়ার পরশনে আমার অধর পরশ নিয়ো,
চল্‌তে পথে—ধূলার প'রে নিয়ো দাসীর নতি।
চরণ বিনা ভাগ্যবতীর কি আছে আর গতি!

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

সম্মতি

আগে যাবে? ফেলে মোরে—শূন্য গৃহমাঝে?
কে দেখাবে দৃষ্টিদীপ মোর চিত্ত-সাঁঝে?
নিবিড় আঁধার প্রাণে কে দেখাবে আলো?
আগে যাবে? তাই যেয়ো—সেই বুঝি ভাল!

আগে যাবে? হানি' শেল আমার এ বুকে?
কেমনে এমন কথা আনো প্রিয়া মুখে?
আগে যাবে? তাই যেয়ো তাই যেয়ো, প্রিয়া
তোমারে বাঁচাবো আমি বুকে শেল নিয়া।

আগে যাবে? আর হেথা আমি রবো একা?
দিনান্তে তোমার সাথে নাহি হবে দেখা?
সে কথা ভাবিতে কাঁপে দুরু দুরু হিয়া!
তবু তুমি আগে যেয়ো, আগে যেয়ো প্রিয়া!

আগে যাবে? তাই যেয়ো, সেই ভাল, প্রিয়া!
চলে যাবো এ রতনে কার কাছে দিয়া?
কে বুঝিবে মূল্য তব হে অমূল্য নিধি!
আগে যাবে? তাই যেয়ো—তবু কাঁপে হৃদি!

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

ভারতচন্দ্র *

গত বছরদু'তিন ধরে বাঙলা দেশের সদর মফঃস্বল নানা সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করার জন্য আমি নিয়মিত নিমন্ত্রিত হই। বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ যে আমাকে তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ এই সূত্রে প্রমাণ হয় যে আমার পক্ষে বঙ্গসাহিত্যের চর্চাটা বৃথা কায বলে গণ্য হয়নি। ভারতচন্দ্র বলেছেন—"যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে"; বাঙালি জাতি মনে করে যে, লেখা জিনিষটি আমার সাজে, এ কি আমার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা?

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অধিকাংশ নিমন্ত্রণই আমি রক্ষা করতে পারিনে। ইংরাজীতে যাকে বলে The spirit is willing but the flesh is weak —আমার বর্ত্তমান অবস্থা হয়েছে তাই। সমস্ত বাঙলা দেশময় ছুটে বেড়াবার মত আমার শরীরে বলও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। যে স্বল্প পরিমাণ শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের মূলধন নিয়ে জীবন যাত্রা আরম্ভ করি, কালক্রমে তার অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে, যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু কৃপণের ধনের মত সামলে ও আগলে রাখতে হয়। তৎসত্বেও শান্তিপুরের নিমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এর কারণ নিবেদন করিতেছি।

প্রথমতঃ একটি চিরস্মরণীয় লেখক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, এবং সে সব কথা শোনবার অনুকূল শ্রোতার অভাব, আমার বিশ্বাস, এ নগরীতে হবে না। দ্বিতীয়তঃ উক্ত সূত্রে আমার নিজের সম্বন্ধেও দুই একটি ব্যক্তিগত কথা বলতেও আমি বাধ্য হব। সমালোচকেরা যখন সাহিত্য সমালোচনা করতে বসে' কোনও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনা সুরু করেন, তখন প্রায়ই তা আক্ষেপের বিষয় হয়, কারণ কোনও লেখকের লেখা থেকে তার জীবনচরিত উদ্ধার করা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রণোদিত সমালোচকদের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাও আমি এ যুগের সাহিত্যিকদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি। যুগধর্ম্মানুসারে একালে সাহিত্য সমালোচনাও এক রকম বিজ্ঞান। এবং তার জন্য নাকি লোকের ঘরের খবর জানা চাই।

২

সম্প্রতি কোনও সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর। এমন কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নিন্দা করা কি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করা, তা ঠিক বোঝা গেল না। যদি আমার নিন্দা হয় ত ভারতচন্দ্র সে নিন্দার ভাগী হতে পারেন না, আর যদি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা হয় ত সে প্রশংসার উত্তরাধিকারী আমি নই। সম্ভবতঃ সমালোচকের মুখে ভারতচন্দ্রের স্তুতি ব্যাজস্তুতি, অর্থাৎ বর্ণচোরা নিন্দা মাত্র। এখন এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যে-জাতীয় নিন্দা প্রশংসার আমরা অধিকারী, ভারতচন্দ্র সে জাতীয় নিন্দা প্রশংসার বহির্ভূত।

ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন অথচ আজও আমরা তাঁর নাম ভুলি নি, তাঁর রচিত কাব্যও ভুলি নি, এমন কি তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছি

অপর পক্ষে আজ থেকে ১৮০ বৎসর পরে বাঙলার ক'জন সাহিত্যিকের নাম বাঙালী জাতি মনে করে রাখবে? আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এতদ্ব্যতীত আরও দু এক জনের নাম হয়ত আগামীকালের কোনও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে, বাদবাকী আমরা সব জলবুদ্বুদ জলে মিশিয়ে যাব।

আর একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে

* শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ অধিবেশনে সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত। এবং পরে তৎকর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত।

চাই যে, গত ১৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরাজের রাজ্য, আমাদের কর্ম্মজীবন এখন ইংরাজ রাজের প্রবর্ত্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ড প্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চির-জীবি হয়ে রয়েছেন। এরি নাম সাহিত্যে অমরতা। আর এক্ষেত্রে সমালোচনার কার্য্য লৌকিক নিন্দা প্রশংসা নয়, এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা। কিন্তু তা করতে হলে মনকে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হয়। কিন্তু দুর্বিনীত সাহিত্যে রাগই পুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য।

৩

সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এমন দু একটি সাহিত্যিক থাকেন, যাঁরা লোকমতে যুগপৎ বড় লেখক ও দুষ্টলেখক বলে গণ্য। উদাহরণ স্বরূপ ইতালীদেশের মাকিয়াভেলির নাম করা যেতে পারে। মাকিয়াভেলির Prince সাহিত্য হিসেবে ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যে ইউরোপীয় সাহিত্যের একখানি অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় গ্রন্থ, এ কথা ইউরোপের কোনও মনীষী অস্বীকার করেন না, অথচ মাকিয়াভেলি নামটি গাল হিসেবেই প্রসিদ্ধ।

আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যেও ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতচন্দ্রের এ দুর্নামের মূলে কতটা সত্য আছে, সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার। কারণ কুসংস্কার মাত্রই কালক্রমে সমাজে সুসংস্কার বলে গণ্য হয়। সাহিত্য সমাজেও অনেক সময়ে উক্ত হিসেবে কু সু হয়ে এবং সু কু হয়ে ওঠে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে, এ যুগের সাহিত্যিকদের কতটা মিল আছে সে বিষয়ে ঈষৎ লক্ষ্য করলেই ভারতচন্দ্রের যথার্থ রূপ ফুটে উঠবে।

প্রথমে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করা যাক্। বলা বাহুল্য তাঁর জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা নেই। তবে তিনি নিজ মুখেই তাঁর জীবনের দুটি-চারটী মোটা ঘটনা প্রকাশ করছেন।

আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও আমি আমরা উভয়েই উচ্চব্রাহ্মণ বংশে উপরন্তু ভূ-সম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। ভারতচন্দ্রের সম্বন্ধে ঘটনা যে তাই, তিনি তা গোপন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন যে—

> ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
> মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
> ভারত তনয় তাঁর, অন্নদামঙ্গল সার
> কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

এখন জিজ্ঞাসা করি কোনও লেখকের লেখা বিচার করতে বসে তার কুলের পরিচয় নেবার ও দেবার সার্থকতা কি? বিশেষতঃ সে বিচারের উদ্দেশ্য যখন লেখককে অপদস্থ করা।

যদি পৃথিবীর এমন কোনও নিয়ম থাকত যে লেখক উচ্চব্রাহ্মণ বংশীয় হলেই তাকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হতে হবে, তাহলে সমালোচক অবশ্য কুলজ্ঞ হতে বাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করাটা ত সাহিত্য সমাজে লজ্জার বিষয় নয়। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বহু কবি ত জাতিতে ব্রাহ্মণ; এবং তার জন্য তাঁদের ইতিপূর্ব্বে কেউ ত হীনচক্ষে দেখেনি।

শুনতে পাই ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে Non-Brahmin Movement নামক একটি ঘোর আন্দোলন চলছে—কিন্তু সে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে। আমি উক্ত আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু উত্তরাপথের সাহিত্য ক্ষেত্রেও যে ব্রাহ্মণ নিগ্রহের জন্য কোনও দল বদ্ধপরিকর হয়েছে এমন কথা আজও শুনিনি, সুতরাং একথা নির্ভয়ে স্বীকার করছি যে আমিও সেই সম্প্রদায়ের লোক, যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে। এ বংশে জন্ম গ্রহণ করাটা এ যুগে অবশ্য গৌরবের কথা নয়, কিন্তু অগৌরবের কথাও ত নয়।

সম্ভবতঃ সমালোচকের মতে একে ব্রাহ্মণ তায় ভূসম্পন্ন হওয়াটা, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধের সংযোগের তুল্য। ভারতচন্দ্র এ জাতীয় সমালোচকের মতে যতটা অবজ্ঞার পাত্র, কবিকঙ্কণ বোধ হয় ততটা নন। কারণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যের

আরম্ভে এই বলে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন যে তিনি—"দামুন্যায় চাষ চাষী।"

কিন্তু চাষ না চষলে যে বড় লেখক হওয়া যায় না, সাহিত্য জগতে তারও কোন প্রমাণ নেই। কারণ ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও এক রকম চাষ আছে, আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে, সাহিত্য। অন্ততঃ এতদিন তাই ছিল।

আমার মনে হয় যে ভারতচন্দ্রের জাতি ও সম্পত্তির উপর কটাক্ষ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইঙ্গিতে এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করবার জন্যই সাহিত্য-চর্চ্চা তাঁর পক্ষে বিলাসের একটি অঙ্গমাত্র ছিল। সুতরাং তিনি যে-সাহিত্য রচনা করেছেন সে হচ্ছে বিলাসী সমাজের প্রিয়। আজীবন বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হলে, লোকে যে-সরস্বতীর সেবা করে তাঁর নাম নাকি দুষ্ট সরস্বতী। লক্ষ্মী সরস্বতীর মিলন সাহিত্য-জগতে যে অনর্থ ঘটায় এমন কথা অপরের মুখেও—অপর কোন কবির সম্বন্ধেও শুনেছি। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জীবন কতটা বিলাস বৈভব পূর্ণ ছিল, তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

৪

সমালোচকরা আবিষ্কার করেছেন আমার জীবন হচ্ছে একটি ট্রাজেডি। এক হিসেবে মানুষ মাত্রেরই জীবন একটা ট্রাজেডি এবং আমি অবশ্য সাধারণ মানব-ধর্ম্ম বর্জ্জিত নই। কিন্তু কি কারণে আমার জীবন অনন্যসাধারণ ট্রাজেডি সে কথাটা তাঁরা প্রকাশ করে বলেন নি, বোধ হয় এই কারণে যে আমার জীবন সুখময় কি দুঃখময়, তা অপরের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আর আমার জীবনের যে পরিচয় সকলেই পান তাকে ঠিক ট্রাজেডি বলা চলে না। আমার মাথার উপর চাল আছে আর সে চালে খড় আছে, আমায় ঘরে ক্ষুধার চাইতে বেশি অন্নের সংস্থান আছে, উপরন্তু আমার পরিধানের বস্ত্র আছে, ইংরাজী বাঙলা দু রকমেরই। এর বেশী সামাজিক লোকে আর কি চায়? আর যে progress-এর আমরা জাতকে জাত অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়েছি, তারই বা চরম পরিণতি কি? সকলের পেটে ভাত ও পরণে কাপড়ই এ যুগে মানব সভ্যতার চরম আদর্শ নয় কি? সম্ভবতঃ আমার গুণগ্রাহী সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে আমার সাংসারিক জীবন নয়, সাহিত্যিক জীবনই একটা মস্ত ট্রাজেডি অর্থাৎ আমার সাংসারিক জীবন মহা ট্রাজেডি হলে আমার সাহিত্যিক জীবন এত বড় প্রহসন হত না।

সে যাই হোক ও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনও মিল নেই। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবন ছিল সত্যই একটি অসাধারণ ট্রাজেডি। সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করছি, তার থেকেই প্রমাণ পাবেন যে তাঁর জীবনের তুল্য ট্রাজেডি বাঙলার কোন সাহিত্যিকেরই নয়, এমন কি তাঁদেরও নয় যাঁদের সাহিত্যিক জীবন হচ্ছে একেবারে Divine Comedy.

ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে আমি কোনরূপ গবেষণা করিনি, কারণ এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল যে ভগবান আমাকে কোন বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি। সুতরাং পরের মুখে কথার উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক ব্যক্তি "কবির জীবনী সম্বলিত" ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। এই অখ্যাতনামা প্রকাশকের "প্রস্তাবনা" হতেই আমি ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস বসু মহাশয়ের দত্ত বিবরণ সত্য। কারণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বলেছেন, শুধু বসু মহাশয়ের বঙ্গাব্দ সেন মহাশয়ের হাতে খৃষ্টাব্দে পরিণত হয়েছে, এই তফাৎ।

৫

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ

রায় ভুরসুট পরগণার অধিপতি ছিলেন। বর্দ্ধমানাধিপতির সঙ্গে বিবাদে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন।

ভারতচন্দ্রের বয়স তখন এগার বছর। এই অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যাভ্যাসার্থ লালায়িত হন। পিতার বর্ত্তমান নিঃস্ব অবস্থায় যথারীতি বিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা হওয়ায় তিনি "পলায়ন পূর্ব্বক" মাতুলালয়ে গমন করেন; এবং তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান অতি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন। উভয় বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করে' তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে পেঁড়োয় ফিরে আসেন। অতঃপর তাঁর বিবাহ হয়।

অর্থকরী পারস্যভাষা শিক্ষা না করে অনর্থকরী সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা করায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করেন।

তারপর দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে তিনি অতি পরিশ্রমপূর্ব্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দিনে স্বহস্তে একবার মাত্র রন্ধন করে তাই দুবেলা আহার করতেন। অনেক সময়ে বেগুন পোড়া ছাড়া আর কিছু তাঁর কপালে জুটত না। এই সময়ে ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। পারস্য-ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি বিশ বৎসর বয়সে বাড়ী ফেরেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তখন তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ভারতচন্দ্রকে তাঁদের মোক্তার নিযুক্ত করে বর্দ্ধমানের রাজধানীতে তাঁদের হয়ে দরবার করতে পাঠান। রাজকর্ম্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে কারারুদ্ধ হন। তারপর কারাধ্যক্ষের কৃপায় জেল থেকে পালিয়ে কটকে মারহাট্টাদের সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাস করে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয় পাঠ করেন। ফলে তিনি ভক্তিমান বৈষ্ণব হয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে সদা সর্ব্বদা ধর্ম্ম চিন্তায় কালাতিপাত করতেন। তারপর বৃন্দাবনধাম দর্শন মানসে তিনি শ্রীক্ষেত্র হ'তে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর শ্যালীপতি ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরই অনুরোধে ভারতচন্দ্র আবার সংসারী হ'তে স্বীকৃত হন, এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য ফরাসডাঙ্গায় Dupleix সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র টাকা ধার করবার জন্য ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁরই অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ভারত-চন্দ্রকে মাসিক ৪০৲ টাকা মাইনেয় নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে খুসি হ'য়ে, ভারতচন্দ্রকে মুলাযোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং সেখানে বাড়ী তৈরী করবার জন্য এককালীন এক শ টাকা দান করেন। এই গ্রামেই তিনি ৪৮ বৎসর বয়েসে ভবলীলা-সাঙ্গ করেন।

তাঁর শেষ বয়েসের কটা দিন যে কি ভাবে কেটেছিল, তার পরিচয় তাঁর রচিত নাগাষ্টকে পাওয়া যায়। আমি উক্ত অষ্টকের তিনটি মাত্র চৌপদী এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি,—

"গতে রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে
ভবোদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতো মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥
বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতো নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি নত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতাবাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশাদাসাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে এগার বৎসর

বয়সে পরভাগ্যোপজীবী হ'তে বাধ্য হন, যিনি এগার থেকে বিশবৎসর পর্য্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরান্ন-ভোজনে জীবনধারণ ক'রে বিদ্যা অর্জ্জন করেন, তারপর আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওকালতি কর্‌তে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তার পর জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশ ত্যাগ ক'রে কটকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তারপর শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চ্চা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তারপর অবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে Dupleix সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আশ্রয় পান আর তথায় মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হ'য়ে কাব্য-রচনা করেন এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্দ্ধমান রাজার কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক নানারকম উৎপীড়িত হ'য়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন, তা' আপনারা সহজেই অনুমান কর্‌তে পারেন।

এরূপ জীবন কল্পনা কর্‌তেও আমাদের আতঙ্ক হয়। আমাদের জীবন আজও অবশ্য হ্রস্ব বৃদ্ধির নিয়মের অধীন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত অবস্থার বিপর্য্যয় আজ কারও কপালে ঘটে না। ভারতচন্দ্রের জীবন, দেশব্যাপী ভূমিকম্প ও ঝড় জলের ভিতর কেটে গেছে। সেকালের দেশের অবস্থা যদি কেউ জান্‌তে চান, তা হ'লে তিনি অন্নদামঙ্গলের গ্রন্থসূচনা পড়ুন। সেকালে এ দেশের লোকের আরামও ছিল না, বিলাসী হবার সুযোগও ছিল না। ভারতচন্দ্র বলেছেন "ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" সে যুগে দেশের কোন লোকের হাতে ক্ষণেকের জন্য চাঁদ আসুক আর না আসুক, অনেকের ভাগ্যেই ক্ষণে হাতে দড়ি পড়ত। ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়ীতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন ত দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নই; এবং চল্লিশ টাকা মাস মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক, অত কমে আমরা কেউ মাসিক পত্রের এডিটারি করতেও নারাজ। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা কবিতা লিখতেন তাঁরা সব দাঁতে হীরে ঘষতেন আর তাঁদের ঘরে রুইমাছ ও পালংএর শাক ভারে ভারে আস্‌ত।

৭

এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত, রসনাও কণ্টকিত হয়ে ওঠে এবং বিলাসীর মন ত একেবারে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক্ সাংসারিক জীবনের এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিভে গিয়েছিল, না আরও জ্বলে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে যে পতিনিন্দা করিয়েছেন, সেই নিন্দার ভিতরই আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাব। সেই নিন্দাবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে॥
নানাশাস্ত্র জানে কত কাব্য-অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা সাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু॥

এই ব্যাজনিন্দা হচ্ছে, ভারতচন্দ্রের আত্মকথা। এ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিষের পরিচয় পাই, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হ'য়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু প্রমোদের প্রভু। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় Shakespeare বলে গণ্য, সেই Cervantesএর জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ জাতীয় হাসির

ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনি বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখ দুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে তাই। এ হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ।
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥

৮

পূর্ব্বেই বলেছি ভারতচন্দ্রের জীবনীর বিষয় বিশেষ কিছু জানা নেই। তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গল, মানসিংহ, সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রভৃতিতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাই অবলম্বন করে এবং লোকমুখে তাঁর সম্বন্ধে কিম্বদন্তী শুনে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যে জীবনচরিত লেখেন, সেই জীবনচরিত থেকেই তাঁর পরবর্ত্তী লেখকেরা তাঁর জীবনের ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। সে, ইতিহাসটি আপনাদের কাছে এই জন্য ধরে দিলুম যে, আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে তাঁর কাব্যের দোষগুণ তাঁর অসার চরিত্রের ফুল কিম্বা ফল নয় বরং ঠিক তার উল্টো। তাঁর কাব্যের চরিত্র যাই হোক্ তাঁর নিজের চরিত্র ছিল অনন্যসাধারণ আত্মবশ। দ্বিতীয়তঃ তাঁর ঘোর দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁর কাব্যের গায়ে পড়েনি। ব্যাপারটির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। কারণ তথাকথিত ইংরাজী-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। বিশেষতঃ যারা অচেতচিত্ত তাদের মনে এই ধারণা একবার বদ্ধমূল হয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ, এ যুগে ইউরোপে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা শুধু নিজের সুখ দুঃখের গান গেয়েছেন কখনো হেসে কখনো কেঁদে। প্রথম পুরুষকে উত্তম পুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে তাঁদের কাব্যের মাল ও মসলা। কিন্তু এঁদেরও এই স্ব বস্তুটি যে ক্ষেত্রে অহং সে ক্ষেত্রে তাঁরা অকবি, আর যে ক্ষেত্রে তা আত্মা, সে ক্ষেত্রে তাঁরা কবি। অহং ও আত্মা যে এক বস্তু নয়, সে কথা কি এদেশে বুঝিয়ে বলা দরকার? ভারতচন্দ্র ছোট হন বড় হন—জাৎকবি, সুতরাং তাঁর অহংএর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এ সব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। সুখের বিষয় সংস্কৃত কবিদের জীবনচরিত আমাদের কাছে অবিদিত, নচেৎ সমালোচকদের হাতে তাঁরাও নিস্তার পেতেন না।

৯

আন্দাজ দশ বারো বৎসর আগে আমি দারজিলিং সহরে একটি সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। পরে দেশে ফিরে সেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি। বলা বাহুল্য প্রাগ্‌বৃটীশযুগের, ভাষান্তরে নবাবী আমলের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের নাম উহ্য রাখা চলে না। তাই উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দর নামক কাব্যের দোষগুণ বিচার করতে আমি বাধ্য হই। সে প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের অতি-প্রশংসাও নেই, অতি-নিন্দাও নেই। এর কারণ নিন্দা প্রশংসায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁদের ও বিষয়ে অতিক্রম করবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, শক্তিও নেই। কারও পক্ষে অথবা বিপক্ষে জোর ওকালতি করা আমার সাধ্যের অতীত। প্রমাণ—আমি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাস করেছি, কিন্তু আদালতের পরীক্ষায় ফেল হয়েছি। ভারতচন্দ্র বলেছেন, উকিলের

"সবে গুণ, যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে।"

সাহিত্যের আদালতে এ গুণের গুণগ্রাহীরা আমাকে নির্গুণ বলেই প্রচার করেছেন।

সে যাই হোক্, উক্ত প্রবন্ধ থেকেই সাধু সাহিত্যাচার্য্যেরা ধরে নিয়েছেন যে, আমি আর ভারতচন্দ্র দুজনে হচ্ছি পরস্পরের মাসতুতো ভাই। আমি উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধটি আজ আবার পড়ে দেখলুম, তাতে এমন একটিও কথা নেই—যা আমি তুলে নিতে

প্রস্তুত। সমালোচকদের স্থূলহস্তাবলেপের ভয়ে আমি আমার মতামতকে ডিগ্‌বাজি খাওয়াতে শিখিনি।

যা একবার ইংরাজীতে বলেছি, বাঙালায় তার পুনরুক্তি করবার সার্থকতা নেই। শুধু তার একটি মত সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে দু'চার কথা বলতে চাই সে কথাটি এই—

Bharatchandra, as a supreme literary craftsman will ever remain a master to us writers of the Bengalee language.*

১০

আমি এখন লেখক হিসেবেই, পাঠক হিসেবে নয়, ভারতচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে আরও দু'চারটি কথা বলতে চাই। আমি যে একজন লেখক সে কথা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেন না, যাঁরা আমার লেখা আদ্যোপান্ত পড়েছেন, এমন কি তার Microscopic examination করেছেন। ভাগ্যিস্ আমাদের চোখের জ্যোতি X rays নয়, তা হলে আমরা চার পাশে শুধু নর-কঙ্কাল দেখতে পেতুম। কিন্তু আপনারা যে আমাকে লেখক বলে গণ্য করেন তার প্রমাণ আপনারা আমাকে এ উচ্চ আসন দিয়েছেন, আমি বক্তা বলে নয়, লেখক বলে।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের আরম্ভেই একবার বলেছেন—

নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাবে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।

তার পর আবার বলেছেন—

কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরল ভাবে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

কথা যুগপৎ সরল করে ও সরস করে বলতে চায় সুধু সাহিত্যিকরা; কারণ কোনও সাহিত্যিকই অ-সরস ও অসরল কথা ইচ্ছে করে বলে না, তবে কারও কারও স্বভাবের দোষে বিরস ও কুটিল কথা মুখ থেকে অনর্গল বেরয়।

আমি এ কথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, আমি সরল ও সরস ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। তবে তাতে কৃতকার্য্য হয়েছি কি না, তার বিচারক আমি নই, সাহিত্য সমাজ।

ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসি, আর পোনেরো বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ছাড়ি। এই দেশই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে। অর্থাৎ এ দেশে আমি যখন আসি তখন ছিলুম আধ আধ ভাষী বাঙাল, আর স্পষ্টভাষী বাঙালী হয়ে এদেশ ত্যাগ করি। আমার লেখার ভিতর যদি সরলতা ও সরসতা থাকে ত, সে দুটি গুণ এই নদীয়া জিলার প্রসাদে লাভ করেছি। ফলে বাঙলায় যদি এমন কোনও সাহিত্যিক থাকেন, যিনি "কহিলে সরস কথা বিরস বাখানে" তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করি মনে মনে এই কথা বলে যে, তোমার হাতযশ আর আমার কপাল।

১১

ভারতচন্দ্রের লেখার ভিতর কোন্ কোন্ গুণের আমরা সাক্ষাৎ লাভ করব তার সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন যে—

পড়িয়াছি যেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্র যা পড়েছিলেন তা যে লিখতে পারতেন সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই—কারণ নিত্য দেখ্‌তে পাই হাজার হাজার লোক তা করতে পারে। এই বাঙলা দেশে প্রতি বৎসর স্কুল কলেজের ছেলেরা যখন পরীক্ষা দেয় তখন তারা "যেই মত পড়িয়াছে সেই মত লেখা" ছাড়া আর কি করে? আর যে যত বেশী পড়া দিতে পারে সে তত বেশী মার্ক পায়। তবে সে সব লেখা যে "বুঝিবারে ভারি" তা তিনিই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন বিদ্যার পরীক্ষক হয়েছেন। আমি

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌ছি যে, ও জাতীয় লেখার ভিতর প্রসাদগুণও নেই, রসও নেই, আছে শুধু বই পড়া মুখস্থ পাণ্ডিত্য। আশা করি বাঙালী জাতি কস্মিন কালেও বিলেতি "বিদ্যাভ্যাসাৎ" এতদূর জড়বুদ্ধি হয়ে উঠ্‌বে না যে, উক্ত জাতীয় লেখাকে সাহিত্য বলে মাথায় তুলে নৃত্য করবে। ভারতচন্দ্র তিনি কি পড়েছিলেন ও ছিলেন জানেন্‌

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক,
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক।
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী,

কিন্তু তিনি যেইমত পড়েছিলেন, সেইমত লেখেন নি কেন, তাই বুঝলে সাহিত্যের ধর্ম্ম যে কি, সকলের কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ যুগে আমরা কোন কবির জজ কিম্বা উকিলকে ক্রিটিক বলে গণ্য করিনে, সাহিত্য সমাজের পাহারাওয়ালদারে ত নয়ই। তাঁকেই আমরা যথার্থ সমালোচক বলে স্বীকার করি, যিনি সাহিত্য রসের যথার্থ রসিক। এ জাতীয় রসগ্রাহীরা জানেন যে সাহিত্যের রস এক নয় বহু এবং বিচিত্র। সুতরাং কোন্‌ লেখকের লেখায় কোন্‌ বিশেষ রস বা বিশেষ গুণ ফুটে উঠেছে তাই যিনি ধরতে পারেন ও পাঁচ জনের কাছে ধরে দিতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ক্রিটিক।

১২

এখন ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রসাদগুণ যে অপূর্ব্ব, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সে গুণ সম্বন্ধে কোন চক্ষুষ্মান বাঙালীর পক্ষে অন্ধ হওয়া অসম্ভব। এখন এই সর্ব্ব আলঙ্কারিক-পূজিত গুণটি কি? যে লেখা সর্ব্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য সেই লেখাই কি প্রসাদগুণে গুণান্বিত? তা যদি হত, তা হলে কালিদাসের কবিতার চাইতে মল্লিনাথের টীকার প্রসাদগুণ ঢের বেশী হত। তা যে নয় তা সকলেই জানে। প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্টরূপ। ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গ সরস্বতী একেবারে "তন্বী শ্যামা শিখরদশনা" রূপ ধারণ করেছেন। যাঁর অন্তরে বঙ্গভাষা এই প্রাণবন্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ লাভ করেছে, তাঁর যে কবি প্রতিভা ছিল, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাকে শাপমুক্ত করা যদি তাঁর একমাত্র কীর্ত্তি হত তাহলেও আমরা বাঙালী লেখকেরা তাঁকে আমাদের গুরু বলে স্বীকরে করতে তিলমাত্র দ্বিধা করতুম না। অমন সরল ও তরল ভাষা তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি নে। আর আমি অপর কোন সাহিত্য জানি আর না জানি, বাঙলা সাহিত্য অল্প বিস্তর জানি।

আমি পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার মহা গুণকীর্ত্তন করি, কিন্তু সে ভুল করে। সেকালে আমার চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এখন দেখছি উক্ত পদাবলীর ভাষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা নয়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখে রূপান্তরিত হয়েই চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা যে তার বর্ত্তমান রূপ লাভ করেছে, সে বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের হিষ্টরি লেখা হয়েছে কিন্তু এখনও সে সাহিত্যের জিওগ্রাফি লেখা হয় নি। যখন সে জিওগ্রাফি রচিত হবে, তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে ভারতচন্দ্রের এ উক্তি সত্য যে নবদ্বীপ সেকালে ছিল ভারতীর রাজধানীর ক্ষিতির প্রদীপ।

আমি বলেছি যে প্রসাদ গুণ ভাষার গুণ, কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে ভাষা ছাড়া ভাব নেই। নীরব কবিদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করিনে। যা আমরা ভাষার গুণ বলি তা হচ্ছে মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং প্রসাদগুণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও বস্তু হচ্ছে মনের আলোক।

১৩

ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে ও তা হবে রসাল। এ দুই বিষয়েই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল ত এইখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের একটি রস বিশেষ সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য।

কেন না তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরিক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক উপবিজ্ঞানে।

সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গ সকল তিনি নানাবিধ উপমা, অলঙ্কার ও সাধু ভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এস্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধু কবি বলে গণ্য। গান রচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই?

চণ্ডীদাস মহাকবি, কিন্তু তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্ত্তন কি বিদ্যাসুন্দরের চাইতে সুরুচিসম্পন্ন? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র কি না যে বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনাবৃত। আমি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ কলঙ্কমোচন ক'রতে চাই নে, কেন না তা করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারও তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের শুধু nature। ভারতচন্দ্র যা দিয়ে তা ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন তাতেই তা ফুটে উঠেছে। তাঁর ছন্দ ও অলঙ্কারের প্রসাদেই তাঁর কথা কারো চোখ কান এড়িয়ে যায় না। পাঠকের পক্ষে ও জিনিষ উপেক্ষা করবার পথ তিনি রাখেন নি। তবে একশ্রেণীর পাঠক আছে যাদের কাছে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা ততটা চ'খে পড়ে না যতটা পড়ে তাঁর art. তার পর ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।

১৪

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয় মস্তিষ্ক, জীবন নয় মন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এ রসের নাম আছে কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান নেই। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকদের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্য রসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।

বাঙলার প্রাচীন কবিরা কেউ এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধু ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয়। হাস্য রস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে তার পরিচয় আরিষ্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রান্স পর্য্যন্ত সকল হাস্য রসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিষটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট সে কথা ত সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁর হাসিও নাকি জঘন্য! সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যে সব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক মহাশয় বলেছেন যে "শ্বশুরের সঙ্গে এ হেন ইয়ারকি কোন্ সমাজের সুরীতি?" আমিও জিজ্ঞাসা করি এরূপ সমালোচনা কোন্ সাহিত্যসমাজের সুরীতি? এর নাম ছেলেমি না জেঠামি? তাঁর নারীগণের পতি-নিন্দাও দেখতে পাই অনেকের কাছে নিতান্ত অসহ্য। সে নিন্দার অশ্লীলতা বাদ দিয়ে তার বিদ্রূপেই নাকি পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগে। নারীর মুখে পতিনিন্দার সাক্ষাৎ ত ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য কবির কাব্যেও পাই। এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির মুখে পতিনিন্দা, এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। এস্থলে

পুরুষজাতির কিংকর্ত্তব্য—হাসা না কাঁদা? বোধ হয় কাঁদা, নচেৎ ভারতের হাসিতে আপত্তি কি? আমি উক্ত জাতীয় দেবতাদের স্মরণ করিয়ে দেই যে, দেবতার চোখে পলকও পড়ে না জলও পড়ে না। আমাদের দেবদেবীর পুরাণকল্পিত চরিত্র অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন। এও নাকি তাঁর একটী মহা অপরাধ। এ যুগের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে, উক্ত পরিহাস তাঁদের অসহ? ভারত-সমালোচনার যে কটি নমুনা দিলুম তাই থেকেই দেখতে পাবেন যে, অনেক সমালোচক কোন্ রসে একেবারে বঞ্চিত। আশা করি যে হাস্‌তে জানে না সেই যে সাধু পুরুষ ও যে হাসাতে পারে সেই যে ইতর, এ হেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখন স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।

আমি আর একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেই এ যাত্রা ক্ষান্ত হব। এদেশে ইংরাজদের শুভাগমনের পূর্ব্বে বাঙলাদেশ বলে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, কেননা ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, যে হেতু আমাদের শিক্ষা-গুরুদের মতে বাঙ্গালী জাতির জন্মতারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

সর্ব্বশেষে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা ভারতচন্দ্রের কথাতেই করি। আপনারা আমাকে এ সভায় কথা কইতে আদেশ করেছেন :—

সেই আজ্ঞা অনুসরি কথা শেষে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখো দুষ্ট মত
সারি দিবা এই নিবেদন ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কাঙ্গাল বন্দনা *

পুণ্যস্রোতা গৌরী নদীকূলে,
দাঁড়াইয়া ত্যাগী যোগিবর,
তুলেছিল সুস্বর লহরী;
আপ্লাবিয়া ধরণী-অম্বর!
তটিনীর কলতান সনে,
ভকতির সুমধুর-ধার
অনুকূল বায়ু সনে মিশি
বয়েছিল সুধা পারাবার।
অবগাহি সেই সুধানীরে,
কত কত সুধী মহাজন
জীবনের অবশিষ্ট দিন
কত সুখে করিল যাপন।
বাংলার পল্লীগেহ কোণে
শুভক্ষণে লভিয়া জনম
জননীর স্নেহ অঙ্কে বসি
সাধিল সে সাধক ধরম,
কাঙ্গাল সে প্রেমের কাঙাল,
পরম সম্পদ অধিকারী,
ফকির 'ফিকিরচাঁদ' নামে,
সেজেছিল প্রেমের ভিখারী।
জননী ও জন্মভূমি তার
ধন্য বলি নমস্কার করি,
সে দেশের পূতধূলি মাখি,
আকিঞ্চন, আমি যেন মরি!
কাঙ্গালের কাহিনী স্মরণে
পুলকিত আঁখিনীরে ভাসি
কৃপা করি কণা মাত্র দিও
ভক্তিসুধা—বড় ভালবাসি।

শ্রীসুরবালা বিশ্বাস।

* কুমারখালি কাঙ্গাল হরিনাথের স্মৃতিসভায় পঠিত।

আকালের পটোল

(ছন্দ—গতিস্তং গতিস্তং ইত্যাদি)

পটোল্ তোল্,
পটোল্ তোল্ ;—
ভাঙন-’পর গাঙের চর,
ঢালের শেষ আলের থর,
শ্যামল ঢেউ,—পটোল ভুঁই ;—
কোথায় কেউ ? শুধুই তুঁই !
ফসল তোল্ কোমর সুই,’
কপালটার কপাট খোল্ !—
পটোল্ তোল্,
পটোল্ তোল্ !

ফুলের ফল, ফলের ফুল,
পাতার ডগ্ লতার মূল ;—
খসোর্ খস্ খসোর্ খস্
চষিস্ হঁস্ চরণ-বশ্ !
নজর রাখ্— না পায় ফাঁক
ডাগর, হোক্, অপোর্কোল্।
পটোল তোল্,
পটোল তোল্।

আলের গায় খালের ছায়
কালের ফল করুণ চায় ;
পটাস্ পট্ পটাস্ পট্
ছিঁড়িস্ সব স্নেহাস্পদ ;
তা’তেই পোর্ আখের্ তোর,
কাঁখের তোর ঝুড়ির খোল্।
পটোল তোল্,
পটোল তোল্।

চো-’প’র দিন কুপোর্-কাৎ,
মাঝায় তোর চাগায় বাত !
তাতেই খাট্ দোমোর্পাট্,
ফসল কর্ কোমর-জাৎ ;
খাটোন্ বই ভুলিস্ কই
পেটের খোল, বুকের টোল্ ?
পটোল তোল্,
পটোল তোল্।

স্মরণ কর্ সে বৈশাখ ;—
মরণ-চর বাজায় শাঁখ !
নটন্-নাথ-নটন্-সাথ
টলল্ টল্ দিকের চাক !
ঘুরণ্ বায় উড়ন্-পায়
জোইট্ যায় ;—জঠর লোল।
পটোল তোল্,
পটোল তোল্।

আষাঢ়, তায় সুদোর কৈ ?
শ্রাবণ যায় ঝরণ বৈ।
বাদরহীন ভাদর দিন ;—
হঠাৎ বান অথই থই !
ডাঙার ধান,—জলের টান ;—
গাঙের বান ডুবায় জোল্ !
পটোল তোল্,
পটোল তোল্।

গগন-কোণ-আসীন রে,
আশিন্-রাত-শশিন্ রে !

শুনিস্ তুই এ ক্রন্দন,
চিরন্তন অরন্ধনঃ?
ভরাই নাই 'মরাই' ভাই!
ঝরাই তাই চোখের কোল।
পটোল তোল্,
পটোল তোল্।

শীতের কোপ অসম্ভব ;—
অড়র বুট্, গহম্ যব
রবির নিজ্, ফসল সব—
তুষার ঘায় ধুসর শব!
ধুধুঃ ধুঃ পাটল মাঠ,
লুটায় দিক্ দিগঞ্চল।
পটোল তোল,
পটোল তোল্।

ফাগুন মাস,—জাগায় ভুল,
লাগাই চাষ পটোল মূল।
খালের শীষ আলের 'পর
পাতায় তার পাতার ঘর ;
ফুলের থর ফলের ভর
মলয় বায় দোদুল্ দোল্।
পটোল তোল্,
পটোল তোল্।

বরষ্-শেষ-চাঁদের সাথ
ডুবায় কাল চোইৎ-রাত!
ভোরের পিক, অদর্শন,
কাঁদায় দিক্ বিদায়-খন্;
উতল মন! নূতন সন
সহিত আজ সাহিৎ খোল্!
পটোল তোল্,
পটোল তোল্!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দেব-দেউল

(উপন্যাস)

৩
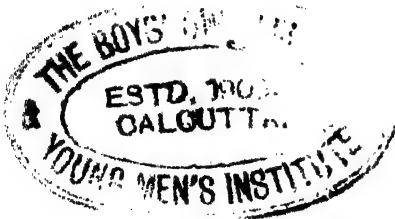
জয়ন্ত যখন মুখ তুলিল, তখন কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত, উহা সহসা শাদা হইয়াছে! রোষে নহে, ভয়ে। তাহারই সম্মুখে তখন বিকটাকার একটা সঙকে ঘিরিয়া কতকগুলি দুষ্ট বালক অপেক্ষাকৃত দূর হইতে বলিতেছিল—

"সাবধান সাবধান, দেশে এলো ভগবান।
গর্ভ যদি থাকে কারো—
পালালে পরে বাঁচতে পারো।"

সেই সময়ে কয়েকটী যুবতী সেই পথে দেব-দেউলের দিকে আসিতেছিল। সম্মুখে সঙকে দেখিয়াই দুই একজন পিছন ফিরিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। ভীত-চিত্তে জয়ন্ত দেখিল, কি ভীষণ মূর্ত্তি সে! সে-ত মুখোসপরা সঙ নয়! এ যে সত্যিকার মানুষ। বৃহৎ মস্তকটা ঢাকিয়া একমাথা চুল ত নয়—যেন শুকরের লোম—কতকটা কালো, কতকটা পিঙ্গল—কর্কশ কঠিন রুক্ষ। অংস হইতে পৃষ্ঠ জুড়িয়া প্রকাণ্ড একটা কুঁজ। উরু এবং পা দুই খানি এমনি বিকল যে দাঁড়াইলে জানুর গায়ে জানু লাগে। সম্মুখ হইতে দেখিলে মনে হয়, দুইখানা বড় বড় কাস্তে যেন হাতলের কাছে

মুখে মুখে মিলিয়াছে। সেই সন্ধির উপর কুঁজ বসানো বৃহৎ পৃষ্ঠদেশ—মাংসল, দৃঢ় বিস্তৃত। দুই পার্শ্বে দুইখানি দীর্ঘ বলিষ্ঠ অতিশয় সবল বাহু লম্বিত রহিয়াছে। মূর্ত্তির একটী চক্ষু তীব্র উজ্জ্বল, আর একটী অন্ধ।

বিস্মিত জয়ন্ত শঙ্কিত চিত্তে চাহিতে চাহিতে আপন মনে বলিল, "সহরে দেখছি সবই অদ্ভুত!"

বিকলাঙ্গ হউক, কিন্তু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় লোকটী অমিত বলশালী, সাহসী ও কর্ম্মতৎপর—কিন্তু একেবারেই উদাসীন। সে যেন ঠিক একটা ভাঙ্গা অসুর। কোনো অক্ষম শিল্পীর হাতে পড়িয়া ভাঙ্গা অসুরের খণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকমত জোড়া লাগিতে পারে নাই!

জয়ন্ত একজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?"

বিস্মিত হইয়া সে বলিল, "কে হে তুমি? এঁকে চেন না! তুমি বুঝি বিদেশী?"

"হাঁ, আমি বিদেশী। কর্ণগড়ের কবি আমি। আজ—"

বাধা দিয়া শ্রমিক বলিল, "কবিই হও আর রবিই হও—সে তুমিই আছ। এ তল্লাটে কে এমন আছে যে, এঁকে চেনে না? এই দেখবে এস না—উনিই আজ আমাদের ধর্ম্মরাজ।"

"নামটা ত খুব জাঁকালো!"

শ্রমিক গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি যে শুনেছি—কবিরা পাগল—তুমিও দেখছি তাই। ওঁর নাম কি আর ধর্ম্মরাজ? উনি হলেন ভৈরব। দেবদেউলে ঘণ্টা বাজান। আমাদের সঙ্গে ওঁকেই আমরা ধর্ম্মরাজ সাজাব বলে নিতে এসেছি।"

আর একজন বলিল, "কে বাজায় তা কে জানে? ও কি আর মানুষ যে, বাজাবে? জানো ত আমার বাড়ীটে? দেউলের পাশেই ওই দেখা যাচ্ছে। কতদিন দুপুর রাতে দেখেছি, দেউলের আল্‌সে বেয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, জলের নল ধরেই ওঠা-নামা করছে—ঠিক যেন একটা বিড়াল! চাও দেখি একবার ঐ দিকে। ঘাড় ভেঙে তবে দেউলের চুড়া দেখতে হয়। ভৈরব সেই চুড়ায় উঠে পূজারিদের ধ্বজা বেঁধে দেয়—একটী পয়সাও নেয় না। চুড়ার নীচেই ঐ যে দেখছ গণেশ ঠাকুর—রোজ তা' কত মাজে ঘষে। এদিকে কিন্তু না পারে কথা কইতে, না পায় শুনতে!"

বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে জয়ন্ত বলিল, "তাই নাকি?"

"তবে আর বলছি কি? মানুষ কি আর ওখানে উঠতে পারে? ঐ আল্‌সে থেকে নীচে চাইলে পৃথিবীটাই ঘুরে ওঠে।"

যাহার সম্বন্ধে এত কথা হইতেছিল, সে তখন ছিল একেবারে নিশ্চিন্ত। কোনো দিকে একবার চাহিলও না। একটী যুবক গুটি গুটি অগ্রসর হইয়া ভৈরবকে ভেঙাইবার জন্য হাঁ করিল, কারণ ভৈরবের মুখখানা ছিল কতকটা ঘোড়ার ক্ষুরের মত। ভৈরব নিমেষে যুবকের কোমরটা ধরিয়া তাহাকে বিশ হাত দূরে ছুড়িয়া দিল।

বালকেরা ইহা দেখিয়া কিছু দূর ছুটিয়া পলাইল এবং সেইখান হইতে বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে মুঠা মুঠা পথের ধুলা ছিটাইতে লাগিল। উত্যক্ত ভৈরব কড়মড় করিয়া দাঁতে দাঁতে ঘষিল এবং সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শোভাযাত্রার দিকে অগ্রসর হইল।

আহত যুবকের হাত ধরিয়া তুলিতে তুলিতে তাহার বন্ধু দেবব্রত কহিল, "কেমন মীনকেতু, এখন হয়েছে? আমি ত আগেই বলেছিলাম, যেও না ঐ কালা ভৈরবকে ঘাঁটাতে! আমি ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—আমার দাদার খেয়েই ভৈরব মানুষ।"

গায়ের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে মীনকেতু বলিল, "কার? সাতমল্লা ঠাকুরের? এমন হিংস্র জানোয়ারটাকেও তিনি পোষেন? আছাড়টা বড্ড লেগেছে ভাই। পাই যদি ব্যাটাকে একবার বাগে—"

হাঁকিয়া দেবব্রত বলিল, "তোমার কাছে ভৈরব একটা হিংস্র জানোয়ার—কিন্তু দাদার কাছে ভেজা বিড়ালটী। তিনিই ত এখন কালভৈরবের মোহান্ত

কি না। দেউলে ঘণ্টা বাজাবার কাযটা তিনিই ওকে দিয়েছেন।"

শতমন্যুর নাম শুনিতেই জয়ন্ত একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে মনে করিতেছিল, অপরিচিত বৃহৎ তাম্রলিপ্ত যেন একটা নিবিড় বন। শীতের রাত্রিতে কোথায় যে মাথা লুকাইবে, এই কথা সে ভাবিতেছিল। সে জানিত, শতমন্যু ঠাকুর কর্ণগড়ের একজন গণ্যমান্য লোক। এতক্ষণে তাহার ভরসা হইল যে, পথ চিনিয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারিলেই, আশ্রয় পাইবে।

শতমন্যু ঠাকুর কোথায় থাকেন তাহা জানিবার জন্য দেবব্রতের দিকে অগ্রসর হইতেই জয়ন্ত শুনিল অনেকে বলিতেছে—"পান্না রে—পান্না। আয় আয় দেখবি আয়।"

পরক্ষণেই দেবব্রত ও মীনকেতু পান্নাকে দেখিবার জন্য বেগে প্রস্থান করিল। জয়ন্ত হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, পান্না আবার কে?

শীতের সন্ধ্যা সকালেই নামিল। তাম্রলিপ্তের রাজপথ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল দেখিয়া জয়ন্ত মনে মনে আনন্দিত হইল। এতক্ষণ তাহার মনে হইতেছিল, পথের প্রত্যেক লোক যেন তাহারই দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে—ঐ যায় দক্ষযজ্ঞের কবি জয়ন্ত!

শীত নিবারণ করিবার যোগ্য বস্ত্রাদি জয়ন্তের ছিল না। সেই দিনই সে তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়াছিল। পথঘাটও চিনিত না। শতমন্যু ঠাকুরের সন্ধান করার সম্ভাবনা যখন আর রহিল না, তখন জয়ন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। যে কোনও উপায়ে রাত্রিটা ত কাটাইতে হইবে! কর্ণগড়ে তাহার বাড়ীঘর ছিল না। পরের আশ্রয়ে কোনরূপে সে দিন কাটাইত এবং কবিতা লিখিত। তাম্রলিপ্তেও সে তখন গৃহহীন—আশ্রয়হীন। তবুও ভাবিল, কর্ণগড় অপেক্ষা তাম্রলিপ্তই ভাল', কারণ বড় সহরে কবিতা বুঝে এমন দুই চারিজন গুণী মিলিবেই মিলিবে।

চলিতে চলিতে জয়ন্ত দেখিল একটা গলির ভিতর আসিয়াছে। কয়েকটা বালক সেখানে ছুঁচো বাজি পোড়াইতেছিল। অগ্নিমুখী ছুছুন্দরীরা জয়ন্তকে বেড়িয়া ধরিল এবং ছিব্ ছিব্ করিয়া অগ্নিজিহ্বা বাহির করিতে লাগিল। দুই একটা বা রাগিয়া ফাটিয়াই গেল! ছেলেরা জয়ন্তকে বিব্রত দেখিয়া হো হো—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিল।

মণ্ডপ হইতে যে শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, তাহার কোলাহল এবং বাদ্যধ্বনি মধ্যে মধ্যে জয়ন্তের কাণে আসিয়া পৌছিতেছিল। মধ্যে মধ্যে ধূপের উজ্জ্বল আলোক, কখনো শ্বেত, কখনো নীল, কখনো লোহিত বর্ণে অন্ধকার আকাশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল—তারার ফুল, সাপের মাথা আকাশমণ্ডলে জ্বলিতেছিল। জয়ন্ত শোভাযাত্রার শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল।

গলিপথে অনেক দূর যাইয়া জয়ন্ত দেখিল সম্মুখেই একটা মুক্ত স্থান, তাহারই একাংশ মশালের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া চারিদিকের অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে। জয়ন্ত তখন জানিত না বটে, কিন্তু এই স্থানকেই লোকে বলিত গোফার মাঠ। মাঠের প্রান্তভাগে মশালগুলির নিকটে আসিয়াই কবি জয়ন্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিল—কে এ নারী? দেবী না অপ্সরী? মানবীতে ত এত রূপ থাকে না। কি মধুর লীলাভঙ্গে নারী তখন নাচিতেছিল! পুষ্পিতা লতার মত দেহখানি শতাধিক মশালের আলোক মাখিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিতে লাগিল, পা দুইখানি তালে তালে উঠিতে লাগিল—তালে তালে পড়িতে লাগিল। নূপুরের রব উঠিল ঝিনি ঝিনি ঝিনি—ঝিনি ঝিনি ঝিনি! সুন্দর কোমল করের করতাল সংযুক্ত খঞ্জনী নূপুরের সঙ্গে সঙ্গে মুখের হইয়া উঠিল।

জয়ন্ত তাহার সকল লাঞ্ছনা, সকল দুঃখ মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল। তাহার মনে হইল, এ যেন একখানি ছবি—যেন দেবভাস্করের ধ্যানে গড়া স্বর্ণপ্রতিমা—যেন বাণীর বীণার ঝঙ্কার সে—গানের সুরতরঙ্গ সে। দেবী নয়, মানবী নয়—মিথ্যা নয়—সত্যও বুঝি নয় সে! নারী

ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতে লাগিল। জয়ন্তের মনে হইল—আকাশের পথ-ভোলা সৌদামিনীশিখা ধরায় নামিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিতেছে।

চারিদিকে যে যেখানে ছিল, সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া সেই অদ্ভুত নৃত্যলীলা দেখিতেছিল। নারীর সুঠাম বাহুযুগ কখনো বা গোলাপী রেশমী রুমালে ঢাকা মাথায় উঠিল, কখনো বা দেহের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে বামে ভঙ্গিমায় ভঙ্গিমায় হেলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে এক একবার তাহার প্রশস্ত বক্ষস্থল কাঁপিতে লাগিল —ঝটিকার অন্তে সাগরের মত—পূর্ণিমা নিশায় ভাগীরথীর হিল্লোলিত তরঙ্গের মত—মলয়ের স্পর্শে ফুলের কেয়ারির মত। জয়ন্তের মনে হইল, সুন্দরীর ভুজলতা যেন প্রভাতকিরণে মধুমক্ষিকার মতই চঞ্চল। একটী সোণালী বক্ষস্ত্রাণ তার রঙীন আংরাখাকে ঢাকিয়া ওড়নার নীচে স্কন্ধ হইতে কটি পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। তাহার পরই চরণসন্ধি পর্য্যন্ত বিলম্বিত ফিরোজা রঙের ঘাঘরা। উহার ভাঁজে ভাঁজে দেহার্দ্ধটা ঢাকা পড়িয়াছে —পাতার আড়ালে চাঁপার কলি যেন ফোটে ফোটে ফোটে না। কৃষ্ণ কেশরাশি আলুলায়িত, অবেণীবদ্ধ, আগুল্‌ফলম্বিত। গোলাপী রেশমী রুমালের প্রান্তভাগ সেই কালোর সঙ্গে ক্রীড়ারত। মশালের কম্পিত আলোকে গঙ্গার লহর লহর মালা ওড়নার অন্তরালেই কখনো কখনো ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। কর্ণগড়ের জয়ন্ত মুগ্ধ হইল—বিস্মিত হইল—আপনা হারাইল। তাহার কাব্যকুসুম সেদিন বারোয়ারির মণ্ডপে দলিত হইয়াছিল বলিয়া অন্তরে যে শেল ফুটিয়াছিল, মোহিনী বেদেনীকে দেখিয়া জয়ন্ত সে দুঃখ ভুলিয়া গেল বটে, কিন্তু এই কথাটা তাহার বার বারই মনে হইতে লাগিল—হায় রে! এই নারীপ্রতিমা কিনা একটা বেদিনী!

গালিচার উপর দুইখানি তরবারি পড়িয়া ছিল—বেদিনী উহা তুলিয়া লইল। তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ কপালের উপর রাখিয়া খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে সে এমন সুকৌশলে নাচিতে লাগিল যে, তরবারি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, মাটীতে পড়িল না। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিল। বেদিনী তখন তরবারি ফেলিয়া দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতে লাগিল—যেন একটী উড়ন্ত প্রজাপতি।

লোকের ভিড়ের মধ্যে তখন এমন একজন ছিল, যে সকলের অলক্ষ্যে নিজের নয়ন দিয়া বেদিনীকে একেবারে গিলিতেছিল। জয়ন্ত ইহা দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল—সেই লোকটাকে সে যেন কোথায় দেখিয়াছে। তাহার অগ্নিপিণ্ডতুল্য নয়নের দিকে, ঈষদ্‌ভিন্ন ওষ্ঠের দিকে—তাহার বিরলকেশ মস্তকের দিকে জয়ন্ত একমনে চাহিয়া রহিল। জয়ন্ত বুঝিতে পারিল যদিও তাহার উচ্চ কপোলে কালের রেখা স্পষ্ট হইয়াছে, কেশে শ্বেত আভা লাগিয়াছে—তবুও তাহার কোটরগত গভীর নয়নে যেন যৌবন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কত আগুন সেখানে—কত আকাঙ্ক্ষা সেখানে। জয়ন্ত দেখিতে লাগিল, তাহার নয়ন দুইটী মুহূর্ত্তের জন্যও বেদিনীকে ছাড়িতেছে না। সকলে যখন পুলকে আনন্দধ্বনি করিল, তখন সহসা একখানা কালো মেঘ আসিয়া তাহার মুখখানা ধীরে ধীরে ঢাকিয়া দিল। কখনো বা সে একটু মৃদু হাসিল, কখনো বা এক একটা কাতর দীর্ঘনিশ্বাস হাসিকে চাপা দিয়া বাহির হইতে লাগিল। জয়ন্তের মনে হইল, সে দীর্ঘশ্বাস অপেক্ষা হাসিটাই যেন বেশী বিষাদমাখা।

নাচিতে নাচিতে ক্লান্ত হইয়া বেদেনী একবার স্নেহ-কণ্ঠে ডাকিল, "মতিয়া!"

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট শ্বেতবর্ণা ছাগী লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া পুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে বেদিনীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। ছাগীর শিং ও ক্ষুর চারিটী সোণালী পাতে মোড়া ছিল বলিয়া, আলোকে ঝিক্ মিক্ করিতে লাগিল। উহার ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা গলাবন্ধটী ধরিয়া বেদিনী কত সোহাগ করিল এবং কহিল, "মতিয়া, আমি বড় হয়রাণ হয়েছি। এবার তোর পালা। গোটাকতক কসরৎ দেখা বাছা।"

বেদিনী মতিয়ার সম্মুখে খঞ্জনীটা ধরিয়া বলিল, "আজ কোন্ মাস মতিয়া ?"

মতিয়া একখানা পা তুলিয়া খঞ্জনীর গায়ে নয়বার আঘাত করিয়া জানাইয়া দিল, সেটা পৌষ মাস।

খঞ্জনীটা ঘুরাইয়া ধরিয়া বেদিনী বলিল, "ভাল ভাল। আজ কোন্ তারিখ মতিয়া ?"

মতিয়া ক্ষুর দিয়া খঞ্জনীর গায়ে ত্রিশবার ঘা মারিল।

বেদিনী বলিল, "সবাইকে বল্ আজ কি বার।"

খঞ্জনীতে দুইবার আঘাত করিয়া মতিয়া জানাইয়া দিল, সেদিন সোমবার—সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন।

সেই বিরলকেশ অদ্ভুত দর্শকটা বেদিনীর দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়—নিশ্চয় এর মধ্যে ভেল্কী আছে।"

তাহার মনের কালি সেই পরুষ কণ্ঠে তখনি প্রকাশ পাইল।

কথাটা শুনিয়াই বেদিনী শিহরিয়া উঠিল এবং সে স্থান হইতে সরিয়া গেল। সে জাতি বেদিয়ারা ভেল্কী করিলে, তাহাদিগের বিচারে অতি কঠোর দণ্ড পায়। সেই রূঢ় কণ্ঠকে ডুবাইয়া দিয়া সকলে যখন মতিয়ার খেলা দেখিয়া আনন্দ জানাইল, বেদিনীর মনের ভার তখন আর রহিল না। আবার মতিয়াকে ডাকিয়া সে বলিল, "পুরোহিতেরা কেমন করে' ঠাকুর-পূজা করে, দেখিয়ে দেনা বাছা।"

মতিয়া অমনি পশ্চাতের দুই পায়ের উপর বসিয়া সম্মুখের পা-দুইটীকে যোড়া করিল, তাহার পর মাথাটী ঝুলাইয়া চক্ষু মুদিয়া ব্যা ব্যা করিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতে লাগিল।

সেই বিরলকেশ দর্শকটি তখন অতিশয় কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কি সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মের অপমান? ঠাকুর-দেবতাকে ব্যঙ্গ? পূজারী মোহান্তের লাঞ্ছনা! একটা বেদিনীর এতদূর স্পর্দ্ধা!

বেদিনী আর একটু দূরে সরিয়া গেল। আপন মনে বলিল—"নিশ্চয় দেখছি সেই লোকটা। ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। দেখলে ঘেন্না হয়—ঘেন্না হয়।"

বেদিনী আর খেলা দেখাইল না—নিম্নের ওষ্ঠটি একবার সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া মুখভঙ্গী করিল। সে ভঙ্গী মুহূর্ত্তে বুঝাইয়া দিল, এই অপরিচিত রুষ্ট শাসকের প্রতি তাহার কত অবজ্ঞা—কত ঘৃণা! সে তখন খঞ্জনীটা উল্টাইয়া ধরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। যাহার কাছে যাহা ছিল, সে তখনি তাহা বাহির করিয়া খঞ্জনীর ভিতর ফেলিতে লাগিল। শূন্য খঞ্জনী দেখিতে দেখিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘুরিতে ঘুরিতে বেদেনী জয়ন্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তাহার আংরাখার পকেটে হাত দিয়াই সেই শীতের রাত্রিতেই ঘামিয়া উঠিল। মুগ্ধ জয়ন্ত একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল যে সে কপর্দ্দকহীন ভিখারী। তখন যদি তাহার কাছে গোলকুণ্ডার হীরক খনিও থাকিত তাহা হইলে সে তাহাও তৎক্ষণাৎ দান করিয়া নিঃস্ব হইতে পারিত! বেদিনীর হাতে কিছু দিয়া ধন্য হইতে পারিল না বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জয়ন্ত লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল।

জয়ন্তের এই সঙ্কটকালে গোফার মাঠের একটি অন্ধকার কোণ হইতে অত্যন্ত তীব্র স্বরে কে যেন কহিল—"রাক্ষসী বেদেনী, যম কি তোকে আজও ভুলে আছে? মাথায় বাজ ভাঙ্গে নি?"

কি ভীষণ—কি তীক্ষ্ণ—কি নির্ম্মম সেই স্বর! ভয়ে বেদিনীর মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জয়ন্তের নিকট হইতে সরিয়া গেল।

কয়েকটী লোক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"ঐ রে ভাই, গোফার সন্ন্যাসিনীটা গাল দিচ্ছে। আজ বুঝি কিছু খেতে পায় নি তাই চেঁচাচ্ছে। চল্ দেখি যাই বিশ্বকর্ম্মার মন্দিরে। কিছু পাই ত এনে দেবো।"

সন্ন্যাসিনীর অনাহারের কথা শুনিয়া এতক্ষণ জয়ন্তেরও মনে হইল যে সেও ত সত্যই ক্ষুধিত—সারা দিন কিছু খায় নাই।

কিছু প্রসাদের আশায় জয়ন্তও উহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে বিশ্বকর্ম্মার মন্দিরের দিকে চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

কিবা গান

কুলু কুলু কি বা গান
ভরিয়া শ্রবণ প্রাণ
সদা কে বা গাও ?
এক তান এক সুর
সুধা-ধারে ভরপুর
অরণ্য জাগাও।
নিভৃত নির্জ্জন ঠাঁই
জীবন প্রবাহ নাই
শুধু এক গান
গিরি অঙ্গে ঝরঝরে
লতা পত্রে মরমরে
উদার মহান !
কে বাজায় কে বা গায়
নেত্রে নাহি দেখা যায়
অদৃশ্য স্বপন,
প্রতিধ্বনি সচকিত
গীতরবে মুখরিত
থামে না কখন।
পর্ব্বত প্রান্তর ভরি
ঐক্যতান সারি সারি
সঙ্গোপনে ধায়
শৈলশৃঙ্গে সমতলে
সে গীত নাচিয়া চলে
তরঙ্গের প্রায়।
যায় স্বর ছলে ছলে
আনমনে সব ভুলে
দূর দুরান্তর
ছুটে, পুনঃ ফিরে আসে
গীতধ্বনি পরকাশে
গোপন অন্তর।

নয়ন হেরিতে নারে
হৃদয়ের সমাচারে
কিবা কথা তার,
সঙ্গীতের তাল-মানে
অতীত কাহিনী আনে
স্মৃতির মাঝার।
কল-কণ্ঠ বিহঙ্গম
তরুশাখে অনুক্ষণ
গায় এক গীতি,
নিশীথ নিদ্রার ঘোরে
সেই গান নিশাভোরে
শুনি নিতিনিতি,
ভুলে যাই বর্ত্তমান
গত স্মৃতি মূর্ত্তিমান
দেখা দেয় আসি,
কত কথা পড়ে মনে
অশ্রু-বিন্দু নেত্রকোণে—
হৃদি যায় ভাসি।
অদূরে আমার গেহ,
সেথায় নাহিক কেহ,
সব লোকান্তরে,
তাহাদের স্নেহ প্রীতি
এ গান বিগত স্মৃতি
শরীরী আকারে।
মনোহর পল্লীবাসে
প্রেমের বন্ধন পাশে
ছিল যে বন্ধন,
সে পাশ যায়নি ছিঁড়ে—
জাগে চিত্তে ধীরে ধীরে
অপূর্ব্ব মোহন।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

রামেন্দ্রসুন্দর

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গত বৎসর স্থির করিয়াছেন যে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী এই উভয়ের মৃত্যুদিনে তাঁহাদের স্মতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রতিবৎসর পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হইবে। এই নির্দ্ধারণ অনুসারে কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল ও অদ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিপূজার্থ আমরা সমবেত হইয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ সম্প্রতি পঞ্চত্রিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে এবং সহস্রাধিক সদস্যের চেষ্টাতে ইহার জীবনীশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু আধুনিক সমৃদ্ধ অবস্থাতে পরিষদ্‌কে আনয়ন করিতে যে সমস্ত কর্ম্মী নিজেদের সমস্ত মনীষা ও শক্তি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়েদের স্থান যে অতি উচ্চে ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অদ্য যাঁহারা এই সভাতে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন ও সাহিত্যপরিষদের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষভাবে অবগত আছেন। কিন্তু আশা করিতে পারা যায় যে, পরিষদের ইতিহাসে এমন একদিন আসিবে, যখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত ছিলেন এমন কেহই থাকিবেন না। তখন যদি বৎসরান্তে প্রাচীন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কেহ রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদ্ গঠনের জন্য কতখানি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার একটী কৈফিয়ৎ দেন, তাহাতে নব কর্ম্মীদের মনে হয়ত উৎসাহের মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবেই যে উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষদ্ এই বাৎসরিক স্মৃতিপূজার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইবে।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীবের দেহে অনবরত ধ্বংস ও গঠনের কার্য্য চলিতেছে। এই ধ্বংসকার্য্য katabolism, গঠনকার্য্য anabolism এই ধ্বংস ও গঠন কার্য্য metabolism সংজ্ঞাতে অভিহিত হইয়া থাকে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় জীবন্ত প্রতিষ্ঠানও বোধ হয় এই জৈব নিয়মের বহির্ভূত নহে। এখানেও ধ্বংস ও গঠনের কার্য্য অনবরত চলিতেছে। এবং ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, গঠনকার্য্যে পটু কর্ম্মীর দরকার চিরকালই থাকিবে। এই সমস্ত কর্ম্মী যখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবেন, তখন হয়ত ত্রিবেদী ও মুস্তফী মহাশয় প্রভৃতির কার্য্যা-লোচনাতে তাঁহাদের মনে নূতন আশা ও বলের সঞ্চার হইবে—এই বিশ্বাসেই আমরা সকলে এই বার্ষিক স্মৃতি-পূজাকে চিরস্থায়ী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুর পর পরিষদে যে বিশেষ সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভাতে ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, কোনও কার্য্যের জন্য আত্মোৎ-সর্গের কথা যে কি, তাহা তিনি মুস্তফীমহাশয়ের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। পরিষদ্-গঠনের জন্য রামেন্দ্রসুন্দর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা বিশেষভাবে জানেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে মুস্তফীমহাশয়ের জীবনকে সাহিত্য পরিষদের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন বলিয়া বর্ণনা করার অধিকার একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়েরই ছিল। দেশে বিদেশে যে সমস্ত মনস্বী ও কর্ম্মী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ভাল করিয়া ওজন করিতে হইলে তুলাধারীরও যথেষ্ট কৃতিত্ব থাকা আবশ্যক। আচার্য্য Einstein তাঁহার আপেক্ষিক-বাদে পৃথিবীর চিন্তারাজ্যে কি পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছেন, তাহার যাচাই আমরা যতখানি করিতে পারিব, ঢাকা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মুস্তফী মহাশয়ের কার্য্যসম্বন্ধে এতবড় ও এতখানি সার্টিফিকেট আর কেহ দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই এবং আমার মতে আর কেহ দিলেও তাহার মূল্য তত হইত না—যত হইয়াছিল ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রদত্ত এই সার্টিফিকেটে। ইহার কারণ এই যে, ত্রিবেদী মহাশয় নিজেও পরিষদের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু পরিষদের কার্য্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করার অর্থ যে কি, তাহা তিনি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আমি একজন নগণ্য সেবক হিসাবে ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতে পরিণত ও অনেকবৎসর তাঁহার নির্দ্দেশমত পরিষদের সেবাকার্য্যের সুযোগ হইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনের শেষভাগে পরিষদের কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের কয়েকজনের বিশেষ মনান্তর উপস্থিত হয়, এবং আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তন্মধ্যে অন্যতম। রাখালবাবু যখন বোম্বাই প্রদেশে বদলী হইয়া যান তখন তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য এক প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। মহানুভব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রীতিভোজে উপস্থিত ছিলেন, এবং রাখালবাবুকে ও আমাকে পরিষদের কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিষদের কার্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যদি দুই একটী কথা বলিতে চাই, তাহা বোধ হয় নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ত্রিবেদী মহাশয় পরিষদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্মোৎসর্গ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই অদ্য আপনাদিগকে জানাইতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুশাস্ত্র ও বিধানমতে দেবাদির উদ্দেশে যাহা অর্পিত হয়, তাহাই উৎসর্গ এবং যাহা একবার উৎসর্গীত হইয়াছে, তাহার উপরে উৎসর্গকারের আর কোনও অধিকার থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তিনি তাঁহার জীবনের যাবতীয় শক্তি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তারাজ্যে পরিষদের স্থান ছিল সর্ব্বপ্রথম ও অন্যান্য বিষয়ের স্থান ছিল পরিষদের নীচে। ত্রিবেদী মহাশয়ের দেশাত্মবোধ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদরূপে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকটিত হইয়াছিল। আপনারা অনেকেই অবগত আছেন যে, সেনেট হাউসে কয়েকটী বক্তৃতা দিবার জন্য যখন ত্রিবেদী মহাশয়কে বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তিনি সম্মত হইয়াছিলেন কেবলমাত্র এই সর্ত্তে যে, তিনি তাঁহার বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষাতে দিবেন—ইংরাজীতে দিবেন না। রামেন্দ্রসুন্দর যে খেয়ালবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া এই সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করেন নাই তাহা যাঁহারা সুপণ্ডিত ও গম্ভীরপ্রকৃতি রামেন্দ্রসুন্দরকে জানিতেন, তাঁহারা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার নিজের প্রাণের কথা বলিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর সর্ব্বদাই দেশের ভাষাকে নিজের অনেক উপরে স্থান দিতেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পরিষদ্-সেবার ইহাই বিশেষত্ব এবং ইহাই পরিষদের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের চরম আত্মোৎসর্গ। কথাটী বোধ হয় একটু পরিষ্কার করিয়া বলার প্রয়োজন।

রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষাতে তিনি সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হইলেও সংস্কৃত ও দর্শন-সাহিত্যে তাঁহার দখল অত্যন্ত উচ্চদরের ছিল। আজ-কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অতি প্রারম্ভ হইতেই যেরূপ ছাত্রগণ নিজেদের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষিতব্য বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারে, কিঞ্চিদধিক বিংশ বৎসর পূর্ব্বেও তাহারা তাহা করিতে পারিত না, ছাত্রগণকে অনেক বিষয়ের সহিত পরিচিত হইতে হইত। সুতরাং ছাত্র ও অধ্যাপক হিসাবে মুখ্যতঃ বিজ্ঞানসেবী হইয়াও তিনি দর্শন, সংস্কৃত-সাহিত্য ও বাঙ্গালা ভাষাতে যথেষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর যখন যুবক, তখন

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজের কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, বাঙ্গালীর সুপ্ত মস্তিষ্ক জাগ্রত হইয়াছে ও জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন রত্ন প্রদানের শক্তি তাহার আছে। বোধ হয় প্রধানতঃ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কোন কোন মেধাবী যুবক গবেষণাকার্য্যে নিজকে নিয়োজিত করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তন্মধ্যে অন্যতম। রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যবহারজীবী হইলে হয়ত পরিণামে কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশে ভাষাজননীর ডাক প্রবেশ করিয়াছে, আইনের চুলচেরা তর্কবিতর্ক তাঁহার নিকট ভাল লাগিবে কেন? সেই হেতু তিনি আইনপাঠে অগ্রসর না হইয়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সহিত পরিচয়স্থাপনের উদ্দেশ্যে জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে রামেন্দ্রসুন্দর যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সহিত তাঁহার অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে কখনও নিজেকে নিয়োজিত করেন নাই; ইহার কারণ যন্ত্রপাতি-সমন্বিত কলেজের অভাব। তিনি John Elliot সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার নিকট অনেক সময়ে John Elliotএর শিক্ষা-পদ্ধতির প্রশংসার কথা শুনিয়াছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে নিজকে নিয়োজিত করাই বোধ হয় রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের প্রথম অভিপ্রায় ছিল। সেই হেতু তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভের পর দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের যন্ত্রাগারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াছিলেন এবং উক্ত কলেজের একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলে তিনি চিরজীবন কলিকাতাতে থাকার সুযোগ পাইবেন না, তখনই এই পদগ্রহণে অসম্মত হইলেন। প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনে যে রামেন্দ্রসুন্দরের কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল, তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানের চর্চ্চা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে কলিকাতাতে থাকিয়া বিজ্ঞানালোচনা সম্ভবপর নহে, তখন তাঁহার এই অবস্থা হইল যে, হয় তাঁহাকে বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কলিকাতার বাহিরে যাইতে হইবে, কিন্তু সেখানে অধ্যাপনা ছাড়া আর কোনও কার্য্য করা সম্ভবপর হইবে না—অথবা কলিকাতাতে থাকিয়া জ্ঞানের চর্চ্চা ও অনুশীলন সম্ভবপর হইবে, কিন্তু সে চর্চ্চা বিজ্ঞানের দিক হইতে হইবে না। যাহাকে ইংরাজীতে বলে যে the lesser of the two evils, তিনি তাহাই গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ কলিকাতাতেই রহিয়া গেলেন। পরে রিপন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়া বিজ্ঞানের অধ্যাপনা এবং সংস্কৃত-সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাহিত্য ও দর্শনের গবেষণাতে ব্যাপৃত থাকিলেও বিজ্ঞানের অধ্যাপনা তাঁহার চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল—এবং সেই হেতুই দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহাই সুযুক্তিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত কথার অনেকগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও মাঝে মাঝে হইতেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা থাকিত। যদি এইগুলি ইংরেজীতে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইত তাহা হইলে তাঁহার নাম ও যশ বাঙ্গালার তথা ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া পড়িত। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা পিতামহ হইতে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহা ছাড়া নিজের প্রতিভাবলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি আবশ্যক। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে তাঁহার লেখনী হইতে যাহা বাহির হইবে তাহা মাতৃভাষার সাহায্যেই হইবে। চিরজীবন তিনি

ভীষ্মের ন্যায় অটলভাবে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হয় যে, দেশে ও বিদেশে স্বীয় নাম ও যশের প্রতি কোনও দৃষ্টি না রাখিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে নিজের সমস্ত মনীষা ও প্রতিভার নিবেদনই হইতেছে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের যথার্থ আত্মোৎসর্গ। এইরূপ আত্মোৎসর্গের তুলনা বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দেশে ও সমাজে এইরূপ ত্যাগীপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশ ও সমাজ সেই ত্যাগীর জন্য যথার্থ গৌরব অনুভব করিতে পারেন এবং আমরাও সেইরূপ রামেন্দ্রসুন্দরের জন্য গৌরব অনুভব করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ইংরেজী বা অপর কোনও য়ুরোপীয় ভাষাতে প্রবন্ধ প্রকাশ আমার মতে অনুচিত। নানা কারণে য়ুরোপীয় ভাষাতে গবেষণার ফলাদি প্রকাশ করা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষাতে গ্রন্থাদি লিখিয়া রামেন্দ্রসুন্দর সমস্ত বিশ্বমণ্ডলীকে তাঁহার বহু আয়াসলব্ধ জ্ঞানের ফলাফল হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর যাহা করিয়াছিলেন তাহা উচিত ছিল কি অনুচিত ছিল তাহার আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্য-পরিষদের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের যে আত্মোৎসর্গ, তাহার প্রকৃত উৎস পিতৃপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত ও নিজের প্রতিভাবলে সুপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবাণীর প্রতি অচলা ভক্তি। নিজকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজের নাম ও খ্যাতির প্রতি কোনও দৃষ্টিপাত না করিয়া চিরজীবন নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য বঙ্গবাণীর চরণে অর্ঘ্য স্বরূপ প্রদানই তাঁহার চরম আত্মোৎসর্গ। আমি এই কয়েকটী কথা আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এই কার্য্যে কতখানি সফল হইয়াছি তাহা জানি না। *

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে পঠিত।

অভিমান

অভিমান সে ত নিঃশেষ করি আপনার সবি দান,
তুচ্ছ তনুরে সরাইয়া দূরে সঁপে দেওয়া সারা প্রাণ।
অভিমানে রাগ রোষ অবিনয়
নর্ম্মলীলায় নব অভিনয়,
রাজা হ'তে চায় প্রাণের প্রণয় শুনিবারে স্তবগান
করি—আপনার বলিদান।

মুখটি ঘুরানো! কণ্ঠ জড়ানো হৃদয়ের বাহু পাশে,
এক চোখ যাতে অরুণ বরণ, অন্য চোখটি হাসে।
নিজ হাতে বাঁধা সাধের বাঁধন,
সখা, সে লুকায়ে সখের কাঁদন,
পীরিতির সে যে কাকুতির রীতি চুম্বন অভিলাষে
র'য়ে—হৃদয়ের বাহুপাশে।

রাঙা আঁখি দুটি আরতি আলোক বঁধুর মুরতি ঘেরি,
ঘন তাপশ্বাস ধূপধূম বাস তোমার বেদীটি বেড়ি।
বাহু ছুঁড়ে ফেলি কেন জানো বঁধু?
শিথিল পরশে মিলেনা যে মধু
তব চাটুবাণী কাণে যত শুনি প্রাণে বাজে জয়ভেরী,
শ্যাম—তোমার প্রতিমা ঘেরি।
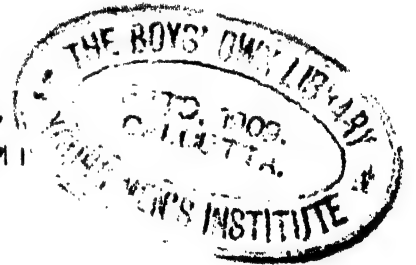
চিত্তের সনে চিত্তের মানে মুখোমুখি পরিচয়,
হৃদয়ের সাথে শত শত পাকে হৃদয়ের পরিণয়।
মানের বাঁধন শিথিল কোথায় ?
হিয়ার বজ্র বাঁধন হিয়ায়।
সকল অর্থে সার্থক রাগ-রাগিণীর জয় জয়,
লোকে—মান তাহারেই কয়।

সব ব্যবধান টুটাবার লাগি নব ব্যবধান ছল,
ক্ষণেকের ঘন স্তম্ভিত রূপ, বরষিতে অবিরল।
হৃদি ক্ষত করি কেন দাগা-দাগি ?
ও-কর অমৃত প্রলেপের লাগি।
তব হৃদি হ্রদে ডুবিয়া জুড়াতে—হ'তে তায় শতদল
আমি—বুকে জ্বালি মানানল।

শ্রীকালিদাস রায়।
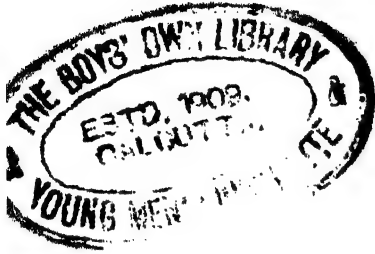
উত্তরাখণ্ডের পত্র

শ্রীমান্ অম্বুজনাথ কল্যাণবরেষু—

গত ৩০শে শ্রাবণ (১৩২৭) অপরাহ্ণে আমরা কান্তিচটি পৌঁছলাম। এ আবার এক নূতনতর দৃশ্য! আমের মুকুলে ভরা শাখাপত্রে গৌরবান্বিত আমের গাছের ঝোপে ঝোপে পাখীরা আনন্দ কলরব করচে। ঝর্ ঝর্ শব্দে পাশ দিয়ে ঝরণা বয়ে চলচে, তারই আশেপাশে বেশ অনেকখানি জমি নিয়ে অনেকগুলি দোতলা সুপরিচ্ছন্ন মাটীর বাড়ীর শ্রেণী। এর আগে এরকম চটি একটীও আমরা পাই নি। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে এ ধরণের গ্রাম দেখেছি। সজ্জনানন্দের ধর্ম্মশালা, গোপাল মন্দির, কালীকমলীর সদাব্রত এবং সদাব্রত-ফণ্ডের ঔষধালয় এখানে আছে।

১লা ভাদ্র ভোরে উঠে কান্তি চটি থেকে বেরিয়ে রওয়ানা হলেম। পঙ্কু প্রভৃতি পায়ে হাঁটার দল আগেই বেরিয়েছিল, পথে দেখা হলো। একজনের পায়ে হোঁচট লাগায় তোমার সেজ মাসি মাতার ডাণ্ডিতে তুলে দিলে। এ পর্য্যন্ত আমরা পথ ভালই পাচ্ছি। তৃতীয় দিনের সেই ভীষণ চড়াই উৎরাইএর পর আর যা কিছু, তাকে এ পথের পক্ষে খুবই কঠিন বলা চলে না। আজকের পথে স্থানে স্থানে একটু চড়াই পাওয়া গেল। রাস্তা কোথাও কোথাও ৬।৭ ফিট চওড়া, কোথাও ৮ ফিটও আছে, আবার ৪।৫ ফিটও সরু। তবে বেশীর ভাগই ৬ ফিটের কম নয়। এই প্রশস্ততর সুখসেব্য পর্ব্বতমার্গটী, মাত্র বৎসর তিন-চার পূর্ব্বে তৈরি হয়েছে। পুরাতন পথের চিহ্ন কোথাও কোথাও দেখতে পেলেম—সেটা নূতন রাস্তার কোথাও অনেক উপর দিয়ে, কোনখানে নীচে দিয়ে গিয়েছিল। ও রাস্তা নূতনের চাইতে অনেক সঙ্কীর্ণ এবং চড়াইও ঢের বেশী উঠতে হতো।

আজকের রাস্তা ভালই ছিল, আর, হয়ত একটু অভ্যাস হয়েও আসছে। ডাণ্ডিতে বসে প্রাণটী হাতে নিয়ে দুর্গানাম জপতে হয়নি। যে দিন পথ ভাল থাকে, সে দিন একটা উলের মাফলার বুনি। আজ কাগজ পেনসিল নিয়ে বসলেম, কিন্তু চলন্ত ডাণ্ডিতে লেখা চলে না। যখন ওরা বিশ্রাম নিতে ডাণ্ডি থামায়, সেই সময় খানিকটা করে লিখে ফেলি। চটিতে গিয়ে স্নানাহারের পর সব দিন লেখা ভাল লাগে না; আর চটিতে মাছির বড়ই উপদ্রব। আমরা একটা ক'রে নেটের মুখঢাকা করে এনেছি, মুখে চাপা দিয়ে শোওয়া বসা যায়।

সে দিনের সেই বৃষ্টির পর সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতির শোভা ফিরে গ্যাছে। তার আর সেই শুষ্করুক্ষ রুদ্রমূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে না। বড়ই শান্ত স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করেছে।

আকাশ পরিষ্কার, বাতাস জলকণাস্নিগ্ধ নাতিশীতোষ্ণ। চড়াই পাখীর আনন্দ-কলরব শ্রুত হচ্ছিল। পথের দুপাশেই জুঁই ও চামেলীর বিশাল আকার, বকুলগন্ধী একপ্রকার কাঁটাগাছের ফুলের গন্ধে চারিদিক মেতে ছিল। নীচে ভাগীরথীর সঙ্কীর্ণধারা কোথাও পর্ব্বতমালার অন্তরালে কদাচিৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, আবার সহসাই পরিদৃশ্যমান হয়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে যেন লুকোচুরি খেলা করছেন, মনে হচ্ছিল। দৃশ্য বা অদৃশ্য যেমনই থাকুন, অদৃশ্যে জাহ্নবীর কলকল স্বর শ্রবণকে পরিতৃপ্ত এবং দৃশ্যে তাঁহার তরঙ্গভঙ্গলীলা আমাদের চক্ষুকে পরিতৃপ্তি প্রদান করছিল। ইনি এখন আমাদের নিত্য-সঙ্গিনী পথপ্রদর্শিকা।

দুই এক জায়গায় রাস্তাটী কিছু সঙ্কীর্ণ। সেইখানে ধারের দিকে এক হাত উঁচু পাথরের পাঁচিল বেঁধে যাত্রীদের পতনভয় নিবারণ করা হয়েছে। শুনলুম দেবাপ্রয়াগ হয়ে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথ এই ভাবেই গেছে।

বেলা সাড়ে আটটায় ব্যাসঘাটে পৌঁছলাম। এর কিছু আগে থেকেই আমাদের অপর পারে (গঙ্গার ধারের দিকেই পাহাড়ের গা দিয়ে পথ) কোটদ্বারের রাস্তা গিয়াছে। ঐ পথে ওঠবার ৮ মাইল গিয়ে কোটদ্বার রেল ষ্টেশন। বিস্তর মিউল ভার বোঝাই নিয়ে ঐ পথ দিয়ে আসচে দেখা গেল। পথেও আমরা ভারবাহী মিউলের খুব ভিড় পেতে লাগলুম। এই সঙ্কীর্ণ পথে সে এক মহাবিপদ। ডাণ্ডিওলারা বিব্রত হয়ে পড়ে, আমরা তো ডাণ্ডিতে বসে দুর্গানাম একমনেই জপছি, জপের সংখ্যা বেড়ে যায়। গঙ্গা এখানে স্থানে স্থানে খুব চওড়া, আর চারিদিক থেকে ছোট বড় নানান আকারের নানান নামের নদী লাফালাফি করতে করতে ছুটে এসে এরই মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়চে। জল অবশ্য এখন সর্ব্বত্রই কম। পাহাড়ে যত বরফ গলবে, বর্ষা নামবে, এই সব সঙ্কীর্ণ জলস্রোত ততই স্ফীতবক্ষ হয়ে উঠবে, এমন কি, মধ্যে মধ্যে এত চওড়া নদী গর্ভেও ওদের তখন স্থান সঙ্কুলান হয়ে উঠবে না।

এ পথে প্রায়ই নদী পার হতে হচ্ছে। আগে এ সবই দড়ির পুল ছিল, এখন পুল সবই লোহার দোলা পুল। পুলের উপর বেশী ভিড় করা সঙ্গত নয়, তাই ডাণ্ডি থেকে নেমে হেঁটেই পার হওয়া নিয়ম। এখানের পুলটি বেশ বড়। ব্যাসগঙ্গা এসে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছেন। ব্যাসগঙ্গার জল ঘোলাটে, তরঙ্গও বেশী। গঙ্গার ধারা এখানে সঙ্কীর্ণ, নদীর মাঝখান দিয়ে বইছে। বেলা প্রায় ৮টার সময় ব্যাসগঙ্গার পুল পার হয়ে প্রায় আধমাইল দূরে ব্যাসগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল ব্যাসচটিতে পৌঁছান গেল। ব্যাস-ঘাটের কিছুদূরে নয়ার বা নবালিকা নদী গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে, এই যায়গাকে ইন্দ্রপ্রয়াগ বলে। কথিত আছে, ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে এইখানে মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করেন, ও তাতে উপাস্যের দ্বারা বিজয়ী হওয়ার বর প্রাপ্ত হন। সেইজন্ত এই স্থান ইন্দ্রপ্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। গঙ্গার ওপারে দক্ষিণ ভাগে ব্যাসের তপস্যা স্থান ও ব্যাসেশ্বর শিবের মন্দির আছে। দর্শনে সমস্ত অন্তর যেন একটা অননুভূত পূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠলো। স্থানটি বড় মনোরম। দুদিক দিয়ে দুটী ধারা বয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে ছোট বড় নুড়ি পাথর ও শুভ্রবালুকার প্রশস্ত চরভূমি। নদী-সঙ্গমস্থলটী এখন শুষ্ক, বর্ষায় সংযুক্ত হবে। এইস্থান মহাভারতকার অথবা আদি মানবের জ্ঞানমঞ্জুষা বেদের সঙ্কলনকর্ত্তা জানিনা কোন্ সে ব্যাসদেবের পুণ্যাবস্থানের গরিমাবহন করেছিল। ব্যাসচটিতে দোকান পসার মন্দ নেই। ডাকঘর আছে। বাজারের মধ্যেই বেদব্যাসের মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। অন্য চটিতে চাল ডাল আটা আলু ঘি নুণ কোথাও কুমড়া, এ ছাড়া বড় একটা কিছু পাওয়া যায় না। ছোলাভাজা ও ক্ষীরের পেঁড়া দু এক জায়গায় দেখেছি। এখানে আবশ্যক অনেক দ্রব্যই আছে, অনাবশ্যক বস্তুজাতও যথা, নকল পলা এবং নকল মুক্তার মালা ইত্যাদিও কিছু কিছু এসে পৌঁছেচে।

বেলা সাড়ে দশটায় সময় আমরা উমরাসু চটিতে পৌঁছলাম। উমরাসুতে বিশেষত্ব কিছুই নেই। চটি

বেশ বড়, প্রায় সব শুদ্ধ ১০।১২টি দোতলা বাড়ী আছে। গঙ্গার উপরেই, কিন্তু গঙ্গায় নামা একটু কঠিন। স্থানটী অনেকখানি খাড়া চড়াইএর উপর।

গত মধ্যাহ্নে মেঘ জমে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আজও টিপিটিপি একটুখানি হলো। এখান থেকে দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত চার মাইল পথের মধ্যে বৃষ্টিতে কষ্ট পেতে হয় নি।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা দেবপ্রয়াগে পৌছে গেলাম। এই চার মাইল পথের মধ্যে সৌড়ি বলে একটি চটি ও একটী বিশ্রামস্থানও আছে। সৌড়ী চটিটি ছোট হলেও স্থানটী বড় সুরম্য, অনেকটা আমাদের দেশের মতন। গরুড় চটির মত অত না হলেও, কলাগাছের সারি গঙ্গাতীর দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমবাগান আছে। আতা ও জাম গাছ মাত্র এইখানেই দেখলাম। স্থানটী ছায়া-স্নিগ্ধ ও শ্যামল। দেব-প্রয়াগ বহু দূর হতেই দেখতে পাওয়া গেল, বেশ একটি বড় পার্ব্বত্য সহর। সহরটী অলকানন্দার উভয় তীরে বিভক্ত। এর মধ্যে দক্ষিণ অংশটী ইংরাজরাজের, উত্তর ভাগটী টিহরী রাজ্যের। মধ্যে দুই পারের দুইটী সহরের একটী সংযোজক লৌহসেতু আছে। সেতুটি ২৮০ ফুট দীর্ঘ। আমরা পদব্রজে পুল পার হয়ে টিহিরী রাজার রাজ্যে প্রবেশ করলেম। দেব-প্রয়াগে বদরীর পাণ্ডাদের অধিকার, সঙ্গে তাঁদের গোমস্তা ছিল, তাঁরা এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। চক বাজারের আগেই একটি খুব সুন্দর ও সুসজ্জিত ত্রিতল গৃহ আমাদের থাকবার জন্ম দিলেন। যত্নেরও কোন ত্রুটি হলো না।

এখানে থানা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, হাসপাতাল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত এবং তীর্থীভূত সঙ্গমস্থল ও দেবালয়াদি টিহরী রাজ্যের অন্তর্গত। বাজার দুদিকেই আছে, তবে উত্তর দিকেই চকবাজার বা বড়বাজার। হিমাচল যাত্রীর আবশ্যক এবং সৌখীন গৃহস্থের উপযোগী সকল দ্রব্যই এই বাজারে প্রচুর রূপে পাওয়া যায়। রবার-সোল জুতা, ভাল অয়েল ক্লথ, ঔষধের ও খুচরা শিশিপত্র রাখার জন্ম ছোট টিনের বাক্স ও ব্যাগ, থলির জন্ম মোটা দেশী ছিট, পেটি কোটের জন্ম এবং চাকর বামুনের জন্ম কিছু ফ্লানেল, সঙ্গমতীর্থের জল রাখার জন্ম স্ক্রু দেওয়া জর্ম্মাণ সিলভারের ঘটি, নোটবুক, পেনশিল। যা কিছু দরকার মনে হলো আমাদের কেনা-কাটা হলো। দাম কিন্তু এত দূরের এই দুর্গম পথেও অন্যায় মনে হলো না। মসুরী দেরাদুনে গরম কাপড় যে দরে কেনা গেছে, হিমালয়ের অভ্যন্তরে মিউলে বাহিত হয়ে এসেও তার যে মূল্য-পরিবর্ত্তন হয়নি, এটা বিস্ময়ের বিষয় বই কি! এলুমিনমের বাসনের দাম সেই ৷১৫ পয়সা ভরি, ভাল চাল এখানে ॥০ সের, সরিষার তেল, কানপুরী ময়দা, চিনি, মিছরী সবই এখানে ভাল। বাজারে মিষ্টান্ন পাকও নানা রকমের হচ্চে। যাত্রী আসা আরম্ভ হতেই নীচের থেকে হালুইকর ও ব্যবসায়ীরা এসে দোকান-পাট খুলে বসেছে। তরি-তরকারির কিন্তু সেই অভাবই রয়ে গেল। সেই যথাপূর্ব্ব আলু কুমড়ো। তবে আমাদের বদরীর পাণ্ডা এক কাঁদি কাঁচকলা এবং আমের, আখের, আমলকীর প্রভৃতি অনেক রকমের মোরব্বা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানের বাড়ীগুলির অবস্থান বড় সুন্দর—বিরাট উচ্চ পর্ব্বত প্রাচীরের গায়ে মাথায়, কোলের কাছে, পায়ের তলায় থাকে থাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা বা ছড়িয়ে দেওয়া। প্রায় তিনতলা বাড়ীর সামনে কাঠের কাযের রেলিংদেওয়া অথবা খোলা বারান্দা। পাশের দিকে হলদে বা গেরুয়া রং, সামনেটি সাদা চুণকাম করা। মাথায় শ্লেট-পাথরের সেই পরতওয়ালা হাল্কা কালো টালি। বারান্দায় গামলা করে গাঁদা, তুলসী, কোথাও অর্কিড ও খাঁচায় টিয়া চন্দনা পাখী ঝোলান। ছবি আর কাকে বলে! রাস্তা-পথ পাথরের নোড়ায় বাঁধান, যেমন হরিদ্বার ও হৃষীকেশে।

দেবপ্রয়াগ উত্তরাখণ্ডের পঞ্চম প্রয়াগের (দেবপ্রয়াগ রুদ্র প্রয়াগ, কর্ণ-প্রয়াগ, নন্দ-প্রয়াগ এবং বিষ্ণু প্রয়াগ), মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে' কথিত হয়। এই স্থান সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ২০০০ ফিট উঁচু। হরিদ্বার থেকে ৭৩ মাইল, কোটদ্বার রেলষ্টেশন থেকে ৯৩ মাইল, কেদার

থেকে ৯৩ মাইল এবং এখান থেকে বদরীনাথের দূরত্ব ১২৬ মাইল। এখানে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমের নিকট দুটি কুণ্ড আছে, তাদের নাম ব্রহ্মকুণ্ড ও বশিষ্ঠকুণ্ড। সঙ্গমস্থলের পর পাথর কেটে প্রশস্ত সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে, এবং দুটো মোটা মোটা লোহার শিকল ঝুলান আছে, তাই ধরে যাত্রীরা সাবধানে স্নান করে। সঙ্গমস্থল খুবই ভয়-সঙ্কুল। অলকানন্দা কল-কল্লোলে তরঙ্গ তুলে বিশৃঙ্খল বেগে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে, তার মধ্যে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই! মা গঙ্গার মূর্ত্তিতে তবু মায়ের মত শান্ত ভাবটা কিছু বজায় আছে! তবে তিনি তো এখন শুধু মানব, সখীর সঙ্গে মিলে-মিশে কৌতুক রঙ্গে রঙ্গময়ী হয়ে রয়েছেন কিনা, তাই একটুখানি উচ্ছৃঙ্খল! এই ভৈরব মূর্ত্তি নদীস্রোতের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ বিস্তার করে প্রকাণ্ডাকার মৎস্যকুলের নির্ভীক বিচরণ দেখবার মত। হরিদ্বারে, হৃষীকেশে, এখানে—মাছেদের সেই একই ভাব! লাফিয়ে গায়ের উপর চলে আসে।

এখানে বদরীনাথের পাণ্ডাদের স্থায়ী বাসস্থান। বদরীতে শীতের জন্য বৎসরের মধ্যে ৭।৮ মাস তো লোক থাকে না। পাণ্ডারা ৫০০ ঘর আছেন। এখানের প্রসিদ্ধ রঘুনাথজীর মন্দিরের দক্ষিণে ও বামে এবং নীচে গঙ্গার বামে ও অলকানন্দার দক্ষিণ তটের উপর এই সব পাণ্ডাদের বাস-গৃহ। এঁদের মধ্যে কর্ণাটি, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণই বেশী। চেহারা ব্রাহ্মণোচিত বটে! ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলিকে দেখলে কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। যেমন রূপ, তেমনই স্বাস্থ্য।

দেবপ্রয়াগে রঘুনাথ কীর্ত্তি মহাবিদ্যালয় নামে একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে। সেখানে পাণ্ডা এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণ বালকগণ পাঠ করে। এর পরিচালনা জন্য কোন স্থায়ী ধনভাণ্ডার নাই, সেই জন্য এর অবস্থা প্রায় শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে তীর্থপুরোহিত পাণ্ডাদের মূর্খতায় তীর্থ ক্ষেত্রে গিয়ে অনেক সময় ক্ষুব্ধ এমন কি মর্ম্মাহত হ'তে হয়েছে। এই মূর্খতা দূর করে সুবিদ্বান ও সংযত চরিত্র পাণ্ডা মোহান্ত পূজারীর আবার ব্যবস্থা হলে, হিন্দু-ধর্ম্মের একটা মহা কলঙ্ক ক্ষালন ও অভাব বিদূরিত হয়। এর দিকে যদি দেশের ধনী ও ধর্ম্মাত্মারা লক্ষ্য করেন, তাহলে অনায়াসেই এ রকম প্রতিষ্ঠান গুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে—কত অন্ধ জনে আলো বিতরণ করতে পারে। কেউ কি এ সব দিক লক্ষ্য করবেন না?

টিহরী দরবার থেকে এ পারেও এক ঔষধালয়, থানা এবং ডেপুটি কালেক্টরের কাছারী আছে। ধনী দাতাদের দেওয়া কয়েকটি ধর্ম্মশালাও আছে শুনলুম। দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর উপরে একটি দড়ির পুল আছে, তার ওপারে একটি ক্ষীণধারা নদী দেখা যায়, তাকে শান্তা নদী বলে। দশরথ-পর্ব্বতোৎপন্না এই নদীটি গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

দেবপ্রয়াগে প্রয়াগসঙ্গমে স্নান করে পিতৃগণকে পিণ্ডদান ও তর্পণ করতে হয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ; মাতামহ, প্রমাতামহ, এবং শ্বশুরকুলের অপগত সকল পূজ্যজনকে ভক্তিভরে আহ্বান করে এনে যথাশক্তি পূজা করবার এ অধিকার লাভ করে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হলো। এই বৈশাখের শুক্লপক্ষই আমার চিরস্নেহময় ভূদেব পিতৃ পিতামহের মহাপ্রয়াণের পুণ্যতিথি। তাঁদের সেই দিব্য তেজোময় জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তি সমুজ্জ্বল ভাস্কররূপে মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে' এক অননুভূত পূর্ব্ব ভাবাবেশে দেহ মনকে যেন অভিভূত করে তুল্লো। সমস্ত জীবনব্যাপী দুঃখসুখের সকল স্মৃতিই যেন আজ এই দেবপ্রয়াগের সঙ্গমতীর্থে পূজার আসনে বসে এক-সঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। যে সব প্রাণাধিক প্রিয়তমদের হাতে করে গড়ে তুলে আবার নিজের হাতেই বিসর্জ্জন দিয়েছি, তারা আজ আমার অনেক ঊর্দ্ধে। তারা আজ শুধুই আমার স্নেহের নয়, আমার শ্রদ্ধারও পাত্র! তাই তাদেরও উদ্দেশে আমার তপ্ত-অশ্রুপূত সুগভীর বেদনাভরা শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করলুম। তারা আজ সংসারের সকল সুখদুঃখ দেনা পাওনার অতীত হলেও আমার সুখদুঃখ ও দেবার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আজকের দিনে, এই পার্ব্বতীয়া পুণ্য-

তরঙ্গিণীদের কোলের কাছে, হিন্দুর এই বহু আকাঙ্ক্ষিত পুণ্যতীর্থে বসে তাদেরই একবার স্মরণ কর্‌বার লোভ ছাড়া যায় কি? স্মৃতির মন্দিরে যাদের নিত্যপূজা নিয়তই চল্‌চে, এ শুধু তাদের নিমেষের জন্য বাইরে নিয়ে আসা মাত্র! মন্দির-দেবতারও তো মধ্যে মধ্যে অঙ্গরাগ করে নিতে হয়।

হিন্দুর এই পিতৃপূজার মত বড় জিনিষ আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। বিশ্বের দেবতাকে আমরা কতটুকু জান্‌তে পারি? কিন্তু আমাদের এজীবনের প্রত্যক্ষ দেবমূর্ত্তির আরাধনায় তো কোন রকম প্রতীকের দরকারই হয় না। এ তো মাত্র ধ্যানগম্য মূর্ত্তি নয়, এ যে জাগ্রত দেবতা।

স্নান, পিণ্ডদান, তর্পণ, ভোজ্যোৎসর্গ সমাধান ক'রে রঘুনাথমন্দির দর্শন করতে যাওয়া হলো। হিমালয়ের বুকের উপর যেমনটী হ'লে মানায়, ঠিক তারই যোগ্য সিঁড়িটী! সাত আট বার বসে বসে মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে কোন গতিকে প্রশস্ত মন্দির-চত্বরে পৌছলাম। প্রশস্ত চতুষ্কোণ চত্বরের মধ্যে উচ্চ মন্দির। ভিতরে শ্যাম-পাষাণময় ৬ ফিট আকারের শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি। মূর্ত্তির অঙ্গে মণিরত্ন ও পীতবাস। মন্দির প্রাচীন, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বলে শোনা গেল। গড়বাল রাজবংশ এই মন্দিরের অধিকারী, তাঁরাই মন্দির সংস্কার ও পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতি করতেন। বিক্রমীয় ১৯৫০ সম্বতের প্রবল ভূমিকম্পে যখন এই মন্দির প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়, তখন গড়বাল-রাজ পরাজিত দশায় থাকায় গোয়ালিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়া এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করে' কীর্ত্তিমান্ হয়েছিলেন। দেবপ্রয়াগের পুরাতন বস্তিও পূর্ব্বোক্ত ভূমিকম্পে এবং ১৯৫১ সম্বতের বিরহীতালের যে বন্যা অলকানন্দায় আসে, তাতেই ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্ত্তমান সহরটী নব নির্ম্মিত।

রঘুনাথ মন্দিরের গড়বাল রাজবংশ প্রদত্ত কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তদ্‌ভিন্ন ভেট, পূজা প্রভৃতি থেকেও কিছু আয় হয়। পাণ্ডাদের মধ্য হতে নির্ব্বাচন করা একটী পঞ্চায়েত সভা আছে। এর আয় ব্যয় প্রভৃতির হিসাব এই সভাই রাখেন এবং টিহরি দরবারে নকল পাঠান হয়। এখানকার ডেপুটী কলেক্টর এই সভার সভাপতি। মন্দির সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের শেষ নির্দ্ধারণ মহারাজই করে থাকেন। বসন্তপঞ্চমীর দিন রঘুনাথজীর উৎসবমূর্ত্তি মহাসমারোহে শোভাযাত্রায় সহিত বাহির করা হয়। সে দিন এখানে খুব ধুমধাম হয় ও একটী বড় রকম মেলা বসে।

রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মবধ জনিত পাপ স্পর্শ করে, (রাবণ ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন) সেই পাপ মুক্ত হবার জন্য তিনি এইখানে তপস্যা করেন এবং পাপ হতে মুক্ত হ'ন। তিনি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইখানে দেবশর্ম্মা নামক মুনি ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করে বরলাভ করেছিলেন বলে' মুনির নামে এই প্রয়াগক্ষেত্র দেবপ্রয়াগ নামে বিখ্যাত হয়েছে। দেবপ্রয়াগের এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত। রঘুনাথমন্দিরের রূপার পাতমোড়া কপাটখানিতে যে সাল লেখা রয়েছে সে কতকটা আধুনিক, সম্ভবতঃ গোয়ালিয়রের দান। এই মন্দিরের কিছু উপরে পাহাড়ে দুর্গামায়ী, বিশ্বেশ্বর, ক্ষেত্রপাল, প্রভৃতির মন্দির আছে। রঘুনাথের মন্দিরের বাহিরে বাহন গরুড় যে আছেনই তা বলাই বাহুল্য। থাকা উচিত ছিল হনুমানের। তা কিন্তু নাই।

সেদিন এখানেই থাকা হলো। পূর্ব্বেই লিখেছি, ক'দিন থেকে এ প্রদেশে বর্ষা নেমেছে। বর্ষার সেই মেঘময়বেণী এলায়িত সবুজসাড়ী পরা রূপ নয়। রাশি রাশি কাপাস তুলো যেন ধুনারীর ধুননযন্ত্র থেকে সদ্য মুক্তি পেয়ে গগনস্পর্শী বিশাল পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় জড়িয়ে গেছে, এবং ক্রমশঃ ধাপে ধাপে তার বুকের উপর দিয়ে, কোলের মধ্য দিয়ে মর্ত্ত্যের অভিমুখে নেমে আসতে আরম্ভ করেচে। অমন যে অভ্রভেদী গিরিরাজি তাদের ওরা যেন একেবারেই আঁচলচাকা দিয়ে ঢেকে ফেল্লে! গাছপালা বাড়ীঘর সমস্তের উপরেই ওদের ঐ লঘু ও শুভ্র আচ্ছাদনী দেখতে দেখতে বিস্তৃত হয়ে গেল। আমরা চিরদিনের মর্ত্ত্যবাসী আজ মেঘরাজ্যের অধিবাসী হয়ে ইন্দ্রজিতের মত মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রইলেম!

বৈকালে খানিকক্ষণের জন্য থেমে থেকে আমাদের সহর দেখার সুযোগ করে দিয়ে রাত্রে আবার বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলে। আমরা পুল পেরিয়ে ইংরেজাধিকৃত "বা" সহরে বেড়িয়ে এলেম। এইখানে যাদের যানবাহন ছিল না, তাদের যান-বাহন নেওয়া হ'ল। আমরা সর্ব্ব-শুদ্ধ কেদার-বদরী যাত্রী তের জন বেরিয়েছিলুম লিখে থাকব বোধ হয়? পঞ্চু, সেজদা, কুঞ্জসাহেব অর্থাৎ ফণীবাবু, আমি, তোমার সেজ মাসিমা সেজদি, সুজুর মা ছাড়া বাকি দু'জনকে কর্ণ এবং পঞ্চপাণ্ডব বলেই নামকরণ করে নেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রধান পাণ্ডব রাঙাদিদি, মধ্য পাণ্ডব, কর্ণ এবং নকুল অর্থাৎ পঞ্চুর ছোড়দি এঁদের হাল্কা শরীরের সাহায্যে কাণ্ডির আরোহী হলেন। তা' আর কি করা যাবে? আমরা তো আমরা—অত বড় যে মহা মহাবীর সেই পাণ্ডবেরাও পদব্রজে বদরীনাথ যেতে সমর্থ হননি। তাঁদেরও আধুনিক লোকেদের ন্যায় অর্থাৎ আমাদের মত বাহক স্কন্ধে যেতে হয়েছিল। ঘটোৎকচপ্রমুখ রাক্ষসগণ তাঁদের বহন করে নিয়ে যায়। এই রাক্ষসগণই আধুনিক তিব্বতীয় ও ভুটানীদিগের আদিপুরুষ কি না, তা কে বলবে? মহাভারতে আছে—

"ঝটিকানিবৃত্তির পর ক্রোশমাত্র পথ গিয়া দ্রৌপদী সৌকুমার্য্য ও ক্লান্তিবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন!"

"ক্রোশমাত্রং প্রযাতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তুং দ্রৌপদীসমুপাবিশৎ ॥ ১
শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষেণ তেন চ।
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্বিনী ॥ ২

(বনপর্ব্বম্ ১৪৪ অধ্যায়)

দ্রৌপদীর মূর্চ্ছাপগমের পর যুধিষ্ঠির বল্লেন,—

"বহবঃ পর্ব্বতা ভীম বিষমা হিমদুর্গমাঃ।
তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো কথং নু বিচরিষ্যতি।

(বনপর্ব্বম ১৪৪.২২)

—"হে ভীম! পথিমধ্যে হিমদুর্গম ও সমবিষম বহু-সংখ্যক পর্ব্বত আছে, দ্রৌপদী কি প্রকারে সে সকল অতিক্রম করিবেন?"

ভীমসেন নিজপুত্র ঘটোৎকচকে আহ্বান ক'রে তাঁকে দ্রৌপদীকে বহন করে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। ঘটোৎকচও তাতে সম্মত হলেন। তাঁর সমভিব্যাহারী রাক্ষসগণ আর সকলকে বহন করবেন স্থির হলো।

"এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ।
পাণ্ডুনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে ॥ ৮
লোমশঃ সিদ্ধমার্গেন জগামানুপমদ্যুতিঃ।
স্বেনৈব স প্রভাবেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৯
ব্রাহ্মণাংশ্চাপি তান্ সর্ব্বান্ সমুপাদায় রাক্ষসাঃ।
নিয়োগাদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য জগ্মুর্ভীমপরাক্রমাঃ ॥ ১০
এবং সুরমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ।
আলোকয়ন্তস্তে জগ্মুর্বিশালাং বদরীং প্রতি ॥ ১১
তে ত্বাশুগতিভির্ব্বীরা রাক্ষসৈস্তৈর্ম্মহাজবৈঃ।
উহ্যমানা যযুঃ শীঘ্রং মহদধ্বানমল্পবৎ ॥ ১২

"এই বলিয়া ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণাকে বহন করিতে লাগিলেন, অপরাপর রাক্ষসগণ পাণ্ডবগণকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। লোমশ নিজ প্রভাপ্রভাবে দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অন্তরীক্ষে সিদ্ধগণের মার্গে গমন করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশানুসারে ভীম-পরাক্রম রাক্ষসগণ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বহন করিল। এইরূপে সুরম্য বন উপবন সমূহ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা বদরীবিশালা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। আশুগতি, মহাবীর রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া তাঁহারা শীঘ্রই দীর্ঘপথ অল্পপথের ন্যায়ই অতিক্রম করিলেন।"—তবেই দেখচো, আমাদের ডাণ্ডি চড়ে যাওয়া কিছুই অন্যায় হচ্ছে না। দ্বাপর যুগের লোকেরাই যখন পারেনি, তখন আমাদের আর দোষ কি?

পরদিন অর্থাৎ ৩রা মে মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার সময় আমরা দেবপ্রয়াগ ছেড়ে এলাম। এখানে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে, এদিনের যাত্রাতে আমাদের মনে একটা তীব্র ব্যথা বেজে রইলো। মনটা যেন নিরানন্দে ভরে রইলো। সেজদি (পঞ্চুর সেজ বোন) আমরা দেরাহনে আসার পর কুম্ভস্নানের আগের দিন দেরাহনে এসে পৌঁছেন এবং তাঁর আর চার বোনের মত

তিনিও এই বদরী যাত্রায় যোগ দেন। তাঁর স্বামী গিরীন বাবুর আগাগোড়াই তেমন মত ছিল না, অথচ হুজুকে পড়ে এগিয়েও চলেছিলেন। ক'দিন থেকে সেজদি অসুস্থ থেকে এখানে এসে জানা গেল, তাঁর গায়ে কিছু বেরিয়েছে। এখানে একজন আগ্রার পাস ডাক্তারকে এনে দেখানো হলো। ভিতরে কোন দোষ নেই, জ্বরও ছেড়েচে, কিন্তু এ অবস্থায় তাঁকে আর বেশীদূরে নিয়ে যাওয়ার সাহস ওঁরা করতে পারলেন না। বিশেষ গায়ের ওগুলো যে কি দাঁড়াবে তাও ঠিক বোঝা যাচ্চে না তো। অগত্যা দু'তিন দিনে কিছু সুস্থ হলে ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে দেরাছনে ফিরে যাবেন এই স্থির ক'রে, তার সমস্ত বন্দোবস্ত এবং এখানের পাণ্ডাজীদের ভার দিয়ে আমরা নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে ওঁদের কাছে বিদায় নিলাম।

দেব প্রয়াগের দেব-নিবাস তুল্য দৃশ্যশোভা চিরদিনই মনে থাকবে। ভৈরবী তরঙ্গমালিনী অলকানন্দা, নির্ম্মল শান্তসলিলা জাহ্নবী, তাঁদের উচ্চ তটভূমে অঙ্কিত চিত্রবৎ সুপরিচ্ছন্ন ঘরদ্বার, বৃক্ষ বাজার পরিশোভিত অনতিবৃহৎ সহরটী, সবই আমাদের কাছে অপরিচিত ও বিস্ময়কর।

দেবপ্রয়াগ হ'তে বেরিয়ে আন্দাজ আধমাইলটাক এসেছি, পথে এক জটাধারী কৌপীনবন্ত আমাদের ডাণ্ডিগুলিকে লক্ষ্য করে উপহাস করলেন,—

"রাম নাম সত্য হ্যায়,
দু'চারকে মৃত্যু হ্যায়।"

সন্ন্যাসী পুঙ্গবের আশীর্ব্বচন শুনেই চক্ষুস্থির! দু'চার জনের মৃত্যু! ঈশ্বর জানেন—তা'ও তো আর এমন কিছু অসম্ভব নয়, হ'লেই হলো। বিশেষতঃ যে পথে পাশে পাশেই মৃত্যুর দূত সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে!

সাত মাইল পথ এসে বৈকালে রাণীবাগ চটিতে পৌছে সেই খানেই রাত্রিযাপন করা গেল। সকাল বেলা তিন মাইলে রামপুর চটিতে বিশ্রামাদি সেরে আবার অগ্রসর হলেম। এই রাস্তাটী যেমন প্রশস্ত, তেমনই সুন্দর। কিছুদূর এসে চারিদিকের পর্ব্বত প্রাচীরের মধ্যে একটী প্রশস্ত সমতল ভূমি, শস্যসম্ভারে অন্নপূর্ণার অন্নথালির মতই ক্ষুধিতের দৃষ্টিক্ষুধা সার্থক করে তুলছে। মাঝখানে একটি সুদৃশ্য গ্রাম। গ্রামের নাম মূলাসু। ইহার অনতিদূরেই অলকানন্দা। অলকানন্দার পরপারে গাড়োয়াল ষ্টেটের রাস্তাটি গঙ্গাদেবীর জন্মভূমি গোমুখী ও গঙ্গোত্রীর পথ নির্দ্দেশ করছে। নদীর পরপার থেকে টিহরী-গাড়োয়াল, এ পারে ব্রিটীশ গাড়োয়াল। অলকানন্দা দুই রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করচেন।

কাছাকাছি অনেকগুলি গ্রাম দেখলুম। একটির নাম দিগোলী, একটির নাম জেলৎ। এখান থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্রায়:সমতলের উপর দিয়েই যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও সুপ্রচুর শস্যক্ষেত্র এখনও এখানকার পূর্ব্ব রাজধানীর গত বৈভবের সাক্ষী দিচ্ছে। শ্রীনগর স্বাধীন গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল, এখন ব্রিটীশ গাড়োয়াল তাকে এই গৌরব থেকে বঞ্চিত করে, ওখান থেকে আট মাইল দূরে পাহাড়ের উপর পৌড়িতে রাজধানী করেছেন। বিটীশ গাড়োয়ালের ডেপুটি কমিশনর সেই খানেই থাকেন, তথাপি তার অতীত গৌরব বহন করে, শ্রীনগর আজও গা'ড়োয়ালের মধ্যে প্রধান সহর হয়ে আছে।

বিল্বকেশ্বরে আমাদের মধ্যাহ্ন যাপন হলো। অলকানন্দা এখানে অনেকখানি চওড়া এবং গভীরতাও বেশী, কারণ তাঁর উদ্দাম চপলতা অনেক খানিই কম। ঢুণ্ঢান্ নদীর উপর লোহার পুল পার হয়ে বিল্বকেশ্বর শিবমন্দিরের অনতিদূরে নদীর উপরেই চটিগুলি অবস্থিত। কাণ্ডি চটি থেকেই এদিকের সমুদয় চটিই দ্বিতল এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। ঘরদ্বার, রান্নার জায়গা, সমস্তই লেপা মোছা তকতকে অবস্থায় পেয়েছি, প্রত্যেক দল যাত্রীর জন্যেই এরা যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এদিকের এই যে নিয়ম, এ বড় চমৎকার! এর জন্য রোগ অনেক কম হয়, সুবিধার তো কথাই নেই। এই সব লক্ষ্য করবার জন্ম হেল্‌থ্ অফিসর স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টারের রীতিমত ব্যবস্থা আছে। পথে স্থানে স্থানে তাঁরা এসে পঞ্চু ও ফণি বাবুকে জিজ্ঞাসা করে গেছেন যে, কোনও চটিতে আমরা অপরিচ্ছনতা দেখেছি কি না? এই সব পুণ্যেই ইংরেজ আমাদের মাথার উপর বসতে অধিকার পেয়েছে।

আশীর্ব্বাদ যে না ক'রে উপায় নেই। পাশেই গাড়োয়াল ষ্টেট, তার পথ ঘাট চটির ব্যবস্থা কিছুই নাকি এ রকম নয়। আমরা ফেরবার সময় টিহরী দিয়ে যাবার কথা বলাতে কুলীরা এবং পাঞ্জাবীরা বল্লে, "সে পথের অসুবিধে আপনারা কি সইতে পারবেন? তার মেরামতের এমন ব্যবস্থাও নেই, তৈরিও এত ভাল নয়। বিশেষ চটি প্রভৃতি ঐরকমেরই নয়। ধর্ম্মশালা আছে ১০।১২ মাইল অন্তর, কিন্তু জলকষ্টও খুব।" শুনে মনটা দমে গেল। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু তার নিজের দেশের লোক। স্বধর্ম্মী রাজার রাজ্যের ব্যবস্থা বিধর্ম্মী ও বিদেশীর চাইতে ভাল, এই কথাটা শুনতে পেলে মনে কতই না সুখ হতো!

তোমায় আগে লিখেছি বোধ হয়, এপথে সমস্ত চটির সঙ্গেই চটিওয়ালার দোকান। চটিতে থাকার জন্য ঘর ভাড়া দিতে হয় না, খদ্দের দোকান থেকে জিনিস কিনলেই থাকতে পায়। অবশ্য খাবার জিনিসের দামে ওরা বেশ পুষিয়ে নেয়। তা' নেবে নাই বা কেন? চটিগুলি প্রত্যেক বছর হয় তৈরী, না হয় মেরামত করতেই হয়। এদের কায তো এই ক'টা মাসেই শেষ। এর মধ্যে যতটুকু যা করে নিতে পারে। সমস্ত বৎসর তো বেকার হয়ে বসেই থাকতে হবে। ভাল চাল, মুগের ডাল, উত্তম ঘৃত দুগ্ধ, এ প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে, উপরন্তু এখানে সিম ও বেগুণ পাওয়া গেল। পাহাড়ী আলু ৶০ সের, বেগুণ।৵০। নিকটবর্ত্তী কয়েকটা গাছে মোটা মোটা সজিনা খাড়া ঝুলে আছে দেখে আমরা লুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ চাকর পাঠিয়ে পাড়িয়ে আনালুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা রান্নার পরে মিষ্টরসের পরিবর্ত্তে রীতিমত তিক্তরসই প্রদান করলেন। পাহাড়ী খাড়া যে এমন খাঁড়াধরা হবেন, তা জানলে ওর জন্যে অত হাঙ্গামায় কে পড়তে যেত? মাঝে থেকে আমাদের দুটোর মধ্যের একটা ব্যঞ্জনই নষ্ট হয়ে গেল।

অলকানন্দায় স্নান করে বিল্বকেশ্বরের মন্দিরে পূজা করতে যাওয়া হলো। পুরাতন ও ক্ষুদ্র হলেও মন্দিরটি নির্জ্জন ও পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের মধ্যস্থলে তামার বেড়ের মধ্যে শিবলিঙ্গ। মাথার উপর রূপার ছাতা, রূপার একটি কারুকার্য্যকরা চক্রাকৃতি চালচিত্র। প্রাচীরের গায়ে তক্তার উপর কলসীতে জল রেখে একটি চেরা বাঁশের সাহায্যে সেই জলকে সরু ধারায় ঠাকুরের মাথায় ঢালা হচ্ছে। আমাদের দেশে যেমন ঝারা দেওয়া হয়, সেই রকম বৈশাখী জল-ঝারা সম্পন্ন করার রীতি এদেশে আর কোথাও কিন্তু দেখি নি।

মন্দিরের বাইরেই একটি শেষশয়ান মূর্ত্তি। পাশের দিকে কয়েকটি মূর্ত্তিকে দ্রৌপদী ভীম প্রভৃতি ব'লে দেখানো ও পয়সা আদায় করা হয়। আমার মনে হল, এগুলি যেন বৌদ্ধ মূর্ত্তি। তারা দেবী, মঞ্জুশ্রী, প্রভৃতির মূর্ত্তি কোনও বৌদ্ধ ভগ্নস্তূপ হতে আনীত হয়ে থাকবে। সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের ধ্বংস হ'তেই এসেছে। একখানি পাথরের উপরে একটি বিরাট পদচিহ্ন! এটি নাকি অর্জ্জুনের। বৈশালীর নিকট বর্ত্তী কলুয়ার অশোকস্তম্ভটিকে ওদিককার লোকেরা ভীমের লাঠি বলে শুনে থাকবে। ভীম না কি বাঁকে করে মাটি নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে বাঁক ভেঙ্গে যাওয়ায় মাটি ঝুড়ি দুটি স্তূপ ও বাঁকের লাঠিটি স্তম্ভ হয়ে আছে! এত দিন যা কিছু বড়সড় তাও ভীমেরই একচেটিয়া ছিল,—তা কি বরেন্দ্রের কৈবর্ত্তরাজ ভীমের কীর্ত্তি, আর কি সারা ভারতবর্ষময় সম্রাট অশোকের। উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করতে এসে অর্জ্জুনেরও যে পদবৃদ্ধি হয়ে গিছলো সে খবরটা এতদিনে জানতে পারা গেল! হ'তে পারে, আশ্চর্য্য নয়! হিমালয়ের হাওয়া খেয়ে যক্ষ্মা রোগীর রোগ সারে, আর অত বড় জঙ্গী জোয়ান বীর পুরুষটার ওটুকু আড়ন বাড়বে না?

বিল্বকেদারের আসল নাম হচ্ছে, ভীল্ল-কেদার। কিরাতরূপী পশুপতি অর্জ্জুনের এই তপস্তা-ক্ষেত্রেই নাকি তাঁকে ছলনা দ্বারা পরীক্ষান্তে অবশেষে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেছিলেন।

এখানে বসে বহু দিন পরে গীতা পাঠ করলেম। অর্জ্জুনের স্মৃতিই হয়ত বা আমায় ঐ কার্য্যে প্ররোচিত করে থাকবে! কত সূক্ষ্ম ভাবেই যে আমাদের মনের উপর ক্রিয়া হয়, প্রথম সেটা যখন জানতে পারা যায়,

হঠাৎ নিরতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে একটা আনন্দ জেগে ওঠে। মহাভারতের কাল আর বনপর্ব্বটা, সমস্ত এক সঙ্গে মনে জেগে উঠলো। এই অলকানন্দার নির্ম্মল তরল প্রবাহরাশি, এই লতায় পাতায় বিজড়িত সরলোন্নত বৃক্ষ-রাজি, মধ্যাহ্নের নাতিপ্রখর স্নিগ্ধোজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণ-ধারায় অভিষিক্ত হয়ে সন্তস্নাত ভারত যুদ্ধের মহা নায়ক হয়ত কোন্ সেই সুদূর দিনে আমাদেরই মত এমনই সময়ে ভক্তি-রিপ্লুতচিত্তে এই শান্তরসাস্পদ বনভূমির এইখানে তাঁর মৃগচর্ম্মখানি বিস্তৃত করে অভীষ্ট দেবতার ধ্যানে আত্মহারা হয়ে বসেছিলেন, আর যাঁর স্তুতিগান সেই ভক্ত হৃদয়ের প্রশস্ত অন্তস্তল হতে উৎসারিত হয়ে এই শুব্ধ বিজন বনস্থলী পরিপুরিত হচ্ছিল, সেই তিনিই তখন ছদ্ম কিরাতরূপ ধরে তাঁকেই ছলতে আসচেন! এ দেবকৌতুক মন্দ না! অতীত গৌরবের এই জীর্ণ সমাধি নর-নারায়ণের প্রেমপাত্র অর্জ্জুনের স্মৃতি-পুত ক্ষুদ্র বিল্লকেদার আমার মনে একটা ছাপ রেখে দিলে। এর মধ্যে উচ্চ সাধনার, পরম সিদ্ধিলাভের একটুখানি নীরব ইঙ্গিত যেন মনের ভিতর থেকে অনুভব করে পাওয়া যায়।

আমাদের বিশ্রামাবসরে হঠাৎ ঘোর রবে ভৈরবের বিষাণ বেজে উঠলো! হা অদৃষ্ট! আমরা তো আর অর্জ্জুন নই যে, কিরাতরূপে ভগবান আমাদের দেখা দিতে আসবেন! দেখা গেল গাঢ় ঘন নীল রঙে পশ্চিমের পাহাড় গুলিকে ছাপিয়ে দিয়ে, তরতর করে প্রকাণ্ডকায় মেঘের পাহাড় পূর্ব্বাভিমুখে ছুটে আসছে! কাল-বৈশাখী ঝড় জল এক সঙ্গে এসে পৌঁছে গেল, বলতে হয় এদেরই কিরাত ও কিরাতিনী বলতে পারো। এ কিন্তু দেবপ্রয়াগের সেই পুঞ্জিত সজ্জিত কার্পাসশুভ্র মেঘের স্তূপ নিয়ে নয়, নিকষ কালো অশনিবর্ষী করাল মূর্ত্তি ধরে রুদ্রের প্রচণ্ড বিষাণ বাজিয়ে পুরাণের সেই কিরাত রূপেই এক মুহূর্ত্তে সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশটাকে যেন লণ্ড ভণ্ড করে দিলে। দেখতে দেখতে বড় বড় গাছ পাথর উপড়ে ত্রিপুরাসুরের মত শুয়ে পড়লো। শাখা-পত্র সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়লো, পথের উপর পাহাড়ের হুড়হুড়ে পাথর সব গড়িয়ে গেল।

মনে হয়েছিল, আজ আর আমরা এখান থেকে বেরুতে পারবো না, কিন্তু খানিক পরেই বৃষ্টি থেমে গেল। স্ফুরিত-বিদ্যুদ্বর্ষী কালো মেঘ পূর্ব্বাভিমুখ না হয়ে হঠাৎ উত্তরের দুরূহ পথ ধরলে। আমরা এখন পূর্ব্বাভিমুখ, কাযেই আমাদের গতি-পথে আর কোনই বাধা রইল না। অতি সুরম্য ও জলধৌত দিব্য পথ দিয়ে আমাদের এবার শুভ-যাত্রা করা হলো। আমার হঠাৎ মনে পড়লো 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—এ'ও যেন তেমনই চারিদিক সুপ্রসন্ন ও মধুময়! জলধৌত বৃক্ষ-লতায় স্নিগ্ধ সূর্য্যালোক ঝিলমিল করে উঠছে, দেব-দারুর সরু পাতা সজল হাওয়ায় থর থর করে কাঁপচে। নদীর জলে একটা মধুর মৃদু কলতান শ্রুত হচ্চে, চারিদিকেই মাধুর্য্যের ছড়াছড়ি।

এই যে চারটি মাইল পথ, এ রাস্তাটির পরিসর স্থানে স্থানে ১০ ফুট হওয়াও অসম্ভব নয়। এক ধারে আর সেই ৩০০, ৫০০ ফিটের, হাজার দেড়হাজার ফিটের পাতাল-স্পর্শী খাদ নেই। এই সুপ্রশস্ত সমতলের কোথাও তামাক ক্ষেত, কোথাও শাক সব্জী বেগুন ও কপি, আর মাইলের পর মাইল ধরে পক্ক গোধুমের স্বর্ণপ্রভ শীর্ষরাজি মন্দ-বায়ুভরে আন্দোলিত হচ্চে। বিল্লকেদার থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত এই ভূভাগটির সমস্তটাই প্রায়শ বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ জনের অধিবাসিত গ্রাম ও উপনগরে পরিপূর্ণ। বিল্লকেদারের পরপারে অলকানন্দার একটি জল-স্রোত এসে মিশেছে, তার নাম মার্কণ্ডেয় গঙ্গা। সেদিন সেখানে কোন যোগ ছিল, অনেক স্ত্রী-পুরুষ স্নান করতে এসেছে দেখা গেল। এ-পার থেকে ও-পারে যাবার জন্য একটি লোহার পুল আছে, তার অল্প দূরে টিহরী ষ্টেটের একটি সবডিভিসন কীর্ত্তিনগর, এখানে একজন ডেপুটি কলেক্টর থাকেন। ক্ষুদ্র সহরটির চুনকামকরা বাড়ী গুলি জলধৌত শুভ্র শুক্তির মতই, চিকণ শ্যাম গাছ-পালার মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। শ্রীনগরের প্রায় এক মাইলের কিছু আগে কমলেশ্বরের মন্দির। আসন্ন মেঘের ভয়ে আমাদের

এখানে নামা হলো না, ফেরবার সময় হয়ত হবে। নদী-তীরে শ্রীপীঠ বিরাজিত। এই শ্রীপাঠ বা লক্ষ্মীপীঠ থেকেই সহরের এই নামকরণ। শ্রীনগরের এই শস্যভাণ্ডারটিই যতদূর মনে হলো যেন এই দুর্গম বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রধান সম্বল। পাহাড়তলীর এই সহরটিও এ প্রদেশের পক্ষে যথেষ্ট সমৃদ্ধিসম্পন্ন। বড় চড় বাঁধান রাস্তা, দু'সারি পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন বিপণি-শ্রেণী, রাস্তায় জলের কল, আলো, পুলিস-পাহারা বড় বড় বাড়ী, আধুনিক প্রথায় প্রস্তুত করা হাঁসপাতাল, স্কুল—সহরোচিত সমস্ত চিহ্নেই এ সহরকে চিহ্নিত দেখতে পেলেম। বাজারে তামা ও পিতলের ঘড়া, স্নানের প্রকাণ্ড টব, গামলা, থালা অনেক কিছুই দেখা গেল। এ সমস্ত এখানেই তৈরি হয়। তোমার সেজ মাসিমার একটা বড় ঘড়া সেই উমরাজু চটিতে দেখে অবধি কেনবার ইচ্ছা, তোমার মেসোমশাই ফেরবার পথে কিনে দেবেন প্রতিজ্ঞা করে তবে নিষ্কৃতি পেলেন। ঘড়াগুলির গড়নে একটু পাহাড়ী বিশেষত্ব আছে অবশ্য, তবে ১৫৲ টাকা কুলি ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং আবার আনার মতন তেমন নয়। জর্ম্মাণী ও জাপানী খেলনা, সিল্ক মোজা, রঙ্গীন সুতি কাপড় এ সবও দেখছি এই দুর্গম পাহাড়কেও কোন রকম বঞ্চিত করেনি! সহর-বাসিনীরা ছিটের সাড়ী জামা পরে খুব স্ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছেন। গলায় ঝুটা পলার মালার রাশও উঠেছে। ছোট ছেলে মেয়েরা দেবপ্রয়াগের পর থেকেই নেচে গেয়ে একটি পাই-পয়সা ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে, এদিকে সংখ্যা ক্রমেই বাড়চে। সহরের মধ্যেও এদের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু যাত্রীরাই এদের লক্ষ্য। একবার সহরে ঢুকে বাসা নিয়ে বসলে আর তাদের কিছু বলে না। সামান্য একটী পয়সা বা আধ পয়সা একটা পেলেও এরা সন্তুষ্ট। সবাই একই গান বা ছড়া আওড়ায় না, কেউ কেউ বলে,—

"মুনি মুনি যোগী করে রামজীকে সেওয়া, (সেবা)
পাথরমে পানি পড়ে রোজে না ভিজে
খাওয়ত ঘিউ খিচড়ী খাতাওয়ে মেওয়া"

কেউ বলে—

"রাজা চলে হাথি ঘোড়া পাল্কি সাজায়কে,
আর, যোগী চলে নেংটী পিনহ্ চিম্‌টা বাজায়কে।"

এদিককার পাহাড়ে পাহাড়ী বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি, সে রকম জাতের লোক বড় নেই। গাড়োয়ালীরা সাধারণতঃ উত্তর-পশ্চিমেরই অধিবাসী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণ। আমাদের ৫৬টা কুলির মধ্যে বেশীর ভাগই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। চেহারাও এদের বেশীর ভাগই ভদ্র চেহারা। গায়ের রং এত কষ্টেও কারু কারু বেশ ফরসা। উঁচু গাঁয়ের ভদ্র নর ও নারীদের মুখও রং দু'ই চমৎকার। মুখের কাট আর্য্য ভাবের, চোখ নাক বেশ টিকোল। ভাষা পরিষ্কার হিন্দী। তবে আপনাদের মধ্যে যখন কথা কয়, তখন পাহাড়ী-মেশান ভাষায় কয়। "ঠিঠি" "ঠং ঠং" এই রকম একটা ঠকারের ঝঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়। শূদ্ররা এদেশে অচল নয়।

কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা দুটি প্রকাণ্ড বাড়ীর একটীর দ্বিতলে দু'খানি ঘর ও রাস্তার উপরেই একটী রেলিং ঘেরা বারান্দা আমরা পেয়েছি। রান্নাঘর নীচের তলায়। সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে জলের কলে দিন রাত মোটা ধারায় জল পড়চে। এখানে এসে আমাদের সঙ্গে হৃষীকেশে পরিচিত এবং পূর্ব্বপরিচিত অনেকগুলি বাঙ্গালী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। এঁরা আমাদের এক দিন পরে বেরিয়েও আমাদের দেবপ্রয়াগে বিলম্ব হওয়ার সুযোগে আমাদের ধরে ধরে ফেলেছেন। দেবপ্রয়াগে বৃটিশ অধিকৃত পারের নাম "বা", ঐখানে দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে এসে এদের কারু কারু সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এখানেও আবার হলো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী।
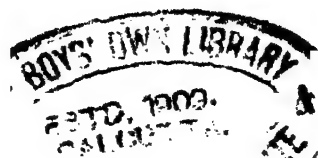
আপেক্ষিকতাবাদের স্থূল কথা
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিভিন্ন জগতের দেশ ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ বা লোরেঞ্জ রূপান্তর সূত্র

সুতরাং জিজ্ঞাস্য হয় "যদি রাম ও শ্যামের জগৎ পরস্পর সম্পর্কে সমবেগ সম্পন্ন হয় এবং ঐ বেগটা 'ব' পরিমিত হয়, তবে রামের মাপের দেশ ও কালের সহিত শ্যামের মাপের দেশ ও কালের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবার প্রয়োজন, যাহার ফলে আলোকের বেগ উভয়ের পরিমাপে সমান—'ভ' পরিমিত হইতে পারে ?"

ইহার উত্তর এইরূপ। বিভিন্ন দ্রষ্টা তাহাদের দেশ-বৃদ্ধি বা কাল-বৃদ্ধির তুলনা করিতে পারে কেবল জাগতিক ঘটনা-সমূহকে অবলম্বন করিয়া—ঘটনা-নিরপেক্ষ দেশ বা কাল অর্থহীন। দুইটা বিশিষ্ট ঘটনার মধ্যে রাম ও শ্যাম দেশের ব্যবধান ও কালের ব্যবধান মাপিতে পারে এবং তাহাদের পরিমাপের ফল তুলনা করিয়া দেখিতে পারে। সকল ক্ষেত্রেই এই পরিমাপ কার্য্য এমন ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাহার ফলে, আলোকের বেগের পরিমাণ সম্বন্ধে, আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ ঘটে না। এইরূপ হইতে হইলেই দুই জগতের দ্রষ্টার দেশ ও কালের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, যাহা নির্ভর করে কেবল তাহাদের আপেক্ষিক বেগের উপরে এবং আলোকের বেগের ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণটার উপরে। এই সম্বন্ধ ও এই নির্ভরতার প্রণালীটা নিম্নোক্ত রূপ বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে।

মনে করা যা'ক (২ নং চিত্র) রামের 'র' চিহ্নিত জগৎ সম্পর্কে শ্যামের 'শ' চিহ্নিত জগতের বেগ 'রশ' রেখাক্রমে এবং 'ব' পরিমিত। এই আপেক্ষিক বেগের পরিমাণ সম্বন্ধে রাম ও শ্যাম একমত—উভয়েই উহাকে 'ব' পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে; কিন্তু রাম মনে করিতেছে আমি স্থির হইয়া রহিয়াছি, 'ব' বেগটা শ্যামের বেগ এবং 'রশ' দিক বরাবর; আর শ্যামের সিদ্ধান্ত এই যে, আমিই স্থির, ঐ বেগটা রামের বেগ এবং 'শর' দিক বরাবর। এইরূপে রাম ও শ্যামের মধ্যে বেগটার দিক সম্বন্ধে এবং উহা কাহার বেগ এ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। প্রত্যেকে নিজেকে স্থির এবং অপরকে বেগসম্পন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া বাহ্য ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছে, এবং ইহারই ফলে যে কোন দুইটা ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান বা কালের ব্যবধান সম্বন্ধে রাম-শ্যামের পরিমাপের ফল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে।
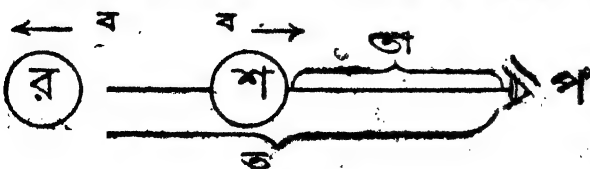
২ নং চিত্র

রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগটা 'রশ' রেখাক্রমে সুতরাং উহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব। মনে করা যা'ক উহারা পরস্পরে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম তাহার দেশলাই জ্বালাইয়া রামের মুখের চুরুটটা ধরাইয়া দিয়া রামের অভ্যর্থনা করিল। এই অভ্যর্থনা ব্যাপারটাকে বলা যাইবে ১নং ঘটনা। ধরিয়া লওয়া যা'ক, এই ঘটনাটাকে অবলম্বন করিয়াই উভয়ে কাল মাপিতে সুরু করিল। রাম ও শ্যাম তাহাদের ঘড়ি মিলাইয়া লইল এবং শ্যামের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তর স্বরূপ,রাম তাহার অবিকল একমাপের দু'খানা ফুটরুলের একখানা শ্যামকে দান করিল। এক সঙ্গেই এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। এখন রাম ও শ্যাম উভয়েই ঠিক এক প্রকারের এক একটা ঘড়ি ও এক একখানা ফুটরুলের অধিকারী হইল; সুতরাং

যাহার যাহার ঘড়ি ও ফুটরুলের সাহায্যে, যাহার যাহার জগৎ হইতে, উহারা অক্লেশে দেশ ও কাল মাপিতে পারিবে।

তা'রপর রাম-শ্যামে ছাড়াছাড়ি হইল এবং এইরূপে উহারা যখন—অর্থাৎ রামের ঘড়ির 'স' সময় পরে এবং শ্যামের ঘড়ির 'সা' সময় পরে—২ নং চিত্রের মত ফাঁক ফাঁক হইয়া দাঁড়াইল, মনে করা যা'ক, তখন উক্ত 'রশ' রেখার কোনও স্থানে—'প' চিহ্নিত স্থানে—এক ব্যক্তি চোখ মেলিয়া তাকাইল। 'প'-এর এই চক্ষুরুন্মীলনকে বলা যাইবে ২নং ঘটনা। 'র' 'শ' ও 'প'কে দেশমধ্যস্থ তিনটা চিহ্ন স্বরূপ মাত্র মনে করিতে হইবে।

এই দুই ঘটনার মধ্যে দেশ ও কালের ব্যবধান মনে করা যা'ক, রামের মাপে দাঁড়াইল, যথাক্রমে 'ত' ও 'স' এবং শ্যামের মাপে দাঁড়াইল, যথাক্রমে 'তা' ও 'সা'। প্রত্যেকে নিজের জগৎ হইতে দেশ ও কাল মাপিতেছে এবং প্রত্যেকে মনে করিতেছে তাহার জগৎ স্থির এবং অপর ব্যক্তির জগৎ 'ব' বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; সুতরাং রাম বলিবে—

ঘটনা দু'টার মধ্যে দেশের ব্যবধান = রপ এবং রপ = ত

" " " কালের ব্যবধান = স এবং $স = \frac{রশ}{ব}$

শ্যাম বলিবে—

ঘটনা দু'টার মধ্যে দেশের ব্যবধান = শপ এবং শপ = তা

" " " কালের ব্যবধান = সা এবং $সা = \frac{রশ}{ব}$

উভয়ের মতেই—

রপ = রশ + শপ……(ক)

এই সম্বন্ধটা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

এখন আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, দেশমধ্যস্থ যে দুই চিহ্নের মধ্যে দূরত্বটা এক জগতের মাপে ১ ফুট পরিমিত হয়, অপর জগতের মাপে তাহা, সাধারণতঃ ভিন্ন পরিমাণের—১ ফুটের 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র—হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সুতরাং উক্ত সম্বন্ধের মধ্যে 'রপ' দূরত্বটা, যাহাকে রাম মাপিয়াছে 'ত' পরিমিত—শ্যামের মাপে দাঁড়াইবে $\frac{ত}{ঐ}$ পরিমিত; এবং 'শপ' দূরত্বটা—যাহাকে শ্যাম মাপিয়াছে 'তা' পরিমিত—রামের মাপে দাঁড়াইবে $\frac{তা}{ঐ}$ পরিমিত। ফলে

'ক' সম্বন্ধটা রামের মতে—$ত = ব \times স + \frac{তা}{ঐ}$

অথবা $তা = ঐ (ত - ব \times স)$……(১)

এবং শ্যামের মতে $\frac{ত}{ঐ} = ব \times সা + তা$

অথবা $ত = ঐ (তা + ব \times সা)$……(২)

এই আকার ধারণ করিবে। প্রত্যেকে তাহার নিজের মাপ-জোখ বিশ্বাস করিতেছে এবং অপরের মাপ-জোখের ফলও সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে। রাম বলিতেছে, শ্যামের দেশ তাহার নিজের দেশ ও কালের সহিত ১নং সম্বন্ধ দ্বারা সংযুক্ত এবং শ্যাম যাহা বলিতেছে তাহাও ঠিক। শ্যাম বলিতেছে, রামের দেশ তাহার নিজের দেশ ও কালের সহিত ২নং সম্বন্ধ দ্বারা সংযুক্ত এবং রাম যাহা বলিতেছে তাহাও ঠিক। এই সূত্র দু'টার তুলনা করিলে দেখা যায় যে ঘটনা দু'টা সম্পর্কে শ্যামের দেশের মাপ (তা) রামের দেশ ও কালের মাপের সহিত (ত ও স-এর সহিত) যেরূপ সূত্রে সম্বদ্ধ রামের দেশের মাপও (ত) শ্যামের দেশ ও কালের মাপের সহিত (তা ও সা-এর সহিত) ঠিক সেইরূপ সূত্রেই সম্বদ্ধ; তফাৎ এই যে, উভয়ের আপেক্ষিক বেগটাকে একজন যোগচিহ্ন দ্বারা এবং অপরে বিয়োগ চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছে।

পুরাতন যুগের মত এই যে, দূরত্ব অথবা কালের পরিমাপে রাম শ্যামকে একমত হইতে হইবে; অর্থাৎ উক্ত সূত্র দু'টার অন্তর্গত 'ঐ' = ১ এবং স = সা হইতে হইবে; সুতরাং পুরাতন যুগের মতে ঐ সূত্র দুইটা একই সূত্র বলিয়া গৃহীত হইবে। আইনষ্টাইনের মতে, সাধারণতঃ 'ঐ'এর মূল্য ১ হইতে ভিন্ন এবং 'স' ও 'সা' পরস্পরের সমান নহে; কিন্তু 'ঐ'-এর সহিত 'ব' ও 'ভ'-এর এমন একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে যাহার ফলে আলোকের বেগের পরিমাণ সম্বন্ধে রাম-শ্যামকে একমত হইতে হয়। এই সম্বন্ধটা 'ঐ'-এর যে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে

উহাকেই উহার প্রকৃত মূল্যরূপে গ্রহণ করিয়া ১নং ও ২নং সূত্র দু'টাকে প্রত্যেক দ্রষ্টার দেশের সহিত অপর দ্রষ্টার দেশ ও কালের সম্বন্ধজ্ঞাপক সত্য সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

'ঐ'এর মূল্য সহজেই নিরূপণ করা যাইতে পারে। এ' জন্য কেবল স্থলবিশেষে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দু'টা কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা দেখিবার প্রয়োজন। সহজেই দেখা যায় যে, আলোকের বেগটাকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া উক্ত ঘটনা দু'টা একটা নূতন আকারে উপস্থিত হইতে পারে; কারণ, এ'রূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, রামের অভ্যর্থনা উপলক্ষে শ্যাম যে আলোটা জ্বালিয়াছিল তাহা হইতে একটা রশ্মি 'রপ' রেখাক্রমে অগ্রসর হইয়া 'প' চক্ষুতে আঘাত করিয়াছিল এবং—রাম-শ্যাম উভয়ের মতেই—ঐ রশ্মি সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গেই 'প' চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। এইরূপ হইলে পূর্ব্বোক্ত ১নং ঘটনাটার অর্থ হইবে "শ্যামের আলো জ্বালা" এবং ২নং ঘটনাটার অর্থ হইবে "প চক্ষুতে রশ্মি-সম্পাত"।

এই দুই ঘটনার মধ্যেও দেশের ব্যবধানটা রামের মাপে 'ত' ও শ্যামের মাপে 'তা' এবং কালের ব্যবধানটা রামের মাপে 'স' ও শ্যামের মাপে 'সা' হইবে। সুতরাং রাম বলিবে ঐ আলোকরশ্মিটা 'স' সময়ের মধ্যে 'রপ' বা 'ত' পরিমিত দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং শ্যাম বলিবে যে উহা 'সা' সময়ের মধ্যে 'লপ' বা 'তা' পরিমিত দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছে। অর্থাৎ কিনা আলোকের বেগটা যদি উভয়ের মাপে সমান সমান, অর্থাৎ 'ভ' পরিমিত হইতে হয়, তবে—

রামের মতে, $ভ = \frac{ত}{স}$; সুতরাং স $\frac{ত}{ভ}$ পরিমিত

এবং শ্যামের মতে $ভ = \frac{তা}{সা}$; সুতরাং $সা = \frac{তা}{ভ}$

পরিমিত হইবে; এবং এই দুইটা সম্বন্ধকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে 'স' ও 'সা'এর যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল উহাদিগকে ১নং ও ২নং সমীকরণে স্থান দিলে উক্ত সাধারণ সূত্র দুইটা, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আকার ধারণ করিবে :—

$$তা = ঐ\left(ত - ব \times \frac{ত}{ভ}\right) = ঐ \times ত \left(১ - \frac{ব}{ভ}\right)$$

$$ত = ঐ\left(তা + ব \times \frac{তা}{ভ}\right) = ঐ \times তা \left(১ + \frac{\quad}{ভ}\right)$$

এবং ইহাদিগকে পূরণ করিয়া একত্র করিলে

$$তা \times ত = ঐ^২ \times ত \times তা \left(১ - \frac{ব^২}{ভ^২}\right)$$

অর্থাৎ $ঐ = \frac{\quad}{\left(১ - \frac{ব^২}{ভ^২}\right)^{\frac{১}{২}}}$ ·(খ)

এই সম্বন্ধটা পাওয়া যায়। সুতরাং 'ঐ'-এর মূল্য পাওয়া গেল।

দেখা যাইতেছে 'ঐ'-এর মূল্য নির্ভর করে 'ব' ও 'ভ'-এর উপরে—রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ এবং আলোকের বেগের উপরে।—'ভ' একটা নির্দ্দিষ্ট রাশি কিন্তু 'ব' ছোট বড় হইতে পারে, সুতরাং 'ব'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ'এর মূল্যও বদলাইয়া যাইবে। 'খ' সম্বন্ধটা হইতে দেখা যায় ব=০ হইলে 'ঐ'=১ পরিমিত হয় এবং 'ব' 'ভ'-এর সমান হইলে 'ঐ' অসীম হইয়া দাঁড়ায়। 'ব' 'ভ' কে ছাড়াইয়া গেলে 'ঐ' একটা কাল্পনিক সংখ্যা হইয়া পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে ১ ও ২ নং সমীকরণের 'ত' ও 'তা' রাশি দু'টাও (অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রষ্টার মতে ঘটনা দু'টার দেশের ব্যবধানও) কাল্পনিক হইয়া দাঁড়ায়। বুঝিতে হইবে, রামের জগৎ সম্পর্কে শ্যামের জগতের বেগ বা জড়ের সম্পর্কে জড়ের বেগ আলোকের বেগ অপেক্ষা বৃহত্তর হইতে পারে না। সাধারণস্থলে 'ব' শূন্য অপেক্ষা বড় এবং আলোকের বেগ অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে; ফলে, সাধারণতঃ, 'ঐ' ১ অপেক্ষা বৃহত্তর ও সসীম হইয়া থাকে।

আরও দেখা যায় যে উপরের ১নং ও ২নং সূত্র দু'টাকে একত্র করিয়া উহাদের মধ্য হইতে যথাক্রমে 'তা' ও 'ত' রাশিটাকে সরাইয়া লইলে নিম্নোক্ত সূত্র দুইটা পাওয়া যায় :—

$$সা = ঐ\left(স - \frac{ব \times ত}{ভ^২}\right) \text{..............} (৩)$$

$$স = ঐ \left(সা + \frac{ব \times তা}{ভ^২} \right) \quad \cdots\cdots\cdots (৪)$$

১ ও ২ নং সূত্র দু'টা যেরূপ এক দ্রষ্টার দেশের সহিত অপর দ্রষ্টার দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে এই সূত্র দু'টাও সেইরূপে একদ্রষ্টার কালের সহিত অপর দ্রষ্টার দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে। উক্ত চারিটা সূত্রকে নিম্নোক্তরূপে দুই জোড়ায় ভাগ করিয়া লওয়া সুবিধাজনক :—

$$\left.\begin{aligned} তা &= ঐ (ত - ব \times স) \\ সা &= ঐ \left(স - \frac{ব \times ত}{ভ^২} \right) \end{aligned}\right\} \cdots\cdots\cdots (৫)$$

$$\left.\begin{aligned} ত &= ঐ (তা + ব \times সা) \\ স &= ঐ \left(সা + \frac{ব \times তা}{ভ^২} \right) \end{aligned}\right\} \cdots\cdots\cdots (৬)$$

$$যেখানে\ ঐ = \frac{১}{\left(১ - \frac{ব^২}{ভ^২} \right)^{\frac{১}{২}}}$$

ইহাদের মধ্যে ৫নং সূত্রটা শ্যামের দেশ এবং কালের সহিত রামের দেশ ও কালের সম্বন্ধ কিরূপ এবং ৬নং সূত্রটা রামের দেশ এবং কালের সহিত শ্যামের দেশ ও কালের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাদের একটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অপরটাও আপনি সত্য হইয়া দাঁড়ায় এবং যে কোনটাকে অবলম্বন করিয়াই শ্যামের দেশ এবং কালকে রামের দেশ ও কালে অথবা রামের দেশ এবং কালকে শ্যামের দেশে ও কালে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। লোরেঞ্জ এই সূত্র দু'টার (বা সূত্রটার) আবিষ্কার করেন এজন্য ইহাকে লোরেঞ্জ রূপান্তর-সূত্র বলা যায় ; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ আইনষ্টাইনই প্রথমে নির্দ্দেশ করেন। এই সূত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দ্রষ্টার দেশবুদ্ধি অথবা কাল-বুদ্ধি অপর দ্রষ্টার দেশ-কাল সম্বলিত উভয় বুদ্ধির সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে।

যদি রাম শ্যামের আপেক্ষিক বেগটা (ব) আলোকের বেগ বা 'ভ'-এর তুলনায় নগণ্য হয়, তবে 'ঐ' = ১ পরিমিত হয় এবং ৫ ও ৬ নং সূত্র দু'টার প্রত্যেকেই নিম্নোক্ত আকার ধারণ করে

$$\left.\begin{aligned} তা &= ত - ব \times স \\ সা &= স \end{aligned}\right\} \cdots\cdots\cdots (৭)$$

দেখা যাইবে, পুরাতন যুগের দেশ ও কালের ধারণা অনুসারে, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা দু'টা সম্পর্কে রামের মাপের দেশ ও কালের সহিত শ্যামের মাপের দেশ ও কালের ইহাই সম্বন্ধ। কারণ, উক্ত ধারণার মূল কথা এই যে, ঘটনা দু'টার কালের ব্যবধান সম্বন্ধে রাম শ্যামকে একমত হইতে হইবে এবং যে 'রপ' দূরত্বটাকে রাম 'ত' পরিমিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, শ্যামের মাপেও উহা 'ত' পরিমিত, অথবা শ্যামের মাপে যে, 'শপ' দূরত্বটা 'তা' পরিমিত হইয়াছে রামের মাপেও উহা 'তা' পরিমিত হইতে হইবে ; এবং এইরূপ অনুমান করিবার অর্থ ৭নং সূত্রটাকেই, সকল ক্ষেত্রে, সত্য সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করা। আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যে ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের তুলনায় নগণ্য হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রেই কেবল পুরাতন যুগের সূত্রটা সত্য হইয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন জগতের দেশ ও কালের সম্বন্ধ নির্দ্দেশকল্পে লোরেঞ্জ সূত্রটাকেই সাধারণ সূত্ররূপে এবং পুরাতন যুগের সূত্রটাকে উহার বিশেষ আকার মাত্ররূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মের বর্ণনায়,—আপেক্ষিক বেগ সত্বেও,—বিভিন্ন জগতের দ্রষ্টাগণ পরস্পরের সহিত একমত হইতে চাহে। এই বর্ণনা প্রসঙ্গ প্রত্যেক দ্রষ্টাকেই দেশ ও কালরূপ ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পুরাতন যুগের বিশ্বাস ছিল, দ্রষ্টা ভেদে এই ভাষার আকার বদলায় না। আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত এই যে, দেশ ও কালের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন জগতের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এক জগতের ভাষাকে সহজেই অপর জগতের ভাষায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। যে নিয়মে এই রূপান্তর সাধন করিতে হইবে, লোরেঞ্জ রূপান্তরসূত্র তাহা বলিয়া দিতেছে। এইরূপে এক জগতের ভাষা

অপর জগতের দ্রষ্টা অনুবাদ করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, মূল বিষয়গুলি অথবা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সকল দ্রষ্টার কাছে একই আকারে উপস্থিত হইয়া থাকে। আলোকের বেগের দ্রষ্টা নিরপেক্ষতা এইরূপ একটা খাঁটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পুরাতন যুগে এই নিয়মটা নিয়ম বলিয়া ধরা পড়ে নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা এ যাবৎ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, দেশের, অথবা বিশেষতঃ কালের বর্ণনায়, আমাদিগকে একই ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। এই ভুল ধারণা এখন ত্যাগ করিতে হইবে এবং লোরেঞ্জ-রূপান্তর সূত্রটাকে বিভিন্ন জগতের দেশ ও কালের সম্বন্ধবাচক সত্য সম্বন্ধ রূপে স্বীকার করিয়া আপাতখাঁটি নিয়মগুলির সংশোধনের পথে এবং বাস্তবিক খাঁটি নিয়মগুলির অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

লোরেঞ্জ সূত্র হইতে আমরা সহজেই নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গুলিতে উপনীত হইতে পারি :—

(১) সংখ্যার অনপেক্ষতা—৫নং লোরেঞ্জ-সূত্রে যদি ত, = ০ এবং স = ০ বসান যায়, তবে উহার অন্তর্গত 'তা' ও 'সা' প্রত্যেকেই শূন্য পরিমিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, রাম যদি বলে, দুইটা বিশিষ্ট ঘটনার মধ্যে দেশের অথবা কালের ব্যবধান নাই, অর্থাৎ রামের মতে যদি উহারা একই স্থলের এবং সমসাময়িক ঘটনা হয়, তবে শ্যামের মতেও উহারা একই স্থলের এবং সমসাময়িক ঘটনাই হইবে—যদিও ঐ স্থলটা কোন্ স্থল এবং ঐ সময়টা কোন্ সময় এ বিষয়ে রাম শ্যামের মতভেদ থাকিতে পারে।

এখন, দু'টা ঘটনাকে অবিকল একই স্থলের এবং একই সময়ের ঘটনারূপে বর্ণনা করার অর্থ, বাস্তব জগতে উহাদিগকে একটা ঘটনারূপে অনুভব করা। সুতরাং বলিতে পারা যায়, একজন দ্রষ্টা যে সকল ঘটনার সমষ্টিকে 'একটা' ঘটনারূপে অনুভব করিতে চাহে, আপেক্ষিক বেগ সত্ত্বেও, অপর সকল দ্রষ্টাই তাহাদিগকে 'একটা' ঘটনারূপেই অনুভব করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে এই সত্যটাকে লোরেঞ্জ-সূত্র হইতে প্রাপ্ত একটা নূতন সত্যরূপে গ্রহণ করা চলে না—ইহাকে সর্ব্ববাদিসম্মত পুরাতন সত্যরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই আমরা লোরেঞ্জ-সূত্রের সম্বন্ধটা পাইয়াছি। 'রামের অভ্যর্থনা' অথবা 'প'-এর 'চক্ষুরুন্মীলন' যদি প্রত্যেকের কাছেই একটা ঘটনারূপে উপস্থিত না হইত, তবে উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া উভয় দ্রষ্টার দেশ ও কালের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভবপর হইত না। এখানে ইহাই দেখা গেল যে, লোরেঞ্জসূত্রটা ঘটনার সংখ্যার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না।

ঠিক ঐরূপে ৬নং লোরেঞ্জ-সূত্রে তা = ০ এবং সা = ০ বসাইলে 'ত' এবং 'স' প্রত্যেকেই শূন্য পরিমিত হইবে এবং ইহার অর্থ হইবে এই যে, শ্যামের মতের একই স্থলের সমসাময়িক ঘটনাগুলি রামের মতেও একই স্থলের এবং সমসাময়িক ঘটনাই হইবে। মোটের উপর, বিভিন্ন দ্রষ্টার আপেক্ষিক বেগ যত বড়ই হউক এবং ইহার ফলে ঘটনায় ঘটনায় দেশের ব্যবধান বা কালের ব্যবধান সম্বন্ধে উহারা যত ভিন্ন মতই পোষণ করুক, ঘটনার সংখ্যার বর্ণনায় উহারা সর্ব্বদাই একমত হইয়া থাকে।

(২) সমসাময়িকতার আপেক্ষিকতা : ৫নং দ্বিতীয় সূত্রে যদি স = ০ বসান যায় তবে ঐ সূত্রটা

$$সা = -ঐ \times \frac{ব}{ভ২} \times ত$$

এই আকার ধারণ করে। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ। রামের মতে যদি একজোড়া ঘটনা সমসাময়িক হয়, তবে শ্যামের মতেও যে উহারা সমসাময়িক হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। শ্যামের মতে উহারা সমসাময়িক (অর্থাৎ সা = ০) হয় যদি (ক) রাম-শ্যামের আপেক্ষিক বেগ বা 'ব' শূন্য পরিমিত হয় অর্থাৎ উহারা পরস্পর সম্পর্কে স্থির হইয়া দাঁড়ায় ; অথবা যদি (খ) ত = ০ হয়, অর্থাৎ যদি রামের মতে (এবং সুতরাং শ্যামের মতেও) ঘটনা দু'টা একই স্থলের ঘটনা হয়। দূরের ঘটনা হইলেই, আপেক্ষিক বেগের ফলে, ঘটনা দু'টার সমসাময়িকতা সম্বন্ধে রাম-শ্যামকে ভিন্নমত হইতে হইবে। ঠিক ঐরূপে ৬নং

দ্বিতীয় সূত্রে সা = ০ বসাইলে দেখা যাইবে যে, শ্যামের মতে যে ঘটনাজোড়া সমসাময়িক, রামের মাপে তাহারা অসমসাময়িক হইয়া থাকে।

মোটের উপর, একই স্থলের ঘটনাসমূহের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় মতভেদ ঘটে না, কিন্তু দূরের ঘটনা হইলেই, যে ঘটনাজোড়া দ্রষ্টাবিশেষের মতে সমসাময়িক হইবে অপর একজন দ্রষ্টার মতে তাহারা অসমসাময়িক হইবে। রাম যদি বলে যে 'ক' ঘটনাটার সঙ্গে 'খ' 'গ' 'ঘ' ঘটনাগুলি সমসাময়িক—তবে শ্যাম বলিবে যে, 'খ' 'গ' 'ঘ' নহে, 'ক' এর সঙ্গে 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' ঘটনাগুলি সমসাময়িক। অর্থাৎ দেখা যায় যে, রামের সমসাময়িকতার চিত্রটা একটা বিশিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অপরাপর যে সকল ঘটনাকে তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাজাইয়া লইবে, শ্যামের সমসাময়িকতার চিত্রপটটা উক্ত ঘটনাটাকে অঙ্গীভূত করিতে যাইয়া যেন ঘুরিয়া দাঁড়াইবে, যাহার ফলে নূতন এক শ্রেণীর ঘটনাকে উহা উহার বক্ষে স্থান দান করিতে পারে।

(৩) কালের আপেক্ষিকতা:—৫নং দ্বিতীয় সূত্রে ত = ০ এবং স = ১ঘণ্টা বসাইলে

সা = 'ঐ' ঘণ্টা

এই সম্বন্ধটা পাওয়া যায়। ইহার অর্থ এইরূপ। রাম সিদ্ধান্ত করিল যে একই স্থলে কিন্তু এক ঘণ্টা আগে-পরে দুইটা ঘটনা ঘটিয়াছে; এইরূপ অবস্থায় শ্যাম বলিবে যে, ১ঘণ্টা নহে, 'ঐ' ঘণ্টা আগে-পরে ঘটনা দু'টা ঘটিয়াছে।

ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ এই। রাম দেখিল তাহার ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা একটা বিশিষ্ট ঘর হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই ঘরে ফিরিয়া আসিল। কাঁটাটার যাত্রার আরম্ভ এবং যাত্রার শেষ, রামের মতে, একই স্থলের কিন্তু ১ ঘণ্টা আগে পরের ঘটনা; এরূপ অবস্থায় শ্যামের মাপে উহারা 'ঐ' ঘণ্টা আগে-পরের ঘটনা হইয়া দাঁড়াইবে। ইহার অর্থ এই যে, রামের ঘড়ি যে সময়টাকে একঘণ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে শ্যামের ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে সেই সময়টা 'ঐ' ঘণ্টা অর্থাৎ একঘণ্টা অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে—ঘড়ি ও ফুটরুলের মাপে, কেননা শ্যাম তাহার ঘড়ি ধরিয়া দেখিতে পাইবে যে যতক্ষণে রামের ঘড়ির কাঁটাটা একপাক * ঘুরিয়া আসিল, ততক্ষণে তাহার ঘড়ির কাঁটাটা আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং ফুটরুলের সাহায্যে মাপিয়া দেখিতে পাইবে যে, ততক্ষণে, রামের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার ঘড়ির কাঁটাটাও বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। রাম যে দুই ঘটনাকে কেবল কাল-প্রবাহে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতেছে, শ্যাম তাহাদিগকে কতকটা দেশের কোঠায় এবং কতকটা কালপ্রবাহে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে, এবং ইহারই ফলে, ঘটনার সংখ্যা সম্বন্ধে একমত হইয়াও, উহাদের কালের ব্যবধান সম্বন্ধে উভয়ে একমত হইতে পারিতেছে না। মোটের উপরে, শ্যাম বলিবে রামের ঘড়ি 'ঐ' গুণ ধীরে চলিতেছে; এবং আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের সমান হইলে (অর্থাৎ 'ঐ' = অসীম হইলে) শ্যাম বলিবে যে রামের ঘড়ি, এবং কেবল ঘড়ি কেন, রামের জগতে প্রাণের স্পন্দনমাত্রই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ঠিক একই কারণ বশতঃ—অথবা ৬নং দ্বিতীয় সূত্র হইতে উল্লিখিত প্রণালীতে দেখা যাইতে পারে—শ্যামের ঘড়ি সম্বন্ধেও রাম অবিকল একই মত প্রকাশ করিবে। প্রত্যেকেই বলিবে অপরের ঘড়ি অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের সমান হইলে প্রত্যেকে বলিবে অপর জগতের ঘড়ি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ বেগটা ছোট হউক বা বড় হউক, নিজের জগতের ঘড়িগুলির কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া কোন দ্রষ্টাই মত প্রকাশ করিবে না। আপেক্ষিক বেগটা শূন্য পরিমিত হইলে 'ঐ' = ১ পরিমিত হইবে, ঘড়ির ব্যবহার সম্বন্ধে রাম-শ্যামের মতের পার্থক্য দূর হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকে বলিবে উভয় জগতের ঘড়িই সমান দ্রুত চলিতেছে।

প্রত্যেক দ্রষ্টাই কেবল অপরের জগৎটাকেই

* এই 'পাক'টার আকার সম্বন্ধে রাম-শ্যামের মতের পার্থক্য থাকিবে।

বেগসম্পন্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু নিজের জগতের সকল স্থানগুলিকেই, নিজের সম্পর্কে, সুতরাং পরস্পর সম্পর্কে, স্থির দেখিতে পায়; ইহাই নিজের জগতের সংজ্ঞা। ফলে, নিজের জগতের বিভিন্ন স্থলের ঘড়িগুলিকে, প্রত্যেক দ্রষ্টাই, সমান দ্রুত চলিতেছে বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে।

(৪) দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা:—৫নং প্রথম সূত্রে তা = ১ ফুট এবং স = ০ বসাইলে

$$ত = \frac{১}{ঐ} ফুট$$

এই সম্বন্ধটা পাওয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, যে দুই ঘটনার মধ্যে দেশের ব্যবধান বা দূরত্বটাকে শ্যাম ১ ফুট বলিয়া নির্দ্দেশ করে রাম যদি ঐ ঘটনা দু'টাকে সমসাময়িক রূপে দেখিতে পায়, তবে রাম বলিবে উহাদের অন্তর্গত দূরত্বটা ১ ফুট নহে—১ ফুটের 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র।

ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ এই। উভয় দ্রষ্টার আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর শ্যামের জগতে একটা ফুটরুল পড়িয়া রহিয়াছে। রামের জগৎ হইতে রাম তাহার ফুটরুল-খানাকে শ্যামের ফুটরুলের সমান্তরাল ভাবে ধরিয়া রহিল এবং শ্যামের জগৎটা পাশ কাটাইয়া যাইতেই মাপিয়া দেখিল যে তাহার ফুটরুলের অন্তর্গত 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত স্থান দু'টা একই সময়ে শ্যামের ফুটরুলের দুই প্রান্ত স্পর্শ করিল। এইরূপ অবস্থায় শ্যাম অবশ্য বলিবে যে উক্ত স্পর্শরূপ ঘটনা দু'টার মধ্যে দূরত্বটা ১ফুট পরিমিত কিন্তু রাম বলিবে যে ঐ দূরত্বটা 'কখ' পরিমিত এবং $ক খ = \frac{১}{ঐ}$ ফুট; অর্থাৎ রামের মতে শ্যামের ফুটরুলের দৈর্ঘ্য, তাহার ফুটরুলের 'ঐ' ভাগের ভাগ মাত্র হইবে।

ঠিক একই কারণ-বশতঃ—অথবা ৬নং প্রথম সূত্র হইতে উক্তরূপ বিচারে দেখা যাইতে পারে—রামের ফুটরুলও শ্যামের মাপে ১ ফুটের 'ঐ' ভাগের ভাগ হইয়া দাঁড়াইবে। যতক্ষণ রাম-শ্যাম পরস্পরকে বেগসম্পন্ন দেখিবে ততক্ষণ 'ঐ' ১ অপেক্ষা বড় হইবে এবং প্রত্যেকের ফুটরুল অপর জগতের মাপে ছোট বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আপেক্ষিক বেগটা আলোকের বেগের সমান হইতে পারিলে 'ঐ' অসীম হইবে সুতরাং প্রত্যেক দ্রষ্টা দেখিবে অপরের ফুটরুল বিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়াছে। অন্যপক্ষে, আপেক্ষিক বেগটা শূন্য পরিমিত হইলে প্রত্যেকে দেখিবে অপরের ফুটরুল তাহার ফুটরুলের সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকের নিকটে প্রত্যেকের ফুটরুল বরাবর এক ফুট পরিমিতই থাকিবে কিন্তু অপর জগৎ হইতে মাপিলেই উহার উক্তরূপ সঙ্কোচন ঘটিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

ফুটরুলই হউক অথবা যে কোন পদার্থই হউক, উহার যে দিকটা আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর অবস্থিত, কেবল ঐ দিকেই উহার সঙ্কোচন ঘটিয়াছে বলিয়া অপর জগতের দ্রষ্টা মতপ্রকাশ করিবে; কিন্তু আড়ভাবে অবস্থিত উহার অপর দু'টা দিকের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে উভয় দ্রষ্টা একমত হইবে।

রামের জগৎটা, রামের দৃষ্টিতে, ফুটবলের মত গোলাকার হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্যামের দৃষ্টিতে উহা ডিম্বাকার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে অর্থাৎ শ্যাম বলিবে যে রামের জগৎটা কমলা লেবুর মত—আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর—কিঞ্চিৎ চেপ্টা; এবং ঐ বেগটা যদি আলোকের বেগের সমান হয়, তবে শ্যাম বলিবে যে, ঐ দিকে রামের জগতের দৈর্ঘ্য নাই অর্থাৎ উহা একখানা থালার মত। রামের যে ঘরটা তাহার নিকটে তিন দিকেই সমান দীর্ঘ বলিয়া বিবেচিত হইবে, শ্যামের জগৎ হইতে তাহার একটা দিক—অর্থাৎ যেটা আপেক্ষিক বেগের দিক বরাবর অবস্থিত—খাটো বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। রাম তাহার ঘরের দেওয়ালে একটা সমচতুর্ভুজ বা একটা সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলে শ্যাম দেখিবে যে, একটা বিষমবাহু চতুর্ভুজ বা একটা বিষমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কিত হইল। ফলে ইউক্লিডের জ্যামিতির সিদ্ধান্তগুলি লইয়া রাম শ্যামের পরস্পরের সহিত কারবার করা চলিবে না এ জন্য উহারা একটা নূতন জ্যামিতি গড়িয়া তুলিবার আবশ্যকতা বোধ

করিবে—একটা কারবারের জ্যামিতি বা ঘটনা-সাপেক্ষ বাস্তব জ্যামিতি, যাহার সিদ্ধান্ত গুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, কিন্তু যাহা, যে সকল দ্রষ্টা পরস্পর সম্পর্কে স্থির হইয়া রহিয়াছে তাহাদের নিকট পুরাতন আকারেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

(৫) জড়ের বেগের আপেক্ষিকতা ও আলোকের বেগের দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতা :—৬নং সূত্রের প্রথমটাকে দ্বিতীয়টা দ্বারা ভাগ করিলে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ পাওয়া যায়

$$\frac{ত}{} = \frac{তা + ব \times সা}{সা + \frac{ব \times তা}{ভ২}} = \frac{\frac{তা}{সা} + ব}{১ + \frac{ব}{ভ_২} \times \frac{তা}{সা}}$$

ইহার অর্থ এইরূপ। রাম দেখিল একটা ঢিল শ্যামের জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল এবং উহার বেগটা শ্যামের জগৎ যে দিকে ধাবমান ঐ দিকে। ঢিলটার যাত্রার আরম্ভ এবং যাত্রার শেষ রাম-শ্যাম প্রত্যেকের মতেই এক একটা বিশিষ্ট ঘটনা। এই ঘটনা দু'টার অন্তর্গত দেশ ও কালের ব্যবধান, রামের মাপে দাঁড়াইয়াছে 'ত' ও 'স' এবং শ্যামের মাপে 'তা' ও 'সা' পরিমিত। সুতরাং ঢিলের বেগটাকে যদি রাম-শ্যাম যথাক্রমে 'প' ও 'পা' দ্বারা নির্দ্দেশ করে তবে $প = \frac{ত}{স}$ এবং $প = \frac{তা}{সা}$ পরিমিত হইবে ; ফলে উপরের সম্বন্ধটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করিবে—

$$= \frac{পা + ব}{১ + \frac{ব}{ভ২} \times পা} \quad \cdot(৮)$$

আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে, ঢিলের বেগ সম্বন্ধে, রামের পরিমাপের ফলের সহিত শ্যামের পরিমাপের ফলের ইহাই সম্বন্ধ। ৫নং সূত্রের প্রথমটাকে দ্বিতীয়টা দ্বারা ভাগ করিলেও ঠিক এই সম্বন্ধটাই পাওয়া যাইবে। দেখা যাইতেছে, এই সম্বন্ধটা পুরাতন যুগের সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন। পুরাতন যুগের দেশ ও কালের ধারণা অনুসারে শ্যাম বলিবে যে, রামের নিকট হইতে আমি 'ব' বেগে দূরে সরিয়া যাইতেছি এবং এইরূপ অবস্থায় ঢিলটাকে 'পা' বেগে, ঐ দিকেই ছুটিতে দেখিতেছি ; সুতরাং রামের মাপে ঢিলটার বেগ (পা + ব) পরিমিত হওয়া উচিত। রামও শ্যামের কথাই মানিয়া লইবে এবং প্রত্যেকেই বলিবে 'প' ও 'পা' এর মধ্যে

$$প = পা + ব \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (৯)$$

এই সম্বন্ধটা খাটিবে।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, সাধারণ ক্ষেত্রে রামের মতে ঢিলটার বেগ (পা + ব) অপেক্ষা কিছু ছোট হইয়া থাকে এবং 'ব' যখন 'ভ' এর তুলনায় নগণ্য হয় তখনই কেবল $\left(\frac{ব}{ভ২} \times পা\right)$ রাশিটা শূন্য পরিমিত হইয়া নূতন ও পুরাতন মতের সম্বন্ধ দুটা একই আকার ধারণ করে।

আরও দেখা যায় যে, যদি শ্যামের মাপে ঢিলটার বেগ (বা 'পা') আলোকের বেগের সমান হয় তবে ৮নং সূত্রটা নিম্নোক্ত আকার ধারণ করে

$$= \frac{ভ + ব}{১ + \quad \times ভ} = \frac{ভ + ব}{১ + \frac{ব}{ভ}} = ভ$$

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে রামের মাপেও ঢিলটার বেগ 'ভ' পরিমিতিই হইয়া থাকে—উহা 'ভ'কে ছাড়াইয়া যায় না। আবার ঐ সূত্রে রামের মাপের 'প' স্থানে 'ভ' বসাইলে দেখা যাইবে যে শ্যামের মাপের 'পা' রাশিটাও ঠিক 'ভ' এর সমান হইয়া থাকে। মোটের উপর, এক জগতের মাপে ঢিলটার বেগ যদি আলোকের বেগের সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে তবে অপর জগতের মাপেও উহা আলোকের বেগের সমানই হইবে। কোন জড় দ্রব্যের বেগই, কোনও জগতের মাপেই, আলোকের বেগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না ; এবং দ্রষ্টা বিশেষের নিকটে যদি কোনও জড়-দ্রব্যের বেগ আলোকের বেগের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায় তবে সকল দ্রষ্টাই বলিবে ঐ বেগটা আলোকের বেগের সমান। পুরাতন যুগের ৯নং

---

* দেখা যাইবে, পুরাতন যুগের ৭নং সূত্রের প্রথমটাকে দ্বিতীয়টা দ্বারা ভাগ করিলে ঠিক এই সম্বন্ধটাই পাওয়া যায়।

সূত্রটা স্বীকার করিলে আলোকের বেগ দ্রষ্টাভেদে বদলাইয়া যাইবে কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের ৮নং সূত্রটা স্বীকার করিলে ঐ পার্থক্য দূর হইয়া যাইবে। অবশ্য এইরূপ হওয়াটা আশ্চর্য্যে বিষয় নহে, কারণ আলোকের বেগের এই দ্রষ্টা-নিরপেক্ষতার উপরেই লোরেঞ্জ সূত্র প্রতিষ্ঠিত। এই উদাহরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে আলোকের বেগের পরিমাণটারই কেবল নিরপেক্ষতার দাবী রহিয়াছে —ঐ পরিমাণটা আলোকের বেগের হউক বা ঢিলের বেগের হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না।

অধিকাংশ স্থলেই 'ব'-এর ন্যায় 'প' ও 'পা' রাশি দু'টাও 'ভ'-এর তুলনায় নগণ্য হইয়া থাকে ; ফলে ৮নং সূত্রের $\left(\frac{ব}{ভ২} পা\right)$ রাশিটা প্রায় শূন্য পরিমিত হইয়া ঐ সূত্রটা সর্ব্বত্রই প্রায় ৯নং সূত্রের আকার ধারণ করে। সুতরাং এই দুইটা সূত্রের মধ্যে কোন্‌টা সত্য সাধারণ ধরণের পরীক্ষা হইতে তাহা নিরূপণ করা চলে না। ইহার জন্য হয় খুব সূক্ষ্ম মাপজোখের ব্যবস্থা করিতে হয় অথবা কোন্ কোন্ অবস্থায় 'প' কিংবা 'পা' 'ভ'-এর প্রায় সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। মিকল্‌সনের পরীক্ষায় আমরা এইরূপ সূক্ষ্ম মাপজোখের পরিচয় পাই এবং এই পরীক্ষাটা, অমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, পুরাতন যুগের ৯নং সূত্রটার সমর্থন করে না।

'প' কিংবা 'পা'-এর পক্ষে 'ভ'-এর প্রায় সমান সমান হওয়ার একটা উদাহরণ এইরূপ। শ্যামের জগৎটা একটা নদী হইতে পারে, রামের জগৎটা উহার তীর হইতে পারে, উভয় তীরের মধ্য দিয়া শ্যামের জগৎটা 'ব' বেগে ছুটিতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত ঢিলটা, নদীমধ্যে ধাবমান একটা আলোকরশ্মি হইতে পারে। এখন 'প' ও 'পা'-এর অর্থ হইবে, তীরসম্পর্কে ও নদীসম্পর্কে জলমধ্যস্থ আলোকরশ্মির বেগ। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ রাশি দু'টাকে 'ভ' হইতে ভিন্ন এবং উহার প্রায় সমকক্ষ হইতে দেখা যায় এবং মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাদের মধ্যে আপেক্ষিকতাবাদের ৮নং সম্বন্ধটাই সত্য হইয়া দাঁড়ায়, পুরাতন মতের ৯নং সূত্রটা খাটে না। ফিজো সাহেব এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহা মিকল্‌সনের পরীক্ষার পূর্ব্বের ঘটনা। আইন্‌ষ্টাইন বলেন, কেবল মিকল্‌সনের পরীক্ষা নহে, ফিজোর পরীক্ষাটাও পরোক্ষভাবে আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রথ-যাত্রা

"জয় জয় জয় জগন্নাথের জয়"—
অযুত যাত্রী আর্ত্ত-কণ্ঠে ডাকিতেছে সবিনয়।
নাহি জাতি-ভেদ নাহি ছোট-বড় নাহি কোনো
দলাদলি,
শুচি কি অশুচি দ্বিজ-চণ্ডাল দাঁড়ায়েছে গলাগলি ;
সতী ও অসতী, ধনী নির্ধন, মূর্খ ও পণ্ডিতে
জগন্নাথের নয়ন-পাতের মহিমায় চৌভিতে
হয়ে গেছে একাকার—
সমন্বয়ের পুরুষোত্তমে কি করুণা দেবতার !
মানুষের দাবি পেয়েছে মানুষ আজি যে সহজে অতি—
দারুব্রহ্মের মহাসামগীতা জগতে নরের প্রতি।

"জয় নারায়ণ, জয় জয় বলরাম,
জয় সুভদ্রা, জগন্নাথের জয়"—ধ্বনি অবিরাম।
হাঁকিছে যাত্রী রথের রজ্জু টানি টানি প্রাণপণ—
চলেনাক' রথ, নারায়ণ যেন উদাসীন আন্‌মন !
বিশ্বম্ভরে ধরিয়া ধরায় বামন রূপেতে নর,
অভিমান তব চালাবে তাঁহার শকট ধরণী'পর ?
এ যে বিস্ময় বড়—
আপনি যে তুমি বহু ভার তব পিছনে করেছ জড়ো !
নারায়ণে তুমি চাহিছ' তুষিতে নরগণে ঘৃণা করি—
মানুষের চির নারায়ণ তাই হাসিছেন রথোপরি।

"জয় জয় জয় জগন্নাথের জয়—"
মিলিত-হাজার-কণ্ঠে যাত্রী কাঁপাইছে দিক্‌চয়।
জগৎ ত্যজিয়া জপিছে তোমায় যে সব ভ্রান্ত জন
বুঝাও তাদেরে—জগতের তুমি, মানুষের প্রাণধন!

সামাল—সামাল—পড়ে গেল সাড়া হঠাৎ অকস্মাৎ,
বিনা-টানে চলে ঠাকুরের রথ, এ কি এ জগন্নাথ?
অই দেখ' নিরখিয়া—
চলে নয়নাথ রথ-পুরোভাগে পথ সম্মার্জ্জিয়া।
জন-গণ-মন-বামন-চরণে নত অভিমান-বলি—
জগন্নাথের জয়-রথ যায় রাজার মুকুট দলি!

"জয় জয় জয় জগন্নাথের জয়—
ওগো মানবের দীনের দেবতা, দরিদ্র দারুময়!"
যাত্রী-জনতা ডাকিল যেমনি ঠাকুরের ঠিক-নামে
ঘুরিল অমনি রথের চক্র, আর তাহা নাহি থামে।
নরের সারথি হয়েছিলা যেই কুরুক্ষেত্র-রণে,
অক্রূর যাঁরে তুলেছিল রথে এমনি বৃন্দাবনে,
আজো তাঁর সেই রথ—
দেখাতে মানুষে জগতে তাহার চলিবার রাজ-পথ।
মাথার উপর আষাঢ় প্রথম নিবিড় জলদ-জালে,
অদূরে সিন্ধু পঠিছে নান্দী, ভৈরব নব-তালে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান—আষাঢ়।

পরমায়ুর বৃদ্ধি এবং হ্রাস—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী। পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন রূপ সাধনার প্রয়োজন। আধিভৌতিক অথবা শারীর ধর্ম্ম পালন, যথা—হিতকর পরিমিত ভোজন প্রভৃতি; আধিদৈবিক—দেবতার পূজা ও উপাসনা প্রভৃতি এবং আধ্যাত্মিক প্রাণায়ামাদি।

সার্জ্জন সুশ্রুত—শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়। এ সংখ্যায় অস্ত্রচিকিৎসার উৎপত্তি, সুশ্রুতের আবির্ভাব-কাল ও অস্ত্রচিকিৎসার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচিত হইয়াছে।

পেটের অসুখের চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন। ভালই চলিতেছে।

জলের ব্যবহার—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ সেন। লেখক বলিতে-ছেন যে চায়ের মত সোডা, লেমনেড, বরফ জল এবং সরবৎ পান বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির একটি কারণ। গুরুভোজনের পর এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা অম্লপিত্তের রোগীর পক্ষে সোডার জল পান নিশ্চয়ই উচিত নহে—উহাতে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। উপরন্তু "সোডা ওয়াটার"এর সহিত অম্লনিবারক "সোডা"র কোনও সংস্রব নাই। কারণ "সোডা ওয়াটার" শুধু জলে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস ভরিয়া প্রস্তুত হয়।

ত্রিদোষতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। আলোচ্য সংখ্যায় পিত্তের নানাবিধ ক্রিয়াদি বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষুর পাকা রোগ—শ্রীযুক্ত অসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। গরুর উক্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা। আমাদের দেশে এই রোগে অনেক গরু মারা যায়। আমরা গরুগুলিকে অপরিষ্কার কর্দ্দমাক্ত স্থানে প্রায় সমস্ত দিন বাঁধিয়া রাখি বলিয়া তাহাদের এই রোগ হয়।

চিকিৎসকের রোজনামচা—কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকনাথ সেন। দুইটী রাজযক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা লেখক বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্যসমাচার—আষাঢ়।

ভাত—ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়। ধান ও চাউল সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় তথ্য। "গমের" (লেখক বোধ হয় আটার কথা বলিতে-ছেন) "সঙ্গে সামান্য পরিমাণে কুঁড়ো মিশ্রিত করিয়া রুটি ও লুচি খাইয়া দেখিয়াছি—তাহাতে ঐ রুটির একটি সুন্দর স্বাদ ও গন্ধ বাহির হয়, উহাতে ময়ান দিবার প্রয়োজন হয় না এবং উহাতে সুন্দর কোষ্ঠ-শুদ্ধি হয়।" পাঠকগণের পরীক্ষা করা উচিত। আমরা ধানের অনেক অপব্যয় করি। তুষটা জ্বালানিরূপে ব্যবহার করিলে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়। তুষকে সামান্য ভাজিয়া মিহি গুঁড়া করিয়া কাপড়ের পুঁটুলির ভিতরে ভরিয়া ক্ষতের উপর বাঁধিয়া দিলে ড্রেস করিবার কাপড় বাঁচিয়া যায়। কুঁড়োতে চাউলের স্নেহজাতীয় পদার্থটি থাকে,

আমরা উহা ফেলিয়া দিই। আঁকাড়া চাউলের ভাত, ভাতের সহিত ঘৃতের কার্য্য করে। আঁকাড়া চাউল দরে সস্তা, দমে ভারী ও স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম হিতকর। অভ্যাস করিলেই ঐ চাউল সুমিষ্ট বোধ হয়। খাদ্যহিসাবে কলে মাজা চাউল অত্যন্ত নিরেস হইয়া পড়ে। তাহার উপর এই রকম চাউলকে সিদ্ধ করিয়া তাহার ফেনটি আমরা ফেলিয়া দিই। পয়সা দিয়া রোগীকে সাগু বার্লি না খাওয়াইয়া ফেন খাওয়াইলে সমান কায হয়।

শিশুর পরিচর্য্যা রোগে। এই সংখ্যায় শিশুদের নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ ও পরিচর্য্যা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যহীনতার একটি কারণ। রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য দেশময় যে বাঁধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে দেশ স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। দেশমধ্যে নদ নদীর জল অবাধে যাওয়া আসা বন্ধ হওয়াতে চাষের অবনতি ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ বন্যাপ্লাবিত দেশগুলি স্বাস্থ্যদায়ক হইয়া থাকে। যে সকল গ্রামের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করিত তাহা দেশের সমস্ত আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদক মশকের ডিম প্রভৃতির ধ্বংসসাধন করিত। যে সকল স্থানে বাঁধ দ্বারা জলের গতি রোধ করা হইয়াছে, তাহা ম্যালেরিয়া রোগের আকর হইয়া উঠিয়াছে। তাম্লোর, রাজামন্দী, নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলাতে, সারা পুল, সারা সিরাজগঞ্জ রেল ও কাটোয়া সাহেব-গঞ্জ রেল নির্ম্মিত হইবার পর হইতেই ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে।

বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা—ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু। আকাঁড়া চাউলই প্রকৃত সারবান খাদ্য। সরু ধানের আকাঁড়া চাউল তৈয়ারী করাইয়া প্রথমে খাইবার অভ্যাস করিতে হইবে, তাহার পর মোটা ধানের চাউল চলিতে পারিবে। আতপ চাউলও কাঁড়া চাউল অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। ইহাও খাইবার অভ্যাস করা উচিত।

ক্ষয়রোগের সূত্রপাত নির্দ্ধারণের আবশ্যকতা। ক্ষয়রোগ নিবার্য্য ব্যাধি। দুঃখের বিষয়, সূত্রপাতেই এই রোগ ধরা পড়ে না বলিয়া বহুলোক এই রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। তরুণ অবস্থায় ক্ষয়রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হইলে রোগী নির্দ্দোষভাবে নিরাময় হইতে পারে।

বাঙ্গালার জল সমস্যা। নলকূপ প্রস্তুত প্রণালী—ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আষাঢ় মাসের স্বাস্থ্যসমাচার পড়িয়া আমরা প্রচুর জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

সাহিত্য

প্রবাসী—আষাঢ়।

রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসু। লেখক ও ডাক্তার সরসীলাল সরকার রবীন্দ্রনাথের সহিত Psycho-analysis, mysticism ও সাধকের জ্যোতিঃ দর্শন সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহারই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ Freud এর মত sex-instinctকেই গোড়ার কথা বলিতে চান না; তিনি বলেন sex-instinctএর মূলে self-assertion এবং self-preservation ও self propagation এই দুইটি self-assertion এর অন্যতম বিকাশ। কথাটা সুস্পষ্ট নয়। আমাদের মনে হয় Freudএর পক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে। "মানুষ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই অহংজ্ঞান (Ego consciousness) নিয়ে জন্মেছে একথাও নিঃসন্দেহে সমর্থন করা চলে না।" মানুষ অহং লইয়া জন্মিতে পারে কিন্তু অহংজ্ঞানটা কিছুকাল পরেই হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাই হোক্ আমরা এ আলোচনায় তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। Freud এর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশদ আলোচনা প্রকাশিত না হইলে এই প্রবন্ধ আমাদের অন্তরে যে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার খণ্ডন হইবে না।

আফগান আমীরের য়ুরোপ ভ্রমণ—শ্রীযুক্ত প্রভাত সান্যাল। রচনাটি চিত্তাকর্ষক। লেখক সংক্ষেপে এই ভ্রমণের রাজনৈতিক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা চিত্রসহযোগে হওয়ায় সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

সম্পাদকের চিঠি—রচনা সরল, সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

অন্তর্লোক যাত্রা—রম্যা রলাঁ। ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সুন্দর সুপাঠ্য রচনা, দর্শন ও কাব্য সমন্বিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাণিজ্যসহায় চিত্রশিল্প—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। লেখক বাণিজ্য-সহায় চিত্রশিল্প বা Commercial art যাহার বিকাশ আধুনিক বিজ্ঞাপনের ছবিতে বিশেষরূপে লক্ষিত হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে ইহার প্রয়োজনীয়তাও বর্ণিত হইয়াছে। এই শিল্পের আলোচনার দ্বারা বর্ত্তমান অন্নসমস্যারও কিছু-না-কিছু সমাধান হইতে পারে। আলোচনা আরও বিশদ হওয়া উচিত।

খদ্দরের কথা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

শ্রীমতী গুহজায়া এই প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত করিয়া প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছেন। চরকা ও খদ্দর বিহারবাসীর পক্ষে কতটা হিতকর তাহাই এই প্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে। প্রবন্ধ সাময়িক ও বিবেচ্য। অর্থনীতি হিসাবে চরকার আয় এত কম যে উহাতে শ্রম করা পণ্ডশ্রম মাত্র; লেখক দেখাইয়াছেন বিহারের কৃষক কার্য্যের অবসরে চরকা কাটিয়া বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিতে পারে। খদ্দর প্রচারের আবশ্যকতাও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সাময়িক প্রসঙ্গ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

স্বরাজের যোগ্যতা—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ক্রমশঃ

প্রকাশিত হইতেছে। লেখকের যুক্তি ও বিষয়ের সারবত্তা পাঠক সহজেই লক্ষ্য করিবেন।

যবদ্বীপের পথে—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতেছে। বিষয় সুপাঠ্য।

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ

বিলাতের স্মৃতি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেশের কথা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের প্রকৃতির তুলনামূলক বিচার সুখপাঠ্য। সর্ব্বত্র অনন্যসুলভ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সমাজনীতি, রাজনীতি ও মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে কবির কথাগুলি হৃদয়গ্রাহী। প্রবন্ধের সারবত্তা সকলেই উপলব্ধি করিবেন।

সংস্কৃত সাহিত্য—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। বর্ণনাংশ দীর্ঘ—বাজে কথার অন্ত নাই। মালবিকার চিত্র কালিদাসের নিপুণ তুলিকাস্পর্শে যেরূপ ফুটিয়াছে, রাশি রাশি শব্দের প্রয়োগ করিয়াও লেখক তেমনটি দেখাইতে পারেন নাই। রচনা একঘেয়ে—সূক্ষ্মবিচার কোথাও লক্ষিত হয় না।

বাঁধে সর্ব্বনাশ—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিলে মনে হয় বাঁধের অপকারিতাই ইহার আলোচ্য বিষয়। লেখক কিন্তু নাইলের বাঁধের উপকারিতা, তাহার নির্ম্মাণকৌশল ও ভাগীরথী একটা কাটা খাল কি না এই সকল বিষয়ই আলোচনা করিয়াছেন। যাই হোক্ বিষয়টি চিত্তাকর্ষক।

শিলং—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ। বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও রচনাটি যাঁহারা বাহিরের খবর বেশী রাখিতে পারেন নাই তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবে। রচনায় কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

আশা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন চৌধুরী। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা আশাকে অন্তরে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও প্রবন্ধে শুধু আশার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে এবং যদিও ইহাতে লেখকের নিজস্ব খুবই কম, তবুও এ সব আলোচনা সময়োপযোগী এবং ইহার আবশ্যকতাও সকলেই উপলব্ধি করিবেন।

আলালের ঘরের দুলাল—শ্রীযুক্ত নীরবিন্দু মিত্র। প্যারিচাঁদ মিত্রের গ্রন্থ ও রচনারীতির আলোচনা এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন নূতনত্ব নাই, তবে একখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা একস্থানে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহা অনেকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষাল। লেখক বলিতে চান্ বাঙ্গালা সাহিত্যে কয়েকটি এমন জিনিষ দেখা দিয়াছে যাহা বিদেশের আমদানী। শ্রমিকের বেদনা, ধর্ম্মের অপ্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রী-পুরুষের মিলনের স্বাধীনতা য়ুরোপের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এ দেশেও এই সাহিত্য তরুণ বাংলার মনকে আলোড়িত করিতে ছাড়ে নাই। লেখক বলেন য়ুরোপীয় আদর্শকে অনুসরণ করিবার সময় আমাদের দেশে এখনও আসে নাই। আলোচনা সুন্দর ও সাময়িক।

তাজমহল—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। তাজমহল সম্বন্ধে লেখক এই সংখ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহা হৃদয়গ্রাহী। শিল্পীর বিবরণও কিছু আছে। ভাষা ও বর্ণনভঙ্গী সুন্দর।

অভিভাষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের পক্ষে হিন্দুর শুদ্ধি ও সংগঠন সম্বন্ধে এরূপ স্বাধীন মতামত প্রকাশ বোধ হয় এই প্রথম। লেখক বলেন "প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া হিন্দুভাবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার পথে প্রাচীন হিন্দু কখনও বাধা দেয় নাই। শুদ্ধির ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে চিরকালই আছে।" লেখক পুরাণাদি হইতে অনেক প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন।

উচ্চজাতির মধ্যেও অনেক অনাচার আছে। লেখক বলেন, "হিন্দু সভায় ভারতব্যাপী শুদ্ধি আন্দোলন অগ্রে নীচজাতির জন্য না হইয়া উচ্চতর জাতির জন্যই হওয়া উচিত।" তাঁহার মতে হিন্দুজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি আদর ও ভালবাসা বর্দ্ধিত করাই হিন্দুসভার প্রধান কর্ত্তব্য। শুধু সংঘশক্তির দুর্দ্ধর্ষ আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া কায করিলে চলিবে না। আস্তিক সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক নেতা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে নেতৃত্বের পদ হইতে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুসমাজের উন্নতি সাধন করা লেখকের মতে অসাধ্য।

প্রবন্ধে যে সংযম, সত্য ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরই উপযুক্ত। এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

প্রাচ্যে নারীজাগরণ—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু। প্রাচ্যে নারী-জাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। বিষয় সাময়িক ও চিত্তাকর্ষক।

বিচিত্রা—আষাঢ়।

তেল আর আলো—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সুচিন্তিত সুলিখিত সওয়া-দুইপৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে চিন্তার খোরাক যথেষ্ট আছে। দুই একটী কথা লেখকের ভাষায় উদ্ধৃত করিলাম :— (১) স্ত্রীপুরুষের ভালবাসাকে মানুষ শুধু তেলের কোঠায় স্থূল করে রাখেনি—তা'কে আলো করে তুলেছে—সৌন্দর্য্যে সংযমে নিষ্ঠায় ত্যাগে সেই আলোর শিখা স্বর্গলোককে উদ্ভাসিত করছে। এই আলোটি যেখানে জ্বলে না সেখানে মানুষের লজ্জার শেষ নেই। (২) হৃদয়ের আবেগকে বাইরে আশু প্রকাশ করার মানুষের একটা গরজ আছে। সেই প্রকাশের মধ্যে যতক্ষণ কেবলমাত্র সেই গরজটুকু দেখা দেয় সেটা মানুষের

পক্ষে বড় জিনিষ নয়; * * * কিন্তু যখনি মানুষ এই সমস্ত হৃদয়াবেগকে তেলের মত ক'রে নিয়ে তাকে ছন্দে সুরে রূপে রেখায় আলো করে জ্বালিয়েছে, তখনই সেটা সঙ্গীত হ'য়ে শিল্প হ'য়ে সাহিত্য হ'য়ে অমৃতত্ব লাভ করেচে। (৩) মানুষও স্বভাবত সৃজনকর্ত্তা। এই জন্যে তার যে কোনো ব্যাপারেই যেখানে অভাব ভাবকে অতিক্রম করে সেইখানেই সে পর্দ্দা টেনে দিতে চায়। মানুষের সত্যকার আব্রু হচ্চে তার সৃজন দ্বারা বস্তুকে ঢেকে দেওয়া।

ভানুসিংহের পত্রাবলী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবারে মাত্র এক খানি পত্র বাহির হইয়াছে। জানিবার বিশেষ কিছুই নাই। এবারে ইহা সমাপ্ত হইল।

পথে প্রবাসে—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। এই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ভ্রমণ কাহিনীতে এবার ভ্রমণের মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত কিছু নাই—আছে লেখকের ভাব-রাজ্যের পরিচয়—পাশ্চাত্য জগতে নর-নারীর মিলননীতি, প্রেম, ভক্তি, ডিভোর্স, (বিবাহচ্ছেদ,) পুনর্বিবাহ, স্ত্রীপুরুষের সখ্য, বহুবিবাহ প্রচলন ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের স্বাধীন মত।

রক্তকরবী—শ্রীনবেন্দু বসু। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর আলোচনা বহু লোকেই করিয়াছেন। ক্রমশঃ দেখিতেছি গীতার নানাবিধ ভাষ্যের ন্যায় রক্তকরবীরও ভাষ্যও অসংখ্য হইবে। লেখকের মতে 'নাটকের মূল বিষয়টি নিহিত থাকে একটা বিরোধ-জনিত দ্বন্দ্বের ভিতর। নাটকের ভিতর দিয়ে এই বিরোধ গত দ্বন্দ্বটির উত্থান পতন ঘটে, এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত ঘটনা বা প্লট উঠতে নামতে থাকে।' সাধারণতঃ নাটক পঞ্চাঙ্কেরই হয়; অধুনা একাঙ্ক নাটকের আরম্ভ হইয়াছে। লেখকের মতে 'পঞ্চাঙ্ক নাটকে যেখানে তৃতীয় বা চতুর্থ অঙ্কে নাটকের চরম ঘটনাটি ঘটে, একাঙ্ক নাটকে সেইখান থেকেই পালা আরম্ভ হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আর পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনা ঐ একটি অঙ্কেই সঙ্কুচিত ক'রে দেখান হয়।' প্রবন্ধ-লেখক এই দিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বক্তব্য বিষয় আরও অল্প-পরিসরের ভিতর বলিতে পারিলে রস জমিতে পারিত। আলোচনা বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত, জানিবার বিশেষ কিছুই নাই।

টলষ্টয়ের জীবনের একটী দিন—শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন। Living Age পত্রে Stefan Zweig লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ। এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে অল্প-পরিসরের ভিতর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র-চিত্রণ কিরূপে করিতে পারা যায় তাহা জানা যায়। মানুষের কার্য্যাবলী দেখিয়া তাহার বৈশিষ্ট্যকে ধরাও যেমন চাই—সরল ভাষায় তাহা প্রকাশ করাও তেমনই প্রয়োজন। টলষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য লেখক সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের অনুবাদ বেশ ভালই হইয়াছে—মনে হয় না কোনও অনূদিত প্রবন্ধ পড়িতেছি।

নারী—শ্রীমতী আশালতা দেবী। লেখিকা সওয়া তিন পৃষ্ঠার ভিতর নারী সম্বন্ধে প্রবাসী পত্রিকায় যে আলোচনা বাহির হইয়াছিল ও রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার আলেচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যের ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেন নাই—লেখিকা বলিতে চান, 'নারী যে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে তার অস্তিত্বের মাধুর্য্যকে নিরন্তর ব্যক্ত করতে চাইছে, পুরুষের মনোবৃত্তির কাছে এইটে কি কম প্রাপ্তি?' এ কথা কে অস্বীকার করে? নারীর Coquetry সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের মতপার্থক্য নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, 'নারী-লাবণ্যে' পুরুষের চিন্তাশক্তি এবং কর্ম্মশক্তি দ্বিগুণতর হইয়া উঠে, এবং (যখন তিনি বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৈঠকে আসিয়া আলাপ আলোচনায় যোগদান করেন) তখন 'আলাপ আলোচনা আরও নিবিড় হবার অবকাশ পায়।' ইহা আমরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। কথাটাও তিনি বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই, কারণ তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে 'অথচ ব্যাপারটা ঠিক যে তাই তা নয়।' এ মতের বিপক্ষে অনেকেই বলিয়াছেন। সে দিন ভারতবর্ষ পত্রিকায় ভ্রাম্যমানের জল্পনার একস্থলে পাদটীকায় ওয়েল্‌সের কয়েকটি ছত্র এইরূপ আছে—"The fatal delusion that a woman can be the crown of a man's life, his incentive to action, his inspiration, has to be cleaned out of the mind altogether." আলোচ্য প্রবন্ধে ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য ধারা অনুসৃত হয় নাই—ভাবের বিবৃতি এলোমেলো হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন, 'পরস্পরের কাছে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম এবং চেষ্টা করেও নিজেকে মধুর করে প্রকাশ করবার কামনা এইটেই পুরুষের ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত এবং উদ্বোধিত করে এবং নারীকেও বিশেষ তৃপ্তি দেয়।' ইহা মানি। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য 'artistic temperament যদি traditional moralityর স্থান গ্রহণ করে তা হ'লে মানসিক রাজ্যে ফল আরও ভাল হয়।' এ কথার কোনও যুক্তি নাই। Artistic temperamentএর সংজ্ঞা নির্দ্দেশও তিনি করেন নাই। এই যুক্তির যুগে তাঁহার ফাঁকা কথায় কে আস্থা স্থাপন করিবে? প্রবন্ধলেখিকা তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সংযমের উপকারিতা তিনি বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—'পরস্পরকে সংযম এবং সঙ্গতিজ্ঞান সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করতে হবে।' অন্যত্র বলিয়াছেন—'আবেগ জিনিষটা ভালো, কিন্তু সংযত আবেগ তার চেয়েও ভালো।'

চাহার মামলা—মৌঃ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। চাহার মামলা' গ্রন্থের লেখক সুকবি নিজামী উরুজী সমরকন্দী, ওমর খায়েমের সমসাময়িক ছিলেন, ওমরের সমাধিস্থল দেখিয়া তাহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের সহিত ওমর খায়েমের কবরের চিত্র আছে।

অতি আধুনিকের বার্ত্তা—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত। এই সুচিন্তিত

প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন—'অতি আধুনিক যুগে আমরা আমাদের প্রকৃতির অধমস্তরে রসাতলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছি—সেখানকার যত অজ্ঞাত লুক্কায়িত সত্যের শক্তির পরিচয় গ্রহণ করিতেছি।' কথাটা খুবই খাঁটি। বাস্তবিকই অতি আধুনিক লেখকেরা মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া মানবপ্রকৃতির উচ্চ প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন না করিয়া প্রকৃতির অধমস্তরের চিত্রই অঙ্কিত করিতেছে। যাহা ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে—যাহা নীচ পশুচরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য তাহাই সাধারণ মানবের বৈশিষ্ট্য বলিয়া অঙ্কিত হইতেছে।

বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ—শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত। বিশ্লেষণাত্মক রচনা। বর্ণনভঙ্গী চিত্তগ্রাহী। রবীন্দ্রনাথের ভাবের ধারা নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান—শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য। হুইট্‌ম্যানের বৈশিষ্ট্য অল্পকথায় বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাহিত্য ও আর্ট—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল। ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনে ও নববর্ষোৎসবে পঠিত। আলোচ্য প্রবন্ধে নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু নাই। পাশ্চাত্য মনীষীদের বক্তব্য যাহা পূর্ব্বে বহুবার আলোচিত হইয়াছে তাহাই ইহাতে আছে, তবুও এরূপ প্রবন্ধের উপযোগিতা আছে। ভাল কথার আলোচনা যতই অধিক হয় ততই লাভ। লেখক দেখাইয়াছেন—'পাওয়ার ভিতর না পাওয়ার সন্ধান—একটা অনন্ত চিরন্তনের ইঙ্গিতে' আসলে আর্ট দেখা যায়।' 'বাস্তব জগৎ সত্য। প্রকৃতি সত্য। আর্ট তার পরিপন্থী নয়। সে বরং বাস্তবকে আরো সুন্দর, আরো সম্পূর্ণতর ক'রে তোলে।' অন্যত্র লেখক বলিয়াছেন, 'যে সাহিত্য মানুষের উচ্চতম প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে—প্রকৃত আনন্দ দিবার অধিকার তারই।' পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে অস্বাস্থ্যকর হাওয়া এদেশে আসিয়াছে তার উপর তিনি খড়্গহস্ত। তিনি সত্যই বলিয়াছেন, —'তরুণ সাহিত্যিকেরা আর যাই করুন, 'কুৎসিতই' চরম সত্য এই মতবাদের উপর নিজেদের সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করবেন না। ভিতে গলদ থাকলে প্রকাণ্ড সৌধও ভূমিসাৎ হয়ে পড়ে।'

বিবিধ-সংগ্রহে শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত 'ভূপালে'র বিবরণ মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। প্রবন্ধটী সচিত্র। এত অল্পে তৃপ্ত হওয়া যায় না।

চীনে হিন্দুসাহিত্য—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য প্রবন্ধ। পূর্ব্বের মতই বহু জ্ঞাতব্য উপকরণ সম্ভারে সমৃদ্ধ।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

শিক্ষা-বিস্তারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্বের মতই জ্ঞাতব্য-তথ্য-বহুল প্রবন্ধ। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এদেশের শিক্ষা-বিস্তারকল্পে কিরূপ চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তুক-গীতি—শ্রীযুক্ত শিবতরন মিত্র। এবারে 'দান-লীলা' সম্বন্ধে বহু গীতাদি সহ আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের প্রসাদে আমরা বহু তুক-গীতি রচয়িতার সন্ধান পাইতেছি। ইঁহাদিগকে বিখ্যাত পদাবলীর ভাষ্যকার বলা যায়।

বিশ্ব সাহিত্য—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এবারে রুশিয়ার প্রসিদ্ধ মনীষী ডষ্টয়েভেস্কীর জীবন-কথা বিবৃত হইয়াছে। 'জাতির অন্তস্তলের রসশোষণ' করিতে না পারিলে কোন সাহিত্যেরই বিকাশলাভ হয় না, তাই যখন নির্ব্বাসিত ডষ্টয়েভেস্কি সাইবেরিয়ার কারাবাসে জাতির অন্তস্তলের সন্ধান পাইলেন তখন হইতেই তাঁহার সাহিত্য অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। 'সাইবেরিয়ার সেই তুহিনের দেশে আরণ্যক ঋষির মত তিনি মহৎ ভাবের শিখার স্পর্শে প্রত্যক্ষভাবে পাপী, তাপী, নির্য্যাতিত মানবের বুকে মন্দার সৌরভ জাগাইয়া তুলিলেন।'

এবারের ভ্রমণ কাহিনীগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক ও বহুল-তথ্যপূর্ণ। এগুলির ভিতর আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসুর 'শীতের সুইজারল্যাণ্ড'। বরফ-পড়ার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা মনোরম। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে সকল বয়সের নর-নারী এখানে বরফের খেলা করিতে—winter sports করিতে আসেন'। আমাদের লেখক গিয়াছিলেন প্রকৃতির শোভা-উপভোগ করিবার জন্য। এই স্থলে লেখকের দু'এক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—'এইখানে ভারতীয় মনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় মনের প্রভেদ বুঝছি। ভারতের আত্মা যেখানে প্রকৃতির মহান্ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখেছে, সেখানে দেবতার মন্দির গড়েছে—সে সমুদ্র-তীরে হোক্, গহন অরণ্যে হোক, চিরতুষারা-বৃত পর্ব্বত চূড়ায় হোক। * * তুষারাবৃত পর্ব্বতের নালায় ভারতের নর-নারী স্কি করতে যায় না, তারা যায় তীর্থদর্শন করতে, প্রকৃতির মহান্ সৌন্দর্য্য অনুভব করতে, শঙ্করের চিরশুভ্র ধ্যানমগ্ন রূপ দেখ্‌তে। * * আমরা যেখানে প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখতে পেয়ে আত্মার উন্নতি করতে গেছি, এরা সেখানে প্রকৃতির সহযোগিতায় নানা ক্রীড়া, ব্যায়ামের চর্চ্চা করে শরীরের উন্নতি করেছে।'

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের—'ভ্রাম্যমানের জল্পনায়' এবার বার্টরাণ্ড রাসেলের 'স্পিরিটুয়ালিজম্' সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত আছে—আমাদের দেহের অবসানে চৈতন্যের কোনও চিহ্ন থাকে কি না ও টেলিপ্যাথি বেতার বার্ত্তার মত একটা দৈহিক কিছু কি না এ সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। বৌদ্ধ পুনর্জ্জন্মবাদ ইত্যাদি নানা কথাও প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দের 'পদব্রজে আসাম হইতে বর্ম্মা'য় যেমন বহু

চিত্র আছে, জানিবার ও শিখিবার কথাও অনেক আছে। ইংরাজী ১৯২০ সালে আসাম হইতে বর্ম্মা জরিফ করিয়া রেল লাইন স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে যে অভিযান আসাম হইতে বর্ম্মায় পাঠান হয় সেই অভিযানে একজন রেলওয়ে বিভাগের, একজন ভূতত্ত্ববিভাগের ও একজন বনবিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। এই শেষোক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন স্বয়ং লেখক, তাঁহার কার্য্য ছিল—কোথায় কি প্রকার বৃক্ষাদি বা অন্য বনজদ্রব্য পাওয়া যায় তাহার বিবরণ সংগ্রহ করা। সেই সরকারী কার্য্য করিতে গিয়া লেখক যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের চরিত্র-চিত্রও সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায়ের সিংহলদ্বীপের শ্রীদুর্গার বিবরণ এবারে বর্ণিত হইয়াছে। এখানকার ফ্রেস্কো চিত্রগুলি বড়ই মনোরম। চটান্ গুহার দেওয়ালে কাঁচা জমাটের উপর চিত্রাঙ্কন আছে। সবগুলি নারীমূর্ত্তি—রং এখনও টাটকা ও উজ্জ্বল রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'মালয় ষ্টেট্‌সের কথা' সঙ্কলিত সুন্দর প্রবন্ধ। জাতিতত্ত্বের অনেক উপকরণ এই প্রবন্ধ ও রাজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রতিভা ও প্রতিপত্তি—আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ডালটনগঞ্জ নিখিল-ভারত কায়স্থ-সম্মেলনে সভাপতি-রূপে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অভিভাষণ। সূচীপত্রে ইহা জাতিতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে জাতিতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেল না. ভারতের প্রাচীন্ কায়স্থগণের ও বঙ্গদেশের কায়স্থগণের প্রতিভা ও প্রতিপত্তির কথা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, 'জাতির ভবিষ্যৎ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নির্ভর করে মাতাদের উপর ; কারণ মাতাই সন্তানের জীবন গড়িয়া তুলে। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। বাল্য বিবাহ রহিত করা একান্ত প্রয়োজন। পরদাও বিদায় দিতে হইবে। পরদার সহিত হিন্দু-ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। * * বিভিন্ন জেলার এবং প্রদেশের কায়স্থ মধ্যে বিবাহ প্রচলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।" বাল্য-বিবাহ রহিত করা কেন যে উচিত সে সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয় কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। বাল্য বিবাহের স্বপক্ষে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এটর্ণী যে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত তাহার খণ্ডন হইতে দেখিলাম না। যাহা হউক অন্ততঃ উচ্চবর্ণের মধ্যশ্রেণীর লোকদের ভিতর বাল্য-বিবাহ একরূপ উঠিয়া যাইতেছে, অবশ্য তাহার কারণ সাংসারিক অসচ্ছলতা, দেশের অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা। আজ-কাল কিন্তু বড় বড় পাশ্চাত্য লেখকেরা বাল্য-বিবাহের গুণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এরূপ বিবাহে গৃহের শান্তি অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম ও দর্শন।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

"গীতায় দুই প্রকৃতি"—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ। এই সংখ্যায় তিনটী দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের এই প্রবন্ধটীই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে যে অপরা এবং পরা দুই প্রকৃতির উল্লেখ আছে তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় (৭ম অধ্যায় ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য)। "পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহাই আমার অষ্টধা ভিন্ন প্রকৃতি ; ইহা অপরা ; কিন্তু ইহা হইতেও বিভিন্ন আমার আর এক প্রকৃতি আছে—তাহা পরা প্রকৃতি। তাহাই জীব হইয়াছে এবং এই জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে।" তত্ত্ব বর্ণনায় এইটিই গীতার প্রথম নূতন কথা। ইহারই সাহায্যে গীতা সাংখ্যের ন্যায় হইয়াও সাংখ্যকে অতিক্রম করিয়া বৈদান্তিক অর্থ দিতে পারিয়াছে। এই পরা-প্রকৃতি বিশ্ব-জগতের প্রকৃত মূল--আদ্যা সৃজন শক্তি ও কর্ম্মশক্তি। নীচের অজ্ঞান অপরা প্রকৃতি সেই পরা-প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত। অথবা "আত্মা ও জগতের পশ্চাতে পরমেশ্বরের যে চিৎশক্তি রহিয়াছে, তাহাই পরা-প্রকৃতি··· কিন্তু জগতে এই বিচিত্র বহুমুখী বিশ্ব-লীলাকে ধারণ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক সত্তার প্রয়োজন, তাই পরা-প্রকৃতি জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে,—জীবভূতা যয়েদা ধার্য্যতে জগৎ।······আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যেন আমরা না ভাবি যে, কালের মধ্যে যে জীব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এবং পরা-প্রকৃতি এমন ভাবে এক যে, পরা-প্রকৃতি জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরমাত্মার পরা-প্রকৃতি কখনও এই প্রকার হইতে পারে না। কালের মধ্যে যখন প্রকাশের লীলা চলিতেছে তখনও পরা-প্রকৃতি ইহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু, নূতন জগতে উহার সত্তা কেবল বহুধাই হইত, জগতে একত্বের স্বরূপ থাকিত না। গীতা বলেন নাই যে পরা-প্রকৃতি তাহার মূল সত্তায় জীব, জীবাত্মকম্। গীতা বলিয়াছেন পরা-প্রকৃতি জীব হইয়াছে, জীবভূতম্। এবং এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে জীবরূপে আবির্ভাবের পশ্চাতে পরা-প্রকৃতি মূলতঃ আরও কিছু,—আরও উচ্চ সত্তা- ইহা এক পরম আত্মারই স্বরূপ। জীব ঈশ্বর—কিন্তু আংশিক প্রকাশরূপে, মমৈবাংশঃ।" প্রবন্ধটী অরবিন্দবাবুর ইংরাজী হইতে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

ইতিহাস ও নিয়তি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। বেদ-ব্যাখ্যার মামুলি দোষ দেখাইতে গিয়া Oxford বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বোডেন প্রোফেসর Macdonald সাহেব বলিয়াছেন যে 'জড়-বিজ্ঞানে যে রীতি অনুসরণ করা হয় এখন সেই রীতিই সমস্ত য়ুরোপীয় গবেষণায় অনুসৃত হইতেছে, এবং তাহারই ফলে বিদেশীয় য়ুরোপীয়েরা

যেমন সুন্দর ভাবে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিতে পারে সেরূপ কোনও ভারতীয়ই পারে না। (The method of natural science which has led to such an astounding advancement of knowledge, for instance in the sphere of Physics, Chemistry and Medicine, is fundamentally the same as that which has been applied to modern European scholarship......The sole aim here being the attainment of truth, it is a positive advantage that the translators of ancient sacred books should be outsiders rather than native custodians of such writings. The latter could not escape from religious bias—an orthodox Brahman could not possibly do so) ।" ইহারই উত্তরে প্রমথবাবু বলিতেছেন—"জড় বিজ্ঞানে যে রীতি অনুসরণ করিয়া আমরা ফল পাইয়াছি, ইতিহাসে,--বিশেষতঃ যে ইতিহাস শুধু ঘটনা আর তথ্য জড় করিতেই প্রবৃত্ত নয়, যে ইতিহাস ঘটনাবলীর পিছনে মানুষের নিয়ত চঞ্চল প্রাণধারাটিকেও বুঝিতে চায়; শুধু facts নহে, interpretationও যার উদ্দেশ্য—সে ইতিহাসে সে রীতির অনুসরণ করা তেমন সম্ভবপর নয়, ততটা যুক্তিযুক্তও নয়।" ইহার প্রধান কারণ চেতনা ও প্রাণকে বাদ দিয়া জড় জগতের রাসায়নিক ইত্যাদি বিবরণ দেওয়া চলে, কিন্তু ইতিহাসের তথ্যগুলি অবশ্যই জাতীয় নহে। "সে তথ্যগুলির পিছনে বিশ্ব-মানবের প্রাণ বিচিত্র আনন্দে ও বেদনায়, বিবিধ আবেগে ও চেষ্টায় চিরদিন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের এই নিগূঢ় সত্তা, এই প্রেরণাটাই ('motive') আসল জিনিষ।" জড়-জগতে ঘটনা সমূহ পারিপার্শ্বিক অবস্থাপুঞ্জের দ্বারা বাধ্য; ইতিহাসে ঘটনাগুলি ঠিক সেভাবে বাধ্য নহে। Bergson এই তথ্য অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। Macdonald সাহেবের বিলাতী দাবীর এই উত্তর প্রমথবাবু অতি সুন্দর ভাবেই দিয়াছেন।

আমরা প্রমথবাবুর ভাব, ভাষা এবং লিখিবার ভঙ্গীর প্রশংসা করি। কিন্তু প্রবন্ধের শেষাংশে ভারতবর্ষের অবনতির কারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া ব্যাপারটী অবান্তর বলিয়া মনে হইল।

মুক্তি ও আত্মদর্শন—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বি-এ। সাংখ্য দর্শনের একটী খুব সাধারণ বিবৃতি। লেখক একস্থলে বলিয়াছেন একমাত্র সাংখ্য দর্শনই মুক্তির উপায় সহজ এবং সুসাধ্য ভাবে বলিয়া দিয়াছে। আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আর একস্থলে লেখক বলিতেছেন 'মোক্ষ কামনাই সকল হিন্দু ধর্ম্মের মূল; বলিয়া কতকগুলি ইংরাজী ছত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নীচে লেখা "Sankhya Philosophy" হঠাৎ এই কয় ছত্র একখানি ইংরাজী সংস্করণের সাংখ্য দর্শন হইতে উদ্ধৃত করিয়া লেখক তাঁহার বক্তব্য বিষয় স্পষ্টীকৃত করিতে, অথবা তাঁহার ইংরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

প্রবাসী—আষাঢ়।

মানব সৃষ্টি ও বর্ণাশ্রম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বৌদ্ধ অগ্গ সুত্তান্ত হইতে সঙ্কলিত, অনুবাদ।

গীতার আত্মতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ। গীতার অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। এই প্রবন্ধে গীতার নানা অধ্যায় হইতে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা অনাদি, অবিনাশী, শাশ্বত, অব্যয়, অব্যক্ত, অপ্রমেয়, অকর্ত্তা, অদ্বিতীয় ইত্যাদি। গীতার অপরাপর তত্ত্ব পরে আলোচিত হইবে ভরসা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ

শ্যামের বাঁশী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। বৃন্দাবন-ধামের সুমধুর কৈশোর কৃষ্ণলীলার প্রধান উপকরণ 'বাঁশী'। কি ভাবে কেমন করিয়া এই বংশীধ্বনি শ্যামসুন্দরের এই মধুর লীলার সাহায্য করিয়াছিল, তাহাই মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় দেখাইয়াছেন। বেদান্তবাদী তর্কভূষণ মহাশয়ের হাতে শ্যামের বাঁশীর এই মধুর সঙ্গীতে আমরা বিমোহিত হইলাম। দর্শন ও কাব্যরস দুইই এই প্রবন্ধে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাঁহার প্রতিভার একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কবিতা

প্রবাসী—আষাঢ়

পান্থশালা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায়। এই পৃথিবী পান্থশালা মাত্র, মানবের স্থায়ী আবাস-ভূমি নহে। পান্থশালায় রাত্রিবাসের জন্য সমাগত অ-পূর্ব্বপরিচিত যাত্রিগণের মধ্যে যেমন এক রাত্রির জন্য একত্র বাস করার ফলে পরস্পরের আলাপ-পরিচয় হইয়া থাকে, এখানেও সেই রকম হইতে পারিত। কিন্তু কি জানি কেন মায়ার বন্ধনে এই ক্ষণিকের পরিচয় এত গভীর ও নিবিড় হয় যে বিদায়-কালে নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়, হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, পরস্পরের মধ্যে যে যুগ-যুগান্তরের পরিচয় আছে ইহাতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়। এই পুরাতন ভাবটিই কবিতার বর্ণনীয় বিষয়। অভিব্যক্তি মন্দ হয় নাই, তবে মাঝে মাঝে গদ্যাত্মক লাইনও আসিয়া পড়িয়াছে।

পাঞ্চজন্য—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী। কোনও পাণ্ডবের জন্য এ "পাঞ্চজন্য" নিনাদিত নহে এবং শ্রীভগবান স্বয়ং ইহা বাজাইতেছেন না, তবে সহৃদয় দরদী কবির হৃদয়ে ভগবান যে বেদনার প্রেরণা দিয়াছেন তাহাই আজ পঞ্চমুখী হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত জন-সাধারণের কল্যাণে

নির্ঘোষিত হইয়াছে। এবারকার "পাঞ্চজন্যে" যুদ্ধের উত্তেজনা নাই, আছে শান্তি স্বপ্নের গীতি, পরার্থে আত্ম-নিয়োগ ;—

পাঁচ জনে ডেকে পঞ্চমে আজি কাঁদে এ পাঞ্চজন্য—
সব যে আমার, আমি যে সবার—ধন্য জীবন ধন্য !

"মনের আঙুলে খিল ধ'রে আসা"টার কিন্তু আমরা তারিফ করিতে পারিলাম না। প্রবীণ কবি অনেক দিন ধরিয়া লিখিয়াছেন অনেক, হাতের আঙুলে খিল ধরিলে হয়ত আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম না, কিন্তু 'মনের আঙুলে খিল' শুনিলে যে আমরা উদ্বিগ্ন হই !

মেঘ-দূত (পূর্ব্ব মেঘ)—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা। মূলের ছন্দ ভাষা ও ভাব যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া ভুবন-বিখ্যাত মেঘ-দূতের এই সুললিত পদ্যানুবাদে কবির শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। কচিৎ একটু আধটু খটমট হইয়াছে কিন্তু সেটা ধর্ত্তব্যই নয়। অনুবাদ কেমন সরস ও মধুর হইয়াছে তাহার নমুনা দিই—

বীচি-বিক্ষোভে মুখর বিহগ পংক্তি নদীর কাঞ্চীহার,
মদস্খলিত মনোহর গতি, আবর্ত্ত-নাভি দৃষ্ট যার,
অন্তরঙ্গ রূপে ভোগ কোরো নির্ব্বিন্ধ্যার রসানুরাগে,
বিভ্রম—সে তো নারীর প্রথম প্রণয় বচন প্রিয়ের আগে।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

কাকের বাসায়—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ। কবি কুমুদরঞ্জন এবার অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। একটা কাকের ডাকেই লোকে অস্থির হইয়া ওঠে কিন্তু কবি "লক্ষ কাকের ডাকে" অবিচলিত। কোকিলের 'কুহু', ময়ূরের 'কেকা' পুরাণো হইয়া এখন 'অচল, অধম' হইয়া গিয়াছে। কাক এত দিন কাব্যের ভোজে অপাংক্তেয় ছিল, আজ শুদ্ধি-মন্ত্রের বলে অন্ততঃ 'জল-চল' হইল। বায়সের কর্কশ-কণ্ঠে পায়সের মিষ্টতা আস্বাদন করা কবি কুমুদরঞ্জনের সরস হৃদয়ের দ্বারাই সম্ভবে। আমাদের মনে হয় কবি ইচ্ছা করিলেই 'বাঘের-গুহায়'ও কাব্য-রস পাইতে পারেন, আমরা এ দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বলা বাহুল্য 'কুমুদরঞ্জনী' উপমার স্তূপ আলোচ্য কবিতাটিতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিন্তু উপমাগুলি সর্ব্বত্র সুষ্ঠু ও সঙ্গত হয় নাই। দায়ে পড়িয়া কাকের ডাকে কবি কখনও 'ঢাকের' কখনো বা কাঁসির আবার কখনও 'রাম-শিঙার' আওয়াজ শুনিয়াছেন। যাহা হউক এ আওয়াজ কবির খুব মিষ্ট লাগিয়াছে। কোকিলেরও খুব মিষ্ট লাগিয়া থাকে তাই 'কোকিল এদের বাসায় তার কণ্ঠ সাধে।' এটুকু বেশ কবিত্ব পূর্ণ।

তুলসী—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। ভক্ত-কবির হৃদয়াঙ্গনে যে অপরূপ তুলসী বীজ প্রেমাশ্রু সেচনে অঙ্কুরিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধমান হইতেছে, সেই তুলসীরই সরস প্রকাশ এই পবিত্র কবিতাটিতে দেখিতে পাই। তুলসী মালার ন্যায় এ কবিতাটিও 'কণ্ঠস্থ' করিবার যোগ্য। কবি বেশ নিপুণতার সহিত কবিতাটির মধ্যে শ্রীবাস-অঙ্গনে সপার্ষদ মহাপ্রভুর নৃত্য, জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীযুক্ত গীত-গোবিন্দ, ভক্ত বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস, বৃন্দাবন দাস, মহাত্মা প্রতাপরুদ্র গজপতি, গজপতি ঐরাবত, রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নানা কথার আভাস দিয়াছেন। পণ্ডিত ও ভক্ত কবির এ কলা-কৌশল অনুধাবন ও অনুকরণযোগ্য। শেষে কয় ছত্র তুলিয়া দিতেছি—

হরিপদ সম্ভবা তরুরূপা জাহ্নবী
তুমি দেবী বৈষ্ণব-ভবনে,
মহাযাত্রীর শিরে ছায়াখানি সঞ্চারি
হরি নাম দাও তার শ্রবণে।

এমন কবিতায় ছাপার ভুল কিন্তু অসহ্য।

মুক্ত—শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু। প্রণয়ী "পলকের ভুলে প্রণয়িনীর অলক হইতে চিকণ চারু অলঙ্কার" খুলিয়া লওয়ায় কি রকম সাংঘাতিক বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা। প্রিয়তমের এই সামান্য-অপরাধে প্রিয়তমা একেবারে তাঁহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ লোপ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, সাধারণতঃ এরকমটা ঘটে না বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। কেন যে অঘটন ঘটিল তাহা নির্দ্ধারণ করিতে রসজ্ঞ পাঠককে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। অলকের অলঙ্কার 'ভুলিয়া' বা না বলিয়া লওয়ায় প্রণয়িনী যে এইরূপ বিষম চটিয়াছেন এটা একটা গৌণ কারণ অর্থাৎ উপলক্ষ্য মাত্র—আসল গলদ এই খানে :—

তখন তো কেহ
আমারে কহেনি সখি ! তোমার ও গেহ—
স্নেহ-তৃপ্ত বহু প্রণয়ীতে
রাখে দিবা-রজনীতে
কলরবে করিয়া মুখরিত
ছলনায় জুড়িয়া দু'কর।

হায় হায় ! এর পরও প্রণয়ীর আপনাকে 'মুক্ত' ভাবার অভিমান ! এমন সর্ব্ব-সংস্কার বর্জ্জিত নিলর্জ্জ প্রণয়ীর চিত্র আজ কালই চোখে পড়ে। প্রবীণ কবি এই তথাকথিত তারুণ্য-প্রভাব হইতে "মুক্ত" হইলেই আমরা সুখী হইব।

মানুষের গান—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়। সুখে দুঃখে, উত্থানে-পতনে ধনী-দরিদ্র, বলবান্-বলহীন অভেদে মানব-সমাজের সমবেত কণ্ঠ হইতে অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া যে মহা-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে তাহাই এ কবিতাটির বিষয়-বস্তু। বিষয়টি অবশ্য খুব উচ্চ ও মহান্ কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে যে এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়া উৎকট করিয়া তুলিতে হইবে ইহার কোন কারণ নাই। কবি শক্তিহীন নহেন, তাই মনে হয় তিনি ইচ্ছা করিয়াই কবিতাটিকে এই রকম 'কটমট' করিয়া বৈশিষ্ট্য দানের প্রয়াস পাইয়াছেন।

শেষের রেশ—শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। রচনা সরল ও স্বচ্ছ। হাত মিষ্ট, তবে এখনও পরিবেষণের হাত হয় নাই। আশা আছে হাত খুলিবে।

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ সরকার। ভগবানের নিকট ভক্তের আত্ম-নিবেদন। কবিতা হিসাবেও সুখপাঠ্য।

তা'রে কর জ্বালাতন—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। ভগবানের প্রতি ভক্তের উক্তি।

যা'র প্রতি তুমি বাম, দাও তা'রে রত্ন ধন,
ভালবাস যা'রে তুমি, তা'রে কর জ্বালাতন।

ভক্ত কবি যদি ইহাতেই সান্ত্বনা পাইয়া থাকেন, আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে অভক্ত পাঠকের মনে হয়ত "আঙুর টক" এই কথাটাই মনে পড়িবে। তাহারা ভাবিতে পারে ধনের প্রতি নির্ধনের এই অবহেলা অভিমানেরই নামান্তর।

যদি—শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে যে সব সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে হয় এবং যে সব দোষ বর্জ্জন করিতে হয় তাহারই একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা। রচনা সরল ও মধুর।

তুমি—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। সেই চিরদিনের 'তুমি'র মামুলি বর্ণনা। 'তুমি' যদি ইহাতে খুসী থাকেন ত' ভালই। কিন্তু 'তুমি'রা কি এমনই বোকা?

চির-ঈপ্সিত—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিশ্র। ভগবানের নিকট ভক্তের প্রাণের আকুতি নিবেদন। ভাব পবিত্র ও রচনা আন্তরিকতা পূর্ণ। কিন্তু ভক্তি-স্রোতে ছন্দ হাবুডুবু খাইতেছে।

সহর কলিকাতা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী। ডি, এল, রায়ের সুবিখ্যাত 'আমার দেশ' গানের প্যারডি। 'কলিকাতা'র সঙ্গে 'সেথা' 'মাথা' 'কথা' 'তথা' প্রভৃতির মিল 'অসবর্ণ-বিবাহ' বিলের অনুসারেই হইয়াছে বোধ হয়। তথাপি রচনা সুখপাঠ্য।

জীবন-সংগ্রাম—শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়। সমগ্র সৃষ্টি জুড়িয়া অনাদি অনন্তকাল হইতেই অবিশ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম চলিতেছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মরণের জয় মনে হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। মরণ নাশ নয়, ধ্বংস নয়, রূপান্তরমাত্র। মরণের মাঝেই জীবনের বীজ নিহিত আছে, মরণের সঙ্গে সঙ্গেই সৃজন অঙ্কুরিত হয়। এই পরম তথ্যটিই কবি নানা দৃষ্টান্তের সহযোগে কবিতার মধ্যে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দ্বারা মূল ভাবকে সুনিশ্চিত রূপে ব্যক্ত করিতে গিয়া কবি একদিকে যেমন লাভবান্ হইয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি আর্টকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। যাহাকে বলে logical sequence, কবিতাটিতে তাহাই বিদ্যমান। যাঁহারা কাব্যের মধ্যে emotional বা rhetorical seqence দেখিতে চান তাঁহারা হতাশ হইবেন। কবির স্বভাব-সিদ্ধ ভাষার বৈভব, রচনার সরস ভঙ্গী, গুরু-গম্ভীর ছন্দ-ঝঙ্কার—সমস্তই ইহাতে আছে। শেষ কয় ছত্র উদ্ধৃত করিলাম:—

ভ্রান্ত মোরা ভয় পাই মরণের আপাত প্রসারে
শতের মরণ দেখি,—দেখি না যে লক্ষ জিনে তারে

*　　*

শবাসনে বসি যবে করিছে সে শ্মশানে সাধনা
ভাবি বুঝি নির্জ্জিত সে, মরণেরি করে আরাধনা
রূপ হ'তে রূপান্তরে যখনই সে করিছে প্রয়াণ
পরাজয় হলো ভাবি দুঃখে তাপে হই মুহ্যমান।
মানবাত্মা যবে যায় মৃত্যু-পথে মৃত্যুহীন লোকে,
মরণ করিল গ্রাস মোরা ভাবি,—কাঁদি তাই শোকে।

মাতৃ-স্নেহ—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। মাতৃস্নেহের মতই মধুর।

দেবতা—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। নিরাকার দেবতা মানুষের কাতর প্রার্থনাতেই সাকার হইয়াছেন। দেবতা-পূজায় শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার, অন্য কাহারও নাই—এ নিয়ম দেবতার অভিপ্রেত নয়। মন্দিরে, মঠে, মসজিদে নিত্য যে স্তব-ঝঙ্কার উঠিতেছে তাহা মিথ্যাচার। অন্তর্য্যামী দেবতা এ স্তবে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সমদর্শী দেবতা মানব-সাধারণের জন্যই পৃথিবীতে নানা প্রকার সুখ-সুবিধার সৃজন করিয়াছেন—জাতি বর্ণ বিশেষের জন্য নহে। ঘরের প্রিয়জনের প্রতি মানব যদি প্রিয় ব্যবহার করে, দেবতা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন—তাহই তাঁহার প্রকৃষ্ট পূজা। রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।" কবিতাটি মোটের উপর ভালই লাগিল। ফেনা একটু কম থাকিলেও চলিত।

শ্যামা মা—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল। ধরণীর যেখানে যত শ্যামল ছবি আছে সকলের মাঝেই 'শ্যামা মার' জ্যোতিঃ প্রতিফলিত। শ্যামল প্রান্তর, তরুর শ্যামচ্ছায়া, সাঁঝের নদীর জল, সকলই মনোহারী, কারণ তাহারা ভক্তের মনে শ্যামা-মারই মূর্ত্তি জাগায়। রামপ্রসাদের দেশে এ কথা নূতন নয়। তাই নবীনত্ব হিসাবে না হউক, পবিত্রতার দাবীতে কবিতাটি সচল।

দীক্ষা—শ্রীমতী মানসী নন্দী। রুগ্না স্ত্রীকে ঘরে ফেলিয়া স্বামী গুরুদেবের কাছে দীক্ষা লইতে গেলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মনে এখন কোন্ দেবতার মূর্ত্তি জাগিতেছে আমাকে বল।" দীক্ষা-প্রার্থী দেখিলেন সমস্ত দেব-মূর্ত্তি অপসারিত করিয়া তাঁহার রুগ্না স্ত্রীর মূর্ত্তিই জাগরূক। তিনি সেই কথাই অকপটচিত্তে গুরুকে জানাইলেন। তখন গুরু উপদেশ দিলেন—

হাসিয়া ঠাকুর কহিলা তখন—"ফিরে যাও তবে আপন গেহে,
সেবা কর গিয়ে জায়া রোগিণীর, ভগবান তব তাহারি দেহে।

ঘরে ঘরে এই উপদেশ পালিত হইলে সংসার শান্তি-কুঞ্জ হইবে।

রচনাটি সরল ও মধুর। স্বামীর পক্ষ হইতেও কোন পুরুষ-কবিকে কলম ধরিতে দেখিলে সুখী হইব।

চিরন্তন মিলন—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায়। ললিত মধুর সরস রচনা। ভাব চমৎকার, প্রকাশভঙ্গীতেও বেশ কৌশল আছে। যাঁহারা বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশ' কবিতা পড়িয়াছেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে আলোচ্য কবিতাটি তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। মদনের বরে চিত্রাঙ্গদার বর্ষৈকভোগ্য সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য-শ্রীর স্তবে আসল চিত্রাঙ্গদা ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া ধার করা রূপকে ভার-স্বরূপই বোধ করিয়াছিলেন। অনুপ্রেরণা ও অনুকরণ এক জিনিষ নয়।

বিচিত্রা—আষাঢ়।

সুসময়—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে, শ্রাবণের প্লাবনে যে কার্য্য অসাধ্য, দখিণার মৃদু কম্পনে, শরতের স্নিগ্ধ শিশির কণার তাহা অতি সহজ-সাধ্য। প্রবলের চেয়ে দুর্ব্বল, কঠিনের চেয়ে কোমল, স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্ম অনেক ক্ষেত্রে কার্য্যকর। অসময়ে প্রবল যেখানে পরাভূত, 'সুসময়ে' অবলও সেখানে সফল। কবিতাটির বিষয় ইহাই।

সনেট—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ। এবারে কান্তিবাবুর দুইটি সনেট বিচিত্রার বৈচিত্র্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছে। 'নানা কথায়' সম্পাদক মহাশয় জানাইয়াছেন যে 'ওমর খৈয়ামের কবি' কান্তিবাবুর সনেট সংগ্রহ পুস্তক এই মাসেই প্রকাশিত হইবে। তার পর পাঠকবর্গ এইরূপ সনেটের হস্ত হইতে রেহাই পাইবে ত?

মানুষ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মানুষ তাহার প্রিয়তম মর্ত্ত্য-ভূমি ও মর্ত্তবাসী ছাড়িয়া স্বর্গেও যাইতে চায় না কেন, মানুষের হীনতা ও মানুষের গৌরব কোথায়—এই সব গভীর তত্ত্ব-কথার আলোচনা এই কবিতাটিতে আছে। শিল্প-কুশল প্রবীণ কবির হাতে আমরা এ রকম প্রাণহীন ছবি চাই না। বাণীর কিয়দংশ অকথিত রাখিলেই কথিত অংশের সার্থকতা হয় এ কথা 'সপ্তস্বরা'র কবির ভুলিলে চলিবে কেন?

দিশাহারা—শ্রীযুক্ত সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য। জ্যোৎস্না রজনীতে একটি যুগল-মিলনের সুখ-চিত্র। অঙ্কনে সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য আছে, তবে স্থানে স্থানে রসাধিক্যও ঘটিয়াছে। প্রথমটা 'দিশাহারা' হইবার কোনও সঙ্গত কারণ পাইলাম না, তবে এক যায়গায় একটু কেমন কেমন মনে হইল—

> চকিত ছোঁয়ার এক পলকে
> যে কাঁপন ফিরে ফিরে ছলকে
> পাঁজরের চারি ধারে
> উছলিয়া বারে বারে
> দেহের কিনারে যায় ঠেকিয়া
> ... ...
> তারে আজি লবো ছুঁয়ে দেখিয়া।

অবস্থা কিন্তু সঙ্গীন হইয়া উঠিল, যথা—

> পরাণ কেবলি আজ কহে রে
> খোঁজাখুঁজি নহে আর নহে রে
> দুখানি আকুল হিয়া
> এথা দেই এলাইয়া, ইত্যাদি।

শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার দোষ নয়, আজিকার এ রাতটাই বেয়াড়া—

> দিশা হারাণোর এলা বেশেতে
> এ মধুর রজনীটি এসেছে;
> * *
> আকুল আকাশভরা জ্যোছনার
> নেশাটি লাগুক প্রাণে দুজনার
> নিতিকার লাজ ভয়
> দুখ সুখ সমুদয়
> থাক পিছনের তীরে পড়িয়া—

কাযেই 'দিশাহারা' বৈ কি!

এক বিন্দু অশ্রু—শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্য। করুণ, কোমল ও স্নিগ্ধ।

আমার প্রিয়া—শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু। প্রিয়া বড়মানুষের মেয়ে নয়, সুন্দরী নয়, কলকণ্ঠী নয়, তার নামটিও যুৎসই নয়, তবুও তাহাকে ভালবাসি। এ দেখিতেছি নিছক 'অহেতুকী' ভালবাসা। প্রিয়াকে ভালবাসা খুবই ভাল, কিন্তু তা' বলিয়া 'নেতি' 'নেতি' করিয়া তার রূপ গুণ উড়াইয়া দেওয়া বড় দুঃসাহসের কায। উহাতে বিপদ ঘটিতে পারে।

চিঠি—শ্রীমতী উমা দেবী। অনেক দিন পরে প্রিয়তমের চিঠি পাইলে বিরহিণী প্রিয়ার হৃদয় যে কি অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে তাহার অকপট ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

নীল আকাশের তারা—শ্রীযুক্ত অমরকুমার দত্ত। সরল হৃদয়-গ্রাহী কবিতা। কবির দৃষ্টি প্রশংসনীয়।

কথাসাহিত্য

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ।

ইন্দ্রধনু—শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ। এমাসের মাসিক বসুমতীতে এই একটি মাত্র গল্প। কথাসাহিত্যের বাকীগুলি সবই ক্রমশঃপ্রকাশ্য উপন্যাস। এ গল্পের প্লটের শেষ দিকটা খাপছাড়া। বিষম রোগের

প্রতিষেধক হিসাবে বিষ দেওয়া চলে—কিন্তু গল্পের নায়িকা মাধুরীর সামান্য মানসিক ব্যাধির আরোগ্যের জন্য অতবড় বিষের প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। অতবড় নির্লজ্জের মত অভিনয় করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করার নাম কি কৌতুক অভিনয়—বিশেষতঃ ভ্রাতাভগিনীর সম্পর্ক যেখানে? তা ছাড়া শ্যামাপ্রসাদের মত চরিত্রও শেষের দিক্‌টায় যেন কেমন হীন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বনাম রাধিকা—নক্সা—শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ নহেন—ইনি পাড়াগেঁয়ে হাতুড়ে ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ডাক্তারিতে দিন না চলায়, ইনি ভট্টাচার্য্যের দশকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাই গ্রামে ইহাঁর নাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়। নক্সা হিসাবে রচনাটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। পল্লীজীবনের চিত্রটি নিখুঁৎ ভাবে উঠিয়াছে। হাস্যরসটুকু স্বচ্ছ ও অনাবিল।

বিচিত্রা—আষাঢ়।

পয়োকুম্ভ—শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। মোটের উপর এ গল্পটি আমাদের মন্দ লাগে নাই। শেষের দিক্‌টা বেশ করুণ ও উপভোগ্য হইয়াছে। সংসারের দুঃখদৈন্যের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া গল্পটি লিখিত। পাশাপাশি দুইটি স্ত্রীর চিত্র বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সুরোর চরিত্রাঙ্কন চিত্তার্ধক।

বিমাতা—শ্রীযুক্ত সমীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছোট গল্প। 'বিমাতা রাক্ষসীর নামান্তর' ইহাই যাঁহারা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, লেখকের বিমাতা তাহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা লইয়া দুটি উদ্যত বাহু তাহার সপত্নী-পুত্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। সে নিশ্চল মূর্ত্তির মধ্যে রাক্ষসীত্ব এতটুকু নাই। লেখা ভাল, বর্ণনাকৌশল ভাল।

গল্পের ছাঁচ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র মজুমদার। আধুনিক বাঙ্গলার তরুণ-দলের গল্পের একটা নক্সা। লিখিবার ধারাটি মন্দ নহে।

জীবন-নাট্য—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত। সংসারের দুঃখদৈন্যের কাহিনী। নূতনত্ব কিছুই নাই। নিতান্ত একঘেয়ে। তবে সংসারের দুঃখদৈন্যের কথা চিত্তাকর্ষক, সেই হিসাবে উপভোগ্য। পুরাতনকে নূতন করিয়া বলিবার ক্ষমতারও কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়।

বড়মানুষ—সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর লিখিত ছোট গল্প। অনেকদিন পরে ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় রায় বাহাদুর পূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কথাসাহিত্যের মহারথী। তাঁহার ছোট গল্প লিখিবার ক্ষমতা নূতন জিনিস নহে,তবুও মনে হয় বহুদিন তাঁহার এরূপ গল্প মাসিকের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার পাকা হাতের পাকা লেখা "বড়মানুষ" সত্যই শোভা-সম্পদে অতুলনীয়। কথা বলিবার কৌশল চমৎকার—বর্ণনাভঙ্গী অপূর্ব্ব। গল্পটি পড়িবার সময় আর একটা কথা মনে হয় যে, আজকালকার দিনে বাঙ্গলা মাসিক সাহিত্যে এই শ্রেণীর গল্পের বড়ই অভাব। প্রেমের কাহিনী ভিন্ন যেন কোন গল্পেরই অবতারণা করা চলে না—একঘেয়ে প্রেমের কাহিনী পড়িয়া প্রাণটা যখন হাঁপাইয়া উঠে, তখন বড়মানুষের মত গল্প পাঠ করিয়া সত্যই প্রাণে একটা তৃপ্তি অনুভব করা যায়।

জগন্নাথ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু। কাত্যায়নী ধনীর বিধবা। গুরুদেব বলিয়াছিলেন 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" তাই মুক্তিলাভের আশায় কাত্যায়নী রথ দেখিতে আসে। রথতলায় শিশুপুত্র-ক্রোড়ে এক মৃতপ্রায় নারীকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কাত্যায়নী তাহার শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত হইল। নারী রথের তলায় পড়িয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়। সেবানিরতা কাত্যায়নীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া নারী মুক্তিলাভ করিল—কাত্যায়নীর ক্রোড়ে শিশু জগন্নাথ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। জগন্নাথ একজনকে দিলেন মুক্তি আর একজনকে দিলেন বন্ধন!

দুটি চোখের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়। তিনটি পর্ব্বে, দুটি চোখের ইতিহাস। প্রথম পর্ব্ব!—সহরের সরকারী বাগানে, দীঘির ধারে প্রথম দর্শন,—অপূর্ব্ব দুটি চোখ! চোখের মালিক একটি দশ বছর বয়সের বালিকা! দুটি ডাগর চোখ বিচিত্র মহিমায় দৃষ্টিকে পলকহারা ক'রে দিলে!

দ্বিতীয় পর্ব্ব!—আট দশ বছর পরের কথা, বৈকালে একটা দুর্দ্দান্ত মাতালকে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় দেখে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখি, মাতালের স্ত্রীকে। সে যুবতী। যুবতীর অপূর্ব্ব দুটি চোখ, সেই আশ্চর্য্য দুটি চোখ—কতকাল আগেকার দেখা সেই বালিকাই, এই যুবতী—এই অমানুষ মাতাল তার স্বামী!

তৃতীয় পর্ব্ব। আরো দশ বছর পরে। শ্মশানে—একখানা খাটের পাশে বসে ৭।৮ জন স্ত্রীলোক মদ খাচ্ছিল, অট্টহাসি হাসছিল—খাটের উপর স্ত্রীলোকের শব। শবের মুখের উপর সেই অপূর্ব্ব চোখ দুটি স্থির হয়ে আছে! এও সেই দুটি চোখ!—সেই খেলা-ভোলা খুসি-ভরা বালিকা, সেই বিষাদিনী সিঁদুর-পরা বিধবা,—আর এই জীবন-ছাড়া, নারীত্ব-হারা নারী!"......গল্পের প্লটের মধ্যে নূতনত্ব না থাকিলেও পুরাণোকে নূতন করিয়া বলিবার ক্ষমতা গল্পটিকে উপভোগ্য করিয়াছে।

প্রাণের বিনিময়ে—শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ বসু। বাচস্পতি মহাশয়ের এক জ্ঞাতি করাচি হইতে একটি রুদ্রাক্ষ পাঠাইয়া দেন। রুদ্রাক্ষ মন্ত্রপূত ও বিশেষ গুণবিশিষ্ট। যে কোন গৃহী ব্যক্তি ইহাকে দক্ষিণ হস্তে লইয়া দেবীকে স্মরণ পূর্ব্বক যাহা কামনা করিবে, তাহাই অতি সত্বর সফল হইবে। আর সে সফলতা ঘটনা-পরম্পরায় এমন স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হইবে, যে, তাহাতে কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবে না।......বাচস্পতি মহাশয়ের কৃতবিদ্য পুত্র দেবীপ্রসাদ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বাচস্পতি পুত্রের পাঠদ্দশায় ঋণজালে জড়িত

হইয়া পড়িয়াছিলেন। রুদ্রাক্ষহস্তে বৃদ্ধ তাহার পত্নীর অনুরোধে ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মাত্র দেবীর নিকট ২০০০৲ টাকার কামনা করিলেন। বৈকালে চিঠি আসিল—দেবীপ্রসাদের কর্ম্মস্থল হইতে মিলের সাহেব দেবীপ্রসাদের মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়াছেন। ইলেক্‌ট্রিক কল খারাপ হইয়া যাওয়ায় তাহার দেহে তার লাগিয়া বিজলী খেলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ থানায় চালান দেওয়া হইয়াছে—এবং সাহেব আরও সংবাদ দিয়াছেন যে, মৃতের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে নগদ ২০০০৲ টাকা দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। আখ্যায়িকাভাগ মন্দ হয় নাই।

পাহাড়ের মায়া—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়। গল্প না বলিয়া "ভ্রমণ কাহিনী" বলাও চলিতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন দিক দিয়াই ইহা সার্থক হয় নাই। না গল্প,—না ভ্রমণবৃত্তান্ত! শুধু খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কতকগুলো রংমাখানো কথার মালা!—আড়ম্বর যথেষ্ট আছে—উপরে। ভিতরে শুধু কাঠামো—খড় মাটি! অধিকন্তু অনাবশ্যক ভাবে কলেবরটা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে পড়িবার ধৈর্য্য থাকে না, —একঘেয়ে 'মায়াপুরীর রাজকন্যা' আর তার 'নীল রঙের ওড়না' আর পাহাড় পাথর বর্ণনা কিছুক্ষণ পড়িতেই নিতান্ত তিক্ত হইয়া পড়ে।

নন্দদার ডায়েরী—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটি অস্বাভাবিক।

প্রবাসী—আষাঢ়।

সংস্কার—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গল্প। আখ্যায়িকা হিসাবে অতি সাধারণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা।

জাত রক্ষা—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়। অস্পৃশ্যতার উপর গল্পটি লেখা হইয়াছে। বিমাতা রাজলক্ষ্মীর চরিত্রটি বেশ ফুটিয়াছে।... মাঝে মাঝে কিন্তু একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে।

বিজ্ঞান

প্রবাসী—আষাঢ়।

প্রবন্ধের নাম 'পাঞ্জাবের মৃণ্ময় শিল্প।' বিষয়-সূচীতে লেখা আছে যে, শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত ও শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু পত্রিকার অভ্যন্তরে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর নাম দেখিতে পাইলাম না। কয়েকখানি চিত্র ছাড়া এই প্রবন্ধের উল্লেখ-যোগ্য আর বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হইল না। পাঞ্জাবের মৃণ্ময়শিল্পের ইতিহাস লিখিতে গিয়া, যদি কোন লেখক হরাপ্পাতে আবিষ্কৃত মৃণ্ময় বস্তুর উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন, তবে সে দোষ উপেক্ষণীয় নহে। লেখক দুই এক স্থলে কোনও বিশেষ প্রকার মৃণ্ময়শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই মত সমর্থনের জন্য কোনও যুক্তির অবতারণা করেন নাই। লেখকমহাশয় (বা মহাশয়গণ) চারিভাগে মৃণ্ময়শিল্প বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বিত হয় নাই। লেখকমহাশয়গণ manganese dioxide এবং cobalt oxide নামক দুইটী দ্রব্যকে ধাতব ক্ষার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ alkali অর্থে ক্ষার শব্দ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ধাতব ক্ষার দ্বারা metallic alkali সূচিত হইতেছে। Metallic alka'i জিনিষটী যে কি তাহা এই প্রবন্ধের লেখক ব্যতীত আর কোনও রাসায়নিক জানেন কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রবন্ধের ভাষাও পরিমার্জ্জিত বলিয়া মনে হইতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম:—

"(E) মাটির খেলনা, পুতুল প্রভৃতি। এই সব প্রস্তুত করিবার কাযে ইহারা আগ্রা বা লক্ষ্ণৌয়ের সমান না হইলে একেবারে আনাড়িও নয়।"

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মজুমদার মহাশয় 'নব্যভারতের রসায়ন চর্চ্চা' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা দেশে বিজ্ঞান প্রচারের সঙ্গে এই দুই পণ্ডিতের (Alexander Pedler ও George Watt) নাম বিশেষভাবে জড়িত হইয়া আছে।" Sir Alexander Pedlar প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষামন্দিরের রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মৌলিক গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন বটে এবং বর্ত্তমান সময়ে যে মুখত্যঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দৃষ্টান্তে ও উৎসাহে ভারতবর্ষে রাসায়নিক গবেষণা ক্রমবিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহার সহিত Sir Alexander Pedlarএর কিছু সম্বন্ধ থাকিলেও George Watt এ দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচারের জন্য যে বিশেষ কিছু করিয়াছেন, তাহা মনে হইতেছে না। George Wattএর Economic Products তাহার নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেছে বটে, কিন্তু তিনি নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা কোনও বাঙ্গালী ছাত্রকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার গবেষণাতে উৎসাহিত করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা দেশে সম্প্রতি উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিষয়ক গবেষণার যে একটু সূত্রপাত দেখা যাইতেছে, সে জন্য যদি কোনও এক ব্যক্তির কৃতিত্ব থাকে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের অন্যতর অধ্যাপক Dr Bruhlএর প্রাপ্য বলিয়া মনে হয়।

'কাশ্মীরে রেশমশিল্প' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, 'সুখের বিষয় যে, কাশ্মীরে নব্য প্রণালীতে রেশম উৎপাদন ও বয়ন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে রেশমশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; এখানে এবং দক্ষিণভারতের কতিপয় স্থানে যে রেশমশিল্পের উন্নতিকল্পে কোন সুব্যবস্থা হইতেছে না, তাহা অতীব অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন।'

প্রকৃতি—গ্রীষ্মসংখ্যা, ১৩৩৫।

এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধের নাম 'প্রাচীনযুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞান।' ভারতীয় রসায়ন-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ তখনই শোভা পায়, যখন তাহা মূল প্রবন্ধ বাহির হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এস্থলে তাহার যথেষ্ট ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সুতরাং আমরা এই অনুবাদ-প্রকাশের সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেনের 'কচুড়িপানা' একটী সুলিখিত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধপাঠে আমরা জানিতে পারি যে একাধিক উপায়ে আমরা কচুড়িপানা আমাদের ব্যবহারোপযোগী করিতে পারি। এ খবরটি মন্দের ভাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখক মহাশয়ের মতে mechanical, chemical, thermal ও physiological—এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে কচুড়িপানার ধ্বংস-সাধন করা যাইতে পারে এবং 'বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের পক্ষে স্থলভেদে প্রথম ও তৃতীয় প্রণালীই সমধিক বাঞ্ছনীয়।'

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয়ের 'কালিদাসের বৃক্ষলতা' নামক প্রবন্ধে উদ্ভিদ্-শাস্ত্রের কোনও জ্ঞান-বৃদ্ধি হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না, তবে যদি কখনও কালিদাসের শব্দাদির কোনও index প্রস্তুত হয়, তখন এই প্রবন্ধ কার্য্যে আসিতে পারে।

'মস্মাঙ্ক' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এক অতিকায় সরীসৃপের একটী প্রস্তরীভূত মনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

'প্রজাপতি' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় বলিয়াছেন, 'সিমলা-সহরে ইংরাজ-বালকদিগকে শিক্ষকের সহিত পর্ব্বতভ্রমণকালে ছোট জালের সাহায্যে বিচিত্রবর্ণের প্রজাপতিসমূহ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি।......অভিভাবক ও শিক্ষকগণ বালক-বালিকাদিগকে প্রকৃতির সহিত পরিচিত করিবার অবসর ও উৎসাহ প্রদান করিলে আমাদের মধ্যেও দুই একজন বিংহাম (Bingham) বা কমষ্টক্ (Comstock)এর ন্যায় বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব অবশ্যই হইত বলিয়া মনে হয়।'—আমরাও বলি 'তথাস্তু'। তবে সত্যের খাতিরে আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, লেখকমহাশয় বালক-বালিকাদিগকে প্রজাপতি আলোচনার জন্য আপাততঃ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে। শ্রীযুক্ত রায়মহাশয়ের বোধ হয় জানা আছে যে, বালক-বালিকাদের মধ্যে জীব ও উদ্ভিদশাস্ত্রের "আলোচনার" সূত্রপাত করিতে হইলে তাহা Natural Historyর দিক্ দিয়া করিতে হইবে, systematic বর্ণনার দিক দিয়া করিলে হইবে না। যদি প্রবন্ধকার মহাশয় প্রজাপতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে বর্ণনা না করিয়া আমাদের দেশে সে সমস্ত প্রজাপতি সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সহজবোধ্য ভাষাতে সেগুলির বর্ণনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেই বালকবালিকাদের মধ্যে প্রজাপতি সম্বন্ধে নানা কথা জানিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'পদার্থের গঠন' নামক প্রবন্ধ বোধ হয় ৮।১০ মাস পরে বাহির হইল, এবং তাঁহাও 'ক্রমশঃ' প্রকাশ্য, সুতরাং এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলাই ভাল।

রায় ৺রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুরের 'ফলের চাষ' একটী সুলিখিত রচনা। বিশেষজ্ঞ লেখকের লেখার মতই এই প্রবন্ধ অনেক চিন্তাপূর্ণ তথ্যে ভরা। ইহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থ মাত্রই অনেক উপদেশ পাইবেন। আমরা বাঙ্গালার পল্লীবাসী প্রত্যেক গৃহস্থকে এই প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কৌশিক ব্যাপার' নামক প্রবন্ধের প্রথম অংশ সমাপ্ত হইল, এবং আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সুরেন্দ্রবাবুর লেখার ক্ষমতা আছে। তিনি পদার্থবিজ্ঞান-সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। তিনি যদি পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে সেই পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা-বিষয়সম্বন্ধে অন্যতম পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি তিনি মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকার মারফতে আমাদিগকে এরূপ দুরূহ বিষয়ের ঘাত পাঠাইয়া দেন, তাহা অনেক সময়ে সাধারণের পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়ে।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের 'মানব অভ্যুদয় সম্বন্ধে দুই একটী কথা' নামক প্রবন্ধ পত্রিকাতে বাহির না হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। লেখকমহাশয় তাঁহার রচনাতে যে সমস্ত বিষয়ে অবতারণা করিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিংশ শতাব্দীর দেশ ও কাল' একটী ক্রমশঃপ্রকাশ্য প্রবন্ধ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষমহাশয় 'প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা' নামক প্রবন্ধে মেরুদণ্ডীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য পারিভাষিক শব্দের আলোচনা করিয়াছেন। একেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবিত সমস্ত শব্দের সমালোচনা সম্ভবপর নহে, তবে তাঁহার প্রস্তাবিত শব্দগুলির মধ্যে কোন কোনটী সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মত পোষণ করিতে পারা যায় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। দৃষ্টান্তস্বরূপ Cephalochorda শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একেন্দ্রবাবু এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'পূর্ব্বদণ্ডী' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। Cephalochdrdo শব্দের পরিবর্ত্তে 'মূর্দ্ধাদণ্ডী' শব্দই অধিকতর সঙ্গত।

ভৌতিক টেবিল

(গল্প)

সেদিন বন্ধুসমাগমে মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরে ডিনারের পূর্ব্বেচারিটী অর্দ্ধপেগ পান করা আমার নিয়ম; কিন্তু, সেদিন বন্ধুবর্গের অনুরোধে এই পরিমাণের দ্বিগুণেরও অধিক পান করিয়াছিলাম। বন্ধুগণ চলিয়া গেলে মাথাটা কেমন একটু ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। হলঘরের এক কোণে একটী সুদৃশ্য কারুকার্য্যশোভিত সেগুনকাঠের টেবিল ছিল। টেবিলটী আমি এক মাস পূর্ব্বে রেঙ্গুনের এক নীলামে ক্রয় করিয়াছিলাম। টেবিলটি গোলাকার, ব্যাস প্রায় তিন ফুট হইবে, কিনারায় এককুটব্যাপী অদ্ভুত কারুকার্য্য, মধ্যভাগে গোলাকৃতি এককুটস্থান সমতল ও মসৃণ। উত্তমরূপে পালিস করা হেতু বিদ্যুৎ আলোকে চক্ চক্ করিতেছিল। মনে হয়, দর্পণের মত ইহাতে মুখ দেখা যাইতে পারে। আমি এই টেবিলটির পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া কুনুই-দুটী টেবিলের উপর ভর দিয়া দুই হাতে মাথাটি রাখিয়া টেবিলের মধ্যভাগে মসৃণ অংশের প্রতি আনমনে চাহিয়া ছিলাম।

২

কিয়ৎকাল পরে—কতক্ষণ পরে তাহা আমার মনে নাই—আমার মনে হইল, যেন টেবিলের মধ্যভাগটা সবলে আমার দৃষ্টি ও মনোযোগ-আকর্ষণ করিতেছে। অনিচ্ছা সত্বেও আমি যেন একদৃষ্টিতে ও একাগ্রচিত্তে টেবিলের ঐ মধ্যভাগটীর দিকে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। কিছুকাল এইরূপে চাহিয়া থাকিবার পর, হঠাৎ যেন একখানা ছবি ঐ মধ্যভাগে ফুটিয়া উঠিল। তারপর বায়োস্কোপের ছবির মত দৃশ্যপট এবং অভিনেতাদের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

যেন দেখিলাম, পাহাড়ের গায়ে জলপ্রপাত। পাহাড়ের সর্ব্বগাত্র ঘন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন; গাত্র ভেদ করিয়া রজতধারার মত প্রপাতের জল তর্ তর্ করিয়া বহুনিম্নে নামিতেছে এবং নিম্নে গিয়া বাষ্পাকার ধারণ করিতেছে। নিম্নের জঙ্গল কুজ্ঝটিকার মত এই বাষ্পে আচ্ছাদিত। হঠাৎ জল-প্রপাতের উৎপত্তি স্থলে সমতল ভূমির উপর একটী প্রকাণ্ড সেগুনবৃক্ষের নিম্নদেশে জঙ্গলে ভেদ করিয়া একটী যুবক সাহেব এবং একটী যুবতী মেমসাহেব উপস্থিত হইল। যুবতীর মুখে আশঙ্কা ও ভীতির চিহ্ন; যুবকের আননে শঠতাপূর্ণ ক্রূর হাস্য। আমি যে শুধু এই দৃশ্যই দেখিতেছিলাম, তাহা নহে, আমার মনে হইল—আমি যেন উহাদের কথোপকথনও সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

যুবতী। কেন আমায় এখানে ডাকিয়া আনিলে? জান, এখন আমি পরস্ত্রী। এরূপ নির্জ্জন স্থানে একাকিনী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার এখন শোভা পায় না।

যুবক। বড় যে সতী সাজিয়াছ! আর সকলের নিকট সতীত্বের বড়াই করিও, আমার নিকট তোমার সতীত্বের বড়াই বড়ই হাস্যকর।

এই কথা শুনিয়া যুবতীর সুন্দর মুখ সিন্দুরের মত লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধে, ক্ষোভে, বিরক্তিতে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া যুবতী ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এমনি অপদার্থ তুমি! গত জীবনের কথা বলিতে তোমার একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ, একটু অনুশোচনা হইল না? সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া, তাহার শরীরে, মনে চির-কলঙ্কের ছাপ দিয়া, তাহাকে বিবাহ না করিয়া বিলাত হইতে তুমি ব্রহ্মদেশে চলিয়া আসিলে। আশা করিয়াছিলাম, একদিন তোমার হৃদয়ে অনুতাপ হইবে, তুমি বিবেকের দংশনে অস্থির হইবে; যে সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে, দেশে ফিরিয়া তাহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার জীবনের কলঙ্ককালিমা ধৌত করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু, ব্রহ্ম-প্রত্যাগত ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মুখে বিলাতে থাকিয়া ক্রমাগত কি শুনিলাম? শুনিলাম, তুমি কত ব্রহ্মদেশীয়া বালিকার আমারই মত সর্ব্বনাশ করিয়াছ। ক্ষণিক মোহের পর অবসাদ আসিলে তাহাদিগকে তাহাদের শিশুসন্তানসহ জীর্ণ পাদুকার মত পরিত্যাগ করিয়াছ। শুধু অনূঢ়া বালিকা ও যুবতীর সর্ব্বনাশ করিয়া তোমার দারুণ লালসার শান্তি হয় নাই; শেষে তুমি পরস্ত্রীর প্রতিও লোলুপদৃষ্টি করিতে ছাড় নাই। কত সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছ; কত শান্তির কুটীরে আগুন জ্বালাইয়াছ; শেষে বিবাহ-

চ্ছেদের মোকর্দ্দমায় আসামী হইয়া অর্থদণ্ড দিয়াছ; এই সব কাহিনী শুনিয়া আমার মন তোমার প্রতি ঘৃণায় তিক্ত হইয়া উঠে। আমি জোর করিয়া তোমার ছবি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলি। তোমার পত্র ও উপহার সামগ্রীগুলি, যাহা একদিন আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তর ছিল, আগুনে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলি। অবশেষে দেবতুল্য আমার স্বামীর সহিত বিলাতে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার চরিত্রের মহত্ব, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, দয়া, মায়া, মমতা, মধুরতা এবং সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করি। তাঁহাকে ভালবাসিয়া, তাঁহার সেবা করিয়াই আমার সুখ। আজ তুমি হঠাৎ ধূমকেতুর মত আমার সুখের সংসারে অনর্থ আনিতে চেষ্টা করিতেছ কেন?"

যুবতীর এই দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যুবক তাহার স্বাভাবিক ক্রূর বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "আমার চিঠি ও উপহারগুলি তো পোড়াইয়া ফেলিয়াছ; কিন্তু, তোমার প্রেমের চিঠিগুলি যে এখনও আমার নিকটে আছে। যদি সেইগুলির ভিতর হইতে বাছিয়া দুই তিনখানা চিঠি তোমার স্বামীর নিকট কৌশলে পাঠাইয়া দিই, তখন কেমন হয় বল দেখি? যদি পূর্ব্বের মত আমার সহিত সদ্ব্যবহার না কর, এবং আমার ইচ্ছামত আমার বাসনা পূরণ না কর, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার স্বামীর নিকট তোমার কয়েকখানি চিঠি পাঠাইয়া দিব। দেখি, তখন তোমার সতীত্বের বড়াই কোথায় থাকে!"

তদুত্তরে যুবতী কহিল, "তোমার চরিত্রের অবনতি হইয়াছে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে এতদূর অধঃপাতে গিয়াছ, তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। তুমি কাপুরুষ, পাষণ্ড; তোমার সহিত আর আমার কথা নাই। আমি চলিলাম। আমার অনুসরণ করিও না। তোমার যাহা খুসী, তাহা তুমি করিতে পার। আমার স্বামী দেবতুল্য। তোমার মত পশুর সাধ্য কি যে, তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করে? আমি নিজেই অকপটে আমার স্বামীর নিকট সব কথা ব্যক্ত করিব। কিছুই গোপন রাখিব না। তোমার অত্যাচার আচরণের কথাও জানাইব।"

যুবতীর এতাদৃশ দৃঢ়তা দর্শনে যুবক, কতকটা ভীত, কতকটা সন্ত্রস্ত হইল। বুঝিতে পারিল, ভয় দেখাইয়া এই প্রকার তেজোদৃপ্তা রমণীকে বশ করা যাইবে না। তাই সুর নরম করিয়া বলিল, "ছিঃ মেরী, তুমি আমার পরিহাস বুঝিতে পারিলে না? আমাকে কি এতই কাপুরুষ মনে কর যে, আমি তোমার চিঠি তোমার স্বামীকে দেখাইব! লক্ষ্মীটী, আমার উপর রাগ করিয়া আমাকে ফেলিয়া যাইও না। এস, এখানে এই জলপ্রপাতের পার্শ্বে পাথরের উপর বসিয়া উভয়ে খানিক বিশ্রম্ভালাপ করি।" বলিয়া যুবক, যুবতীর পুষ্পদলতুল্য সুকোমল দক্ষিণ হস্তটী ধারণ করিল।

হস্ত ধরিবামাত্র যুবতী দৃপ্তা সিংহিনীর মত, পুচ্ছবিমর্দ্দিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল "এক্ষুণি হাত ছাড়, নতুবা ভাল হইবে না।"

"হাত ত ছাড়িবই না, বরঞ্চ—" এই বলিয়া যুবক হঠাৎ যুবতীর হস্ত ছাড়িয়া যুবতীকে দুই বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিল। যুবতী নিজ বাহু মুক্ত করিয়া যুবকের কপোলে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যুবক টাল সামলাইতে না পারিয়া যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, তথা হইতে জলপ্রপাতের মুখে পড়িয়া গেল। আর একটু হইলেই জলপ্রপাতের উপর পড়িত। নৈরাশ্যব্যঞ্জক একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া সে দক্ষিণ হস্তে প্রপাতের পার্শ্বদেশস্থিত একখণ্ড প্রস্তরের প্রান্ত আঁকড়াইয়া ধরিল; এবং বাম হস্তে যুবতীর গাউনের এক প্রান্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া রহিল। যুবতী উহার হস্ত হইতে নিজের গাউন মুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। ক্রমশঃ যুবকের দক্ষিণ হস্ত শিথিল হইয়া আসিল। তখন সে প্রস্তরের প্রান্তভাগ ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তে যুবতীর গাউনের প্রান্তভাগ ধরিল। যুবতী যুবকের সমস্ত ভার সাম্‌লাইতে না পারিয়া জলপ্রপাতে আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঘূর্ণ্যমান জলরাশি উভয়কেই গ্রাস করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

ঠিক এমনি সময় দুইটী সবল হস্ত যুবতীকে জড়াইয়া ধরিল, এবং সেই মুহূর্ত্তে যুবকের দুই মুষ্টি শিথিল হইয়া যুবতীর গাউনের প্রান্তভাগ পরিত্যাগ করিল এবং চক্ষুর নিমেষে যুবক জলপ্রপাতের ক্ষুধিত জলরাশির উদরে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

যুবতী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিবামাত্রই যুবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া স্বামীর গায়ে এলাইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাশেষে যখন যুবতীর পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেখিল যে, সে শিলাতলে স্বামীর জানুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া শুইয়া আছে।

পূর্ব্ব ঘটনা সমস্তই তাহার মনে পড়িল; অমনি যুবতীর নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বহিতে

লাগিল। তাহার স্বামী স্বীয় রুমালে অতি যত্নে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ লক্ষ্মীটী, কাঁদিও না, কাঁদিলে আবার অসুখ বাড়িবে।"

যুবতী গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রিয়তম, কেন আমায় বাঁচাইলে? আমার মরণই ছিল ভাল। আমি তোমাকে প্রতারণা করিয়াছি। বিবাহের পূর্ব্বে আমার গত জীবনের ইতিহাস তোমাকে বলি নাই। আজ তোমাকে অকপটে সব খুলিয়া বলিব। শুনিয়া যদি পায়ে রাখ, চিরজীবন তোমার দাসী হইয়া থাকিব; আর যদি পরিত্যাগ কর, তথাপি চিরজীবন তোমার মঙ্গল কামনা করিব।"

তদুত্তরে যুবতীর স্বামী কহিল, "প্রিয়তমে, তোমাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। আমি ঝোপের আড়াল হইতে সবই শুনিয়াছি। নরাধমের কুচরিত্রের কথা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। কাযেই তোমাদের দুইজনকে জলপ্রপাতের দিকে আসিতে দেখিয়া আমি অদৃশ্য ভাবে তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম, এবং এই পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত ছিলাম। তার পর যখন দেখিলাম যে, পাষণ্ড নিজে ত মরিবেই, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও মারিতে চায়, তখন ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তোমাকে ধরিলাম। আর একটু হইলে সর্ব্বনাশ হইয়াছিল আর কি! তুমি এখনও যেমন আমার হৃদয়ের রাণী হইয়া আছ, চিরকালই তেমনিই থাকিবে। তোমার মত তেজস্বিনী সাধ্বী স্ত্রী যার, তার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে?"

যুবতীর চক্ষু এবার আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। বলিল, "কিন্তু প্রিয়তম, আমি যে হত্যাকারিণী, নরঘাতিনী!"

তদুত্তরে স্বামী গাঢ়স্বরে বলিল, "এ সব ভগবানের কায; তাঁহার কায তিনি করিয়াছেন। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। ধ্বংসও করেন তিনি এবং সৃজনও করেন তিনি। চল, গৃহে যাই।" বলিয়া সেনানীর বেশ পরিহিত যুবক তাহার পত্নীকে শিলাতল হইতে উঠাইয়া তাহার মস্তক স্বীয় স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে বন ভেদ করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

* * * *

এমন সময় আমার "বয়" আসিয়া বলিল, "সাহেব, রাত্রির খাবার প্রস্তুত।"

আমি বিরক্তভাবে মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলাম। তার পর পুনরায় সেই টেবিলের মসৃণ মধ্যভাগের প্রতি দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম যে, আর কোন ছবি উহাতে দেখা যায় না। শুধু উপরের বিদ্যুৎ বাতির আলো উহাতে পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছে।

৩

পরদিন সকালে এই টেবিলটীর বিষয় অনুসন্ধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। কিরূপে সন্ধান করিয়া টেবিলের জন্মবৃত্তান্ত হইতে আধুনিক ইতিহাস পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাই না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে-সেগুন গাছের নিম্নে এই ভয়াবহ দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল, এই টেবিলটীর মধ্যভাগ সেই সেগুন গাছের কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহু হস্তান্তরিত হইয়া এই টেবিলটী অবশেষে আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল।

* * *

বহু বৎসরের পুরাণ কাগজ ঘাঁটিয়া সাময়িক কোনও পত্রে নিম্নলিখিত প্যারাটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম:—

ভীষণ দুর্ঘটনা!
রমণীর অপূর্ব্ব সাহস!!

গতকল্য অমুক সাহেব এবং অমুক বিবি আনিসাবান জলপ্রপাত দেখিতে গিয়াছিলেন, হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া সাহেব জলপ্রপাতের ভিতর পড়িয়া যান। দুই হস্তে প্রপাতের পার্শ্বের প্রস্তরের প্রান্ত ধরিয়া থাকেন। বিবি স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া উঁহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঁচাইতে পারেন নাই। হঠাৎ প্রপাতের জলরাশি সাহেবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বিবি তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রপাতে ঝম্প দিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার স্বামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পত্নীকে এই অসমসাহসিক কার্য্য হইতে নিরস্ত করেন। অদ্য প্রাতে পুলিস জলপ্রপাতের পাদদেশ হইতে সাহেবের মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। যদি বিবির স্বামী ঠিক সময়ে সেস্থানে উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে আমরা একটি নারীরত্ন হারাইতাম।

* * *

অনেক ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, টেবিলটী সাইকিক সোসাইটিতে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিব। গৃহস্থের ঘরে এরূপ টেবিল রাখা নিরাপদ হইবে না।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের নানা স্থানে ধর্ম্মঘটের মরশুম পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে লিলুয়ায় ধর্ম্মঘট, আসানসোলে ধর্ম্মঘট, পাটের কলে ধর্ম্মঘট, এমন কি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ধাঙ্গড় মেথরেরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ওদিকে বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘট, টাটার কারখানাতেও ধর্ম্মঘট। কলিকাতার ধাঙ্গড় মেথরদের ধর্ম্মঘট শেষ হইয়াছে, মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তারা তাহাদের বেতন মাসিক এক টাকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। লিলুয়ার ধর্ম্মঘটওয়ালারা কিছু-দিনের জন্য ধর্ম্মঘট ধামাচাপা দিয়া কার্য্যে প্রত্যাগমন করিয়াছে; হয়ত ভবিষ্যতে আবার ধর্ম্মঘট করিবে। এদিকে বিদ্যামন্দিরেও ধর্ম্মঘট। কলিকাতা সিটি কলেজের হিন্দু ছাত্রদের ধর্ম্মঘট এখনও চলিতেছে; এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের যে কবে শেষ হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মিটমাটের চেষ্টা একাধিক বার বিফল হইয়াছে; এখন আর কেহই মীমাংসা করিবার জন্য অগ্রসরও হইতেছেন না।

——o——

কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর ধাঙ্গড়েরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। তাহাদের ধর্ম্মঘট করার কারণ তাহারা মিউনিসিপালিটীকে জানাইয়াছিল। তাহারা অনেক দফা কারণ দেখাইয়াছিল বটে; কিন্তু আমাদের মনে হয়—তাহাদের প্রধান কারণ ছিল এই যে, ধাঙ্গড়েরা তাহাদের পুরা বেতন পাইত না। তাহাদের বেতনের একটী অংশ নিয়মিত ভাবে অন্য লোকের পকেটে যাইত। প্রায় ৭ দিন ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল। গরমের সময় রাস্তায় ময়লা জমিয়াছিল এবং ধূলা উড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সেইজন্য অনেকের ভয় হইতেছিল যে, নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধিতে সহর ছাইয়া যাইবে। লোকে দুর্গন্ধে অস্থির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মেয়র-মহোদয় তাহাদের সহিত রফা করিয়াছিলেন, তাহার সর্ত্ত মোটামুটি এইরূপ ছিল—

(১) ধাঙ্গড়েরা অবিলম্বে কাযে যোগ দিবে।

(২) ধর্ম্মঘটের জন্য কাহারও শাস্তি হইবে না।

(৩) ধর্ম্মঘটের সময়ের জন্য ধাঙ্গড়েরা মাহিনা পাইবে, তাহাদের বেতন কাটা যাইবে না।

(৪) ধাঙ্গড়দের দুই টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য মেয়র মহোদয় চেষ্টা করিবেন।

(৫) তাহাদের সমস্ত অভিযোগ আপত্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিবার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হইবে এবং এই কমিটীর মধ্যে ধাঙ্গড়দের প্রতিনিধিরাও সদস্য থাকিবে।

এই সকল সর্ত্তে সে ধর্ম্মঘট শেষ হয় এবং ধাঙ্গড়েরা তৎক্ষণাৎ কাযে যোগ দিয়াছিল। মিউনিসিপালিটীও, যে কমিটী গঠন করিবার কথা ছিল, সেই কমিটী গঠন করিল।

এই সময়েই শ্রীযুক্ত মেয়র মহোদয় ও শ্রীযুক্ত চিফ একজিকিউটিভ অফিসার জে, সি, মুখার্জ্জির মধ্যে মতভেদ প্রকাশ পাইল। মেয়র মহোদয় বলিলেন যে, ধর্ম্মঘট শেষ হইবার কোন লক্ষণই দেখিতে না পাইয়া তিনি সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ধর্ম্মঘটকারীদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জে, সি, মুখার্জ্জি মহোদয় বলেন যে, ধর্ম্মঘট প্রায় শেষ হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ মেয়র ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। সে যাহাই হউক, ধর্ম্মঘটকারীদের অভিযোগ এবং দাবীর বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইল, সেই কমিটি কেবল-মাত্র একদিন বসিয়াছিল, আর কখনও বসে নাই, এবং অভিযোগাদির বিবেচনাও হয় নাই।

এদিকে ধর্ম্মঘটকারীরা যখন দেখিল যে, তাহাদের অভিযোগাদির কোন বিচার কিংবা বিবেচনা হইতেছে না এবং কমিটিও বসিতেছে না, তখন তাহারা মিউনিসি-পালিটীতে নোটিশ দিল এবং তৎপরে সর্ব্বসাধারণের নিকটেও সহানুভূতির জন্য আবেদন করিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ইহার পূর্ব্বেই ধর্ম্মঘটকারীরা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ (মারপিট প্রভৃতি) বিচারালয়ে আনিয়াছিল, তাহা রফার সর্ত্তানুসারে উঠাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু কর্পোরেশন তাহাদের বিরুদ্ধে যে মারপিট প্রভৃতির অভিযোগ আদালতে আনিয়াছিল, তাহা উঠাইয়া নিল না, এবং কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারীর শাস্তিও হইল। ধাঙ্গড়েরা যখন দেখিল যে, রফার সর্ত্তানুসারে কায করিতে কর্পোরেশন তৎপর নহে, তখন তাহারা আবার এই দ্বিতীয়বার ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, কর্পোরেশন ধর্ম্মঘটকারীদের ধর্ম্মঘট-কালের বেতন চুকাইয়া দিয়াছিল।

এখন বিবেচ্য এই যে, সহরের এই দুরবস্থার জন্য কে দায়ী? প্রথম ধর্ম্মঘটের কারণগুলি যুক্তিসঙ্গতই হউক আর যুক্তিহীনই হউক, ধাঙ্গড়দের অভিযোগের ভিত্তি কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, তাহাদের সেই সকল দাবী এবং অভিযোগের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, সে কমিটি যে কাযে অবহেলা করিয়া

ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অবহেলার জন্য যেই দায়ী হউক না কেন, আমরা মনে করি মিউনিসিপালিটিই দায়ী। যদি ঐ কমিটি বিচার এবং বিবেচনা পূর্ব্বক কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইত এবং সেই সিদ্ধান্ত না মানিয়া ধাঙ্গড়েরা পুনরায় ধর্ম্মঘট করিত, তাহা হইলে আমাদের এখানে কিছু বলিবার কথা থাকিত না। কিন্তু কর্পোরেশনের নিশ্চেষ্টতাই এই দ্বিতীয় ধর্ম্মঘটের কারণ। আর ইহার জন্য সমস্ত উত্তর-কলিকাতা (এক নম্বর এবং দুই নম্বর ডিষ্ট্রিক্ট) ভয়ানক ভাবে অসুবিধা এবং কষ্ট ভোগ করিতেছে। এই ধর্ম্মঘট যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় তাহার জন্য কর্পোরেশান এবং করদাতৃগণের অবহিত হওয়া উচিত।

[ইহা লেখার পরে, পূর্ব্বোক্ত কমিটি বসিয়া ধাঙ্গড়দের একটাকা মাহিনা-বৃদ্ধি অনুমোদন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মঘট শেষ হইয়াছে। আমরা আশা করি, কমিটি অবিলম্বে সমুদয় অভাব অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন।]

"মাসিক বসুমতী"র মতে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে পুনরায় ভাইস্-চান্সেলর নিযুক্ত করা উচিত নহে, এবং এই মতের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। এই সমস্ত যুক্তির কতকগুলি factঘটিত ও অপর কতকগুলি opinion মাত্র। যেগুলি কেবল মাত্র opinion, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই; কারণ, একই বিষয় বিচার করিয়া বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মতে উপনীত হইতে পারেন। কিন্তু যে গুলি factঘটিত, সে গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমরা আমাদের সহযোগিনীর কথা সমর্থন করিতে অক্ষম। মাসিক বসুমতীতে লেখা হইয়াছে যে, (১) "প্রথম হইতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের শিক্ষকদিগের সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য চলিতেছে। তিনি যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে ফ্যাকালটি বোর্ড হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন, তাঁহারাও ভাইস্-চান্সেলারকে পোষ্ট-গ্রাজুয়েটের বোর্ডগুলিতে প্রবেশ করিতে দেন নাই।" এই স্থানে দেখা যাইতেছে যে, মাসিক-বসুমতীর মতে যদুবাবুর বিশেষ অপরাধ এই যে, তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষকদিগকে সমস্ত বোর্ড ও ফ্যাকলটি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে আমরা জোরের সহিত বলিতে পারি যে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট-বিভাগের যে সমস্ত শিক্ষক সেনেটের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারা যে ফ্যাকলটির সভ্য হওয়ার উপযুক্ত, তাঁহারা কেহই সেই ফ্যাকলটি হইতে বাদ যান নাই। আর্টস ফ্যাকালটিতে ৫৯ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে অন্যূন ২৮ জন সভ্য পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের শিক্ষক। Faculty of Scienceএ ৩০ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অন্যূন ১৭ জন পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের শিক্ষক। বসুমতী বোর্ডগুলির নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বিচারসহ নহে। আমাদের কথা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে বোর্ডগুলির নাম, তাহাদের সভ্যসংখ্যা এবং এই সভ্যদের মধ্যে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে কয়জন আছেন—তাহা প্রদত্ত হইল :—

বোর্ড	সভ্য	পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষক
ইংরাজি	১২	৫
সংস্কৃত	১২	১০
বাঙ্গালা পালি ইত্যাদি	১২	১০
আরবী ইত্যাদি	১২	৩
ইতিহাস	১২	৪
দর্শন	১২	৬
অর্থনীতি	১২	৫
রসায়ন	১২	৬
	১২	৭
প্রাণিতত্ত্ব	৮	
ভূতত্ত্ব	৮	৭
উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব	১০	৭
শারীরতত্ত্ব	৮	৬
মনস্তত্ত্ব	১১	৮
গণিতশাস্ত্র	১২	৬
ভূগোল	১০	৩
শিক্ষা	১২	

উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল, পাঠকগণ তাহা হইতে নিজেরাই বিচার করিবেন যে, মাসিক-বসুমতী যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ কিনা। মাসিক-বসুমতী আরও লিখিয়াছেন, "অপরপক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহু সদস্য লইয়াছেন এবং ফ্যাকলটির অতিরিক্ত সভ্যও অধিকাংশই ত প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে লওয়া হইয়াছে।" যদুবাবু ভাইস্-চ্যান্সলার পদে নিযুক্ত হওয়ায় পর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে দুই জন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন এবং Art-Facultyর অতিরিক্ত ৮ জন সভ্যের মধ্যে ৩ জন ও Science Facultyর অতিরিক্ত ১০ জন সভ্যের মধ্যের ৩ জন প্রেসিডেন্সি

কলেজ হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; ইহাই হইতেছে যথার্থ ঘটনা এবং এই ঘটনার উপরে নির্ভর করিয়া লিখিলে, মাসিক-বসুমতী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লিখিতে পারা যায় কি না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ।

——o——

B.Sc ও. B.A. পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের তুলনাতে এবার সমস্ত পরীক্ষার ফলই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়াছে। শুনিতেছি যে, অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ২০ নম্বর করিয়া grace দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নম্বর দেওয়ার অজুহাত এই যে, এই বিষয়ের একটী প্রশ্নপত্র অত্যন্ত শক্ত হইয়াছিল। এইরূপ grace নম্বর দেওয়া যে প্রকৃত শিক্ষার দিক্ দিয়া বিচার করিলে অত্যন্ত দূষণীয়, তাহা আমরা পুর্ব্ববারে বলিয়াছি। যাহাতে কোন প্রশ্নপত্র অতীব দুরূহ না হয় তজ্জন্য Moderater নিযুক্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে করি। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

——o——

মধ্যে শুনিতে পাওয়া গেল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বর্ত্তমান কার্য্যকাল আগামী আগষ্ট মাসে শেষ হইলে তাঁহাকেই পুনরায় দুই বৎসরের জন্য উক্ত কার্য্যে বহাল করাই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন; কিন্তু এখন পর্য্যন্তও গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন উচ্চবাচ্য শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, অথচ সময়ও বেশী নাই। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের বিরুদ্ধদল এখনও সংবাদপত্রে আন্দোলন করিতে বিরত হন নাই। আবার তাঁহার স্বপক্ষদলও নীরব নহেন। 'বেঙ্গলী' কাগজে প্রতি-সপ্তাহে দুই তিন বার যদুনাথ বাবুর গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, আবার 'ফরওয়ার্ড' কাগজ ত যদুবাবুর পিছনে লাগিয়াই আছেন। এ মতান্তরের আর নিবৃত্তি হইবে না। চান্-সেলর মহোদয় যাঁহাকেই এ পদে নিযুক্ত করুন না, তাঁহারই স্বপক্ষে-বিপক্ষে কথা উঠিবে; বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ এখন যে প্রকাশ্যে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এই দলাদলিতেই আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি বিপন্ন হইয়া পড়ে, ইহা বুঝিয়াও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরাও সংযত হন না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

——o——

আগামী ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় এবার কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতি বা কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে। কন্‌গ্রেস এখন স্বরাজ দলের অধিকারভুক্ত হইয়াছে; তাই অন্য কোন দল কন্‌গ্রেসে যোগ দেন না বা বিশেষ কোনরূপ উৎসাহও দেখান না; স্বরাজ দলই কন্‌গ্রেসের বিধি-ব্যবস্থা করেন, অনুষ্ঠান-আয়োজন করেন। আগামী কলিকাতা কন্‌গ্রেসে স্বরাজদল-নায়ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখন হইতেই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে পার্ক সার্কাসের নিকট একখণ্ড ভূমি গ্রহণ করা হইয়াছে। সেখানে কুড়ি হাজার লোকের যাহাতে বসিবার স্থান হয়, সেই প্রকার একটা মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে; প্রদর্শনীর জন্যও অনেক গৃহ সেখানে নির্ম্মিত হইবে। প্রতিনিধি-গণকে এবার আর সহরের নানা স্থানে রাখা হইবে না, কন্‌গ্রেস মণ্ডপের সন্নিকটেই তাঁহাদের অবস্থানের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। কন্‌গ্রেস উপলক্ষে ঐ সময়ে যে সকল সভা সমিতির অধিবেশন হয়, তাহার জন্য গুটিকয়েক স্বতন্ত্র ছোট মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে। বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালনার জন্য শাখা-কমিটি হইয়াছে। কিন্তু এখনও চাঁদার খাতা বাহির হয় নাই এবং মফস্বলে লোক প্রেরিত হয় নাই। বোধ হয় স্বরাজ দলের নেতৃবর্গ ব্যবস্থাপক সভা লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন।
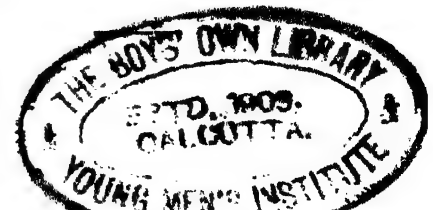
বৈদেশিকী

সঙ্কলন

১। শতবৎসর পূর্ব্বের কথা—মনোরম পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মেক্‌সিকোদেশীয় বিলাসিনীগণ মনোহারী ব্যজনী সঞ্চালনে যুবকদিগের মনোহরণ করিত।
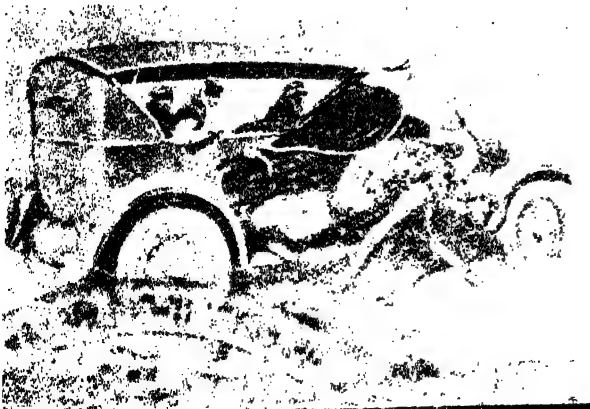
২। জীবন্ত অবস্থায় উট-পক্ষী ধরা—শিকারীরা মোটরসহ পশ্চাদ্ধাবন করে। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উটপক্ষী মোটরের গতি-বেগকেও পরাজিত করে, কিন্তু শীঘ্র ক্লান্ত হয়; তখন মোটর তাহার পার্শ্বদেশে আসিয়া পড়ে এবং পা-দান হইত এক-জন শিকারী তাহার গল-দেশ আকর্ষণ করিয়া ভিতরে টানিয়া লয়।

৩। বারুদ-চালিত মোটর-যান—সাধারণ মোটরের প্রচলিত যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তে ইহাতে কতকগুলি বারুদ-পূর্ণ রন্ধ্র ব্যবহৃত হয় এবং বারুদের স্ফোটনশক্তি সাহায্যে যান হাউই বাজীর ন্যায় ধাবিত হয়। জার্ম্মানিতে ইহার পরীক্ষা-কালে দেখা গিয়াছে যে, মাত্র ৮ সেকেণ্ডের মধ্যে ইহার গতিবেগ প্রায় ৭২ মাইল বৃদ্ধি পায়।
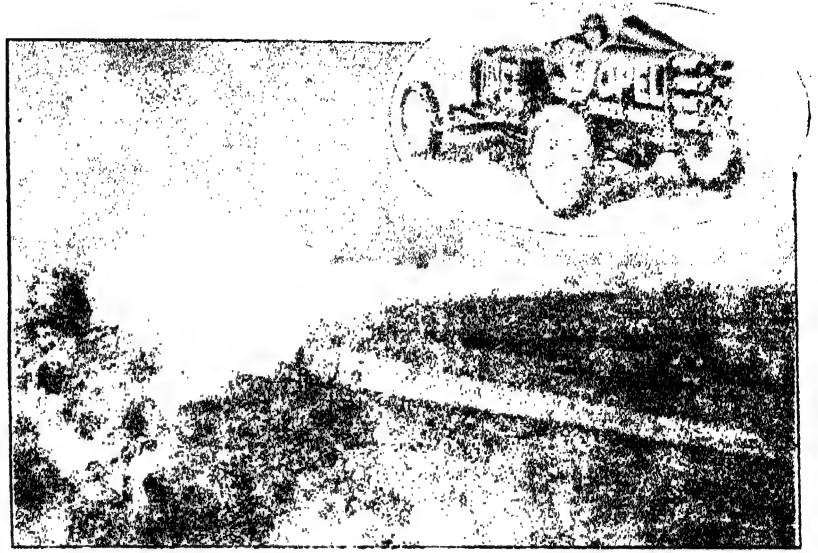
৪। টেক্‌সাস্ স্বাধীনতার পীঠস্থান আলামো—সেন্টফ্রান্সিস্ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম্মমন্দির এক্ষণে টেকসাস্ স্বাধীনতার পীঠস্থান। এই স্থানেই একদিন মাত্র ১৮০ জন অনুচর সাহায্যে জেমস্ বাউই মেক্সিকো দেশীয় সেনানায়ক সানিটা আন্নার বিপক্ষে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। সে গৌরবকাহিনী মেক্সিকো দেশ নতমস্তকে স্বীকার করে।

৫। পেকান বৃক্ষের বিশাল কাণ্ড

৬। যুক্তরাজ্যবাসী সৈন্যদের জুতার সখ—তাহারা সুন্দরী পণ্য বিক্রেত্রীর নিকট হইতে এই অতিরিক্ত মূল্যের মনোহারী জুতাক্রয়ের গর্ব্ব করে।

৮। গগন-পর্য্যটনে পক্ষ ব্যবহার—কিছুদিন পূর্ব্বে অটো লিলিয়েন্থাল নামক একজন বিশিষ্ট ব্যোমপোত যন্ত্রজ্ঞ পক্ষ-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। একদিন ইহার পরীক্ষাকালে ঝটিকাবিতাড়িত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উপস্থিত ফ্রান্সদেশে পুনঃপরীক্ষায় ইহা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে।

৭। প্রস্তরে অতিরম্য কারুকার্য্য—ইহা সান জোসে দে আগুয়াও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরের বাতায়ন ছিল। ইহার নির্ম্মাণকার্য্যে স্পেনদেশীয় নরপতিগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।
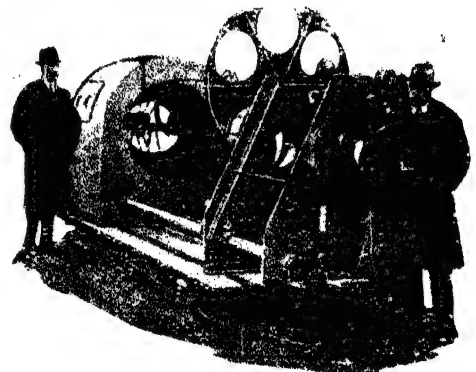
৯। অভিনব বিজ্ঞাপনযন্ত্র—ইহার সাহায্যে মেঘে বিজ্ঞাপনচিত্র ক্ষেপণ করা যায়। মেঘের উপর প্রত্যেক চিত্রটি প্রায় ১৭০ গজ বিস্তৃত হয় এবং চিত্রের স্বতঃ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

১০। সর্পচর্ম্মের লাভজনক ব্যবসা—সর্পচর্ম্মে কোমরবন্ধ, টুপিবন্ধনী, টাকার থলিয়া ইত্যাদি অতি সুলভে নির্ম্মিত হয়। এগুলি বেশ স্থায়ী।

১১। সর্পে ও শৃঙ্গভেকে যুদ্ধ—সাধারণতঃ সর্প ভেককে গলাধঃকরণ করে। এ ক্ষেত্রে ভেকের মস্তকে যে কণ্টক-গুচ্ছ থাকে, তাহা সর্পের কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়াছে এবং উভয়েই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে।